

ফাযায়েলে সাদাকাত

মূল লেখক

শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা
মুহাম্মদ যাকারিয়া ছাহেব কান্দলভী (রহঃ)

অনুবাদ

মুফতী মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ্

নজরে ছানী ও সম্পাদনা

হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ যুবায়ের ছাহেব

মাওলানা রবিউল হক ছাহেব

দারুল কিতাব

৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা

ফাযায়েলে সাদাকাত

(প্রথম খণ্ড)

মূল লেখক

শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা
মুহাম্মদ যাকারিয়া ছাহেব কান্ধলভী (রহঃ)

অনুবাদ

মুফতী মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ

মুহাদ্দিস, জামেয়া আরাবিয়াহ, ফরিদাবাদ
খতীব, সিদ্দিক বাজার জামে মসজিদ, ঢাকা।

নজরে ছানী ও সম্পাদনা

হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ যুবায়ের ছাহেব
মাওলানা রবিউল হক ছাহেব



দারুল কিতাব

৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফাযায়েলে সাদাকাত (প্রথম খণ্ড)

শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা

মুহাম্মদ যাকারিয়া ছাহেব কান্ধলভী (রহঃ)

প্রকাশনা :

দারুল কিতাব

৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ .

প্রথম প্রকাশ :

জুমাদাস্ সানিয়া, ১৪২৫ হিঃ

আষাঢ়, ১৪১১ বাং

জুলাই, ২০০৪ ইং

(সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

মূল্য :

প্রথম খণ্ড : ১১০.০০ টাকা মাত্র।

দ্বিতীয় খণ্ড : ১১০.০০ টাকা মাত্র।

পূর্ণ (দুই খণ্ড এক জে বাঁধাই) : ২০০.০০ টাকা মাত্র।

আমল

ফাযায়েলে আমল এবং মুত্তাখাব হাদিস গ্রন্থদ্বয় পিডিএফ আকারে ইন্টারনেটে পাওয়া যায় কিন্তু ফাযায়েলে সাদাকাত গ্রন্থটির সর্বশেষ সংস্করণের পিডিএফ পাওয়া যায় না। অনেক পুরনো একটি সংস্করণ পিডিএফ আকারে পাওয়া যায়। অথচ গ্রন্থটি পরবর্তীতে পরিবর্ধিত এবং পরিমার্জিত আকারে প্রকাশিত হয়েছে। পিডিএফ কপিও সেই অভাবকে উপলব্ধি করেই প্রিয় গ্রন্থ ফাযায়েলে সাদাকাত এর সর্বশেষ সংস্করণের পিডিএফ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলাম। এটি স্বপ্রণোদিত হয়ে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে পিডিএফ করা হয়েছে। তাই এখানে স্ক্যানার এর মান আশা না করাই ভালো। আল্লাহতালা এই কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। তাদের সবাইকে ক্ষমা করুন। এই কিতাবের বরকত আমাদেরকে দান করুন। কিতাবটি অধ্যয়ন করে বাস্তব জীবনে আমল করার তৌফিক দান করুন।

- পিডিএফ প্রস্তুতকারী টিম

মুরব্বীগণের দোয়া ও অভিমত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

আল্লাহ তায়ালার খাছ মেহেরবানী ও অশেষ রহমতে দীর্ঘদিনের অপেক্ষার পর হযরত শায়খুল হাদীস যাকারিয়া (রহঃ)এর 'ফাযায়েলে সাদাকাত' কিতাবের পূর্ণাঙ্গ ও বিশুদ্ধ তরজমা প্রকাশিত হইল। মুফতী উবাইদুল্লাহ ছাহেব ইহার বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন অতঃপর মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ যুবায়ের ও মাওলানা রবিউল হক ছাহেবান আদ্যোপান্ত মূলের সহিত ইহাকে মিলাইয়াছেন এবং প্রয়োজনীয় স্থানসমূহে পরিবর্তন, পরিমার্জন ও মূলানুগ করিবার ব্যাপারে রাত্র-দিন যথেষ্ট মেহনত করিয়াছেন।

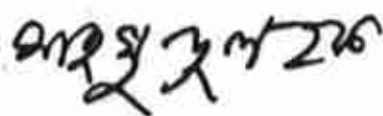
দোয়া করি, আল্লাহ তায়ালার উক্ত মেহনতকে আখেরাতের যখীরা হিসাবে কবুল করুন এবং বিশ্বের বাংলাভাষী সকল মুসলমানকে ইহা দ্বারা উপকৃত হওয়ার তওফীক দান করুন। আমীন।



(মোঃ সিরাজুল ইসলাম, কাকরাইল মসজিদ)
৩৭৭-বি, খিলগাঁও আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২১৯

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

আল্লাহ তায়ালার অশেষ মেহেরবানীতে শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া ছাহেব (রহঃ)এর 'ফাযায়েলে সাদাকাত' কিতাবখানির তরজমা বাংলাভাষায় পুরাপুরিভাবে করা হইল। হাজী আবদুল মুকীত ছাহেব (রহঃ)এর একান্ত আগ্রহ ও আদেশে মুফতী উবাইদুল্লাহ ছাহেব ইহার যথায়থ তরজমা করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালার তাঁহার এই প্রচেষ্টাকে কবুল করুন ও পুরা উন্মতকে ইহা দ্বারা উপকৃত করুন, আমীন।



(মাহমুদুল হক)
কাকরাইল মসজিদ, ঢাকা।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

আল্লাহ তায়ালা অশেষ মেহেরবানীতে শায়খুল হাদীস হযরত
মাওলানা যাকারিয়া ছাহেব(রহঃ)এর 'ফাযায়েলে সাদাকাত' কিতাবখানির
মোকাম্মাল বাংলা তরজমা প্রকাশিত হইল। হাজী আবদুল মুকীত ছাহেব
(রহঃ)এর একান্ত আগ্রহ ও হুকুমে তাঁহারই হেদায়াত মোতাবেক মুফতী
উবাইদুল্লাহ ছাহেব ইহার তরজমা করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁহার এই
মেহনতকে কবুল করুন এবং উম্মতকে ইহা দ্বারা উপকৃত হওয়ার তওফীক
দান করুন, আমীন।

সৈয়দ আজিজুল মকছুদ

(সৈয়দ আজিজুল মকছুদ)

৬৫নং কুদরতে খোদা রোড, ধানমণ্ডি, ঢাকা।



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

অনুবাদকের আরজ

আলহামদুলিল্লাহ, শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া (রহঃ) রচিত ঈমান আমল ও দাওয়াত-তবলীগের জয়বা পয়দাকারী মশহুর কিতাব 'ফাযায়েলে সাদাকাত' এর পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হইল। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূল গ্রন্থকার হযরত শায়েখ (রহঃ) এর দেওয়া মৌলনীতি ও দিকনির্দেশনার যথাযথ অনুসরণ করার সর্বাত্মক চেষ্টা করা হইয়াছে। তিনি যে নীতিমালা দিয়াছেন, তাহা হইল—

اسی طرح دوسرے مختلف زبانوں میں ترجمہ کرنے والوں پر اس کی پوری پوری ذمہ داری ہے کہ وہ ترجمہ کرتے وقت اس مضمون کو نہ بدلیں اور نہ ہی پہلی طرف سے کچھ اضافہ کریں۔ مقدمہ خلیفہ نصاب

হযরত হাজী আবদুল মুকীত ছাহেব (রহঃ) এর সরাসরি নির্দেশ, দিলি তামান্না ও ঐকান্তিক আগ্রহই কিতাবখানি তরজমার ক্ষেত্রে আমাকে অনুপ্রেরণা ও সাহস জোগাইয়াছে। ইত্তিকালের তিন মাস পূর্বেও তিনি এই বলিয়া বিশেষ তাম্বীহ ও খাছ হেদায়েত দিয়াছেন যে, তরজমা এমন সরল সহজ হইতে হইবে, যেন সাধারণ মানুষ অনায়াসেই পড়িতে ও তালীম করিতে পারে।

আল্লাহ পাক জাযায়ে খায়ের দান করুন হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ যুবায়ের ছাহেব ও মাওলানা রবিউল হক ছাহেবকে, তাঁহারা কাকরাইলের বর্তমান মুরুব্বীগণের মান্শা মোতাবেক পাণ্ডুলিপির আগাগোড়া মূল কিতাবের সহিত অক্ষরে অক্ষরে মিলাইয়া প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিমার্জন করিয়া দিয়াছেন।

কাকরাইলের সকল আহলে শূরা, আকাবেরীন, অন্যান্য মুরুব্বিয়ান ও দোস্ত-আহবাবের নিকট আমি শোকর ওজার যে, তাঁহারা খাছ দোয়া ও

তাওয়াজ্জুহ দ্বারা আমাকে হিম্মত দিয়াছেন। আমার শ্রদ্ধেয় আব্বাজানও ইহার জন্য আন্তরিক দোয়া করিয়াছেন। আল্লাহ পাক দোজ্জাহানে তাঁহাদিগকে বহুত বহুত জাযায়ে খায়ের দান করুন ও দরজা বুলন্দ করুন। কিতাবখানির তরজমা ও প্রকাশের ব্যাপারে যে সকল আহবাব আমাকে সহযোগিতা করিয়াছেন আল্লাহ পাক তাঁহাদেরকেও উভয় জাহানে উত্তম বদলা দান করুন।

পাঠকবর্গের খেদমতে সবিনয় আবেদন যে, কোনপ্রকার ভুল-ত্রুটি ধরা পড়িলে জানাইয়া কৃতার্থ করিবেন। পরবর্তীতে সংশোধন করিয়া দেওয়া হইবে ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে মিনতি পেশ করিতেছি, তিনি যেন আপন দয়ায় কিতাবখানি কবুল করিয়া নেন এবং ইহাকে সকল উম্মতের আমল, হেদায়েত ও নাজাতের ওসীলা হিসাবে কবুল ফরমান।

—বিনীত অনুবাদক।



সূচীপত্র
ফাযায়েলে সাদাকাত
প্রথম খণ্ড

বিষয়	পৃষ্ঠা
• ভূমিকা	১৫
প্রথম পরিচ্ছেদ মাল খরচ করার ফযীলত	
মাল খরচ করা সম্পর্কিত আয়াতসমূহ	১৭
• ‘মান্’ ও ‘আযা’-র ব্যাখ্যা	৩০
• গোপনে ও প্রকাশ্যে সদকা করা	৩১
• প্রিয়বস্তু খরচ করা	৩৯
• রাগ দমন ও ক্ষমা করা	৪৪
• হযরত আবু বকর (রাযিঃ)-র রাগান্বিত অবস্থায় আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার ইচ্ছা করা	৫৫
• খরচ করার প্রতিদান	৬১
• সাহাবাদের নিজের উপর অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া	৭৩
• কাফের বন্দীদের প্রতি সহযোগিতা	৯৩
মাল খরচ করার ফযীলত সম্পর্কিত হাদীসসমূহ	৯৮
• হযরত আবু যর (রাযিঃ)-র অবস্থা	৯৯
• মাল খরচকারীদের জন্য ফেরেশতাদের দোয়া : খরচকারীদেরকে পুরস্কৃত কর, জমাকারীদের মাল ধ্বংস কর	১০২
• সুস্থ অবস্থায় সদকা করা	১০৯
• ব্যাভিচারী, চোর ইত্যাদির উপর সদকা করা	১১৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
• জ্বানের হেফাজত	১১৮
• সদকা করার দ্বারা মাল কমে না	১২০
• বাগানের এক-তৃতীয়াংশ আমদানী সদকা করা	১২৪
• কুকুরকে পানি পান করানোর কারণে ক্ষমা	১২৭
সদকা সম্পর্কিত বিভিন্ন হাদীস	১২৮
• কেয়ামতের দিন ফকীরদের সুপারিশ	১৩১
• ক্ষুধার্ত অবস্থায় খানা খাওয়ানো	১৩৯
• তিন ব্যক্তি আল্লাহর পছন্দনীয় আর তিন ব্যক্তি অপছন্দনীয় ...	১৪৬
• সদকায়ে জারিয়া	১৫৯
• যে সমস্ত কাজের সওয়াব মৃত্যুর পরেও বাকী থাকে	১৫৯
• মেহমানের একরাম করা	১৭০
• প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া	১৭১
• ভাল কথা বলিবে অথবা চুপ থাকিবে	১৭৫
• মেহমানের জন্য বিশেষ আয়োজন শুধু একদিন	১৮০
• তোমার খানা যেন মুত্তাকী লোকেরা খায়	১৮৪
• কাহারও সহিত সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য যে সমস্ত গুণাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে	১৮৫
• সঙ্গ ও সংশ্রবের প্রভাব	১৮৬
• অসহায় ব্যক্তির সদকা করা প্রসঙ্গ	১৮৯
• স্বামীর মাল হইতে স্ত্রীর সদকা করা	১৯৭
• প্রত্যেক নেক কাজ সদকা	২০৩
• সদকার ব্যাপারে অন্যকে উৎসাহ প্রদান	২০৪
• বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করা	২০৫
• রিয়া বা লোক দেখানো কাজ গোপন শিরক	২০৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কপণতার নিন্দা

আয়াতসমূহ

• এর ব্যাখ্যা وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ الْاِيَةِ	২২১
• আনন্দ চিন্তে সদকা করা	২২৭
• এর ব্যাখ্যা يَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ	২৩৫
• কপণ বাগান-মালিকের ঘটনা	২৪৫
• এতীমদের প্রতি দয়া সম্পর্কিত আয়াতসমূহের সূচী	২৫৪

কপণতার নিন্দা সম্পর্কিত হাদীসসমূহ	২৫৮
• বিড়ালকে ক্ষুধার্ত রাখিয়া মারিয়া ফেলার কারণে শাস্তি	২৬৮
• ওসীয়েতের মধ্যে ওয়ারিসদের প্রতি খেয়াল রাখা	২৭৪
• মূল্যবন্ধির অপেক্ষায় পণ্যদ্রব্য আটকাইয়া রাখা	২৭৯
• মহিলাদের অধিকহারে দোষখে যাওয়া	২৮৭
• আমার উম্মতের ফেতনা হইল মাল	২৯০
• মালের উপকারিতা ও ক্ষতি	২৯৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আত্মীয়-স্বজনের সহিত সুসম্পর্ক

• এ সম্পর্কিত আয়াতসমূহের সংক্ষিপ্ত সূচী	৩০২
• আত্মীয়-স্বজনের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করা সম্পর্কিত আয়াতসমূহের সংক্ষিপ্ত সূচী	৩১১
• আত্মীয়-সম্পর্ক ছিন্ন করার শাস্তি	৩১২
• মাতাপিতার হক ও আদব	৩১৭
• আত্মীয়-সম্পর্ক বজায় রাখার উপকারিতা	৩২৪
• পিতার মৃত্যুর পর তাহার বন্ধু-বান্ধবদের সহিত সম্পর্ক	৩২৮
• পিতার মৃত্যুর পর অবাধ্য সন্তানের জন্য ক্ষতিপূরণের উপায়	৩২৯
• সন্তানদের উপর খরচ করা	৩৩২

• কাফেরদের প্রতি সহানুভূতি	৩৩৭
• সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহর পরিবারভুক্ত	৩৪০
• আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার অর্থ সম্পর্ক স্থাপনকারীর সহিত সম্পর্ক বজায় রাখা নয় ; বরং সম্পর্ক ছিন্নকারীর সহিত সম্পর্ক বজায় রাখা.....	৩৪৫
• আত্মীয়তা-সম্পর্ক ছিন্ন করার দুনিয়াতে শাস্তি	৩৪৯

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

যাকাতের গুরুত্ব

• যাকাতের ফযীলত সম্পর্কিত আয়াতসমূহ	৩৫৩
• যাকাতের ফযীলত সম্পর্কিত হাদীসসমূহ	৩৫৮
• যাকাতের নিয়ম হইল মধ্যম পর্যায়ের মাল দেওয়া	৩৬৬
• নিজের পক্ষ হইতে যাকাতের পরিমাণের চাইতে বেশী দেওয়া চাই.....	৩৭৪
• সত্তরটি নফল একটি ফরজের বদলা হয়	৩৭৫

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

যাকাত না দেওয়ার উপর ভীতি প্রদর্শন

• কারুণের ঘটনা	৩৭৯
• যাকাত না দেওয়ার শাস্তি	৩৮৪
• যাকাত ফকীরদের হক, কেয়ামতের দিন এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইবে	৩৮৯
• যাকাত আদায় না করার কারণে মুসীবতসমূহ	৪০২
• যাকাত আদায় না করিলে মাল ধ্বংস হইয়া যায়	৪০৬
• যাকাতের মাল মিশ্রিত হইলে অন্য মালও ধ্বংস হইয়া যায়	৪০৮
• যাকাত দ্বারা হারাম মাল পবিত্র হয় না	৪০৯

• মহিলাদের জন্য স্বর্ণের অলংকার	৪১০
• নিম্ন পর্যায়ের মাল দ্বারা যাকাত আদায় করা	৪১৩
• যাকাত আদায় করার আদব ও নিয়মাবলী	৪১৬
• যাকাত কেমন লোকদেরকে দিতে হইবে এবং তাহাদের গুণাবলী	৪২৭



ফাযায়েলে সাদাকাত

(প্রথম খণ্ড)

ভূমিকা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

এই কয়েকটি পৃষ্ঠা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার ফযীলত সম্পর্কে লিখিত হইয়াছে। আমার ‘ফাযায়েলে হজ্জ’ নামক কিতাবের শুরুতে এ সম্পর্কে লিখিয়াছি—চাচাজান হযরত মাওলানা ইলিয়াস ছাহেব (রহঃ) এই কিতাবের ব্যাপারে খুবই গুরুত্ব দিতেন এবং জীবনের শেষ দিনগুলিতে বারবার ইহার জন্য তাকিদ করিয়াছেন। একবার আছরের জামাত দাঁড়াইতেছিল ; একামতের সময় কাতার হইতে মুখ বাহির করিয়া অধমকে হুকুম করিলেন, দেখ এই কাজটি ভুলিও না। অসুস্থতার কারণে চাচাজান তখন নিজে ইমামতি করিতেন না ; এইজন্য মুক্তাদীদের কাতারে তিনিও শরীক ছিলেন। এত বেশী গুরুত্ব আরোপ ও বারবার বলা সত্ত্বেও আমার অবহেলার দরুন এই কাজে বিলম্ব হইতেই থাকিল ; শুধু বিলম্ব নয় কাজটি প্রায় বন্ধ হইয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছিল। এমন সময় তকদীরের ফয়সালা অনুযায়ী ১৩৬৬ হিজরী সালের শাওয়াল মাসে দিল্লীর বস্তী হযরত নিজামুদ্দীনে দীর্ঘদিন অবস্থান করিতে হইল, যাহা ‘ফাযায়েলে হজ্জ’ নামক কিতাবের শুরুতে লিখিয়াছি। উহা লেখা শেষ হওয়ার পরও যখন সাহারানপুর ফিরিয়া যাওয়ার কোন সুযোগ হইল না, তখন ১৩৬৬ হিজরী সালের ২৪শে শাওয়াল বুধবার এই কিতাব লেখা শুরু করা হয়। আল্লাহ তায়ালা তাহার সেই দয়া ও মেহেরবানী দ্বারা—যাহা আমার শত অযোগ্যতা সত্ত্বেও আমার উপর প্রতিদিন দীন-দুনিয়া উভয় দিক হইতে

বাড়িয়াই চলিয়াছে—এই কিতাবে পূর্ণতায় পৌছাইয়া কবুল করুন। একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই তওফীকদাতা ; তাহারই উপর ভরসা করিতেছি এবং তাহারই দিকে ফিরিতেছি।

এই কিতাবে সাতটি পরিচ্ছেদ লেখার ইচ্ছা রহিয়াছে। প্রথম পরিচ্ছেদে আল্লাহর রাস্তায় মাল খরচ করার ফযীলত। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে কৃপণতার নিন্দা। তৃতীয় পরিচ্ছেদে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব। চতুর্থ পরিচ্ছেদে যাকাত ওয়াজিব হওয়া এবং উহার ফযীলত। পঞ্চম পরিচ্ছেদে যাকাত আদায় না করার উপর ধমক। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ও অল্পে তুষ্টি এবং সওয়াল না করার প্রতি উৎসাহ প্রদান। সপ্তম পরিচ্ছেদে দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ও আল্লাহর রাস্তায় দানকারী ব্যক্তিদের ঘটনাবলী।





نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

ফাযায়েলে সাদাকাত

প্রথম পরিচ্ছেদ

মাল খরচ করার ফযীলত

আল্লাহ তায়ালায় পাক কালাম ও তাঁহার সত্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদসমূহের মধ্যে খরচ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং উহার ফযীলত এত বেশী বর্ণিত হইয়াছে যে, উহার কোন সীমা নাই। এই সকল ফযীলত দেখিলে মনে হয়, টাকা-পয়সা সঙ্গে রাখিবার জিনিসই নয় ; ইহা পয়দাই হইয়াছে আল্লাহর রাস্তায় খরচ হওয়ার জন্য। এই বিষয়ের উপর যেই পরিমাণ এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে, উহার দশ ভাগের এক ভাগ বা বিশ ভাগের এক ভাগও সংগ্রহ করা কঠিন। নমুনা হিসাবে কয়েকটি আয়াত ও কয়েকটি হাদীসের তরজমা আমার অভ্যাস অনুযায়ী পেশ করিতেছি—

আয়াতসমূহ

(রিকাব یعنی قرآن شریف) راستہ بندے الی ہے خدا سے دینے والوں کو جو یقین لائے ہیں غیب کی چیزیں

① هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ

ওর কাম রকতে মিন মাদকু'র জব্বায়েম নে অকু'র
 অমিন سے خرچ کرتے ہیں اور وہ لوگ ایسے ہیں جو
 یقین رکھتے ہیں (ایمان لائق ہیں) اس کتاب پر بھی
 جو آپ پر نازل کی گئی اور ان کتابیں پر بھی جو آپ سے
 پہلے نازل کی گئیں اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں
 یہی لوگ اس صبح راستہ پر ہیں جو ان کے سب کی طرف سے
 طلبہ اور سی لوگ فلاح کر سنبھالے ہیں۔

الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
 يُنْفِقُونَ ۝ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
 بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِمَّا أُنْزِلَ
 مِنْ قَبْلِكَ ۖ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ
 يُوقِنُونَ ۝ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى
 مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
 الْمُفْلِحُونَ ۝ (بقرہ-۱۷)

① (এই কিতাব অর্থাৎ, কুরআন শরীফ) খোদাভীরুদের জন্য পথপ্রদর্শক ; যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করে অদৃশ্য বস্তুসমূহের প্রতি এবং নামায কায়েম রাখে, আর আমি তাহাদিগকে যাহা প্রদান করিয়াছি উহা হইতে খরচ করে এবং তাহারা এমন যে, একীন রাখে (সিমান আনে) ঐ কিতাবের প্রতিও যাহা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে আর ঐ সমস্ত কিতাবের প্রতিও যাহা আপনার পূর্বে অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং আখেরাতের প্রতিও তাহারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। ইহারাই তাহাদের প্রভু হইতে প্রাপ্ত হেদায়েতের উপর রহিয়াছে এবং ইহারাই সফলকাম। (বাকারা : ১-৫)

ফায়দা : এই আয়াত শরীফে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্যণীয়—

ক. খোদাভীরুদের জন্য পথপ্রদর্শনকারী অর্থাৎ, যে মালিককে ভয় করে না, মালিককে মালিক মনে করে না এবং সে আপন সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে অস্ত—এইরূপ ব্যক্তি কুরআন পাকের প্রদর্শিত পথ কিভাবে দেখিতে পাইবে? পথ সেই ব্যক্তিই দেখিতে পায়, যাহার মধ্যে দেখিবার যোগ্যতাও থাকে। যাহার মধ্যে দেখিবার মাধ্যম স্বরূপ চোখই নাই, সে কী দেখিবে? তদ্রূপ যাহার অন্তরে মালিকের ভয়ই নাই, সে মালিকের হুকুমের কী পয়োয়া করিবে?

খ. 'নামাযকে কায়েম রাখা' হইল, উহাকে উহার আদব ও শর্তসমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যত্ন ও গুরুত্বসহকারে আদায় করে। ইহার বিস্তারিত বিবরণ ফাযায়েলে নামায কিতাবে বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) এর এই উক্তি বর্ণনা করা হইয়াছে যে, নামায কায়েম করার অর্থ, উঃ র রুকু ও সেজদা উত্তমরূপে আদায় করা, পরিপূর্ণ মনোযোগ ও খুশু-খুযু সহকারে পড়া। কাতাদাহ (রাযিঃ) বলেন, নামায

কায়েম করার অর্থ—উহার সময়ের হেফাজত করা এবং ওয়, রুকু ও সেজদা উত্তমরূপে আদায় করা।

গ. সফলকাম হওয়া বহু উচ্চ পর্যায়ের জিনিস। সফলতা শব্দটি যেখানেই উল্লেখিত হয়, উহা দ্বীন ও দুনিয়ার যাবতীয় উন্নতি ও কামিয়াবীর অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইমাম রাগেব (রহঃ) লিখিয়াছেন, দুনিয়াবী সফলতা ঐ সমস্ত গুণাবলী অর্জন করার নাম যাহা দ্বারা দুনিয়ার জীবন উন্নত হইয়া যায়। আর তাহা হইল স্থায়িত্ব, অমুখাপেক্ষিতা ও সম্মান। আর আখেরাতের সফলতা হইল চার জিনিস : এমন স্থায়িত্ব যাহা কখনও শেষ হয় না, এমন অমুখাপেক্ষিতা যাহার মধ্যে অভাবের লেশমাত্রও নাই, এমন সম্মান যাহার মধ্যে কোন প্রকার অপমান নাই, এমন এলেম যাহার মধ্যে মূর্থতার দখল নাই। উক্ত আয়াতে সফলতা শব্দটি ব্যাপক অর্থে বলা হইয়াছে, কাজেই উহার মধ্যে দ্বীন ও দুনিয়া উভয়েরই সফলতা আসিয়া গিয়াছে।

সارا کمال اسی میں نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف
کر لیا مغرب کی طرف لیکن اصل کمال تو یہ ہے کہ کوئی
شخص اللہ پر ایمان لائے اور قیامت کے لیے پروا اور
فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں پر اور سب پیغمبروں
پر اور اللہ کی محبت میں مال دیتا ہو، اپنے
رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور غریبوں کو اور
مسافروں کو اور (لا چاری میں) سوال کرنے والوں
کو اور (قیدیوں اور غلاموں کی) گردن چھڑانے میں
خروج کرتا ہو اور نماز کو قائم رکھتا ہو اور زکوٰۃ
کو ادا کرتا ہو کہ اصل کمالت یہ چیزیں ہیں۔
(آیت شریفہ میں ان کی بعض اور صفات کا ذکر
فرما کر ارشاد ہے) کہ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی
لوگ مخلصی ہیں۔

② لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا
وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ وَلَئِنَّ الْبِرَّ
مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَآلَمَلَّحْكَةً وَ
الْكِتَابِ وَالتَّبِئِينَ
وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ
ذَوَى الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ
(الآية - سورة بقرہ - ۱۷۷)

② সমস্ত সৎকর্ম শুধু ইহাই নয় যে, তোমরা নিজেদের মুখ পূর্বদিকে
কর কিংবা পশ্চিম দিকে কর। বরং আসল সৎকর্ম তো এই যে, কোন

ব্যক্তি ঈমান রাখে আল্লাহর প্রতি, কিয়ামতের দিনের প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি, আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি এবং নবীগণের প্রতি। আর আল্লাহর মহব্বতে মাল প্রদান করে আপন আত্মীয়-স্বজনকে এবং এতীমদিগকে, গরীবদিগকে, মুসাফিরদিগকে, (আর অসহায় অবস্থায়) সওয়ালকারীদেরকে এবং (বন্দী ও গোলামদের) মুক্ত করিতে খরচ করে এবং নামাযকে কায়েম রাখে ও যাকাত আদায় করে। অর্থাৎ, আসল সৎকর্ম হইল, এইগুলি। (উক্ত আয়াতে আরও কিছু গুণাবলী উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে,) এই সমস্ত লোকই সত্যবাদী এবং ইহারাই পরহেযগার। (বাকার : ১৭৭)

ফায়দা : হযরত কাতাদাহ (রাযিঃ) বলেন, ইহুদীরা পশ্চিম দিকে নামায পড়িত এবং খৃষ্টানরা পূর্বদিকে নামায পড়িত। এই সম্পর্কে উক্ত আয়াত শরীফ নাযিল হইয়াছে। আরও অনেকের নিকট হইতে এই একই বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। (দুররে মানসূর)

ইমাম জাসসাস (রহঃ) লিখিয়াছেন, উক্ত আয়াতে ইহুদী ও নাসারাদের অভিযোগ খণ্ডন করা হইয়াছে। যখন তাহারা কেবলা রহিত হইয়া যাওয়ার (অর্থাৎ, বায়তুল-মুকাদ্দাসের স্থলে কাবাকে কেবলা বানানোর) উপর অভিযোগ করিল, তখন আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত অবতীর্ণ করিলেন যে, সৎকর্ম আল্লাহ তায়ালায় আনুগত্যের মধ্যে রহিয়াছে ; তাহার আনুগত্য ব্যতীত পূর্ব ও পশ্চিম দিকে মুখ ফিরানো কোন জিনিস নহে। (আহকামুল-কুরআন)

আল্লাহর মহব্বতে মাল প্রদান করে—এর অর্থ হইল, উপরে বর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে আল্লাহ তায়ালায় মহব্বত ও সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে খরচ করে, লোক দেখানো, সুখ্যাতি ও সম্মান অর্জনের জন্য খরচ করে না। কেননা, এই উদ্দেশ্যে খরচ করা নেকী বরবাদ করা ও গুনাহ অনিবার্য হওয়ার নামান্তর। নিজের মালও খরচ করিল এবং আল্লাহ তায়ালায় নিকট সওয়াবের পরিবর্তে গুনাহ হইল।

হযূর সাব্বান্নাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের বাহ্যিক আমল ও তোমাদের মালের প্রতি দেখেন না (যে, কি পরিমাণ খরচ করিল) বরং তোমাদের এখলাস ও তোমাদের অন্তরের প্রতি দেখেন (যে, কি নিয়ত ও কি উদ্দেশ্যে খরচ করিল)। (মিশকাত)

অপর এক হাদীসে হযূর সাব্বান্নাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের জন্য আমার সবচাইতে বেশী শির্কে আসগরের ভয় হয়। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! শির্কে আসগর কি? হযূর সাব্বান্নাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, লোক

দেখানোর জন্য আমল করা।

বহু হাদীসে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে খরচ করার প্রতি অনেক বেশী সতর্ক করা হইয়াছে, ইহার বর্ণনা পরে আসিতেছে। উক্ত আয়াতের দ্বারা যদি আল্লাহর মহব্বতে দান করা উদ্দেশ্য হইয়া থাকে, তবে তো এই অর্থই হইবে যাহা করা হইয়াছে। কোন কোন আলেম 'খরচ করার মহব্বত' অর্থ করিয়াছেন, অর্থাৎ যাহা খরচ করিয়াছে উহার উপর আনন্দিত হয়; এমন হয় না যে, তখন তো খরচ করিয়াছে কিন্তু পরে আফসোস হয় যে, আমি কেন খরচ করিলাম? কেমন বোকামী করিলাম, টাকা কমিয়া গেল ইত্যাদি ইত্যাদি। (আহকামুল-কুরআন)

অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম উক্ত আয়াতের অর্থ 'মালের প্রতি মহব্বত' বলিয়াছেন, অর্থাৎ মালের প্রতি মহব্বত সত্ত্বেও এই সমস্ত ক্ষেত্রে খরচ করে। এক হাদীসে আছে, কোন এক ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! মালের প্রতি মহব্বতের অর্থ কি? মালের প্রতি মহব্বত তো প্রত্যেকেরই হয়। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যখন তুমি মাল খরচ কর, তখন তোমার অন্তর তোমার প্রয়োজনসমূহকে স্মরণ করাইয়া দেয় এবং অন্তরে তোমার প্রয়োজনের ব্যাপারে ভয় পয়দা হয় যে, জীবন এখনও অনেক বাকী রহিয়াছে; আমার আবার প্রয়োজন দেখা না দেয়।

এক হাদীসে আছে, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সর্বোত্তম সদকা হইল, তুমি এমন সময় খরচ করিবে যখন সুস্থ থাক এবং দীর্ঘদিন দুনিয়াতে বাঁচিয়া থাকার আশা হয়। এক্রপ করিও না যে, সদকা করিতে টাল-বাহানা করিতে থাক, আর যখন দম বাহির হওয়ার সময় হইল এবং মৃত্যুর সময় নিকটে আসিয়া গেল, তখন বলিতে লাগিলে যে, এই পরিমাণ অমুককে দেওয়া হউক আর এই পরিমাণ অমুক জায়গায় দেওয়া হউক। অথচ এখন তো উহা অমুকের হইয়া গিয়াছে।

(দুররে মানসুর)

অর্থাৎ, যখন নিজের ব্যাপারে নিরাশ হইয়া গেলেন এবং নিজের প্রয়োজন ও অভাবের ভয়ও আর রহিল না, তখন আপনি বলিতে শুরু করিলেন যে, এই পরিমাণ অমুক মসজিদে, এই পরিমাণ অমুক মাদ্রাসায় দেওয়া হউক। অথচ এখন উহা প্রায় ওয়ারিসের সম্পদ হইয়া গিয়াছে। কাজেই এখন ইহা মিষ্টির দোকানে নানাজির ফাতেহা পড়ার মত হইয়া গেল, অর্থাৎ অন্যের মাল দ্বারা সওয়াব হাসিল করার মত হইল। যতক্ষণ উহার সহিত নিজের প্রয়োজন জড়িত ছিল, ততক্ষণ তো খরচ করার

তৌফিক হয় নাই। আর যখন উহা অন্যদের, অর্থাৎ ওয়ারিশদের মালিকানায যাওয়ার সময় হইল, তখন আল্লাহর রাস্তায় দেওয়ার আগ্রহ পয়দা হইল। এইজন্যই পবিত্র শরীয়ত ছকুম দিয়াছে যে, মৃত্যুর সময়ের দান এক-তৃতীয়াংশ সম্পদের মধ্যে কার্যকর হইবে। যদি কেহ এই সময় সমস্ত মালও দান করিয়া মরিয়া যায়, তবে ওয়ারিসদের অনুমতি ব্যতীত এক-তৃতীয়াংশের অধিক সম্পদের মধ্যে তাহার ওসীয়াত গ্রহণযোগ্য হইবে না।

এই আয়াত শরীফে সম্পদকে এতীম, মিসকীন ও অন্যান্যদের উপর খরচ করার বিষয়টিকে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। আর শেষের অংশে যাকাতকে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। যদ্বারা জানা যায় যে, এই সমস্ত খরচ যাকাত আদায়ের পর অবশিষ্ট সম্পদের সহিত সম্পর্কিত। ইহার বিবরণ হাদীসের বর্ণনায় প্রথম হাদীসের ব্যাখ্যায় আসিতেছে।

﴿ ٣ ﴾ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ○ (ব্রূঃ)

اور تم لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو اور اپنے ہاتھوں سے تباہی میں نہ ڈالو (خروج و غزوہ)
 کی اچھی طرح کیا کرو۔ بیشک حق تعالیٰ محبوب مکتبین اچھی طرح کام کئے والوں کو۔

③ আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় খরচ কর এবং তোমরা নিজেদেরকে নিজ হাতে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করিও না আর (খরচ ইত্যাদি) উত্তমরূপে সম্পন্ন কর। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা উত্তমরূপে কর্ম সম্পাদনকারীদেরকে ভালবাসেন। (বাকার : ১৯৫)

ফায়দা : হযরত হোযায়ফা (রাযিঃ) বলেন, 'নিজেরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করিও না' ইহার অর্থ হইল, দরিদ্রতার ভয়ে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা ছাড়িয়া দিও না। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করার অর্থ ইহা নয় যে, মানুষ আল্লাহর রাস্তায় কতল হইয়া যাইবে। বরং ইহার অর্থ হইল, আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা হইতে বিরত হইয়া যাওয়া। হযরত যাহ্‌হাক ইবনে জুবায়ের (রাযিঃ) বলেন, আনসারগণ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিতেন এবং দান-খয়রাত করিতেন। এক বৎসর দুর্ভিক্ষ হইল, ইহাতে তাহাদের খেয়াল পরিবর্তন হইয়া গেল এবং আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা ছাড়িয়া দিলেন। তখন এই আয়াত নাযিল হয়।

হযরত আসলাম (রাযিঃ) বলেন, আমরা কুস্তনতুনিয়ার যুদ্ধে শরীক

হিলাম। কাফেরদের বিরাট বাহিনী মুকাবিলার জন্য আসিল। মুসলমানদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি তরবারী লইয়া তাহাদের কাতারের মধ্যে ঢুকিয়া গেল। অন্যান্য মুসলমানগণ শোরগোল করিল এবং বলিল যে, সে নিজেকে নিজে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছে।

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাযিঃ)ও এই যুদ্ধে শরীক ছিলেন। তিনি দাঁড়াইয়া বলিলেন, ইহা নিজেকে নিজে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করা নয়। তোমরা এই আয়াতের এই অর্থ করিতেছ? এই আয়াত তো আমাদের সম্পর্কে নাথিল হইয়াছে। ঘটনা এই হইয়াছিল যে, যখন ইসলামের প্রসার হইতে লাগিল এবং দ্বীনের সাহায্যকারী অনেক হইয়া গেল, তখন আমাদের অর্থাৎ আনসারগণের গোপনে এই সিদ্ধান্ত হইল যে, এখন আল্লাহ তায়ালা ইসলামকে বিজয় দান করিয়াছেন এবং লোকদের মধ্যে দ্বীনের সাহায্যকারীদের সংখ্যা অনেক হইয়া গিয়াছে; এই দিকে আমাদের ধন-সম্পদ, ক্ষেত-খামার ইত্যাদি দীর্ঘদিন যাবৎ পুরাপুরিভাবে দেখাশোনা না করিতে পারার কারণে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। অতএব, আমরা এইসব বিষয়ে খোঁজ-খবর লই এবং এইগুলিকে ঠিক করিয়া লই। তখন এই আয়াত নাথিল হইয়াছে। সুতরাং নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করার অর্থ হইল, ধন-সম্পদের ব্যবস্থার মধ্যে লাগিয়া যাওয়া এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা ছাড়িয়া দেওয়া। (দুররে মানসূর)

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ (বقرہ- ۲۷۵)
 لَكَ آبٌ يَرْجُو مِنْكَ خَيْرَاتٍ ۖ
 كَمَا خَرَفَ كَرِيْمٌ فَرَادِيكُ كَتَبْتُمْ وَرَتَّ
 (ت) نَامِدِ -

⑧ লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে যে, তাহারা কি পরিমাণ দান করিবে। আপনি বলিয়া দিন, যাহা (প্রয়োজন হইতে) অতিরিক্ত হয়।

(বাকারা : ২১৯)

ফায়দা : অর্থাৎ, ধনসম্পদ তো খরচ করার জন্যই। নিজের প্রয়োজন পরিমাণ রাখিয়া যাহা অতিরিক্ত হয়, উহা খরচ করিয়া দিবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, আপন পরিবার-পরিজনের খরচ হইতে যাহা বাঁচিয়া যায়, উহাই অতিরিক্ত। হযরত আবু উমামা (রাযিঃ) হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করেন যে, হে মানুষ! যাহা তোমার প্রয়োজন হইতে অতিরিক্ত, উহা খরচ করিয়া দাও; ইহা তোমার জন্য উত্তম। আর যদি উহাকে জমা করিয়া রাখ, তবে ইহা তোমার জন্য মন্দ। তবে প্রয়োজন পরিমাণ জমা রাখিলে কোন দোষ নাই।

প্রথমে তোমার পরিবারের লোকদের উপর খরচ কর, আর উপরের হাত (অর্থাৎ, দাতার হাত), নিচের হাত হইতে উত্তম (অর্থাৎ, সেই হাত লওয়ার জন্য প্রসারিত হইয়া থাকে)।

হযরত আতা (রাযিঃ) হইতেও ইহাই বর্ণনা করা হইয়াছে যে, 'আফও' শব্দ দ্বারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়াকে বুঝানো হইয়াছে। (দুররে মানসূর)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বলেন, একবার হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যাহার নিকট অতিরিক্ত সওয়ারী আছে, সে যেন এমন ব্যক্তিকে দেয় যাহার নিকট সওয়ারী নাই। আর যাহার নিকট অতিরিক্ত সম্বল আছে, সে যেন এমন ব্যক্তিকে সম্বল দান করে যাহার নিকট সম্বল নাই। (হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত বেশী গুরুত্বসহকারে এই কথা বলিলেন যে,) আমরা ধারণা করিতে লাগিলাম যে, কোন ব্যক্তির প্রয়োজন হইতে অতিরিক্ত মালের মধ্যে তাহার কোন অধিকারই নাই। (আবু দাউদ) আর সর্বোচ্চ স্তরের কথাও ইহাই যে, মানুষের নিকট তাহার প্রকৃত প্রয়োজনের অতিরিক্ত যাহা আছে, উহা খরচ করিবার জন্যই; জমা করিয়া রাখিবার জন্য নয়।

কোন কোন আলেম 'আফও' শব্দের অর্থ সহজ বলিয়াছেন। অর্থাৎ, যে পরিমাণ সহজভাবে খরচ করিতে পার। যাহা খরচ করিলে নিজে পেরেশান হইয়া দুনিয়াবী কষ্টে লিপ্ত হইতে না হয় এবং অন্যের হক নষ্ট হওয়ার কারণে আখেরাতের কষ্টেও লিপ্ত হইতে না হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, কিছু লোক এইরূপ সদকা করিত যে, তাহাদের নিকট নিজেদের খাওয়ারও কিছু থাকিত না। এমনকি অন্যরা তাহাদেরকে দান করিবার অবস্থা হইয়া যাইত। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বলেন, এক ব্যক্তি মসজিদে আসিল। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার অবস্থা দেখিয়া তাহাকে কাপড় দান করিবার জন্য লোকদিগকে বলিলেন, অনেক কাপড় চাঁদা হিসাবে জমা হইয়া গেল। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহা হইতে দুইটি কাপড় ঐ ব্যক্তিকে দান করিলেন। অতঃপর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় দান করিতে উৎসাহ দিলেন। লোকেরা দান করিল, তখন ঐ ব্যক্তিও তাহার দুইটি কাপড় হইতে একটি দান করিল। ইহাতে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিলেন এবং তাহার দান করা কাপড়টি ফেরত দিয়া দিলেন।

নিজের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও খরচ করিবার জন্য কুরআন পাকে

উৎসাহিত করা হইয়াছে। কিন্তু উহা ঐ সমস্ত লোকের জন্য যাহারা ইহা খুশীমনে বরদাশত করিতে পারে এবং প্রকৃতই তাহাদের অন্তরে আশ্বেরাভের গুরুত্ব দুনিয়ার উপর প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। আটত্রিশ নম্বর আয়াতেও এই বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হইবে।

⑤ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ط وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ○
(সূরা বাক্বা-রকত ২৮)

কোন এ অংশের আল্লাহর ঋণ শুল্ক করছে
আমি প্রচুর ঋণ দিলাম, পরিশোধে তাই
করবেত ন্যায় কমে (আরও গুণে) কমে সে ঋণ
খুশীমনে (কর) আল্লাহর ঋণ শুল্কই ঋণ ফরাশ
করবে (আসি কে বস্তুই) আল্লাহর ঋণ
(মূলকে) ঋণ শুল্কই বাওকে-

⑤ এমন ব্যক্তি কে আছে, যে আল্লাহ তায়ালাকে করজ দিবে; উক্ত করজ? অতঃপর আল্লাহ তায়ালা ইহাকে তাহার জন্য বর্ধিত করিয়া দিবেন বহুগুণে (এবং এই খরচ করার দ্বারা অভাবের ভয় করিও না)। কেননা, আল্লাহ তায়ালাই সংকুচিত করেন ও প্রসঙ্গতা দান করেন (অর্থাৎ, এই কাজ তাহারই কক্ষায় রহিয়াছে) এবং তাহারই দিকে তোমরা (মৃত্যুর পর) প্রত্যাবর্তিত হইবে। (বাক্বা : ২৪৫)

ফায়দা : আল্লাহর রাস্তায় খরচ করাকে এইজন্য করজ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, করজ আদায় করা ও ফেরত দেওয়া যেমন জরুরী, তেমনই আল্লাহর রাস্তায় খরচের সওয়াব ও বিনিময় অবশ্যই লাভ হয়। হযরত ওমর (রাযিঃ) বলেন, আল্লাহকে করজ দেওয়া দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা বুঝানো হইয়াছে।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, যখন এই আয়াত নাযিল হইয়াছে, তখন হযরত আবু দাহদাদ্ আনসারী (রাযিঃ) হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন এবং আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা আমাদের নিকট করজ চাহিতেছেন? হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, নিঃসন্দেহে। তিনি আরজ করিলেন, আপনার পবিত্র হাত আমাকে ধরিতে দিন (যাহাতে আমি আপনার পবিত্র হাতে একটি অঙ্গিকার করি)। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত বাড়াইলেন। তিনি অঙ্গিকারের নিয়ম অনুযায়ী হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত ধরিয়া আরজ করিলেন, ইয়া

রাসূলুল্লাহ! আমি আমার বাগান আমার আল্লাহকে করজু দিয়া দিলাম। তাহার বাগানে ৬০০ খেজুরের গাছ ছিল, আর এই বাগানেই তাহার পরিবার-পরিজন থাকিত। এখান হইতে উঠিয়া তিনি নিজের বাগানে গেলেন এবং তাহার স্ত্রী উম্মে সাহলাহ (রাযিঃ)কে ডাকিয়া বলিলেন, চল এই বাগান হইতে বাহির হও, এই বাগান আমি আমার রবকে দিয়া দিয়াছি।

আরেক হাদীসে হযরত আবু হোরায়া (রাযিঃ) বলেন, ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বাগানটি কয়েকজন এতীমের মধ্যে বন্টন করিয়া দিলেন।

এক হাদীসে আছে, যখন এই আয়াত **مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ الْاِيَةِ** অর্থাৎ, 'যে ব্যক্তি একটি নেকী করিবে তাহাকে দশগুণ সওয়াব দেওয়া হইবে' নাযিল হইল, তখন ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করিলেন, হে আল্লাহ! আমার উম্মতের সওয়াব ইহা হইতেও বেশী করিয়া দিন। অতঃপর এই আয়াত **مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ الْاِيَةِ** নাযিল হইল। ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় দোয়া করিলেন, হে আল্লাহ! আমার উম্মতের সওয়াব আরও বৃদ্ধি করিয়া দিন। অতঃপর এই আয়াত **الَّذِينَ يَنْفِقُونَ الْاِيَةِ** নাযিল হইল যাহা ৭ নম্বরে আসিতেছে। ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবারও দোয়া করিলেন, হে আল্লাহ! আমার উম্মতের সওয়াব বৃদ্ধি করিয়া দিন। তখন এই আয়াত **انَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ** নাযিল হইল। অর্থাৎ, সবরকারীগণকে তাহাদের সওয়াব পরিপূর্ণ দেওয়া হইবে; যাহা অসংখ্য ও অগণিত হইবে। (যুমার : ১০)

এক হাদীসে আছে, একজন ফেরেশতা আহবান করিয়া বলে, কে আছে, যে আজ করজু দিবে এবং কাল পরিপূর্ণ বিনিময় গ্রহণ করিয়া লইবে? আরেক হাদীসে আছে, আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে মানুষ! তোমার সম্পদ আমার নিকট আমানত রাখিয়া দাও। উহাতে না আগুন লাগিবার আশংকা থাকিবে, না উহা ডুবিয়া যাওয়ার আশংকা থাকিবে আর না চুরি হওয়ার আশংকা থাকিবে। আমি এমন সময় উহা তোমাকে পুরাপুরিভাবে ফেরত দিব, যখন তোমার চরম প্রয়োজন দেখা দিবে।

(দুররে মানসুর)

⑥ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَلِفُوا
مِمَّا نَزَّلْنَاهُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ
لَعَلَّ إِيَّانَ مَا وَخَّجَ كَرْدَانِ حَبِيزِ مِلْ

يَا أَيُّهَا يَوْمٌ لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا يَخْلَعُ
وَلَا شَفَاعَةٌ (بقرہ - ع ۳۳)

آج کے جس میں نہ تو خرید و فروخت ہو سکتی
ہے نہ دوستی ہوگی نہ کسی کی (اللہ کی اجازت
بغیر) سفارش ہوگی۔

৬) হে মুমিনগণ! খরচ কর এই সমস্ত বস্তু হইতে, যাহা আমি তোমাদিগকে দিয়াছি—সেই দিন আগমনের পূর্বে, যেইদিন কোন ক্রয়-বিক্রয় হইবে না এবং কোন বন্ধুত্ব হইবে না এবং কাহারও (আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত) সুপারিশ চলিবে না। (বাকারা : ২৫৪)

ফায়দা : অর্থাৎ, সেই দিন না ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থা থাকিবে যে, কেহ অন্যের নেকী খরিদ করিয়া লইবে, না কোন বন্ধুত্ব থাকিবে যে, সম্পর্কের কারণে কেহ অন্যের নিকট হইতে নেকী চাহিয়া লইবে, না অনুমতি ব্যতীত কাহারও সুপারিশ করিবার অধিকার থাকিবে যে, নিজের পক্ষ হইতে কাকূতি-মিনতি করিয়া সুপারিশ করাইয়া লইবে। মোটকথা, সেইদিন অন্যের নিকট হইতে সাহায্য লওয়ার সকল পথ রুদ্ধ থাকিবে। সেই দিনের জন্য কিছু করিতে হইলে আজ করিতে হইবে। যাহা বপন করিতে হয় আজ করিতে হইবে। সেই দিন তো ফসল কাটিবার দিন হইবে। যাহা বপন করা হইয়াছে, উহাই কাটা হইবে। খাদ্য শস্য হউক বা ফুল অথবা কাটা বা ছালানী লাকড়ি। প্রত্যেক ব্যক্তি যেন নিজেই চিন্তা করিয়া দেখে, সে কি বপন করিতেছে !

جو لوگ اللہ کے راستے میں (یعنی عیسائی گھمروں میں) اپنے ناموں کو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک والد جو جس میں سات بیٹے اگلی ہوں اور ہر بال میں سو دانے جوں (تو ایک دانے سے سات سو دانے مل گئے) اور اللہ جل شانہ جس کو چاہے دنیا و حلا فرائض میں اللہ جل شانہ برحق دے دے ہیں (انکے یہاں کی چیز کی کمی نہیں) اور جاننے والے ہیں (کہ خرچ کرنے والے کی نیت کا حال بھی اسی کو خوب معلوم ہے)۔

④ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ
أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
كَمَثَلٍ مِثْلَةٍ آتَتْ
بِئْتٍ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ط
وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ○
(سورة بقرہ - رکعت ۳۶)

৭) যাহারা আল্লাহর পথে অথাৎ, কল্যাণের কাজে) নিজেদের

ধন-সম্পদ খরচ করে, তাহাদের উদাহরণ এইরূপ—যেমন একটি বীজ যাহার মধ্যে সাতটি শীষ বাহির হইয়াছে এবং প্রত্যেক শীষে একশত দানা রহিয়াছে (অতএব, একটি দানা হইতে সাত শত দানা লাভ হইল)। আর আল্লাহ তায়ালা যাহাকে চাহেন বেশী দান করেন। আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত প্রশস্ততার মালিক (তাহার নিকট কোন জিনিসের অভাব নাই) এবং তিনি মহাজ্ঞানী (অর্থাৎ, খরচকারীর নিয়তের অবস্থাও তাহার খুব ভালভাবে জানা রহিয়াছে। (বাকারা : ২৬১)

ফায়দা : এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে—আমল ছয় প্রকার এবং মানুষ চার প্রকার। ছয় প্রকার আমলের মধ্যে দুইটি আমল ওয়াজিবকারী এবং দুইটি আমল সমান সমান। আর একটি আমল দশগুণ সওয়াব রাখে, আর একটি আমল সাতশত গুণ সওয়াব রাখে। যে দুইটি আমল ওয়াজিবকারী উহা হইল, যে ব্যক্তি শির্ক না করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, সে অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। আর যে শির্ক করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। সমান সমান আমল হইল, যে ব্যক্তি কোন নেক কাজের ইচ্ছা করে এবং আমল করিতে না পারে, তাহার একটি সওয়াব লাভ হয়। আর যে গুনাহ করে, সে একটির বদলা একটি পায় আর যে ব্যক্তি কোন নেক আমল করে তাহার দশগুণ সওয়াব লাভ হয়, আর যে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে তাহার প্রতিটি খরচের বিনিময়ে সাতশত গুণ সওয়াব লাভ হয়। আর মানুষ চার প্রকার—এক, ঐ সমস্ত লোক যাহাদের জন্য দুনিয়াতেও সচ্ছলতা আর আখেরাতেও সচ্ছলতা। দ্বিতীয়, ঐ সমস্ত লোক, যাহাদের জন্য দুনিয়াতে সচ্ছলতা আর আখেরাতে অভাব। তৃতীয়, ঐ সমস্ত লোক যাহাদের জন্য দুনিয়াতে অভাব ও আখেরাতে সচ্ছলতা রহিয়াছে। চতুর্থ, ঐ সমস্ত লোক, যাহাদের জন্য দুনিয়াতেও অভাব আর আখেরাতেও অভাব রহিয়াছে। (কানযুল উম্মাল) অর্থাৎ, দুনিয়াতে অভাবের সঙ্গে আমলও খারাপ ছিল, পরিণামে আখেরাতেও বঞ্চিত রহিল। ফলে দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ই বরবাদ হইল।

হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি একটি খেজুর পরিমাণও সদকা করে—শর্ত হইল, পবিত্র মাল হইতে ; অপবিত্র মাল হইতে নয়, কেননা আল্লাহ তায়ালা পবিত্র মালই কবুল করেন—আল্লাহ তায়ালা উক্ত সদকাকে লালন-পালন করেন। যেমন, তোমরা তোমাদের বাছুরকে লালন-পালন করিয়া থাক। অবশেষে সেই সদকা বৃদ্ধি পাইয়া পাহাড় পরিমাণ হইয়া

যায়। (মিশকাত)

আর এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি একটি খেজুর আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে, আল্লাহ তায়ালা উহার সওয়াবকে এত বৃদ্ধি করিয়া দেন যে, উহা উদ্দ পাহাড় হইতেও বড় হইয়া যায়। উদ্দ পাহাড় মদীনা শরীফের একটি অনেক বড় পাহাড়। এমতাবস্থায় সাতশত হইতে অনেক বেশী সওয়াব হইয়া যায়। এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, যখন সাতশত গুণ সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হইল, তখন ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়ালা নিকট সওয়াব বৃদ্ধি করিবার দোয়া করিলেন। তখন পূর্বে বর্ণিত ৫৭ আয়াত নাযিল হইল। (বয়ানুল কুরআন)

এই বর্ণনা অনুযায়ী এই আয়াত পূর্বে নাযিল হইয়াছে। দ্বিতীয় হাদীসে ইহার বিপরীত বর্ণিত হইয়াছে। যাহা ৫৭ আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر
 دتو (جس کو یا اس پر) احسان جتنا ہے میں
 اور نہ (کسی اور طرح) اس کو آڑتی ہوں
 میں تو ان کیلئے انکے سب کے پاس اس کا ثواب ہے
 اور (قیامت کے دن) ان کو دو گنی قسم کا خوف
 ہو گا اور ان کیلئے بہن گے۔

⑧ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ
 مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ
 أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ
 عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○
 (سورہ بقرہ - رکوع ۳۶)

⑧ যাহারা নিজেদের সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে অতঃপর (যাহাকে দান করিয়াছে তাহাকে) খোঁটা দেয় না (এবং অন্য কোন প্রকারে) তাহাকে কষ্ট দেয় না, তবে তাহাদের জন্য তাহাদের রবের নিকট ইহার সওয়াব রহিয়াছে। আর (কিয়ামতের দিন) তাহাদের কোন প্রকার ভয় হইবে না এবং তাহারা চিন্তাযুক্ত হইবে না। (বাকারা ১২৬২)

ফায়দা : এই আয়াত পূর্বোক্ত আয়াতের পরেই রহিয়াছে। আর এই কুর সস্পূর্ণ বিষয়বস্তু এই ব্যাপারেই বর্ণিত হইয়াছে এবং আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান ও দান করার পর খোঁটা দিয়া উহাকে বরবাদ না করার প্রতি সতর্ক করা হইয়াছে। অন্য কোন প্রকারে কষ্ট না দেওয়ার অর্থ হইল, নিজের এই অনুগ্রহের কারণে যাহার প্রতি অনুগ্রহ করা হইয়াছে তাহার সহিত তুচ্ছ-তাজ্জিল্য স্বরূপ আচরণ করা এবং তাহাকে হেয় মনে করা।

ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কিছু লোক

জান্নাতে প্রবেশ করিবে না। তাহাদের মধ্যে এক ঐ ব্যক্তি, যে নিজের দানকৃত জিনিসের উপর খোঁটা দেয়। দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি, যে পিতামাতার নাকরমানী করে। তৃতীয় ঐ ব্যক্তি, যে শরাব পান করিতে থাকে ইত্যাদি ইত্যাদি। (দুররে মানসুর)

ইমাম গাযযালী (রহঃ) এহইয়া কিতাবে সদকার আদবসমূহের বর্ণনায় লিখিয়াছেন, স্বীয় সদকাসমূহকে মান্ন ও আযা দ্বারা বরবাদ করিও না। মান্ন ও আযার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উলামায়ে কিরামের কয়েকটি উক্তি রহিয়াছে। কোন কোন আলেম লিখিয়াছেন, মান্ন হইল, স্বয়ং দান গ্রহিতার সহিত এই দানের কথা আলোচনা করা এবং আযা হইল, অন্যের নিকট দানের কথা প্রকাশ করা। আর কেউ কেউ বলিয়াছেন, মান্ন হইল, দানের বিনিময়ে দান গ্রহিতার দ্বারা বিনা পারিশ্রমিকে কোন কাজ লওয়া এবং আযা হইল, দান গ্রহিতাকে দরিদ্র বলিয়া খোঁটা দেওয়া। কেহ কেহ বলিয়াছেন, মান্ন হইল, দানের কারণে গ্রহিতার উপর বড়াই করা আর আযা হইল, দান গ্রহিতাকে সওয়াল করার কারণে ধমক দেওয়া।

ইমাম গাযযালী (রহঃ) বলেন, প্রকৃতপক্ষে মান্ন হইল, দানকারী তাহার অন্তরে দান গ্রহিতার উপর অনুগ্রহ করিয়াছে বলিয়া মনে করা। ইহার কারণেই উপরোক্ত বিষয়গুলি প্রকাশিত হয়। অথচ দান গ্রহিতাই দানকারীর উপর এহসান করিয়াছে বলিয়া মনে করা উচিত। কেননা, সে তাহার নিকট হইতে আপ্লাহ তায়ালার হক কবুল করিয়া তাহাকে দায়মুক্ত করিয়া দিয়াছে এবং তাহার সম্পদের পবিত্রতার কারণ হইয়াছে আর যাকাত না দেওয়ার কারণে জাহান্নামের যে আযাব হইত উহা হইতে তাহাকে নাজাত দিয়াছে।

বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম শাব্বী (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ফকীরকে তাহার সদকার প্রতি যে পরিমাণ মুখাপেক্ষী মনে করে নিজেকে তদপেক্ষা অধিক সওয়াবের মুখাপেক্ষী মনে না করে সে নিজের সদকাকে বরবাদ করিয়া দিল। আর সেই সদকা তাহার মুখের উপর মারিয়া দেওয়া হয়।

(এহয়াউল উলুম)

কিয়ামতের দিন অত্যন্ত কঠিন দুঃখ-কষ্ট ও ভয়-ভীতির দিন হইবে। যেমন এই কিতাবের শেষের দিকে উহার বর্ণনা আসিতেছে। ঐ দিন কাহারও চিন্তামুক্ত ও ভয়মুক্ত হওয়া অনেক উচ্চ পর্যায়ের জিনিস হইবে।

④ إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا
مَسَاتِ كَرَأْتُمْ بِرَكَةٍ مِّنْ رَبِّهِمْ
مِنْ رَّأْفَتِهِمْ وَتَوَفُّوهُمْ

وید تو یہ توبہ سے ملے نیا وہ بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ
شانہ تمہارے کچھ گناہ معاف کر دیں گے اور
اللہ تعالیٰ شانہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔

الْفُقَرَاءَ فَهُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيَكْفُرُوا
عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ ط وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ (توبہ : ۷۴)

অন্য আয়াতে আছে :

جو رُک انعاموں کو خرچ کرتے ہیں رات و دن
پر شیعہ اور کلمہ حقہ ان کی جتنی ہی کسب کے پس
اس کا ثواب ہے اور قیامت کے دن ان کو
کوئی خوف ہو گا نہ وہ ٹھوم ہوں گے۔

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ
وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (نور : ۳۲)

⑤ যদি তোমরা প্রকাশ্যে সদকা কর তবুও ভাল কথা, আর যদি উহা গোপনে ফকীরদিগকে দিয়া দাও, তবে ইহা তোমাদের জন্য অতি উত্তম এবং আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কিছু গুনাহ মাফ করিয়া দিবেন। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কার্যাবলীর পূর্ণ খবর রাখেন। (বাকারা : ২৭১)

অন্য আয়াতে এরশাদ হইয়াছে, যাহারা নিজেদের সম্পদ খরচ করে রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে, তাহাদের জন্য তাহাদের রবের নিকট ইহার সওয়াব রহিয়াছে। কিয়ামতের দিন তাহাদের কোন ভয় থাকিবে না আর তাহারা চিন্তাযুক্ত হইবে না। (বাকারা : ২৭৪)

ফায়দা : উপরোক্ত দুই আয়াতে গোপনে সদকা করা এবং প্রকাশ্যে করা উভয় পদ্ধতিরই প্রশংসা করা হইয়াছে। অপরদিকে অনেক হাদীস এবং কুরআন পাকের আয়াতসমূহে রিয়া অর্থাৎ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কাজ করার নিন্দা করা হইয়াছে এবং উহাকে শিরক বলা হইয়াছে এবং সওয়াব বিনষ্টকারী ও গুনাহের কাজ বলা হইয়াছে। এইজন্য প্রথমে ইহা বুঝিয়া লইতে হইবে যে, লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কাজ করা ভিন্ন জিনিস, আর প্রকাশ্যে করা ভিন্ন জিনিস। প্রকাশ্যে কাজ করিলেই যে উহা রিয়া বা লোক দেখানোর জন্য হইবে ; ইহা জরুরী নয়। বরং রিয়া হইল, নিজের বড়ত্ব প্রকাশ করার ও সুখ্যাতি অর্জনের জন্য বা নিজের গুণ প্রকাশ করার ও ইচ্ছত-সম্মান হাসিল করার জন্য কোন কাজ করা।

আর যে কাজ আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্টি ও রেজামন্দি হাসিল করার জন্য করা হয় এবং যদি সঙ্গত কারণে আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্টি প্রকাশ্যে কাজ করার মধ্যেই নিহিত থাকে, তবে উহা রিয়া বা লোক দেখানো নয়।

তদুপরি প্রত্যেক কাজ বিশেষ করিয়া সদকার মধ্যে গোপনীয়তা অবলম্বন করাই উত্তম। কেননা, ইহাতে রিয়া বা লোক দেখানোর কোন সম্ভাবনাই থাকে না, অপরদিকে দান গ্রহণকারীও অপমান ও কষ্ট পাওয়া হইতে নিরাপদ থাকে। গোপনে সদকা করা উত্তম হওয়ার আরেকটি কারণ ইহাও হইতে পারে যে, প্রকাশ্যে সদকা করার সময় দাতার মধ্যে যদিও রিয়া বা লোক দেখানোর ভাব থাকে না, কিন্তু পরবর্তীতে লোকদের মধ্যে যখন তাহার দানশীলতা প্রসিদ্ধি লাভ করে, তখন আত্মগর্ব ও অহমিকা পয়দা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আরেকটি কারণ ইহাও যে, লোকদের মধ্যে যদি প্রসিদ্ধি ছড়াইয়া পড়ে, তবে অনেক লোক সওয়াল করিয়া পেরেশান করিতে আরম্ভ করিবে এবং তাহার সম্পদশালী হওয়ার প্রসিদ্ধির কারণে বিভিন্ন প্রকার দুনিয়াবী অসুবিধা সৃষ্টি হইবে। যেমন, সরকারী ট্যাক্স, চোরের দৃষ্টি, হিংসুকদের শত্রুতা।

ইমাম গাযযালী (রহঃ) বলেন, গোপনে সদকা করা রিয়া ও খ্যাতি হইতে অনেক দূরে। অপরদিকে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদও বর্ণিত হইয়াছে যে, উত্তম সদকা হইল, কোন অভাবী লোক নিজে পরিশ্রম করিয়া কোন অসহায় লোককে চুপে চুপে দান করিবে। যে ব্যক্তি নিজের সদকা সম্পর্কে আলোচনা করিয়া বেড়ায়, সে নিজের সুখ্যাতি চায়, আর যে লোক সমাবেশে দান করে, সে রিয়াকার।

পূর্ববর্তী বুয়ুর্গগণ গোপনে সদকা করার ব্যাপারে এতবেশী চেষ্টা করিতেন যে, তাহারা ইহাও পছন্দ করিতেন না যে, ফকিরও জানিতে পারে যে, কে দান করিয়াছে। এইজন্য কোন কোন বুয়ুর্গ তো তালাশ করিয়া অন্ধ ফকিরদেরকে দান করিতেন। আর কোন কোন বুয়ুর্গ ঘুমন্ত ফকিরদের পকেটে রাখিয়া দিতেন। কোন কোন বুয়ুর্গ অপরের মাধ্যমে দান করিতেন, যাহাতে ফকির বুঝিতে না পারে এবং সে লজ্জিত না হয়। মোটকথা, যদি সুখ্যাতি ও লোক দেখানো উদ্দেশ্য হয়, তবে নেকী বরবাদ ও গুনাহ অপরিহার্য।

ইমাম গাযযালী (রহঃ) লিখিয়াছেন, যেখানে সুখ্যাতি উদ্দেশ্য হইবে, সেখানে আমল বিনষ্ট হইয়া যাইবে। কারণ, যাকাত ওয়াজিব হইয়াছে সম্পদের মহব্বত দূর করিবার জন্য, আর সম্মানের লিপ্সার রোগটি মানুষের মধ্যে সম্পদের মহব্বতের চাইতেও বেশী হইয়া থাকে। আখেরাতে এই উভয়টিই ধ্বংসের বিষয় হইবে। কৃপণতার অভ্যাস তো কবরে বিচ্ছুর আকারে নিযুক্ত হয় আর রিয়া ও সুখ্যাতির অভ্যাস অঙ্গগরের আকারে রূপান্তরিত হয়। (এহইয়া উলুম)

এক হাদীসে আছে, মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, তাহার প্রতি অঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করা হয়, চাই উহা ধর্মী বিষয় সম্পর্কিত হউক অথবা দুনিয়াবী বিষয় সম্পর্কিত হউক।

হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি নিজের সুখ্যাতি পছন্দ করে, সে আল্লাহ তায়ালা সহিত সত্যবাদিতার আচরণ করিল না। আইয়ুব সাখতিয়ানী (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা সহিত সত্যবাদিতার আচরণ করে, তাহার একান্ত ইচ্ছা এই হয় যে, কেহ যেন ইহাও জানিতে না পারে যে, তাহার বাড়ী কোথায়। (এইহুয়াউল-উসুম)

হযরত ওমর (রাযিঃ) একবার মসজিদে নববীতে আসিয়া দেখিলেন, হযরত মুয়াজ (রাযিঃ) ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর শরীফের নিকট বসিয়া কাঁদিতেছেন। হযরত ওমর (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন কাঁদিতেছ? হযরত মুয়ায (রাযিঃ) বলিলেন, আমি ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গুনিয়াছি, রিয়া বা লোক দেখানোর সামান্যতম অংশও শিরকের অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহ তায়ালা এমন মুস্তাকী লোকদিগকে ভালবাসেন যাহারা এমন নিরিবিলিতে বাস করে, যদি কোথাও চলিয়া যায়, তবে কেহ তালাশ করে না এবং লোক সম্মুখে আসিলে কেহ তাহাদিগকে চিনে না। তাহাদের অন্তর হেদায়েতের প্রদীপ হইয়া থাকে এবং তাহারা সর্বপ্রকার গুনাহের আবর্জনাশয় অন্ধকার স্থান হইতে মুক্ত থাকে। মোটকথা, রিয়ার নিন্দা অনেক আয়াত ও হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এই সবকিছু সত্ত্বেও কখনও প্রকাশ্যে দান করার মধ্যে ধীন স্বার্থ নিহিত থাকে, যেমন, অন্যদেরকে উৎসাহিত করা। কেননা, প্রয়োজনের সময় এক-আধ জনের সদকা দ্বারা ধীনের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনসমূহ পূরা হইতে পারে না। এইরূপ ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে সদকা করা অন্যদের উৎসাহিত হওয়ার কারণ হইয়া প্রয়োজন পূরা হওয়ার উসীলা হইয়া যায়। এইজন্যই ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ রহিয়াছে, সশব্দে কুরআনে পাক তেলাওয়াতকারী প্রকাশ্যে দানকারী ব্যক্তির মত। আর নিঃশব্দে কুরআনে পাক তেলাওয়াতকারী গোপনে দানকারী ব্যক্তির মত। (মিশকাত)

সময় বিশেষে কুরআনে পাকও সশব্দে তেলাওয়াত করা উত্তম আর কখনও নিঃশব্দে তেলাওয়াত করা উত্তম। পূর্বে বর্ণিত আয়াত সম্পর্কে অনেক উল্যামায়ে কেলাম হইতে নকল করা হইয়াছে যে, উক্ত আয়াতে ফরজ সদকা—অর্থাৎ যাকাত—এবং নফল সদকা উভয়টিকেই বর্ণনা করা হইয়াছে। ফরজ সদকা প্রকাশ্যে আদায় করা উত্তম। যেমন, অন্যান্য ফরজ

সম্পর্কেও একই বিধান রহিয়াছে যে, উহা প্রকাশ্যে করা উত্তম। কেননা, উহাতে অন্যদেরকে উৎসাহ প্রদানের সাথে সাথে নিজের উপর হইতে যাকাত আদায় না করার দোষারোপ ও অপবাদ দূর করাও উদ্দেশ্য হয়। এই কারণেই অন্যান্য তাৎপর্য ছাড়াও জামাআতের সহিত নামায আদায় করা শরীয়ত অনুমোদন করিয়াছে। কেননা, ইহাতে নামায আদায় করার প্রকাশ্য ঘোষণা রহিয়াছে।

হাফেজ ইবনে হজর (রহঃ) বলেন, আল্লামা তবরী (রহঃ) উলামায়ে কেরামের ঐক্যমত নকল করিয়াছেন যে, ফরজ সদকা প্রকাশ্যে দান করা উত্তম এবং নফল সদকা গোপনে দান করা উত্তম। বাইন ইবনে মুনির (রহঃ) বলেন, ইহা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন রকম হইয়া থাকে। যেমন, শাসক যদি জালিম হয় এবং যাকাতের মাল যদি গোপনে থাকে, তবে যাকাত গোপনে দেওয়া উত্তম। আর যদি কোন ব্যক্তি এমন হয় যে, লোকেরা তাহার আমল দেখিয়া অনুসরণ করিবে, তবে তাহার জন্য নফল সদকাও প্রকাশ্যে দেওয়া উত্তম হইবে। (ফাতহুল বারী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা নফল সদকার মধ্যে গোপনে দান করাকে প্রকাশ্যে দান করার উপর সত্তর গুণ ফযীলত দান করিয়াছেন এবং ফরজ সদকার মধ্যে প্রকাশ্যে দান করাকে গোপনে দান করার উপর পঁচিশ গুণ ফযীলত দান করিয়াছেন। এমনিভাবে, অন্যান্য সকল নফল ও ফরয এবাদতসমূহেরও একই অবস্থা। (দুররে মানসূর)

অর্থাৎ, অন্যান্য এবাদতের মধ্যেও ফরজ এবাদত প্রকাশ্যে আদায় করা গোপনে আদায় করা হইতে উত্তম। কেননা, ফরজসমূহকে গোপনে আদায় করিলে একদিকে নিজের উপর আদায় না করার অপবাদ আসে অপরদিকে ইহাও একটি ক্ষতি যে, আপন সঙ্গী-সাথীরা মনে করিবে যে, এই ব্যক্তি অমুক এবাদত মোটেও আদায় করে না। ফলে, তাহাদের অন্তরে উক্ত এবাদতের প্রতি প্রজ্ঞা ও গুরুত্ব কম হইয়া যাইবে। এমনিভাবে, নফল এবাদতের মধ্যেও যদি অন্যান্যদের অনুসরণের সম্ভাবনা থাকে, তবে প্রকাশ্যে আদায় করা উত্তম।

হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করা হইয়াছে যে, নেক আমল চুপে চুপে করা প্রকাশ্যে করা হইতে উত্তম; কিন্তু ঐ ব্যক্তির জন্য প্রকাশ্যে আদায় করা উত্তম, যে ইহা চান যে, তাহাকে অনুসরণ করা হউক।

হযরত আবু উমামা (রাযিঃ) বলেন, হযরত আবু যর (রাযিঃ) হযূর

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন সদকা উত্তম? হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কোন অভাবী লোককে গোপনে কিছু দিয়া দেওয়া আর কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির এইরূপ চেষ্টা করা উত্তম। আর আসল ইহাই যে, নফল সদকা গোপনে আদায় করা উত্তম। তবে প্রকাশ্যে আদায় করার মধ্যে যদি কোন দ্বীনী ফায়দা নিহিত থাকে, তবে প্রকাশ্যে দান করাও উত্তম হইয়া যায়। কিন্তু এই ব্যাপারে নিজের নফস ও শয়তান হইতে নিশ্চিত না থাকা চাই। কেননা, সে সদকাকে বরবাদ করিবার জন্য দিলকে ইহা বুঝাইবে যে, প্রকাশ্যে দেওয়ার মধ্যে উপকারিতা রহিয়াছে। বরং অত্যন্ত গভীর চিন্তা সহকারে ইহা যাচাই করিয়া লইবে যে, প্রকাশ্যে দান করার মধ্যে বাস্তবিকই দ্বীনের ফায়দা রহিয়াছে কিনা। আর সদকা করিবার পর ইহা যেন আলোচনা করিয়া না বেড়ায়। কেননা, এইরূপ করিলেও ইহা প্রকাশ্যে সদকা করার অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়।

এক হাদীসে আসিয়াছে, মানুষ যখন গোপনে কোন আমল করে, তখন ঐ আমলকে গোপন আমল হিসাবে লিখিয়া লওয়া হয়। অতঃপর সে যখন কাহারও নিকট ঐ আমলটি প্রকাশ করিয়া দেয়, তখন উহাকে গোপনের স্থলে প্রকাশ্য আমল হিসাবে বদলাইয়া দেওয়া হয়। তারপরও যদি সে মানুষের নিকট বলিয়া বেড়ায়, তবে উহাকে প্রকাশ্য আমল হইতে লোক দেখানো আমলে পরিবর্তন করিয়া দেওয়া হয়। (এহইয়া)

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সাত ব্যক্তি এমন রহিয়াছে, যাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালা ঐ দিন নিজের ছায়াতে রাखিবেন, যেদিন আল্লাহ ছাড়া কাহারও ছায়া হইবে না অর্থাৎ কিয়ামতের দিন। এক, ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ (শাসনকর্তা)। দুই, ঐ নওজোয়ান, যে আল্লাহ তায়ালায় এবাদতের মধ্যে লালিত-পালিত হইতে থাকে। তৃতীয়, ঐ ব্যক্তি, যাহার অন্তর মসজিদে আটকিয়া থাকে। চতুর্থ, ঐ দুই ব্যক্তি, যাহাদের মধ্যে শুধু আল্লাহ তায়ালায় কারণে মহব্বত হয়, দুনিয়াবী কোন স্বার্থ তাহাদের পরস্পরের মধ্যে জড়িত থাকে না। এই মহব্বতের কারণেই তাহারা পরস্পর একত্রিত হয় এবং ইহার কারণেই তাহারা পৃথক হয়। পঞ্চম, ঐ ব্যক্তি যাহাকে অভিজাত বংশীয়া কোন রূপসী নারী নিজের দিকে আকৃষ্ট করে আর সে বলিয়া দেয় যে, আমি আল্লাহকে ভয় করি। (এমনিভাবে, কোন পুরুষ কোন মহিলাকে আকৃষ্ট করে, আর ঐ মহিলা অনুরূপ বলিয়া দেয়)। ষষ্ঠ, ঐ ব্যক্তি, যে এত গোপনে সদকা করে যে, বাম হাতও খবর রাখে না যে, ডান হাত কি খরচ করিয়াছে। সপ্তম, ঐ

ব্যক্তি, যে নির্জনে আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করিয়া কাঁদে। এই হাদীসে সাত ব্যক্তির উল্লেখ করা হইয়াছে। অন্যান্য হাদীসে এই সাত ব্যক্তি ছাড়াও অন্য আরও লোকদের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, যাহারা ঐ কঠিন দিনে আরশের ছায়ার নিচে স্থান পাইবে। উলামায়ে কেরাম এইরূপ লোকদের সংখ্যা বিরশিজন পর্যন্ত গণনা করিয়াছেন। ‘এতহাফ’ গ্রন্থকার এই সকল লোকদেরকে উল্লেখ করিয়াছেন। অনেক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করা হইয়াছে যে, গোপন সদকা আল্লাহ তায়ালা গোপনকে দূর করিয়া দেয়।

হযরত সালেম ইবনে আবিল-জাদ (রহঃ) বলেন, এক মহিলা তাহার সন্তানকে লইয়া যাইতেছিল। পথে একটি বাঘ তাহার সন্তানকে ছিনাইয়া লইয়া গেল। মহিলা ঐ বাঘের পিছনে দৌড়াইতে লাগিল। এমন সময় পথে একজন ভিক্ষুক তাহার নিকট কিছু সওয়াল করিল। মহিলার নিকট একটি রুটি ছিল। সে উহা ভিক্ষুককে দিয়া দিল। সেই বাঘটি ফিরিয়া আসিল এবং তাহার সন্তানকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তিন প্রকার মানুষকে আল্লাহ তায়ালা ভালবাসেন এবং তিন প্রকার মানুষের প্রতি আল্লাহ তায়ালা অসন্তুষ্ট থাকেন। যাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালা ভালবাসেন, তন্মধ্যে একজন ঐ ব্যক্তি যে, কোন এক মজলিসে এক ব্যক্তি আসিয়া কিছু সওয়াল করিল এবং সে শুধু আল্লাহর ওয়াস্তে সওয়াল করিল, মজলিসের কাহারো সহিত তাহার কোন আত্মীয়তাও ছিল না ; এমতাবস্থায় মজলিসে উপস্থিত উক্ত ব্যক্তি উঠিয়া অন্যান্যদের অজ্ঞাতে গোপনে সওয়ালকারীকে কিছু দিয়া দিল। তাহার এই দান সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেহই কিছু জানিল না। দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা ভালবাসেন যে, একদল লোক রাতভর সফর করিল, যখন তাহাদের উপর নিদ্রা প্রবল হইয়া গেল এবং সামান্য সময় আরাম করিবার জন্য তাহারা সওয়ারী হইতে অবতরণ করিল, তখন তাহাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি না ঘুমাইয়া নামাযে দাঁড়াইয়া গেল ও আল্লাহ তায়ালা সম্প্রক্ষে বিনয় প্রকাশ করিতে লাগিল। তৃতীয় ঐ ব্যক্তি যে, একটি দল জিহাদ করিতেছিল এবং কাফেরদের মোকাবেলায় পরাজিত হইতে লাগিল এবং লোকেরা পলায়ন করিতে লাগিল, তখন এই ব্যক্তি তাহাদের মধ্য হইতে সাহসিকতার সহিত দৃঢ়পদে মোকাবেলা করিতে থাকে। অবশেষে শহীদ হইয়া যায় অথবা জয়লাভ করে। আর যে তিন ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ তায়ালা অসন্তুষ্ট থাকেন, তাহাদের মধ্য হইতে

একজন ঐ ব্যক্তি, যে বৃদ্ধ হইয়াও ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি, যে অভাবী হইয়াও অহংকার করে। তৃতীয় ঐ ধনী, যে জুলুমকারী হয়। হাদীসের বর্ণনায় ১৫ নম্বরে এই হাদীসের বর্ণনা আসিতেছে।

আর এক হাদীসে আছে, হযরত জাবের (রাযিঃ) বলেন, একবার হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা পড়িলেন। উহাতে এরশাদ করিলেন, হে লোকসকল! মৃত্যুর আগেই নিজের গুনাহ হইতে তওবা করিয়া লও এবং নেক আমল করার ব্যাপারে জলদি কর। এমন যেন না হয় যে, অন্য কোন কাজে মশগুল হইয়া যাও আর উহা বাদ পড়িয়া যায়। বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করিয়া এবং গোপনে ও প্রকাশ্যে সদকা করিয়া আল্লাহ তায়ালার সহিত নিজের সম্পর্ক জুড়িয়া লও। কেননা, ইহা দ্বারা তোমাদিগকে রিযিক দেওয়া হইবে, তোমাদের সাহায্য করা হইবে এবং তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করিয়া দেওয়া হইবে।

এক হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তি আপন সদকার ছায়াতলে থাকিবে; যতক্ষণ পর্যন্ত হিসাবের ফয়সালা না হইবে। অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন যখন সূর্য অত্যন্ত নিকটবর্তী হইবে, তখন প্রত্যেক ব্যক্তির উপর তাহার সদকার পরিমাণে ছায়া হইবে। যত বেশি সদকা করিয়া থাকিবে, তত বেশি ছায়া হইবে।

আর এক হাদীসে আছে, সদকা কবরের তাপ দূর করে, আর প্রত্যেক ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আপন সদকার ছায়া হাসিল করিবে। এই বিষয় তো অনেক বর্ণনায় আসিয়াছে যে, সদকা বিপদ-আপদ দূর করে। বর্তমান যুগে যখন মুসলমানদের উপর তাহাদের বদআমলের কারণে চতুর্দিক হইতে সর্ব রকমের বাল্য-মুসীবত অবতীর্ণ হইতেছে, এমতাবস্থায় বেশি বেশি সদকা করা উচিত। বিশেষ করিয়া যখন চোখের সামনে সারাজীবনের কামাই মুহূর্তের মধ্যে ছাড়িয়া যাইতে হইতেছে, এইরূপ অবস্থায় অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে অনেক বেশি পরিমাণে সদকা করিতে থাকা উচিত। এইভাবে ঐ সম্পদও ধ্বংস হইতে নিরাপদ হইয়া যায়; যাহা সদকা করা হইয়াছে। উপরন্তু, সদকার বরকতে নিজের উপর হইতে বিপদ-আপদও দূর হইয়া যায়। কিন্তু আফসোস যে, আমরা এই সব অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়াও সদকার প্রতি গুরুত্ব দান করি না।

এক হাদীসে আছে, সদকা খারাবীর সত্তরটি দরজা বন্ধ করিয়া দেয়।

এক হাদীসে আছে, সদকা আল্লাহ তায়ালার গোষ্ঠা দূর করিয়া দেয় এবং অপমৃত্যু হইতে হেফাজত করে।

আর এক হাদীসে আছে, সদকা আয়ু বৃদ্ধি করে এবং অপমৃত্যু হইতে

হেফাজত করে, আর অহংকার ও গর্ব দূর করিয়া দেয়।

আর এক হাদীসে আছে, আল্লাহ তায়ালা এক টুকরা রুটি অথবা এক মুষ্টি খেজুর অথবা এইরূপ কোন মামুলী জিনিসের বিনিময়ে যাহা দ্বারা কোন অভাবী লোকের প্রয়োজন মিটিয়া যায় ; তিন ব্যক্তিকে জান্নাতে দাখেল করেন। প্রথমতঃ বাড়ীওয়ালা, যে সদকা করার হুকুম করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ঘরের মহিলা, যে রুটি ইত্যাদি পাক করিয়াছে। তৃতীয়তঃ ঐ খাদেম, যে ফকির পর্যন্ত পৌছাইয়াছে। এই হাদীস বর্ণনা করিয়া এরশাদ করিয়াছেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালায় জন্য, যিনি আমাদের খাদেমদেরকেও সওয়াবের ব্যাপারে ভুলেন নাই।

একবার হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি জান—সবচাইতে শক্তিশালী ব্যক্তি কে? লোকেরা আরজ করিল, যে ব্যক্তি প্রতিদ্বন্দ্বীতায় অন্যকে ধরাশায়ী করে। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, বড় বীরপুরুষ ঐ ব্যক্তি, যে রাগের সময় নিজেকে আয়ত্তে রাখে। অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি জান—বন্ধ্য কে? লোকেরা আরজ করিল, যাহার সম্বানাদি হয় না। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, না, বরং ঐ ব্যক্তি, যে কোন সম্বানাদি আগে পাঠায় নাই, অর্থাৎ তাহার পূর্বে কোন সম্বানের মৃত্যু হয় নাই। অতঃপর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা কি জান—ফকীর কে? লোকেরা আরজ করিল, যাহার নিকট ধন-দৌলত নাই। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ফকীর এবং একেবারে ফকীর ঐ ব্যক্তি, যাহার নিকট সম্পদ আছে এবং সে ভবিষ্যতের জন্য কিছু পাঠাইল না। (কেননা, সে ঐ দিন শূন্য হাতে দাঁড়াইয়া থাকিবে, যেদিন তাহার অত্যন্ত প্রয়োজন হইবে।)

হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা (রাযিঃ)কে বলিলেন, নিজেকে আল্লাহ তায়ালায় নিকট হইতে খরিদ করিয়া লও ; যদিও খেজুরের একটি টুকরার বিনিময়েই হউক না কেন। আমি তোমাকে আল্লাহ তায়ালায় কোন জিজ্ঞাসাবাদ হইতে রক্ষা করিতে পারিব না। হে আয়েশা! কোন সওয়ালকারী যেন তোমার নিকট হইতে খালি হাতে ফিরিয়া না যায়। বকরীর একটি খুরই হউক না কেন তাহাকে দান কর। (দুররে মানসুর)

ইমাম গায়যালী (রহঃ) লিখিয়াছেন, আগেকার লোকেরা ইহা অপছন্দ করিতেন যে, কোন দিন সদকা ব্যতীত অতিবাহিত হইয়া যাইবে ; চাই একটি খেজুরই হউক না কেন, রুটির একটি টুকরাই হউক না কেন।

কেননা, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের সদকার ছায়াতে স্থান পাইবে।

(এইহিয়াউল-উলুম)

⑩ يَمْنَعُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيهِ
مَنْ تَعَالَى شَرُّ سِدِّكَ مِثْلَهُ عِيَالًا
الضَّدَقَةُ ط (البقرة- ২৮)

⑩ আল্লাহ তায়ালা সুদকে ধ্বংস করিয়া দেন এবং সদকাকে বৃদ্ধি করিয়া দেন। (বাকারা : ২৭৬)

ফাযলদা : সদকা বৃদ্ধি করা সম্পর্কে পূর্বে অনেক বেওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আখেরাতে ইহার সওয়াব পাহাড় পরিমাণ হয়। ইহা তো ছিল আখেরাতের হিসাব। আর দুনিয়াতেও অধিকাংশ সময় বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। যে ব্যক্তি এখলাসের সহিত বেশী বেশী সদকা করিতে থাকে, তাহার আমদানী বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যাহার মন চায়, পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া লইতে পারে। তবে এখলাসের সহিত হইতে হইবে। লোক দেখানো ও অহংকার যেন না হয়। আর সুদকে তো আখেরাতে ধ্বংস করিয়াই দেওয়া হয়, দুনিয়াতেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধ্বংস হইয়া যায়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন, সুদ যদিও বেশী দেখা যায় ; কিন্তু উহার পরিণতি কবের দিকে হয়।

হযরত মা'মার (রহঃ) বলেন, ৪০ বছরের মধ্যে সুদের মধ্যে কমতি হইয়া যায়।

হযরত যাহ্যাক (রাযিঃ) বলেন, সুদ দুনিয়াতে বৃদ্ধি পায়, আর আখেরাতে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হয়।

হযরত আবু বারযাহ (রাযিঃ) বলেন, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষ একটি টুকরা দান করে আর উহা আল্লাহ তায়ালা নিকট এই পরিমাণ বৃদ্ধি পায় যে, উহুদ পাহাড়ের সমান হইয়া যায়।

⑪ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى
تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ط
(سورة آل عمران- ৯০)
ہمے مسلمانو! تم (کامل) نیکی کو حاصل نہ کر سکو گے یہاں تک کہ اس چیز کو خرچ نہ کرو جو تم کو (خوب) محبوب ہو۔

⑪ হে মুসলমানগণ ! তোমরা (পূর্ণ) নেকী কখনও হাসিল করিতে

পারিবে না ; যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেকে (অতি) প্রিয় বস্তু খরচ না করিবে।

(সূরা আলি-ইমরান : ৯২)

ফায়্যদা : হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, আনসারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী খেজুরের বৃক্ষ হযরত তালহা (রাযিঃ)এর নিকট ছিল। তাঁহার একটি বাগান ছিল, যাহার নাম ছিল বায়রহা। বাগানটি তাহার খুবই পছন্দনীয় ছিল। মসজিদে নববীর সম্মুখেই ছিল। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় এই বাগানে তরীফ লইয়া যাইতেন এবং উহার পানি পান করিতেন। উহার পানি অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ছিল। যখন উক্ত আয়াত নাযিল হইল, তখন আবু তালহা (রাযিঃ) হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন এবং আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা এইরূপ বলিতেছেন : لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ ۖ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ আর আমার নিকট সকল বস্তু হইতে বায়রাহা বাগানটি সবচেয়ে বেশী প্রিয়। আমি উহাকে আল্লাহর জন্য সদকা করিতেছি এবং উহার বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা নিকট সওয়াবের আশা রাখিতেছি। আপনি যেখানে ভাল মনে করেন, সেখানে উহা খরচ করিবেন। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, বাহ বাহ অনেক লাভজনক সম্পদ! আমি ভাল মনে করিতেছি যে, তুমি ইহাকে আপন আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বন্টন করিয়া দাও। আবু তালহা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, উত্তম। অতঃপর উহাকে তিনি আপন চাচাত ভাইদের এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বন্টন করিয়া দিলেন।

আর এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, আবু তালহা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার এই মূল্যবান বাগানটি দান করিলাম। আর যদি আমি ক্ষমতা রাখিতাম যে, এই ব্যাপারে কেহ যেন জানিতে না পারে, তবে এইরূপ করিতাম ; কিন্তু বাগান তো এমন জিনিস নয় যাহা গোপন থাকিতে পারে।

হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) বলেন, যখন আমি উক্ত আয়াত সম্পর্কে জানিতে পারিলাম, তখন আমি ঐ সমস্ত সম্পদের ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করিলাম যাহা আল্লাহ পাক আমাকে দান করিয়াছেন। তখন আমি দেখিলাম যে, এই সবকিছুর মধ্যে আমার মায়জানা নামক বাদিটি আমার নিকট সবচাইতে বেশী প্রিয়। আমি তাহাকে আল্লাহর নামে মুক্ত করিয়া দিলাম। অতঃপর যদি আমি ঐ বস্তু দ্বারা যাহা আল্লাহর নামে দান করিয়াছি পুনরায় উপকৃত হওয়া পছন্দ করিতাম, তবে ঐ বাদিকে মুক্ত করিয়া দেওয়ার পর বিবাহ করিয়া লইতাম। (কেননা, ইহা জায়েয ছিল

এবং ইহাতে দানের মধ্যে কোন ত্রুটিও হইত না। কিন্তু ইহাতে যেহেতু বাহ্যিকভাবে দান ফেরত নেওয়া দেখা যাইত) অতএব, আমি তাহা পছন্দ করিলাম না। এই কারণে আমার গোলাম হযরত নাকফ (রহঃ)এর নিকট তাহাকে বিবাহ দিয়া দিলাম।

আর এক হাদীসে আছে, হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) নামাযের মধ্যে তেলাওয়াত করিতেছিলেন। যখন উক্ত আয়াত শরীফ পর্যন্ত পৌঁছিলেন, তখন তিনি নামাযের মধ্যেই ইশারায় তাহার এক বাদীকে মুক্ত করিয়া দিলেন। আল্লাহ তায়ালা এবং তাহার পাক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীসমূহের প্রতি গুরুত্ব প্রদান ও উহার উপর আমল করিবার ব্যাপারে কেহ যদি অগ্রগামী হইতে চায়, তবে সে যেন এই সকল সাহায্যে কেবাম হইতে শিক্ষা গ্রহণ করে। বাস্তবিকই এই সকল ব্যক্তিগণ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা হওয়ার উপযুক্ত ছিলেন; তাহারাই হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদেম হওয়ার উপযুক্ত ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাহাদের সকলের উপর রাজি হইয়া যান এবং তাহাদিগকেও আল্লাহ তায়ালা রাজি করুন, আমীন।

হযরত ওমর (রাযিঃ) আবু মুসা অশআরী (রাযিঃ)এর নিকট পত্র লিখিলেন যে, জালুলাহ—এর বাদীদের মধ্য হইতে একটি বাদী যেন তাহার জন্য খরিদ করা হয়। তিনি একটি উৎকৃষ্ট বাদী খরিদ করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। হযরত ওমর সেই বাদীকে তাহার নিকট ডাকিলেন এবং উক্ত আয়াত পড়িলেন ও মুক্ত করিয়া দিলেন।

হযরত মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির (রাযিঃ) বলেন, যখন উক্ত আয়াত নাযিল হইল, তখন হযরত য়ায়েদ ইবনে হারেসা (রাযিঃ)এর নিকট একটি ঘোড়া ছিল। যাহা তাহার নিকট নিজের সমস্ত জিনিস হইতে বেশী প্রিয় ছিল। তিনি উক্ত ঘোড়াটিকে লইয়া হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেদমতে হাজির হইলেন ও আরজ করিলেন, আমি ইহা দান করিলাম। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহা কবুল করিয়া লইলেন এবং তাহার পুত্র হযরত উসামা (রাযিঃ)কে দিয়া দিলেন। ইহাতে হযরত য়ায়েদের চেহারা কিছুটা অপছন্দের ভাব প্রকাশ পাইল। (কেননা, ঘরের জিনিস ঘরেই রহিয়া গেল। বাপের স্থলে বেটার হইয়া গেল।) হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আল্লাহ তায়ালা তোমার সদকা কবুল করিয়া লইয়াছেন। অর্থাৎ, তোমার সদকা আদায় হইয়া গিয়াছে। এখন আমি চাই উহা তোমার ছেলেকে দেই অথবা অন্য কোন আত্মীয়কে কিংবা অপরিচিত কাহাকেও দেই। (কেননা, তুমি তো

হেলেকে দিতেছ না, যাহার ফলে স্বার্থপরতার সন্দেহ হইতে পারে, তুমি তো আমাকে দিয়া ফেলিয়াছ। এখন আমার অধিকার রহিয়াছে, আমি যাহাকে ইচ্ছা দিব।)

বনি সুলাইম গোত্রের এক ব্যক্তি বলেন, হযরত আবু যর গিফারী (রাযিঃ) রাবায়াহ নামক এক গ্রামে থাকিতেন। সেখানে তাহার নিকট উটের পাল ছিল আর উহার রাখাল হিসাবে একজন দুর্বল লোক ছিল। আমিও সেখানে তাহাদের নিকটেই থাকিতাম। আমি হযরত আবু যর (রাযিঃ)এর নিকট আরজ করিলাম, আমি আপনার খেদমতে থাকিতে চাই। আপনার রাখালকে সাহায্যা করিব এবং আপনার সঙ্কলান্তে উপকৃত হইব। হইতে পারে, আল্লাহ তায়ালা আপনার বরকতে আমাকেও উপকৃত করিবেন। হযরত আবু যর (রাযিঃ) বলিলেন, আমার সাথী ঐ ব্যক্তি (অর্থাৎ, এমন ব্যক্তিকে আমি আমার সাথী বানাইতে পারি), যে আমার কথা মানে। যদি তুমি ইহার জন্য প্রস্তুত থাক, তবে অসুবিধা নাই। নতুবা আমার সঙ্গে থাকিবার ইচ্ছা করিও না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কোন বিষয়ে আমার আনুগত্য চাহিতেছেন? তিনি বলিলেন, যখন আমি কোন জিনিস কাহাকেও দেওয়ার জন্য চাহিব, তখন সবচাইতে উত্তম জিনিসটি বাছাই করিয়া দিবে। আমি মানিয়া লইলাম এবং দীর্ঘদিন তাহার খেদমতে থাকিলাম। একবার তিনি জানিতে পারিলেন যে, অমুক জলাশয়ের নিকট যে সকল লোক বসবাস করে তাহারা অভাব-অনটনের মধ্যে রহিয়াছে। তিনি আমাকে বলিলেন, আমরা উটগুলির মধ্য হইতে একটি উট লইয়া আস। ওয়াদা মোতাবেক তালাশ করিয়া উহাদের মধ্য হইতে উৎকৃষ্ট একটি নর উট যাহা অত্যন্ত বাধ্যগত ছিল এবং উহার মত কোন উট পালের মধ্যে ছিল না ; আমি উহা লইয়া যাওয়ার ইচ্ছা করিলাম ; কিন্তু আমার খেয়াল হইল যে, এই উটটির এখানে (পাল দেওয়া ইত্যাদির জন্য) প্রয়োজন রহিয়াছে। সুতরাং উহাকে বাদ দিয়া অন্যগুলির মধ্য হইতে যে উটটি সর্বোত্তম ছিল, উহা তাহার নিকট লইয়া গেলাম। ঘটনাক্রমে যে উটটি দরকারী মনে করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলাম, উহার প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িয়া গেল। তিনি আমাকে বলিতে লাগিলেন, তুমি আমার সহিত ওয়াদা ভঙ্গ করিয়াছ, আমি বুঝিয়া গেলাম এবং এই উটটি ফেরত লইয়া গেলাম এবং পূর্বের উটটি লইয়া আসিলাম। তিনি উপস্থিত লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আমার এমন দুইজন লোক প্রয়োজন যাহারা একটি সওয়াবের কাজ করিবে। দুইজন লোক নিজেদেরকে পেশ করিল এবং বলিল, আমরা তৈয়ার আছি। তিনি

বলিলেন, তোমাদের যদি কোন ওজর না থাকে, তবে এই উটটিকে জবাই করিয়া উহার গোশত জলাশয়ের কিনারে বসবাসরত লোকদের ঘর অনুপাতে টুকরা কর এবং প্রত্যেক ঘরে এক একটি করিয়া টুকরা পৌছাইয়া দাও। আমার ঘরকেও উহাদের সহিত গণনা করিয়া সমপরিমাণ দিবে ; বেশী যেন না হয়। তাহারা দুইজনই মানিয়া লইল এবং দ্বকুম পালন করিল। যখন কাজ শেষ হইল, তখন আমাকে ডাকিলেন এবং বলিলেন, আমি বুঝিতে পারিতেছি না যে, আমার সহিত শুরুতে তোমার যে ওয়াদা হইয়াছিল তাহা কি তুমি ভুলিয়া গিয়াছিলে? তবে তো আমি তোমাকে অক্ষম মনে করিব, নাকি স্মরণ থাকা সত্ত্বেও তুমি এই ব্যাপারে অবহেলা করিয়াছ? আমি আরজ করিলাম, আমি ভুলি নাই, পূর্বের ওয়াদা আমার স্মরণ ছিল। কিন্তু আমি যখন তালাশ করিলাম এবং এই উটটি সর্বোত্তম পাইলাম, তখন আপনার প্রয়োজনের কথা খেয়াল করিয়া ভাবিলাম, ইহা তো আপনার নিজেরই প্রয়োজন। তিনি বলিতে লাগিলেন, তুমি কি শুধু আমার প্রয়োজনের জন্যই ইহাকে বাদ দিয়াছিলে? আমি আরজ করিলাম, শুধু এই কারণেই বাদ দিয়াছিলাম। তিনি বলিতে লাগিলেন, আমি কি আমার প্রয়োজনের সময় কোনটি তাহা বলিব? আমার প্রয়োজনের সময় হইল তখন, যখন আমি কবরের গর্তে নিষ্কিপ্ত হইব। সেই দিন আমার প্রয়োজনের দিন হইবে। তোমার প্রত্যেক মালের মধ্যে তিন অংশীদার রহিয়াছে। এক অংশীদার তকদীর ; জানা নাই—তকদীর কি উত্তম মালগুলিকে লইয়া যাইবে, নাকি খারাপ মালগুলিকে লইয়া যাইবে? এই তকদীর কোন কিছুই অপেক্ষা করে না। (অর্থাৎ, যেই সম্পদকে আমি উত্তম ও উৎকৃষ্ট এবং অন্য সময় কাজে আসিবে মনে করিয়া রাখিয়া দিতেছি ; জানা নাই যে, অন্য সময়ে ইহা আমার কাজে আসিবে কিনা। কাজেই এখনই কেন আমি উহাকে আখেরাতের সম্পদ বানাইয়া আল্লাহর ব্যাংকে জমা করিয়া লই না। দ্বিতীয় অংশীদার ওয়ারিসগণ, যাহারা সর্বদা এই অপেক্ষায় থাকে যে, কখন তুমি কবরে যাইবে আর তাহারা সমস্ত মাল কস্বা করিয়া লইবে। তৃতীয় অংশীদার তুমি নিজে (অর্থাৎ, তুমি নিজের কাজে ব্যবহার করিতে পার)। অতএব, এই চেষ্টা কর যে, তুমি যেন তিন অংশীদারের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কম অংশ না পাও। (এমন যেন না হয়—তকদীর উহাকে লইয়া গেল, অর্থাৎ উহা ধ্বংস হইয়া গেল অথবা ওয়ারিসগণ লইয়া গেল। কাজেই সর্বোত্তম হইল ইহাই যে, তুমি শীঘ্র এই সম্পদ আল্লাহ তায়ালার খাজানায় জমা করিয়া দাও।) উপরন্তু আল্লাহ তায়ালার এরশাদ

রহিয়াছে— **لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ** আর এই উট
যেহেতু আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় কাজেই আমি কেন ইহাকে নিজের
জন্য বিশেষভাবে সংরক্ষণ করিয়া লইব না এবং আগামী দিনের জন্য
পাঠাইয়া দিব না।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন,
হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে একটি পশুর গোশত
পেশ করা হইল। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে উহাকে
পছন্দ করেন নাই। কিন্তু অন্যদেরকে খাইতে নিষেধও করেন নাই। আমি
আরজ করিলাম, ইহা গরীব লোকদেরকে দিয়া দিব কি? হযুর সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যে জিনিস নিজে খাওয়া পছন্দ কর না,
উহা অন্যদেরকে দিও না।

এক হাদীসে আছে, হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) চিনি খরিদ করিয়া
গরীবদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিতেন। তাহার খাদেম আরজ করিল,
আপনি যদি চিনি না দিয়া খাদ্য বিতরণ করিতেন, তবে গরীবদের উপকার
বেশী হইত। তিনি বলিলেন, ঠিক বলিয়াছ। আমারও ইহাই খেয়াল। কিন্তু
আল্লাহ তায়ালা এরশাদ হইল— **لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ** আর আমার পছন্দনীয় হইল, চিনি (মিষ্টিদ্রব্য)। (দুররে মানসুর)

সাহাবায়ে কেরাম কোন জিনিসকে উত্তম জানিয়াও অধিকাংশ সময়
আল্লাহ তায়ালা ও তাহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার
বাহ্যিক অর্থের উপর আমল করিবার চেষ্টা করিতেন। এরূপ অনেক
উদাহরণ হাদীসসমূহে মওজুদ রহিয়াছে। ইহা মহব্বতের চরম পর্যায় যে,
অন্য কোন জিনিস উত্তম হইলেও প্রিয়তমের জবান হইতে যে কথা বাহির
হইয়াছে, উহার উপর আমল করিতে হইবে।

اور دوڑو اس بخشش کی طرف جو تبارے ہاں
کی طرف سے ہے اور دوڑو اس وقت کی طرف
جس کا پیٹلہ سارے آسان اور زمین میں ہے۔ جو
تیار کی گئی ہے ایسے شقی لوگوں کے لئے جو ان کی
راہ میں خرابی کہتے ہیں، فراخی میں بھی اور تنگی
میں بھی۔ اور غصہ کو ضبط کہتے ہیں اور اللہ کے
کی خطاؤں کو معاف کہتے ہیں اور اللہ کے

⑫ **وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ
وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ۝ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ
وَالْعُسْرَاءِ وَالْعَظِيمِينَ الْأَقْيَطِ
وَالْعَافِينَ مِّنَ النَّاسِ ط
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝**

(সুদ আল ইমরান-সূরা ১৩) — محبوب نکتہ میں اسکاں کرنے والی کو۔

১২) আর দৌড়াইয়া চল ঐ ক্ষমার দিকে যাহা তোমাদের পরওয়ারদিগারের পক্ষ হইতে রহিয়াছে। আর দৌড়াইয়া চল ঐ জাহান্নামের দিকে যাহার প্রশস্ততা সমস্ত আসমান ও জমিন সমতুল্য, যাহা প্রস্তুত করা হইয়াছে এমন মুতাকী লোকদের জন্য যাহারা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে সচ্ছলতা ও অভাবের সময়, আর যাহারা রাগ সংবরণ করে এবং লোকদের অপরাধ ক্ষমা করে। আল্লাহ তায়ালা সদাচারী লোকদেরকেই ভালবাসেন। (আলি-ইমরান : ১৩৩-১৩৪)

কাহিনী : ওলামায়ে কেরাম লিখিয়াছেন, কিছুসংখ্যক সাহাবী বনী ইসরাইলের এই বিষয়ের উপর ঈর্ষা করিয়াছিলেন যে, তাহাদের মধ্য হইতে যখন কেহ গোনাহ করিত, তখন তাহার দরজার উপর সেই গোনাহ লেখা হইয়া যাইত এবং উহার কাফফারাও লেখা হইয়া যাইত। অর্থাৎ, অমুক গোনাহের কাফফারা স্বরূপ অমুক কাজ করা হউক। যেমন, নাক কাটিয়া দেওয়া হউক, কান কাটিয়া দেওয়া হউক ইত্যাদি ইত্যাদি। সাহাবায়ে কেরামের ঈর্ষা এইজন্য যে, কাফফারা আদায় করিয়া দিলে নিশ্চিতভাবে উক্ত গোনাহ মিটিয়া যাইত। কারণ, তাহাদের দৃষ্টিতে গোনাহের ভয়াবহতা এত কঠিন ছিল যে, তাহারা উপরোক্ত শাস্তিগুলিকেও গোনাহের মোকাবেলায় হালকা এবং ঈর্ষাষোধ্য মনে করিতেন। এই সকল বুয়ুর্গের যে সমস্ত ঘটনা হাদীসের কিতাবসমূহে বর্ণিত হইয়াছে, উহা বাস্তবিকই এরূপ যে, মানুষ হিসাবে কাহারও দ্বারা কোন গোনাহ সংঘটিত হইয়া গেলে উহার ভয় ও গুরুত্ব তাহাদের উপর অনেক বেশী পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করিত। পুরুষ তো পুরুষই, মহিলাদের মধ্যেও এই জজবা ছিল। জনৈক মহিলার দ্বারা ব্যভিচার সংঘটিত হইল। স্বয়ং হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া অপরাধ স্বীকার করিলেন এবং গোনাহ হইতে পবিত্র হওয়ার আগ্রহে নিজেকে পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুবরণের জন্য পেশ করিলেন এবং পাথর নিক্ষেপ হইলেন। ইহা কেন? কারণ, গোনাহের ভয় তাহার অন্তরে মৃত্যুবরণ অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল।

নামাযরত অবস্থায় হযরত আবু তালহা (রাযিঃ) এর অন্তরে তাহার বাগানের খেয়াল আসিয়া গেল। তখন তিনি উহাকে আল্লাহর রাস্তায় দান করিয়া শাস্ত হইলেন। শুধু নিজের উপর এই দিকারের কারণে যে, নামাযের মধ্যে দুনিয়ার জিনিসের খেয়াল আসিয়াছে, অতএব যে জিনিস

নামাযের মধ্যে নিজের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে উহাকে নিজের কাছে রাখিব না।

অপর এক আনসারী সাহাবীর সহিতও এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়াছে যে, বাগানে খেজুর পাকিতেছিল। নামাযে উহার খেয়াল আসিল (যে, কেমন সুন্দর খেজুর পাকিতেছে)। হযরত ওসমান (রাযিঃ)এর খেলাফতকাল ছিল। তাহার খেদমতে উপস্থিত হইয়া খেজুরের বাগানের ঘটনা উল্লেখ করিয়া বাগানটি তাহার সোপর্দ করিয়া দিলেন। হযরত ওসমান (রাযিঃ) বাগানটিকে পঞ্চাশ হাজারের বিনিময়ে বিক্রয় করিয়া উহার মূল্য দ্বীনের কাজে খরচ করিয়া দিলেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) একবার ভুলবশতঃ সন্দেহযুক্ত এক লোকমা খাইয়া ফেলিলেন। এইজন্য বারবার পানি পান করিয়া বমি করিলেন। যাহাতে ঐ নাজায়েয লোকমা শরীরের অংশে পরিণত না হইয়া যায়।

এই সকল বুয়ুর্গের অনেক ঘটনা আমি আমার কিতাব হেকায়াতে সাহাবাতে লিখিয়াছি। এমতাবস্থায় যদি এই সকল বুয়ুর্গের ইহার উপর ঈর্ষা হয় যে, বনী ইসরাইল গোত্রের গুনাহসমূহের কারুকার্য তাহারা জানিতে পারিত এবং উহা দ্বারা তাহাদের গুনাহ মিটিয়া যাইত, তবে এইরূপ ঈর্ষা অযৌক্তিক নয়। আমাদের মত অযোগ্য লোকদের চিন্তাও এই পর্যন্ত পৌছে না যে, গুনাহ এত কঠিন জিনিস। মোটকথা, এই সকল বুয়ুর্গের ঈর্ষার কারণে আল্লাহ তায়ালা আপন মেহেরবানী ও আপন মাহবুব সাইয়েদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের উপর দান ও অনুগ্রহ স্বরূপ এই আয়াত নাযিল করিয়াছেন যে, তোমরা এমন নেক কাজের দিকে দৌড়াইয়া যাও যাহা দ্বারা তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে কমা অর্জন করিতে পার।

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রাযিঃ) উক্ত আয়াতের তফসীরে বলেন, অর্থাৎ, নেক আমলের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালাকে কমা দিকে অগ্রগামী হও এবং এমন জান্নাতের দিকে অগ্রগামী হও যাহার প্রশস্ততা এই পরিমাণ যে, যদি সাত আসমান একটি অপরটির সহিত পরপর এমনভাবে জুড়িয়া দেওয়া হয় যেমন, একটি কাপড় অন্য আর একটি কাপড়ের সহিত জুড়িয়া দেওয়া হয়, অনুরূপভাবে সাত তবক জমিন একটি অপরটির সহিত যদি জুড়িয়া দেওয়া হয়, তবে জান্নাতের প্রশস্ততা উহার বরাবর হইবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতেও ইহাই বর্ণনা করা হইয়াছে যে,

সাত আসমান ও সাত জমিন যদি একটিকে অপরাট্রি সহিত জুড়িয়া দেওয়া হয়, তবে জালাতের গ্রন্থ উহার বরাবর হইবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)এর গোলাম হযরত কুরাইব বলেন, আমাকে হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) তওরাতের একজন আলেমের নিকট পাঠাইলেন এবং তাহাদের কিতাব হইতে জালাতের প্রশস্ততা জানিতে চাহিলেন। উক্ত আলেম হযরত মুসা (আঃ)এর সহিফা বাহির করিলেন এবং উহা দেখিয়া বলিলেন, যদি সাত আসমান ও সাত জমিন একটিকে অপরাট্রি সহিত জুড়িয়া দেওয়া হয়, তবে উহা জালাতের গ্রন্থের সমান হইবে। ইহা তো জালাতের গ্রন্থ আর উহার দৈঘ্যের অবস্থা আল্লাহ তায়ালাই জানেন।

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, বদরের যুদ্ধে হযর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে লোকসকল! এমন জালাতের দিকে অগ্রসর হও, যাহার গ্রন্থ সমস্ত আসমান ও জমিন বরাবর।

হযরত ওমায়ের ইবনে হাশ্বাম আনসারী (রাযিঃ) আশ্চর্য হইয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এমন জালাত যাহার গ্রন্থ এত বেশী! হযর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, অবশ্যই। হযরত ওমায়ের (রাযিঃ) আরজ করিলেন, বাহ্ বাহ্ ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর কসম, আমি উহাতে প্রবেশকারীদের একজন অবশ্যই হইব। হযর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ হাঁ তুমি উহাতে প্রবেশকারীদের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছ। অতঃপর হযরত ওমায়ের (রাযিঃ) কয়েকটি খেজুর উট্টের হাওদা হইতে বাহির করিয়া খাইতে আরম্ভ করিলেন (যাহাতে লড়াই করিবার শক্তি পয়দা হয়)। তারপর বলিতে লাগিলেন, এই খেজুরগুলি খাইয়া শেষ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করা তো বড় দীর্ঘ সময়। এই বলিয়া খেজুরগুলিকে ফেলিয়া দিয়া যুদ্ধের ময়দানে চলিয়া গেলেন এবং লড়াই করিতে করিতে শহীদ হইয়া গেলেন। (দুররে মানসূর)

উক্ত আয়াতে মুমিনদের একটি বিশেষ প্রশংসা ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তাহার রাগ সংবরণকারী এবং অপরাধ ক্ষমাকারী। ইহা অত্যন্ত উচ্চ গুণ বিশেষ। উলামায়ে কেবাম লিখিয়াছেন, যখন তোমার ভাইয়ের দ্বারা ভুল-ত্রুটি হইয়া যায়, তখন তুমি তাহার জন্য সত্তরটি ওজর বা কারণ তৈরী কর অতঃপর নিজের অন্তরকে বোঝাও যে, তাহার নিকট এতগুলি কারণ রহিয়াছে। আর যখন তোমার অন্তর এইগুলিকে কবুল না করে, তখন সেই ব্যক্তির পরিবর্তে নিজের অন্তরকে তিরস্কার কর যে, তোমার মধ্যে কত বেশী কঠোরতা ও নিষ্ঠুরতা রহিয়াছে যে,

তোমার ভাই সম্ভবতঃ ওজর বা কারণ দেখাইতেছে আর তুমি উহা কবুল করিতেছ না। আর যদি তোমার ভাই কোন ওজর পেশ করে, তবে উহা কবুল করিয়া লও, কারণ, ছযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ রহিয়াছে, যে ব্যক্তির নিকট কেহ অপারগতা প্রকাশ করে আর সে উহা কবুল করে না, তাহার এই পরিমাণ গুনাহ হয় যে পরিমাণ গুনাহ অবৈধ শুল্ক উসুলকারীর হয়। ছযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমিনের এই গুণ বর্ণনা করিয়াছেন যে, মুমিন জ্বলদি রাগ হইয়া যায় আবার উহা জ্বলদি দূর হইয়া যায়। একপ বলেন নাই যে, রাগ আসে না ; বরং বলিয়াছেন যে, জ্বলদি দূর হইয়া যায়।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলিয়াছেন, যাহার রাগের বিষয়ের উপর রাগ আসে না, সে গাধা। আর যে রাজি করা সত্ত্বেও রাজী হয় না, সে শয়তান। এইজন্যই আল্লাহ তায়ালা রাগ হজমকারী বলিয়াছেন। রাগ আসে না ; এই কথা বলেন নাই। (এহইয়া)

ছযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি গোম্বাকে কার্যকর করার ক্ষমতা রাখা সত্ত্বেও হজম করিয়া লয়, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে নিরাপত্তা ও ঈমান দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া দেন।

(দুররে মানসুর)

অর্থাৎ, বাধ্য হইয়া সবর তো সর্বক্ষেত্রেই হইয়া থাকে, প্রকৃত গুণ হইল, শক্তি থাকা সত্ত্বেও সবর করা।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, আল্লাহ তায়ালা নিকট মানুষের জন্য গোম্বার ঢোক পান করিয়া লওয়া হইতে অধিক পছন্দনীয় আর কোন ঢোক নাই। যে এই ঢোক পান করিয়া লয়, আল্লাহ তায়ালা তাহার অন্তরকে ঈমান দ্বারা ভরিয়া দেন।

অন্য এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও গোম্বা হজম করিয়া লয়, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন সমস্ত মখলুকের সামনে তাহাকে ডাকিয়া বলিবেন, যে ছরকে তোমার মনে চায়, বাছিয়া লও।

ছযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঐ ব্যক্তি বাহাদুর নয়, যে অন্যকে ধরাশায়ী করিয়া দেয় ; বরং বাহাদুর সে, যে গোম্বার সময় নিজেই নিয়ন্ত্রণ করে।

হযরত আলী ইবনে ইমাম হুসাইন (রাযিঃ)এর এক বাদী তাহাকে ওয়ু করাইতেছিল। এমন সময় তাহার হাত হইতে ওয়ুর পাত্রটি পড়িয়া গেল। ফলে, তাহার মুখ জখম হইয়া গেল। তিনি বাদীর প্রতি কড়া দৃষ্টিতে তাকাইলেন। বাদী বলিতে লাগিল, আল্লাহ তায়ালা বলেন : وَالْكَافِرِينَ

الْغِطُ ہزارت آلی (رہ:) বলیلن، آمی آمار گوسا ہضم کریریا لہلام۔ سہ آبار پڈیل : النَّاسِ تینی বলیلن، توماکہ آلاہ تاہلا کما کریریا دین۔ وادی پونراہ پڈیل : وَاللَّهِ تینی বলیلن، توماکہ موقت کریریا دلام۔

اکبار اک مہمانہر جنہ تاہار گولام گرم گوشہر پات لہیا آسیتہلن۔ اٹا تاہار آٹا ہلہر ماہار اُپر پڈیا گہل، فہلہ سہ مارا گہل۔ تینی گولامکہ বলیلن، آمی توماکہ موقت کریریا دلام۔ اتہر تینی ہلہر کافن-دافنہر کاجہ لاگیرا گہلن۔ (رہ:)

۱۳) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (انفال: ۱)

بس ایمان والہ قومہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ جل شانہ کا ذکر آجائے تو۔ (اس کی عظمت کے خیال سے) ان کے دل ڈر جائیں۔ اور جب اللہ جل شانہ کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ ان کے ایمان کو زیادہ مضبوط کر دیتی ہیں اور وہ لوگ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ان کے واسطے خرچہ کرتے ہیں۔ بس یہی ہیں سچے ایمان والے ان کیلئے بڑے بڑے اجر ہیں ان کے رب

کچھ اس واسطے کہ مغفرت ہے اور ان کے لئے سعادت کی نعمت ہے۔

۱۴) نیشی ایماندار گن تہ اہر پہی ہر—یخن تاہادہر سمنوہ آلاہ تاہلالار نام اٹار گن ہر، تخن (تاہار بڈا آٹا کریریا) تاہادہر اٹار سمنوہ ڈیت ہہیا یار۔ آہر یخن آلاہ تاہلالار آما سمنوہ تاہادہر گہ پڈیا گنن ہر، تخن سہی آما سمنوہ تاہادہر ایمانکہ آہر و ہہی دھ کریریا دہر۔ آہر تاہارا نیجہدہر پڑو یار دہر اُپرہی ڈر سا کرہ، ناماہ کاہم کرہ اہر یاہ کھو آمی تاہادہر دیا آٹا اہر (آلاہر اُما) ہر کرہ۔ اہراہی ساتیکار ایماندار، تاہادہر جنہ اٹا مہا داسمنوہ رہی آہر تاہادہر رہر نیکٹ۔ آہر تاہادہر جنہ کما رہی آہر اہر

তাহাদের জন্য সম্মানজনক রিযিক রহিয়াছে : (আনফাল : ২-৪)

ফায়দা : হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বলেন, অন্তরের ভয় পাওয়া এইরূপ, যেমন খেজুরের শুকনা পাতায় আগুন লাগিয়া যাওয়া। অতঃপর তিনি তাহার শাগরেদ শাহর ইবনে আওসাফকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, হে শাহর, তুমি শরীরের কম্পন বুঝ ? তিনি আরজ করিলেন, বুঝি। তিনি বলিলেন, ঐ সময় দোয়া করিও, তখন দোয়া কবুল হয়।

হযরত সাবেত বুনানী (রহঃ) বলেন, এক বুযুর্গ বলিয়াছেন, আমার কোন দোয়াটি কবুল হইয়াছে আর কোনটি কবুল হয় নাই ; আমি জানিতে পারি। লোকেরা আরজ করিল, কিভাবে জানিতে পারেন ? তিনি বলিলেন, যখন আমার শরীরে কম্পন শুরু হয়, আর অন্তর ভীত হইয়া যায় এবং চক্ষু হইতে অশ্রু প্রবাহিত হয়, সেই সময়ের দোয়া কবুল হয়।

হযরত ছুদ্দি (রহঃ) বলেন, যখন তাহাদের সম্মুখে আল্লাহ তায়ালা নাম উচ্চারণ করা হয়—ইহার অর্থ এই যে, কোন ব্যক্তি কাহারও উপর জুলুমের ইচ্ছা করে অথবা অন্য কোন গুনাহর ইচ্ছা করে ঐ সময় তাহাকে যদি বলা হয়, আল্লাহকে ভয় কর, তখন তাহার অন্তর আল্লাহর ভয়ে ভীত হইয়া যায়।

হারেস ইবনে মালেক আনসারী একজন সাহাবী। একবার হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছিলেন। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, হারেস তোমার কি অবস্থা ? তিনি আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি নিঃসন্দেহে সত্যিকার মুমিন। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, চিন্তা করিয়া বল, কি বলিতেছ ? কেননা, প্রত্যেক জিনিসের একটি হাকীকত থাকে, তোমার ঈমানের হাকীকত কি ? (অর্থাৎ, তুমি কি কারণে এই সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছ যে, আমি সত্যিকার মুমিন হইয়া গিয়াছি।) আরজ করিলেন, আমি আমার নফসকে দুনিয়া হইতে বিরত রাখিয়াছি, রাত্রি জাগরণ করি, দিনে পিপাসার্ত থাকি (অর্থাৎ, রোযা রাখি), জামাতবাসীদের পরস্পর সাক্ষাতের দৃশ্য আমার চোখের সামনে থাকে এবং জাহান্নামীদের শোরগোল ও আফসোসের দৃশ্যও আমার চোখের সামনে থাকে (অর্থাৎ, সর্বদা দোষ ও জামাতের ধ্যান থাকে)। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, হারেস ! নিঃসন্দেহে তুমি দুনিয়া হইতে নিজের নফসকে বিরত রাখিয়াছ, ইহাকে মজবুতভাবে ধরিয়া রাখ। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা তিনবার বলিলেন। (দুররে মানসুর) ইহা স্পষ্ট যে, যাহার সম্মুখে সর্বদা দোষ ও জামাতের দৃশ্য

বিদ্যমান থাকে, সে কিভাবে দুনিয়ার মধ্যে জড়াইতে পারে?

﴿۱۴﴾ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ○ (انفال- ۸৫)

اور جو کچھ تم اس کے واسطے میں خرچ کر گئے اس کا سبیل اللہ کو پورا پورا کیا جائے گا اور تم پر قسم کا ظلم نہ کیا جائے گا۔

﴿১৪﴾ আর তোমরা যাহা কিছুই আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিবে, উহার সওয়াব তোমাদিগকে পুরাপুরি দেওয়া হইবে এবং তোমাদের উপর কোন প্রকার জুলুম করা হইবে না। (আনফাল : ৬০)

ফায়দা : যে সমস্ত আয়াত ও হাদীসে বর্ণিত আকারে সওয়াব লাভ হওয়ার বর্ণনা রহিয়াছে, তাহা এই আয়াতের বিপরীত নয়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, এই সমস্ত আমলের মধ্যে কোনপ্রকার কম করা হইবে না। বাকি রহিল সওয়াবের পরিমাণ কি হইবে? এই ব্যাপারে সময় সাপেক্ষে ও খরচকারীর নিয়ত ও তাহার অবস্থা হিসাবে যে পরিমাণই হউক বৃদ্ধি পাইতে পারে। ইহা তো আখেরাতের হিসাবে হইবে। আর অনেক সময় দুনিয়াতেও উহার পুরাপুরি বিনিময় পাওয়া যায়। যেমন, অন্যান্য আয়াত ও হাদীস দ্বারা ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন, আয়াতসমূহের বর্ণনায় ২০নং আয়াতে এবং হাদীসসমূহের বর্ণনায় ৮নং হাদীসে আসিতেছে। এই হিসাবে যদি উক্ত আয়াতে এইদিকে ইঙ্গিত করা হইয়া থাকে, তবে ইহাও অসম্ভব নয়।

﴿۱۵﴾ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِنْ رِزْقِهِمْ سِرًّا وَ عَلَانِيَةً قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ ○ (الہٰلِم- ৫৮)

جو میرے خاص ایمان والوں کے لئے ہے کہ وہ نماز پڑھیں اور اپنے مال سے سیرتاً و علانیہ خرچ کریں اور اس سے پہلے کہ آئے وہ دن جس میں نہ بیع ہو نہ خیل۔

﴿১৫﴾ আমার খাস ঈমানদার বাঙ্গাদিগকে বলিয়া দিন, তাহারা যেন নামাজ কায়েম রাখে এবং আমার দেওয়া রিয়ক হইতে গোপনেও এবং প্রকাশ্যেও খরচ করিতে থাকে; সেইদিন আসিবার পূর্বে যেদিন কোন ক্রয়-বিক্রয় থাকিবে না আর কোন বন্ধুত্ব হইবে না। (হিবরাহীম : ৩১)

ফায়দা : 'গোপনেও এবং প্রকাশ্যেও'—ইহার অর্থ হইল, যখন যেই রকম দান উপযোগী হয়। কারণ, অবস্থা অনুপাতে উভয় প্রকারের

প্রয়োজন হইয়া থাকে। এই অর্থও হইতে পারে যে, প্রকাশ্যে—অর্থাৎ
করজ সদকা যাহা প্রকাশ্যে করা উত্তম, গোপনে—অর্থাৎ নফল সদকা
যাহা গোপনে করা উত্তম, যেমন, ৯নং আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে। আর সেই
দিন দ্বারা কিয়ামতের দিন বুঝানো হইয়াছে, যেমন, ৬নং আয়াতে বর্ণিত
হইয়াছে। আর নামায কায়ম রাখার বিষয় সর্বপ্রথম আয়াতে বর্ণিত
হইয়াছে।

হযরত জাবের (রাযিঃ) বলেন, একবার হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম খুতবা পাঠ করিলেন। উহাতে তিনি বলিলেন, হে লোকসকল!
মৃত্যুর পূর্বেই তওবা করিয়া লও (এমন যেন না হয় যে, মৃত্যু আসিয়া যায়
আর তওবা থাকিয়া যায়)। আর ব্যস্ততা বাড়িয়া যাওয়ার পূর্বেই নেক
আমল করিয়া লও। (এমন যেন না হয় যে, ব্যস্ততা বাড়িয়া যাওয়ার
কারণে সুযোগ হইল না) আর বেশী বেশী আল্লাহ তায়ালার স্মরণ এবং
গোপনে ও প্রকাশ্যে অধিক পরিমাণে সদকার দ্বারা নিজের ও আপন
পরওয়ারদিগারের মধ্যে সম্পর্ক মজবুত করিয়া লও। কেননা, ইহার দ্বারা
তোমাদিগকে রিক্তও দেওয়া হইবে, তোমাদের সাহায্যও করা হইবে
এবং তোমাদের দুরাবস্থাও দূর হইবে। (তারগীব)

آپ جو شجری پیچھے ان عاجزی کرنے والے مسلمانوں
کو جو ایسے ہیں کہ جب ان کے سامنے اس کا ذکر کیا جاتا
ہے تو ان کے دل ٹوڑ جاتے ہیں اور جو مصیبتیں ان
پر پڑتی ہیں ان پر صبر کرتے ہیں اور نماز کو قائم
رکھنے والے ہیں اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس سے
خوش کرتے ہیں۔

①۴ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ
الَّذِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَجِلَّتْ
فُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا
أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ
(سورہ حج ۵۷)

①৬ আর আপনি সুসংবাদ দান করুন ঐ সকল বিনয় অবলম্বনকারী
মুসলমানদিগকে, যাহারা এমন যে, যখন তাহাদের সম্মুখে আল্লাহর
যিকির করা হয়, তখন তাহাদের অন্তর ভীত হইয়া যায়। আর যে সমস্ত
মুসীবত তাহাদের উপর আসিয়া পড়ে, উহার উপর সবর করে। আর
নামায কায়ম রাখে এবং যাহাকিছু আমি তাহাদিগকে দিয়াছি, উহা
হইতে খরচ করে। (হজ্জ ৪ ৩৪-৩৫)

ফাযলদা : ‘মুখবিতীন’ যাহার অর্থ ‘বিনয় অবলম্বনকারী’ লেখা
হইয়াছে। ইহার অর্থের ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের কয়েকটি অভিমত

রহিয়াছে। ইহার আসল অর্থ নিম্ন দিকে গমনকারী। কোন কোন আলেম ইহার অর্থ 'আল্লাহর জুকুম-আহকামের সম্মুখে ঘাড় অবনতকারী' করিয়াছেন। কেননা, তাহারাও ঘাড়কে নিচের দিকে লইয়া যায়। কেহ কেহ 'বিনয়ী' অর্থ করিয়াছেন। কেননা, তাহারা তো সর্বদাই ঘাড় বুকাইয়া রাখেন।

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) উহার অর্থ 'শান্ত লোক' করিয়াছেন।

হযরত আমর ইবনে আওস (রহঃ) বলেন, মুখবিতীন ঐ সমস্ত লোক যাহারা কাহারও উপর জুলুম করে না এবং তাহাদের উপর জুলুম করা হইলে উহার প্রতিশোধ গ্রহণ করে না।

হযরত যাহ্যাক (রহঃ) বলেন, মুখবিতীন অর্থ 'বিনয়ী লোক'।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে—তিনি যখন হযরত রবী ইবনে খাইসাম (রাযিঃ)কে দেখিতেন, তখন বলিতেন, আমি তোমাকে যখন দেখি, তখন আমার মুখবিতীনদের কথা স্মরণ হয়।

اور جو لوگ (انکے راہیں) جیتے ہیں جو کچھ جیتے ہیں اور اس پر بھی انکے دل میں جیتے جیتے ہیں کہ وہ اللہ کے پاس جانے والے ہیں یہی لوگ ہیں جو نیکیوں میں وہ جیتے والے ہیں اور یہی ہیں وہ لوگ جو نیکیوں کی طرف بوقت کیلئے ہیں۔	۱۷) وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ۝ أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَبِقُونَ ۝ (مؤمن ۳۷-۳۸)

১৭) এবং যে সকল লোক যাহা কিছু দান করার (আল্লাহর রাস্তায়) দান করে, তদুপরি তাহাদের অন্তরসমূহ ভীত থাকে এইজন্য যে, তাহাদিগকে আল্লাহর নিকট ফিরিয়া যাইতে হইবে; ইহারাই ঐ সমস্ত লোক, যাহারা নেক কাজের দিকে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয় এবং ইহারাই ঐ সমস্ত লোক, যাহারা উহাতে অগ্রগামী। (মুখিনূন : ৬০-৬১)

ফায়দা : অর্থাৎ, আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা সত্ত্বেও তাহারা এই বিষয়ে ভীত থাকেন যে, আল্লাহ তায়ালা নিকট তাহাদের এই নেকীসমূহের কি পরিণতি হইবে—কবুল হইবে নাকি হইবে না। আর ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত মহান ও অতি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। যে ব্যক্তি যত উচ্চ স্তরের হয়, আল্লাহ তায়ালা তার ভয়ও তাহার অন্তরে তত বেশী প্রবল হয়—বিশেষ করিয়া ঐ ব্যক্তি, যাহার অন্তরে প্রকৃতই আল্লাহ

তায়ালার মহত্ত্ব ও আজমত রহিয়াছে। এমনকি তাহারা তো এই বিষয়েও ভয় করিতে থাকেন যে, এই দান-সদকার ব্যাপারে আমাদের নিয়ত খালেস আছে কিনা। অনেক সময় নফস ও শয়তানের ধোকার কারণে মানুষ কোন জিনিসকে নেকী বলিয়া মনে করিতে থাকে ; অথচ উহা নেকী নয়। যেমন, সূর্য্যে কাহাফের শেষ রুকুতে এরশাদ হইয়াছে—

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ
أَعْمَالًا ۝ الَّذِينَ قُلِّ سَعْيُهُمْ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ
يُقْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُغْسَبُونَ
مُنْعًا ۝ (سورة مريم ع ۱۲)

اے کھلم کھلم کہ تم کو ایسے آدمی بتائیں جو
اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسار
والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں
دنیا میں گئی گئی جو گتیں اور وہ یہ سمجھتے
ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں۔

অর্থাৎ, আপনি বলিয়া দিন—আমি কি তোমাদিগকে এমন লোকদের কথা বলিব, যাহারা আমলের দিক দিয়া সবচাইতে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত। তাহারা ঐ সকল লোক, যাহাদের কৃত সকল পরিশ্রম দুনিয়াতে বিফল হইয়া গিয়াছে ; অথচ তাহারা মনে করিতেছে যে, আমরা ভাল কাজ করিতেছি।

(কাহফ : ১০৩-১০৪)

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, মুমিন ব্যক্তি নেক কাজ করিয়া ভয় পায়। আর মুনাফেক খারাপ কাজ করিয়াও নির্ভয় হইয়া যায়। ফাযায়েলে হজ্জ কিতাবে এই ধরনের বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ করা হইয়াছে যে, যাহাদের অন্তরে আল্লাহ তায়ালার মহত্ত্ব ও বড়ত্ব পূর্ণমাত্রায় থাকে, তাহারা মুখে লাববাইকা বলিবার সময় উহা কবুল না হওয়ার ভয় করিয়া থাকেন।

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! الَّذِينَ يُؤْتُونَ الْاَيَةَ এই আয়াত কি এমন সমস্ত লোকের জন্য যেমন, কেহ চুরি করে, যেনা করে, শরাব পান করে এবং অন্যান্য গুনাহ করে আর সে এই বিষয়ে ভয় করে যে, তাহাকে আল্লাহ তায়ালার নিকট ফিরিয়া যাইতে হইবে? (অর্থাৎ, নিজের কৃত গুনাহের কারণে আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় করে যে, সেখানে কিতাবে সে মুখ দেখাইবে?)

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করমাইলেন, না, বরং ইহারা এমন সমস্ত লোক যেমন, কেহ রোযা রাখে, দান-সদকা করে, নামায পড়ে এবং ইহা সত্ত্বেও সে আল্লাহর দরবারে এই সমস্ত আমল

کبھی نہ ہوگا کہ وہ کرے۔

انہی ایک آدمی سے آج، ہجرت آج (راوی:) آج کر لیں،
ایسا رسول اللہ! ایسا کہ اے تمام لوگ، یاہا انہی کا کرے،
وہ نہ کرے اور نہ کرے؟ ہجرت رسول اللہ آج ایسا رسول اللہ
آج کر لیں، نا، ہجرت ایسا کہ اے تمام لوگ یاہا نامہ پڑھ،
روایہ کرے، دانہ-سدا کرے اور تاہا انہی کے ہجرت آج کرے۔

ہجرت ایسا رسول اللہ (راوی:) ہجرت کرنا کرنا ہجرت ہے، تاہا
ہجرت ہجرت آج کرے۔

سید ایسا رسول اللہ (راوی:) ہجرت، تاہا دانہ-سدا کرے اور
کیا ہجرت کے دن رسول اللہ تاہا انہی کے ہجرت آج اور ہجرت کے
کرتا ہجرت کرے۔

ہجرت ہجرت (راوی:) ہجرت کرنا کرنا ہجرت ہے، ایسا کہ اے
تمام لوگ، یاہا نہ کرے اور نہ کرے؟ ہجرت آج کرے، نا،
ہجرت آج ہجرت کرے اور تاہا انہی کے ہجرت آج کرے۔

(پہلے باب)

ہجرت رسول اللہ آج ایسا رسول اللہ (راوی:) ہجرت آج کر لیں،
توہ تاہا انہی کے ہجرت آج کر لیں۔ اور توہ نامہ
ہجرت آج کر لیں، توہ ہجرت آج کر لیں۔ کہہ ایسا کہ اے
تمام لوگ، یاہا نہ کرے اور نہ کرے؟ ہجرت آج کرے، نا،
ہجرت آج ہجرت کرے اور تاہا انہی کے ہجرت آج کرے۔

ہجرت رسول اللہ آج ایسا رسول اللہ (راوی:) ہجرت آج کر لیں،
توہ تاہا انہی کے ہجرت آج کر لیں۔ اور توہ نامہ
ہجرت آج کر لیں، توہ ہجرت آج کر لیں۔ کہہ ایسا کہ اے
تمام لوگ، یاہا نہ کرے اور نہ کرے؟ ہجرت آج کرے، نا،
ہجرت آج ہجرت کرے اور تاہا انہی کے ہجرت آج کرے۔

اور جو کہ (راوی:) ہجرت آج کر لیں،

(راوی:) ہجرت آج کر لیں،

ہجرت آج کر لیں،

ہجرت آج کر لیں،

ہجرت آج کر لیں،

ہجرت آج کر لیں،

ہجرت آج کر لیں،

۱۸ وَلَا يَأْتِلْ أُولُو الْفَضْلِ

مِنْكُمْ وَالشَّعْوُ أَنْ يُؤْتُوا

أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسْكِينِ

وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا

أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يُغْفَرَ اللَّهُ

لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

(সূত্র-২০) (১২)

قصر راعى كرمه كرمه بك اشترى

فقد شيمه

(১৮) আর তোমাদের মধ্যে যাহারা (দ্বীনের দিক দিয়া) বুয়ুর্গ (এবং দুনিয়ার দিক দিয়া) সচ্ছল, তাহারা যেন এরূপ কসম না করিয়া বসে যে, তাহারা আত্মীয়-স্বজন ও গরীব-মিসকীনকে এবং আল্লাহর রাস্তায় হিজরতকারীদেরকে দান করিবে না। তাহাদের উচিত, যেন কমা করিয়া দেয় ও মার্জনা করিয়া দেয়। তোমরা কি ইহা চাও না যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ভুল-ত্রুটি মাফ করিয়া দিবেন? (অতএব, তোমরাও তোমাদের সহিত ভুল-ত্রুটিকারীদেরকে কমা করিয়া দাও)। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা বড় কমাশীল পরম দয়ালু। (নূর : ২২)

ফায়দা : ৬ষ্ঠ হিজরীতে গাযওয়ায়ে বানী মুস্তালিক নামে একটি জিহাদ হইয়াছিল। উহাতে হযরত আয়েশা (রাযিঃ) ও হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলেন। তাহার সওয়ারীর উট ভিন্ন ছিল। উহার উপর হাওদা বা বসার পালকী ছিল। তিনি নিজের হাওদার মধ্যে অবস্থান করিতেন। যখন রওয়ানা হইবার সময় হইত, তখন কয়েকজন লোক হাওদাটি উঠাইয়া উটের উপর বাঁধিয়া দিত। তিনি অত্যন্ত হালকা-পাতলা ছিলেন। যাহারা উঠাইতেন তাহারা অনুভব করিতে পারিতেন না যে, ইহার মধ্যে কেহ আছে, কি নাই। কারণ, যখন চারজন লোক মিলিয়া হাওদা উঠাইতে হইত, তখন উহার মধ্যে একজন কমবয়স্কা হালকা-পাতলা মেয়েলোকের ওজন কিভাবে অনুভব করিবে? নিয়ম অনুযায়ী এক মঞ্জিলে কাফেলা অবস্থান করিতেছিল। যখন রওয়ানা হওয়ার সময় হইল, তখন লোকেরা তাহার হাওদা বাঁধিয়া দিল। অঞ্চ তিনি তখন এস্তেঞ্জার জন্য বাহিরে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, তিনি যে গলার হারটি পরিধান করিয়া রাখিয়াছিলেন উহা নাই। তিনি উহা তালাশ করিবার জন্য চলিয়া গেলেন। এইদিকে কাফেলা রওয়ানা হইয়া গেল। তিনি একাকী এই খোলা ময়দানে রহিয়া গেলেন। মনে করিলেন, পথে যখন হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার অনুপস্থিতির বিষয় জানিতে পারিবেন, তখন আমাকে তালাশ করিবার জন্য লোক এখানেই আসিবে। এইজন্য তিনি সেখানেই বসিয়া গেলেন। যখন নিদ্রা চাপিল, তখন ঘুমাইয়া পড়িলেন। আল্লাহ তায়ালা তাহাদের নেক আমলের কারণে তাহাদিগকে পরিপূর্ণরূপে মনের শান্তি দিয়া রাখিয়াছিলেন। যদি বর্তমান যুগের কোন মহিলা হইত, তবে একাকী খালি

ময়দানে রাত্রে ঘুম আসিবার তো চিন্তাই করা যায় না। ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া কাঁদিয়া কাটিয়া সকাল করিয়া দিত। হযরত সাফওয়ান ইবনে মুওয়াল্লাহ (রাযিঃ) একজন বুয়ুগ সাহাবী ছিলেন। যিনি কাফেলার পিছনে এইজন্য থাকিয়া যাইতেন যে, রাস্তায় কোন জিনিস পড়িয়া গেলে খোঁজ-খবর রাখিবেন। তিনি সকালবেলা যখন ঐ জায়গায় পৌঁছিলেন, তখন একজন মানুষকে পড়িয়া থাকিতে দেখিলেন। আর যেহেতু তিনি পর্দার হুকুম নাথিল হওয়ার পূর্বে হযরত আয়েশা (রাযিঃ)কে দেখিয়াছিলেন, এইজন্য তাঁহাকে এইখানে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া চিনিয়া ফেলিলেন এবং জোরে ইম্মা লিল্লাহি ওয়া ইম্মা ইলাইহি রাজিউন পড়িলেন। তাঁহার আওয়াজে হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল এবং সাথে সাথে মুখ ঢাকিয়া লইলেন। উক্ত সাহাবী নিজের উটকে বসাইলেন এবং হযরত আয়েশা (রাযিঃ) উহার উপর সওয়ার হইয়া গেলেন। আর তিনি উটের লাগাম ধরিয়া চলিলেন এবং কাফেলার নিকট পৌছাইয়া দিলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মুনাফেকদের সরদার এবং মুসলমানদের কঠিন শত্রু ছিল, সে অপবাদ লাগাইবার সুযোগ পাইয়া গেল এবং খুব প্রচার করিল। তাহার সঙ্গে কোন কোন সরলপ্রাণ মুসলমানও এই আলোচনায় শরীক হইয়া গেল। আব্দুল্লাহ তায়ালায় কুদরত ও মহিমা ; একমাস পর্যন্ত এই আলাপ-আলোচনা হইতে থাকিল। মানুষের মধ্যে এই ঘটনার চর্চা হইতে থাকিল এবং হযরত আয়েশার পবিত্রতা সম্পর্কে কোন ওহী ইত্যাদিও নাথিল হইল না। এই দুই ঘটনার কারণে হযর সাব্বাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানদের খুবই কষ্ট হইতেছিল ; আর কষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক। হযর সাব্বাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষ এবং মহিলাদের সহিত এই ব্যাপারে পরামর্শ করিতেছিলেন এবং প্রকৃত ঘটনা যাচাই করিতেছিলেন ; কিন্তু কোন প্রকার সাক্ষ্য পাইতেছিলেন না। একমাস পর সুরায়ে নূরের একটি স্বতন্ত্র রুকু কুরআন পাকে হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর পবিত্রতা সম্পর্কে নাথিল হইল এবং আব্দুল্লাহ তায়ালায় পক্ষ হইতে ঐ সমস্ত লোকের প্রতি চরম অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা হইল, যাহারা বিনা দলীল-প্রমাণে এই অপবাদ প্রচার-প্রসার করিয়াছিল। এই ঘটনা প্রচারকারীদের মধ্যে একজন সাহাবী হযরত মিসতাহ (রাযিঃ)ও ছিলেন। তিনি হযরত আবু বকর (রাযিঃ)এর আত্মীয় ছিলেন, হযরত আবু বকর (রাযিঃ) তাহার খোঁজ-খবর রাখিতেন এবং সাহায্য করিতেন। এই অপবাদের ঘটনায় তাহার অংশগ্রহণের কারণে হযরত আবু বকর (রাযিঃ) কষ্ট পাইলেন ; কষ্ট পাওয়াই স্বাভাবিক। কেননা, তিনি আপনজন

হইয়া বিনা প্রমাণে এই ঘটনা ছড়াইয়াছেন। উক্ত কষ্টের কারণে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) কসম খাইলেন যে, তিনি মিসতাহ (রাযিঃ)কে সাহায্য করিবেন না। তখন উপরোক্ত আয়াত নাখিল হয়। বিভিন্ন রেওয়াজাত দ্বারা জানা যায়, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) ছাড়া অন্যান্য কিছুসংখ্যক সাহাবায়ে কেবাম (রাযিঃ)ও এইরূপ লোকদের সাহায্য করা হইতে হাত গুটাইয়া লইয়াছিলেন; যাহারা এই অপবাদের ঘটনায় বেশী অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, মিসতাহ (রাযিঃ) এই ঘটনায় অনেক বেশী অংশ লইয়াছিলেন এবং তিনি হযরত আবু বকর (রাযিঃ)এর আত্মীয়ও ছিলেন এবং তাহারই পোষা ছিলেন। যখন হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর পবিত্রতা নাখিল হইল, তখন হযরত আবু বকর (রাযিঃ) কসম খাইলেন যে, তাহার উপর খরচ করিবেন না। এই পরিপ্রেক্ষিতে আয়াত لَا يَأْتِلُ الْاِيْلَا নাখিল হইল। উক্ত আয়াত নাখিল হওয়ার পর হযরত আবু বকর (রাযিঃ) পুনরায় তাহাকে আপন প্রতিপালনে গ্রহণ করিয়া লইলেন।

অন্য এক হাদীসে আছে, এই আয়াত নাখিল হওয়ার পর হযরত আবু বকর (রাযিঃ) পূর্বে যে পরিমাণ খরচ করিতেন, উহার দ্বিগুণ করিয়া দিলেন। অপর এক হাদীসে আছে, হযরত আবু বকর (রাযিঃ) দুইজন এতীমের প্রতিপালন করিতেন। তাহাদের একজন ছিলেন হযরত মিসতাহ (রাযিঃ)। হযরত আবু বকর (রাযিঃ) উভয়ের খরচাদি বন্ধ করিয়া দেওয়ার কসম খাইয়াছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, সাহাবা (রাযিঃ)দের মধ্যে কয়েকজন এমন ছিলেন, যাহারা হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর উপর অপবাদ আরোপে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। যেই কারণে হযরত আবু বকর (রাযিঃ) সহ অনেক সাহাবায়ে কেবাম (রাযিঃ) এমন ছিলেন, যাহারা কসম খাইয়াছিলেন যে, যে সমস্ত লোক এই অপবাদের প্রচার-প্রসারে অংশগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের উপর খরচ করিবেন না। তখন এই আয়াত নাখিল হইল যে, মর্যাদাবান ও সচ্ছল ব্যক্তিগণ যেন এমন কসম না খান যে, তাহারা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করিবেন না এবং পূর্বে যে রূপ খরচ করিতেছিলেন ঐরূপ খরচ করিবেন না।

(মুত্তায়ে মানসূর)

ইহা কত বড় সাধনার বিষয় যে, একদিকে কোন ব্যক্তি কাহারও কন্যার ইজ্জত-সম্মান নষ্ট করার জন্য মিথ্যা কথা বলিয়া বেড়ায়, অপরদিকে সে ব্যক্তি পূর্বে তাহার যে রূপ সাহায্য-সহযোগিতা করিতেছিল সেইরূপ করিল; বরং পূর্বের চেয়েও দ্বিগুণ করিয়া দিল।

১৭) تَتَّبَعَانِي جُنُوبُهُمْ عَنِ
الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ
خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يُنْفِقُونَ ○ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ
مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُتُوبِ أَعْيُنٍ
جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○
(সূরা সূর - সূরা ২)

মাজে কান কে পিলো বস্ত্রের سے عظیمہ ہوتے
میں اس طرح کہ وہ لوگ اپنے سب کو (غراب
کے) خوف سے اور (غراب کی) تمہیں میں پکارنے
سجے ہیں اور ہماری ہی جہتی چیزوں سے خرچہ
کہتے ہوتے ہیں پس کوئی نہیں جانتا کہ ایسے لوگوں کی
انکسوں کی ٹھٹھک کا کیا کیا سزا ہے جو عیب میں
موجو ہے یہ بدلہ ہے ان کے نیک اعمال کا۔

১৯) রাতে তাহাদের পার্শ্ব বিছানা হইতে পৃথক থাকে ; এইভাবে যে, তাহারা আপন রবকে (আযাবে) ভয়ে এবং (সওয়াবের) আশায় ডাকিতে থাকে। আর আমার দেওয়া সম্পদ হইতে খরচ করে। অতএব, কেহ জানে না যে, এই সমস্ত লোকদের জন্য নয়ন জুড়ানো কি কি সামগ্রী গায়েরী তাহারে মওজুদ রহিয়াছে। ইহা তাহাদের নেক আমলের প্রতিদান।

(সাজ্দাহ : ১৬-১৭)

কায়দা : রাতে তাহাদের পার্শ্ব বিছানা হইতে পৃথক থাকে—এ সম্পর্কে মুফাসসিরগণের দুই রকম উক্তি রহিয়াছে। এক হইল, ইহা দ্বারা মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়কে বুঝানো হইয়াছে। সাহাবায়ে কেবাম হইতে বর্ণিত অনেক উক্তি দ্বারা ইহার সমর্থন পাওয়া যায়।

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, এই আয়াত আমাদের সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে। আমরা আনসারগণ মাগরিবের নামায পড়িয়া হযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত এশার নামায না পড়া পর্যন্ত ঘরে ফিরিতাম না। এই সম্পর্কে উক্ত আয়াত নাযিল হইয়াছে।

অন্য এক রেওয়ায়াতে হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতেই বর্ণনা করা হইয়াছে যে, মুহাজির সাহাবা (রাযিঃ)দের এক জামাতের অভ্যাস এই ছিল যে, তাহারা মাগরিবের পর হইতে এশা পর্যন্ত নফল নামায পড়িতেন। এই সম্পর্কে উক্ত আয়াত নাযিল হইয়াছে।

হযরত বেলাল (রাযিঃ) বলেন, আমরা মাগরিবের পর বসিয়া থাকিতাম এবং সাহাবা (রাযিঃ)দের এক জামাত মাগরিব হইতে এশা পর্যন্ত নামায পড়িতে থাকিতেন। এই সম্পর্কে উক্ত আয়াত নাযিল হইয়াছে।

আবদুল্লাহ ইবনে সসা (রাযিঃ) হইতেও এরূপ নকল করা হইয়াছে যে,

আনসারদের এক জামাত মাগরিব হইতে এশা পর্যন্ত নফল পড়িতেন। এই সম্পর্কে উক্ত আয়াত নাযিল হইয়াছে।

দ্বিতীয় অভিযত এই যে, উক্ত আয়াত দ্বারা তাহাজ্জুদ নামাযকে বুকানো হইয়াছে। হযরত মুআয (রাযিঃ) হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করেন যে, এই আয়াত দ্বারা রাতের নামাযকে বুকানো হইয়াছে।

এক হাদীসে মুজাহিদ (রহঃ) হইতে নকল করা হইয়াছে, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের নামায সম্পর্কে আলোচনা করিলেন এবং তাহার চোখ হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইল। অতঃপর তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, তওরাত কিতাবে লেখা আছে, যাহাদের পার্শ্ব রাতে বিছানা হইতে দূরে থাকে, তাহাদের জন্য আল্লাহ তায়ালা এমন বস্তুসমূহ তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছেন, যাহা না কোন চোখ দেখিয়াছে, না কোন কান শুনিয়াছে, না কোন মানুষের অন্তর উহার কল্পনা করিয়াছে, না উহা কোন নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা জানে, না কোন নবী-রাসূল জানেন। কুরআন পাকের এই আয়াতে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ)ও হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে নকল করেন যে, আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন, আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন সমস্ত জিনিস তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছি, যাহা না কোন চোখ দেখিয়াছে, না কোন কান শুনিয়াছে, না কোন অন্তর উহার কল্পনা করিয়াছে।

রাওজুর-রায়াহীন ইত্যাদি কিতাবে এইরূপ লোকদের শত শত ঘটনা উল্লেখ করা হইয়াছে, যাহারা সারারাত্র মাওলার স্মরণে কাঁদিয়া কাটাইয়া দিতেন।

হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)এর ৪০ বছর পর্যন্ত এশার ওজু দিয়া ফজরের নামায পড়া এমন প্রসিদ্ধ বিষয় যে, উহাকে অস্বীকার করার অবকাশ নাই। রমযান মুবারকে তাহার দৈনিক রাত্রে ৩ দিনে দুই খতম কুরআন তেলাওয়াত করার ঘটনাও প্রসিদ্ধ রহিয়াছে।

হযরত ওসমান (রাযিঃ)এর সারারাত্র জাগিয়া থাকা এবং এক রাকাতে পুরা কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করার ঘটনাও প্রসিদ্ধ রহিয়াছে।

হযরত ওমর (রাযিঃ) অনেক সময় এশার নামায পড়িয়া ঘরে তশরীফ লইয়া যাইতেন। ঘরে যাইয়া নামায শুরু করিয়া দিতেন এবং নামায

পড়িতে পড়িতে সকাল করিয়া দিতেন।

হযরত তামীম দারী (রাযিঃ) একজন বিখ্যাত সাহাবী। এক রাকাতে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করা এবং কখনও একটি মাত্র আয়াতকে সকাল পর্যন্ত বারবার পড়িতে থাকা তাহার অভ্যাস ছিল।

হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রাযিঃ) ঘুমাইবার জন্য শুইতেন এবং এপাশ ওপাশ পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়া এই বলিয়া দাঁড়াইয়া যাইতেন যে, হে আল্লাহ, জাহান্নামের ভয় আমার নিজাকে উড়াইয়া দিয়াছে। অতঃপর সকাল পর্যন্ত নামায পড়িতে থাকিতেন।

হযরত ওমায়ের (রাযিঃ) এক হাজার রাকাত নফল নামায এবং এক লক্ষ বার তসবীহ প্রতিদিন পড়িতেন।

হযরত উয়্যাহেস করনী (রহঃ) বিখ্যাত ভাবেয়ী ছিলেন। হযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাহার প্রশংসা করিয়াছেন এবং তাহার দ্বারা দোয়া করাইবার জন্য লোকদেরকে উৎসাহিত করিয়াছেন। তিনি কোন রাত সম্পর্কে বলিতেন যে, আজকের রাত রুকুুর জন্য। অতঃপর সারারাত রুকুতে কাটাইয়া দিতেন। কোন রাত সম্পর্কে বলিতেন, আজকের রাত সেজদার জন্য। অতঃপর সারারাত সেজদার মধ্যে কাটাইয়া দিতেন। (একামাতুল ইজ্জাহ)

মোটকথা, এই সকল বুয়ুর্গদের রাতভর মালিকের স্মরণে মাহবুবের অধীর আগ্রহে কাটাইয়া দেওয়ার ঘটনাবলী এত বেশী যে, উহা সম্পূর্ণ লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব। এই সকল বুয়ুর্গগণ প্রকৃতপক্ষে নিম্নে বর্ণিত কবিতার যোগ্য পাত্র ছিলেন—

ہمارا کام جبرائیل کو رونا یاد دلیر میں
ہماری نیند ہے تجھ خیال یار ہو جانا

অর্থ : ‘আমাদের কাজ হইল, রাতভর মাহবুবের স্মরণে, কাঁদিয়া কাটাইয়া দেওয়া। আর আমাদের নিদ্রা হইল, বন্ধুর ধ্যানে বিভোর হইয়া যাওয়া।’ হায়, যদি আল্লাহ তায়ালা এই সকল বুয়ুর্গদের শওক-আগ্রহের সামান্যতম ছায়াও এই অধমের উপর ঢালিয়া দিতেন!

﴿٦﴾ قُلْ إِنْ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ
لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ
لَهُ ۥ وَمَا تُلْقُوا مِنْ شَيْءٍ

ہم کہہ دیجئے کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے
جس کو چاہے روزی کی وسعت سے کچھ اور
جس کو چاہے سختی کی تنگی سے کچھ اور

قَهُوْ وَيُخْلِفُهُ وَ هُوَ

بَلِّغْهُمَا كَمَا أَمَرَ رَبِّي

غَيْرَ الْمُرْتَابِينَ ○

وَيُخْلِفُهُ

(সহ সবার কক্ষ)

(২০) আপনি বলিয়া দিন, আমার রব আপন বান্দাদের মধ্য হইতে যাহার জন্য চাহেন রিযিক প্রদান করিয়া দেন। আর যাহার জন্য চাহেন রিযিক সংকীর্ণ করিয়া দেন। আর তোমরা যাহা কিছু (আল্লাহর রাস্তায়) খরচ করিবে আল্লাহ তায়ালা উহার বিনিময় প্রদান করিবেন এবং তিনি সর্বাপেক্ষা উত্তম রিযিকদাতা। (সাবা : ৩৯)

ফায়দা : অর্থাৎ, অভাব ও সচ্ছলতা আল্লাহ তায়ালায় পক্ষ হইতে হইয়া থাকে ; তোমাদের খরচ না করার দ্বারা সচ্ছলতা আসে না ; আর খরচ বেশী করার দ্বারা অভাব আসে না বরং আল্লাহর রাস্তায় যাহা খরচ করা হয়, উহার বিনিময় আখেরাতে তো পাওয়া যাইবেই, অধিকাংশ সময় দুনিয়াতেও উহার বিনিময় পাওয়া যায়। এক হাদীসে আছে, হযরত জিবরাইল (আঃ) আল্লাহ তায়ালায় এই এরশাদ নকল করিয়াছেন, হে আমার বান্দারা ! আমি তোমাদিগকে আপন দয়া ও অনুগ্রহে দান করিয়াছি এবং তোমাদের নিকট কর্তব্য চাহিয়াছি। অতএব, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায়, সন্তুষ্টচিত্তে ও আগ্রহ সহকারে আমাকে দিবে ; আমি উহার বিনিময় দুনিয়াতে শীঘ্রই দান করিব এবং আখেরাতে তাহার জন্য সম্বল বানাইয়া রাখিব, আর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় দিবে না বরং তাহার নিকট হইতে আমি আমার দানকৃত বস্তু জোরপূর্বক ছিনাইয়া লইব আর সে উহার উপর সর্বর করিবে ও সওয়াবের আশা রাখিবে, তাহার জন্য আমি আমার রহমত ওয়াজিব করিয়া দিব, তাহাকে হেদায়াতপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে লিখিয়া দিব এবং তাহার জন্য আমার দীদার উন্মুক্ত করিয়া দিব। (কান্ব)

আল্লাহ তায়ালায় কি পরিমাণ অনুগ্রহ যে, স্বেচ্ছায় না দেওয়া অবস্থায়ও যদি বান্দার নিকট হইতে জোরপূর্বক ছিনাইয়া লওয়া হয় আর সে উহার উপর সর্বর করে, তবে উহার জন্যও বিনিময় দান করেন। অথচ যখন সে আল্লাহ তায়ালায় দানকৃত বস্তু স্বেচ্ছায় দান করে না ; জোরপূর্বক তাহার নিকট হইতে ছিনাইয়া লওয়া হয়, তখন আবার বিনিময় কিসের। কিন্তু আল্লাহ তায়ালায় অনুগ্রহের কি কোন শেষ আছে।

হযরত হাসান (রাযিঃ) বলেন, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত আয়াত সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, তোমরা অপচয় ও কার্পণ্য ছাড়া,

যাহাকিছু নিজের পরিবার-পরিজনের উপর খরচ কর, উহা সবই আল্লাহর রাস্তায় গণ্য করা হয়।

হযরত জাবের (রাযিঃ) হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, মানুষ যাহাকিছু শরীয়তের হুকুম অনুযায়ী খরচ করে আল্লাহ তায়ালার নিকট উহার বিনিময় রহিয়াছে। শুধু উহা ছাড়া, যাহা ইমারত তৈরীতে খরচ করা হয় অথবা গুনাহের কাজে খরচ করা হয়।

হযরত জাবের (রাযিঃ) হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন, প্রত্যেক অনুগ্রহ সদকা এবং যাহাকিছু মানুষ নিজের উপর এবং নিজের পরিবার-পরিজনের উপর খরচ করে, উহা সদকা। আর যাহাকিছু নিজের ইচ্ছাত-সম্মানের হেফাজতে খরচ করে, উহা সদকা। আর মুসলমান যাহাকিছু (শরীয়ত অনুযায়ী) খরচ করে, আল্লাহ তায়লা উহার বিনিময় প্রদানের জিম্মাদার। তবে ঐ খরচের জিম্মাদার নহেন যাহা গুনাহের কাজে অথবা ইমারত তৈরীতে করা হইয়া থাকে। হাকীম তিরমিযী (রহঃ) হযরত জুবায়ের (রাযিঃ) হইতে একটি বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। যাহা হাদীসের বিবরণ প্রসঙ্গে ১২নম্বরে বিস্তারিতভাবে আসিতেছে। আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ) দূরে মানসুর কিতাবে ইহাকে হাকীম তিরমিযী (রহঃ) এর রেওয়াযাত হইতে বিস্তারিত নকল করিয়াছেন। কিন্তু স্বয়ং তিনি 'লাআলী মাসনুআহ' কিতাবে ইহাকে অনেক সংক্ষেপে ইবনে আদী হইতে জাল হাদীসের বর্ণনায় নকল করিয়াছেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করেন, প্রতিদিন সকালে দুইজন ফেরেশতা আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করেন। একজন দোয়া করেন, হে আল্লাহ! খরচকারী ব্যক্তিকে উহার বিনিময় দান কর। আর একজন আরজ করেন, হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি জমা করিয়া রাখে, তাহার সম্পদ ধ্বংস কর। হাদীসের বর্ণনায় ইহা দুই নম্বর হাদীসে আসিতেছে। অভিজ্ঞতায়ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, যে সমস্ত লোক দান করে আল্লাহ তায়ালার দরবার হইতে তাহার জন্য সবসময় প্রাচুর্যের দরজা খোলা থাকে। আর যে সমস্ত লোক কার্পণ্য করিয়া জমা করিয়া রাখে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন আসমানী আপদ, রোগ, মোকদ্দমা, চুরি ইত্যাদি এমন বিষয়ের সম্মুখীন হইয়া যায়; যাহার কারণে বছরের পর বছর জমা করা সম্পদ কিছুদিনের মধ্যেই ধ্বংস হইয়া যায়। যদি কাহারও অন্যান্য নেক আমলের বরকতে এবং তাহার নিয়তের সত্যতার কারণে তাহার উপর এই ধরনের খরচের আপদ নাও আসে, তবু অপদার্থ সন্তানরা পিতার জমা

করা সম্পদ যাহা সে সারা জীবন কামাই করিয়াছিল, কয়েক মাসে সাবাড় করিয়া দেয়।

হযরত আসমা (রাযিঃ) বলেন, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এরশাদ করিয়াছেন, খুব খরচ কর এবং গনিয়া গনিয়া রাখিও না, আল্লাহ তায়ালাও তোমাকে গনিয়া গনিয়া দান করিবেন। জমা করিয়া রাখিও না, আল্লাহ তায়ালাও তোমাকে না দিয়া জমা করিয়া রাখিবেন। দান করিতে থাক; যত পরিমাণ তোমার দ্বারা সম্ভব হয়।

(মিশকাত : বুখারী, মুসলিম)

একবার হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বেলাল (রাযিঃ)এর নিকট গেলেন। তাহার নিকট খেজুরের একটি স্থূপ রাখা ছিল। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইহা কি? তিনি আরজ করিলেন, ভবিষ্যতে প্রয়োজনের জন্য রাখিয়া দিয়াছি। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি কি এই ভয় কর না যে, জাহান্নামের আগুনের মধ্যে ইহার ধোঁয়া দেখিতে পাইবে? হে বেলাল! খুব খরচ কর এবং আরশের মালিকের নিকট কম হওয়ার ভয় করিও না। (মিশকাত)

এখানে প্রয়োজন পরিমাণেও ভবিষ্যতের জন্য জমা করিয়া রাখার ব্যাপারে ধমক দেওয়া হইয়াছে এবং জাহান্নামের ধোঁয়া দেখিবার ভয় রহিয়াছে। হযরত বেলাল (রাযিঃ) তাঁহার মান-মর্যাদা হিসাবে ইহারই উপযুক্ত ছিলেন। কেননা, তিনি ঐ সকল উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন লোকদের মধ্য হইতে ছিলেন, যাহাদের ব্যাপারে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহা পছন্দ করিতেন না যে, তাঁহারা ভবিষ্যতের ফিকির করেন এবং আপন মালিকের উপর তাহাদের এই বিষয়ে পুরাপুরি ভরসা না থাকে যে, যে মালিক আজ দিয়াছেন তিনি কালও দিবেন। প্রত্যেক ব্যক্তির একটি মান ও মর্যাদা হইয়া থাকে—‘নেক লোকদের নেক কর্ম নৈকটাপ্রাপ্ত লোকদের জন্য শুনাহ’ একটি প্রসিদ্ধ প্রবাদ রহিয়াছে। সাধারণ লোকদের জন্য যে সকল কাঁজ নেকী হিসাবে গণ্য হয়, নৈকটাপ্রাপ্ত লোকদের জন্য তাহাদের মর্যাদা হিসাবে সেইগুলিও ক্রটি হিসাবে ধরা হইয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ বহু ঘটনা রহিয়াছে। মোটকথা, সম্পদ কখনও রাখিয়া দেওয়ার জন্য নয়, কখনও জমা করিয়া রাখিবার বস্তু নয়, ইহা শুধু খরচ করিবার জন্য পয়দা হইয়াছে। নিজের উপর কম হইতে কম এবং অন্যদের উপর বেশী হইতে বেশী খরচ করা হইল, মালের উপকারিতা। কিন্তু একটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী যে, আল্লাহ তায়ালা নিকট সবকিছু নির্ভর করে নিয়তের উপর। إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ইহা

প্রসিদ্ধ হাদীস। অর্থাৎ, আমল নিয়তের উপর নির্ভর করে। যেখানে নেক নিয়ত থাকে, শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য খরচ করা উদ্দেশ্য হয়, চাই নিজের উপর করা হউক অথবা পরিবার-পরিজনের উপর কিংবা আত্মীয়-স্বজন বা অন্যদের উপর হউক—এই খরচ অবশ্যই সুফল ও বরকত আনিবে। আর যেখানে নিয়ত খারাব থাকে, সুখ্যাতি অর্জন ও ইযযত-সম্মান হাসিল করা মকসুদ হয়, সুনাম অথবা অন্য কোন স্বার্থ জড়িত থাকে, সেখানে নেকী বরবাদ ও গুনাহ অবধারিত হইয়া যায় ; এই সব ক্ষেত্রে বরকতের প্রশ্নই থাকে না।

(১১) إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ۝ لِيُؤْفِقَهُمُ اجْوَرَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ

জওক قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں وہ ایسی تجارت کے تمیز میں جس میں گمنا نہیں ہے اور اس لئے تاکہ حق تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کی اجر میں بھی بڑی بڑی عطا کرے اور اس کے علاوہ اپنے فضل سے بڑھاتا کرے اور زیادہ عطا کرے۔ بیشک وہ بڑا بخشنے والا بڑا قہر مند ہے۔

(سورہ فاطر - رکوع ۲)

(২১) যাহারা কুরআন পাক তেলাওয়াত করে এবং নামায কায়েম রাখে আর আমি তাহাদিগকে যাহা কিছু দিয়াছি উহা হইতে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে, তাহারা এমন ব্যবসায়ের আশা রাখে, যাহা কখনও মন্দা হইবে না। আর ইহা এইজন্য, যাহাতে আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে তাহাদের আমলসমূহের প্রতিদান পূর্ণরূপে দান করেন এবং ইহা ছাড়া স্বীয় অনুগ্রহে (পুরস্কার স্বরূপ) আরও অধিক দান করেন। নিঃসন্দেহে তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল ও গুণগ্রাহী। (ফাতির : ২৯-৩০)

ফায়দা : হযরত কাতাদা (রাযিঃ) বলেন, এমন ব্যবসা যাহা কখনও মন্দা হইবে না—ইহা দ্বারা জাম্বাতকে বুঝান হইয়াছে, যাহা কখনও ধ্বংস হইবে না এবং নষ্ট হইবে না। আর আপন অনুগ্রহে আরও বেশী দান করিবেন—ইহা দ্বারা উহাই বুঝান হইয়াছে, যাহা (কুরআন পাকে) দ্বারা ব্যক্ত করা হইয়াছে। (দুররে মানসুর)

এই আয়াত দ্বারা হযরত কাতাদা (রাযিঃ) সূরা কাফ-এর আয়াতের

প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন, যাহাতে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন :
 لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ অর্থাৎ, ঐ সকল (জান্নাতবাসী)
 লোকদের জন্য জান্নাতে এমন প্রত্যেক বস্তু বিদ্যমান থাকিবে, যাহার প্রতি
 তাহারা আকাঙ্ক্ষা করিবে এবং (তাহাদের কাম্বিক্ত জিনিসসমূহ ছাড়া)
 আমার নিকট তাহাদের জন্য আরও অধিক রহিয়াছে। (যাহা আমি
 তাহাদিগকে দান করিব।)

উক্ত আয়াতের তফসীরে হাদীস শরীফে অনেক আশ্চর্য আশ্চর্য বিষয় বর্ণনা করা হইয়াছে, যাহা বিস্তারিত বিবরণ সাপেক্ষ। তন্মধ্যে সর্বোচ্চ বস্তু হইল, আল্লাহ তায়ালায় সন্তুষ্টির পরওয়ানা লাভ করা ও বারবার আল্লাহ তায়ালায় দীদার ও যিয়ারত লাভ করা, যাহা সৌভাগ্যবান লোকদের নসীব হইবে। আর এই এত বড় দৌলত কত সামান্য পরিশ্রমের উপর দেওয়া হইবে, যাহার জন্য কোন কষ্ট ও পরিশ্রম করিতে হয় না। আল্লাহর রাস্তায় অধিক পরিমাণে খরচ করা, নামায কায়েম রাখা এবং বেশী বেশী কুরআন তেলাওয়াত করা, যাহা স্বয়ং দুনিয়াতেও মজ্জার জিনিস। কুরআন পাক বেশী বেশী তেলাওয়াত করা সম্পর্কে কিছু ঘটনা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আর কিছু ঘটনা 'কাযায়েলে কুরআন' কিতাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। উহা মনোযোগ সহকারে দেখা উচিত।

اور جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نیکو
 قائم کیا اور ان کا رب (ختمِ پاشان) کا نام شہید
 ہے اور جو ہم نے ان کو یاد اس کے، فرج کرتے
 ہوتے ہیں (ایسے لوگوں کیلئے حق تعالیٰ شانہ کی یہاں
 جو عطا ہیں وہ دنیا کے سارے سامان ہے بہر جا
 بہتر اور پائیدار نہیں)۔

(۲۲) وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
 وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ
 وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ○
 (سوره شوری - رکعت ۴)

بہتر اور پائیدار ہوگی۔

(২২) আর যাহারা স্বীয় রথের নির্দেশ মানিয়াছে এবং নামায কায়েম করিয়াছে আর তাহাদের প্রত্যেক (গুরুত্বপূর্ণ) কাজ পরামর্শের মাধ্যমে সম্পাদিত হয় এবং আমি যাহা কিছু তাহাদিগকে দান করিয়াছি উহা হইতে খরচ করিতে থাকে (এইরূপ লোকদের জন্য আল্লাহ তায়ালা নিকট যে প্রতিদান রহিয়াছে, উহা দুনিয়ার সম্পদ হইতে অনেক গুণ উত্তম ও স্থায়ী)। (শূরা : ৩৮)

ফায়দা : এই সকল আয়াতে কামেল ব্যক্তিদের অনেক গুণাবলী বর্ণনা

করা হইয়াছে এবং তাহাদের জন্য আল্লাহ তায়ালা নিকট দুনিয়ার নেয়ামতসমূহ হইতে অনেক গুণ উত্তম যাহা কিছু রহিয়াছে উহার ওয়াদা করা হইয়াছে। ওলামায়ে কেরাম লিখিয়াছেন : **لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ** হইতে পরবর্তী আয়াতগুলিতে ধারাবাহিকভাবে খোলাফায়ে রাশেদীন (রাযিঃ)দের বিশেষ গুণাবলী এবং সেই সময়কার অবস্থার দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) হইতে হযরত আলী (রাযিঃ) বরং হযরত হাসান ও হুসাইন (রাযিঃ) পর্যন্ত সময়ের অবস্থা দ্বারা পর্যায়ক্রমে খোলাফতের তরতীবের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

সেই তরতীব ও পর্যায়ক্রম অনুসারেই গুণাবলী ও অবস্থার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে ; যেই তরতীবে তাহাদের খোলাফত পরিচালিত হইয়াছে। আর এই আয়াতগুলিতে ইঙ্গিতে খোলাফায়ে রাশেদীনদের জন্য আখেরাতে বহু পুরস্কারের ওয়াদাও করা হইয়াছে। তবে আয়াতে ব্যবহৃত শব্দাবলীর ব্যাপকতার দ্বারা এই সমস্ত ওয়াদা ঐ সকল লোকদের জন্যও প্রমাণিত হয়, যাহারা নিজেদের মধ্যে এই সমস্ত গুণাবলী পয়দা করার চেষ্টা করিবে। হায় ! যদি আমাদের মুসলমানদের দ্বীনের প্রতি উৎসাহ এবং কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত সার্বাঙ্গম আখলাকসমূহ তালাশ করিয়া নিজেদের মধ্যে পয়দা করার আগ্রহ হইত ! কিন্তু আমাদের চারিত্রিক অধঃপতন এত বেশী হইতেছে বরং হইয়া গিয়াছে, যাহা দেখিয়া অমুসলিমদেরও ইসলামের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হইতেছে। এই বেচারাদের ইহা জানা নাই যে, আজ মুসলমানরা ইসলামী আখলাকের উপর চলিতেছে না। তাহারা মুসলমানদের যে চরিত্র দেখিতেছে, উহাকে ইসলামী চরিত্র বলিয়া মনে করিতেছে। সকল অভিযোগ একমাত্র আল্লাহরই দরবারে।

﴿ ১৩ ﴾ **وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ** **وَالسَّعْيِدِ** (মায়াত-১৫) **أَوَّلُ مَا لَكَ مِنْ سُلْطَانٍ**

﴿ ২৩ ﴾ এবং তাহাদের সম্পদের মধ্যে সওয়ালকারীদের এবং (যাহারা সওয়াল না করে এইরূপ) অসহায় লোকদের হক রহিয়াছে।

(যারিয়াত : ১৯)

ফায়দা : পূর্ব হইতে পরিপূর্ণ ঈমানদারদের বিশেষ গুণাবলী বর্ণিত হইয়া আসিতেছে। সেই প্রসঙ্গে তাহাদের আরও একটি বিশেষ গুণ ইহাও যে, তাহারা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে এত অধিক পরিমাণে দান-খয়রাত করিয়া থাকে, যেমন উহা তাহাদের জিম্মায় অবশ্য কর্তব্য হইয়া গিয়াছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, তাহাদের সম্পদের মধ্যে হক রহিয়াছে—ইহার অর্থ, যাকাত ব্যতীত ঐ সম্পদ যাহা দ্বারা সে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে, মেহমানদের দাওয়াত করে এবং বঞ্চিত লোকদের সাহায্য করে।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, উক্ত আয়াতে যাকাত ব্যতীত অন্যান্য খরচ বৃদ্ধান হইয়াছে।

ইবরাহীম (রহঃ) বলেন, ঐ সমস্ত লোক তাহাদের সম্পদে যাকাত ব্যতীত আরও হক রহিয়াছে বলিয়া মনে করেন।

ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, বঞ্চিত হইল, ঐ দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তি, যে দুনিয়া তালাশ করে অথচ দুনিয়া তাহার নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং লোকদের নিকট সওয়াল করে না।

অন্য এক রেওয়াযাতে ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, বঞ্চিত ঐ ব্যক্তি যাহার বাইতুল-মালে কোন অংশ থাকে না।

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, বঞ্চিত হইল, ঐ অভাবী ব্যক্তি, যাহার আয় তাহার জন্য যথেষ্ট হয় না।

আবু কেলাবা (রহঃ) বলেন, ইয়ামামা এলাকায় এক ব্যক্তি ছিল। একবার বন্যা আসিল এবং তাহার সমস্ত ধন-সম্পদ ভাসাইয়া লইয়া গেল। এক সাহাবী (রাযিঃ) বলিলেন, এইরূপ ব্যক্তিকে বঞ্চিত বলা হয়। তাহার সাহায্য করা চাই।

হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন, মিসকীন ঐ ব্যক্তি নয়, যে একটি লোকমার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ায় অর্থাৎ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। বরং আসল মিসকীন ঐ ব্যক্তি, যাহার নিকট স্বয়ং এই পরিমাণ মাল নাই যাহা তাহার প্রয়োজন মিটাইতে পারে ; অথচ লোকেরা তাহার অবস্থা জানে না যে, তাহার সাহায্য করা প্রয়োজন। এইরূপ ব্যক্তিই প্রকৃত বঞ্চিত।

হযরত ফাতেমা বিনতে কায়েস (রাযিঃ) হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, সম্পদের মধ্যে যাকাত ব্যতীত আরও হক রহিয়াছে। (দুররে মানসুর)

এই হাদীস এই পরিচ্ছেদের হাদীসের বিবরণে ১৬নম্বরে আসিতেছে। অতঃপর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন : لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ الْاِيَةِ (বাকারা : ১৭৭) এই আয়াতের অংশবিশেষ দুই নম্বর আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত আয়াতে

মিসকীন ও অন্যান্যদেরকে দান করিবার বিষয় পৃথকভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে এবং যাকাত আদায়ের বিষয় পৃথকভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতে এই কথাই প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে যে, মানুষ যেন শুধু যাকাত আদায় করাকেই যথেষ্ট মনে না করে ; বরং যাকাত ছাড়াও নিজের সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় বেশী বেশী খরচ করা উচিত। কিন্তু আজ আমাদের জন্য শুধু যাকাত আদায় করাই কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কত মুসলমান এমন রহিয়াছে, যাহারা যাকাতও আদায় করে না, কিন্তু শাদী-বিবাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে অনর্থক রসম-রেওয়াজে নিজের বাড়ী বন্ধক রাখিতেও প্রস্তুত রহিয়াছে, যেখানে দুনিয়াতে সম্পদ বরবাদ হয় এবং আখেরাতে গুনাহের বোঝা হয়।

﴿ ২৩ ﴾ اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ
وَ اٰتِقُوْا رِمًاۤ جَعَلَكُمْ
مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِۦ ۚ فَاَلْدِيْنَ
اٰمِنُوْا مِنْكُمْ وَ اٰتِقُوْا لَهُمْ
اَجْرًا كَثِيْرًا ﴿ صِدْق ۱ ﴾

তম লোক আল্লাহর প্যাস কেরে رسول پر ایمان لاء
اور جس مال میں اس نے تم کو دوسرے کا تم قما
بنایا ہے اس میں سے (اس کی راہ میں) خرچ کرو
جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور (انہوں نے
ان کی راہ میں) خرچ کیا ان کیلئے بہت بڑا اجر ہے۔

﴿ ২৪ ﴾ তোমরা আল্লাহর প্রতি এবং তাহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন কর এবং যেই সম্পদে তিনি তোমাদিগকে অন্যদের স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন উহা হইতে (আল্লাহর পথে) খরচ কর। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনিবে এবং (আল্লাহর পথে) খরচ করিবে তাহাদের জন্য অনেক বড় সওয়াব রহিয়াছে। (হাদীদ : ৭)

কায়দা : স্থলাভিষিক্ত করার অর্থ এই যে, পূর্বে এই সম্পদ অন্য কাহারও নিকট ছিল। এখন কয়েক দিনের জন্য তোমাদের নিকট আছে, তোমাদের চক্ষু বন্ধ হইয়া যাওয়ার পর আবার অন্য কাহারও নিকট চলিয়া যাইবে। এইরূপ অবস্থায় উহাকে জমা করিয়া রাখা অনর্থক। এই কমজাত সম্পদ চিরদিন না কাহারও নিকট থাকিয়াছে আর না থাকিবে। তবে ভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি যে উহাকে নিজের নিকট রাখিবার উপায় করিয়া লয়। আর সে উপায় একমাত্র ইহাই হইতে পারে যে, উহাকে আল্লাহ তায়ালার ব্যাংকে জমা করিয়া দিবে। সেখানে ধ্বংস হইবার কোন আশংকা নাই এবং হাতছাড়া হইয়া যাইবারও ভয় নাই। নতুবা দুনিয়াতে থাকা অবস্থায় সবসময় আশংকাই আশংকা থাকে। আজকাল তো আল্লাহ তায়ালার স্বচক্ষে দেখাইয়া দিয়াছেন যে, বড় বড় অট্টালিকা, বড় বড় জমিদারী,

পাওয়া যায়। অতঃপর উক্ত আয়াতে এই বিষয়ে সতর্ক করা হইয়াছে যে, যাহারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে আল্লাহ তায়ালাকে কাজে খরচ করিয়াছে অথবা জিহাদ করিয়াছে, তাহারা তাহাদের তুলনায় মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ যাহারা মক্কা বিজয়ের পরে খরচ করিয়াছে বা জিহাদ করিয়াছে। কেননা, মক্কা বিজয়ের পূর্বে প্রয়োজন বেশী ছিল আর যে জিনিস বেশী প্রয়োজনের সময় খরচ করা হইবে সওয়াবও তত বেশী হইবে। যেমন, হাদীসের বিবরণে ১৩ নম্বরে আসিতেছে। কাজেই প্রয়োজনের সময় খরচ করার বিষয়ে খুবই খেয়াল রাখা উচিত এবং যখন অন্যদের প্রয়োজন হয়, তখন খরচ করাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করা উচিত। আল্লাহ তায়ালা সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)দের মধ্যেও এই তারতম্য করিয়া দিয়াছেন যে, যাহারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে খরচ করিয়াছে তাহাদের সওয়াব অনেক বেশী বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। এমনভাবে সবসময় খেয়াল রাখা উচিত যে, কাহারও প্রয়োজনের সময় তাহার জন্য খরচ করা অনেক উচু কাজ।

(۲۶) مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَمَّا وَلَدَ أَجْرُكُمْ ۖ ﴿٢٦﴾
 (سورہ مدیہ - رکعت ۲)
 کون شخص ہے ایسا جو اللہ جل شانہ کو قرضِ حسنہ دے پھر اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو اس کے لئے بڑھاتا چلا جاتے اور اس کیلئے بہترین بدلہ ہے۔

২৬ কে আছে এমন, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিবে? অনন্তর আল্লাহ তাআলা তাহার জন্য উহার সওয়াব বৃদ্ধি করিতে থাকেন এবং তাহার জন্য রহিয়াছে উত্তম বিনিময়। (হাদীদ : ১১)

ফায়দা ৪ ৫ নম্বরে একটি আয়াত এই আয়াতের সমার্থক বর্ণিত হইয়াছে। বিশেষ গুরুত্বের কারণে এই বিষয়টিকে পুনরায় এরশাদ করিয়াছেন এবং কুরআন পাকে বারবার ইহার উপর সতর্ক করা হইতেছে যে, আজ্ঞা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিবার সুযোগ রহিয়াছে, যাহা খরচ করিতে হয় করিয়া লও, মৃত্যুর পর আফসোস করা ছাড়া কিছুই নাই।

(۲۷) اِنَّ الْمُحْسِنِيْنَ وَالْمُحْسِنَاتِ
 وَافْرُسُوا اللّٰهَ قَرۡبًا عَسَا
 يُضَفِّفُ لَهُمۡ وَلَهُمۡ اَجْرٌ
 كَرِيۡمٌ ○ (عیدہ رکوع ۲)

(۲۹) نیٹ سمنہ دے دان-خیراتکاری پورہ و دان-خیراتکاریگی
مہیلاگن (اےوے اے دان-خیراتکاریگن) آلاہ تاہیلاکے اڈوم و
دان کریتہے۔ تاہادےر سوہاےر بڈی کرہیا دےوہا ہہیے اےوے
تاہادےر جنہ اڈوم اڈیدان رہیہاے۔ (ہادیہ : ۱۷)

فائدہ : اٹھا، تاہارا دان-خیرات کرے تاہارا اڈومپنے آلاہ
تاہیلاکے کڈ دے۔ اےہجنہ یے، اےہو کڈےر مڈ دانکاریدےرکے
فیرہیا دےوہا ہہی۔ اڈاےو، اےہ دان انےک وےہی وینیمہ و اڈیدان
سہ اےمن سمنہ فیرہیا آسہیے، یکن دانکاریدےر کٹین اڈاے و
اڈاڈ اڈوڈن و اسہاےر اڈا ہہیے۔ مانہ ویاہ-شاہی، سہر و
انہانہ اڈوڈنہر خاٹہر کڈ کڈ کرہیا ڈما کرہیا راہے یے،
اڈوم اڈوڈنہر سمنہ آسہیے۔ سڈانہر ویاہہر جنہ سہسمنہ
ٹڈا-فیکہر ڈاگہیا ڈاے۔ یکنہ سہوگ ہہ کڈ نا کڈ کاہڈ
اڈاڈاےر اڈاڈاےر خرد کرہیا راہیے ڈاے۔ تاہاےر اڈوڈنہر سمنہ
اسوہیہ نا ہہی۔ اڈا آٹہراےر سمنہ ڈاے اےمن کٹین اڈوڈن و
اڈاےر سمنہ یے، ڈکن کاہار و نکاٹ ہہیے رڈ کرہا یاہیے نا،
کڈ لہوہا یاہیے نا، ڈکا کرہا یاہیے نا۔ اےہرگن وڈوڈن و کٹین
سمنہر جنہ ڈاے ڈاے وےہی سڈا ڈما کرہیے ڈاے اڈاڈ دہرڈاٹا و
کاڈےر کاڈ ہہیے۔ اڈا اڈا کرہیا ڈما کرہیے ڈاکیلے اڈانہ
تاہا وڈا و یاہیے نا ; اڈا سہانہ اڈا پاہاڈ ہرماہ ملہیے۔

۱۸ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِالْآثَارِ
وَالْإِيمَانِ مِنْ قَبْلِهِمْ
يَعْبُثُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ
وَلَا يَجِدُونَ فِي هُدُورِهِمْ
خَلْعَةً مِمَّا آوَوْا وَيُؤْثِرُونَ
عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ
خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوَفِّي
شَخْخَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ

اےہ سمنہ ان رگن کاہی و ہہر رگن
ہہر سمنہ ہہر سمنہ ہہر سمنہ
ہہر سمنہ ہہر سمنہ ہہر سمنہ
ہہر سمنہ ہہر سمنہ ہہر سمنہ
ہہر سمنہ ہہر سمنہ ہہر سمنہ
ہہر سمنہ ہہر سمنہ ہہر سمنہ
ہہر سمنہ ہہر سمنہ ہہر سمنہ
ہہر سمنہ ہہر سمنہ ہہر سمنہ
ہہر سمنہ ہہر سمنہ ہہر سمنہ
ہہر سمنہ ہہر سمنہ ہہر سمنہ
ہہر سمنہ ہہر سمنہ ہہر سمنہ

کونچا پر ترجیح دیتے ہیں چاہے خود کوں پر فاقہ

(سیدہ شہر-رکعت ۱)

کیوں نہ ہو اس قدر کہ جس شخص اپنی بیعت کے لئے کسی سے غنڈہ بھدوی و گنڈالار پہنچا دے۔

(২৮) (আর উহাতে তাহাদেরও হক রহিয়াছে) যাহারা দাকুল ইসলামে (অর্থাৎ, মদীনা মুনাওয়াযায় পূর্ব হইতে অবস্থান করিয়া আসিতেছে) এবং ঈমানের মধ্যে উহাদের (মুহাজিরদের আগমনের) পূর্ব হইতে অটল রহিয়াছে (অর্থাৎ, মুহাজিরদের আগমনের পূর্বেই তাহারা ঈমান আনিয়াছিল। আর ইহারা এইরূপ গুণাবলীর অধিকারী লোক যে) যাহারা তাহাদের নিকট হিজরত করিয়া আসে, তাহাদিগকে ইহারা (অর্থাৎ আনসাররা) ভালবাসে, আর মুহাজিরগণ যাহা কিছু লাভ করে ইহারা তজ্জন্য মনে কোন স্বার্থ পোষণ করে না (অর্থাৎ, উহা লইতে চাওয়া অথবা উহার উপর ঈর্ষা পোষণ করা) এবং মুহাজিরদিগকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দান করে ; যদিও তাহারা ক্ষুধাতই থাকে। আর প্রকৃতপক্ষে যে নিজের স্বভাবগত কৃপণতা হইতে রক্ষিত থাকিবে ; এইরূপ লোকেরাই সফলকাম হইবে। (হাশ্ব : ৯)

ফায়দা : উপরোক্ত আয়াতসমূহে বায়তুল-মালের হকদারদের সম্পর্কে আলোচনা চলিতেছে। অর্থাৎ, উহার মধ্যে কাহাদের হক রহিয়াছে? তাহাদের সহিত এই আয়াত শরীফে আনসারদের আলোচনা করা হইয়াছে এবং তাহাদের বিশেষ গুণাবলীর দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি গুণ এই যে, তাহারা নিজেদের ঘরে থাকিয়া ঈমান ও অন্যান্য গুণাবলী হাসিল করিয়াছে। নিজেদের ঘরে থাকিয়া গুণাবলী হাসিল করা সাধারণতঃ কঠিন হইয়া থাকে। দুনিয়াবী ব্যস্ততা ও অন্যান্য কাজ-কর্ম অধিকাংশ সময় বাধা হইয়া থাকে। আনসারদের আরেকটি বিশেষ গুণ এই যে, তাহারা মুহাজিরদিগকে অত্যন্ত ভালবাসেন। ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাস সম্পর্কে যাহার জ্ঞানা আছে, সে এই সকল ব্যুর্গগণের অবস্থা এবং তাহাদের মহব্বতের ঘটনাবলী দ্বারা হতবাক হইয়া যায়। কিছু ঘটনা হেকায়াতে সাহাবা কিতাবেও বর্ণিত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ একটি ঘটনা এখানে লিখিতেছি।

যখন হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করিয়া মদীনা শরীফে আগমন করিলেন, তখন হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে এইভাবে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক করিয়া দিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক আনসারীর সহিত একজন মুহাজিরের বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করিয়া দিয়াছিলেন এবং একেকজন মুহাজিরকে একেকজন

আনসারীর ডাই বানাইয়া দিয়াছিলেন। কারণ, মুহাজিরগণ পরদেশী ছিলেন, অপরিচিত জায়গায় তাহারা বিভিন্ন রকম সমস্যার সম্মুখীন হইবেন। আনসারগণ হইলেন, স্থানীয়, তাহারা যদি এই মুহাজিরদের বিশেষভাবে খোঁজ-খবর রাখেন ও সহযোগিতা করেন, তবে তাহাদের জন্য সমস্ত কাজ সহজ হইয়া যাইবে। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন সুন্দর ব্যবস্থা করিলেন, ইহাতে মুহাজিরদেরও সবরকম সুবিধা হইয়া গেল আর আনসারদেরও কষ্ট হইল না। কেননা, একজনের খোঁজ-খবর রাখা প্রত্যেকের পক্ষে সহজ।

এই প্রসঙ্গে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাযিঃ) স্বয়ং নিজের ঘটনা বর্ণনা করেন যে, যখন আমরা মদীনা শরীফে আসিলাম, তখন হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ও সাদ ইবনে রবী (রাযিঃ)এর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক জুড়িয়া দিলেন। সাদ ইবনে রবী (রাযিঃ) আমাকে বলিলেন, আমি আনসারদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী সম্পদশালী। আমার সম্পদ হইতে অর্ধেক তুমি লইয়া লও এবং আমার দুই বিবি রহিয়াছে, তাহাদের মধ্য হইতে যাহাকে তোমার পছন্দ হয়, আমি তাহাকে তালাক দিয়া দিব। যখন তাহার ইদত পূরা হইয়া যাইবে, তুমি তাহাকে বিবাহ করিয়া লইবে। (দুররে মানসুর)

ইয়াযীদ ইবনে আসাম (রহঃ) বলেন, আনসারগণ হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দরখাস্ত করিলেন, আমাদের সকলের জমিন মুহাজিরদের মধ্যে সমানভাবে বন্টন করিয়া দিন। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহা কবুল করিলেন না বরং এরশাদ করিলেন যে, ক্ষেত-বামারে মুহাজিরগণ কাজ করিবে আর ফসলের মধ্যে তাহারা অংশীদার হইবে। তাহাদের মেহনতের দ্বারা তোমাদের সাহায্য হইবে এবং তোমাদের জমিনের দ্বারা তাহাদের সাহায্য হইবে। এই ধরনের সম্পর্ক এবং পরস্পর ভালবাসা শুধুমাত্র স্বীকৃত ভ্রাতৃত্বের কারণে হইবে, বর্তমানে ইহা বুঝে আসাও কঠিন। আশ্চর্যের বিষয় যাহাদের একমাত্র বৈশিষ্ট্য ও গুণ ছিল অপরকে প্রাধান্য দেওয়া এবং পরস্পর সহানুভূতি প্রদর্শন করা, আজ সেই মুসলমানরা শুধু স্বার্থপরতা এবং নিজের খায়েশ পূরা করার মধ্যে লিপ্ত রহিয়াছে। নিজের আরামের জন্য অন্যের যতই কষ্ট হউক, তাহাতে কিছু আসে যায় না। এক সময় মুসলমানের চরিত্র এই ছিল যে, নিজের কষ্ট করিয়া অন্যকে আরাম পৌছাইত। মুসলমানদের ইতিহাস এইসব ঘটনাবলী দ্বারা পরিপূর্ণ রহিয়াছে।

এক বুযুর্গের স্ত্রী রক্ষা স্বভাবের ছিল। সবসময় কষ্ট দিত। জনৈক

ব্যক্তি সেই ব্যুর্গের নিকট আরজ করিল, আপনি তাহাকে তালুক দিয়া দিন। তিনি বলিলেন, আমার ভয় হয়—পরবর্তীতে সে অন্য কাহারো সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইবে এবং তাহার ক্রুদ্ধ স্বভাবের কারণে সেই ব্যক্তি কষ্ট পাইবে। (এইইয়া)

কত সূক্ষ্ম বিষয়, আজ আমাদের মধ্যে কেহ কি এইজন্য কষ্ট স্বীকার করিতে তৈয়ার আছে, যাহাতে অন্য কাহারও কষ্ট না হয়।

উক্ত আয়াতে আনসারদের তৃতীয় গুণ এই বর্ণনা করা হইয়াছে যে, মুহাজিরগণ গনিমত ইত্যাদি হইতে কোন কিছু পাইলে আনসারদের অন্তরে কোনরূপ মনোকষ্ট বা ঈর্ষা হইত না।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, ইহার অর্থ হইল, মুহাজিরদিগকে আনসারদের উপর সাধারণভাবে যে ফযীলত দেওয়া হইয়াছে, ইহাতে আনসারদের কোনরূপ খারাপ লাগিত না।

চতুর্থ গুণ এই বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তাহারা নিজেদের প্রয়োজন ও ক্ষুধা সত্ত্বেও অন্যকে নিজের উপর প্রাধান্য দিতেন। এই সব ঘটনা অনেক বেশী পরিমাণে তাহাদের জীবন ইতিহাসে পাওয়া যায়। যাহার মধ্য হইতে কিছু ঘটনাবলী আমি আমার কিতাব হেকায়াতে সাহাবা কিতাবে 'অন্যকে নিজের উপর প্রাধান্য দান ও সহানুভূতি'র অধ্যায়ে লিখিয়াছি। উহার মধ্যে সেই প্রসিদ্ধ ঘটনাও রহিয়াছে, যাহা এই আয়াতের শানে নুযুলে উল্লেখ করা হইয়া থাকে। উহা এই—

এক ব্যক্তি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া ক্ষুধা ও অভাবের অভিযোগ করিল। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবিদের ঘরে লোক পাঠাইলেন। কিন্তু কোথাও খাওয়ার কিছু পাওয়া পেল না। তখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহিরে পুরুষদেরকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, এমন কেহ আছে কি? যে এই ব্যক্তিকে মেহমান হিসাবে লইয়া যাইবে? কোন কোন বর্ণনা মতে আবু তালহা (রাযিঃ) নামে একজন আনসারী সাহাবী তাহাকে নিজের ঘরে লইয়া গেলেন এবং স্ত্রীকে বলিলেন, এই ব্যক্তি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহমান। তাহার খুব সমাদর কর এবং ঘরের কোন কিছু তাহাকে না দিয়া রাখিয়া দিও না। স্ত্রী বলিলেন, ঘরে তো শুধু বাচ্চাদের জন্য কিছু খাবার রাখা আছে, আর কিছুই নাই। হযরত আবু তালহা (রাযিঃ) বলিলেন, বাচ্চাদেরকে ডুলাইয়া খুম পাড়াইয়া দাও। অতঃপর আমরা যখন খানা লইয়া মেহমানের সহিত বসিব, তখন তুমি বাতি ঠিক করিবার জন্য উঠিয়া উহাকে নিড়াইয়া দিও। যাহাতে আমরা খাওয়া

হইতে বিরত থাকি আর মেহমান খাইয়া লয়। সুতরাং তাহার স্ত্রী এইরূপই করিলেন। সকাল বেলা যখন ছয়ুর্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন, তখন ছয়ুর্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের স্বামী-স্ত্রী উভয়ের আচরণ বড় পছন্দ করিয়াছেন। আর উপরোক্ত আয়াত তাহাদের ব্যাপারে নাযিল হইয়াছে। (দুররে মানসূর)

হাদীসের বিবরণে ১৩ নম্বরে উক্ত আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে একটি হাদীস আসিতেছে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা পবিত্র এরশাদ হইল, যাহাকে তাহার স্বভাবগত শূহ্ অর্থাৎ লোভ-লালসা হইতে রক্ষা করা হইয়াছে তাহারাই সফলকাম হইবে। শূহ্ শব্দের অর্থ স্বভাবজাত লোভ ও কপণতা। অর্থাৎ, স্বভাবের মধ্যে কপণতা থাকে ; যদিও কার্যত কপণতা হয় না। এই কারণেই উলামায়ে কেরাম হইতে ইহার ব্যাখ্যায় বিভিন্ন শব্দ বর্ণিত হইয়াছে। ইহাকে লোভ ও লালসার অর্থে ব্যবহার করা ঠিক আছে। আর এই লোভ-লালসা নিজের সম্পদের মধ্যেও হইতে পারে এবং অন্যের সম্পদের মধ্যেও হইতে পারে।

এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ)এর খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন, আমি তো ধবংস হইয়া গিয়াছি। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন? সে বলিতে লাগিল, আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন, যাহাকে শূহ্ হইতে রক্ষা করা হইবে, সে ব্যক্তিই সফলকাম হইবে। আর আমার মধ্যে এই রোগ পাওয়া যায়। আমার মনে চায় না যে, আমার নিকট হইতে কোন জিনিস চলিয়া যায়। হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলিলেন, ইহা শূহ্ নয়, ইহা হইল, বুখল (কপণতা)। যদিও বুখলও ভাল জিনিস নয়। আর শূহ্ হইল, অন্যের সম্পদ জুলুম করিয়া খাওয়া।

হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতেও প্রায় এইরূপই বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলেন, মানুষের নিজের সম্পদ খরচ না করা শূহ্ নয়, ইহা হইল, বুখল এবং ইহাও অনেক খারাপ জিনিস। কিন্তু শূহ্ হইল, অন্যের জিনিসের প্রতি দৃষ্টিপাত করা।

হযরত তাউস (রহঃ) বলেন, কপণতা হইল, নিজের মাল খরচ না করা। আর লোভ হইল, অন্যের মালের মধ্যে কপণতা করা। অর্থাৎ, অন্য কোন ব্যক্তি খরচ করিলে উহাতেও মনে কষ্ট হয়।

হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, লোভ কপণতা হইতে বেশী কঠিন। এই জন্য যে, কপণ শুধু নিজের মাল খরচ

করে না, আর লোভী নিজের মালও খরচ করে না আবার এই কামনাও করে যে, অন্যদের কাছে যাহা কিছু আছে উহাও যেন তাহার নিকট আসিয়া যায়।

এক হাদীসে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করা হইয়াছে, যে ব্যক্তির মধ্যে তিনটি অভ্যাস রহিয়াছে সে লোভ হইতে পবিত্র। মালের যাকাত আদায় করে, মেহমানের মেহমানদারী করে এবং বিপদের সময় মানুষের সাহায্য করে।

অন্য এক হাদীসে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে, ইসলামকে কোন জিনিস এরূপ ধ্বংস করে না, যে রূপ লোভ-লালসা ধ্বংস করে।

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, আল্লাহর রাস্তার ধূলা এবং জাহান্নামের ধূয়া এই দুই জিনিস কোন এক ব্যক্তির পেটে জমা হইতে পারে না। তদ্রূপ, ঈমান ও লোভ-লালসা কোন এক ব্যক্তির অন্তরে কখনও জমা হইতে পারে না।

এক হাদীসে হযরত জাবের (রাযিঃ) হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন, জুলুম হইতে বিরত থাক। কেননা, জুলুম কিয়ামতের দিন ঘন অন্ধকার হইবে। (অর্থাৎ, উহা এমন কঠিন অন্ধকার পয়দা করিবে যে, স্তরে স্তরে অন্ধকার জমিয়া যাইবে) এবং নিজেকে লোভ-লালসা হইতে রক্ষা কর। কেননা, উহা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে ধ্বংস করিয়াছে। আর উহারই কারণে তাহারা অন্যের রক্ত প্রবাহিত করিয়াছে এবং উহারই কারণে নিজেদের মাহরাম অর্থাৎ বিবাহ নিষিদ্ধ মহিলাদের সহিত ব্যভিচার করিয়াছে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন, নিজেকে লোভ-লালসা এবং কপণতা হইতে রক্ষা কর। কেননা, উহা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের দ্বারা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করাইয়াছে, তাহাদের দ্বারা নিজেদের বিবাহ নিষিদ্ধ মহিলাদের সহিত ব্যভিচার করাইয়াছে এবং তাহাদের দ্বারা রক্তপাত করাইয়াছে। অর্থাৎ, মানুষ যদি অপরিচিতা মহিলার সহিত ব্যভিচার করে, তবে তাহাকে কিছু বিনিময় দিতে হয় আর কন্যার সহিত ব্যভিচার করিলে বিনা পয়সায় কাজ হইয়া যায়, আর সম্পদের কারণে লুটতরাজ তো জানা কথা।

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, এক ব্যক্তির ইন্তেকাল হইল। লোকেরা বলিতে লাগিল, এই লোকটি বেহেশতী মানুষ ছিল। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের কি তাহার সমস্ত অবস্থা জানা

আছে? হইতে পারে কখনও সে অনর্থক কথা বলিয়াছে অথবা এমন জিনিসে কার্পণ্য করিয়াছে যাহাতে তাহার কোন লাভ নাই।

অন্য হাদীসে এই ঘটনা এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে যে, ওহুদের যুদ্ধে এক ব্যক্তি শহীদ হইয়া গেল। জনৈকা মহিলা তাহার নিকট আসিয়া বলিতে লাগিল, বেটা! তোমার জন্য শহীদী মর্যাদা মোবারক হউক। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি কি জ্ঞান? হয়ত সে কোন অহেতুক কথা বলিয়াছে অথবা এমন কোন জিনিসে কার্পণ্য করিয়াছে যাহাতে তাহার কোন প্রয়োজন ছিল না। (দুররে মানসূর) অর্থাৎ, এমন সাধারণ জিনিসে কৃপণতা করাও চরম পর্যায়েৰ লোভ-লালসার কারণে হইয়া থাকে। নচেৎ এমন সাধারণ জিনিসে যাহাতে নিজের কোন ক্ষতি নাই, কার্পণ্য করার কথা নয়।

اسے ایمان والا کہتم کہ تمہارے دل اور تہمتی طاف
اللہ کی یاد سے غافل نہ کرو، اور جو ایسا
کر گیا، ایسے ہی لوگ خسارہ دلہے میں اور جو کچھ
ہم نے تم کو دیاتے ہیں اس سے پہلے پہلے
خفیہ کر لو کہ تم میں سے کسی کی موت آجاتے
اور وہ کہنے لگے، اسے میرے رب کچھ کو تھوڑے
دن کی اور مہلت کیوں نہ دے دی کہ میں خیرات
کر دیتا، اور نیک لوگوں میں ہو جاتا، اور
اللہ جل شانہ کسی شخص کو بھی جب اس کی
موت کا وقت آجاتے ہو تو مہلت نہیں
دیتا، اور اللہ تعالیٰ کہ تمہارے سب کلموں
کی خبر ہے :

(٢٩) يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا
لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَ
لَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ
هُمُ الْخَاسِرُونَ ○ وَأَنْفِقُوا
مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ
يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ
فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي
إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَقَسَقَ
وَأَكُنَّ مِنَ الْخَالِعِينَ ○ وَلَنْ
يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ
أَجَلُهَا ○ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ ○ (مجادل - ٢٩)

২৯) হে মুমিনগণ! তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সম্ভান-সম্মতি যেন তোমাদিগকে আল্লাহর স্মরণ হইতে গাফেল করিয়া না দেয়। আর যাহারা এইরূপ করিবে, তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত। আর যাহা আমি তোমাদিগকে দান

করিয়াছি উহা হইতে এমন সময় আসার পূর্বে খরচ কর, যখন তোমাদের কাহারো মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয় আর সে বলে, হে আমার রবব! আমাকে কেন আরও কিছুদিনের অবকাশ প্রদান করিলেন না যে, আমি দান-খয়রাত করিয়া লইতাম এবং নেক লোকদের অন্তর্ভুক্ত হইতাম। আর আল্লাহ তায়ালা কাহাকেও কখনও অবকাশ দেন না; যখন তাহার মৃত্যুর সময় আসিয়া যায়। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সমস্ত কার্যাবলী সম্বন্ধে পূর্ণ অবহিত আছেন। (মুনাফিকুন : ৯-১১)

ফায়দা : ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির ব্যস্ততা এমন জিনিস, যাহা আল্লাহ তায়ালা হুকুমসমূহ পালনের ব্যাপারে ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণ হইয়া যায়। কিন্তু এই কথা নিশ্চিত ও চূড়ান্ত যে, মৃত্যুর সময় কাহারও জানা নাই যে, উহা কখন আসিয়া পড়ে। তখন আক্ষেপ ও আফসোস ব্যতীত আর কিছুই সম্ভব হইবে না এবং চোখের সম্মুখে সন্তান-সন্ততি, ধন-সম্পদ সবকিছুকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে। এখনও সুযোগ আছে যাহা করিবার করিয়া লও।

رنگالے نہ چُنڈیا، گندھالے نہ سی
تو کیا کیا کرے گی ازی دن کے دن
نہ جانے بلالے پیا کس گھر سی
تو دیکھا کرے گی کھر سی دن کے دن

অর্থ : এখনও তুই উড়না রঙাইলি না, চুল বাঁধিলি না; আরে দিনের শেষে তুই কোন্ কোন্টা করিবি! জানা নাই, কোন্ মুহূর্তে প্রিয়জন তোরে ডাকিয়া বসে। সময় শেষে তখন শুধু দাঁড়াইয়া চাহিয়া থাকিবি।

হযরত ইবনে আক্বাস (রাযিঃ) বলেন, হযুর সাব্বাহ আল্লাহইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তির নিকট এই পরিমাণ সম্পদ থাকে যে, সে হজ্জ করিতে পারে, তাহার উপর যাকাত ওয়াজিব হয়; অথচ সে উহা আদায় করে না, তবে সে মৃত্যুর সময় দুনিয়াতে ফিরিয়া আসিবার আকাঙ্ক্ষা করিবে।

এক ব্যক্তি ইবনে আক্বাস (রাযিঃ)কে বলিল, কাফের দুনিয়াতে ফিরিয়া আসিবার আকাঙ্ক্ষা করে; মুসলমান করে না। তখন হযরত ইবনে আক্বাস (রাযিঃ) উক্ত আয়াত তেলাওয়াত করিলেন। কেননা, উহাতে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের সম্পর্কে বলিয়াছেন।

অন্য এক হাদীসে ইবনে আক্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে, উক্ত আয়াতে মুমিন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। যখন তাহার মৃত্যু আসিয়া পড়ে এবং তাহার নিকট যাকাত ওয়াজিব হয় পরিমাণ সম্পদ থাকে আর সে যাকাত আদায় করে নাই, অথবা তাহার উপর হজ্জ ফরজ

৩৫ হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় করিতে থাক, আর প্রত্যেক ব্যক্তি যেন চিন্তা করিয়া লয় যে, সে কাল (কিয়ামতের) দিনের জন্য কি জিনিস প্রেরণ করিয়াছে। আল্লাহকে ভয় করিতে থাক, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সমস্ত আমলের খবর রাখেন। ঐ সমস্ত লোকের মত হইও না, যাহারা আল্লাহকে ভুলিয়া গিয়াছে। অতএব (উহার শাস্তি স্বরূপ) আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং তাহাদিগকে তাহাদের নিজেদের সম্বন্ধে ভুলাইয়া দিয়াছেন। ইহারাই নাফরমান। (আর স্মরণ রাখিও,) জাহান্নামের অধিবাসীগণ ও দোযখের অধিবাসীরা সমান হইতে পারে না। জাহান্নামের অধিবাসীগণই সফলকাম (প্রকৃত সফলতা একমাত্র জাহান্নামবাসীগণের জন্যই)। (হাশর : ১৮-২০)

ফারদা : আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে তাহাদের সম্বন্ধে ভুলাইয়া দিয়াছেন—ইহার অর্থ হইল, তাহাদের বিবেক-বুদ্ধি এমনভাবে ধ্বংস করা হইয়াছে যে, তাহারা নিজেদের লাভ-লোকসানও বুঝে না এবং যে সমস্ত জিনিস তাহাদের জন্য ক্ষতিকর তাহারা উহাকে গ্রহণ করে।

হযরত জারীর (রাযিঃ) বলেন, আমি দুপুরের সময় হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় মুজার গোত্রের একটি জামাত হাজির হইল। যাহারা নগ্ন পা, খালি শরীর ও ক্ষুধার্ত ছিল। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাহাদিগকে ক্ষুধার্ত দেখিলেন, তখন তাঁহার নূরানী চেহারা পরিবর্তন হইয়া গেল। উঠিয়া ঘরে তشرীফ লইয়া গেলেন। (সম্ভবতঃ ঘরে তাহাদের উপযুক্ত কোন জিনিস তালাশ করিবার জন্য তشرীফ লইয়া গিয়াছিলেন।) অতঃপর বাহিরে মসজিদে তشرীফ আনিলেন। হযরত বেলাল (রাযিঃ)কে আযান দেওয়ার হুকুম দিলেন এবং যোহরের নামায পড়িলেন। তারপর মিন্বরে আরোহন করিলেন এবং আল্লাহ তায়ালায় হামদ ও ছানা করিবার পর কুরআন পাকের কয়েকটি আয়াত তেলাওয়াত করিলেন। তন্মধ্যে উপরোক্ত আয়াতগুলিও ছিল। অতঃপর হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদকা করার হুকুম করিলেন এবং এরশাদ করিলেন, সদকা কর ঐ সময়ের পূর্বে যখন তোমরা সদকা করিতে পারিবে না, সদকা কর ঐ সময়ের পূর্বে যখন তোমরা সদকা করা হইতে অপারগ হইয়া যাইবে। যে ব্যক্তি যাহাই দান করিতে পারে—দিনার দান করিতে পারে, দেরহাম দান করিতে পারে, কাপড় দান করিতে পারে, গম দান করিতে পারে, যব দান করিতে পারে, খেজুর দান করিতে পারে, এমনকি খেজুরের একটি টুকরাও দান করিতে পারে, সে যেন উহা দান করে।

একজন আনসারী উঠিলেন এবং একটি খলি ভর্তি করিয়া আনিলেন।
যাহা বহন করিতেও তাহার কষ্ট হইতেছিল। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের খেদমতে পেশ করিলেন। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের নূরানী চেহারা আনন্দে চমকাইতে লাগিল। হযুর সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যে ব্যক্তি কোন উত্তম তরীকা চালু করে
সে উহার সওয়াব লাভ করিবে এবং যাহারা উহার উপর আমল করিবে
তাহাদের সওয়াবও লাভ করিবে। অথচ আমলকারীগণের সওয়াবের মধ্যে
সামান্যতম কমি হইবে না। এমনিভাবে, যদি কোন ব্যক্তি কোন খারাপ
তরীকা চালু করে, তবে উহার গুনাহ তো তাহার হইবেই; যত লোক উহার
উপর আমল করিবে তাহাদের সকলের গুনাহেরও সে ভাগী হইবে; অথচ
তাহাদের গুনাহের বোঝা হইতে কিছুমাত্রও কম করা হইবে না।

অতঃপর সমস্ত লোক বিক্ষিপ্ত হইয়া চলিয়া গেল। কেহ দিনার (স্বর্ণ
মুদ্রা) লইয়া আসিল, কেহ দেবহাম লইয়া আসিল, কেহ খাদ্য লইয়া
আসিল। মোটকথা, খাদ্য ও কাপড়ের দুইটি স্তূপ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের নিকট জমা হইয়া গেল। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম ঐ সমস্ত জিনিস মুজার গোত্রের আগত লোকদের মধ্যে বন্টন
করিয়া দিলেন। (নাসায়ী, নুররে মানসূর)

এক হাদীসে আসিয়াছে, হে লোকসকল! নিজেদের জন্য কিছু অগ্রিম
পাঠাইয়া দাও। অতি সত্ত্বর এমন সময় আসিতেছে, যখন না কোন
মধ্যস্থতাকারী থাকিবে, আর না মাঝখানে কোন পর্দা থাকিবে, আর
আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিবেন—তোমার নিকট কি রাসূল আসেন নাই,
যিনি তোমার নিকট হুকুম-আহকাম পৌছাইয়া দিয়াছেন? আমি কি
তোমাকে সম্পদ দান করিয়াছিলাম না? আমি কি তোমাকে প্রয়োজনের
চাইতে বেশী দিয়াছিলাম না? তুমি নিজের জন্য কি জিনিস অগ্রিম
পাঠাইয়াছ? সেই ব্যক্তি এদিক ওদিক তাকাইবে। কিছুই দেখিতে পাইবে
না। চোখের সামনে জাহান্নাম হইবে। সুতরাং যে ব্যক্তি উহা হইতে বাঁচিতে
পারে, সে যেন বাঁচিবার চেষ্টা করে। চাই খেজুরের একটি টুকরা দ্বারাই
হউক না কেন। (লন্ঘ)

বড় কঠিন পরিস্থিতি হইবে, বড় কঠিন প্রশ্ন হইবে, জ্বলন্ত দোষখ
সম্মুখে হইবে, প্রতি মুহূর্তে উহার মধ্যে নিষ্কিপ্ত হইবার আশংকা হইবে।
তখন আফসোস হইবে যে, আমরা দুনিয়াতে সবকিছু কেন খরচ করিয়া
দিলাম না। আজ আমরা মনগড়া প্রয়োজনের খাতিরে খরচ করা হইতে
বিরত থাকি কিন্তু আজ চক্ষু বন্ধ হইয়া গেলে সমস্ত প্রয়োজন শেষ হইয়া

যাইবে। তখন শুধু জাহান্নাম হইতে বাঁচিবার কঠিন প্রয়োজন মাথার উপর থাকিবে।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) একবার খুতবার মধ্যে বলিলেন, ইহা উত্তমরূপে জানিয়া লও যে, তোমরা সকাল-সন্ধ্যা এমন সময়ের মধ্যে চলিতেছ, যাহার অবস্থা তোমাদের জানা নাই যে, কখন উহা শেষ হইয়া যাইবে। অতএব, যদি তোমাদের দ্বারা সম্ভব হয়, তবে এইরূপ কর, যেন এই সময়টুকু সতর্কতার সহিত শেষ হয়। আর আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছাতেই তোমরা এইরূপ করিতে পার। এক জাতি তাহাদের সময়কে এমন কাজে খরচ করিয়াছিল, যাহা তাহাদের জন্য উপকারী হয় নাই। আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে তাহাদের মত হইতে নিষেধ করিয়াছেন এবং এরশাদ করিয়াছেন : **وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ** : তোমাদের ঐ সমস্ত ভাইয়েরা কোথায় যাহাদেরকে তোমরা জানিতে, তাহারা নিজ নিজ সময় শেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছে এবং তাহাদের আমল শেষ হইয়া গিয়াছে, এখন তাহারা নিজ নিজ আমলের নিকট পৌছিয়া গিয়াছে। যেমন আমল করিয়াছে তেমন পাইয়াছে (ভাল করিয়া থাকিলে আনন্দ উপভোগ করিতেছে, খারাপ করিয়া থাকিলে উহার শাস্তি ভোগ করিতেছে)।

কোথায় সেই অতীত যুগের অত্যাচারী লোকেরা, যাহারা বড় বড় শহর বানাইয়াছে, উচু উচু প্রাচীরের দ্বারা নিজেদেরকে রক্ষা করিয়াছে, এখন তাহারা পাথর ও টিলার নিচে পড়িয়া রহিয়াছে। ইহা আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কালাম। ইহার বিস্ময়কর বিষয়াবলী শেষ করা যায় না, ইহার আলো ম্লান হয় না। অন্ধকার দিনের জন্য ইহা হইতে আজ আলো হাসিল করিয়া লও এবং উপদেশ গ্রহণ করিয়া লও।

আল্লাহ তায়ালা এক জাতির প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন—

كَانُوا يُسِرُّونَ فِي الْغَيْبَاتِ
وَيَذَرُونَ أَرْحَامًا وَرَهْبًا وَكَانُوا
لَنَا خُشِعِينَ ○ (আম্বিয়া : ৭৫)

وَالَّذِينَ كَانُوا لَا يُلَاقُونَكَ
تَتَذَكَّرُونَ كَذِبًا وَكَانُوا
لَنَا خُشِعِينَ ○ (আম্বিয়া : ৭৫)

অর্থাৎ, তাহারা নেক কাজে ব্যাপাইয়া পড়িত এবং আশা ও ভীতি সহকারে আমাকে ডাকিত। আর আমার সম্মুখে বিনয় প্রকাশ করিত।

(আম্বিয়া : ৯০)

ঐ কথায় কোন ভালাই নাই, যাহা দ্বারা আল্লাহর সজ্জাটি উদ্দেশ্য না হয়। আর ঐ সম্পদে কোন কল্যাণ নাই, যাহা আল্লাহর রাস্তায় খরচ না

হয়। আর ঐ ব্যক্তি উত্তম নয়, যাহার ধৈর্য তাহার ক্রোধের উপর প্রবল না হয়। আর ঐ ব্যক্তি উত্তম নয়, যে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির মুকাবেলায় কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারের পরোয়া করে। (সুরের মানসূর)

﴿۱﴾ اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَنْفُسُكُمْ
فِتْنَةٌ وَاللّٰهُ عِنْدَکُمْ اَخْرُ
عَظِیْمٌ ۝ فَاتَّقُوا اللّٰهَ
مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاَسْمَعُوا
وَاَطِيعُوا وَاَلْفِقُوا خَیْرًا
لَّا لَنْفُسِکُمْ ط وَمَنْ یُّؤَقْ
شَحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِکَ
هُمُ الْمَقْلُکُوْنَ ۝
(সূৰে তবাস-রক' ২)

اس کے سوا دوسری بات نہیں کہ تمہارا مال
اور تمہاری اپنی تمہارے لئے ایک آزمائش کی چیز
جدا ہے جو تمہاری نفس میں جو کچھ اللہ کو یاد رکھ
تمہاں کہ تمہارا اللہ کے پاس بڑا ابو ہے جس سے تم
پر کہ اللہ کے لئے کہہ دو اور اس کی بات سنو
اور تمہارا اللہ کے لئے کہہ دو (خروج کرتے ہو) اللہ
تمہارے لئے زیادہ بہتر ہوگا اور جو شخص اپنے نفس
کے فتنے یعنی لالچ سے محفوظ رہے اس میں کوئی
ظلم کو پہنچنے والا نہیں ہے۔

﴿৩১﴾ এতদভিন্ন আর কিছুই নয় যে, তোমাদের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ। (অতএব, যে ব্যক্তি উহাতে যশগুল থাকিয়াও আল্লাহকে স্মরণ রাখে) তাহার জন্য আল্লাহর নিকট বিরাট প্রতিদান রহিয়াছে। অতএব, তোমরা যথাসম্ভব আল্লাহকে ভয় করিতে থাক এবং তাহার কথা শোন ও মান, আর আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিতে থাক। ইহা তোমাদের জন্য অধিক উত্তম হইবে। আর যে ব্যক্তি তাহার নফসের লালসা হইতে হেফাজতে রহিয়াছে, এইসব লোকেরাই সফলকাম হইবে। (জাগাবুন : ১৫-১৬)

ফায়দা : কৃপণতার উচ্চস্তরকে 'শূহ' বলা হয়। যেমন, আটাইশ নম্বর আয়াতের ফায়দায় বর্ণিত হইয়াছে—“ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পরীক্ষার বস্তু হওয়ার অর্থ হইল, ইহা যাচাই করা হইবে যে, কোন্ ব্যক্তি এই সমস্তের মধ্যে লিপ্ত হইয়া আল্লাহ তাআলার হুকুম-আহকাম ও তাহার স্মরণকে ভুলিয়া যায়। আর কোন্ ব্যক্তি এই সবকিছু সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলার ফরমানবিরোধী করে এবং তাহার স্মরণে যশগুল থাকে। নমুনায় অন্য ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ সম্মুখে রহিয়াছে। এখানে কাহারও এক বা দুই স্ত্রী থাকিতে পারে। ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নয়জন স্ত্রী ছিলেন। সন্তান-সন্ততিও ছিল।

পুত্র-কন্যা, নাতি-নাতনী সবই ছিল।

হযরত সালাহুদ্দীন আল্লাহি ওয়াসাল্লাম ছাড়াও সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা সমগ্র দুনিয়ার সম্মুখে রহিয়াছে এবং অনেক বিস্তারিতভাবে কিতাবাদিতে বর্ণিত আছে। হযরত আনাস (রাযিঃ)এর সন্তান-সন্ততি গণনা করাই মুশকিল। তিনি বলেন, আমার সন্তানদের সন্তানের হিসাব তো পৃথক রহিয়াছে। স্বয়ং আমার সন্তানদের মধ্য হইতে একশত পঁচিশ জনকে আমি দাফন করিয়াছি। (ইসবাহ) অন্যান্য যাহারা জীবিত রহিয়াছে, তাহাদের হিসাব ভিন্ন। উপরন্তু, সন্তানদের সন্তানের সংখ্যা ইহারও অতিরিক্ত রহিয়াছে। এতদসত্ত্বেও তিনি ঐ সমস্ত সাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত, যাহাদের মাধ্যমে অধিক পরিমাণে হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বহুবার জিহাদে শরীক হইয়াছেন। এত অধিক পরিমাণে সন্তান-সন্ততি তাহার জন্য না এলেম হইতে বাধা হইয়াছে, না জিহাদ হইতে।

হযরত যুবায়ের (রাযিঃ) যখন শহীদ হইলেন, তখন তাহার নয় পুত্র, নয় কন্যা ও চারজন স্ত্রী ছিল। কোন কোন পৌত্র তাহার কোন কোন পুত্রের চাইতেও বয়সে বড় ছিল। (বুখারী)

আর পিতার জীবদ্দশায় যাহাদের ইন্তেকাল হইয়া গিয়াছে, তাহাদের হিসাব ভিন্ন। এতদসত্ত্বেও তিনি না কখনও চাকুরী করিয়াছেন, না অন্য কোন কাজ করিয়াছেন। জিহাদ করিতে করিতে জীবন কাটাইয়া দিয়াছেন। আরও অন্যান্য অনেক সাহাবীদেরও এইরূপ অবস্থা ছিল, না ধন-সম্পদ তাহাদের জন্য দ্বীনের ব্যাপারে কোন প্রতিবন্ধক হইত, না অধিক সন্তান-সন্ততি। আর তাহাদের মধ্যে যাহারা ব্যবসায়ী ছিলেন, ব্যবসা তাহাদের জন্য দ্বীনের কাজে বাধা হইত না। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কুরআন পাকে তাহাদের প্রশংসা করিয়াছেন : رَجُلٌ لَا تُلِيهِمْ تِجَارَةٌ ۖ ۲۷। অর্থাৎ, তাহারা এমন লোক যাহাদিগকে ক্রয় ও বিক্রয় আল্লাহর যিকির হইতে, নামায কায়েম করা হইতে এবং যাকাত আদায় করা হইতে বিরত রাখে না। তাহারা এমন দিনকে ভয় করে, যেইদিন বহু অস্ত্র ও চক্ষু উলট-পালট হইয়া যাইবে এবং উহার পরিণাম এই হইবে যে, আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে তাহাদের আমলসমূহের অতি উত্তম বিনিময় প্রদান করিবেন। তাহাদিগকে আপন অনুগ্রহে বিনিময় ছাড়াও পুরস্কার হিসাবে) আরও অধিক দান করিবেন। (নূর : ৩৭) উক্ত আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে সাহাবায়ে কেরাম হইতে বর্ণিত অনেক রেওয়াযাতে এই বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে যে, যে সমস্ত লোক ব্যবসা করিত, এই ব্যবসা তাহাদের জন্য আল্লাহর স্মরণে প্রতিবন্ধক হইত না। আযান শুনামাত্রই তাহারা নিজ

নিজ দোকান ছাড়িয়া নামাযের জন্য রওয়ানা হইয়া যাইত। (দুররে মাননুর)

اگر تم اللہ جل شانہ کو کراہی طرح (یعنی غلامی سے)
قرض مانگے تو وہ اسکو تمہارے حق بڑے عطا کر جائیگا
اور تمہارے گناہ بخش دیگا اور اللہ جل شانہ بڑی قدر
کرنی والا ہے اگر تمہو سے مسئل کو بھی قبول کرتی ہے
اور بڑا بڑا بار ہے اگر بڑے سے بڑے گناہ پر بھی نوازندہ
میں جیسی نہیں کہ تم پر شیطان ظالم کھینچنے والا
ہے۔ زبردست ہے حکمت والا ہے۔

(۳۲) اِنْ تَقْرَضُوا مِنْ اللّٰهِ قَرْضًا
 حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ وَ
 يَغْفِرْ لَكُمْ ۖ وَاللّٰهُ شَكُورٌ
 عَلِيمٌ ۝ عَالِمُ الْغَيْبِ وَ
 الشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ۝
 (سورة قیام - رکعت ۲)

৩২) যদি তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে উত্তমরূপে (অর্থাৎ, এখলাসের সহিত) করুজ দাও, তবে তিনি উহা তোমাদের জন্য বৃদ্ধি করিতে থাকিবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করিয়া দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত গুণগ্রাহী। (অর্থাৎ, সামান্য আমলকেও কবুল করিয়া লন) এবং অত্যন্ত ধৈর্যশীল (অর্থাৎ, বড় হইতে বড় গুনাহের উপরও শাস্তি প্রদান করিতে জ্বলদি করেন না)। গোপন এবং প্রকাশ্য আমলসমূহ সম্পর্কে ক্ষমতা, মহাপরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়। (তাগাবুন : ১৭-১৮)

ফায়দা : ৫, ২৬ ও ২৭ নম্বর আয়াতে এই ধরনের বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহা আল্লাহ তায়ালায় বিশেষ দয়া ও মেহেরবানী যে, আমাদের মঙ্গল কামনা ও বান্দাদের প্রতি তাহার অনুগ্রহের কারণে অত্যন্ত জরুরী বিষয়গুলি গুরুত্বসহকারে বারবার উল্লেখ করেন। আর আমরা এ সমস্ত আয়াত বারবার পড়ি এবং এই মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া যাই যে, কুরআন পাক তেলাওয়াত করিয়া অনেক সওয়াব লাভ করিয়াছি। বস্তুতঃ ইহা মহান দাতার পক্ষ হইতে অনুগ্রহ ও পুরস্কার স্বরূপ যে, তিনি তাহার পবিত্র কালাম শুধু তেলাওয়াত করিলেও সওয়াব দান করেন। কিন্তু এই পবিত্র কালাম শুধু পড়ার জন্য নাযিল হয় নাই। বরং পড়ার সাথে সাথে তাহার পবিত্র হুকুমসমূহের উপর আমলও করিতে হইবে। সমগ্র জগতের বাদশাহ আপন মুনিব, অনুগ্রহকারী, প্রতিপালক, রিযিকদাতা, সৃষ্টিকর্তা বারবার একটি বিষয়ে আদেশ করিতেছেন আর আমরা বলিতেছি যে, আমরা তো আপনার আদেশ পড়িয়াছি ; ইহাই তো যথেষ্ট। ইহা আমাদের পক্ষ হইতে কত বড় জুলুম !

৩২) وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
 الزَّكَاةَ وَآفَرُّهُوا إِلَهُ قَرْضًا
 حَسَنًا وَمَا تَقْرُؤُوا لِنَفْسِكُمْ
 مِنْ خَيْرٍ تَعْبُدُونَهُ عِنْدَ اللَّهِ
 هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا ط
 وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ ط إِنَّ اللَّهَ
 غَفُورٌ رَحِيمٌ (সূরা বাক্বা ২০)
 ৩৩) আর তোমরা নামায কায়েম রাখ, যাকাত দিতে থাক এবং
 আল্লাহ তায়ালাকে উত্তমরূপে কব্জ দিতে থাক। আর যে নেক আমল
 তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চয় হিসাবে অগ্রে প্রেরণ করিবে, আল্লাহ
 তায়ালা নিকট যাইয়া তোমরা উহা অপেক্ষা উত্তম এবং সওয়াবের দিক
 দিয়া বর্ধিত আকারে পাইবে। আল্লাহ তায়ালা নিকট গুনাহ ক্ষমা
 করাইতে থাক। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল এবং পরম দয়ালু।
 (মুখ্যাম্মিল ৪ : ২০)
 কায়দা : আল্লাহ তায়ালা নিকট যাইয়া উহা অপেক্ষা উত্তম পাইবার
 অর্থ হইল, দুনিয়ার জিনিসপত্র খরিদ করিতে যাহা খরচ করা হয় অথবা
 দুনিয়াবী প্রয়োজনে খরচ করা হয় এবং উহার বিনিময় দুনিয়াতে পাওয়া
 যায় যেমন, এক টাকায় দুই সের গম দুনিয়াতে পাওয়া যায় ;
 আখেরাতের বিনিময়কে উহার উপর অনুমান করা উচিত হইবে না। বরং
 যে সকল জিনিস আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা হয়, উহার বিনিময়ে
 আখেরাতে যাহা পাওয়া যাইবে, তাহা পরিমাণ ও গুণগত মান উভয় দিক
 দিয়া দুনিয়ার বিনিময় অপেক্ষা বহুগুণে বেশী হইবে। যেমন, ৭ নং
 আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে, যদি হালাল মাল দ্বারা নেক নিয়তের সহিত
 একটি খেজুরও সদকা করা হয়, তবে আল্লাহ তায়ালা উহার সওয়াব উহুদ
 পাহাড় সমান করিয়া দেন। হায়, আমরা যদি এত অধিক বিনিময়
 প্রদানকারী দয়ালুর কদর করিতাম এবং বেশী হইতে বেশী মূল্য তাহার
 নিকট জমা করিতাম আর অত্যন্ত কঠিন প্রয়োজনের সময় প্রচুর পরিমাণে
 সম্পদ লাভ করিতাম ! অতঃপর উক্ত আয়াতেই আল্লাহ তায়ালা এরশাদ
 করিতেছেন, যে কোন প্রকারের নেকীই তোমরা আগে পাঠাইয়া দিবে,
 উহার বিনিময় তেমনই লাভ করিবে।

'بارا کاتہ یحکیر' (अर्थात् 'फायामेले यिकिर') पुस्तिकाय अनेक विस्तारितभावे এই धरনের बहू रेणुमायात वर्णित हईयाछे ये, एकवार सुवहानाग्राह अथवा आलहामदुलिग्राह अथवा ला ईलाहा ईल्लाग्राह अथवा आग्राह आकवार बलिबार सওয়াब आग्राह तामालार निकट उहस पाहाड हईते बेनी। तवे शर्त এই ये, एखलासेर सहित हईते हईवे। आर एखलासेर शर्त तो आखेरातेर प्रत्येकटि काज्जेर मध्ये रहियाछे। एखलास व्यतीत सेइथाने कोन छिनिसेरई मूल्यायन हईवे ना। आर এই एखलास पयदा करिबार छन्य वयुर्गदेर झुता सोझा अर्थात् खेदमत करिते हय। केनना, এই दोलत ताहादेर कदमे पड़िया थाकार द्वारा हासिल हय।

بله شك نيك رنگ (بشت میں) ایسے جام شراب
ہیں کہ جن میں کافی آمیزش ہوگی ایسے چشوں
سے بھرے جاویں گے جن سے اللہ کے خاص بندے
پتے ہیں (ان چشموں میں عجیب بات ہوگی) کہ جتنی
رنگ آمیز چشموں کو جیالیاں پیاویں یا تیس گے تو ان سے چٹے
انکے اشد میں گتے تاج ہو گئے) یہ ایسے رنگ ہیں جو
نشتوں کو پیدا کرتے ہیں (اللہ اسی طرح اللہ کے طہیات
کو) اور ایسے میں سے تھے جی جن کی ان کی عقل پہلی تھی
ہوگی (یعنی علم ہوگی کہ شجر کچھ کچھ کچھ کچھ پریشانی
میں مبتلا ہوگا) یہ رنگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں
کھا اکلے ہیں سب کی ان تہیم کو اور قیدی کو راہ جو کہ
وہ قیدی کا فرار ملے گا وہیں برسرِ کار ہوتے تھے) اور
وہ رنگ (پختہ دل میں یا زبان سے) کہتے ہیں کہ ہم تم کو
محض اللہ کے واسطے کھاتے ہیں۔ تو ہم اس کا تم سے
بد چاہتے ہیں۔ اس کا شک یہ چاہتے ہیں (بلکہ اس وجہ
سے کھاتے ہیں) کہ تم اپنے سب کی طرف سے ایک سخت
اللہ تلخ دل کا دشمنی قیامت کے دن کا خوف کھتے ہیں

۱۴) اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُونَ
مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا
كَافُورًا ۝ عَيْنًا يَشْرَبُ
بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُونَهَا
تَفْجِيرًا ۝ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ
وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ
مُسْتَطِيرًا ۝ وَ يُطْعَمُونَ
الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا
وَيَتِيمًا وَّ اَسِيرًا ۝ اِنَّمَا
نُطْعِمُهُمْ لِرُؤْفَةِ اللّٰهِ
لَا نُرِيدُ مِنْهُمْ جَزَاءً
وَلَا شُكُورًا ۝ اِنَّا
نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا
غَمُوسًا ۝ فَمَطْرَئِرًا ۝
فَوَقَّهُمْ اللّٰهُ شَرَّ
ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ
نَضْرَةً وَّ سُرُورًا ۝

وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا
 جَنَّةً وَحَرِيرًا ۝
 مُتَجِدِّينَ فِيهَا عَلَى
 الْأَرَائِكِ لَا يَوَدُّ فِيهَا
 شُمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ۝
 وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا
 وَذُلَّتْ أَطْوْفُهَا تَذْلِيلًا ۝
 وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِانِيَّةٍ
 مِنْ فِضَّةٍ وَأَحْطَابٍ
 كَانَتْ قَوَارِيرًا ۝ قَوَارِيرًا
 مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا
 تَقْدِيرًا ۝ وَيُسْقَوْنَ
 فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا
 زَنْجَبِيلًا ۝ عَيْنًا فِيهَا
 تُسْقَى سَلْسَبِيلًا ۝
 وَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ
 مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ
 حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا ۝
 وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ
 نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ۝
 عَلَيْهِمْ رِيَابٌ رُحَدٌ
 مُنْقَرَعُونَ ۝ إِسْتَبْرَقَ زُحُلًا
 أَسَاوِدَ مِنْ فِضَّةٍ ۝

ہیں اللہ جل شانہ اگر اس میں کسی سختی سے محنت لگے گا
 اللہ اکبر ان کی اہم ضرورتوں کا امداد ان کو اس سبکی کے
 بدل میں بہت اور بھی لباس عطا کرے گا اس حالت میں
 کہ بہت میں سہولت پر کیا کہ بہت سے ہونے کے
 عدوان کی کسی چیز میں گدے سر میں لگے شیل
 نورم (ہما) اور ختم کے ساتھ ان کے ہر ایک جوئے
 ہوں گے کہ ان کے خشتہ کے بیچ ہوں گے اگر میں وقت
 جس کو پسند کریں گے قریب آجیگا اور وہ کہیں
 (کہانے) کہتے ہیں ان کی کہتے ہیں وہ شیشہ کا جوئے
 تھے جائیں گے ایک شیشہ جو پانی کے ہوں گے (یعنی
 وہ شیشہ پانی کے پانی کے پانی کے ہوں گے
 جو اس عالم میں دشوار نہیں بلکہ وہی کو بھرنے والی
 تھے صبح انداز سے ہر ایک اگر ضرورت سے کم نہ
 زیادہ) اور وہ ان (کا فوری شرب کے لئے) ایسا
 شرب بھی پتے جائیں گے میں سونے کی لہریں ہوں گے
 (جیسا کہ حجر کی بقل میں ہوتا ہے) یہ ایک شخصہ ہر
 جائیں گے جس کا نام سلسلہ ہے اور ان کے ساتھ ہوں گے
 سونے کے گرم مطلب یہ کہ وہ ان کے لئے شرب ہیں
 ہیں اور اس کے لیے کہ ان کے لئے ہوں گے ہر
 ہوں گے (کہہ رہی ہیں گے اور ان کے لئے ہیں) اگر ان کو
 دیکھ کر یہ گمان کہہ کر یہ سنی ہیں جو کہ بہت ہیں
 (اور جو چیزیں ہوں گے ان کی ہی فقط نہیں بلکہ
 جب تو اس جگہ کو دیکھے گا تو ان کی ہی ہوں گے

অনুভব করিবে, না শীত (বরং মধ্যম ধরনের মৌসুম হইবে)। আর বৃক্ষসমূহের ছায়া তাহাদের উপর ঝুকিয়া থাকিবে। আর উহার ফলসমূহ তাহাদের আয়ত্বাধীন থাকিবে। (ফলে, যখন যাহা পছন্দ করিবে উহা নিকটে আসিয়া যাইবে।) আর তাহাদের নিকট (খানাপিনার জন্য) রূপার পাত্র ও কাঁচের তৈরী পানপাত্রসমূহ আনয়ন করা হইবে। এমন কাঁচের পাত্র যাহা রৌপ্য নির্মিত হইবে। (অর্থাৎ, ঐসব কাঁচ রূপার দ্বারা বানান হইবে যাহা ঐ জগতে অসম্ভব নয়।) আর পূর্ণকারীগণ উহাকে সঠিক পরিমাণে পূর্ণ করিবে। (অর্থাৎ প্রয়োজনের চেয়ে না কম হইবে, না বেশী।) আর সেখানে (কর্পূর মিশ্রিত শরাব ছাড়াও) এমন শরাবের পেয়ালা পান করানো হইবে যাহা আদ্রক মিশ্রিত হইবে (যেমন জিঞ্জারের পানীয় বোতল হইয়া থাকে)। ইহা এমন বর্ণাসমূহ হইতে পূর্ণ করা হইবে যাহার নাম সালসাবিল। (কর্পূর ঠাণ্ডা হয় আর আদ্রক গরম হয় অর্থাৎ সেখানে বিভিন্ন স্বাদের শরাব হইবে।) আর এমন বালকগণ উহা লইয়া আসা-যাওয়া করিবে যাহারা সর্বদা বালকই থাকিবে। (তাহারা এমন সুশ্রী হইবে যে,) যদি আপনি তাহাদিগকে দেখেন, তবে এইরূপ মনে করিবেন, যেন মুজা ছড়াইয়া রহিয়াছে (আর যে সমস্ত জিনিস উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে শুধুমাত্র তাহাই নয় বরং) যখন আপনি সেই স্থান দেখিবেন, তখন বড় বড় নেয়ামত ও বিশাল রাজত্ব দেখিতে পাইবেন। আর তাহাদের উপর সেখানে মিহিন রেশমের সবুজ পোশাক থাকিবে আর মোটা রেশমের পোশাকও। (মোটকথা, বিভিন্ন রকমের উন্নত পোশাক থাকিবে।) আর তাহাদিগকে রূপার কঙ্কনসমূহ পরানো হইবে। আর আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে এমন শরাব পান করাইবেন যাহা অত্যন্ত পবিত্র হইবে, আর বলা হইবে যে, ইহা তোমাদের আমলের প্রতিদান এবং তোমরা দুনিয়াতে যে সাধনা করিয়াছিলে উহা সমুচিত মূল্য পাওয়ার উপযুক্ত হইয়াছে। (দায়র : ৫-২২)

ফায়দা : উক্ত আয়াতে তিন জায়গায় শরাবের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে এবং তিন জায়গাতেই শরাবের প্রকার এবং উহা ব্যবহার পদ্ধতি ভিন্নরূপে বলা হইয়াছে। প্রথম জায়গাতে নিজে পান করা উল্লেখ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় জায়গাতে খাদেমদের দ্বারা পান করানো উল্লেখ করা হইয়াছে এবং তৃতীয় জায়গায় স্বয়ং রাব্বুল আলামীন আল্লাহ তায়ালা পান করাইবেন বলা হইয়াছে। সম্ভবতঃ ইহা নেককার বান্দাদের তিন প্রকার অর্থাৎ নিম্ন, মধ্যম ও উচ্চ স্তর হিসাবে হইয়াছে। উপরোক্ত আয়াতসমূহে যত মর্যাদা ও সম্মান নেককার লোকদের এবং বিশেষভাবে যাহারা আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে থানা খাওয়ায়, তাহাদের জন্য

উল্লেখ করা হইয়াছে। যদি আমাদের মধ্যে ঈমানের পরিপূর্ণতা হইত, তবে এই সমস্ত ওয়াদার পর এমন কে আছে, যে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) এর মত আল্লাহ ও তাহার রসুলের নাম ব্যতীত নিজ ঘরে কোন জিনিস অবশিষ্ট রাখিতে পারে।

উপরোক্ত আয়াতসমূহে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্যণীয়—

১. প্রথমে ঈর্ষা সম্পর্কে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, জাম্বাজী লোকেরা এইসব ঈর্ষাকে যেখানে ইচ্ছা লইয়া যাইবে। মুজাহিদ (রহঃ) উহার তফসীলে বলেন, তাহারা এই সকল ঈর্ষাকে যেখানে চাহিবেন, টানিয়া লইয়া যাইবেন।

কাতাদা (রহঃ) বলেন, তাহাদের জন্য কর্পূরের সংমিশ্রণ হইবে এবং উহার উপর মেশকের মোহর লাগানো থাকিবে। আর তাহারা যেদিকে চাহিবেন, ঐ সমস্ত ঈর্ষার পানি সেইদিকে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিবে।

ইবনে শাওয়াব (রহঃ) বলেন, তাহাদের নিকট স্বর্ণের ছড়ি হইবে। তাহারা নিজেদের ছড়ি দ্বারা যেইদিকে ইঙ্গিত করিবেন সেইদিকেই ঐ ঈর্ষা প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিবে।

২. মান্নত পূরা করা সম্পর্কে কাতাদা (রহঃ) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহারা আল্লাহ তায়ালায় সমস্ত হুকুম-আহকাম পূর্ণকারী লোক হইবে। এই কারণেই শুরুতে তাহাদিগকে আবরার বলা হইয়াছে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, ইহা দ্বারা ঐ সমস্ত মান্নত বুঝানো হইয়াছে, যাহা আল্লাহর জন্য করা হইয়াছে (অর্থাৎ, কোন ব্যক্তি রোযার মান্নত করিল, এতেকাফের মান্নত করিল, এমনিভাবে অন্যান্য ইবাদতের মান্নত করিল)।

ইকরিমা (রহঃ) বলেন, ইহা দ্বারা শুকরানা মান্নতকে বুঝানো হইয়াছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এক ব্যক্তি হাজির হইয়া আরজ করিল, আমি এই মান্নত করিয়াছিলাম যে, আমি স্বয়ং নিজেকে আল্লাহর জন্য জবাই করিব। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তাহার কথার প্রতি লক্ষ্য করেন নাই। এই ব্যক্তি হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুপ থাকাকে অনুমতি মনে করিল এবং (হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিবার পর) উঠিয়া গেল। দূরে যাইয়া সে নিজেকে জবাই করিতে লাগিল। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিতে পারিয়া বলিলেন, আল্লাহ তায়ালায় শোকর, যিনি আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক পয়দা করিয়াছেন, যাহারা মান্নত পূরা করিবার প্রতি এইরূপ যত্নবান হয়।

অতঃপর (নিজেকে জবাই করিবার বিষয়ে লোকটিকে নিষেধ করিলেন এবং) বলিলেন, তুমি নিজের জানের বদলায় একশত উট আদ্রাহর নামে জবাই কর। (কেননা, নিজেকে জবাই করা জায়েয নয়, আর জানের ফিদইয়া 'দিয়াত' হিসাবে একশত উট হইয়া থাকে।)

৩. কয়েদীদেরকে খাওয়ানোর দ্বারা উক্ত আয়াতে মুশরিক কয়েদীদেরকে বুঝানো হইয়াছে। কেননা, সে যুগে মুশরিক কয়েদীই হইত, মুসলমান কয়েদী সে যুগে ছিল না। যেক্ষেত্রে কাফেরদেরকে খাওয়ানোর উপর উক্ত সওয়াব রহিয়াছে, সেক্ষেত্রে মুসলমান কয়েদী হইলে যে আরো উত্তম হইবে; তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, যখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের কয়েদীদেরকে (যাহারা কাফের ছিল) ধরিয়া আনিলেন, তখন সাতজন সাহাবী হযরত আবু বকর, ওমর, আলী, খুবায়ের, আবদুর রহমান, সাদ, আবু উবায়দা রাযিয়াল্লাহু আনহুম তাহাদের উপর বিশেষভাবে স্বরূচ করিয়াছেন। তখন আনসারগণ বলিলেন, আমরা তো আদ্রাহর ওয়াস্তে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলাম, তোমরা কেন এত বেশী স্বরূচ করিতেছ। ইহার উপর **إِنَّ الْأَبْرَارَ** হইতে উনিশটি আয়াত উক্ত সাতজনের প্রশংসায় অবতীর্ণ হইয়াছে।

হযরত হাসান (রহঃ) বলেন, যখন এই আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়, তখন কয়েদীরা মুশরিক ছিল। কাতাদা (রহঃ) বলেন, আদ্রাহ তায়ালা উক্ত আয়াতগুলিতে কয়েদীদের প্রতি অনুগ্রহ করার হুকুম করিয়াছেন; অর্থাৎ তখন কয়েদীরা মুশরিক ছিল। কাজেই মুসলমান কয়েদীর হক তোমার উপর আরও বেশী হইয়া গিয়াছে।

ইবনে জুরাইজ (রহঃ) বলেন, ঐ যমানায় মুসলমান কয়েদী ছিল না। মুশরিক কয়েদীদের সম্পর্কে এই আয়াত নাযিল হইয়াছে। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের সহিত উত্তম ব্যবহার করার হুকুম করিতেন।

আবু রাবীন (রহঃ) বলেন, আমি শাকীক ইবনে সালামা (রহঃ) এর নিকট ছিলাম। কয়েকজন মুশরিক কয়েদী সেখান দিয়া অতিক্রম করিল। শাকীক (রহঃ) আমাকে তাহাদের উপর সজকা করিবার হুকুম করিলেন এবং এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন।

৪. আমরা না উহার প্রতিদান চাই, না উহার কৃতজ্ঞতা চাই—ইহার অর্থ হইল, এই সকল বুয়ুর্গগণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও দোয়ার মাধ্যমেও নিজেদের দান ও অনুগ্রহের বদলা দুনিয়াতে পাওয়া পছন্দ করিতেন না ;

নিজেদের সবকিছু আখেরাতেই লইতে চাহিতেন।

হযরত আয়েশা ও হযরত উম্মে সালামা (রাযিঃ)এর অভ্যাস সম্পর্কে বর্ণনা করা হইয়াছে, যখন তাহারা কোন অভাবী ফকীরের নিকট কিছু পাঠাইতেন, তখন বাহককে বলিয়া দিতেন, চুপে চুপে গুনিয়া লইও যে, তাহারা এই দানের উপর কি শব্দ বলে। যখন বাহক আসিয়া তাহাদিগকে দোয়া ইত্যাদির শব্দ বর্ণনা করিত, তখন তাহারা অনুরূপ দোয়া ঐ ফকীরের জন্য করিয়া দিতেন এবং বলিতেন, ইহা তাহাদের দোয়ার বদলা হইল, যাহাতে আমাদের সদকা শুধু আখেরাতের জন্য থাকিয়া যায়।

হযরত ওমর ও তাহার ছেলে হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ)এরও এই ধরনেরই অভ্যাস বর্ণনা করা হইয়াছে। (এহইয়া)

হযরত যাইনুল আবেদীন (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি মাল খরচ করার জন্য প্রার্থীর অপেক্ষা করে, সে দানশীল নয়। দানশীল ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর হুকুমমূহ নিজের পক্ষ হইতে নেক বান্দাদের নিকট পৌছাইয়া দেয় এবং তাহাদের নিকট হইতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আশা রাখে না। কেননা, সে তো আল্লাহ তায়ালার প্রতিদানের উপর পূর্ণ একীন রাখিবে। (এহইয়া)

৫. জাম্বাতের ফলগুলি তাহাদের অনুগত থাকিবে, ইহার অর্থ হইল, উহা তাহাদের চাহিদার অধীন হইবে।

হযরত বারা ইবনে আযেব (রাযিঃ) বলেন, জাম্বাতী লোকগণ জাম্বাতের ফলসমূহ দাঁড়াইয়া, বসিয়া, শুইয়া; যে অবস্থায় তাহারা চাহিবে খাইতে পারিবে।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, তাহারা দাঁড়ান থাকিলে ফল উপরে উঠিয়া যাইবে। আর বসিয়া থাকিলে ফল ঝুকিয়া যাইবে। আর যদি তাহারা শয়ন করে, তবে আরও বেশী ঝুকিয়া যাইবে।

অন্য বেওয়াযাতে আছে, তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, জাম্বাতের জমিন রূপার, উহার মাটি মেশকের, উহার বৃক্ষের শিকড় স্বর্ণের, উহার শাখা-প্রশাখা ও পত্রপল্লব মুক্তা ও জবরজদের। উহার মাঝখানে ফল ঝুলিতে থাকিবে, যদি তাহারা দাঁড়াইয়া খাইতে চাহে, তবে কোন কষ্ট হইবে না। বসিয়া অথবা শুইয়া খাইতে চাহিলে, ফল তাহাদের জন্য সেই পরিমাণ ঝুকিয়া যাইবে।

৬. রূপার কাঁচের অর্থ হইল, রূপা দ্বারা এমনভাবে বানানো হইবে, যাহা কাঁচের মত পরিষ্কার হইবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, তুমি যদি দুনিয়াতে রূপাকে মাছির পাখার ন্যায় পাতলা করিয়া ফেল, তবুও উহার ভিতরের পানি

দেখা যাইবে না। কিন্তু জালাতের পেয়ালাসমূহ রূপার হওয়া সত্ত্বেও কাঁচের মত পরিষ্কার হইবে।

অন্য রেওয়াজাতে আছে, জাম্বাজের প্রত্যেকটি জিনিসের নমুনা দুনিয়াতে রহিয়াছে ; কিন্তু রূপার তৈরী এইরূপ পেয়ালার নমুনা দুনিয়াতে নাই।

কাতাদা (ব্রহ্মঃ) বলেন, যদি সারা দুনিয়ার মানুষ একত্রিত হইয়া রূপার এইরূপ পাত্র বানাইতে চেষ্টা করে যাহার মধ্যে কাঁচের মত ভিতরের জিনিস দেখা যাইবে, তবে তাহারা উহা বানাইতে পারিবে না।

(দুররে খানসুর)

হযরত ইবনে আক্বাস (রাযিঃ) হইতে এক রেওয়াজাতে জানা যায় যে, উপরোক্ত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হযরত আলী ও হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) এর একটি ঘটনা। যাহা এই কিতাবের শেষে বর্ণিত ৪৩নং ঘটনায় আসিতেছে। একটি আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ কয়েকটি ঘটনা হইতে পারে। অনেক সময় এমন হইয়াছে যে, একই সময় কয়েকটি ঘটনা ঘটিয়াছে ; আর তখন কোন আয়াত নাযিল হইয়াছে। এমতাবস্থায় এই আয়াত সবগুলি ঘটনার সহিত সম্পর্কিত হইতে পারে।

”با مراد ہو گیا وہ شخص جس پر پاک ہو گیا۔ اور اپنے رب کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ بلکہ تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو مقدم رکھتے ہو حالانکہ آخرت دنیا سے بہت زیادہ بہتر ہے۔“

ہمیشہ رخصت والی چیز ہے :-

(٣٥) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۖ
وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ۝
لَوْ ثَرَوْنَ الْعِوَاةَ الدُّنْيَا ۖ
وَالْآخِرَةَ خَيْرَؤْ أَبْغَى ۝

(سورہ اہل)

৩৫ সফলকাম হইয়াছে সেই ব্যক্তি, যে পবিত্রতা লাভ করিয়াছে এবং স্বীয় রবের নাম স্মরণ করিতে ও নাশায পড়িতে রহিয়াছে। অথচ তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিয়া থাক ; যদিও আখেরাত দুনিয়া হইতে বহুগুণে উত্তম ও স্থায়ী। (আলা : ১৪-১৭)

ফায়দা : 'পবিত্রতা লাভ করিয়াছে' এই কথা'র বিভিন্ন ব্যাখ্যা উলামায়ে
কেরাম হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে। অনেক উলামায়ে কেরামের উক্তি
হইল, ইহা দ্বারা সদকায়ে ফিতর আদায় করা বুকানো হইয়াছে, যেমন
কতক রেওয়াযাতে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। আর অনেক উলামায়ে কেরাম
ইহাকে ব্যাপক অর্থে বলিয়াছেন।

সাজিদ ইবনে জুবাইর (রহঃ) বলেন, পবিত্রতা লাভ করিয়াছে—ইহার অর্থ এই যে, সে নিজের সম্পদ হইতে পাক হইয়া গিয়াছে। কাতাদা (রহঃ) বলেন, সফলকাম হইয়াছে ঐ ব্যক্তি যে নিজের সম্পদ দ্বারা আপন সৃষ্টিকর্তাকে রাজি করিয়া লইয়াছে।

হযরত আবুল আহওয়াস (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তির উপর দয়া করেন, যে সদকা করে, অতঃপর নামায পড়ে। এই বলিয়া তিনি উক্ত আয়াত তেলাওয়াত করিলেন। এক রেওয়াযাতে তাহার এই উক্তি বর্ণনা করা হইয়াছে—যে ব্যক্তি নামাযের পূর্বে কিছু সদকা করিবার সামর্থ্য রাখে, সে যেন এইরূপ করে।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, যে ব্যক্তি নামায পড়িবার ইচ্ছা করে, তাহার জন্য কি অসুবিধা যে, সে নামাযের পূর্বে কিছু সদকা করিয়া দেয়। অতঃপর তিনি উক্ত আয়াত তেলাওয়াত করিলেন।

আরফাযা (রাযিঃ) বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ)কে 'ছাব্বিহিসমা সূরা' পড়িবার অনুরোধ করিলাম; তিনি শুনাইতে আরম্ভ করিলেন। যখন তিনি এই আয়াতে পৌঁছিলেন ۞ **بَلْ تُؤْثِرُونَ** ۞ **الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا** তখন পড়া বন্ধ করিয়া লোকদের দিকে মনোযোগী হইলেন এবং বলিলেন, আমরা দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দিয়াছি। লোকেরা চুপ করিয়া বসিয়াছিল। অতঃপর বলিলেন, আমরা দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়াছি কারণ, আমরা উহার সৌন্দর্যকে, উহার নারীদেরকে, উহার ঝানাপিনাকে দেখিয়াছি। আর আখেরাতের বস্ত্রসমূহ আমাদের নিকট হইতে গোপন রহিয়াছে। সুতরাং উপস্থিত বস্ত্রসমূহের মধ্যে লাগিয়া গিয়াছি এবং সেই ওয়াদাকৃত বস্ত্রকে ছাড়িয়া দিয়াছি।

কাতাদা (রহঃ) বলেন, সমস্ত লোক উপস্থিত (অর্থাৎ, দুনিয়াতে বিদ্যমান) বস্ত্রসমূহের মধ্যে লাগিয়া গিয়াছে এবং উহাকে গ্রহণ করিয়া লইয়াছে; তবে তাহারা ব্যতীত যাহাদিগকে আল্লাহ হেফাজত করিয়াছেন। অথচ আখেরাত কল্যাণ হিসাবে অতি উত্তম ও চিরস্থায়ী ছিল।

হযরত আনাস (রাযিঃ) ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বান্দাদেরকে আল্লাহ তায়ালা অসন্তুষ্টি হইতে রক্ষা করে; যতক্ষণ তাহারা দুনিয়াকে ধীনের উপর প্রাধান্য না দেয়। আর যখন দুনিয়াকে ধীনের উপর প্রাধান্য দিতে আরম্ভ করে, তখন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকেও তাহাদের দিকে ফেরৎ দেওয়া হয় এবং বলা হয় যে, তোমরা মিথ্যা বলিতেছ।

অন্য এক হাদীসে ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ

করিলেন। উপস্থিত লোকজন নিশ্চুপ ছিল। (হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্ভবত ইহার অপেক্ষা করিতেছিলেন যে, হয়ত কেহ প্রশ্ন করিবে। অথচ উপস্থিত লোকজন আদব ও ভয়ের কারণে চুপ ছিল।) দূর হইতে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার মাতা-পিতা আপনার উপর কুরবান হউন, অন্য কোন জিনিস মিলাইবার অর্থ কি? হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, দুনিয়ার মহব্বত এবং উহাকে প্রাধান্য দেওয়া। আর উহার জন্য মাল জমা করিয়া রাখা এবং জালেমদের মত আচার-আচরণ করা।

অন্য এক হাদীসে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি দুনিয়ার সহিত মহব্বত রাখে, সে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আর যে ব্যক্তি আখেরাতের সহিত মহব্বত রাখে, সে দুনিয়ার দিক দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সুতরাং এমন জিনিসের (অর্থাৎ, আখেরাতের) মহব্বতকে প্রাধান্য দাও, যাহা বাকী থাকিবে—ঐ জিনিসের উপর (অর্থাৎ দুনিয়ার উপর) যাহা ধ্বংস হইয়া যাইবে।

এক হাদীসে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে, দুনিয়া ঐ ব্যক্তির ঘর, যাহার আখেরাতে ঘর নাই এবং দুনিয়া ঐ ব্যক্তির সম্পদ, যাহার আখেরাতে সম্পদ নাই এবং উহার জন্য ঐ ব্যক্তিই জমা করে, যাহার বুদ্ধি নাই।

অপর এক হাদীসে আছে, আল্লাহ তায়ালার নিকট তাহার সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে দুনিয়া অপেক্ষা অধিক অপছন্দনীয় আর কিছু নাই। আর তিনি যখন হইতে উহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, কখনও উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই।

আর এক হাদীসে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে, দুনিয়ার মহব্বত সকল গোনাহের শিকড়। (দুররে মানসূর)

এই কিতাবের শেষাংশে যষ্ঠ পরিচ্ছেদে দুনিয়া ও আখেরাত সম্পর্কিত অনেক আয়াত ও হাদীস সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। উল্লেখিত আয়াতসমূহ ছাড়াও আরও অনেক আয়াত এমন রহিয়াছে, যাহার মধ্যে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার প্রতি উৎসাহিত করা হইয়াছে। আর যে

বিশ্বয়কে আল্লাহ তায়ালার স্বীয় পবিত্র কালামে বারবার বিভিন্ন শিরোনামে বিভিন্নভাবে উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে উল্লেখ করিয়াছেন, উহার গুরুত্ব সম্পর্কে বলার অপেক্ষা রাখে না। বিশেষ করিয়া এইজন্য যে, এই সবকিছু তাহারই দেওয়া নেয়ামত। জনৈক ব্যক্তি তাহার কোন চাকরকে কিছু টাকা পয়সা দিয়া বলিল, ইহা তুমি নিজের প্রয়োজনে খরচ করিও এবং আমার পছন্দ এই যে, ইহা হইতে কিছু বাঁচাইয়া অমুক খাতেও খরচ করিও। যদি তুমি এইরূপ কর, তবে আমি তোমাকে ইহা হইতে অনেক বেশী দিব। প্রত্যেক ব্যক্তি বুঝিতে পারে যে, এমতাবস্থায় কে আছে, যে উহা হইতে কিছু বাঁচাইয়া অনেক বেশী পাওয়ার আশায় ঐ খাতে খরচ করিবে না?

হাদীসসমূহ

এই পরিমাণ আল্লাহ তায়ালার এরশাদ বর্ণিত হওয়ার পর হাদীস উল্লেখ করার প্রয়োজন বাকী থাকে না, কিন্তু হাদীসও যেহেতু কালামে পাকের ব্যাখ্যা ও তফসীর, কাজেই পরিপূর্ণতার জন্য কিছু হাদীসের তরজমাও লেখা হইতেছে।

تَضَوُّوا قَدْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کہ اگر میرے پاس اُمُّہ کے پیار کے برابر بھی سوا ہر تو مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میرے اوپر تین دن گند جائیں اس حال میں کہ میرے پاس اس میں سے کچھ بھی ہو بجز اس کے کہ کوئی چیز اوار فرض کے لئے نکال جائے۔	① عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُعْدٍ وَهَبًا لَسَرَفْتِي أَنْ لَا يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثُ لَيَالٍ وَ عِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْءٌ أَرْضِدُهُ لِدِينٍ، نَوَافِلُ الْبَغَايَةِ (مُحَمَّد)

⑤ হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যদি আমার নিকট উহুদ পাহাড় পরিমাণও স্বর্ণ থাকে, তবে আমি ইহা পছন্দ করি না যে, উহা হইতে সামান্য কিছুও আমার নিকট অবশিষ্ট থাকে আর এমতাবস্থায় আমার উপর তিন দিন অতিবাহিত হইয়া যায় ; শুধু ঐ পরিমাণ ব্যতীত যাহা করজ আদায়ের জন্য রাখা হয়। (মিশকাত : বুখারী)

ফারদা : উহুদ পাহাড় মদীনা তাইয়্যেবার একটি প্রসিদ্ধ পাহাড়। যাহা অনেক বড় পাহাড়। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যদি এই পরিমাণ স্বর্ণ আমার নিকট থাকে, তবে আমার ইচ্ছা এই যে, তিন দিনের মধ্যে এই সবকিছুকে বন্টন করিয়া দিব ; সামান্য

কিছুও আমার নিকট রাখিব না। তিন দিন শুধু এইজন্য উল্লেখ করিয়াছেন যে, এত বেশী পরিমাণ খরচ করিবার জন্য কিছু না কিছু সময় তো অবশ্যই লাগিবে। নতুবা তিন দিন হওয়া কোন শর্ত নয়। হাঁ, যদি করজ থাকে যাহা অবশ্যই দিতে হইবে আর তাহা ঐ সময় যদি মওজুদ না থাকে, তবে উহা আদায় করা যেহেতু সদকা করা হইতে অগ্রগন্য, সেইহেতু উহা আদায় করিবার জন্য কিছু রাখিয়া দেওয়া এবং হেফাজত করা ভিন্ন কথা।

উক্ত হাদীস শরীফে একদিকে যেমন অধিক সদকা করার প্রতি উৎসাহিত করা হইয়াছে, অপরদিকে করজ আদায় করা যে উহা হইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ; তাহাও প্রমাণিত হয়। জমা করিয়া না রাখা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ অভ্যাস ছিল ; জমাইয়া রাখার কোন সুযোগই ছিল না। হযরত আনাস (রাযিঃ) যিনি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশিষ্ট খাদেম, সবসময়ের প্রসিদ্ধ বেদমতগার হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি বলেন, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগামীর জন্য কোন জিনিস জমাইয়া রাখিতেন না। হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে অন্য এক হাদীসে আছে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেদমতে কোথাও হইতে হাদিয়াস্বরূপ তিনটি পাখি আসিল। উহা হইতে একটি তিনি তাহার খাদেমকে দিলেন। দ্বিতীয় দিন উক্ত খাদেম ঐ পাখিটি লইয়া হাজির হইল। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি কি তোমাকে নিষেধ করি নাই যে, আগামী কালের জন্য কোন জিনিস রাখিও না ; আগামী কালের রুজি আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং দান করিবেন।

হযরত সামুরা (রাযিঃ) হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন, আমি কখনও কখনও শুধু এইজন্য কোষাগার দেখিতে যাই যে, সেখানে কোন জিনিস পড়িয়া রহিল কিনা, আর উহা আমার নিকট থাকা অবস্থায় আমার মৃত্যু আসিয়া পড়ে। (জারগীব)

হযরত আবু বার দিফারী (রাযিঃ) বিখ্যাত সাহাবী ও অত্যন্ত দুনিয়া বিরাগী লোকদের মধ্যে ছিলেন। সম্পদের প্রতি যুগা সম্পর্কিত তাহার অনেক আশ্চর্যজনক ঘটনা রহিয়াছে। তন্মধ্যে হইতে একটি ঘটনা আয়াতসমূহের বিবরণে ১১ নম্বরে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি নিজেরও এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমি একবার হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত পাহাড়কে দেখিয়া বলিলেন, যদি এই পাহাড় স্বর্ণে পরিণত হইয়া যায়,

তবুও আমার ইহা পছন্দ নয় যে, উহা হইতে একটি দিনারও আমার নিকট তিন দিনের অধিক সময় থাকিবে। ইহা করজ আদায়ের জন্য যে দিনার রাখিব উহা ব্যতীত। অতঃপর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, অধিক সম্পদশালীরাই অধিকাংশ হারে কম সওয়াবের অধিকারী হয়। তবে ঐ ব্যক্তি যে এইরূপ এইরূপ করে। হাদীস বর্ণনাকারী 'এইরূপ এইরূপ' কথাটিকে উভয় হাত মিলাইয়া ডানদিকে ও বামদিকে ঘুরাইয়া বুঝাইয়াছেন। অর্থাৎ, উভয় হাত ভরিয়া ডান দিকের লোকদেরকে দেয় এবং বাম দিকের লোকদেরকে দেয়, অর্থাৎ প্রত্যেককে বেশী বেশী করিয়া দান করে। (বুখারী)।

হযরত আবু যর (রাযিঃ)এরই আর একটি ঘটনা মিশকাত শরীফে বর্ণিত হইয়াছে—তিনি হযরত ওসমান (রাযিঃ)এর খেলাফত আমলে তাঁহার খেদমতে হাজির ছিলেন। হযরত ওসমান (রাযিঃ) হযরত কাব (রাযিঃ)কে বলিলেন, হযরত আবদুর রহমান (রাযিঃ)এর ইন্তেকাল হইয়া গিয়াছে এবং তিনি সম্পদ রাখিয়া গিয়াছেন। এই ব্যাপারে তোমার মত কি, তিনি কি ইহা ঠিক করিয়াছেন? কাব (রাযিঃ) বলিলেন, যদি তিনি এই সম্পদের মধ্যে আল্লাহ তাযালার হক আদায় করিয়া থাকেন, তবে ইহাতে দোষের কি আছে? হযরত আবু যর (রাযিঃ)এর হাতে একটি লাঠি ছিল। উহা দ্বারা হযরত কাব (রাযিঃ)কে মারিতে আরম্ভ করিলেন এবং বলিলেন, আমি স্বয়ং হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়াছি—যদি এই পাহাড় স্বর্ণে পরিণত হইয়া যায় এবং আমি উহা সম্পূর্ণ খরচ করিয়া দেই এবং তাহা কবুল হইয়া যায়, তবুও আমার ইহা পছন্দ নয় যে, উহা হইতে আমি ছয় উকিয়া পরিমাণও আমার মৃত্যুর পর ছাড়িয়া যাই। অতঃপর আবু যর (রাযিঃ) হযরত ওসমান (রাযিঃ)কে বলিলেন, আমি তোমাকে কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি কি এই হাদীস হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে তিন বার শোন নাই? হযরত ওসমান (রাযিঃ) বলিলেন, অবশ্যই শুনিয়াছি।

তাঁহার আরও একটি ঘটনা বুখারী শরীফ ইত্যাদি কিতাবে বর্ণিত হইয়াছে। আহনাফ ইবনে কায়েস (রহঃ) বলেন, আমি মদীনা মুনাওয়ারায় কুরাইশের একটি জামাতের নিকট বসিয়াছিলাম। এক ব্যক্তি আসিল, যাহার চুল শক্ত ছিল। (অর্থাৎ, তৈল ইত্যাদি লাগান ছিল না) পরিধানের কাপড় মোটা ও বেশভূষা অত্যন্ত সাধারণ ছিল। উপস্থিত লোকদের নিকট দাঁড়াইয়া প্রথমে সালাম করিল। অতঃপর বলিল, সম্পদ জমাকারীদেরকে এমন পাথরের সুসংবাদ শুনাইয়া দাও, যাহা জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত

করা হইবে। তারপর উহাকে তাহাদের স্তনের উপর রাখিয়া দেওয়া হইবে। যাহার প্রচণ্ড গরমে গোশত ইত্যাদি সিদ্ধ হইয়া কাঁধের উপর দিয়া টগবগ করিয়া ফুটিতে আরম্ভ করিবে। অতঃপর সেই পাথর কাঁধের উপর রাখা হইবে। তখন ঐ সমস্ত গোশত স্তন দিয়া প্রবাহিত হইতে শুরু করিবে। ইহা বলিয়া তিনি মসজিদের একটি খুঁটির নিকট যাইয়া বসিয়া গেলেন। আহনাফ (রহঃ) বলেন, আমি জানিতাম না যে, তিনি কে। আমি তাঁহার কথা শুনিয়া পিছনে পিছনে গেলাম এবং সেই খুঁটির নিকট বসিয়া পড়িলাম। তারপর আরম্ভ করিলাম, উপস্থিত লোকেরা আপনার কথার দিকে কোন মনোযোগ দেয় নাই বরং তাহারা এই কথাকে অপছন্দ করিয়াছে। তিনি বলিতে লাগিলেন, ইহারা বোকা, কিছুই বুঝে না, আমাকে আমার প্রিয় মাহবুব বলিয়াছেন। আহনাফ (রহঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার প্রিয় মাহবুব কে? তিনি বলিলেন, হযূর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। (তিনি আমাকে বলিয়াছেন,) হে আবু যর! তুমি কি উত্তর পাহাড় দেখিতেছ? আমি মনে করিলাম, হয়ত কোন জায়গায় কাজের জন্য পাঠাইবেন। এইজন্য ইহা দেখাইতেছেন যে, দিনের কত সময় বাকী আছে। আমি বলিলাম, জ্বি হাঁ, দেখিতেছি। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যদি আমার নিকট এই পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণ হয়, তবে আমার মনের ইচ্ছা হইল, উহা সম্পূর্ণ খরচ করিয়া দেই। শুধুমাত্র তিনটি দিনার ব্যতীত। (ইহার বর্ণনা অন্যান্য বেওয়াযাতেও আসিয়াছে।) অতঃপর আবু যর (রাযিঃ) বলিলেন, কিন্তু এই সমস্ত লোকেরা বুঝে না; দুনিয়াকে জমা করিয়া চলিয়াছে। আর আমি আল্লাহর কসম দিয়া বলিতেছি, তাহাদের নিকট আমার না দুনিয়ার কোন প্রয়োজন আছে, না দ্বীনের বিষয়ে কোন কিছু জানার আছে (কাজেই আমি কেন তাহাদের দ্বারা প্রভাবিত হইব, বরং আমি তো স্পষ্টভাবে বলিয়া দিব)। (ফাতহ)

হযরত আবু যর (রাযিঃ)এর একটি ঘটনা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ৫ নং
আয়াতেও আসিতেছে।

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزِ اربعہ صبح کے وقت دو فرشتے (آسمانی سے) اترتے ہیں۔ ایک دُعا کرتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو پھل

② عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ يَوْمٍ
يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَ يَنْزِلُ
فَيَقُولُ أَحَدُهَا اللَّهُمَّ اعْطِ مُسْفِقًا

خَلَقْنَا وَيَقُولُ الْآخَرُ اَللّٰهُمَّ اَعْطِ
عطا فرما، دوسرا دعا کرتا ہے اے اللہ!
مُمِيسًا مَلْفًا، مَتَفَقٍ مَلِيسٍ (مشکوٰۃ)
کر رکھے واسطے کامل برباد کرتے۔

② হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, হযূর সাব্বান্নাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, প্রতিদিন সকালে দুইজন ফেরেশতা (আসমান হইতে) অবতীর্ণ হন। একজন দোয়া করেন, হে আল্লাহ! খরচকারীকে বিনিময় দান করুন। দ্বিতীয় জন দোয়া করেন, হে আল্লাহ! যে জমা করিয়া রাখে, তাহার মাল ধ্বংস করুন।

(মিশকাত : বুখারী, মুসলিম)

কুরআন পাকের আয়াতসমূহের বর্ণনায়ও ২০ নম্বর আয়াত দ্বারা এই হাদীসের সমর্থন পাওয়া যায়। যাহার বিষয়বস্তু হইল, যাহা কিছু তোমরা খরচ করিবে আল্লাহ তায়ালা উহার বিনিময় দান করিবেন। সেইখানে আরও কয়েকটি হাদীস ইহার সমর্থনে উল্লেখ করা হইয়াছে। হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) হযূর সাব্বান্নাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন—যখনই সূর্য উদিত হয়, তখনই উহার দুইদিকে দুইজন ফেরেশতা ঘোষণা করেন; এই ঘোষণা জিন ও মানুষ ব্যতীত সকলেই শুনিতে পায়। অর্থাৎ, হে লোকসকল! স্বীয় প্রতিপালকের দিকে চল। অল্প জিনিস যাহা যথেষ্ট হয়, উহা ঐ অধিক পরিমাণ হইতে অনেক উত্তম যাহা আল্লাহ হইতে গাফেল করিয়া দেয়। আর যখন সূর্য অস্ত যায়, তখন উহার দুইদিকে দুইজন ফেরেশতা উচ্চ আওয়াজে দোয়া করে—হে আল্লাহ! খরচকারীকে বিনিময় দান করুন। আর যে জমা করিয়া রাখে তাহার মালকে ধ্বংস করুন। (আহমদ)

এক হাদীসে আছে, যখন সূর্য উদিত হয়, তখন উহার দুইদিকে দুইজন ফেরেশতা আওয়াজ দেয়—হে আল্লাহ! খরচকারীকে জলদি বিনিময় দান করুন, হে আল্লাহ! যে জমা করিয়া রাখে তাহার মালকে জলদি ধ্বংস করুন।

অন্য এক হাদীসে আছে, আসমানে দুইজন ফেরেশতা রহিয়াছে। তাহাদের দায়িত্বে শুধু একটি কাজ রহিয়াছে, তাহাদের অন্য কোন কাজ নাই। অর্থাৎ, একজন বলিতে থাকে, হে আল্লাহ! খরচকারীকে বিনিময় দান করুন। দ্বিতীয়জন বলে, হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি জমা করিয়া রাখে তাহাকে ধ্বংস দান করুন। (কানয)

বুঝা গেল—শুধু সকাল-সন্ধ্যায়ই নয় ; বরং সবসময়ই তাহাদের এই দোয়া চলিতে থাকে। কিন্তু পূর্বে বর্ণিত রেওয়াজ দ্বারা জানা যায়—এই ফেরেশতারা সূর্য উদয় ও অস্ত যাওয়ার সময় বিশেষভাবে এই দোয়া করে। প্রত্যক্ষ ঘটনা এবং অভিজ্ঞতা দ্বারাও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়, যেমন সম্পদ জমাকারীদের উপর অধিকাংশ সময় এমন এমন অবস্থা আসিয়া পড়ে, যাহার কারণে সমস্ত সম্পদ বরবাদ হইয়া যায়। কাহারও উপর মামলা-মোকদ্দমা আসিয়া পড়ে, কাহারও মধ্যে খেচ্ছাচারিতা দেখা দেয়, কাহারও পিছনে চোর-ডাকাত লাগিয়া যায়।

হাফেজ ইবনে হজর (রহঃ) লিখিয়াছেন, কখনও মূল সম্পদ ধ্বংস হইয়া যায়, কখনও এই ধ্বংস স্বয়ং সম্পদের মালিকের উপর আসিয়া পড়ে। অর্থাৎ, মালিক নিজেরই শেষ হইয়া যায়। আর কখনও নেক আমল বরবাদ হওয়ার দ্বারা ধ্বংস দেখা দেয়। অর্থাৎ, সম্পদের মোহে পড়িয়া তাহার নেক আমল ছুটিয়া যাইতে থাকে। পক্ষান্তরে, যে খরচ করে তাহার মালে বরকত হয়। বরং এক হাদীসে আসিয়াছে, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে দান-খয়রাত করে আল্লাহ তায়ালা তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তিকে উত্তমরূপে হেফাজত করেন। (এহইয়া)

অর্থাৎ, তাহার মৃত্যুর পরেও ওয়ারিসগণ তাহার সম্পদ নষ্ট করে না, অনর্থক কাজে খরচ করিয়া বরবাদ করে না। অপরদিকে অধিকাংশ ধনী লোকদের সন্তানরা পিতার সম্পদের যে পরিণতি করে, উহা সকলের জানা আছে। ইমাম নবভী (রহঃ) লিখিয়াছেন, পছন্দনীয় খরচ উহাই, যাহা নেক কাজের জন্য করা হয়, পরিবার-পরিজনদের জন্য খরচ করা হয় অথবা মেহমানদের জন্য খরচ করা হয় বা অন্যান্য এবাদতে খরচ করা হয়।

কুরতুবী (রহঃ) বলেন, ইহা ফরজ ও নফল উভয় প্রকার এবাদতের জন্য প্রযোজ্য। তবে যে ব্যক্তি নফলে খরচ করে না, সে উপরোক্ত বদদোয়ার উপযুক্ত হয় না। হাঁ, তাহার স্বভাবে যদি এমন কৃপণতা দেখা দেয়, যে কারণে সে ওয়াজিব কাজেও খুশীমনে খরচ করে না, তবে উপরোক্ত বদদোয়ার যোগ্য হইবে। কিন্তু পরবর্তী হাদীস ফরজ ও নফল উভয়ের জন্য ব্যাপক বলিয়া ইঙ্গিত করিতেছে।

مُحَمَّدٌ رَأْسُ الْمَدِينَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا رَأَى شَاهِدٌ
 کہ اسے آدم کے بیٹے تو ضرورت سے ناکد مال
 کو خرچ کرے یہ تیرے لئے بہتر ہے اور تو

۳) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ يَا ابْنَ آدَمَ أَنْ تَبْذُلَ

انْقَضِ خَيْرُكَ وَ اَنْ
تَسِيْكُهُ شَرُّكَ وَلَا تَلَامُ
مَلِي كَفَافٍ وَاَبْدًا يَمُنُّ تَعُوْلُ
زَوَاهِ مُسْلِمٍ، مَشْكُوَةٌ -

اس کر دوک کہ کھتویر تیرے لئے بڑا ہے اور
بقدر کفایت روکھے پر ملامت نہیں، اور
خوشی کہ نہ میں جی کی روئی تیرے قریب ہے اُن
سے ابتداء کر (کہ اسی پر خوشی کناء و سروں
سے مُتَّئِم ہے)۔

⑦ ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হে
আদম সন্তান! তুমি প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ খরচ করিয়া দাও, ইহা
তোমার জন্য উত্তম হইবে। আর যদি তুমি উহা জমা করিয়া রাখ, তবে
ইহা তোমার জন্য মন্দ হইবে। আর প্রয়োজন পরিমাণ জমা করিয়া
রাখাতে কোন দোষ নাই। যাহাদের রুজি তোমার জিম্মায় রহিয়াছে,
তাহাদের উপর হইতে খরচ আরম্ভ কর। (কেননা, তাহাদের উপর খরচ
করা অন্যদের হইতে অগ্রগণ্য।) (মিশকাত : মুসলিম)

ফায়দা : উক্ত বিষয়ের সমর্থনও ৪ নম্বর আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে।
স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন, যাহা অতিরিক্ত হয় উহা খরচ
করিয়া দাও। সেখানে উপরোক্ত হাদীসও বর্ণা করা হইয়াছে। গুরুত্ব ও
ব্যাখ্যার প্রয়োজনে এখানে পুনরায় উল্লেখ করা হইল। প্রকৃতপক্ষে, নিজের
প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ মোটেও জমা করিয়া রাখিবার জন্য নয়।
উহার জন্য সবচেয়ে উত্তম ব্যবস্থা হইল, আল্লাহ তায়ালা ব্যাংকে জমা
করিয়া দেওয়া। যাহা কখনও ধ্বংস হইবে না, উহার উপর কোন বিপদ
আসিবে না; বরং এমন কঠিন মুসীবতের সময় কাজে আসিবে যে, সেই
তুলনায় এখানের প্রয়োজনসমূহ কিছুই নয়। আর সেখানে ঐ সময়
কামাই করিবার কোন উপায় থাকিবে না। সম্পদ বলিতে শুধু উহাই হইবে,
যাহা নিজের সাথে লইয়া গিয়াছে।

এই হাদীসে দ্বিতীয় বিষয় এই যে, প্রয়োজন পরিমাণ জমা করিয়া
রাখাতে দোষ নাই। অর্থাৎ, যেই পরিমাণ প্রকৃত প্রয়োজন এবং যতটুকু না
হইলে চলে না অথবা সঞ্চাল করিতে হয়, সেই পরিমাণ জমা করিয়া
রাখাতে দোষ নাই। আর নিজ জিম্মায় যাহাদের রুজি রহিয়াছে অর্থাৎ
পরিবার-পরিজন অথবা অন্যান্য লোকজন এমনকি জীবজন্তুও যদি
উহাকে আটক করিয়া রাখা হয়, তখন উহাদের খোঁজ-খবর লওয়া তাহার
জিম্মায় হইবে। উহাদেরকে ধ্বংস বা বরবাদ করিলে গুনাহ হইবে। হাদীস

শরীফে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষের গুনাহের জন্য ইহাই অনেক যে, তাহার জিন্মায় যাহার কুজি রহিয়াছে উহাকে সে ধ্বংস করিয়া দিল। (মিশকাত)

আবদুল্লাহ ইবনে সামেত (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আবু যর (রাযিঃ) এর সহিত ছিলাম। তখন তিনি বাইতুল-মাল হইতে তাঁহার নির্ধারিত ভাতা পাইলেন। তিনি নিজের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি খরিদ করিতে যাইতেছিলেন। সঙ্গে তাঁহার বাঁদি ছিল। সে তাহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতেছিল। জরুরী জিনিসপত্র খরিদ করিবার পর তাহার নিকট সাতটি স্বর্ণমুদ্রা বাঁচিয়া গেল। তিনি বাঁদিকে বলিলেন, এইগুলি ভাংতি করিয়া লইয়া আস। (লোকদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিব) আমি বলিলাম, আপনি যদি এই স্বর্ণমুদ্রাগুলি এখন রাখিয়া দেন, তবে যখন প্রয়োজন দেখা দিবে, যেহেতু আসিবে, তখন খরচ করিতে পারিবেন। ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, আমার প্রিয় মাহবুব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার নিকট হইতে এই অঙ্গীকার লইয়াছিলেন যে, যে স্বর্ণ অথবা রূপা বাঁধিয়া জমা করিয়া রাখা হইবে, উহা মালিকের জন্য আগুনের স্ফুলিঙ্গ হইবে; যতক্ষণ না উহাকে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিয়া দেওয়া হইবে।

(তরগীব)

প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস খরচ করিয়া দেওয়ার ব্যাপারে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে এত বেশী উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে যে, কোন কোন সাহাবী ধারণা করিতে লাগিলেন যে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস রাখিবার কাহারো কোন অধিকারই নাই।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বলেন, আমরা হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত এক সফরে যাইতেছিলাম। এক ব্যক্তি তাহার উটনীকে কখনও এইদিকে কখনও ঐদিকে লইয়া যাইতেছিল। ইহা দেখিয়া হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যে ব্যক্তির নিকট অতিরিক্ত সওয়ারী রহিয়াছে, সে যেন এমন ব্যক্তিকে দিয়া দেয়, যাহার নিকট সওয়ারী নাই। আর যাহার নিকট অতিরিক্ত সফরের সামান রহিয়াছে, সে যেন ঐ ব্যক্তিকে দিয়া দেয়, যাহার নিকট সফরের সামান নাই। এমনকি আমাদের ধারণা হইতে লাগিল, নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিসের মধ্যে মানুষের কোন অধিকারই নাই। (আবু দাউদ)

উক্ত লোকটি নিজের উটনীকে এদিক সেদিক লইয়া যাওয়া হয়ত গর্ব ও অহংকারের কারণে ছিল। যদি ইহাই হয়, তবে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ব্যক্তিকেই লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন অর্থাৎ,

প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস গর্ব অহংকারের জন্য নয় ; বরং অন্যদের সাহায্যের জন্য। কোন কোন আলেম বলিয়াছেন, উটনীকে এদিক সেদিক লইয়া যাওয়া দ্বারা তাহার অবর্ণনীয় করুণ অবস্থা দেখানোর জন্য সওয়াালের বাহ্যিক রূপ ছিল। এমতাবস্থায় হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যদেরকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন।

عَنْ عَقَبَةَ بْنِ الْعَارِثِ
قَالَ صَلَّيْتُ وَرَأَيْتُ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِالْمَدِينَةِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ
ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا فَتَخَطَّى
رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ
عُبَيْرِ نِسَائِهِ فَقَزَعَ النَّاسُ
مِنْ سُرْعَتِهِ فَقَرَجَ عَلَيْهِمْ
فَرَأَى أَنَّهُمْ قَدْ عَجِبُوا
مِنْ سُرْعَتِهِ قَالَ ذَكَّرْتُ
شَيْئًا مِنْ تَبَرُّعِنَا
فَكَرِهْتُ أَنْ يَغِيبَتْنِي
فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ -
(رواه البخاري مشكوة)

খুবীকতے ہیں کہ میں نے مدینہ میں حضور پاک ﷺ
صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میری نماز میں حضور پاک
نماز کا سلام پھیرا اور حضور پاک ﷺ پر بعد نماز کے نہایت
مجلت کیا کہ تم لوگوں کے سر پر دوں پر کو گزرتے
ہوئے از روئے سطرات کے گزروں میں سے ایک گھر
میں تشریف لے گئے۔ لوگوں میں حضور پاک کے اس
طرح جلدی تشریف لے جانے سے تشریف پیدا
ہوئی کہ یہ معلوم کیا بات پیش آگئی حضور پاک
سے واپس تشریف لے گئے تو لوگوں کی حیرت کو خوشی
فرمایا اس پر حضور پاک ارشاد فرمایا کہ مجھے سارے ایک
مکمل یاد آگیا تھا جو گھر میں رہ گیا تھا مجھ پر بات گئی
گذری (کہ کبھی موت آجائے اور وہ رہ جائے اور
میدانِ حشر میں اس کی جوب دی اور اس کا صاحب)
مجھ روک لے اس لئے اس کو جلدی ہانٹ دینے
کو کہہ کر آیا ہوں۔

⑧ উকবা (রাযিঃ) বলেন, আমি মদীনা তাইয়েবায় হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে আসরের নামায পড়িলাম। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের সালাম ফিরাইলেন। কিছুক্ষণ পর উঠিয়া অত্যন্ত দ্রুতগতিতে মানুষের কাঁধের উপর দিয়া অতিক্রম করিয়া বিবিদের কোন এক ঘরে প্রবেশ করিলেন। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এইভাবে দ্রুত চলিয়া যাইতে দেখিয়া লোকেরা বিচলিত হইল ; না জানি কি হইয়া গেল। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম ঘর হইতে ফিরিয়া আসিয়া লোকদের অস্থিরতা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, একটি স্বর্ণের টুকরার কথা আমার মনে পড়িয়া গিয়াছিল, যাহা ঘরে রহিয়া গিয়াছিল। আমার কাছে অপছন্দনীয় মনে হইল যে, (কখন মৃত্যু আসিয়া যায়, আর উহা থাকিয়া যায়, অতঃপর হাশর ময়দানে উহার জবাবদিহি ও হিসাব) আমাকে আটকাইয়া রাখে। এইজন্য জলদি উহা বন্টন করিয়া দিবার জন্য বলিয়া আসিলাম। (মিশকাত : বুখারী)

ফায়দা : এই ঘটনার বিবরণেই অন্য হাদীসে আসিয়াছে, আমার নিকট ইহা অপছন্দ লাগিল যে, হয়ত আমি ভুলিয়া যাইব আর রাত্রিতে উহা আমার নিকট থাকিয়া যাইবে। ইহা হইতে বেশী আরও আশ্চর্যজনক একটি ঘটনা হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে—হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসুস্থতার সময় তাহার নিকট ছয় সাতটি স্বর্ণমুদ্রা ছিল। (তখনই হয়ত কোথাও হইতে আসিয়াছিল।) হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নির্দেশ দিলেন, এইগুলি জলদি বন্টন করিয়া দাও। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুরুতর অসুস্থতার কারণে উহা বন্টন করিবার সুযোগ আমার হয় নাই। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিতে চাহিলেন, ঐ স্বর্ণমুদ্রাগুলি বন্টন করিয়া দিয়াছ কি? আমি আরজ করিলাম, আপনার অসুস্থতার দরুন একেবারেই সুযোগ পাই নাই। বলিলেন, লইয়া আস। আমি লইয়া আসিলে উহা হাতের উপর রাখিলেন এবং বলিলেন, আল্লাহর নবীর কি ধারণা, (অর্থাৎ, তাহার কি পরিমাণ লজ্জা হইবে,) যদি সে এইগুলি নিজের নিকট রাখিয়া এই অবস্থায় আল্লাহ তায়ালার সহিত সাক্ষাত করে! (মিশকাত)

অন্য এক হাদীসে হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হইতে এই ধরনের আরও একটি ঘটনা বর্ণনা করা হইয়াছে। উহাতে আছে, (স্বর্ণমুদ্রাগুলি) রাত্রেই কোথাও হইতে আসিয়াছিল। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘুম উড়িয়া গেল। রাত্রে শেষ অংশে আমি উহা বন্টন করিয়া দেওয়ার পর তিনি ঘুমাইলেন। (এহইয়া)

হযরত সাহল (রাযিঃ) বলেন, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সাতটি স্বর্ণমুদ্রা ছিল, যাহা হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর নিকট রক্ষিত ছিল। তিনি হযরত আয়েশা (রাযিঃ)কে বলিলেন, উহা আলীর নিকট পাঠাইয়া দাও। ইহা বলিবার পর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেঁঠশ হইয়া গেলেন। ইহাতে হযরত আয়েশা (রাযিঃ) তাহার খেদমতে মশগুল হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পর

ইশ কিরিয়া আসিলে পুনরায় একই কথা বলিলেন। অতঃপর আবার বেঁধে হইয়া গেলেন। এইভাবে বারবার বেঁধে হইতেছিলেন। অবশেষে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারবার বলিবার কারণে হযরত আয়েশা (রাযিঃ) স্বর্ণমুদ্রাগুলি হযরত আলী (রাযিঃ)এর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তিনি উহা বন্টন করিয়া দিলেন। এই ঘটনা দিনের বেলা ঘটিয়াছিল, আর সেইদিন সোমবারের রাত্র ছিল, অর্থাৎ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের শেষ রাত্র। অথচ হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর ঘরে সেই রাত্রে বাতির তৈল পর্যন্ত ছিল না। এক মহিলার নিকট বাতি পাঠাইয়া বলিলেন, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই অসুস্থ, ইন্তেকালের সময় নিকটবর্তী। এই বাতিটির মধ্যে ঘি ঢালিয়া দাও, যাহাতে জ্বলাইতে পারি। (ভারগীব)

হযরত উম্মে সালামা (রাযিঃ) হইতে এইরূপ আরও ঘটনা বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, একবার হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসিলেন। তাঁহার চেহারা মুবারক বিষন্ন ছিল। আমি মনে করিলাম, তিনি হযরত অসুস্থ। আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার চেহারা বিষন্ন ভাব দেখা যাইতেছে, কি হইয়াছে? তিনি বলিলেন, রাত্রে সাতটি স্বর্ণমুদ্রা আসিয়াছিল, উহা বিছানার এক কোণায় পড়িয়া রহিয়াছে; এখনও বন্টন করা হয় নাই। (ইরাকী এহইয়া)

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাদিয়া আসিতেই থাকিত। কিন্তু দিন হউক, রাত্র হউক, সুস্থ অবস্থা হউক, অসুস্থ অবস্থা হউক; যতক্ষণ পর্যন্ত উহা বন্টন না হইয়া যাইত, ততক্ষণ পর্যন্ত মনের উপর একপ্রকার ভার অনুভব করিতেন। এমনকি নিজের ঘরে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় রাত্রে বাতি জ্বলাইবার জন্য তৈলও নাই। কিন্তু সাতটি স্বর্ণমুদ্রা থাকা সত্ত্বেও ঘরের প্রয়োজনের কথা না হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনে আসিল, না উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর স্মরণে আসিল যে, সামান্য তৈলের ব্যবস্থা করিয়া লই। (লেখক শায়খুল হাদীস (রহঃ) বলেন,) আমার পিতা (রহঃ)এর এই অভ্যাস বারবার দেখিবার সুযোগ হইয়াছে যে, রাত্রে তিনি নিজের মালিকানায় কোন টাকা-পয়সা রাখিতে চাহিতেন না, ধার-কর্জ তো সবসময়ই লাগিয়া থাকিত, এমনকি ইন্তেকালের সময়ও সাত-আট হাজার থাকিলে উহা কোন পাওনাদারকে দিয়া দিতেন, আর ভাংতি পয়সা হইলে বাচ্চাদের মধ্যে কাহাকেও দিয়া দিতেন। আর বলিতেন, আমার মন চায়

না যে, এই অপবিত্র বস্তু রাতে আমার নিকট থাকিবে। কখন মৃত্যু আসিয়া যায় জানা নাই।

ইহা হইতে আরও উচ্চ পর্যায়ের কথা আমি হযরত শাহ আবদুর রহীম রায়পুরী (রহঃ) সম্পর্কে শুনিয়াছি। তাঁহার নিকট হাদিয়া-তোহফা অধিক পরিমাণে আসিত। যখন কিছু জমা হইয়া যাইত, তখন অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে উহা বিভিন্ন কল্যাণ কাজে বন্টন করিয়া দিতেন। ইহার পর আবার যখন কোথাও হইতে কিছু আসিয়া যাইত, তখন চেহারা মুবারকে বিষমভার ছাপ দেখা যাইত। তখন তিনি বলিতেন, এই যে আরও আসিয়া গিয়াছে। জীবনের শেষ সময়ে তিনি নিজের পরনের কাপড়গুলিও বন্টন করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার বিশিষ্ট খাদেম হযরত মাওলানা আবদুল কাদের (রহঃ)কে বলিয়াছিলেন, এখন তো তোমার নিকট হইতে ধার করিয়া পরিব। আল্লাহর ওলীদের অবস্থা বড়ই আশ্চর্য; ইহাও একটি মনের আবেগ ও প্রবল আগ্রহ ছিল যে, সেইভাবে দুনিয়াতে আসিয়াছিলেন সেইভাবেই চলিয়া যাইবেন; এই দুনিয়ার কোন সম্পদ কেন মালিকানায় না থাকে।

• ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ! کوئی سادہ
 ثواب کے اعتبار سے بڑھا جائے، حضور نے
 فرمایا یہ کہ تو صدقہ ایسی حالت میں کہے، کہ
 سند سے ہر مال کی حرص دل میں ہو، اپنے
 فقیر ہو جانے کا درد ہو، اپنے مالدار ہونے کی تمنا ہو
 اور صدقہ کہے کہ اس وقت تک متوخر نہ کر کہ شرح
 طلق کہہ سنبھالے یعنی سولے کا وقت قریب آ
 جائے تو کریں کہہ کر اتنا مال فلاح (سہ) کا
 اور اتنا مال فلاح (مرد) کا مالا کلب مال
 فلاح (دار) کا ہو گیا۔

⑤ عَنْ أَنِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ
 رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْ
 الصَّدَقَةِ أَكْثَرُ أَجْرًا قَالَ
 أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَبِيحٌ
 شَبِيحٌ تَنْفُسِي الْفَقْرَ
 وَتَأْمَلُ الْغِنَى وَلَا تَمِيلُ
 حَتَّى إِذَا بَلَغْتَ الْعُلُقُومَ
 قُلْتَ يَفْلَانِ كَذَا وَفُلَانِ
 كَذَا وَقَدْ كَانَ يَفْلَانِ
 متفق عليه۔ (مشکوٰۃ)

⑤ এক ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোন সদকা সওয়াবের দিক দিয়া বড়? হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এমন অবস্থায় সদকা করিবে, যখন তুমি সুস্থ থাক, অন্তরে সম্পদের লোভ থাকে, গরীব হইয়া যাওয়ার ভয় থাকে, ধনী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকে।

আর সদকা করিতে এত দেবী করিও না যে, রূহ হালক পর্যন্ত পৌছিয়া যায়, অর্থাৎ মৃত্যুর সময় নিকটে আসিয়া যায় আর তখন তুমি এইরূপ বলিতে আরম্ভ কর যে, এই পরিমাণ মাল অমুক (মসজিদ)এর জন্য এবং এই পরিমাণ মাল অমুক (মাদ্রাসা)এর জন্য ; অথচ এখন তোমার মাল অমুক অর্থাৎ (ওয়ারিস)এর জন্য হইয়া গিয়াছে। (মিশকাত : বুখারী, মুসলিম)

ফায়দা : অমুক (ওয়ারিস)এর জন্য হইয়া গিয়াছে—ইহার অর্থ হইল, উহাতে ওয়ারিসের হক शामिल হইয়া গিয়াছে। এই কারণেই ওসিয়ত শুধু এক তৃতীয়াংশের মধ্যে হইতে পারে এবং মরণাপন্ন অবস্থার দান-খয়রাতও তিন ভাগের এক ভাগের মধ্যে হইতে পারে। মরণাপন্ন ব্যক্তির জন্য ইহার চেয়ে বেশী ওসিয়ত করার অধিকার নাই। এইজন্যই অন্য এক হাদীসে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে—মানুষ বলে, আমার মাল আমার মাল ; অথচ তাহার মাল শুধু তিনটি জিনিস, যাহা সে খাইয়াছে অথবা পরিধান করিয়াছে অথবা আল্লাহর ভাণ্ডারে সদকা করিয়া জমা করিয়া দিয়াছে। ইহা ছাড়া যাহা রহিয়া গিয়াছে উহা চলিয়া যাইবে, অর্থাৎ এই ব্যক্তি উহা অন্য লোকদের জন্য ছাড়িয়া যাইবে। (মিশকাত)

অন্য এক হাদীসে আছে, মানুষ তাহার সুস্থ সময়ে একটি দেবহাম সদকা করিবে ; ইহা মৃত্যুর সময় একশত দেবহাম সদকা করা হইতে উত্তম। (মিশকাত) কেননা, প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুর সময় তো সে যেন অন্যের সম্পদ হইতে সদকা করিতেছে, এমন তো তাহার কোন সম্পদ থাকিতেছে না। যাহা কিছু রহিয়াছে, অবশ্যই তাহাকে উহা ছাড়িয়া যাইতে হইবে।

আরেক হাদীসে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে—যে ব্যক্তি মৃত্যুর সময় সদকা করে, তাহার দৃষ্টান্ত এইরূপ, যেমন কোন ব্যক্তি পেট ভরিয়া খাইল, অতঃপর বাঁচিয়া যাওয়া খাবার কাহারো জন্য হাদিয়া বা তোহফা স্বরূপ লইয়া গেল। (মিশকাত)

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন উদাহরণ দ্বারা এই বিষয়ে সতর্ক করিয়াছেন যে, সুস্থ অবস্থা হইল, সদকা বা দান খয়রাতের আসল সময়। কেননা, তখনই নিজের নফসের সহিত প্রকৃত মুকাবেলা হয়। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, মৃত্যুকালে সদকা বা ওসিয়ত অনর্থক ; বরং উহারও সওয়াব হইবে, আখেরাতের সঞ্চয় হিসাবে উহাও গণ্য হইবে। তবে ঐ পরিমাণ সওয়াব হয় না, যে পরিমাণ নিজের প্রয়োজন ও আরাম-আয়েশের মুকাবেলায় সদকা বা দান করিলে হয়। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ

خَيْرَ اِنْ الْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَالْاَقْرَبَيْنَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

অর্থাৎ, তোমাদের উপর ফরজ করা হইতেছে যে, যখন তোমাদের কাহারও মৃত্যু নিকটবর্তী হয়—যদি তাহার ত্যাজ্য সম্পত্তি থাকে, তবে পিতামাতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের জন্য ন্যায়সঙ্গতভাবে কিছু ওসিয়ত করিবে। যাহাদের মধ্যে আল্লাহর ভয় আছে, তাহাদের জন্য ইহা অবশ্য কর্তব্য। (বাকারা : ১৮০) উক্ত আয়াতে যে হুকুম বর্ণিত হইয়াছে, উহা ইসলামের শুরু যুগে ছিল। সে সময় পিতা-মাতার জন্য ওসিয়ত করা ফরজ ছিল। পরবর্তীতে যখন মিরাসের হুকুম নাযিল হইল, তখন পিতামাতা ও যে সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের হক শরীয়ত নির্ধারিত করিয়া দিয়াছে, তাহাদের জন্য ওসিয়তের হুকুম রহিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যে সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের হক শরীয়ত নির্ধারিত করে নাই, তাহাদের জন্য তিন ভাগের একভাগ সম্পদের ওসিয়ত করার বিধান এখনও বাকী রহিয়াছে। তবে মিরাসের হুকুম নাযিল হওয়ার পূর্বে ইহা ফরজ ছিল, এখন আর ফরজ নাই।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, উক্ত আয়াত শরীফের হুকুমের দ্বারা ঐ সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের জন্য অসীমতের হুকুম রহিত হইয়া গিয়াছে, যাহারা ওয়ারিস হিসাবে গণ্য হয়। আর যাহারা ওয়ারিশ হয় না, তাহাদের জন্য ওসিয়তের হুকুম রহিত হয় নাই।

কাতাদা (রহঃ) বলেন, উক্ত আয়াত শরীফে এখন ওসীমতের হুকুম ঐ সমস্ত লোকের জন্য রহিয়া গিয়াছে, যাহারা ওয়ারিস হয় না ; তাহারা আত্মীয়-স্বজন হউক বা না হউক। (দুররে মানসূর)

এক হাদীসে আল্লাহ তায়ালায় এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে, হে আদম সন্তান! তুমি তোমার জীবনকালে কৃপণ ছিলে আর মরণকালে অবখা স্বগ্রহ করিতে শুরু করিয়াছ। দুই মন্দ একত্র করিও না, এক—জীবনকালে কার্পণ্য, দ্বিতীয়—মৃত্যুর সময় অতিরিক্ত দান। তুমি তোমার এমন আত্মীয়-স্বজনকে দেখ, যাহারা তোমার উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে ; তাহাদের জন্য কিছু ওসিয়ত করিয়া যাও। (কানুয)

পূর্বে বর্ণিত ২ নম্বর আয়াতের বর্ণনায় স্বয়ং আল্লাহ তায়ালায় পাক কালামেও এইদিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, মানুষের অন্তরে মালের মহব্বত ঠাণ্ডা হইয়া যাওয়ার পর সদকা করা হইতে এমন সময় সদকা করা উত্তম যখন মালের মহব্বত অন্তরে পীড়া দিতে থাকে।

এক হাদীসে আছে, আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তির প্রতি অসন্তুষ্ট, যে

جیہدشای کفایتا کریراھے آار مآقارلے داتا ساجیراھے۔ (کانہ)

سؤتراۛ ھے سمسؤ لؤك دان-خیراؤ و ویراکیےر ہارارے مآقار سمیرے ارےفکا کرے، ہہا ٲھمدریہ جیریس نہی۔ ارھے تہ ہہا ہا ناہ ھے، کھن اےہ کیارے مآقار آاسیرا ہاہے۔ اہ ہرہرےر شیرکیرہ انےک ہٹنا دےہیرار سؤرؤگ ہہیراھے ھے، مآقار سمیر انےک دان-خیراؤ و ویراکیے کرار آاشا-آاکاؤکا لؤك دےر مہا ہیل۔ کيسؤ رؤگ-ہارہیہ اہمناہے آاکراؤ ہہیراھے ھے، کيسؤ کرار سؤرؤگ ہہ نہی۔ کھ ٲھکاراٹے آاکراؤ ہہیرا گیراھے، کاهارؤ آوان کھ ہہیرا گیراھے۔ کواہاوا اؤؤراہیکاری و سہا-سؤرؤکاریرہن دان-خیراؤرےر ہارارے اریرہک ہہیرا دایاہیراھے۔ آار ہدی اہ سمسؤ ہارہ-ہیراؤ اؤیرکرم کریرا مآقار سمیر دان-خیراؤرےر سؤرؤگ ٲاہیراؤ ہار ہاا خہ کمرہ ہہیرا ہاکے، تہوؤ اہ ٲریرماہ سؤرؤر تہ ہر نا، ہاا نیجےر خاہشکے دہاہیرا دان-خیراؤ کریرلے ہر۔ اہہا ہدی جیہدشای نیجےر دؤرلار کارہے دان-خیراؤ نا کریرلے ٲارے، تہے مآقار سمیر دان کریرلے ٲاراکےؤ سؤرؤگ مہے کریرلے۔ مآقار ٲر کھ کاهارؤ کھا اؤرا کرے نا ؛ سہا ہ دؤہ-اار دیر کاناکاراٹ کریرا ڈولیرا ہار ؛ اریر دیر ہہا دہا ہاہےتہے۔ ہاا کيسؤ لہیرا ہاہےتہے ہر، نیجےہ نیجےر سؤس لہیرا ہاؤ ؛ کاکے آاسیرے۔

رہی اسراہیل کے) ایک آدمی نے اپنے دل میں
کہا کہ آج رات کو چھکے سے صدقہ کر دوں گا۔ چنانچہ
رات کو چھکے سے ایک آدمی کے ہاتھ میں مال لے
کر چلا آیا۔ صبح کو لوگوں میں آپس میں چرچا ہوتا
کہ رات کو کسی شخص نے ایک چھوٹا سا صدقہ دے دیا اس نے
کہ یہ مال نے کہا یا اللہ چھوٹا سا صدقہ کہہ کر میں بھی گئے

ہی ملے تو صرف یہ کہ اس سے بھی زیادہ بہ حال
کو دیا جاتا تو ہی بتا میں کیا کر سکتا تھا) پھر اس نے
دوبارہ اٹھان کر آج رات کو پھر صدقہ کر دیا کہ اگر یہ
تو ضائع بھی ہوتا تو یہ رات کو صدقہ کا مال لے کر نکلا

④ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْهُ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ
لَّا تَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ
فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا
فِي يَدِ سَارِقٍ فَأَصْبَحُوا

يَتَحَدَّثُونَ تُصَدِّقُ الْمَنَكَةَ
عَلَى سَارِقٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ
لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ
لَّا تَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ

فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا
فِي يَدِ زَانِيَةٍ فَأَصْبَحُوا
يَتَصَدَّقُونَ تَصَدَّقَ اللّٰهُ
عَلَى زَانِيَةٍ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ
لَكَ الْعَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ
لَا تَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ
فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا
فِي يَدِ غَنِيٍّ فَأَصْبَحُوا
يَتَصَدَّقُونَ تَصَدَّقَ اللّٰهُ
عَلَى غَنِيٍّ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ
لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ
وَزَانِيَةٍ وَغَنِيٍّ - فَأَتَى
فَقِيلَ لَهُ اَمَّا صَدَقَتُكَ
عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهٗ اَنْ
تَسْتَعِيفَ عَنْ سَرَقَتِهِ
وَ اَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا
اَنْ تَسْتَعِيفَ عَنْ زِنَاهَا
وَ اَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهٗ
يَعْتَمِرُ فَيُنْفِقَ مِمَّا
اَعْطَاهُ اللّٰهُ -

(متفق علیہ مشکوٰۃ)

اور اسکو ایک عورت کو دے آیا (یہ خیال کیا ہوگا کہ
یہ تو چوری کیا کہہ سکی) صبح کو چوپا بٹا کر رات
کوئی شخص غلام بیکار عورت کو صدقہ دے گیا۔ اس نے
کہا یا اللہ تیرے ہی لئے تعریف ہے تاکہ یہ غلامی عورت
پر بھی (کہ میرا مال تو اس سے بھی کم ہے جو کہ قابلِ قتل
پھر میری ترسواں کیا کہ اتنی رات کو خود صدقہ دے کر گیا
چلو چلتا کو صدقہ لے کر گیا اور اسکو ایک شخص کو دیا
جو مالدار تھا صبح کو چوپا بٹا کر ایک مالدار کو
صدقہ دے گیا اس صدقہ دینے والے نے کہا یا اللہ تیرے
لئے تعریف ہے چور پر بھی نہ کہنے والی عورت پر
بھی اور غنی پر بھی رات کو خواب میں دیکھا کہ تیرا
صدقہ قبول ہو گیا (تیرا صدقہ چور پر اس لئے کرایا
گیا) کہ شاید وہ اپنی چوری کی عادت سے توبہ کر لے
اور زانیہ پر اس لئے کہ وہ شاید زنت سے توبہ کر لے
(جب وہ یہ دیکھے گی کہ بغیر منہ کالا کر کے بھی اللہ
جل شانه عطا فرماتے ہیں تو اس کو خیر آئے گی
اور غنی پر اس لئے تاکہ اس کو خیر حاصل ہو
کہ اللہ کے بندے کس طرح نجیب کہ صدقہ دے
ہیں اس کی وجہ سے) شاید وہ بھی اس مال
میں سے جو اس کو اللہ جل شانہ نے عطا فرمایا
بہ صدقہ کر دے۔

⑥ (بنی اسرائیل گوتھر) ایک ব্যক্তি মনে মনে বলিল, আজ রাতে গোপনে সদকা করিব। সুতরাং রাতে এক ব্যক্তির হাতে গোপনে মাল দিয়া চলিয়া আসিল। সকালে লোকদের মধ্যে পরস্পর আলোচনা হইল, রাতে

কোন ব্যক্তি একটি চোরকে সদকা দিয়া গিয়াছে। উক্ত সদকাকারী ব্যক্তি বলিল, হে আল্লাহ! চোরকে সদকা দেওয়ার ব্যাপারেও তোমারই প্রশংসা। (কেননা, যদি তাহার চেয়েও খারাপ লোকের হাতে পড়িত, তখনই বা আমি কি করিতে পারিতাম।) লোকটি পুনরায় সংকল্প করিল, আজ রাত্রে আবার সদকা করিব। (কেননা, প্রথম সদকা তো নষ্ট হইয়া গিয়াছে।) সুতরাং রাত্রে সদকার মাল লইয়া বাহির হইল এবং উহা একজন মহিলাকে দিয়া আসিল। (হয়ত সে ধারণা করিয়াছে যে, মহিলা তো আর চোর হইবে না।) সকালে লোকেরা বলাবলি করিল, রাত্রে কোন ব্যক্তি অমুক ব্যভিচারিণী মহিলাকে সদকা দিয়া গিয়াছে। সে বলিল, হে আল্লাহ! ব্যভিচারিণী মহিলাকে দান করার ব্যাপারেও তোমারই প্রশংসা। (কেননা, আমার মাল তো তাহার চেয়েও নিম্নস্তরের লোকের উপযুক্ত ছিল।) অতঃপর তৃতীয়বার এরাদা করিল, আজ রাত্রে অবশ্যই সদকা করিব। সুতরাং রাত্রে সদকা লইয়া গেল এবং উহা এমন এক ব্যক্তিকে দিয়া গেল, যে ধনী। সকালে বলাবলি হইল, রাত্রে একজন ধনী লোককে সদকা দেওয়া হইয়াছে। উক্ত সদকাকারী বলিল, হে আল্লাহ! তোমারই প্রশংসা; চোরের ব্যাপারেও, ব্যভিচারিণী মহিলার ব্যাপারেও এবং ধনীকে দান করার ব্যাপারেও। রাত্রে সে স্বপ্নে দেখিল—(তোমার সদকা কবুল হইয়া গিয়াছে) তোমার সদকা চোরের উপর এইজন্য (করানো হইয়াছে) যে, হয়ত সে তাহার চুরির অভ্যাস হইতে তওবা করিয়া লইবে। আর ব্যভিচারিণী মহিলার উপর এইজন্য যে, হয়ত সে ব্যভিচার হইতে তওবা করিয়া লইবে। (যখন সে দেখিবে যে, মন্দ কাজ করা ব্যক্তিতই আল্লাহ তায়ালা দান করেন, তখন তাহার লজ্জা হইবে।) আর ধনীর উপর সদকা এইজন্য করাইয়াছি, যাহাতে তাহার শিক্ষা হয় (যে, আল্লাহর বান্দারা কিভাবে গোপনে সদকা করিয়া থাকে। ইহাতে) হয়ত সেও ঐ সম্পদ হইতে যাহা আল্লাহ তায়ালা তাহাকে দান করিয়াছেন, সদকা করিতে শুরু করিবে।

(মিশকাত : বুখারী, মুসলিম)

ফায়দা : এক হাদীসে এই ঘটনা অন্যভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। হইতে পারে, উহা অন্য কোন ঘটনা হইবে। কেননা, এই ধরনের বিভিন্ন ঘটনা সংঘটিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। আর যদি উহা একই ঘটনা হয়, তবে উহা দ্বারা এই ঘটনার কিছু ব্যাখ্যা হইয়া গেল।

তাউস (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি মান্নত করিল, এই বস্তিতে সর্বপ্রথম যাহার উপর আমার দৃষ্টি পড়িবে, তাহার উপর সদকা করিব। ঘটনাক্রমে সর্বপ্রথম এক মহিলার সহিত দেখা হইল, তাহাকে সদকার মাল দান

করিল। লোকেরা বলিল, এই মহিলা তো অত্যন্ত চরিত্রহীনা। উক্ত সদকাকারী ইহার পর সর্বপ্রথম যাহাকে দেখিল, তাহাকে দান করিল। লোকেরা বলিল, এই ব্যক্তি তো অত্যন্ত নিকৃষ্ট লোক। অতঃপর সেই ব্যক্তি যাহাকে সর্বপ্রথম দেখিল, তাহাকে সদকা দান করিল। লোকেরা বলিল, এই লোক তো বড় ধনী ব্যক্তি। সদকাকারী বড় দুঃখ পাইল। সে স্বপ্নে দেখিল—তাহাকে বলা হইতেছে, আল্লাহ তায়ালা তোমার তিনটি সদকাই কবুল করিয়া লইয়াছেন। ঐ মেয়েলোকটি ব্যভিচারিণী ছিল ; শুধু অভাবের কারণে সে এই অসৎ কাজ করিত। তুমি যখন তাহাকে মাল দিয়াছ, তখন হইতে সে এই খারাপ কাজ ছাড়িয়া দিয়াছে। দ্বিতীয় ব্যক্তি চোর ছিল, সেও অভাবের কারণে চুরি করিত। তোমার মাল দেওয়ার কারণে সে চুরি ছাড়িয়া দিয়াছে। তৃতীয় ব্যক্তি ধনী লোক ; কিন্তু সে কখনও সদকা করিত না। তোমার সদকা করার কারণে তাহার শিক্ষা হইয়াছে যে, আমি তাহার তুলনায় বেশী সম্পদশালী, কাজেই তাহার চেয়ে অধিক সদকা করিবার যোগ্যতা রাখি। এখন তাহার সদকা করিবার তৎপর হইয়া গিয়াছে। (কোনও)

উক্ত হাদীস দ্বারা এই কথা স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, সদকাকারীর নিয়তে এখলাস থাকা সত্ত্বেও যদি সদকা অপাত্রে পৌছিয়া যায়, তবে উহাতেও আল্লাহ তায়ালা কোন হেকমত নিহিত থাকে ; ইহাতে দুঃখিত হওয়া চাই না। মানুষের কাজ হইল, নিয়তে এখলাস রাখা, কেননা, আসল জিনিস হইল, নিজের এরাদা ও কাজ। উক্ত ঘটনায় এই সদকাকারী ব্যক্তিদের ফযীলতও প্রকাশ পাইল যে, নিজে চেষ্টা করা সত্ত্বেও যখন সদকা অপাত্রে খরচ হইয়া গেল, ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া সদকা করিবার ইচ্ছা ত্যাগ করে নাই ; বরং বার বার যোগ্য পাত্রে সদকার মাল খরচ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে থাকিল। ইহাই ছিল তাহাদের ঐ এখলাস ও নেক নিয়ত, যাহার বরকতে তাহাদের তিনটি সদকাই কবুল হইয়া গিয়াছে এবং কবুলের সুসংবাদও স্বপ্নের মাধ্যমে প্রকাশ হইয়া গিয়াছে।

হাফেজ ইবনে হজ্বর (রহঃ) বলেন, উক্ত হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, বাহ্যিকভাবে যদি সদকা সঠিক পাত্রে খরচ না হয়, তবে পুনরায় আদায় করা মুস্তাহাব ; পুনরায় আদায় করিতে বিরক্ত হওয়া চাই না। যেমন, কোন কোন বুয়ুর্গ হইতে বর্ণিত আছে যে, খেদমত করা বন্ধ করিও না ; যদিও কবুল না হওয়ার লক্ষণ দেখা যায়।

আল্লামা আইনী (রহঃ) বলেন, ইহাতে এই কথাও জানা গেল যে, আল্লাহ তায়ালা মানুষের নেক নিয়তের বিনিময় অবশ্যই দান করেন।

কেননা, উক্ত সদাকারী ব্যক্তিগণ খালেস আত্মাহর জন্য সদকা করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন (এইজন্যই রাতে গোপনে দিয়াছিলেন)। কাজেই আত্মাহ ত্যাগা উহা কবুল করিয়াছেন। আর অপাত্রে খরচ হওয়ার কারণে ফিরাইয়া দেন নাই।

④ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَصَدَّقُوا بِمَالِكِكُمْ عَلَىٰ أَوْلَادِكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ عَلَىٰ أَوْلَادِهِمْ وَمَنْ يَصُدَّقْ بِمَالِهِ عَلَىٰ أَهْلِهِ يَكُنْ لَهُ أَجْرُ ثَلَاثِينَ نَفْسًا
 ⑤ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَصَدَّقُوا بِمَالِكِكُمْ عَلَىٰ أَوْلَادِكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ عَلَىٰ أَوْلَادِهِمْ وَمَنْ يَصُدَّقْ بِمَالِهِ عَلَىٰ أَهْلِهِ يَكُنْ لَهُ أَجْرُ ثَلَاثِينَ نَفْسًا

⑥ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সদকা করার ব্যাপারে জ্বলদি কর। কেননা, বিপদ সদকাকে ডিঙ্গাইতে পারে না।

(মিশকাত : রায়ীন)

ফায়দা : অর্থাৎ, যদি কোন আপদ-বিপদ আসিবার থাকে, তবে উহা সদকার কারণে পিছনে থাকিয়া যায়। একটি দুর্বল সনদযুক্ত হাদীসে আসিয়াছে, সদকা মন্দেবর সত্তরটি দরজা বন্ধ করে। এক হাদীসে আসিয়াছে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিজেদের সম্পদকে যাকাত আদায় করার মাধ্যমে পবিত্র কর এবং নিজেদের রোগীদের সদকার দ্বারা চিকিৎসা কর। আর দোয়ার দ্বারা মুসীবতের ডেউয়ের মোকাবিলা কর। (ভারগীব)

‘কানযুল উম্মাল’ কিতাবে কয়েকটি হাদীসে এই বিষয় বর্ণিত হইয়াছে যে, তোমরা সদকার মাধ্যমে নিজেদের রোগীদের চিকিৎসা কর। আর অভিজ্ঞতাও ইহার সাক্ষী যে, অধিক পরিমাণে সদকা দ্বারা রোগ হইতে সুস্থতা লাভ হয়।

এক হাদীসে আসিয়াছে, সদকা দ্বারা রোগীদের চিকিৎসা কর। কেননা, সদকা অপমান ও জিল্লতি দূর করে, রোগ-ব্যর্থিও দূর করে, নেকী বৃদ্ধি করে এবং আয়ু বৃদ্ধি করে। (কানয)

এক হাদীসে আসিয়াছে, সদকা সত্তর প্রকার বিপদ-আপদ হইতে রক্ষা করে। তন্মধ্যে সর্বনিম্ন হইল, কুষ্ঠ ও শ্বেত রোগ। (কানয)

এক হাদীসে আসিয়াছে, তোমার দুশ্চিন্তা ও পেরেশানীর ক্ষতিপূরণ সদকা দ্বারা কর। ইহাতে আত্মাহ ত্যাগা তোমার ক্ষতিও দূর করিয়া দিবেন এবং তোমার শত্রুর মোকাবিলায় তোমাকে সাহায্য করিবেন।

(কানয)

অপর এক সহীহ হাদীসে আসিয়াছে, যখন কোন ব্যক্তি কোন মুসলমানকে কাপড় পরিধান করায়, তখন যতক্ষণ পর্যন্ত পরিধানকারী

শরীরে ঐ কাপড়ের একটি টুকরাও থাকিবে, ততক্ষণ সেই দানকারী ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালায় হেফাজতে থাকিবে।

ইবনে আবিল জাদ (রহঃ) বলেন, সদকা মন্দের সত্তরটি দরজা বন্ধ করে। (এইহিয়া)

এক হাদীসে বর্ণিত আছে, তুমি সকালে অতি ভোরে সদকা কর। কেননা, বিপদ সদকা হইতে আগে বাড়িতে পারে না। (ভারগীব)

পূর্বে বর্ণিত নয় নম্বর আয়াতে ইবনে আবিল জাদ (রহঃ) হইতে বাধ সম্পর্কিত একটি ঘটনা উল্লেখ করা হইয়াছে এবং এই বিষয়ে বিভিন্ন রেওয়াজাত পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

হযরত আনাস (রাযিঃ) হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করেন—সদকা আল্লাহ তায়ালায় গোপ্যকে দূর করে এবং খারাপ মৃত্যু হইতে রক্ষা করে। (মিশকাত)

উলামায়ে কেরাম লিখিয়াছেন, সদকা মৃত্যুর সময় শয়তানের কুমন্ত্রণা হইতে হেফাজত করে, রোগ-যাতনার কারণে মুখ হইতে না-শোকরীমূলক শব্দ উচ্চারণ হওয়া হইতে হেফাজত করে এবং হঠাৎ মৃত্যু হইতে রক্ষা করে। মোটকথা, সদকা ঈমানের সহিত মৃত্যুর ব্যাপারে সাহায্য করে।

এক হাদীসে আছে, সদকা কবরের গরমী দূর করে এবং মানুষ কিয়ামতের দিন আপন সদকার ছায়াতে থাকিবে। (কানয) অর্থাৎ, যতবেশী সদকা করিবে তত বেশী ছায়া হইবে।

হযরত মুয়ায (রাযিঃ) হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিলেন, আমাকে এমন আমল বলিয়া দিন, যাহা জাম্মাতে প্রবেশ করাইয়া দেয় এবং জাহান্নাম হইতে দূরে রাখে। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি অনেক কঠিন কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, যাহার জন্য আল্লাহ তায়ালা সহজ করিয়া দেন তাহার জন্য উহা খুবই সহজ। আর উহা এই যে, এখলাসের সহিত আল্লাহ তায়ালায় এবাদত কর, তাহার সহিত কাহাকেও শরীক করিও না, নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় করিতে থাক, রমযানুল মুবারকে রোযা রাখ, আর বায়তুল্লাহ শরীফের হজ্জ কর। অতঃপর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি কি তোমাকে ভাল কাজের দরজাসমূহ বলিয়া দিব? (অর্থাৎ, যে সমস্ত দরজা দিয়া মানুষ কল্যাণ পর্যন্ত পৌছিতে পারে) উহা হইল, রোযা ঢালস্বরূপ (অর্থাৎ, যেমন ঢাল দ্বারা মানুষ দুষ্মনের হামলা প্রতিহত করে, তদ্রূপ রোযা দ্বারা শয়তানের হামলা প্রতিহত করে)। আর সদকা গুনাহসমূহকে এমনভাবে নিভাইয়া দেয়, যেমন পানি

আগুনকে নিভাইয়া দেয় এবং রাত্রের মধ্যভাগে নামায পড়াও তদ্রূপ। অতঃপর হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন : **تَجَافَى جُنُوبَهُمْ** এই আয়াত ১৯ নম্বর আয়াতের বিবরণে উল্লেখ করা হইয়াছে। পুনরায় হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি কি তোমাকে সমস্ত কাজের মাথা এবং উহার ঝুঁটি আর উহার চূড়া বলিয়া দিব? সমস্ত কাজের মাথা হইল, ইসলাম। (কেননা, ইহা ব্যতীত কোন কিছুই গ্রহণযোগ্য নয়।) উহার ঝুঁটি নামায। (কেননা, ঝুঁটি ছাড়া যেমন কোন ঘর টিকিয়া থাকা মুশকিল, তদ্রূপ নামায ব্যতীত ইসলাম টিকিয়া থাকা মুশকিল।) আর উহার চূড়া হইল, জিহাদ (অর্থাৎ, জিহাদের দ্বারা ইসলাম উন্নতি লাভ করে)। অতঃপর হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এইসব জিনিসের শিকড় কি তোমাকে বলিয়া দিব? (যাহার উপর সমস্ত বুনিয়াদ কায়েম হয়) হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় জিহ্বা মুবারক ধরিয়া এরশাদ করিলেন, ইহাকে নিয়ন্ত্রণে রাখ। হযরত মুয়ায (রাযিঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা মুখে যে সমস্ত কথাবার্তা বলি উহার ব্যাপারে আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হইবে কি? হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে মুয়ায! তোমার মা তোমার জন্য ক্রন্দন করুক। জিহ্বা ব্যতীত অন্য কোন বস্তু আছে কি, যাহা মানুষকে নাকের উপর উপুড় করিয়া জাহান্নামের ভিতর নিক্ষেপ করিবে? (মিশকাত)

তোমার জন্য তোমার মা ক্রন্দন করুক—ইহা আরবদের পরিভাষায় সতর্ক করার জন্য বলা হয়। সারকথা হইল, আমরা কেঁচির মত যেভাবে ছবান চালনা করিতে থাকি, এই সবকিছু আমলনামায় মাপা হইবে। অহেতুক, অনর্থক, নাজায়েয কথাবার্তা যাহা কিছু বলি; উহা জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হয়।

অন্য এক হাদীসে আসিয়াছে, মানুষ আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্টির জন্য এমন কোন কথা বলে, যাহাকে সে তেমন গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করে না; কিন্তু আল্লাহ তায়ালা সেই কথার কারণে জাহান্নামে তাহার মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়া দেন। পক্ষান্তরে, মানুষ আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্টিজনক কোন কথা বলে, যাহাকে সে সাধারণ মনে করে, কিন্তু সেই কথার কারণে তাহাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়। এক রেওয়ামাতে আছে, জাহান্নামে এত দূরে নিক্ষেপ করা হয়, যেমন পূর্ব হইতে পশ্চিমের দূরত্ব রহিয়াছে।

অন্য এক হাদীসে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি দুইটি জিনিসের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে অর্থাৎ, অপাত্রে

ব্যবহার করিবে না—এক হইল, যাহা দুই চোম্বালের মাঝখানে রহিয়াছে (অর্থাৎ, জবান), আর দ্বিতীয় হইল, যাহা দুই উরুর মাঝখানে রহিয়াছে (অর্থাৎ, লজ্জাস্থান) : আমি তাহার জন্য জাঙ্গাতের জামিন হইব।

এক হাদীসে আছে, এই দুইটি জিনিসই মানুষকে অধিক হারে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবে।

এক হাদীসে আছে, কোন ব্যক্তি শুধু মানুষকে হাসাইবার ও আনন্দ ফুটির উদ্দেশ্যে কোন কথা বলে আর উহার শাস্তি হিসাবে তাহাকে জাহান্নামে এত দূরে নিক্ষেপ করা হয়, যে পরিমাণ আসমান ও জমিনের মাঝখানে দূরত্ব রহিয়াছে।

হয়রত সুফিয়ান সাকাফী (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, উম্মতের ব্যাপারে আপনার সবচেয়ে বেশী ভয় কোন জিনিসের? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন জিহ্বা ঘুবারক ধরিয়া বলিলেন, ইহার। (মিশকাত)

এতদ্ভিন্ন আরও অনেক রেওয়াজাতে বিভিন্ন শিরোনামে এই বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা উহা হইতে অনেক বেশী গাফেল। অবশ্যই প্রত্যেককে এই বিষয়ে খুবই খেয়াল রাখা উচিত যে, জবান দ্বারা যাহা কিছু বলিতেছে উহা দ্বারা যদি কোন উপকার না হয়, তবে অস্তুতপক্ষে কোন আপদ বা মুসীবতে যেন গ্রেফতার হইতে না হয়।

হযরত সুফিয়ান সওরী (রহঃ) হাদীস ও ফেকার বিখ্যাত ইমাম ছিলেন। তিনি বলেন, আমার দ্বারা একটি গুনাহ হইয়া গিয়াছিল, যে কারণে পাঁচমাস পর্যন্ত তাহাজ্জুদ হইতে মাহরাম থাকিয়াছি। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, এমন কি গুনাহ হইয়া গিয়াছিল? তিনি বলিলেন, এক ব্যক্তি কাঁদিতেছিল, তখন আমি মনে মনে এই কথা বলিয়াছিলাম যে, এই ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য কাঁদিতেছে। (এহইয়া)

এই হইল, মনে মনে বলার পরিণাম। আর আমরা লোকদের সম্পর্কে ইহা হইতে অনেক বেশী কঠিন শব্দ বলিতে থাকি এবং বিনা কারণে বলিতে থাকি। আর যদি সেই ব্যক্তির সহিত শত্রুতাও থাকে, তবে তো তাহার প্রতি অপবাদ দেওয়ার ব্যাপারে সামান্য পরিমাণও কম করি না। তাহার সমস্ত গুণকে দোষ এবং সমস্ত দোষকে আরও বেশী বড় আকারে প্রচার করি।

⑧ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرِثُ شَاخِصٌ كَصَدَقَةٍ كُنَّا مَالُكُمْ كُمْ نَهَيْتُمْ كُنَّا أَوْ كُنَّا خَطَاوَارُكُمْ كَقَصْرِكُمْ

তাহার সম্মান বৃদ্ধি করেন। আর তৃতীয় বিষয় হইল, যে ব্যক্তি মানুষের নিকট ভিক্ষার দরজা খুলে, আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর অভাবের দরজা খুলিয়া দেন। এই তিনটি বিষয়ের পর একটি কথা তোমাদেরকে বলিতেছি, ইহাকে স্মরণ রাখ। উহা এই যে, দুনিয়াতে মানুষ চার প্রকার হইয়া থাকে। প্রথম ঐ ব্যক্তি, যাহাকে আল্লাহ তায়ালা এলেমও দান করিয়াছেন এবং সম্পদও দান করিয়াছেন। সে (তাহার এলেমের কারণে) নিজের সম্পদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে (অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালায় মর্জির খেলাফ খরচ করে না, বরং)। আত্মীয়তার সম্পর্ক কায়েম রাখে এবং ঐ সম্পদ দ্বারা আল্লাহ তায়ালায় জন্য নেক আমল করে, উহার হক আদায় করে। এই ব্যক্তি সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ তায়ালা এলেম দান করিয়াছেন, কিন্তু সম্পদ দান করেন নাই, তাহার নিয়ত সত্য, সে আকাঙ্ক্ষা করে, যদি আমার নিকট সম্পদ থাকিত, তবে আমিও অমুকের মত (নেক কাজে) খরচ করিতাম। আল্লাহ তায়ালা তাহার নিয়তের কারণে তাহাকেও ঐ সওয়াব দান করেন, যাহা প্রথম ব্যক্তির জন্য রহিয়াছে। ফলে, তাহারা উভয়ই সওয়াবের মধ্যে বরাবর হইয়া যায়। তৃতীয় ঐ ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ তায়ালা সম্পদ দান করিয়াছেন, কিন্তু এলেম দান করেন নাই। সে তাহার সম্পদে উল্টা-পাল্টা কাজ করে (অপাত্রে, খেল-তামাশায় এবং নফসের খাহেশের মধ্যে খরচ করে)। এই সম্পদের ব্যাপারে না সে আল্লাহকে ভয় করে, না আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখে, না হক অনুযায়ী খরচ করে। এই ব্যক্তি (কিয়ামতের দিন) নিকৃষ্টতম স্তরে থাকিবে। চতুর্থ ঐ ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ তায়ালা না সম্পদ দিয়াছেন, না এলেম দিয়াছেন। সে আকাঙ্ক্ষা করে, যদি আমার নিকট সম্পদ হয়, তবে আমিও অমুক (অর্থাৎ, তিন নম্বর) ব্যক্তির মত খরচ করিব। এই ব্যক্তির নিয়তের গুনাহ হইবে এবং ধ্বংসের দিক দিয়া সে এবং তৃতীয় ব্যক্তির বরাবর হইয়া যাইবে। (মিশকাত : তিরমিযী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন, সদকা সম্পদকে কমাইয়া দেয় না। যখন কোন ব্যক্তি সদকা করিবার জন্য হাত বাড়ায়, তখন ঐ সম্পদ ফকীরের হাতে যাইবার পূর্বে আল্লাহ তায়ালায় পবিত্র হাতে যায় (অর্থাৎ, কবুল হয়)। আর যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় ভিক্ষার হাত বাড়ায়, যখন ভিক্ষা না করিলেও তাহার কাজ চলিয়া যায় ; আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর অভাবের দরজা খুলিয়া দেন। (তারগীব)

হযরত কায়েস ইবনে ছিলা' আনসারী (রাযিঃ) বলেন, আমার

ভাইয়েরা ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আমার সম্পর্কে অভিযোগ করিল যে, সে অনেক অপচয় করে এবং নিজের সম্পদকে অপাত্রে খরচ করে। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি বাগান হইতে আমার অংশ গ্রহণ করি এবং আল্লাহর রাস্তায়ও খরচ করি, আর যাহারা আমার সহিত সাক্ষাত করিতে আসে তাহাদেরকেও খাওয়াই। ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বুকের উপর হাত মারিয়া তিনবার বলিলেন, খরচ করিতে থাক, আল্লাহ তায়ালা তোমার উপর খরচ করিবেন। ইহার কিছুদিন পর আমি জিহাদের এক সফরে চলিলাম। তখন আমার নিকট সওয়ারীও নিজস্ব ছিল এবং আমার সমস্ত পরিবারের লোকদের অপেক্ষা আমি বেশী সম্পদশালী ছিলাম। (তারগীব) অর্থাৎ, যে সমস্ত লোক অতি সাবধানতার সহিত খরচ করিত, তাহাদের নিকট ঐ পরিমাণ ছিল না যাহা আমার ন্যায় অতিমাত্রায় খরচকারীর নিকট ছিল।

হযরত জাবের (রাযিঃ) বলেন, একবার ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবার মধ্যে এরশাদ করিলেন, হে লোকসকল! মৃত্যু আসার পূর্বেই তোমরা আল্লাহ তায়ালা নিকট তওবা করিয়া লও, তোমরা এদিক-সেদিক মশগুল হওয়ার পূর্বেই জলদি নেক কাজ করিয়া লও, আর অধিক পরিমাণে আল্লাহ তায়ালা যিকির করিয়া এবং গোপনে ও প্রকাশ্যে বেশী পরিমাণে সদকা করিয়া নিজেদের মধ্যে ও আল্লাহ তায়ালা মধ্যে সম্পর্ক জুড়িয়া লও। কেননা, ইহার কারণে তোমাদিগকে রিযিক দেওয়া হইবে, তোমাদের সাহায্য করা হইবে এবং তোমাদের লোকসানের ক্ষতিপূরণ করা হইবে। (তারগীব)

এক হাদীসে আসিয়াছে, সদকার দ্বারা রিযিকের ব্যাপারে সাহায্য লও।

অন্য হাদীসে আসিয়াছে, সদকা দ্বারা রিযিক নামাও। (কান্‌য)

এক হাদীসে আসিয়াছে, সদকা দ্বারা সম্পদ বৃদ্ধি হয়। (কান্‌য)

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাযিঃ) বলেন, ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঐ পবিত্র সন্তার কসম, যাহার হাতে আমার জীবন, তিনটি বিষয় এমন রহিয়াছে, যাহার উপর আমি কসম করিতেছি। প্রথম এই যে, সদকা করিলে মাল কমে না ; এইজন্য খুব সদকা করিতে থাক। দ্বিতীয় এই যে, যেই ব্যক্তির উপর জুলুম করা হয় আর সে তাহাকে মাফ করিয়া দেয়, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তাহার সম্মান বৃদ্ধি করিয়া দেন। তৃতীয় বিষয় এই যে, যে কোন বান্দা ভিক্ষার দরজা খুলে, আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর অভাবের দরজা খুলিয়া দেন। (তারগীব)

হযরত আবু সালামা (রাযিঃ) হইতেও ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই প্রশংসা বর্ণনা করা হইয়াছে যে, সদকা করিলে সম্পদ কমে না। অতএব, সদকা কর। (দুর আওয়াল) বাহ্যিক দৃষ্টিতে কম না হওয়ার অর্থ ইহাই যে, অতি সত্ত্বর আল্লাহ তায়ালা উহার উত্তম বদলা দান করেন।

হযরত হাবীব আজমী (রহঃ) বিখ্যাত বুয়ুর্গ ছিলেন। তাহার স্ত্রী একবার আটার খামির বানাইয়া সামনের বাড়ী হইতে আগুন আনিতে গেলেন। ইতিমধ্যেই একজন ভিক্ষুক আসিল। হযরত হাবীব (রহঃ) ঐ আটা ফকিরকে দিয়া দিলেন। স্ত্রী যখন আগুন লইয়া আসিলেন, তখন দেখিলেন আটা নাই। স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আটা কি হইল? তিনি বলিলেন, রুটি তৈয়ার হওয়ার জন্য গিয়াছে। তাহার বিশ্বাস হইল না, বারবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, আমি তো উহা সদকা করিয়া দিয়াছি। স্ত্রী বলিতে লাগিলেন, সুবহানাল্লাহ! আপনি ইহাও খেয়াল করেন নাই যে, এইটুকুই মাত্র আটা ছিল, এখন সকলে কি খাইবে? অস্বতঃ আমাদের জন্য তো কিছু রাখিয়া দেওয়া উচিত ছিল। স্ত্রী এই কথা বলিতেছিলেন, এমন সময় একজন লোক বড় পেয়ালার মধ্যে গোধত ও রুটি লইয়া হাজির হইল। স্ত্রী বলিতে লাগিলেন, কত তাড়াতাড়ি পাকাইয়া লইয়া আসিয়াছে। উপরন্তু, তরকারীও সঙ্গে আনিয়াছে। (রওজ)

এইরূপ ঘটনাবলী প্রায়ই ঘটিয়া থাকে ; কিন্তু আমরা যেহেতু আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে সম্পর্ক রাখি না ; এইজন্য চিন্তাও করি না যে, এই নেয়ামত কিসের বিনিময়ে পাইয়াছি। এইরূপ বিষয়কে আমরা মনে করি যে, ঘটনাচক্রে অযুক্ত জিনিস পাইয়া গিয়াছি ; নতুবা কি অবস্থা হইত ! অথচ উহা খরচ করার কারণেই আসিয়াছে।

”مُضَوِّرًا أَعْيَسَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَيَّادَكَ
 رَيْكَ شَخْصٍ رَيْكَ جَعَلَ فِي مَتْنِهِ، أَسْ نَعِ رَيْكَ
 بَادِلٍ فِي سَعَةِ رَاوِزُ نَسِيكَ فَطَلَّ شَخْصٍ كَعِ
 رَاوِزُ كَرَانِي دَعَى - اس آواز کے بعد فوراً
 وہ بادل ایک طرف چلا اور ایک پتھری زمین
 میں خوب پانی برسا اور وہ سارا پانی ایک

⑨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ قَالَ بَيْنَا رَجُلٌ
بِفُلَانٍ مِنَ الْأَرْضِ فَسَمِعَ
صَوْتًا فِي سَحَابَةٍ إِسْقَى
حَدِيقَةَ فُلَانٍ فَتَنَنِي

তৎক্ষণাৎ সেই মেঘ একদিকে চলিল এবং একটি পাথরময় জমিনে খুব পানি বর্ষণ করিল। আর সেই পানি একটি দালার মধ্যে জমা হইয়া চলিতে লাগিল। উক্ত ব্যক্তি সেই পানির পিছনে চলিল। পানি এমন এক জায়গায় পৌঁছিল, যেখানে এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বেলচা দিয়া নিজের বাগানে পানি দিতেছিল। সে বাগানের লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার নাম কি? লোকটি ঐ নামই বলিল, যাহা সে মেঘের মধ্যে শুনিয়াছিল। অতঃপর বাগানওয়ালা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি আমার নাম কেন জানিতে চাহিয়াছ? সে বলিল, যেই মেঘ হইতে এই পানি আসিতেছে, আমি উহার ভিতর এই আওয়াজ শুনিয়াছি যে, অমূকের বাগানে পানি দাও এবং তোমার নাম মেঘের ভিতর শুনিয়াছিলাম। তুমি এই বাগানে এমন কি কাজ কর? (যাহার কারণে মেঘকে হুকুম করা হইয়াছে, যেন উহা তোমার বাগানে পানি দেয়।) বাগানওয়ালা বলিল, তুমি যখন এই সবকিছু বলিয়াছ, তখন আমাকেও বলিতে হয়। এই বাগানে যাহাকিছু উৎপন্ন হয় আমি উহা দেখি (এবং উহাকে তিন ভাগ করি)। একভাগ অর্থাৎ, এক তৃতীয়াংশ তখনই আল্লাহর রাস্তায় সদকা করিয়া দেই, আর এক তৃতীয়াংশ আমি এবং আমার পরিবার-পরিজন খাই। আর এক তৃতীয়াংশ এই বাগানের প্রয়োজনে লাগাইয়া দেই। (মিশকাত : মুসলিম)

কারণ : আল্লাহর নামে আমদানীর মাত্র তিন ভাগের এক ভাগ খরচ করিয়া দেওয়ার মধ্যে কি পরিমাণ বরকত যে, গায়েব হইতে তাহার বাগানের ব্যবস্থা হইয়া যায়। ইহা প্রথম হাদীসে বর্ণিত বিষয়ের স্পষ্ট উদাহরণ যে, সদকা করিলে সম্পদ কমে না। লোকটি বাগানের এক তৃতীয়াংশ কসল সদকা করিয়াছিল, যদ্বারা সম্পূর্ণ বাগানের দ্বিতীয় বার কসল পরমা হওয়ার ব্যবস্থা হইয়া গেল।

এই হাদীস দ্বারা একটি উত্তম শিক্ষা ইহাও হাসিল হয় যে, নিজের আমদানীর কিছু অংশ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার জন্য নির্ধারিত করিয়া লওয়া অত্যন্ত উপকারী জিনিস। অভিজ্ঞতাও ইহাই যে, মানুষ যদি ইহা শিক্ষা করিয়া লয় যে, এত পরিমাণ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিব, তখন কল্যাণের খাত এবং খরচ করিবার সুযোগও অনেক পাওয়া যায়। আর যদি এই মনে করে যে, যখন কোন নেক কাজ হইবে, তখন দেখা যাইবে। প্রথমতঃ এমনভাবে দাল কাজ খুব কমই বুঝে আসে আর নফস ও শয়তান সবসময়ই এই খেলাল মনের মধ্যে ঢালিতে থাকে যে, ইহা কোন জরুরী খরচ তো নয়। আর যদি এইরূপ কোন বেশী গুরুত্বপূর্ণ কাজ আসিয়াও যায় যাহাতে খরচ করা ভাল বলিয়া স্পষ্ট বুঝে আসে, তখন

অধিকাংশ সময় মাল মণ্ডজুদ থাকে না, যদি মণ্ডজুদ থাকেও তবে নিজের প্রয়োজনের কথা মনে করিয়া কম হইতেও কম খরচ করিতে ইচ্ছা হয়। আর যদি মাসের শুরুতেই বেতন পাওয়ার সাথে সাথে একটি অংশ পৃথক করিয়া রাখিয়া দেওয়া হয় অথবা ব্যবসায়ের দৈনিক আয় হইতে একটি অংশ আলাদা করিয়া সিঁদুকের এক কোণায় রাখিয়া দেওয়া হয় যে, ইহা শুধু আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিব, তখন খরচ করিবার সময় মনে কোনরূপ সংকীর্ণতা আসে না। কেননা, এই পরিমাণ তো অবশ্যই খরচ করিতে হইবে। ইহা অত্যন্ত পরীক্ষিত ব্যবস্থা, যাহার ইচ্ছা হয়, সে যেন কিছুদিন পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া লয়।

আবু ওযায়েল (রহঃ) বলেন, আমাকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বনী কুরাইষার দিকে পাঠাইলেন এবং বলিয়া দিলেন, সেইখানে যাইয়া ঐ কাজ করিবে যাহা বনী ইসরাইল গোত্রের একজন নেক লোক করিত। অর্থাৎ, আমি যেন এক তৃতীয়াংশ সদকা করিয়া দেই, আর এক তৃতীয়াংশ উহাতে রাখিয়া দেই আর এক তৃতীয়াংশ তাহার নিকট লইয়া আসি। (ফানয)

ইহা দ্বারা জানা গেল যে, সাহাবায়ে কেরামত এই নিয়মের উপর আমল করিতেন।

مُحَمَّدٌ رَافِدِیٌّ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا ارشاد صحیح و ثابت
فاحشہ عورت (رشتہ کی اتنی است پر بخشش کر
دی گئی کہ وہ چلی جا رہی تھی اس نے ایک کنوئیں پر
دیکھا کہ ایک کتا کھڑا ہوا ہے جس کی زبان پیاس
کی شدت کی وجہ سے باہر نکلی ہوئی ہے اور وہ منہ
کو ہے۔ اس صحت نے ہر پانیوں کا (پھر حکم) سوز
نکالا اور اس کو اپنی اڑھنی میں باندھ کر کنوئیں
میں سے پانی نکالا اور اس کچھ کر پلایا۔ حضور
مُحَمَّدٌ رَافِدِیٌّ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے کسی نے پوچھا کیا ہم
لوگوں کو جانوروں کے حصے میں بھی ثواب ملتا ہے
حضور نے فرمایا ہر جگہ کہتے ہیں (یعنی جاندار)

(١٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُفِرَ لِمُرَاةٍ مُوسَى مَرَّتْ يَكُوبُ عَلَى رَأْسِ نِكِي يَلْهَثُ كَأَن يَبْتَغِيهِ الْعَظْشُ فَتَزَعَّتْ خُفَّيْهَا فَأَوْثَقَتْهُ بِخِمَارِهَا فَتَزَعَّتْ لَهُ مِنَ الْمَاءِ فَغُفِرَ لَهَا بِذَلِكَ قِيلَ إِنْ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا قَالَ فِي كُلِّ ذَاتٍ حَيَّةٍ وَطَبَّةٍ أَجْرٌ مِثْلُ

پرا حسان کرنے میں ثواب ہے (مسلمان ہوتا)
کافر و آدمی ہوتا جانور۔

علیہ السلام - (مشکوٰۃ)۔

১০) ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এক দূশ্চরিত্রা (পতিতা) মেয়েলোককে শুধু এইজন্য ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, সে পথ চলিতেছিল, দেখিল, একটি কুয়ার নিকট একটি কুকুর দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। প্রচণ্ড পিপাসার কারণে জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িয়াছে এবং কুকুরটি মরণাপন্ন অবস্থায় পৌছিয়াছে। মেয়েলোকটি নিজের পায়ের (চামড়ার) মোজা খুলিল এবং উহাকে তাহার উড়না দ্বারা বান্ধিয়া কুয়ার ভিতর হইতে পানি বাহির করিল এবং কুকুরটিকে পান করাইল। ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেহ জিজ্ঞাসা করিল, জীবজন্তুর সহিত ভাল ব্যবহারের কারণেও কি আমরা সওয়াব পাইব? ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, প্রত্যেক কলিজাধারী (অর্থাৎ প্রাণী)এর প্রতি দয়া করার মধ্যে সওয়াব রহিয়াছে। (মুসলমান হউক বা কাফের হউক বা জীবজন্তু হউক।) (মিশকাত : বুখারী, মুসলিম)

ফায়দা : ইহা বনী ইসরাইল গোত্রের একজন পতিতার ঘটনা। কোন কোন রেওয়াজাতে বনী ইসরাইলের ঘটনা বলিয়া স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। (কানয)

বুখারী শরীফ প্রভৃতি কিতাবে একজন পুরুষ সম্পর্কেও এইরূপ আরেকটি ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এক ব্যক্তি এক ময়দান দিয়া যাইতেছিল। পিপাসা তাহাকে খুব পোreshান করিল। সে একটি কুয়াতে নামিল এবং যখন পানি পান করিয়া বাহির হইল, তখন দেখিল, একটি কুকুর পিপাসায় কাতর হইয়া রহিয়াছে এবং প্রচণ্ড পিপাসার কারণে কাদাঘাটি চাটিতেছে। সেই ব্যক্তি মনে করিল, এই কুকুরটিরও পিপাসায় ঐরূপ কষ্ট হইতেছে যেইরূপ আমার হইয়াছিল। পানি উঠাইবার জন্য কোন জিনিস ছিল না, এইজন্য সে নিজের পায়ের মোজা খুলিল এবং পুনরায় কুয়াতে নামিয়া মোজাটিতে পানি ভরিল এবং উহাকে মুখ দ্বারা আটকাইয়া ধরিয়া উভয় হাতের সাহায্যে উপরে উঠিল। অতঃপর সেই পানি কুকুরকে পান করাইল। আল্লাহ তায়ালা তাহার এই আমলের কদর করিলেন এবং তাহাকে মাফ করিয়া দিলেন। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জীবজন্তুর ব্যাপারেও কি সওয়াব হইয়া থাকে? ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, প্রত্যেক কলিজাধারী (অর্থাৎ প্রাণী)এর ব্যাপারে

সওয়াব রহিয়াছে। (মুখারী)

এক হাদীস আছে, প্রত্যেক উম্ম কলিজাধারীর ব্যাপারে সওয়াব রহিয়াছে। (কানয)

মোজার মধ্যে পানি ভরিবার অর্থ হইল, আরব দেশে চামড়ার মোজা ব্যবহারের ব্যাপক প্রচলন রহিয়াছে। উহাতে পানি ভরিলে বাহিরে কম পড়ে। আর মুখ দ্বারা ধরিবার প্রয়োজন এইজন্য দেখা দিয়াছে যে, ময়দানের কুয়ার মধ্যে সাধারণতঃ কিছু ইট ইত্যাদি এমনভাবে বাহির করিয়া রাখা হয়, যাহাতে এইরূপ লোক যাহার নিকট বালতি ও বশি না থাকে, সে যেন নিচে নামিতে পারে। তবে উঠানামা করিবার জন্য হাতের সাহায্য নেওয়ার প্রয়োজন অবশ্যই দেখা দেয়। এইজন্য মোজাকে মুখের দ্বারা সামলাইতে হইয়াছে। এই কিতাবের শেষের দিকে বর্ণিত সাতচল্লিশ নম্বরে একজন জালেম ব্যক্তিরও এইরূপ ঘটনা উল্লেখ করা হইয়াছে। সে ঘা-পাঁচড়ায় আক্রান্ত একটি কুকুরকে আশ্রয় দিয়াছিল। আল্লাহ তায়ালা নিকট তাহার এই আমল পছন্দ হইয়া গেল। এই দুই হাদীসে কুকুরের মত নিকট জন্তুর উপর দয়া করিবার বিনিময় যখন এইরূপ রহিয়াছে, তাহা হইলে সৃষ্টির সেরা মানুষের উপর দয়া করিবার কিরূপ বদলা হইবে !

কোন কোন আলেম লিখিয়াছেন, ঐ সমস্ত জীবজন্তু যেইগুলিকে হত্যা করা মোস্তাহাব, যেমন—সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদি ; ইহার অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু অন্যান্য আলেমগণ বলেন, ইহাদেরকে হত্যা করার অর্থ এই নয় যে, পিপাসার্ত জানা গেলে পানি পান করানো যাইবে না। কেননা, আমাদের মুসলমানদিগকে এই হুকুম করা হইয়াছে যে, কোন কারণে যদি কোন প্রাণীকে হত্যা করিতে হয়, তবে ইহাতেও যেন উত্তম পন্থা অবলম্বন করা হয়। এইজন্যই যাহাকে হত্যা করা জরুরী তাহার হাত পা ইত্যাদি কাটা নিষেধ। (ফাতহ)

এই দুই হাদীস দ্বারা এবং ইহা ছাড়া আরও অনেক হাদীস দ্বারা একটি সুস্পষ্ট বিষয় ইহাও জানা গেল যে, কাহারও যদি কোন একটি আমলও আল্লাহ তায়ালা পছন্দ হইয়া যায়, তবে উহার বরকতে সারাজীবনের গুনাহ মাফ করিয়া দেন। তাহার দয়া ও মেহেরবানীর মুকাবেলায় ইহা কোন ব্যাপারই নয়। তবে কবুল হওয়া এবং পছন্দ হওয়াই আসল বিষয়। ইহাও জরুরী নয় যে, প্রত্যেক গুনাহগারের সমস্ত গুনাহ পানি পান করানোর দ্বারা অথবা কোন একটি নেকীর দ্বারা মাফ করিয়া দেওয়া হইবে। হাঁ, কাহারও কোন জিনিস যদি কবুল হইয়া যায়, তবে ক্রমার ব্যাপারে কোন বাধা নাই। এইজন্য অত্যন্ত এখলাসের সহিত চেষ্টা করিতে থাকা

উচিত, কে জানে কোন আমল তাহার পছন্দ হইয়া যায় আর নাজান হইয়া যায়। বড় জিনিস হইল, এখলাস অর্থাৎ শুধু আল্লাহর জন্য কোন কাজ করা। তাহার মধ্যে দুনিয়ার কোন উদ্দেশ্য शामिल না হয়, না উহা দ্বারা দুনিয়া কামাই করা উদ্দেশ্য হয়, না সুখ্যাতি ও সম্মান অর্জন করা উদ্দেশ্য হয়। এইগুলির মধ্য হইতে কোন একটি যদি शामिल হইয়া যায়, তবে উহা সমস্ত আমল বরবাদ করিয়া দেয়। আর যদি একমাত্র তাহারই জন্য কোন কাজ করা হয়, তবে অতি সাধারণ কাজও পাহাড় হইতে ভারী হইয়া যায়।

হুম্বরত লোকমান (আঃ) নিজ পুত্রকে নসীহত করিয়াছেন, যখন তোমার দ্বারা কোন গুনাহ হইয়া যায়, তখন সদকা করিও। (এহইয়া) কেননা, ইহা গুনাহকে ধৌত করে এবং আল্লাহ তায়ালায় গোম্বাকে দূর করে।

حُضْرَةُ اَمْرِئِيسَ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کَرَامَاتُ جَلَّتْ

ہیں ایسے بالاعمال نے بیچ کر گمراہ آئینوں کے بغیر ہو

ہیں کہ ان کے اندر کی سب چیزیں باہر سے نظر آتی

ہیں اور ان کے اُمسے باہر کی سیب خیزیں نظر آتی

ہیں صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کہیں لوگوں

کہتے ہیں۔ محضرت نے فرمایا، جو اسی طرح

بات کریں (یعنی تشریف دے) منہ چڑھا کر

بات نہ کریں، اور لوگوں کو کھانا کھلائیں،

اور ہمیشہ روزہ رکھیں اور ایسے وقت میں

رات کو شہر پر یسین کہ لوگ سو رہے ہوں۔

⑪ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَغُرَفًا يُرَى

ظُهُورُهَا مِنْ يَطْوُنِهَا وَ

يُطَوِّنُهَا مِنْ ظُهُورِهَا قَالُوا

مَنْ هِيَ قَالِ لِمَنْ أَطَابَ

الْعَلَامَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَ

لَقَامَ الْعِصْيَامَ وَصَلَّى بِاللَّيْلِ

الناس نيام - الفوجين الى شعبة

الترمدى وغيرها ذات النوى -

১১ ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জাম্মাতে এমন মহলসমূহ রহিয়াছে, যাহা (দেখিতে আয়নার মত) উহার ভিতরের সমস্ত বস্তু বাহির হইতে দেখা যাইবে এবং ভিতর হইতে বাহিরের সমস্ত বস্তু দেখা যাইবে। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহা কাহাদের জন্য? ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যাহারা উত্তমরূপে কথা বলে (অর্থাৎ, তিক্ত চেহারা লইয়া মুখ বিকৃত করিয়া কথা বলে না)। লোকদেরকে খানা খাওয়ায় এবং সর্বদা

রোযা রাখে আর রাত্রিতে এমন সময় তাহাজ্জুদ পড়ে, যখন লোকেরা ঘুমাইয়া থাকে। (দুরঃ : ইবনু আবী শায়বা, তিরমিধী)

ফায়দা : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাযিঃ) যিনি তখনও মুসলমান হন নাই ; বলেন, যখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করিয়া মদীনায তশরীফ আনিলেন, আমি খবর পাইয়া তৎক্ষণাৎ হাজির হইলাম এবং তাহার মুবারক চেহারা দেখিয়া বলিলাম, এই মুবারক চেহারা মিথ্যাবাদী লোকের হইতে পারে না। সেখানে পৌছিবার পর সর্বপ্রথম যে কথাটি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবান মুবারক হইতে বাহির হইতে শুনিলাম তাহা এই ছিল—হে লোকসকল! তোমরা পরস্পর সালামের প্রচলন কর এবং একে অপরকে খানা খাওয়াও। আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখ। আর রাত্রিতে যখন সমস্ত লোক ঘুমাইয়া থাকে, তখন নামায পড়। নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। (মিশকাত)

৩৪ নম্বর দীর্ঘ আয়াতে এই বিষয় বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহারা আল্লাহ তায়ালায় মহক্বতে মিসকীনকে, এতীমকে এবং কয়েদীকে খানা খাওয়ার এবং বলে যে, আমরা তোমাদেরকে একমাত্র আল্লাহ তায়ালায় সন্তুষ্টির জন্য খানা খাওয়াই ; না তোমাদের নিকট উহার বিনিময় চাহি এবং না কৃতজ্ঞতা চাহি।

এক হাদীসে আসিয়াছে, যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ভাইকে এমনভাবে খানা খাওয়ায় যে, তাহার পেট ভরিয়া যায় এবং এমনভাবে পানি পান করায় যে, তাহার পিপাসা মিটিয়া যায় ; আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তির এবং জাহান্নামের মধ্যে সাতটি খন্দক সৃষ্টি করিয়া দেন। প্রতিটি খন্দক এত বড় যে, সাতশত বৎসর চলিলে উহা শেষ হইবে। (কানয)

এক হাদীসে আছে, সমস্ত মাখলুক আল্লাহ তায়ালায় পরিবার (সন্তান-সন্ততির পর্যায়ে), সুতরাং আল্লাহ তায়ালায় নিকট সর্বাধিক প্রিয় ঐ ব্যক্তি, যে তাহার পরিবারের বেশী উপকার করে। (কানয)

এক হাদীসে আসিয়াছে, প্রত্যেক ভাল কাজ সদকা। তন্মধ্যে ইহাও যে, তুমি মুসলমান ভাইয়ের সহিত হাসিমুখে সাক্ষাৎ কর, নিজের বালতি হইতে প্রতিবেশীর পায়ে পানি ভরিয়া দাও। (কানয)

উত্তমরূপে কথা বলার অংশ হিসাবে ইহাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, মানুষের সহিত হাসিমুখে কথা বলিবে ; বিরক্তি সহকারে মুখ বিকৃত করিয়া কথা বলিবে না।

এক হাদীসে আসিয়াছে, ভাল কাজের কোন অংশই তুচ্ছ নয়। চাই

উহা আপন ভাইয়ের সহিত হাসিমুখে সাক্ষাৎ করাই হউক না কেন।

এক হাদীসে আছে, কেহ যেন ভাল কাজের কোন অংশকে তুচ্ছ মনে না করে। আর কিছু সম্ভব না হইলেও কমপক্ষে যেন আপন ভাইয়ের সহিত হাসিমুখে সাক্ষাৎ করে। (কান্য়)

এক হাদীসে আসিয়াছে, কাহারও সহিত হাসিমুখে সাক্ষাৎ করাও সদকা। কাহাকেও ভাল কাজের হুকুম করা অথবা খারাপ কাজ হইতে বিরত রাখাও সদকা। কোন পথভোলা মানুষকে পথ দেখানোও সদকা। রাস্তা হইতে কোন কষ্টদায়ক জিনিস ; কাঁটা ইত্যাদি সরাইয়া দেওয়াও সদকা। নিজের বালতি হইতে কাহারও পাতে পানি ঢালিয়া দেওয়াও সদকা। (কান্য়)

এক হাদীসে আসিয়াছে, কিয়ামতের দিন জাহান্নামী লোকদেরকে এক কাতারে দাঁড় করানো হইবে। তাহাদের নিকট দিয়া একজন (জান্নাতী কামেল) মুসলমান অতিক্রম করিবে। ঐ কাতার হইতে এক ব্যক্তি তাহাকে বলিবে, তুমি আমার জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট সুপারিশ করিয়া দাও। সে জিজ্ঞাসা করিবে, তুমি কে? জাহান্নামী ব্যক্তি বলিবে, তুমি আমাকে চিন না? তুমি দুনিয়াতে একবার আমার নিকট পানি চাহিয়াছিলে, তখন আমি তোমাকে পানি পান করাইয়াছিলাম। ইহা শুনিয়া সে সুপারিশ করিবে (এবং তাহার সুপারিশ কবুল হইয়া যাইবে)। এমনভাবে অপর ব্যক্তি বলিবে, তুমি আমার নিকট দুনিয়াতে অমুক জিনিস চাহিয়াছিলে। আমি উহা তোমাকে দিয়াছিলাম। (কান্য়)

আর এক হাদীসে আছে, জাহান্নামীদের কাতারের নিকট দিয়া একজন জান্নাতী লোক অতিক্রম করিবে। তখন তাহাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি তাহাকে ডাকিয়া বলিবে, তুমি আমাকে চেন না? আমি তো ঐ ব্যক্তি যে, অমুক দিন তোমাকে পানি পান করাইয়াছিলাম, অমুক সময় তোমাকে ওয়ূর পানি দিয়াছিলাম। (মিশকাত)

অন্য এক হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন যখন জান্নাতী ও জাহান্নামী লোকদের কাতার তৈয়ার হইবে, তখন জাহান্নামীদের কাতার হইতে এক ব্যক্তির দৃষ্টি জান্নাতীদের কাতারের কোন এক ব্যক্তির উপর পড়িবে, তখন সে তাহাকে স্মরণ করাইবে যে, আমি দুনিয়াতে তোমার উপর অমুক এহসান করিয়াছিলাম। ইহা শুনিয়া ঐ জান্নাতী ব্যক্তি তাহার হাত ধরিয়া আল্লাহ তায়ালার নিকট আরজ করিবে, হে আল্লাহ! আমার প্রতি এই ব্যক্তির অমুক এহসান রহিয়াছে। আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে এরশাদ হইবে, আল্লাহ তায়ালার রহমতের উসিলায় তাহাকে জান্নাতে দাখেল

করিয়া দেওয়া হউক।

এক হাদীসে আছে, গরীবদের সহিত বেশী সম্পর্ক রাখ এবং তাহাদের উপর অধিক পরিমাণে অনুগ্রহ ও এইসান কর। কেননা, তাহাদের নিকট বড় সম্পদ রহিয়াছে। কেহ আরজ করিল, ইয়া রাসূলান্নাহ! ঐ সম্পদ কি? হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহাদেরকে কিয়ামতের দিন বলা হইবে, যে ব্যক্তি তোমাদেরকে একটি রুটির টুকরা খাওয়াইয়াছে অথবা পানি পান করাইয়াছে অথবা কাপড় দিয়াছে, তাহাকে হাত ধরিয়া জান্নাতে পৌছাইয়া দাও।

এক হাদীসে আছে, আল্লাহ তায়ালা গরীবদের নিকট কিয়ামতের দিন এমনভাবে ওজর পেশ করিবেন, যেমন মানুষ মানুষের নিকট ওজর পেশ করিয়া থাকে আর বলিবেন, আমার ইজ্জত ও বড়ত্বের কসম, আমি দুনিয়াকে তোমার নিকট হইতে এইজন্য দূরে সরাই নাই যে, তুমি আমার নিকট অপদস্থ ছিলে। বরং এইজন্য সরাইয়াছি যে, আজ তোমার জন্য বড় সম্মান রহিয়াছে। হে আমার বান্দা! তুমি ঐ সমস্ত জাহান্নামী লোকদের কাতারের মধ্যে চলিয়া যাও; যে ব্যক্তি তোমাকে আমার সন্ততির জন্য খানা খাওয়াইয়াছে অথবা কাপড় দিয়াছে, সে তোমার। সেই গরীব এমন অবস্থায় তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিবে যে, তাহার মুখ পর্যন্ত ঘামের মধ্যে ডুবন্ত থাকিবে। সে তাহাদিগকে চিনিয়া জান্নাতে দাখেল করিবে। (রওজ)

এক হাদীসে আছে, কেয়ামতের দিন ঘোষণা হইবে—উম্মতে মুহাম্মদীর দরিদ্র ব্যক্তির কোথায়, উঠ এবং লোকদেরকে কেয়ামতের ময়দানে তালাশ করিয়া লও। যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্য হইতে কাহাকেও আমার সন্ততির জন্য একটি লোকমা দিয়াছে অথবা আমার সন্ততির জন্য এক ঢোক পানি দিয়াছে অথবা আমার সন্ততির জন্য কোন নূতন অথবা পুরাতন কাপড় দিয়াছে, তাহাদের হাত ধরিয়া জান্নাতে দাখেল করিয়া দাও। ইহা শুনিয়া উম্মতের দরিদ্র ব্যক্তির উঠিবে এবং কাহারও হাত ধরিয়া বলিবে, হে আল্লাহ! এই ব্যক্তি আমাকে খানা খাওয়াছিল, এই ব্যক্তি আমাকে পানি পান করাইয়াছিল। উম্মতের দরিদ্রদের মধ্য হইতে ছোট অথবা বড় কেহ এমন থাকিবে না, যে তাহাদেরকে জান্নাতে দাখেল না করিবে। (কানয)

এক হাদীসে আসিয়াছে, যে ব্যক্তি কোন ক্ষুধার্ত প্রাণীকে খানা খাওয়াইবে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে জান্নাতের উৎকৃষ্ট খাদ্যসমূহের মধ্য হইতে খানা খাওয়াইবেন। (কানয)

এক হাদীসে আসিয়াছে, যেই ঘর হইতে লোকদেরকে খানা খাওয়ানো

হয়, বরকত সেই ঘরের দিকে এত দ্রুত অগ্রসর হয়, যেমন উটের কুঁড়ে দ্রুত ছুরি চলে। (কান্‌য)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) ভাল ভাল খেজুর লোকদেরকে খাওয়াইতেন এবং বলিতেন, যে বেশী খাইবে তাহাকে প্রত্যেকটি খেজুরের বিনিময়ে এক দেহরাম দেওয়া হইবে। (এহইয়া)

এক হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন ঘোষণাকারী ঘোষণা করিবে, কোথায় ঐ সমস্ত লোক যাহারা ফকীর ও মিসকীনদের সম্মান করিয়াছে? আজ তোমরা জালাতে এমনভাবে দাখেল হইয়া যাও যে, না তোমাদের কোন ভয় আছে, না তোমরা চিন্তিত হইবে।

অন্য এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করিবে, কোথায় ঐ সমস্ত লোক, যাহারা অসুস্থ ফকীর এবং গরীবদের খোঁজ-খবর রাখিয়াছে। তাহারা যেন আজ নূরের মিস্বরের উপর উপবেশন করে এবং আল্লাহ তায়ালার সহিত কথাবার্তা বলে। অপরদিকে অন্যান্য লোকজন কঠিন হিসাবে নিপু থাকিবে। (কান্‌য)

এক হাদীসে আছে, কত ছর এমন রহিয়াছে, যাহাদের মহর হইতেছে—এক মুষ্টি খেজুর অথবা সমপরিমাণ অন্য কোন জিনিস দান করা। (কান্‌য)

এক হাদীসে আসিয়াছে, ক্ষুধার্তকে খানা খাওয়ানো হইতে অধিক শ্রেষ্ঠ আর কোন সদকা নাই। (কান্‌য)

এক হাদীসে আসিয়াছে, আল্লাহর ক্ষমা ও যাজ্বেবকারী আমলসমূহের মধ্য হইতে একটি আমল হইল, ক্ষুধার্ত লোকদেরকে খানা খাওয়ানো।

(কান্‌য)

এক হাদীসে আসিয়াছে, আল্লাহ তায়ালার নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল হইল, কোন মুসলমানকে খুশী করা অথবা তাহার দুঃখ-চিন্তা দূর করা অথবা তাহার করজ আদায় করিয়া দেওয়া অথবা ক্ষুধার্ত অবস্থায় তাহাকে খানা খাওয়ানো। (কান্‌য) অর্থাৎ, এই সমস্ত আমল বেশী পছন্দনীয়, যে কোনটাই সম্ভব হয় করিবে।

আরও এক হাদীসে আছে, কোন মুসলমানকে খুশী করা, তাহার ক্ষুধা দূর করা, তাহার বিপদ দূর করা, ঐ সকল আমলের অন্তর্ভুক্ত যেগুলির দ্বারা মাগফিরাত ওয়াজিব হইয়া যায়। (কান্‌য)

এক হাদীসে আসিয়াছে, যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ভাইয়ের দুনিয়াবী প্রয়োজন পূরা করে আল্লাহ তায়ালার তাহার বাহাদুরটি প্রয়োজন পূরা করেন। তন্মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ প্রয়োজন হইল, বান্দার গুনাহ মাফ

করা। (কানয) অর্থাৎ গুনাহ কমা হইতেও বড় বড় প্রয়োজন রহিয়াছে।
১৩নং হাদীসে ইহার বিবরণ আসিতেছে।

عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَقِي وَلَا تُعْصِي فَيُعْصِي اللَّهُ عَلَيْكَ وَلَا تُؤْمِي فَيُؤْمِي اللَّهُ عَلَيْكَ أَرْضَعِي مَا اسْتَطَعْتَ مَتَّقِ عَلَيْهِ عَذَابِي الْمَشْكُورَةَ۔
حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نے
ان سے ارشاد فرمایا کہ (خوب) بچ کر
کہ اور شمار نہ کر (اگر ایسا کہے گی) تو
اللہ تجھ پر عتاب فرمے گا اور
محفوظ نہ رہے (اگر ایسا کہے گی) تو
اللہ تجھ پر عتاب فرمے گا۔
(یعنی کم عطا کرے گا) عطا کر جتنا بھی تجھے عطا ہو سکے۔

১২) হযরত আসমা (রাযিঃ) বলেন, ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, (বেশী বেশী) খরচ কর, গণনা করিও না (যদি এইরূপ কর), তবে আল্লাহ তায়ালাও তোমার ব্যাপারে গণনা করিবেন এবং জমা করিয়া রাখিও না (যদি এইরূপ কর), তবে আল্লাহ তায়ালা তোমার ব্যাপারে জমা করিয়া রাখিবেন (অর্থাৎ, কম দান করিবেন)। তোমার দ্বারা যতটুকু সম্ভব দান করিতে থাক।

(মিশকাত : বুখারী, মুসলিম)

ফায়দা : হযরত আসমা (রাযিঃ) হযরত আয়েশা (রাযিঃ) এর বোন। উক্ত হাদীসে ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিক পরিমাণে খরচ করিবার ব্যাপারে কয়েকভাবে উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। প্রথমতঃ অধিক খরচ করিবার স্পষ্ট হুকুমই করিয়াছেন। তবে ইহা স্পষ্ট বিষয় যে, এই খরচই পছন্দনীয়, যাহা শরীয়ত অনুযায়ী আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্টিজনক বিষয়ে করা হয়। শরীয়তের খেলাফ খরচ করা দ্বারা সওয়াব হয় না বরং ক্ষতি হয়। অতঃপর ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গণনা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। যাহা প্রথমোক্ত বিষয়ের জন্য তাকিদ স্বরূপ। উলামায়ে কেরাম ইহার দুইটি অর্থ বলিয়াছেন—এক, গণনা করার অর্থ হইল, গণিয়া গণিয়া রাখা এবং জমা করা। যদি তুমি এইভাবে হিসাব করিয়া রাখ, তবে আল্লাহ তায়ালা পক্ষ হইতে দান করার ব্যাপারেও সংকীর্ণতা করা হইবে। যেমন কর্ম তেমনই ফল পাইবে।

দ্বিতীয় অর্থ হইল, গরীবদেরকে দান করিতে গণনা করিও না, তাহা হইলে আল্লাহ তায়ালা পক্ষ হইতে বদলা এবং সওয়াবও অগণিত পাইবে।

অতঃপর এই বিষয়টিকে আরও বেশী তাকীদ করিয়া এরশাদ করিয়াছেন, জমা করিয়া রাখিও না। তুমি যদি তোমার সম্পদকে আল্লাহর রাস্তায় খরচ না করিয়া জমা করিয়া রাখ, তবে আল্লাহ তায়ালাও তোমার প্রতি তাহার অধিক দান ও অনুগ্রহ বন্ধ করিয়া দিবেন। অতঃপর এই বিষয়টিকে আরও বেশী তাকীদ করিয়া এরশাদ করিয়াছেন—তোমার দ্বারা যতটুকু সম্ভব খরচ কর অর্থাৎ কম ও বেশীর পরওয়া করিও না। এই চিন্তা করিও না যে, এত বেশী পরিমাণ খরচ করা সমীচীন নয়, এই চিন্তাও করিও যে, এই সামান্য পরিমাণ জিনিস কি দিব? বরং তোমার সামর্থ্যে যতটুকু সম্ভব হয়, উহা খরচ করিবার ব্যাপারে কুণ্ঠিত হইও না।

অন্যান্য হাদীসে এই বিষয় অধিক পরিমাণে বর্ণিত হইয়াছে যে, দান-খয়রাতের মাধ্যমে জাহান্নামের আগুন হইতে নিজের হেফাজত ও বাঁচার ব্যবস্থা কর; যদিও খেজুরের একটি টুকরা দান করিয়াই হউক না কেন। কেননা, ইহাও জাহান্নামের আগুন হইতে হেফাজতের উপায়। বোখারী শরীফের অন্য এক হাদীসে আছে, হযরত আসমা (রাযিঃ) হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হযুর! এখন তো আমার নিকট নিজের কোন জিনিস নাই। শুধু উহাই থাকে, যাহা (আমার স্বামী) হযরত যুবায়ের (রাযিঃ) দিয়া থাকেন। আমি কি উহা হইতে দান করিব? হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, দান কর, পাত্রের মধ্যে জমা করিয়া রাখিও না (যদি এইরূপ কর), তবে আল্লাহ তায়ালাও তোমার ব্যাপারে (নিজের দানকে) জমা করিয়া রাখিবেন। এই হাদীসে আসমা (রাযিঃ)কে হযরত যুবায়ের (রাযিঃ) যাহা দিতেন, উহা যদি মালিক বানাইয়া দেওয়ার অর্থে হইয়া থাকে, তবে তো উক্ত মাল হযরত আসমা (রাযিঃ)এর হইয়া গিয়াছে। তিনি তাহার মাল যেইরূপ ইচ্ছা খরচ করিবার অধিকার রাখেন। আর যদি ঘরের খরচের জন্য দেওয়া অর্থ হইয়া থাকে, তবে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্ত এরশাদের অর্থ এই হইবে যে, সম্ভবতঃ হযরত যুবায়ের (রাযিঃ)এর স্বভাব সম্পর্কে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমান হইয়া গিয়াছিল যে, দান-খয়রাত করা তাহার নিকট অপছন্দনীয় নয়।

উহার কারণ ইহাও হইতে পারে যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যুবায়ের (রাযিঃ)কে বিশেষভাবে দান-খয়রাত করিবার জন্য উৎসাহ এবং তাকীদ করিয়াছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাধারণ উৎসাহ প্রদানের উপরও মনে-প্রাণে উৎসর্গ হইয়া যাইতেন। সেই ক্ষেত্রে যদি কাহাকেও হযুর

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষভাবে উৎসাহিত করিয়া থাকেন এবং নসীহত করিয়া থাকেন, তবে তিনি উহাকে কি পরিমাণ গুরুত্ব দিবেন তাহা এমনিতেই অনুমান করা যায়। শত শত নয় হাজার হাজার ঘটনা ইহার সাক্ষী রহিয়াছে। হেফাযাতে সাহাবা কিতাবের নবম অধ্যায়ে এই বিষয়ে উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি ঘটনা লিখিয়াছি।

আল্লামা সুযুতী (রহঃ) দুররে মানসুর কিতাবে স্বয়ং ইয়রত যুবায়ের (রাযিঃ) হইতে একটি ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে খরচ করিবার ব্যাপারে বিশেষভাবে উৎসাহিত করিয়াছেন। ইয়রত যুবায়ের (রাযিঃ) বলেন, আমি একবার হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেদমতে তাঁহার সম্মুখে বসিয়াছিলাম। এমন সময় হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (গুরুত্ব বুঝাইবার এবং সতর্ক করিবার উদ্দেশ্যে) আমার পাগড়ীর পিছনের কিনারা ধরিয়া বলিলেন, হে যুবায়ের! আমি বিশেষভাবে তোমার প্রতি এবং সাধারণভাবে সমস্ত মানুষের প্রতি আল্লাহ তায়ালার বার্তাবাহক (অর্থাৎ, আমি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে তোমাকে বিশেষভাবে পৌছাইতেছি)। তোমার কি জ্ঞানা আছে, আল্লাহ তায়ালা কি বলিয়াছেন? আমি আরজ করিলাম, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলই বেশী জানেন। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা যখন আপন আরশে এক বিশেষ অবস্থায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন আল্লাহ তায়ালা আপন বান্দাদের প্রতি (অনুগ্রহের) দৃষ্টি করিলেন এবং বলিলেন, হে আমার বান্দারা! তোমরা আমার সৃষ্টি, আমি তোমাদের প্রতিপালক, তোমাদের রুজি আমার কক্ষায় রহিয়াছে। তোমরা নিজেদেরকে এমন জিনিসের জন্য কষ্টে ফেলিও না, যাহার জিন্মা আমি লইয়া রাখিয়াছি; নিজেদের রুজি আমার নিকট চাহিয়া লও।

অতঃপর হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার বলিলেন, আরও বলিব কি? তোমার প্রতিপালক কি বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, হে বান্দা! তুমি মানুষের উপর খরচ কর, আমি তোমার উপর খরচ করিব। তুমি মানুষকে প্রশস্ততা দাও, আমিও তোমাকে প্রশস্ততা দান করিব। তুমি মানুষের জন্য খরচ করিতে সংকীর্ণতা করিও না, আমিও তোমার উপর সংকীর্ণতা করিব না। তুমি লোকদের হইতে (বাঁচাইয়া) বাঁধিয়া রাখিও না, আমিও তোমার ব্যাপারে বাঁধিয়া রাখিব না। তুমি সম্পদ জমা করিয়া রাখিও না, আমিও তোমাকে (না দেওয়ার জন্য) জমা করিয়া রাখিব না। রিযিকের দরজা সাত আসমানের উপর হইতে খোলা রহিয়াছে যাহা

আরশের সহিত মিলিত আছে। উহা না রাতে বন্ধ হয়, না দিনে। আল্লাহ তায়ালা ঐ দরজা দিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির উপর কৃষ্টি অবতীর্ণ করিতে থাকেন। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার নিয়ত, তাহার দান—খয়রাত, তাহার সদকা, তাহার খরচ ইত্যাদির পরিমাণে দান করেন। যে ব্যক্তি বেশী খরচ করে, তাহার জন্য বেশী অবতীর্ণ করা হয়। যে কম খরচ করে, তাহার জন্য কম করিয়া দেওয়া হয়। যে আটকাইয়া রাখে, তাহার ব্যাপারেও আটকাইয়া রাখা হয়।

হে যুবায়ের! নিজেরও খাও অন্যদেরকেও খাওয়াও। বাঁধিয়া রাখিও না, তোমার ব্যাপারেও বাঁধিয়া রাখা হইবে। গণনা করিও না, তোমার ব্যাপারেও গণনা করা হইবে। সংকীর্ণতা করিও না, তোমার ব্যাপারেও সংকীর্ণতা করা হইবে। (মানুষকে) কষ্টে ফেলিও না, তোমাকেও কষ্টে ফেলিয়া দেওয়া হইবে। হে যুবায়ের! আল্লাহ তায়ালা খরচ করাকে পছন্দ করেন এবং সংকীর্ণতাকে অপছন্দ করেন। দানশীলতা (আল্লাহ তায়ালায় প্রতি) একীনের দ্বারা পয়দা হয় আর কৃপণতা সন্দেহ হইতে পয়দা হয়। যে ব্যক্তি (আল্লাহ তায়ালায় প্রতি পূর্ণ) একীন রাখে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করিবে না। আর যে সন্দেহ করে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করিবে না। হে যুবায়ের! আল্লাহ তায়ালা দানশীলতাকে পছন্দ করেন; চাই খেজুরের একটি টুকরাই হউক না কেন। আল্লাহ তায়ালা বাহাদুরীকে পছন্দ করেন; চাই সাপ বিড়ু মারার মধ্যেই হউক না কেন। হে যুবায়ের! আল্লাহ তায়ালা ভূমিকম্প (এবং মুসীবত)এর সময় সবার করাকে ভালবাসেন। আর কাম-প্রবৃত্তির তাড়নার সময় এমন একীনকে পছন্দ করেন, যাহা সর্বব্যাপী হয় (এবং খাহেশ পূরা করা হইতে বাধা প্রদান করে, আর দ্বীনের ব্যাপারে) সন্দেহ পয়দা হওয়ার সময় পরিপূর্ণ জ্ঞানকে মহব্বত করেন। হারাম ও অপবিত্র জিনিস সম্মুখে আসিলে তাকওয়া অবলম্বন করাকে পছন্দ করেন। হে যুবায়ের! ভাইদের সম্মান কর, নেক লোকদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা বাড়িও, ভাল মানুষের সম্মান কর, প্রতিবেশীদের সহিত সদ্যবহার কর, ফাসেক লোকদের সহিত পথ চলিও না। যে ব্যক্তি এইসব বিষয়ের উপর গুরুত্ব সহকারে আমল করিবে, বিনা আয়াবে ও বিনা হিসাবে জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। ইহা আমার প্রতি আল্লাহ তায়ালায় নসীহত এবং তোমার প্রতি আমার নসীহত।

২০নং আয়াতেও এই ঘটনার প্রতি সংক্ষিপ্ত ইশারা করা হইয়াছে এবং কিছু আলোচনাও করা হইয়াছে।

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বিস্তারিত নসীহতের পর

হযরত যুবায়ের (রাযিঃ)এর মনের কি অবস্থা হইবে, তাহা স্পষ্ট। এমতাবস্থায় যদি তিনি হযরত আসমা (রাযিঃ)কে হযরত যুবায়েরের সম্পদ হইতে নিঃসংকোচে খরচ করিতে বলেন, তবে ইহা কোন অপাত্রে বলা হইবে না। হযরত যুবায়ের (রাযিঃ) ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুফাতো ভাইও ছিলেন। আত্মীয়-স্বজনের সহিত সম্পর্ক দৃঢ় হইলে এই ধরনের অধিকার খাটানোর দ্বারা সম্পর্ক আরও বৃদ্ধি পায় এবং আরও শক্তিশালী হয়। এই অধঃপতনের যুগেও ইহা চোখে দেখা যায় এবং বারবার ইহার অভিজ্ঞতা হইতে থাকে। এই সবকিছু বাদ দিলেও স্বয়ং হযরত যুবায়ের (রাযিঃ)এর দানশীলতাও অসাধারণ ছিল।

‘এসাবা’ কিতাবের লেখক লিখিয়াছেন, তাহার এক হাজার গোলাম ছিল, যাহারা তাহাকে কর আদায় করিত ; কিন্তু উহা হইতে সামান্য পরিমাণও ঘরে যাইত না। অর্থাৎ সবকিছুই তিনি সদকা করিয়া দিতেন। এই দানশীলতারই ফল ছিল যে, ইস্তেকালের সময় বাইশ লক্ষ দেবহাম কর্জ ছিল। যাহার বিস্তারিত ঘটনা বুখারী শরীফে উল্লেখ রহিয়াছে। এত কর্জ এইভাবে হইয়াছিল যে, তিনি অত্যন্ত আমানতদার এবং খুবই সতর্ক লোক ছিলেন। লোকেরা তাহার নিকট আমানত রাখিত। তিনি বলিতেন, আমানত রাখিবার জায়গা তো আমার নিকট নাই, আমাকে কর্জ দিয়া দাও। যখন প্রয়োজন হয়, লইয়া যাইও। তিনি আমানত হিসাবে না লইয়া কর্জ লইতেন এবং খরচ করিয়া দিতেন। শুধু যুবায়ের (রাযিঃ)ই নহেন, এই সকল বুয়ুর্গদের সকলের একই অবস্থা ছিল। তাঁহাদের নিকট সম্পদ জমা করিয়া রাখার বস্তুই ছিল না।

হযরত ওমর (রাযিঃ) একবার একটি থলিতে চারশত দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) ভরিলেন এবং গোলামকে বলিলেন, ইহা আবু উবায়দা (রাযিঃ)কে দিয়া আস। তিনি নিজের প্রয়োজনে খরচ করিবেন। গোলামকে ইহাও বলিয়া দিলেন যে, তাঁহাকে দেওয়ার পর সেইখানেই কোন কাজে মশগুল হইবেন, যাহাতে তুমি দেখিতে পার যে, তিনি উহা দ্বারা কি করেন। গোলাম তাঁহার নিকট গেল এবং উক্ত দিনার তাহার খেদমতে পেশ করিল। হযরত আবু উবায়দা (রাযিঃ) হযরত ওমর (রাযিঃ)কে অনেক দোয়া দিলেন। অতঃপর নিজের বাঁদিকে ডাকিলেন এবং তাঁহার মাধ্যমেই সাত দিনার অমুককে, পাঁচ দিনার অমুককে, এত দিনার অমুককে আর এত দিনার অমুককে—এইভাবে ঐ মজলিশেই সব খতম করিয়া দিলেন। গোলাম ফিরিয়া আসিয়া হযরত ওমর (রাযিঃ)কে ঘটনা শুনাইলেন। পুনরায় হযরত ওমর (রাযিঃ) সেই পরিমাণ দিনার গোলামের হাতে হযরত মুয়াজ্জ

করা হইয়াছে যাহা কুরআন পাকে নেক লোকদের জন্য সাব্যস্ত করা হইয়াছে। যেমন, সূরা তাতফীফে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র এরশাদ

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ . عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ . تَعْرِفُ فِيهِ جُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ . يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ . خِتْمُهُ مِنْكَ . وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ

আকিবে, তাহারা পালংকসমূহের উপর বসিয়া (বেহেশতের চমৎকার আসবাবসমূহ) দেখিতে থাকিবে। হে শ্রোতা, তুমি তাহাদের মুখমণ্ডলে সুখের সজীবতার পরিচয় পাইবে। তাহারা পান করার জন্য সিলমোহরযুক্ত বিশুদ্ধ শরাব পাইবে। উহাতে কস্তুরির সিলমোহর হইবে। এইরূপ বস্তুর প্রতি প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত, অর্থাৎ এইগুলিই প্রতিযোগিতা করার মত জিনিস।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, 'রাহীক' হইল, জাহ্নাতের শরাবসমূহের মধ্য হইতে মেশকের তৈরী একটি শরাব, যাহাতে তাসনীমের সংমিশ্রণ রহিয়াছে। তাসনীমের উল্লেখ এই সূরাতেই পরবর্তী আয়াতে রহিয়াছে।

কাভাদা (রহঃ) বলেন, তাসনীম হইল, জাহ্নাতের শরাবসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শরাব। নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দারা ইহা খালেস শরাবরূপে পান করিবে। আর অন্যান্য স্তরের লোকদের শরাবে উহার মিশ্রণ থাকিবে।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) হইতেও বর্ণনা করা হইয়াছে, রাহীক একটি শরাব, ইহাতে তাসনীমের মিশ্রণ রহিয়াছে। উপরোক্ত হাদীসে যে ফযীলত বলা হইয়াছে, তাহা বস্ত্রহীন অবস্থায় ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত অবস্থায় কাপড় পরানো এবং পানাহার করানোর ফযীলত সম্পর্কে বলা হইয়াছে। এই অবস্থা কি খরচকারীর, নাকি যাহার উপর খরচ করা হইয়াছে তাহার—ইহাতে উভয় সম্ভাবনাই রহিয়াছে। প্রথম সম্ভাবনা অনুযায়ী হাদীসের অর্থ এই যে, দানকারী নিজে বস্ত্রহীন অর্থাৎ তাহার নিজেরই কাপড়ের প্রয়োজন—এমতাবস্থায় সে অন্যকে কাপড় পরিধান করায়, নিজে ক্ষুধার্ত অবস্থায় থাকে। যখন কিছু খাবার পায়, তখন অন্যকে নিজের উপর প্রাধান্য দেয়, নিজেই পিপাসার্ত কিন্তু যদি পানি পায়, তখন সে নিজে পান করার পরিবর্তে অন্যকে প্রাধান্য দেয়। এই অর্থ অনুযায়ী উক্ত হাদীস কুরআন পাকের ঐ আয়াতের ব্যাখ্যা হইবে, যাহা আয়াতের বর্ণনায় ২৮ নম্বরে উল্লেখ করা হইয়াছে : يُؤْتُونَ عَلَى

‘أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ’ অর্থাৎ, তাহারা অন্যদেরকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দান করে ; যদিও তাহাদের নিজেদেরই প্রয়োজন থাকে।

হাদীসের দ্বিতীয় অর্থ হইল, বর্ণিত অবস্থাসমূহ ঐ সমস্ত লোকদের, যাহাদের উপর খরচ করা হইতেছে। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী হাদীসের অর্থ হইবে, যে কোন জিনিস যত বেশী প্রয়োজনের সময় খরচ করা হইবে, সওয়াব ততই বেশী হইবে। একজন অভাবী লোককে কাপড় দান করিলে অবশ্যই সওয়াব হয় ; কিন্তু এমন ব্যক্তিকে যদি কাপড় পরান হয়, যে বস্ত্রহীন অবস্থায় ঘুরিতেছে, ছেঁড়াফটা কাপড় পরিধান করিয়া রহিয়াছে, তবে ইহার সওয়াব সাধারণ গরীবদের তুলনায় অনেক বেশী হইবে। একজন ফকিরকে খানা খাওয়াইলে অবশ্যই উহার সওয়াব হইবে। কিন্তু এমন ব্যক্তিকে যদি খানা খাওয়ানো হয়, যে ক্ষুধায় কাতর হইয়া রহিয়াছে, তবে ইহার সওয়াব অনেক বেশী হইবে। এমনভাবে যে কোন ব্যক্তিকে পানি পান করাইলে সওয়াব হয় ; কিন্তু পিপাসায় ছটফট করিতেছে এইরূপ ব্যক্তিকে যদি পানি পান করানো হয়, তবে ইহার সওয়াব এতবেশী হয় যে, সারা জীবনের গুনাহের কাফফারা হইয়া যায়।

১০ নম্বর হাদীসে একটু পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে, একটি পিপাসার্ত কুকুরকে পানি পান করাইবার দরুন জনৈক পতিতা মেয়েলোকের সারা জীবনের গুনাহ মাফ হইয়া গিয়াছে। ২৩ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যায় হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে যে, মিসকীন ঐ ব্যক্তি নয়, যে দুই এক লোকমা খাবারের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ায়। আসল মিসকীন ঐ ব্যক্তি যাহার নিকট এই পরিমাণ মাল নাই, যাহা তাহার প্রয়োজন মিটাইতে যথেষ্ট হয়, আর লোকেরাও তাহার দুরাবস্থা সম্পর্কে জানে না, যাহাতে সাহায্য করিতে পারে ; এই ব্যক্তিই প্রকৃত মিসকীন।

১১ নম্বর হাদীসে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেকগুলি এরশাদ ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে খানা খাওয়ানোর ফযীলত সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে। হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি আপন কোন মুসলমান ভাইয়ের প্রয়োজন মিটানোর কাজে মশগুল হয়, আল্লাহ তায়ালা তাহার অভাব দূর করিবার প্রতি মনোযোগী হন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের কোন বিপদ দূর করে, আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তির উপর হইতে কিয়ামতের মুসীবতসমূহ হইতে কোন মুসীবত দূর করিয়া দেন। আর যে

ব্যক্তি কোন মুসলমানের গোপন বিষয় ঢাকিয়া রাখে (উহা দোষ-ত্রুটি সম্পর্কিত হউক অথবা পোশাক সম্পর্কিত হউক), কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তাহার (ঐ ধরনের) গোপন বিষয় ঢাকিয়া রাখিবেন। (মিশকাত)

এই ধরনের বিষয়বস্তু অনেক সাহাবায়ে কেরাম হইতে বিভিন্ন রেওয়াজে বর্ণনা করা হইয়াছে। আরও এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি কোন গোপনীয় বিষয় দেখিয়া (উহা শারীরিক হউক অথবা অন্য কোন দোষ হউক) ঢাকিয়া রাখে, ইহার সওয়াব এইরূপ যেন সে কোন এমন ব্যক্তিকে কবর হইতে বাহির করিল যাহাকে জীবিত কবরস্থ করা হইয়াছিল।

(মিশকাত)

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন : لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ
এই আয়াত পঁচিশ নম্বরে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার কারণ উলামায়ে কেরাম লিখিয়াছেন যে, যেহেতু মক্কা বিজয়ের পূর্বে অভাব বেশী ছিল, এইজন্য ঐ সময় খরচ করিবার সওয়াব মক্কা বিজয়ের পর খরচ করার সওয়াব হইতে বেশী ছিল।

‘জামাল’ কিতাবের লেখক বলেন, ইহা এইজন্য যে, তাহারাই ইসলাম ও মুসলমানদের অসহায় অবস্থায় খরচ করিয়াছে। ঐ সময় মুসলমানগণ জ্ঞান ও মালের মধ্যে সাহায্যের বেশী মুখাপেক্ষী ছিলেন। ইহারাই মুহাজিরীন ও আনসারগণের মধ্য হইতে প্রথম যুগের মুসলমান ছিলেন, যাহাদের সম্পর্কে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন—তোমরা উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ দান করিলেও তাহাদের এক মুদ (অর্থাৎ, আধা সের পরিমাণ) অথবা অর্ধ মুদ পরিমাণ দান করার সমতুল্য হইতে পারিবে না। (জামাল)

ইহা ছাড়াও অনেক বর্ণনায় বিভিন্ন শিরোনামে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভাবী লোকদেরকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করিয়াছেন এবং তাকীদ করিয়াছেন। ওলিমার দাওয়াত কবুল করিবার উৎসাহ অনেক রেওয়াজে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এক রেওয়াজে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন—ঐ ওলিমার খানা নিকটতম খানা যাহার মধ্যে ধনী লোকদেরকে দাওয়াত দেওয়া হয় আর গরীব লোকদেরকে বাদ দেওয়া হয়। (মিশকাত : বুখারী ও মুসলিম) অর্থাৎ, ওলিমার যে দাওয়াত এইরকম হয় যে, উহাতে ধনীদেরকেই দাওয়াত করা হয়, গরীব লোকদেরকে দাওয়াত করা হয় না, উহা নিকটতম খানা। নতুবা ওলিমার খানা সুন্নত।

এক হাদীসে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে এমন জায়গায় পানি পান করায় যেখানে পানি পাওয়া যায়, সওয়াবের দিক দিয়া সে যেন একটি গোলাম আজাদ করিল। আর যে ব্যক্তি কাহাকেও এমন জায়গায় পানি পান করায় যেখানে পানি পাওয়া যায় না, সে যেন তাহাকে জীবন দান করিল। অর্থাৎ, মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে যেন ধ্বংস হইতে বাঁচাইল। (কানয)

এক হাদীসে আছে, সর্বোত্তম সদকা হইল, কোন ক্ষুধার্তকে (মানুষ হউক কিংবা জীবজন্তু হউক) খানা খাওয়ানো। (কানয)

এক হাদীসে আছে, আল্লাহ তায়ালার নিকট সর্বাধিক প্রিয় হইল, কোন মিসকীনকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় রুটি খাওয়ানো অথবা তাহার করজ আদায় করিয়া দেওয়া অথবা তাহার বিপদ দূর করিয়া দেওয়া। (কানয)

ওবায়দ ইবনে ওমায়ের (রাযিঃ) বলেন, কিয়ামতের দিন মানুষের হাশর এমন অবস্থায় হইবে যে, তাহারা ভীষণ ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত অবস্থায় সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইবে। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কাহাকেও আল্লাহর ওয়াস্তে খানা খাওয়াইয়াছিল, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে ঐ দিন তৃপ্তি সহকারে খাওয়াইবেন। আর যে ব্যক্তি কাহাকেও আল্লাহর ওয়াস্তে পানি পান করাইয়াছিল, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে তৃপ্তি সহকারে পান করাইবেন। আর যে ব্যক্তি কাহাকেও কাপড় পরাইয়াছিল, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে কাপড় দান করিবেন। (এহইয়া)

تَحْصُوا أَهْلَ مَسْكِنٍ مِّنْكُمْ كَمَا رَأَيْتُمْ
بِأَيِّ عِلَّةٍ وَالدِّينَ عِلَّةً مِّنْكُمْ كَمَا رَأَيْتُمْ
كَمَا رَأَيْتُمْ كَمَا رَأَيْتُمْ كَمَا رَأَيْتُمْ
كَمَا رَأَيْتُمْ كَمَا رَأَيْتُمْ كَمَا رَأَيْتُمْ
كَمَا رَأَيْتُمْ كَمَا رَأَيْتُمْ كَمَا رَأَيْتُمْ
كَمَا رَأَيْتُمْ كَمَا رَأَيْتُمْ كَمَا رَأَيْتُمْ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَسْرَأْنِي عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْمَسْكِينِ
كَأَسْرَأْنِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَغْسَبُهُ
قَالَ كَأَنَّمَا لَمْ يَفْقَرُوا كَأَنَّمَا لَمْ
لَمْ يَفْقَرُوا مَتَّفَعٌ عَلَيْهِ (مشكوة).

১৪) হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি স্বামীহারা স্ত্রীলোক এবং মিসকীনের অভাব দূর করিবার চেষ্টা করে, সে এমন, যেমন জিহাদের জন্য চেষ্টা করিল। যথাসম্ভব হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাও বলিয়াছেন যে, সে এমন ব্যক্তির ন্যায়, যে রাতভর নামায পড়ে; একটুও অলসতা করে না এবং দিনভর রোযা রাখে

অর্থাৎ সর্বদা রোযা রাখে। (মিশকাত : বুখারী, মুসলিম)

ফায়দা : এখানে স্বামীহারা স্ত্রীলোক শব্দটির অর্থ ব্যাপক—বিধবা হউক অথবা এখনও স্বামী পায় পাই ; এমন হউক। এই হাদীসে উভয়ের জন্য যে চেষ্টা করিবে, তাহার জন্য এই সওয়াব ও ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে, তাহার এই চেষ্টা সফল হউক বা না হউক।

এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি আপন মুসলমান ভাইয়ের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য অথবা তাহার কোন উপকার করার জন্য অগ্রসর হয়, তাহাকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীদের সওয়াব দেওয়া হয়। (কানয)

এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি আপন অসহায় ভাইয়ের সাহায্য করিবে, আল্লাহ তায়ালা ঐ দিন তাহাকে দৃঢ়পদ রাখিবেন, যেইদিন পাহাড় পর্যন্ত স্থানচ্যুত হইয়া যাইবে। (কানয) অর্থাৎ, কিয়ামতের কঠিন দিনে পাহাড়সমূহও নিজ নিজ স্থানে স্থির থাকিতে পারিবে না, সেইদিন এই ব্যক্তি দৃঢ়পদ থাকিবে। এই হাদীস দ্বারা আরও একটি সূক্ষ্ম বিষয় জানা যায় যে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবং আপদ-বিপদের সময় যখন মানুষের পদস্থলন হয়, যেমন বর্তমান সময় হইতেছে, তখন এই সমস্ত লোক দৃঢ়পদ থাকিবে, যাহারা মানুষের সাহায্য ও সহযোগিতা করিতে থাকে।

এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি আপন মুসলমান ভাইয়ের দুনিয়াবী কোন প্রয়োজন পূরণ করে, আল্লাহ তায়ালা তাহার ৭০টি প্রয়োজন পূরণ করেন। তন্মধ্যে সর্বনিম্ন হইল, তাহার গুনাহ মাফ হইয়া যায়। (কানয)

এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি আপন কোন মুসলমান ভাইয়ের প্রয়োজন সরকার পর্যন্ত পৌছাইয়া দেওয়ার মাধ্যম হইবে ; যদ্বারা তাহার কোন উপকার হয় অথবা তাহার কোন সমস্যা সমাধান হইয়া যায়, আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন পুলসিরাত পার হইবার সময় সাহায্য করিবেন ; যখন সেখানে লোকদের পা পিছলাইয়া যাইতে থাকিবে।

(কানয)

অতএব, যাহারা সরকারী কর্মচারী অথবা কর্মকর্তাদের নিকট পৌছিতে পারে, তাহাদের বিশেষভাবে এই হাদীস দ্বারা উপকৃত হওয়া উচিত। কর্মচারী ও অধীনস্থদের অভাব-অভিযোগ জানিয়া তাহাদের মনিব ও কর্তা ব্যক্তিদের নিকট পৌছাইয়া দেওয়া চাই। এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, আমরা কেন অনর্থক অন্যের আমেলায় লিপ্ত হইব। কেননা, পুলসিরাত অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন বিষয় হইবে। এই সামান্য চেষ্টার দ্বারা তাহাদের কত বড় সমস্যার সমাধান হইয়া যাইতেছে। তবে সমস্ত বিষয়ই আল্লাহর জন্য হওয়া শর্ত। নিজের সম্মান খ্যাতি এবং মানুষের অন্তরে

প্রভাব বিস্তার উদ্দেশ্য না হওয়া চাই। আল্লাহর জন্য করিলেও এইসব বিষয় এমনিতেই হাসিল হইয়া যাইবে। বরং নিজ নিয়ত ও ইচ্ছা করার দ্বারা যতটুকু হইবে, উহার চাইতে বেশী হইবে। তবে নিজের পক্ষ হইতে এই সমস্ত জিনিসের নিয়ত করার কারণে আল্লাহর জন্য করার নিয়ত বাকি থাকিবে না।

(١٥) عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمْ اللَّهُ وَثَلَاثَةٌ
 يُبْغِضُهُمْ اللَّهُ فَأَمَّا الَّذِينَ
 يُحِبُّهُمْ اللَّهُ فَرَجُلٌ آتَى
 قَوْمًا فَسَأَلَهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَمْ
 يَسْأَلْهُمْ لِقَابًا بَيْنَهُ
 وَبَيْنَهُمْ فَمَنْعُوهُ فَتَخَلَّفَ
 رَجُلٌ بِأَعْيَانِهِمْ فَأَعْطَاهُ سِرًّا
 لَا يَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهِ إِلَّا اللَّهُ
 وَالَّذِي أَعْطَاهُ وَقَوْمٌ سَارُوا
 لَيْلَتَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ
 الثَّوْمُ أَغْبَتَ إِلَيْهِمْ مِمَّا
 يَعُدُّلُ بِهِ فَوَضَعُوهُ وَسَمُّهُ
 فَقَامَ يَتَمَلَّقُنِي وَيَسْلُو
 أَيَّامِي وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ
 فَلَقِيَ الْعَدُوَّ فَهَزَمُوا
 فَأُتِيَ بِرَجُلٍ بِصَدْرِهِ حَتَّى يُقْتَلَ
 أَوْ يُفْتَمَ لَدَا وَالثَّلَاثَةُ
 الَّذِينَ يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ

حضرت اقدس مصلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے کہ میں آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ جلّ شانہ عجیب رکھتا ہے اور میں شخص ایسے ہیں جن سے اللہ جلّ شانہ کو بغض ہے۔ جن میں کہیں کو اللہ جلّ شانہ محبوب رکھتا ہے ان میں ایک تو وہ شخص ہے کہ کسی فحش کے پاس کوئی سائل آیا اللہ مفضل اللہ کے واسطے سے ان سے کچھ سوال نہ لگا۔ کوئی قرابت، رشتہ داری (ذخیرہ) اس سائل کو ان سے دیتی اس مجمع نے اس سائل کو کچھ نہ دیا اس مجمع میں سے ایک شخص اٹھا اور چپکے سے اس سائل کو کچھ دے دیا، جس کی خبر بجز اللہ جلّ شانہ کے یا اُس سائل کے اور کسی نہ ہوئی (تو یہ دینے والا شخص اللہ جلّ شانہ کو بہت محبوب ہے و ویرا) وہ شخص کہ ایک مجمع کہیں سفر میں ہمارا ہے۔ ساری رات چلنے کے بعد جب نیند کا اُن پر اتنا غلبہ ہو جائے کہ وہ ہر چیز سے زیادہ محبوب بن گئی ہو تو وہ مجمع تھوڑی دیر کے لئے سونے لیٹ گیا، لیکن ایک شخص اُن میں سے کھڑ ہو کر اللہ جلّ شانہ کے سامنے گواہانہ لگے اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دے۔ تیسرا وہ

الشَّيْخُ الزَّائِي وَالْفَقِيرُ
الْمُسْكَنُ وَالْفَقِيرُ الْمَكْلُومُ -
رواه الترمذی والنسائی
هذا في المشكوة وعزاه
السيوطي في الجامع الى
ابن عسبان والعالم -

শুধু কিসে যে সমস্ত জীবদেহের শরীক হওয়া
জায়েজ নকসে কান্না এল যে এক শূন্য
সিংহের মতো গর্জন করছে। যাই হোক
হুগো - অর্থাৎ শূন্য শূন্য শূন্য
নকসে যে এক দেহের মতো হুগো
হুগো, অর্থাৎ শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য

তিন শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য

১৫) হুগো সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা ভালবাসেন। আর তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা ঘৃণা করেন। যেই তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা ভালবাসেন, তাহাদের মধ্যে একজন ঐ ব্যক্তি, যে কোন একদল লোকের (সহিত ছিল, তাহাদের) নিকট একজন ভিক্ষুক আসিল এবং একমাত্র আল্লাহ তায়ালা দোহাই দিয়া তাহাদের নিকট কিছু চাহিতে লাগিল। তাহাদের সহিত এই ভিক্ষুকের কোন সম্পর্ক আত্মীয়তা (ইত্যাদি) ছিল না। লোকেরা ভিক্ষুককে কিছুই দিল না। তাহাদের মধ্য হইতে উক্ত ব্যক্তি উঠিল এবং গোপনে ঐ ভিক্ষুককে কিছু দিয়া দিল, যাহা আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অথবা ঐ ভিক্ষুক ব্যতীত আর কেহ জানিল না। (এই দানকারী ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত ভালবাসেন। দ্বিতীয়) ঐ ব্যক্তি যে একদল লোকের সহিত কোথাও সফরে যাইতেছিল। সারারাত্র পথ চলিবার পর যখন তাহাদের উপর ঘুমের চাপ এত বেশী হইল যে, ঘুমই তাহাদের নিকট সবচেয়ে প্রিয় বস্তু বলিয়া মনে হইল; তখন তাহারা কিছুক্ষণের জন্য ঘুমাইয়া পড়িল। কিন্তু তাহাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আল্লাহ তায়ালা সম্মুখে বিনয় সহকারে কাদিতে লাগিল এবং কুরআন পাকের তেলাওয়াত শুরু করিয়া দিল। (তৃতীয়) ঐ ব্যক্তি যে কোন এক দলের সহিত জিহাদে শরীক ছিল। দলটি জিহাদে পরাজিত হইয়া গেল কিন্তু তাহাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি বুক টান করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইল এবং শহীদ হইয়া গেল অথবা বিজয়ী হইল। আর ঐ তিন ব্যক্তি যাহাদেরকে আল্লাহ তায়ালা ঘৃণা করেন—এক, ঐ ব্যক্তি যে বৃদ্ধ হইয়াও ব্যভিচারে লিপ্ত থাকে। দ্বিতীয়, ঐ ব্যক্তি যে ফকির হইয়াও অহংকার করে। তৃতীয়, ঐ ব্যক্তি যে ধনী হইয়া অত্যাচার করে। (মিলকাতঃ তিরমিযী, নাসায়ী, জামে সগীর, ইবনে হিব্বান, হাকেম)

ফায়দা : এই ছয় ব্যক্তি সম্পর্কে এই ধরনের বিষয়বস্তু আরও অনেক রেওয়াযাতে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আর এই হাদীস ৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যায়ও বর্ণিত হইয়াছে। কোন কোন রেওয়াযাতে ইহাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তিকে উল্লেখ করা হইয়াছে আবার কোন কোন রেওয়াযাতে একের অধিক উল্লেখ করা হইয়াছে। এক হাদীসে আছে, তিনটি সময় এমন রহিয়াছে যখন বান্দার দোয়া ফেরত দেওয়া হয় না, অর্থাৎ অবশ্যই কবুল করা হয়। এক, ঐ ব্যক্তি যে একা কোন ময়দানে রহিয়াছে ; যেখানে কেহ তাহাকে দেখিতেছে না। এমতাবস্থায় সে দাঁড়াইয়া নামায পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে (এই সময় তাহার দোয়া অবশ্যই কবুল হইবে)। দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি, যে কোন দলের সহিত জিহাদে শরীক হইল। তাহার সঙ্গীরা সকলেই পলায়ন করিল আর সে একা জমিয়া রহিল। তৃতীয় ঐ ব্যক্তি, যে শেষ রাতে আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়। (জামে সগীর)

এক হাদীসে আছে, তিন ব্যক্তি এমন রহিয়াছে যাহাদের সহিত আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন না কথা বলিবেন, না তাহাদের তাযকিয়া করিবেন, আর না তাহাদের প্রতি (রহমতের) দৃষ্টি করিবেন। তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব হইবে। এক, বৃদ্ধ ব্যভিচারী, দ্বিতীয়, মিথ্যাবাদী বাদশাহ, তৃতীয়, অহংকারী ফকির। (জামে সগীর : মুসলিম)

হাদীসে উল্লেখিত তাযকিয়া না করার অর্থ ইহাও হইতে পারে যে, তাহাদিগকে গুনাহ হইতে পবিত্র করিবেন না এবং ইহাও হইতে পারে যে, তাহাদের প্রশংসা করিবেন না।

অপর এক হাদীসে আছে, তিন ব্যক্তি এমন রহিয়াছে, যাহাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন (রহমতের) দৃষ্টি করিবেন না এবং তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক কঠিন শাস্তি থাকিবে। এক, মধ্যবয়সী ব্যভিচারী লোক। দ্বিতীয়, অহংকারী ফকির। তৃতীয় ঐ ব্যক্তি যে বেচা-কেনার সময় সর্বদা কসম খাইতে থাকে ; কসম খাইয়া খরিদ করে আর কসম খাইয়া বিক্রয় করে (অর্থাৎ, কথায় কথায় প্রয়োজনে বিনা প্রয়োজনে বারবার কসম খায় ; কেননা, ইহা মহান আল্লাহ তায়ালা উচ্চ মর্যাদার সহিত বেয়াদবী)।

অপর এক হাদীসে এই শব্দে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিন ব্যক্তির প্রতি কাল (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ তায়ালা দৃষ্টি করিবেন না। এক, বৃদ্ধ ব্যভিচারী, দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি যে বেশী বেশী কসম খাওয়াকে আপন পুঞ্জি বানাইয়া লয় ; সত্য মিথ্যা সব বিষয় কসম খাইতে থাকে। তৃতীয়, অহংকারী ফকির, যে দস্ত করে। (জামে সগীর)

এক হাদীসে আছে, তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা ভালবাসেন এবং তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা ঘৃণা করেন। যাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালা ভালবাসেন, তন্মধ্যে একজন ঐ ব্যক্তি, যে কোন জামাতের সহিত জিহাদে শরীক হইল এবং শত্রুর সম্মুখে বুক টান করিয়া দাঁড়াইয়া গেল। অতঃপর সে জয়ী হইল কিংবা শহীদ হইয়া গেল। দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি, যে কোন জামাতের সহিত সফর করিতেছে। যখন রাত্রের অধিকাংশ অতিবাহিত হইয়া যায় এবং জামাতের লোকেরা কিছুক্ষণ আরামের জন্য শুইয়া পড়ে, তখন এই ব্যক্তি দাঁড়াইয়া নামায পড়িতে আরম্ভ করে। অবশেষে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পর সঙ্গীদেরকে অগ্রসর হইবার জন্য জাগাইয়া দেয়। (নিজে একটুও আরাম করে না) তৃতীয় ঐ ব্যক্তি, যাহার প্রতিবেশী তাহাকে কষ্ট দেয় আর সে তাহার এই কষ্ট দেওয়ার উপর সবর করে। অতঃপর মৃত্যু অথবা সফর ইত্যাদির কারণে তাহার এবং তাহার প্রতিবেশীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে (অর্থাৎ, যতদিন সে প্রতিবেশীর সঙ্গে থাকে, অনবরত সবর করিতে থাকে)।

আর ঐ তিন ব্যক্তি যাহাদেরকে আল্লাহ তায়ালা ঘৃণা করেন—প্রথম, কসমখোর ব্যবসায়ী। দ্বিতীয়, অহংকারী ফকির। তৃতীয়, ঐ কৃপণ ব্যক্তি যে দান করিয়া খোটা দেয়। (জামে সগীর)

①٦ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ
قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْمَالِ لَعَقًا
سِوَى الزَّكَاةِ ثُمَّ تَلَا لَيْسَ الْبِرُّ
أَنْ تُلْوَ وَأَجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ - الْآيَةِ

تَحْفِظُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا رِشَادُ قَوْلِهِ
مَالٍ فِي زَكَاةٍ كَمَا عَلَّمَهُ وَأَوْجِبِي حَقَّ جِبْرِ
اس رِشَادِي تَأْيِيدِي سُورَةَ بَقَرَةٍ كَمَا تَأْيِيدِي
زَكَاةً كَمَا يَأْتِي (لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُلْوَ
وَأَجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
أَزْكَى تِلَاوَتِ قَوْلِي -

رواه الترمذی وابن ماجه والدارمی کذا فی مشکوٰۃ وقال الترمذی هذا
حدیث لیس اسنادہ بذلك وابو حمزة یضعف وروی بیان واستعیل
عن الشعبی هذا الحدیث قوله وهو اصح قلت وانخرجه ابن ماجه بلفظ
لیس فی المال عفا سوا الزکوة وقال العینی فی شرح البضاری واه البیهقی
یلفظ الترمذی ثم قال والذي یرویه اصحابنا فی التعلیق لیس فی

المال حق سوى الزكاة

(১৬) ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সম্পদের মধ্যে যাকাত ছাড়া আরও হক রহিয়াছে। অতঃপর তিনি (এই কথার সমর্থনে সূরায়ে বাকারার ২২তম রুকু'র এই আয়াত) لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا شَيْئًا وَجُودُكُمْ قَبْلَ الشَّرِّ وَالْمَغْرِبِ শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত করিলেন। (মিশকাত : তিরমিযী, ইবনে মাজা, দারিমী)

ফায়দা : উক্ত আয়াতের বিস্তারিত বর্ণনা ২নং আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে। ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত আয়াত দ্বারা ইহা প্রমাণ করিয়াছেন যে, সম্পদের মধ্যে যাকাত ছাড়া আরও হক রহিয়াছে। আর এই প্রমাণ এইজন্য স্পষ্ট যে, উক্ত আয়াতে আপন সম্পদ আত্মীয়-স্বজন, এতীম, গরীব, মুসাফির এবং সওয়ালকারীদের উপর খরচ করিবার জন্য, এমনিভাবে বন্দী ও গোলামদেরকে মুক্ত করিবার খাতে খরচ করিবার জন্য পৃথকভাবে উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে। সর্বশেষে যাকাত আদায় করার বিষয়টি স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। মুসলিম ইবনে ইয়াসার (রহঃ) বলেন, নামায দুই প্রকার (এক, ফরয, দ্বিতীয়, নফল)। এমনিভাবে যাকাতও দুই প্রকার (এক, নফল, দ্বিতীয় ফরজ)। আর কুরআন পাকে এই উভয় প্রকারের উল্লেখ রহিয়াছে। আমি কি তোমাদেরকে বলিয়া দিব? লোকেরা জানিতে চাহিলে তিনি উক্ত আয়াত তেলাওয়াত করিলেন এবং এই আয়াতের প্রথম অংশ যাহার মধ্যে উল্লেখিত খাতসমূহে মাল খরচ করার কথা রহিয়াছে তেলাওয়াত করিয়া বলিলেন, এই সবগুলি খাত হইল নফল। অতঃপর যাকাতের আলোচ্য অংশ তেলাওয়াত করিয়া বলিলেন, ইহা ফরজ। (দুররে মানসুর)

আল্লামা তীবী (রহঃ) বলেন, হাদীসে উল্লেখিত হক শব্দের অর্থ সওয়ালকারী ব্যক্তিকে বঞ্চিত না করা, ফরজ প্রার্থীকে বঞ্চিত না করা, নিজের ঘরের সাধারণ আসবাবপত্র সাময়িক ব্যবহারের জন্য কেহ চাহিলে অস্বীকার না করা। যেমন হাড়ি, বাটি ইত্যাদি কেহ সাময়িক ব্যবহার করিবার জন্য চাহিলে দিতে অস্বীকার না করা, লোকদেরকে পানি লবণ আগুন দিতে অস্বীকার না করা।

আল্লামা কারী (রহঃ) বলেন, ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত হাদীস শরীফে যে আয়াত তেলাওয়াত করিয়াছেন, উহার মধ্যে যাকাত ব্যতীত যে সমস্ত বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, হক শব্দ দ্বারা উহা বুঝাইয়াছেন। যেমন, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, এতীমদের প্রতি

দয়া করা, মিসকীন, মুসাফির এবং সওয়ালকারীকে দান করা, গোলামদেরকে মুক্ত করা ইত্যাদি। (মিশকাত)

মাজাহেরে হক কিতাবের লেখক লিখিয়াছেন, যাকাত তো ফরজ ; অবশ্যই দেওয়া চাই। যাকাত ছাড়া নফল সদকাও মুত্তাহাব ; উহাও দেওয়া চাই। আর উহা এই—অতঃপর আল্লামা তীবী ও আল্লামা কারী (রহঃ) এর বক্তব্য অর্থ সহ উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, এই আয়াত হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রমাণের জন্য পড়িয়াছেন। কেননা, ইহাতে আল্লাহ তায়ালা প্রথমে মুমেনদের প্রশংসা করিয়াছেন যে, তাহারা নিজেদের সম্পদ আত্মীয়-স্বজন ও এতীমদেরকে দান করে। অতঃপর তাহাদের নামায় কায়ম করা ও যাকাত প্রদান করার উল্লেখ করিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। অতএব, জানা গেল যে, আয়াতে উল্লেখিত সম্পদ দান করার অর্থ, যাকাত ব্যতীত একটি ডির ভিনিস। আর উহা হইল, নফল সদকা। মোটকথা, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কথা যে, ‘সম্পদের মধ্যে যাকাত ছাড়াও হক রহিয়াছে’ উক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। কেননা, উক্ত আয়াতে প্রথমে নফল সদকাকে উল্লেখ করা হইয়াছে, অতঃপর ওয়াজিব সদকাকে উল্লেখ করা হইয়াছে।

আল্লামা জাস্‌সাস রাযী (রহঃ) লিখিয়াছেন, কোন কোন আলেম উক্ত আয়াত দ্বারা ওয়াজিব হকসমূহকে বুঝিয়াছেন। যেমন, ভীষণ কষ্টে পতিত আত্মীয়-স্বজনের সহিত সদ্যবহার করা অথবা এমন কোন পেরেশান ও ক্ষুধার্ত লোকের উপর খরচ করা, যাহার মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার আশংকা হয়—এইরূপ ব্যক্তির উপর এই পরিমাণ খরচ করা জরুরী যা দ্বারা তাহার ক্ষুধা মিটিয়া যায়। অতঃপর আল্লামা জাস্‌সাস (রহঃ) হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্ত এরশাদ অর্থাৎ ‘মালের মধ্যে যাকাত ছাড়াও হক রহিয়াছে’ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, ইহা দ্বারা গরীব আত্মীয়-স্বজনের উপর খরচ করার অর্থও হইতে পারে ; যখন সরকার উক্ত ব্যয়ভার তাহার জিম্মায় করিয়া দেয়। এমনভাবে অভাবগ্রস্ত নিরম্পায় লোকের উপর খরচ করার অর্থও হইতে পারে। অনুরূপভাবে নফল হকসমূহও অর্থ হইতে পারে। কেননা, হক শব্দটি ওয়াজিব ও নফল উভয়ের উপর প্রয়োগ করা হইয়া থাকে।

ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী কিতাবে আছে, অভাবী লোক যখন উপার্জনের জন্য বাহিরে যাইতে ও লোকদের নিকট সওয়াল করিতে অক্ষম হয়, তখন তাহাকে খানা খাওয়ান অন্যান্য লোকের উপর ফরজ। এখানে তিনটি কথা রহিয়াছে—প্রথম এই যে, যখন অভাবী ব্যক্তি বাহিরে

যাইতে সক্ষম হয় ; এমনভাবে তাহার এই অক্ষমতা সম্পর্কে যে জানে, তাহার জিম্মায় সেই ব্যক্তিকে খানা খাওয়ান ফরজ এবং এই পরিমাণ খাওয়ানিতে হইবে, যদ্বারা সে বাহিরে যাইতে এবং ফরজ আদায় করিতে সক্ষম হইয়া যায়। তবে যে ব্যক্তি তাহার অবস্থা জানিবে, সে খানা খাওয়ানিতে সক্ষম হইতে হইবে। আর যদি সে নিজে খানা খাওয়ানিতে সক্ষম না হয়, তবে তাহার দায়িত্ব হইবে অন্যদেরকে সেই ব্যক্তির অবস্থা জানাইয়া দেওয়া। আর যদি সে নিজে খাওয়ানিতে না পারে এবং অন্যদেরকেও জানাইল না, এমনভাবে যদি সেই অভাবী ব্যক্তি মারা যায়, তবে ঐ সমস্ত ব্যক্তি গুনাহগার হইবে যাহারা তাহার অবস্থা জানিত।

দ্বিতীয় বিষয় হইল, যদি অভাবী ব্যক্তি বাহিরে যাইতে সক্ষম ; কিন্তু উপার্জন করিতে সক্ষম নয়, তবে লোকদের দায়িত্ব হইল, নিজেদের ওয়াজিব সদকা হইতে তাহাকে সাহায্য করিবে। আর যদি সে উপার্জন করিতে সক্ষম হয়, তবে তাহার অন্য সওয়াল করা জায়েয হইবে না। তৃতীয় বিষয় হইল, যদি সেই অভাবী ব্যক্তি বাহিরে যাইতে সক্ষম হয় ; কিন্তু উপার্জন করিতে সক্ষম না হয়, তবে তাহার জিম্মায় জরুরী হইল, বাহিরে যাইয়া লোকদের নিকট সওয়াল করিবে। যদি সে সওয়াল না করে, তবে গুনাহগার হইবে। (আলমগীরী)

حضرت بیاضی فرماتی ہیں کہ میرے والدین
نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے
دریافت کیا کہ وہ کیا چیز ہے جس کا کسی
مانگنے والے کو دینے سے روکنا جائز نہیں
حضور نے فرمایا پانی، میرے والدین میری
سوال کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
نہیں، میرے والدین میری سوال کیا تو حضور
نے فرمایا جو بھلائی تو (کسی کے ساتھ) کرے گا

① عَنْ بَهْیَسَةَ عَنْ أَبِيهَا قَالَتْ
قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ
الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنَعُهُ قَالَ الْمَاءُ
قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي
لَا يَحِلُّ مَنَعُهُ قَالَ الْبَلَحُ قَالَ
يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي
لَا يَحِلُّ مَنَعُهُ قَالَ أَنْ تَفْعَلَ
الْغَيْرَ خَيْرٌ لَكَ

(رواه ابو داؤد و هذا في مشکوٰۃ) تیرے لئے بہتر ہے

①৭ হযরত বুহাইছা (রাযিঃ) বলেন, আমার পিতা হযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, উহা কোন জিনিস, যাহা (কেহ চাহিলে দিতে) অস্বীকার করা জায়েয নয়। হযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, পানি। আমার পিতা পুনরায় একই প্রশ্নই

করিলেন। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, লবণ। আমার পিতা আবার একই প্রশ্ন করিলেন। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি (কাহারও জন্য) যে কোন উপকার করিতে পার, উহা তোমার জন্য উত্তম। (মিশকাত : আবু দাউদ)

ফায়দা : যদি পানি দ্বারা উদ্দেশ্য হয় কুয়া হইতে পানি লওয়া, আর লবণ দ্বারা উদ্দেশ্য হয় খনি হইতে লবণ লওয়া, তবে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী কাহাকেও এইসব জিনিস লওয়ার ব্যাপারে বাধা দেওয়ার অধিকার নাই। কিন্তু যদি নিজের মালিকানাভুক্ত পানি অথবা মালিকানাভুক্ত লবণ উদ্দেশ্য হইয়া থাকে, তবে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য এইখানে সতর্ক করা যে, এইরূপ মামুলী জিনিসের ব্যাপারে কোন সওয়ালকারীকে কখনও নিষেধ করা চাই না। এইসব জিনিস দেওয়ার মধ্যে দাতার তেমন ক্ষতি নাই। অথচ সওয়ালকারী ব্যক্তির বিরাট প্রয়োজন মিটিয়া যায়। তবে দাতা যেন সওয়ালকারী ব্যক্তির পর্যায়েৰ আভাবী না হয়। কিন্তু বাড়ীঘরে এইসব জিনিস যেহেতু প্রায়ই মজুদ থাকে এবং নিজের তাৎক্ষণিক তেমন কোন প্রয়োজন থাকে না, এমতাবস্থায় কাহারও তরকারী যদি পানসা ও স্বাদবিহীন হয় সামান্য লবণ দ্বারা তাহার সম্পূর্ণ খানা ঠিক হইয়া গেল ; অথচ ইহাতে তোমার তেমন কোন ক্ষতি হইল না। পানির বিষয়টিও ঠিক তেমনি।

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তিন জিনিসের ব্যাপারে নিষেধ করা জায়েয নয়—পানি, লবণ, আগুন। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! পানির বিষয়টি তো বুঝিলাম (কেননা, ইহা বাস্তবিকই অত্যন্ত প্রয়োজনের জিনিস) ; কিন্তু লবণ ও আগুনের বিষয়টি কি? হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, হে হুমায়রা ! যখন কেহ কাহাকেও আগুন দেয়, তখন সে যেন ঐ সমুদয় জিনিস সদকা করিল যাহা ঐ আগুন দ্বারা পাকান হইল। আর যে লবণ দিল, সে যেন ঐ সমুদয় জিনিস সদকা করিল যাহা লবণের দ্বারা সুস্বাদু হইল। (মিশকাত)

যদিও এই দুইটি জিনিসের মধ্যে মামুলী খরচ হয়, কিন্তু অন্যের বড় উপকার হয়। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত হাদীসে উদাহরণস্বরূপ দুইটি জিনিসের উল্লেখ করিয়াছেন। অতঃপর একটি নিয়ম বলিয়া দিয়াছেন—কাহারও যে কোন উপকার করিতে পার, উহা তোমার জন্য উত্তম।

বাস্তব ইহাই যে, মানুষ যে কোন ধরনের অনুগ্রহ কাহারও সহিত করে,

উহা দেখিতে যদিও অন্যের প্রতি অনুগ্রহ মনে হয় ; কিন্তু বাস্তবে উহা নিজের প্রতিই অনুগ্রহ স্বরূপ।

২০নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালার এরশাদ উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তোমরা যাহা কিছু আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিবে, আল্লাহ তায়ালার উহার বিনিময় দান করিবেন।

২১নং হাদীসে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, দুইজন ফেরেশতা প্রতিদিন এই দোয়া করিতে থাকে—হে আল্লাহ! খরচকারীদেরকে বিনিময় দান করুন, আর যাহারা জমা করিয়া রাখে তাহাদেরকে ধ্বংস করুন। এইরূপ অবস্থায় যে কোন অনুগ্রহ কোন ব্যক্তি কাহারও প্রতি করে, সে যেন নিজের সম্পদকে ধ্বংস হইতে বাঁচাইয়া আল্লাহ তায়ালার খাজানা হইতে বিনিময় গ্রহণ করার জন্য নিজের অধিকার কায়ম করিয়া লইল। আর গভীর দৃষ্টিতে দেখিলে বুঝে আসিবে যে, ইহা বাস্তবে অন্যের প্রতি সামান্যতম অনুগ্রহও নয় ; বরং ইহা এমন যেন গ্রহণকারী তোমার বাড়ীঘরকে লুটতরাজ হইতে বাঁচাইয়া দিল। এই হিসাবে সে তোমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছে ; তাহার প্রতি তোমার অনুগ্রহ নয়।

①৮ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رَضِيَ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ فَأَتَى الْقَدْفَةَ أَفْضَلُ قَالَ أَلْمَاءُ فَحَقَّرَ بَيْتًا وَقَالَ هَذِهِ لِأُمِّ سَعْدٍ (رواه مالك و أبو داود والنسائي هذا في المشحونة)

حضرت سعد نے عرض کیا یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا (ان کے ایصالِ ثواب کے لئے) کونسا مسند زیادہ افضل ہے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی سب افضل ہے اس پر حضرت سعد نے اپنی والدہ کے ثواب کے لئے ایک کنواں کھدوا دیا۔

①৮ হযরত সা'দ (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার মা ইন্তেকাল করিয়াছেন (তাহার ইসালে সওয়াবের জন্য) কোন সদকা অধিক উত্তম হইবে? হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, সর্বোত্তম হইল, পানি। ইহা শুনিয়া হযরত সা'দ (রাযিঃ) তাহার মায়ের সওয়াবের জন্য একটি কুয়া খনন করিলেন।

(মিশকাত : মালেক, আবু দাউদ, নাসায়ী)

ফায়দা : হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানিকে সর্বোত্তম সদকা এইজন্য বলিয়াছেন যে, মদীনা শরীফে ইহার প্রয়োজন বেশী ছিল। গরম দেশগুলিতে সর্বত্রই বিশেষভাবে পানির প্রয়োজন হয়। আর তখন

মদীনা শরীফে পানির অভাবও ছিল। এছাড়া পানির উপকারিতাও ব্যাপক এবং প্রয়োজনও ব্যাপক।

এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি পানির ব্যবস্থা করিয়া যাইবে, উহা হইতে যে কোন মানুষ, জিন অথবা পশুপাখি পানি পান করিবে, মৃত ব্যক্তি কিয়ামত পর্যন্ত উহার সওয়াব পাইতে থাকিবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ)এর নিকট এক ব্যক্তি আসিয়া আরজ করিল, আমার হাঁটুতে একটি ক্ষত আছে। সাত বৎসর যাবৎ সব ধরনের ঔষধ ও চিকিৎসা করিয়াছি, কোন উপকার হয় নাই, বড় বড় চিকিৎসকের নিকটও গিয়াছি। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) বলিলেন, যে এলাকায় পানির অভাব রহিয়াছে, সেখানে তুমি একটি কুয়া খনন করিয়া দাও। আমি আব্দুল্লাহর নিকট আশা রাখি যে, যখন উহা হইতে পানি বাহির হইয়া আসিবে, তখন তোমার হাঁটুর রক্ত পড়াও বন্ধ হইয়া যাইবে। সুতরাং সেই ব্যক্তি উহাই করিল এবং হাঁটুর ক্ষত ভাল হইয়া গেল।

বিখ্যাত মুহাদ্দিস আবু আবদুল্লাহ হাকেম (রহঃ)এর চেহারায় একটি ক্ষত হইয়া গিয়াছিল। সবধরনের চিকিৎসা করিয়াছেন, কিন্তু কোন লাভ হয় নাই। এইভাবে এক বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। একবার তিনি উস্তাদ আবু উসমান সাবুনী (রহঃ)এর নিকট দোয়ার জন্য দরখাস্ত করিলেন। জুমআর দিন ছিল। তিনি দীর্ঘসময় পর্যন্ত দোয়া করিলেন। উপস্থিত সকলেই আমীন বলিল। দ্বিতীয় জুমআতে একজন মহিলা হাজির হইল এবং একটি কাগজের টুকরা মজলিসে পেশ করিল। উহাতে লেখা ছিল—আমি গত জুমআর দিন ঘরে পৌছিয়া হাকেমের জন্য অত্যন্ত মনোযোগের সহিত দোয়া করিতেছিলাম, স্বপ্নে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত হইল। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, হাকেমকে বলিয়া দাও, সে যেন মুসলমানদের জন্য পানির সুব্যবস্থা করিয়া দেয়। হাকেম (রহঃ) ইহা শুনিয়া নিজের বাড়ীর সম্মুখে পানির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। উহাতে সবসময় পানি রাখিবার এবং বরফ ঢালিবার ব্যবস্থাও করিয়া দিলেন। এক সপ্তাহ অতিবাহিত হইয়াছিল, ইতিমধ্যে তাহার চেহারার সমস্ত ক্ষত সম্পূর্ণ ভাল হইয়া গেল। পূর্বের চেয়েও তাহার চেহারা উজ্জ্বল হইয়া গেল। (তারগীব)

এক হাদীসে আছে, হযরত সাদ (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার মা জীবদ্দশায় আমার সম্পদ দ্বারা হজ্জ করিতেন, আমার সম্পদ হইতেই দান-খয়রাত করিতেন, আত্মীয়-স্বজনকে দান

করিতেন, অন্য লোকদেরও সাহায্য করিতেন, এখন তাহার ইন্তেকাল হইয়া গিয়াছে। আমি যদি তাহার পক্ষ হইতে এই সমস্ত কাজ করি, তবে তিনি কি উহার সওয়াব পাইবেন? ছ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, সে সওয়াব পাইবে। (কানয)

এক হাদীসে আসিয়াছে, একজন মহিলা ছ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল, আমার মা হঠাৎ ইন্তেকাল করিয়াছেন। হঠাৎ ইন্তেকাল না করিলে তিনি কিছু দান-খয়রাত করিয়া যাইতেন। আমি যদি তাহার পক্ষ হইতে কিছু সদকা করি, তবে উহা কি তাহার পক্ষ হইতে গণ্য হইবে? ছ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, হাঁ তুমি তাহার পক্ষ হইতে সদকা করিয়া দাও। (আবু দাউদ)

নিজের মাতা-পিতা, স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন, সম্মান-সম্মতি এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন, বিশেষভাবে ঐ সমস্ত লোক যাহাদের মৃত্যুর পর তাহাদের কোন সম্পদ আমি পাইয়াছি অথবা আমার প্রতি যাহাদের বিশেষ অনুগ্রহ রহিয়াছে, যেমন উস্তাদ, মাশায়ের; তাহাদের জন্য সওয়াব পৌছানোর ব্যাপারে অনেক বেশী গুরুত্ব দেওয়া উচিত। অত্যন্ত লজ্জার বিষয় যে, তাহাদের সম্পদ দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়, তাহাদের জীবনকালে তাহাদের অনুগ্রহ দ্বারা উপকৃত হয়; অথচ যখন তাহারা নিজেরা দান-দক্ষিণা ও হাদিয়ার মুখাপেক্ষী হয়, তখন তাহাদেরকে ভুলিয়া যাওয়া হয়। মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে, তখন তাহার সমস্ত আমল বন্ধ হইয়া যায়, তবে সে যদি কোন সদকায়ে জারিয়ার কাজ করিয়া যাইয়া থাকে অথবা এমন কোন আমল করিয়া যাইয়া থাকে যাহা সদকায়ে জারিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে তাহা বাকী থাকে। ইহার বর্ণনা সামনে আসিতেছে। মৃত্যুর পর সে অন্যদের পক্ষ হইতে সওয়াব এবং তাহাদের দোয়া ইত্যাদি দ্বারা সাহায্য পাওয়ার মুখাপেক্ষী ও অপেক্ষমান থাকে।

এক হাদীসে আসিয়াছে, মৃত ব্যক্তি তাহার কবরে পানিতে ডুবন্ত ব্যক্তির মত থাকে এবং চতুর্দিক হইতে কোন সাহায্যকারীর আশা করিতে থাকে। সে অপেক্ষা করিতে থাকে যে, বাপ ভাই বা অন্য কোন বন্ধুর পক্ষ হইতে (অন্ততঃ) দোয়ার মাধ্যমে যেন তাহার সাহায্য করা হয়। যখন তাহার নিকট কোন সাহায্য পৌছে, তখন উহা তাহার নিকট সারা দুনিয়ার ধন-সম্পদ হইতে বেশী প্রিয় হয়। (এছইয়া)

বিশ্বর ইবনে মনসুর (রহঃ) বলেন, মহামারীর জন্মানায় এক ব্যক্তি বেশী বেশী জানাযার নামায়ে শরীক হইত এবং সন্ধ্যার সময় কবরস্থানে

اِنَّ اللَّهَ وَحُشَّتَكُمْ وَ رَحِمَ غُرْبَتَكُمْ وَ تَجَاوَزَ : এই দোয়া করিত : اِنَّ اللَّهَ وَحُشَّتَكُمْ (আল্লাহ তোমাদের

ভয়-ভীতিকে সাঙ্ঘনা দ্বারা পরিবর্তন করিয়া দিন, তোমাদের অসহায় অবস্থার প্রতি রহম করুন, তোমাদের ভুল ত্রুটি মাফ করিয়া দিন এবং তোমাদের নেক আমল কবুল করিয়া নিন। এই দোয়া করিয়া লোকটি বাড়ীতে চলিয়া যাইত। ঘটনাক্রমে একদিন সেই ব্যক্তি এই সুযোগের অভাবে দোয়া না পড়িয়াই ঘরে আসিয়া পড়িল। রাত্রে সে স্বপ্নে দেখিল, বড় এক জামাত তাহার নিকট আসিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কাহারা? কি জন্য আসিয়াছ? তাহারা বলিল, আমরা কবরস্থানের বাসিন্দা। তুমি আমাদেরকে এই বিষয়ে অভ্যস্ত করিয়া দিয়াছ যে, প্রতিদিন তোমার পক্ষ হইতে আমাদের নিকট হাদিয়া আসিত। সে জিজ্ঞাসা করিল, কেমন হাদিয়া! তাহারা বলিল, তুমি প্রতিদিন যে দোয়া করিতে উহা আমাদের নিকট হাদিয়ার আকারে পৌছিত। সেই লোকটি বলিল, এই ঘটনার পর আমি কখনও এই দোয়া ছাড়ি নাই।

বাশ্শার ইবনে গালিব নজরানী (রহঃ) বলেন, আমি হযরত রাবেয়া বসরীয়ার জন্য বেশী বেশী দোয়া করিতাম। একবার আমি তাঁহাকে স্বপ্নে দেখিলাম। তিনি বলিতেছেন, হে বাশ্শার! তোমার উপহার আমাদের নিকট নূরের তশতরীতে রেশমের গেলাফ দ্বারা ঢাকিয়া পৌছাইয়া দেওয়া হয়। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কেমন কথা! তিনি বলিলেন, মুসলমানদের যে দোয়া মৃত ব্যক্তির জন্য কবুল হয়, উহা নূরের তশতরীতে রেশমের গেলাফ দ্বারা ঢাকিয়া এই বলিয়া মৃত ব্যক্তির নিকট পেশ করা হয় যে, ইহা তোমার জন্য অমুক ব্যক্তি হাদিয়া পাঠাইয়াছে। (এহইয়া)

পরবর্তী হাদীসের ব্যাখ্যায় এই ধরনের আরও কয়েকটি ঘটনা আসিতেছে। ইমাম নবভী (রহঃ) মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থে লিখিয়াছেন, মৃত ব্যক্তির নিকট সদকার সওয়াব পৌছিবার ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে কাহারও দ্বিমত নাই; এই অভিমতই সঠিক। কেহ কেহ লিখিয়াছে যে, মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির নিকট কোন সওয়াব পৌছে না, ইহা নিঃসন্দেহে বাতিল এবং ভুল কথা। ইহা কুরআন পাকেরও বিপরীত, হুম্মুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসেরও বিপরীত এবং উম্মতের ঐকমত্যেরও বিপরীত। কাজেই এই উক্তির প্রতি মোটেও জঙ্কেপ করা চাই না। (বায়ল)

শায়েখ তকীউদ্দিন (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি এই ধারণা করে যে, মানুষ শুধু নিজের কৃত আমলেরই সওয়াব পাইবে, সে উম্মতের ঐকমত্যের

বিরোধিতা করিতেছে। কেননা, উম্মত এই ব্যাপারে একমত যে, অন্যের দোয়া দ্বারাও মানুষের উপকার হয়। ইহার অর্থ অন্যের আমল দ্বারা উপকৃত হওয়া। এমনিভাবে ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাশরের ময়দানে সুপারিশ করিবেন, অন্যান্য নবী ও নেকলোকগণও সুপারিশ করিবেন। এই সবকিছুর অর্থ অন্যের আমল দ্বারা উপকৃত হওয়া। ফেরেশতারাও মুমেনদের জন্য দোয়া ও এস্তেগফার করিয়া থাকে (যেমন সূরা মুমিনের প্রথম রুকুতে রহিয়াছে)। ইহাও অন্যের আমল দ্বারা উপকৃত হওয়া। এমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা শুধু নিজ রহমতে অনেক লোকের গুনাহ মাফ করিবেন। ইহাও নিজের চেষ্টা ও আমল ছাড়া উপকৃত হওয়া। সূরা ওয়াত তুরের প্রথম রুকুতে বর্ণিত আছে যে, মুমিনদের সম্মান-সন্তুতিকে নিজ নিজ পিতামাতার সহিত জাম্মাতে দাখেল করা হইবে। ইহাও অন্যের আমল দ্বারা উপকৃত হওয়া। বদলী হজ্জ দ্বারা মৃত ব্যক্তির ফরজ হজ্জ আদায় হইয়া যায়, ইহাও অন্যের আমল দ্বারা উপকৃত হওয়া। মোটকথা, অনেক বিষয় এই ব্যাপারে প্রমাণস্বরূপ রহিয়াছে, যাহা গণনা করাও কঠিন কাজ। (বায়ল)

এক বুযুর্গ বলেন, আমার ভাইয়ের ইন্তেকাল হইলে আমি তাহাকে স্বপ্নে দেখিলাম। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কবরে রাখিবার পর তোমার কি অবস্থা হইয়াছে? সে বলিল, তখন আমার নিকট আগুনের একটি শিখা আসিয়াছিল কিন্তু সাথে সাথে আমার নিকট এক ব্যক্তির দোয়া পৌছিয়া গেল। যদি উহা না হইত, তবে আগুনের ঐ শিখা আমার শরীরে লাগিয়া যাইত।

আলী ইবনে মুসা হান্দাদ (রহঃ) বলেন, আমি আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)এর সঙ্গে এক জানাযায় শরীক ছিলাম। মুহাম্মদ ইবনে কুদামা জওহরী (রহঃ)ও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। লাশ দাফন করিবার পর একজন অন্ধ ব্যক্তি আসিয়া কবরের নিকট বসিয়া কুরআন শরীফ পড়িতে লাগিল। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) বলিলেন, কবরের নিকট বসিয়া কুরআন শরীফ পড়া বেদআত। যখন আমরা ফিরিয়া আসিতেছিলাম, তখন পশ্চিমধ্যে মুহাম্মদ ইবনে কুদামা (রহঃ) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার দৃষ্টিতে মুবাশ্শির ইবনে ইসমাইল হালাবী কেমন লোক? ইমাম সাহেব বলিলেন, তিনি বিশ্বস্ত লোক। ইবনে কুদামা (রহঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনিও কি তাহার নিকট হইতে এলেম হাসিল করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, হাঁ আমিও তাহার নিকট হইতে বিভিন্ন হাদীস সংগ্রহ করিয়াছি। ইবনে কুদামা (রহঃ) বলিলেন,

মুবাশ্শির আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবদুর রহমান ইবনে আলা ইবনে লাজলাজ (রহঃ) তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি তাহার ইচ্ছেকালের সময় ওসীয়াত করিয়াছিলেন, তাহার কবরের শিয়রে যেন সুরায়ে বাকারার শুরু ও শেষ অংশ তেলাওয়াত করা হয়। অতঃপর বলিয়াছিলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ)কে এই ওসীয়াত করিতে শুনিয়াছিলাম। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) এই ঘটনা শুনিয়া ইবনে কুদামাকে বলিলেন, তুমি কবরস্থানে ফিরিয়া যাও এবং সেই অঙ্কে কুরআন শরীফ পড়িতে বল। মুহাম্মদ ইবনে আহমদ মারওয়াজী (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)এর নিকট শুনিয়াছি, যখন তোমরা কবরস্থানে যাও, তখন সুরা আল-হামদু, কুলছআল্লাহ, কুল আউযু বিরাব্বিল-ফালাক এবং কুল আউযু বিরাব্বিন-নাস পড়িয়া কবরবাসীদেরকে বখশিয়া দিও। কেননা, ইহার সওয়াব তাহাদের নিকট পৌছিয়া যায়। (এহইয়া)

হাম্বলী ফেকার নির্ভরযোগ্য আল-মুগনী কিতাবে লেখক উক্ত ঘটনা এবং এই ধরনের আরও ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন।

‘বয়লুল মাজহুদ’ কিতাবে বাহুর কিতাব হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে, যে ব্যক্তি রোযা রাখে অথবা নামায পড়ে অথবা দান-খয়রাত করে এবং উহার সওয়াব অন্য কোন মৃত অথবা জীবিত ব্যক্তিকে বখশিয়া দেয়, উহার সওয়াব তাহার নিকট পৌছিয়া যায়। জীবিত অথবা মৃত হওয়ার কারণে কোন পার্থক্য হয় না।

আবু দাউদ শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ)এর এই উক্তি বর্ণনা করা হইয়াছে যে, এমন কোন ব্যক্তি আছে কি, যে এই দায়িত্ব লইবে যে, মসজিদে আশারে (যাহা বসরা শহরের নিকটে অবস্থিত) যাইয়া দুই রাকাত অথবা চার রাকাত নামায পড়িয়া এই কথা বলিবে যে, এই নামায (অর্থাৎ, ইহার সওয়াব) আবু হুরাইরার জন্য হউক। (আবু দাউদ)

মৃত আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি সওয়াব পৌছাইবার ব্যাপারে খুব বেশী গুরুত্ব দেওয়া চাই। তাহাদের হক ছাড়াও অতি শীঘ্রই মৃত্যুর পর তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইবে, তখন কত বড় লজ্জার বিষয় হইবে যে, মানুষ তাহাদের দান, অনুগ্রহ, ধন-সম্পদ নিজের কাজে খরচ করিতে থাকে; অথচ তাহাদেরকে স্মরণ রাখে না।

تَحْذِيرًا لِمَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
কাপাক ইরশাদ হে کہ جب آدمی مر جائے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَسَلَّمَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ
إِنْ قَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ
ثَلَاثٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ
جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ
أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ۔

যে তরাসকে অমল কাঁড়াব নহে
জানাজে মৃত্যুতিন চিহ্নই এই যি জন
কাঁড়াব নহে কে বদকি মতাবস্তে এক
সদকা জারিয়া, দুইয় ঐ এলেম, যদ্বারা মানুষ উপকৃত
কওনৈ পুঁজিয়াছে তিসেই সাহায্য এলাও
অকল মৃতকে বদকি মতাবস্তে

(রোহ مسلم كذا في المشكوة طت وإرداؤد والنسائي وغيرهما)

১৯) ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন
মানুষ মারা যায়, তখন তাহার যাবতীয় আমলের সওয়াব বন্ধ হইয়া যায়,
কিন্তু তিনটি বিষয় এমন রহিয়াছে যাহার সওয়াব মৃত্যুর পরও সে পাইতে
থাকে। এক, সদকায়ে জারিয়া, দ্বিতীয় ঐ এলেম, যদ্বারা মানুষ উপকৃত
হইতে থাকে। তৃতীয়, নেক সন্তান, যাহারা তাহার জন্য মৃত্যুর পর দোয়া
করিতে থাকে। (মিশকাত : মুসলিম। আবু দাউদ, নাসায়ী)

ফাযলদা : আল্লাহ তায়ালা কত বেশী দান, অনুগ্রহ, মেহেরবানী ও দয়া
যে, মানুষ যদি চায় মৃত্যুর পরেও যখন তাহার আমল করিবার সময় শেষ
হইয়া যাইবে, আমল করিবার কোন ক্ষমতা থাকিবে না, তখনও কবরে
সুখে ঘুমাইতে থাকিবে আর তাহার নেক আমল বৃদ্ধি পাইতে
থাকিবে—আল্লাহ তায়ালা আপন অনুগ্রহে ইহারও ব্যবস্থা করিয়া
দিয়াছেন। ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনটি বিষয় উক্ত
হাদীসে উল্লেখ করিয়াছেন। এক, সদকায়ে জারিয়া, অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বে সে
এমন কোন জিনিস সদকা করিয়া যায়, যাহার উপকারিতা বাকী থাকে।
যেমন, কোন মসজিদ বানাইয়া গেল ; লোকেরা উহাতে নামায পড়িতে
থাকে। যতদিন উহাতে নামায হইতে থাকিবে, সেই মৃত ব্যক্তি বিনা
পরিশ্রমে উহার সওয়াব পাইতে থাকিবে। এমনিভাবে কোন মুসাফিরখানা,
দ্বীনী কাজের জন্য কোন বাড়ী বানাইয়া ওয়াকফ করিয়া গেল ; উহা দ্বারা
মুসলমানদের অথবা দ্বীনী কাজের উপকার হইতে থাকে ; এমতাবস্থায় সেই
ব্যক্তি উহার সওয়াব পাইতে থাকিবে। সর্বসাধারণের উপকারার্থে কুয়া
খনন করিয়া গেল, এই কুয়া হইতে যতদিন লোকেরা পানি পান ও ওয়ু
ইত্যাদি করিতে থাকিবে, মৃত্যুর পরেও ততদিন সে উহার সওয়াব পাইতে
থাকিবে।

অন্য এক হাদীসে ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে — মানুষ মৃত্যুর পর যে সমস্ত জিনিসের সওয়াব পাইতে থাকে, তন্মধ্যে একটি হইল, এলেম ; যাহা সে কাহাকেও শিক্ষা দিয়াছে এবং উহার প্রচার করিয়াছে। আর নেক সন্তান ; যাহাকে সে রাখিয়া গিয়াছে এবং কুরআন শরীফ ; যাহা সে তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তির মধ্যে রাখিয়া গিয়াছে। মসজিদ এবং মুসাফিরখানা ; যাহা সে বানাইয়াছে। পানির নালা বা খাল ; যাহা সে চালু করিয়া গিয়াছে। দান-খয়রাত ; যাহা সে জীবদশায় এবং সুস্থ অবস্থায় এমনভাবে দিয়া গিয়াছে, যাহাতে মৃত্যুর পরেও উহার সওয়াব পাইতে থাকে। (মিশকাত)

সওয়াব পাইতে থাকার অর্থ হইল, সদকায়ে জারিয়া হিসাবে দিয়া গিয়াছে। যেমন, ওয়াকফ করিয়া গিয়াছে। আর এলেম প্রচারের অর্থ হইল, কোন মাদরাসায় চাঁদা দিয়াছে অথবা কোন দ্বীনী কিতাব লিখিয়াছে অথবা পাঠকদের মধ্যে বিতরণ করিয়াছে অথবা মসজিদ ও মাদরাসায় কুরআন শরীফ কিংবা দ্বীনী কিতাব ওয়াকফ করিয়াছে।

অন্য এক হাদীসে আছে, মানুষের মৃত্যুর পর সাতটি জিনিসের সওয়াব সে পাইতে থাকে। কাহাকেও এলেম শিক্ষা দিয়াছে, কোন পানির নালা বা খাল জারি করিয়া দিয়াছে, কোন পানির কূয়া বানাইয়া দিয়াছে, কোন গাছ লাগাইয়াছে, কোন মসজিদ বানাইয়াছে, উত্তরাধিকার সূত্রে কুরআন শরীফ রাখিয়া গিয়াছে অথবা এমন সন্তান রাখিয়া গিয়াছে যাহারা তাহার জন্য মাগফেরাতের দোয়া করিতে থাকে। (তারগীব)

আর ইহাও জরুরী নয় যে, এইসব কাজ সে একাই করিয়াছে। বরং কোন কাজের মধ্যে যদি কম বেশী নিজেও কিছু শরীক হইয়া থাকে, তবু তাহার অংশ পরিমাণ সওয়াব সে পাইতে থাকিবে। উক্ত হাদীসে বর্ণিত দ্বিতীয় জিনিস হইল, এলেম দ্বীন ; যাহা দ্বারা মানুষের উপকৃত হইতে থাকে। যেমন, কোন মাদরাসায় কোন কিতাব ওয়াকফ করিয়া গিয়াছে ; যতদিন সেই কিতাব বাকী থাকিবে এবং উহা দ্বারা লোকেরা উপকৃত হইতে থাকিবে, ততদিন ইহার সওয়াব মৃত ব্যক্তি আপনাআপনি পাইতে থাকিবে। কোন তালেবে এলেমকে খরচাদি দান করিয়া কুরআনের হাফেজ বা আলেম বানাইয়া গিয়াছে ; যতদিন তাহার এলেম ও হেফজ দ্বারা উপকার হইতে থাকিবে, ততদিন মৃত ব্যক্তির নিকট ইহার সওয়াব পৌঁছিতে থাকিবে। সেই হাফেজ বা আলেম নিজে জীবিত থাকুক বা না থাকুক উক্ত ব্যক্তি সওয়াব পাইতে থাকিবে। যেমন, কাহাকেও হাফেজ বানাইয়াছিল, সেই হাফেজ ১০/২০জন ছাত্রকে কুরআন শরীফ পড়াইয়া

দিল অতঃপর সেই হাফেজ মারা গেল ; এমতাবস্থায় যতদিন এই ছাত্ররা কুরআন শরীফ পড়িতে ও পড়াইতে থাকিবে, ততদিন উক্ত হাফেজ উহার স্বতন্ত্র সওয়াব পাইতে থাকিবে, আর যে ব্যক্তি তাহাকে হাফেজ বানাইয়াছে সেও স্বতন্ত্র সওয়াব পাইতে থাকিবে। এমনিভাবে যতদিন এই ছাত্রদের পড়িবার ও পড়াইবার ধারা কিয়ামত পর্যন্ত চলিতে থাকিবে, উহার সওয়াব সেই আসল হাফেজ বানানেওয়ালার নিকট আপনাপ্রাপনিই পৌছিতে থাকিবে ; চাই ইহারা সওয়াব পৌছাক বা না পৌছাক।

অনুরূপভাবে, যদি কোন ব্যক্তি কাহাকেও আলেম বানায়, তবে যতদিন পর্যন্ত সরাসরি অথবা বিভিন্ন মাধ্যমে তাহার এলেম দ্বারা মানুষ উপকৃত হইতে থাকিবে, সেই প্রথম ব্যক্তি যে আলেম বানাইয়াছে এই সমস্ত সওয়াব পাইতে থাকিবে। এখানেও প্রথম বিষয়টি রহিয়াছে, অর্থাৎ ইহা জরুরী নয় যে, তাহাকে এককভাবে পূর্ণ হাফেজ কিংবা পূর্ণ আলেম বানাইতে হইবে। বরং যদি কোন হাফেজের হেফজের ব্যাপারে সে তাহার পক্ষ হইতে কোন প্রকার সহযোগিতা করে কিংবা কোন আলেমের এলেম হাসল করার ব্যাপারে নিজের পক্ষ হইতে কোন প্রকার সহযোগিতা করে, তবে এই সহযোগিতার পরিমাণ সওয়াবের ধারা কিয়ামত পর্যন্ত চলিতে থাকিবে। ভাগ্যবান ঐ সমস্ত লোক যাহাদের জ্ঞান-মালের কোন প্রকার চেষ্টা এলেম প্রচার বা দীনকে বাকী রাখা ও রক্ষা করার কাজে লাগিয়া যায়। কেননা, দুনিয়ার জীবন স্বপ্নের চেয়ে বেশী কিছু নয়। জানা নাই, কখন এই জগত ছাড়িয়া হঠাৎ চলিয়া যাইতে হইবে। সুতরাং নিজের জন্য বাহা কিছু সঞ্চয় করিয়া যাইবে, উহাই চিরস্থায়ী ও উপকারী হইবে। আত্মীয়-স্বজন আপনজন বন্ধু-বান্ধব দুই চারদিন কান্নাকাটি করিয়া, স্মরণ করিয়া নিজ নিজ কাজে মশগুল হইয়া ভুলিয়া যাইবে। শুধুমাত্র উহাই কাজে আসিবে, যাহা মানুষ জীবদ্দশায় নিজের জন্য এমন ব্যাংকে জমা রাখিয়া যাইবে, যাহা কখনও ধ্বংস হইবে না ; মূলধন সুরক্ষিত থাকিবে আর লাভ কিয়ামত পর্যন্ত পাইতে থাকিবে।

উক্ত হাদীসে তৃতীয় বিষয় হইল, ঐ নেক সন্তান, যে পিতামাতার মৃত্যুর পর তাহাদের জন্য নেক দোয়া করিতে থাকে। প্রথমত সন্তানদেরকে নেক বানাইয়া যাওয়াও একটি ভিন্ন সদকায়ে জারিয়া। যতদিন পর্যন্ত তাহারা কোন নেক কাজ করিতে থাকিবে, আপনাপ্রাপনিই উহার সওয়াব পিতামাতার নিকট পৌছিতে থাকিবে। তদুপরি তাহারা যদি পিতামাতার জন্য দোয়া করিতে থাকে, তবে ইহা তাহাদের জন্য ভিন্ন সঞ্চয় হইবে। আর যেহেতু তাহারা নেক সন্তান, কাজেই দোয়া তো করিতেই থাকিবে।

রাওজ নামক কিতাবে বাহিয়া নামে এক নেককার মহিলার ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে—তিনি বড় বেশী এবাদত করিতেন। যখন তাহার এন্তেকালের সময় হইল, তখন তিনি আসমানের দিকে মাথা উঠাইয়া বলিলেন, যে ঐ পবিত্র সত্তা! যিনি আমার সম্বল ও আমার মূলধন, আমার জীবন ও মৃত্যুতে আমি তাহারই উপর ভরসা রাখি। আমাকে মৃত্যুর সময় অপমান করিও না। আর কবরের মধ্যে আমাকে অসহায় অবস্থায় রাখিও না। যখন তাহার ইন্তেকাল হইয়া গেল, তখন তাহার ছেলে নিয়মিত প্রতি জুমআর দিন মায়ের কবরে যাইত, কুরআন শরীফ পড়িয়া উহার সওয়াব বখশিশ করিত এবং তাহার জন্য ও সমস্ত কবরবাসীর জন্য দোয়া করিত। একদিন সেই ছেলে তাহার মাকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আশ্মা! তোমার কি অবস্থা? মা বলিল, মওভের কষ্ট বড় কঠিন, কিন্তু আমি আল্লাহর রহমতে কবরে বড় আরামে আছি। আমার নিচে রায়হান ফুল বিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে, রেশমের তাকিয়া লাগান হইয়াছে, কিয়ামত পর্যন্ত আমার সহিত এই ব্যবহার করা হইবে। ছেলে জিজ্ঞাসা করিল, আমার উপযুক্ত কোন খেদমত থাকিলে বল। মা বলিল, তুমি প্রতি জুমআর দিন আমার নিকট আসিয়া কুরআন শরীফ পড়িতে থাক; ইহা ছাড়িও না। কেননা, যখন তুমি আস, তখন সমস্ত কবরবাসী আনন্দিত হইয়া সুসংবাদ শুনাইবার জন্য আমার নিকট আসে এবং বলে, তোমার ছেলে আসিয়া গিয়াছে, তোমার আগমনে আমিও অত্যন্ত আনন্দিত হই। আর তাহারা সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হয়।

ঐ ছেলে বর্ণনা করিয়াছে, আমি পূর্বের মত প্রত্যেক জুমআর দিনে গুরুত্ব সহকারে কবরস্থানে হাজির হইতাম। একদিন আমি স্বপ্নে দেখিলাম, নারী-পুরুষের একটি বিরাট দল আমার নিকট আসিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমরা কাহারা? কেন আসিয়াছ? তাহারা বলিল, আমরা অমুক কবরস্থানের লোক, তোমার শুকরিয়া আদায় করার জন্য আসিয়াছি। তুমি যে প্রত্যেক জুমআর দিনে আমাদের নিকট আস এবং আমাদের জন্য মাগফেরাতের দোয়া কর, ইহাতে আমরা খুবই আনন্দিত হই; ইহা জারী রাখিও। উহার পর হইতে আমি আরও বেশী গুরুত্ব সহকারে এই কাজ করিতে লাগিলাম।

অন্য এক আলেম বলেন, এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখিল, একটি কবরস্থানের সবগুলি কবর হঠাৎ খুলিয়া গেল। আর ঐ সমস্ত কবর হইতে মূর্দারা বাহির হইয়া জমিনের উপর হইতে কোন বস্তু ভাড়াভাড়া সংগ্রহ করিতে লাগিল। কিন্তু একজন লোক শুধু বসিয়া রহিল; সে কিছুই সংগ্রহ করিল না। আমি

তাহার নিকট যাইয়া সালাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এই লোকগুলি কি সংগ্রহ করিতেছে? সে বলিল, যে সমস্ত লোক সদকা, দান-খয়রাত, দোয়া, দুরূদ ইত্যাদি করিয়া এই কবরবাসীদের জন্য পাঠায়, তাহারা উহার বরকতসমূহ সংগ্রহ করিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি সংগ্রহ করিতেছ না কেন? সে বলিল, আমি এইজন্য নিশ্চিত যে, আমার একটি ছেলে আছে, যে অমুক বাজারে ঘালাবিয়া (এক প্রকার হালুয়া ; যাহা মুখে লাগিয়া যায়) বিক্রয় করে। সে প্রতিদিন এক খতম কুরআন তেলাওয়াত করিয়া আমাকে বখশিয়া দেয়।

আমি সকালে উঠিয়া সেই বাজারে গেলাম। সেখানে এক যুবককে দেখিলাম, ঘালাবিয়া বিক্রয় করিতেছে এবং তাহার ঠোঁট নড়াচড়া করিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কি পড়িতেছ? সে বলিল, আমি প্রতিদিন এক খতম কুরআন শরীফ পড়িয়া আমার পিতার জন্য হাদিয়া পেশ করি। এই ঘটনার কিছুদিন পর পুনরায় আমি ঐ কবরস্থানের লোকদেরকে পূর্বের মত কিছু সংগ্রহ করিতে দেখিলাম এবং তাহাদের সঙ্গে ঐ ব্যক্তিকেও সংগ্রহ করিতে দেখিলাম ; যাহার সঙ্গে পূর্বে আমার কথা হইয়াছিল। অতঃপর আমার চক্ষু খুলিয়া গেল। আমি খুব আশ্চর্য হইলাম। সকালে উঠিয়া আমি পুনরায় সেই বাজারে গেলাম। খোঁজ-খবর লইয়া জানিতে পারিলাম, ঐ ছেলেটির ইন্তেকাল হইয়া গিয়াছে।

হযরত সালাহ মুররী (রহঃ) বলেন, আমি একবার জুমআর রাতে শেষ অংশে জামে মসজিদে ফজরের নামায পড়িবার জন্য যাইতেছিলাম। ভোর হইতে তখনও দেবী ছিল। পথে একটি কবরস্থান ছিল। আমি সেখানে একটি কবরের নিকট বসিয়া গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘুম আসিয়া গেল। আমি স্বপ্নে দেখিলাম, সবগুলি কবর খুলিয়া গিয়াছে। আর উহা হইতে সমস্ত মূর্তি বাহির হইয়া পরস্পর আনন্দ করিতেছে এবং কথাবার্তা বলিতেছে। তাহাদের মধ্যে এক যুবকও কবর হইতে বাহির হইল। সে ময়লা কাপড় পরিহিত এবং বিষন্ন অবস্থায় এক পাশে বসিয়া গেল। কিছুকাল পর আসমান হইতে অনেক ফেরেশতা নামিয়া আসিল। তাহাদের হাতে নূরের রুমাল দ্বারা ঢাকা খাঞ্চা ছিল। তাহারা প্রত্যেককে একটি করিয়া খাঞ্চা দিতেছিল। খাঞ্চা লইয়া প্রত্যেকেই নিজ নিজ কবরে চলিয়া যাইতেছিল। যখন সকলেই লইয়া গেল, তখন এই যুবকও খালি হাতে তাহার কবরে যাইতে লাগিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি ব্যাপার, তুমি এত বিষন্ন কেন? আর এই খাঞ্চাগুলি কি ছিল? সে বলিল, এই খাঞ্চাগুলি ঐ সমস্ত হাদিয়া ছিল ; যাহা জিন্দা লোকেরা নিজ নিজ

মৃত আত্মীয়-স্বজনের জন্য পাঠাইয়া থাকে। আমার তো কেহ নাই, যে
এইরূপ হাদিয়া পাঠাইবে, কেবল একজন যা আছেন তিনিও দুনিয়ার
কামেলায় ফাসিয়া রহিয়াছেন। তিনি অন্যত্র বিবাহ বসিয়া স্বামীকে লইয়াই
মশগুল থাকেন। আমাকে কখনও স্মরণ করেন না। ইহা শুনিয়া আমি
তাহার নিকট হইতে তাহার মায়ের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিলাম, সকালে ঐ
ঠিকানা অনুযায়ী তাহার মায়ের নিকট পৌছিয়া পর্দার আড়াল হইতে
তাহার ছেলে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম এবং এই স্বপ্ন তাহাকে
শুনাইলাম। সেই মহিলা বলিল, নিঃসন্দেহে সে আমার সন্তান ছিল,
আমার কলিজার টুকরা ছিল। আমার কোল তাহার বিছানা ছিল। এই
বলিয়া সে আমাকে এক হাজার দেহহাম দিয়া বলিল, আমার চক্ষু
শীতলকারী পুত্রের জন্য ইহা সদকা করিয়া দিও। এখন হইতে আমি
সবসময় তাহার জন্য দোয়া ও সদকা করিতে থাকিব : কখনও ভুলিব না।

হযরত সালেহ (রহঃ) বলেন, আমি পুনরায় স্বপ্নে ঐ কবরবাসীদেরকে
পূর্বের মত দেখিলাম। আর সেই যুবককেও অত্যন্ত সুন্দর পোশাক পরিহিত
খুবই আনন্দিত অবস্থায় দেখিলাম। সে আমার দিকে দৌড়াইয়া আসিয়া
বলিতে লাগিল, হে সালেহ ! আল্লাহ তায়ালা তোমাকে উত্তম বিনিময় দান
করুন। তোমার হাদিয়া আমার নিকট পৌছিয়া গিয়াছে। (রওজ)

এই ধরনের হাজার হাজার ঘটনা কিতাবে বর্ণিত আছে। পূর্বের
হাদীসেও কয়েকটি ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি চায়
যে, আমার সন্তানগণ মৃত্যুর পরেও আমার কাছে আসুক, তবে যেন
তাহাদেরকে নেক বানাইবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করে। ইহা সন্তানদের
জন্যও প্রকৃত কল্যাণ কামনা আর নিজেদের জন্যও উপকারী।

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন : **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ** অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ ! তোমরা নিজেদেরকে এবং
নিজেদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন হইতে রক্ষা কর।

(তাহকীম : ৬)

যায়েদ ইবনে আসলাম (রহঃ) বলেন, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম উক্ত আয়াত তেলাওয়াত করিলে সাহাবায়ে কেরাম আরম্ভ
করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! নিজেদের পরিবার-পরিজনকে কিতাবে
আগুন হইতে বাঁচাইব ? হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ
করিলেন, তাহাদেরকে এমন কাজের হুকুম করিতে থাক, যাহাতে আল্লাহ
তায়ালা সন্তুষ্ট হন এবং এমন কাজ হইতে নিবেধ করিতে থাক, যাহা
আল্লাহ তায়ালা অপছন্দ করেন।

হযরত আলী (রাযিঃ) হইতে উক্ত আয়াতের তফসীলে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলেন, তোমরা নিজেদের পরিবার-পরিজনকে ভাল বিষয় শিক্ষা দিতে থাক এবং সতর্ক করিতে থাক। (দুররে মানসূর)

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা ঐ পিতার উপর রহম করুন, যে সন্তানদেরকে এই বিষয়ে সাহায্য করে যে, তাহারা যেন পিতার সহিত সদ্যবহার করে। অর্থাৎ তাহাদের সহিত এইরূপ আচরণ না করে, যাহার ফলে তাহারা নাফরমানী করিতে আরম্ভ করে। (এহইয়া)

সন্তান-সন্ততিকে নেক বানানোর বিষয়টিও ইহার অন্তর্ভুক্ত। যদি তাহারা নেক না হয়, তবে পিতামাতার সহিত তাহারা যাহা করিবে তাহা অবাস্তব কিছু নয়।

এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, জন্মের সপ্তম দিনে যেন সন্তানের আকীকা করা হয় এবং তাহার নাম রাখা হয়। আর যখন ছয় বৎসর হইয়া যায়, তখন যেন তাহাকে আদব শিখানো হয়। যখন নয় বৎসরের হইয়া যায়, তখন যেন তাহার বিছানা ভিন্ন করিয়া দেওয়া হয় (অর্থাৎ অন্যদের সঙ্গে যেন না ঘুমায়)। যখন তের বৎসরের হইয়া যায়, তখন নামায না পড়িলে যেন মারপিট করা হয়। যখন ষোল বৎসরের হইয়া যায়, তখন যেন বিবাহ করাইয়া দেওয়া হয়। অতঃপর তাহার পিতা যেন তাহার হাত ধরিয়া এই কথা বলিয়া দেয় যে, আমি তোমাকে আদব শিখাইয়া দিয়াছি, এলেম শিক্ষা দিয়াছি, বিবাহ করাইয়া দিয়াছি। এখন আমি দুনিয়ার জীবনে তোমার ফেৎনা হইতে এবং আখেরাতে তোমার কারণে আযাব হইতে আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। (এহইয়া)

তোমার কারণে আযাব-এর অর্থ হইল, অনেক হাদীসে বিভিন্ন শিরোনামে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি কোন খারাপ পন্থা অবলম্বন করে, তখন সে তাহার কাজের কারণেও গুনাহগার হয় এবং যত লোক তাহার কারণে উহার উপর আমল করে, তাহাদের সকলের গুনাহের সমপরিমাণ তাহার গুনাহ হয় এবং অন্যান্য লোকের গুনাহের মধ্যে কোন কম করে না। বরং তাহাদের নিজেদের কৃতকর্মের কারণে ভিন্ন গুনাহ হয়, আর সেই ব্যক্তি মাধ্যম হওয়ার কারণে তাহার ভিন্ন গুনাহ হয়। অতএব, যেসব সন্তান তাহাদের বড়দের খারাপ কাজকর্ম দেখিয়া উহা গ্রহণ করিয়া থাকে, উহার গুনাহ বড়দেরও হয়। এইজন্য ছোটদের সম্মুখে মন্দ কোনকিছু করা হইতে বিশেষভাবে বাঁচিয়া থাকা উচিত।

উপরোক্ত হাদীসে ১৩ বৎসর বয়সে নামাযের জন্য মারপিট করার হুকুম করা হইয়াছে। আর বহু হাদীসে আছে, সন্তানের বয়স যখন সাত বৎসর হইয়া যায়, তখন তাহাকে নামাযের হুকুম কর। যখন দশ বৎসর হইয়া যায়, তখন নামায না পড়িলে মারপিট কর। এই বর্ণনাটি বিশুদ্ধ ও অধিক পরিমাণে বর্ণিত হওয়ার কারণে অগ্রগণ্যতা রাখে। মোটকথা, সন্তান নামায না পড়িলে মারপিট করিবার জন্য পিতাকে হুকুম করা হইয়াছে। সুতরাং নামাযের জন্য সতর্ক না করা পিতার জন্য অন্যায় সাব্যস্ত হইবে। শ্রদ্ধান্তরে, পিতা যদি সন্তানকে নামায, রোযা আরও অন্যান্য দ্বীনী বিষয় পালনে অভ্যস্ত করিয়া তুলে, তবে সন্তান যে নেক আমল করিবে, উহার সওয়াবও পিতা পাইতে থাকিবে। এমনভাবে, যখন এই নেক সন্তান পিতামাতার জন্য দোয়া করিবে, তখন উহার কারণে আরও বেশী সওয়াব পাইতে থাকিবে।

ইবনে মালিক (রহঃ) বলেন, উক্ত হাদীসে নেককার সন্তানের কথা বলা হইয়াছে, কারণ, নেককার সন্তান না হইলে সন্তানের সওয়াব পৌছায় না। আর সন্তানের দোয়ার উল্লেখ এইজন্য করা হইয়াছে, যাহাতে সন্তান দোয়া করার বিষয়ে উৎসাহিত হয়। যেমন বলা হইয়াছে যে, নেক সন্তানের সওয়াব পিতার নিকট আপনা আপনিই পৌছিতে থাকে ; সে দোয়া করুক বা না করুক। যেমন, কোন ব্যক্তি জনকল্যাণের জন্য কোন বৃক্ষ রোপণ করিল আর লোকেরা উহার ফল খাইতে থাকিল, তখন এই ফল ভক্ষণকারীদের সওয়াব রোপণকারীর নিকট পৌছিতে থাকিবে ; তাহার রোপণকারীর জন্য দোয়া করুক বা না করুক।

আল্লামা মানাবী (রহঃ) বলেন, পিতার জন্য দোয়া করার কথা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হইল, সন্তানকে সতর্ক করা এবং উৎসাহিত করা। যাহাতে সে পিতার জন্য দোয়া করে, নতুবা দোয়া তো প্রত্যেক ব্যক্তিরই উপকারী হইয়া থাকে ; সে সন্তান হউক বা না হউক। উক্ত হাদীসে বিশেষ গুরুত্বের কারণে তিনটি বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়াও আরও কিছু বিষয় বিভিন্ন হাদীসে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। উহার সওয়াবও সবসময় পাওয়া যাইতে থাকে। বিভিন্ন হাদীসে এই বিষয় বর্ণিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি কোন নেক তরীকা জারী করিয়া দেয়, সে ইহার সওয়াব পাইবে, আর যত লোক ইহার উপর আমল করিবে, সকলের আমলের পরিমাণ সওয়াবও পাইতে থাকিবে। আর আমলকারীদের সওয়াবের মধ্যে কোন কমি হইবে না। আর যে ব্যক্তি কোন কুশ্রী চালু করে, এইজন্য তাহার গুনাহ তো হইবেই ; উপরন্তু যত লোক উহার উপর আমল করিবে, তাহাদের

আমলের গুনাহও ঐ ব্যক্তির হইবে আর ইহাতে আমলকারীদের গুনাহে কোন কমি হইবে না।

অন্য এক হাদীসে আছে, প্রত্যেক ব্যক্তির আমলের সওয়াব মৃত্যুর পর শেষ হইয়া যায় ; কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় সীমান্ত পাহারায় থাকে, তাহার সওয়াব কিয়ামত পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। (মিরকাত)

ইহা ছাড়াও বহু হাদীসে আরও অন্যান্য আমলের উল্লেখ রহিয়াছে। যেমন, কোন বৃক্ষ রোপণ করিয়া দেওয়া, নহর জারী করিয়া দেওয়া।

আল্লামা সুযুতী (রহঃ) এই সমস্ত আমলের সংখ্যা এগারো পর্যন্ত বলিয়াছেন।

ইবনে ইমাদ (রহঃ) ইহার সংখ্যা তের পর্যন্ত বলিয়াছেন। কিন্তু উহার অধিকাংশই উপরে বর্ণিত তিনটি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। যেমন গাছ লাগানো অথবা নহর জারী করা সদকায়ে জারিয়ার অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। (আউন)

حضرت عائشةؓ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے
اُرد میں نے یہ قسم کھائی تھی کہ ایک بکری (بکرہ)
(اور اس میں سے تقسیم کرنا) حضرت عائشہؓ
فرمایا کہ کہتا ہوں کہ باقی رہا حضرت عائشہؓ نے فرمایا
کہ وہ ایک شانہ باقی رہ گیا (باقی سب تقسیم
ہو گیا) حضرت نے فرمایا وہ سب باقی نہیں
شانہ کے سوا۔

②۰ عَنْ عَائِشَةَ ۖ أَنَّهُمْ ذَبَحُوا
كَأَنَّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَقِيَ مِنْهَا قَالَتْ
مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلَّا كَتِفُهَا قَالَ
بَقِيَ كُلُّهَا إِلَّا كَتِفُهَا۔
(رواه الترمذی وصححه كذا
في المشکوٰۃ)۔

②۰ হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, একবার আমাদের ঘরের লোকেরা অথবা সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) একটি বকরী জবেহ করিলেন (এবং উহা বন্টন করিয়া দিলেন)। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, কি পরিমাণ বাকী রহিয়াছে? হযরত আয়েশা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, একটি কাঁধের অংশ বাকী আছে (আর সব বন্টন হইয়া গিয়াছে)। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কাঁধের অংশ ছাড়া সবই বাকী আছে। (মিশকাত : তিরমিযী)

ফায়দা : ইহার অর্থ হইল, যাহা আল্লাহর জন্য খরচ করা হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে উহাই বাকী রহিয়াছে। অর্থাৎ উহার চিরস্থায়ী সওয়াব বাকী থাকিবে। আর যাহা রহিয়া গিয়াছে উহা শেষ হইয়া যাইবে। কেননা, জানা

নাই; কোনো স্থায়ী জায়গায় থরচ হইবে, নাকি অন্য কোন জায়গায় থরচ হইবে। মাজাহেরে হক কিতাবের লেখক বলেন, উক্ত হাদীসে আল্লাহ তায়ালা এই পবিত্র এরশাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে : مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ অর্থাৎ, তোমাদের নিকট যাহা কিছু দুনিয়াতে আছে, উহা একদিন শেষ হইয়া যাইবে (ধ্বংস হওয়ার দ্বারা অথবা তোমাদের মৃত্যুর দ্বারা) আর যাহা কিছু আল্লাহ তায়ালা নিকট আছে, উহা চিরকাল থাকিবে। (নাহল : ২৬)

এক হাদীসে ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে—বান্দা বলে, আমার মাল আমার মাল; অথচ প্রকৃত কথা হইল, তাহার মাল উহাই যাহা সে খাইয়া শেষ করিয়া দিয়াছে অথবা পরিধান করিয়া পুরাতন করিয়া দিয়াছে অথবা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিয়া নিজের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে। ইহা ছাড়া যাহা রহিয়া গিয়াছে উহা শেষ হইয়া যাইবে, যাহা সে অন্যদের জন্য রাখিয়া চলিয়া যাইবে। (মুসলিম)

অন্য এক হাদীসে আছে, ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যাহার নিকট ওয়ারিশের সম্পদ নিজের সম্পদ অপেক্ষা অধিক প্রিয়। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এমন তো কেহ নাই প্রত্যেকের নিকট নিজের সম্পদই বেশী প্রিয়। ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, মানুষের নিজের সম্পদ হইল, যাহা সে (সঞ্চয় করিয়া) আগে পাঠাইয়া দিয়াছে। আর যে সম্পদ রাখিয়া গিয়াছে, উহা ওয়ারিশদের সম্পদ। (মিশকাত : বুখারী)

এক সাহাবী বলেন, আমি ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম। তিনি সূরা আলহাকুমুত-তাকাছুর তেলাওয়াত করিলেন। অতঃপর এরশাদ করিলেন, মানুষ বলে, আমার মাল, আমার মাল, হে মানুষ! তোমার জন্য ইহা ছাড়া আর কিছুই নয়, যাহা তুমি খাইয়া শেষ করিয়া দিয়াছ অথবা যাহা পরিধান করিয়া পুরাতন করিয়াছ অথবা দান-সদকা করিয়া আগে পাঠাইয়া দিয়াছ (যাহা আল্লাহ তায়ালা তাহারে রক্ষিত থাকিবে)। (মিশকাত : মুসলিম)

অনেক সাহাবায়ে কেরাম হইতে এইরূপ রেওয়াজেত বর্ণিত হইয়াছে যে, মানুষ বড় গুরুত্ব সহকারে দুনিয়ার ব্যাংকে টাকা-পয়সা জমা করিয়া রাখিতে চায়, কিন্তু উহা কি সাথে যাইবে? যদি তাহার জীবদ্দশায় উহার উপর কোন বিপদ নাও আসে, তবে মৃত্যুর পরে তো অবশ্যই উহা তাহার

কোন কাজে আসিবে না। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার ব্যাংকে জমাকৃত টাকা-পয়সা অনন্তকাল কাজে আসিবে। না উহার উপর কোন বিপদ আসিবে, না উহা ধ্বংস হইবে। তদুপরি উহা কখনও শেষ হইবে না।

হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ তুসতুরী (রহঃ) নিজের সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় বেশী বেশী খরচ করিতেন। তাহার মা এবং ভাইয়েরা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ)এর নিকট তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল যে, সে সবকিছু খরচ করিয়া ফেলিতে চায়। আমাদের ভয় হয়, সে কিছুদিনের মধ্যে গরীব হইয়া যাইবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) সাহল (রহঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি উত্তর দিলেন—আপনিই বলুন, মদীনা শরীফের কোন অধিবাসী যদি রুম্মাখ শহরে (পারস্যের একটি শহরের নাম) জমিন খরিদ করে এবং সেখানে চলিয়া যাইতে মনস্থ করে, তবে সে কি নিজের কোন জিনিস মদীনায় রাখিয়া যাইবে? আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক বলিলেন, না। সাহল (রহঃ) বলিলেন, ইহাই আমার কথা। তাহার ক্ষণেই শুনিয়া লোকেরা মনে করিল, তিনি জায়গা বদল করিয়া অন্য কোথাও চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন। (তাম্বীহুল গাফেলীন) অথচ তাহার উদ্দেশ্য ছিল এই জগত ত্যাগ করিয়া অন্য জগতে যাওয়া। বর্তমান জমানায় এই ব্যাপারে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও রহিয়াছে। যাহারা হিন্দুস্তান হইতে পাকিস্তানে, অথবা পাকিস্তান হইতে হিন্দুস্তানে স্থায়ীভাবে স্বেচ্ছায় স্থানান্তর হইতে চায়, তাহারা নিজেদের যাওয়ার পূর্বে জায়গা-জমিন ও বাড়ীঘর ইত্যাদি সব জিনিস পরস্পর বদলী করার জন্য কত চেষ্টা করে। যতক্ষণ জায়গা-জমিনের আদান-প্রদান পরিপূর্ণ না হয়, সব ধরনের কষ্ট সহ্য করে ; তবুও স্থানান্তরের এরা দা করে না। আর যাহারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও জোরপূর্বক স্থানান্তর হইয়াছে, তাহাদের দুঃখ ও আফসোসের কোন সীমা থাকে না। এই জগত হইতে প্রত্যেক ব্যক্তির স্থানান্তর হওয়ার বিষয়টিও ঠিক অনুরূপ। এখনও প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের সামান, জায়গা-জমিন ইত্যাদি সবকিছু স্থানান্তরিত করার এখতিয়ার রহিয়াছে। কিন্তু যখন মৃত্যুর দ্বারা স্থানান্তর হইতে বাধ্য হইয়া যাইবে, তখন সবকিছু এই জগতে থাকিয়া যাইবে আর সবকিছু যেন সরকারী নির্দেশে বাজেয়াপ্ত হইয়া যাওয়ার মত হইবে। এখনও সময় আছে, জানী ব্যক্তির যেন নিজেদের সামানপত্র পরজগতে স্থানান্তরিত করিয়া লয়।

(২১) عَنْ أَبِي مُرَّةٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَتَّخِذْ لِنَفْسِهِ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَخْرَجًا لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ
 يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ
 صَيْفَهُ وَمَنْ هَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَكَرُّهُ جَارَةٌ وَمَنْ
 كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَقْصُرْ وَفِي
 رِوَايَةٍ بَدَلِ الْجَارِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ وَصِيَّةً

ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا
 ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا
 ہے اس کو چاہیے کہ وہ ہاتھ کا اکرام کرے
 اور اپنے پڑوسی کو دستاویز، اور
 زبان سے کوئی بات نکالے تو بھلائی کی
 بات نکالے ورنہ پشیم ہے۔ اور
 دوسری روایت میں ہے کہ جو شخص
 کرے۔

(متفق علیہ، مضافاً فی مشکوٰۃ)

(২১) হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইہি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ঈমান রাখে এবং আখেরাতের দিনের উপর ঈমান রাখে, তাহার উচিত, সে যেন মেহমানকে সম্মান করে এবং আপন প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়, আর জবান দ্বারা ভাল কথা বলে, নতুবা চূপ থাকে। অন্য রেওয়াজাতে আছে, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে। (মিশকাত : বুখারী, মুসলিম)

ফায়দা : উক্ত হাদীসে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকটি বিষয়ে সতর্ক করিয়াছেন। প্রত্যেকটি বিষয়কে এই বাক্যের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন যে, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ঈমান রাখে এবং আখেরাতের দিনের উপর ঈমান রাখে'। তরজমা সংক্ষিপ্ত করার জন্য এই বাক্যটি কেবল শুরুতে একবার মাত্র উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রত্যেকটি বাক্যের সহিত ইহাকে উল্লেখ করার দ্বারা এই বিষয়গুলির প্রতি তাকীদ ও গুরুত্ব আরোপ করা উদ্দেশ্য। যেমন, কেহ নিজের সন্তানদের মধ্য হইতে কাহাকেও বলিল, যদি তুমি আমার সন্তান হইয়া থাক, তবে অমুক কাজটি করিয়া দাও। হাদীসের সতর্কবাণীর দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, এই কথা বুঝানো যে, এই বিষয়গুলি পরিপূর্ণ ঈমানের অংশ। সুতরাং যে ব্যক্তি এই বিষয়গুলির প্রতি গুরুত্ব দেয় না, তাহার ঈমানও পরিপূর্ণ নয়। (মাজাহের)

আল্লাহর উপর ঈমান এবং আখেরাতের উপর ঈমানকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, আল্লাহ তায়ালা উপর ঈমান ব্যতীত আখেরাতে কোন নেকীরই সওয়াব নাই। আর আল্লাহ তায়ালা

উপর ঈমান থাকিলে আখেরাতের উপর ঈমান থাকা স্বাভাবিক হওয়া সম্ভব ইহাকে বিশেষভাবে সম্ভবতঃ এইজন্য উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ইহা দ্বারা সতর্ক করা এবং সওয়াবের নিয়ত করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা উদ্দেশ্য। কারণ, এই সমস্ত আমলের প্রকৃত বিনিময় এবং সওয়াব কেয়ামতের দিন পাওয়া যাইবে। সেইদিন জানা যাইবে যে, দুনিয়ার সামান্য সামান্য জিনিস এবং আমলের উপর আল্লাহ তায়ালা নিকট কত বড় বড় সওয়াব ও পুরস্কার রহিয়াছে।

হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত হাদীসে চারটি বিষয়ে সতর্ক করিয়াছেন। প্রথমতঃ মেহমানের সম্মান। এই অংশটি আলোচনার উদ্দেশ্যেই রেওয়াজাতটি এখানে উল্লেখ করিয়াছি। ইহার ব্যাখ্যা পরবর্তী হাদীসে আসিতেছে। দ্বিতীয় বিষয়, প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেওয়া। এই হাদীসে সর্বনিম্ন পর্যায়ের হুকুম করা হইয়াছে যে, প্রতিবেশীকে কষ্ট দিও না। ইহা অত্যন্ত নিম্ন পর্যায়ের হুকুম। নতুবা বহু রেওয়াজাতে প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে অনেক বেশী তাকীদ আসিয়াছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফের কোন কোন বর্ণনায় **فَلْيَكْرِمْ جَارَهُ** শব্দ আসিয়াছে। অর্থাৎ, প্রতিবেশীকে সম্মান কর। বুখারী ও মুসলিমের কোন কোন রেওয়াজাতে **فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ** শব্দ আসিয়াছে। অর্থাৎ, প্রতিবেশীর সহিত অনুগ্রহমূলক ব্যবহার কর। অর্থাৎ, প্রতিবেশী যে জিনিসের মুখাপেক্ষী হয়, তাহাকে ঐ বিষয়ে সাহায্য কর, তাহার কষ্টদায়ক জিনিস দূর কর।

এক হাদীসে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তোমরা কি জান, প্রতিবেশীর হক কি? যদি সে সাহায্য চায়, তাহার সাহায্য কর, যদি সে করজ চায়, তাহাকে করজ দাও, যদি সে মুখাপেক্ষী হয়, তাহার সহযোগিতা কর যদি সে অসুস্থ হয়, তাহার সেবা-শুশ্রূষা কর, যদি সে মারা যায়, তবে তাহার জানাযার সহিত যাও, যদি সে কোন বিষয়ে আনন্দ লাভ করে, তবে তাহাকে মুবারকবাদ দাও, যদি সে মূসীবতে পতিত হয়, তবে তাহাকে সাঙ্গুনা দাও। তাহার অনুমতি ব্যতীত তাহার বাড়ীর পার্শ্বে নিজের বাড়ী এত উঁচু করিও না যাহাতে তাহার হাওয়া-বাতাস বন্ধ হইয়া যায়। তুমি কোন ফল খরিদ করিলে উহা হইতে তাহাকেও হাদিয়া দাও। যদি ইহা না করিতে পার, তবে ফল এমন গোপনভাবে ঘরে আন যাহাতে সে দেখিতে না পায়। তোমার সম্মানগণও যেন ফলসহ বাহির না হয়। যাহাতে প্রতিবেশীর বাচ্চারা ইহা দেখিয়া কষ্ট পায়। তোমার ঘরের ধোঁয়া দ্বারা প্রতিবেশীকে কষ্ট দিও না, হাঁ যদি পাকান বস্তুর কোন অংশ তাহাকে দাও, তবে ভিন্ন কথা। তোমরা কি জান

প্রতিবেশীর হক কত বেশী? ঐ পবিত্র সত্তার কসম যাহার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ, আল্লাহ তায়ালা যাহার উপর দয়া করিয়াছেন, সে ছাড়া প্রতিবেশীর হক কেহ জানে না। এই রেওয়াজটি ইমাম গায়ফালী (রহঃ) আরবাস্টিন নামক কিতাবে বর্ণনা করিয়াছেন। (মাঝাহের) হাফেজ ইবনে হজর (রহঃ) ফতহুল বারী কিতাবেও এই হাদীসটি উল্লেখ করিয়াছেন।

এক হাদীসে আসিয়াছে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তিন বার বলিয়াছেন) আল্লাহর কসম, ঐ ব্যক্তি মুমিন নয়, আল্লাহর কসম, মুমিন নয়, আল্লাহর কসম, মুমিন নয়। কেহ আরজ করিল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! কোন্ ব্যক্তি? হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যাহার প্রতিবেশী তাহার অনিষ্ট হইতে নিরাপদ নয়।

(মিশকাত : বুখারী ও মুসলিম)

অন্য এক হাদীসে আছে, ঐ ব্যক্তি জাম্মাতে প্রবেশ করিবে না, যাহার প্রতিবেশী তাহার অনিষ্ট হইতে নিরাপদ থাকে না।

হযরত ইবনে উমর ও হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদ বর্ণনা করেন যে, হযরত জিবরাঈল (আঃ) আমাকে প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে এত বেশী তাকীদ করিতে থাকেন যে, তাহার বারবার তাকীদের কারণে আমার ধারণা হইল, প্রতিবেশীকে ওয়ারিস বানাইয়া দিবেন। (মিশকাত)

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন—

تم الله تعالى في عبادته اختيار كداده
لكم ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو اور
والدین کیساتھ اچھا معاملہ کرو اور مدد کے
ایل قرابت کے ساتھ بھی اور یتیموں کیساتھ
اور غریبوں کے ساتھ اور پاس والے پڑوسی کے
ساتھ بھی اور فروع پڑوسی کیساتھ بھی اور
بمجلس کیساتھ بھی اور مسافر کے ساتھ بھی۔

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا
بِهِ شَيْئًا وَبِالَّذِينَ إِحْسَانًا
وَيُذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَ
الْيَتَامَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَابْنِ
السَّبِيلِ - (نساء - ۳۶)

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে এবাদত কর। আর তাহার সহিত কাহাকেও শরীক করিও না। স্বীয় পিতামাতার সহিত সদ্যবহার কর। অন্যান্য নিকট আত্মীয়দের সহিত, এতীমদের সহিত, অভাবগ্রস্তদের সহিত, নিকট প্রতিবেশীদের সহিত, দূর প্রতিবেশীদের সহিত, বন্ধু-বান্ধব ও

সহচরদের সহিত এবং মুসাফেরদের সহিতও সম্বাবহার কর। নিকট প্রতিবেশী বলিতে ঐ ব্যক্তিকে বুঝানো হইয়াছে, যাহার ঘর তোমার ঘরের নিকটে রহিয়াছে। (নিসা : ৩৬) আর দূর প্রতিবেশী বলিতে ঐ ব্যক্তিকে বুঝানো হইয়াছে, যাহার ঘর তোমার ঘর হইতে দূরে রহিয়াছে।

হাসান বসরী (রহঃ)কে কেহ জিজ্ঞাসা করিল, কত দূর পর্যন্ত প্রতিবেশী হইয়া থাকে। তিনি বলিলেন, চল্লিশ ঘর সামনের দিকে, চল্লিশ ঘর পিছনের দিকে, চল্লিশ ঘর ডান দিকে এবং চল্লিশ ঘর বাম দিকে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, দূর প্রতিবেশী হইতে শুরু না করিয়া বরং নিকট প্রতিবেশী হইতে শুরু করা উচিত।

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার দুই প্রতিবেশী আছে। প্রথমে কাহার বৌদ্ধ-স্ববর নিব। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যাহার দরজা তোমার দরজার নিকটবর্তী।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বিভিন্ন সনদের মাধ্যমে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, নিকট প্রতিবেশী ঐ ব্যক্তি যাহার সহিত আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে। আর দূর প্রতিবেশী ঐ ব্যক্তি যাহার সহিত আত্মীয়তার সম্পর্ক নাই।

নওফ শামী (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নিকট প্রতিবেশী হইল, মুসলমান প্রতিবেশী। আর দূর প্রতিবেশী হইল, ইহুদী নাসারা অর্থাৎ অমুসলিম। (দুররে মানসুর)

মুসনাদে বাযযার প্রভৃতি কিতাবে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করা হইয়াছে যে, প্রতিবেশী তিন প্রকার—প্রথম, ঐ প্রতিবেশী যাহার তিনটি হক রহিয়াছে। প্রতিবেশী হওয়ার হক, আত্মীয়তার হক ও ইসলামের হক। দ্বিতীয় ঐ প্রতিবেশী যাহার দুইটি হক রহিয়াছে। প্রতিবেশী হওয়ার হক এবং ইসলামের হক। তৃতীয় হইল, যাহার একটি হক রহিয়াছে। আর সে হইল, অমুসলিম প্রতিবেশী। (জামাল)

প্রতিবেশীর জন্য ধারাবাহিকভাবে তিনটি স্তর হইয়া গেল। ইমাম গায়যালী (রহঃ)ও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলিয়াছেন, দেখ, উক্ত হাদীসে কেবল প্রতিবেশী হওয়ার কারণে মুশরিক ব্যক্তির হকও মুসলমানের উপর আরোপ করা হইয়াছে।

অন্য এক হাদীসে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত আছে যে, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম দুই প্রতিবেশীর মধ্যে ফয়সালা

করা হইবে।

এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ)এর নিকট আসিয়া তাহার প্রতিবেশীর ব্যাপারে খুব বেশী অভিযোগ করিতে লাগিল। হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলিলেন, যাও (নিজের কাজ কর) ; যদি সে তোমার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা নাকরমানী করিয়া থাকে (অর্থাৎ তোমাকে কষ্ট দিয়া থাকে), তবে তুমি তাহার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা নাকরমানী করিও না।

সহীহ হাদীসে আসিয়াছে যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে জনৈকা মহিলার অবস্থা বর্ণনা করা হইল যে, সে বেশী বেশী রোদা রাখে, তাহাজ্জুদও পড়ে, কিন্তু তাহার প্রতিবেশীদেরকে কষ্ট দেয়। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সে জাহান্নামে প্রবেশ করিবে (যদিও সাজ্জা ভোগ করিয়া একদিন সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিবে)।

ইমাম গায়যালী (রহঃ) বলেন, প্রতিবেশীর হক শুধু ইহাই নয় যে, তাহাকে কোন কষ্ট দিবে না ; বরং তাহার হক হইল, সে কষ্ট দিলে উহা সহ্য করিবে।

হযরত ইবনে মোকাফ্ফা (রহঃ) অনেক সময় তাহার প্রতিবেশীর দেয়ালের ছায়াতে বসিতেন। একদিন তিনি জানিতে পারিলেন—তাহার প্রতিবেশী ঋণগ্রস্ত হইয়া গিয়াছে ; ইহাতে সে তাহার ঘর বিক্রয় করিতে চাহিতেছে। তখন তিনি বলিলেন, আমি তাহার ঘরের ছায়াতে সবসময় বসিয়াছি। তাহার ছায়ার হক আমি কিছুই আদায় করি নাই। এই বলিয়া তিনি তাহার ঘরের মূল্য তাহাকে হাদিয়া করিয়া দিলেন এবং বলিলেন, তুমি তো ঘরের মূল্য পাইয়া গেলে, এখন উহা বিক্রয় করিও না।

হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ)এর গোলাম একটি বকরী জবাই করিল। ইবনে ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, যখন উহার চামড়া ছিলিয়া ফেলিবে, তখন সর্বপ্রথম উহার গোশত আমার ইমদী প্রতিবেশীকে দিবে। তিনি এই কথা কয়েকবার বলিলেন। গোলাম আরজ করিল, আপনি এই কথা কতবার বলিবেন? হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, আমি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনিয়াছি, তিনি বলিতেন, জিবরাঈল (আঃ) বারবার আমাকে প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে তাকীদ করিয়াছেন (এইজন্য আমিও বারবার বলিতেছি)।

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, দশটি বিষয় উন্নত চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত। অনেক সময় উহা সন্তানের মধ্যে পাওয়া যায় ; পিতার মধ্যে পাওয়া যায় না, গোলামের মধ্যে পাওয়া যায় ; মনিবের মধ্যে পাওয়া যায় না। ইহা

আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ, যাহাকে ইচ্ছা দান করিয়া থাকেন। এক, সত্য বলা। দুই, মানুষের সহিত সততার আচরণ করা (ধোকা না দেওয়া)। তিন, সওয়াবকারীকে দান করা। চার, অনুগ্রহের বদলা দেওয়া। পাঁচ, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা। ছয়, আমানতের হেফাজত করা। সাত, প্রতিবেশীর হক আদায় করা। আট, সাধীদের হক আদায় করা। নয়, মেহমানের হক আদায় করা। দশ, এই সকল গুণের শিকড় এবং মূল ভিত্তি হইল, লজ্জা। (এহইয়া)

উল্লেখিত হাদীসে তৃতীয় বিষয় হইল, যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর এবং
আশেরাতের দিনের উপর ঈমান রাখে, সে জবান দ্বারা ভাল কথা বলে।
নফুস চাপ থাকে।

হাফেজ ইবনে হজর (রহঃ) বলেন, ছয়র সাদ্লাম্মাহ্ আলাইহি ওয়াসাদ্লাম্মাহের এই পবিত্র এরশাদ অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক। কেননা, যে কোন কথা বলা হয় উহা হয়ত ভাল হইবে নতুবা মন্দ হইবে। আর এমন প্রত্যেক বিষয় ভাল কথার অন্তর্ভুক্ত যাহা শরীয়ত সম্মত, উহা ফরজ হউক অথবা মুস্তাহাব। ইহা ছাড়া বাকী সবই মন্দ, অর্থাৎ যদি কোন কথা এমন হয় যে, বাহ্যিকভাবে না ভাল, না মন্দ, তবে হাফেজ ইবনে হজরের উক্তি অনুযায়ী উহা মন্দের মধ্যে শামিল। কেননা, যখন উহা দ্বারা কোন ফায়দা উদ্দেশ্য হয় না, তখন উহা অনর্থক হইল; যাহা স্বয়ং মন্দ।

হযরত উম্মে হাবীবা (রাযিঃ) ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, সংকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হইতে নিষেধ এবং আল্লাহর যিকির ব্যতীত মানুষের প্রত্যেকটি কথা তাহার জন্য বিশদ স্বরূপ, কোন উপকারী জিনিস নয়। এই হাদীস শুনিয়া এক ব্যক্তি বলিতে লাগিল, এই হাদীস তো বড়ই কঠিন।

হযরত সুফিয়ান সওরী (রহঃ) বলিলেন, ইহাতে হাদীস কঠিন হওয়ার
কি রহিয়াছে? ইহা তো স্বয়ং আব্বাস তায়ালা কুরআন পাকে এরশাদ
করিয়াছেন :

لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں خیر نہیں
 پہنچتی، ہاں مگر جو لوگ ایسے ہیں کہ خیرات
 یا کسی نیک کام کی یا لوگوں میں باہم صلح
 کر دینے کی ترغیب دیتے ہیں اور جو
 شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کیلئے

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّبْوَاهُمْ
إِلَّا مَن أَمْرٌ بَصَدْقَةٍ أَوْ
مَعْرُوفٍ أَوْ إِسْلَاحٍ بَيْنَ
النَّاسِ ط وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ
إِتِّعَاءَ مَرْكَبَاتٍ اللّٰهُ

فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ○ (نار-ع-۱۷)
 یہ کام کریگا ہم اس کو مغرب بہت
 زیادہ اجر عطا کریں گے۔

অর্থাৎ, মানুষের অধিকাংশ শলা-পরামর্শের মধ্যে কোন কল্যাণ থাকে না। তবে যাহারা এমন যে, দান-খয়রাত বা কোন নেক কাজ অথবা মানুষের মধ্যে পরস্পর সংশোধনের বিষয়ে উৎসাহ দান করে, আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের জন্য এই কাজ করিবে, আমি অতি শীঘ্র তাহাকে অনেক বেশী বিনিময় দান করিব। (নিসা : ১১৪)

হযরত আবু যর (রাযিঃ) বলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিলাম, আমাকে কিছু ওসীয়াত করুন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাকে ওসীয়াত করিতেছি যে, তুমি আল্লাহকে ভয় কর। কেননা, ইহা তোমার প্রত্যেক কাজের জন্য অলংকার স্বরূপ। আমি আরজ করিলাম, আরও কিছু ওসীয়াত করুন। এরশাদ করিলেন, কুরআন শরীফ তেলাওয়াত ও আল্লাহর যিকিরের এহতেমাম কর। কেননা, ইহা আসমানে তোমার আলোচনার কারণ হইবে এবং জমিনে তোমার জন্য নূর হইবে। আমি আরও বেশী ওসীয়াত চাহিলাম। তখন তিনি এরশাদ করিলেন, অধিকাংশ সময় চুপ থাকিও। ইহা শয়তান দূরে থাকার কারণ হইবে এবং দ্বীনী কাজে সাহায্যের উপায় হইবে। আমি আরও ওসীয়াত চাহিলাম। তিনি বলিলেন, অধিক হাসি হইতে বাঁচিয়া থাক। কারণ, অধিক হাসির দ্বারা দিল মরিয়া যায় এবং চেহারার সৌন্দর্য কমিয়া যায়। আমি আরজ করিলাম, আরও কিছু ওসীয়াত করুন। তিনি বলিলেন, হক কথা বল ; যদিও তিক্ত হয়। আমি আরজ করিলাম, আরও কিছু ওসীয়াত করুন। তিনি বলিলেন, আল্লাহর বিষয়ে কাহাকেও ভয় করিও না। আমি আরজ করিলাম, আরও কিছু। তিনি বলিলেন, নিজের দোষ (দেখা) যেন তোমাকে মানুষের দোষ দেখা হইতে বিরত রাখে। (দুররে মানসূর)

ইমাম গায়যালী (রহঃ) বলেন, জবান আল্লাহ তায়ালার বড় বড় নেয়ামতসমূহের মধ্য হইতে একটি নেয়ামত এবং তাহার সূক্ষ্ম ও নিপুণ কারিগরীসমূহের মধ্য হইতে একটি কারিগরী। জবান আকারে ছোট, কিন্তু উহার এবাদত এবং গুনাহ অনেক বড়। এমনকি কুফর ও ইসলাম যাহা গুনাহ ও এবাদতের দুই শেষ দুই প্রান্তে রহিয়াছে, উহাও এই জবানের দ্বারাই প্রকাশ পায়। অতঃপর তিনি জবানের অনেকগুলি আপদের কথা বলিয়াছেন, যথা—অনর্থক কথাবার্তা, অহেতুক আলোচনা, লড়াই ঝগড়া,

মুখ হুড়াইরা কথা বলা, কৃত্রিমতার সহিত ছন্দ মিলাইয়া ও শুদ্ধ ভাষায় কথা বলা, নোংরা কথা বলা, গালিগালাজ করা, অভিশাপ দেওয়া, কবিতা চর্চার মধ্যে লিপ্ত হওয়া, কাহারও সহিত ঠাট্টা-বিজ্ঞপ করা, কাহারও গোপন বিষয় প্রকাশ করা, মিথ্যা ওয়াদা করা, মিথ্যা বলা, মিথ্যা কসম খাওয়া, কাহারও প্রতি কটাক্ষ করা, সমালোচনা করা, গীবত করা, চোগলখোরী করা, দ্বিমুখী কথা বলা, অপাত্রে প্রশংসা করা, অপাত্রে সওয়াল করা ইত্যাদি ইত্যাদি। এই ক্ষুদ্র জিনিসটির সহিত এত বেশী আপদ জড়িত রহিয়াছে যে, উহার সমস্যাসমূহ অত্যন্ত বিপজ্জনক। এইজন্যই হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ থাকার প্রতি খুবই উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন।

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি চুপ থাকিল, সে মুক্তি পাইয়া গেল। এক সাহাবী আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে এমন জিনিস বলিয়া দিন যে, আপনার পরে আর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে না হয়। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহ তায়ালার উপর ঈমান আন এবং ইহার উপর মজবুত থাক। তিনি আরজ করিলেন, হযূর! আমি কোন্ জিনিস হইতে বাঁচিয়া থাকিব? হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, নিজের জবান হইতে। অন্য এক সাহাবী আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! মুক্তি পাওয়ার ব্যবস্থা কি? হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, নিজের জবানকে নিয়ন্ত্রণে রাখ। নিজ ঘরে থাক (বিনা প্রয়োজনে বাহিরে ঘুরাফেরা করিও না) এবং নিজের গুনাহের উপর কাঁদিতে থাক।

এক হাদীসে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে—যে ব্যক্তি দুইটি জিনিসের জিম্মা গ্রহণ করিবে, আমি তাহার জন্য জান্নাতের জিম্মাদার হইব। এক, জবান, দ্বিতীয়, লজ্জাস্থান।

এক হাদীসে আছে, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইল, যেসব জিনিস জান্নাতে দাখেল করে উহার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনটি? হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহর ভয় ও উত্তম চরিত্র। পুনরায় আরজ করা হইল, যেসব জিনিস জান্নাতের দাখেল করে উহার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনটি? হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, জবান ও লজ্জাস্থান।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) ছাফা মারওয়র ছাফী করিতেছিলেন এবং আপন জবানকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছিলেন, হে

জবান! লজ্জিত হওয়ার পূর্বে ভাল কথা বল; উপকৃত হইবে, খারাপ হইতে চূপ থাক; নিরাপদে থাকিবে। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, আপনি যাহা কিছু বলিতেছেন, নিজের পক্ষ হইতে বলিতেছেন, নাকি এই সম্পর্কে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কিছু শুনিয়াছেন। তিনি বলিলেন, আমি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনিয়াছি যে, মানুষের অধিকাংশ গুনাহ তাহার জবানের কারণে হয়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি নিজের জবানকে বিরত রাখে, আল্লাহ তায়ালা তাহার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখেন। আর যে ব্যক্তি নিজের গোনা নিয়ন্ত্রণে রাখে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে শাস্তি হইতে রক্ষা করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা দরবারে অপারগতা স্বীকার করে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে ক্ষমা করেন।

হযরত মুয়াজ (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে কিছু ওসীয়াত করুন। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আল্লাহ তায়ালা এবাদত এমনভাবে কর যেন তুমি তাহাকে দেখিতেছ এবং নিজেকে তুমি মূর্দাদের মধ্যে মনে কর। আর যদি তুমি বল, তবে আমি তোমাকে ঐ জিনিস বলিয়া দিব যদ্বারা এইসব বিষয়ের উপর সবচেয়ে বেশী শক্তি অর্জন হইবে। এই বলিয়া তিনি নিজের জবানের প্রতি ইশারা করিলেন। (এহইয়া)

হযরত সুলাইমান (আঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কথা বলা যদি রূপাতুল্য হয়, তবে চূপ থাকা হইবে স্বর্ণতুল্য।

হযরত লোকমান হাকীম (আঃ) যিনি আপন হেকমত ও জ্ঞানের কারণে দুনিয়াতে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তিনি অভ্যন্তর কুশী একজন হাবশী গোলাম ছিলেন। কিন্তু আপন হেকমত ও জ্ঞানের কারণে সারা দুনিয়ার অনুসরণীয় ব্যক্তি ছিলেন। এক ব্যক্তি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তুমি কি অমুক ব্যক্তির গোলাম ছিলে না? তিনি বলিলেন, হাঁ। অতঃপর সে বলিল, তুমি কি অমুক পাহাড়ের নীচে বকরী চরাইতে না? তিনি বলিলেন, হাঁ। লোকটি পুনরায় বলিল, এই মর্যাদা কিভাবে লাভ করিলে? তিনি বলিলেন, (চার বস্তুর দ্বারা) আল্লাহর ভয়, কথায় সত্যতা, আমানত পূরাপূরি আদায় করা এবং অনর্থক কথাবার্তা হইতে চূপ থাকা। আরও বিভিন্ন রেওয়াজাতে চূপ থাকা তাহার বিশেষ অভ্যাস ছিল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। (দুররে মানসূর)

হযরত বারা (রাযিঃ) বলেন, এক বেদুঈন আসিয়া আরজ করিল, ইয়া

রাসূলুল্লাহ! আমাকে এমন আমল বলিয়া দিও, যাহা জাহান্নাতে লইয়া যাইবে। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ক্ষুধার্তকে খানা খাওয়াও, পিপাসার্তকে পানি পান করাও, লোকদেরকে ভাল কাজের হুকুম কর, মন্দ কাজ হইতে বিরত রাখ। যদি ইহা সম্ভব না হয়, তবে নিজের জবানকে ভাল ব্যতীত অন্য কথা বলা হইতে বিরত রাখ। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আপন জবানকে ভাল ব্যতীত অন্য কথা হইতে হেফাজতে রাখ, ইহাতে তুমি শয়তানের উপর জয়ী থাকিবে।

সংক্ষিপ্তভাবে এই কয়েকটি রেওয়াজাত উল্লেখ করা হইল। ইহা ছাড়া আরও অনেক হাদীস এবং সাহাবায়ে কেরামদের উক্তি রহিয়াছে, যাহা ইমাম গামযালী (রহঃ) উল্লেখ করিয়াছেন। আল্লামা যুবাইদী ও হাফেজ ইরাকী (রহঃ) ঐ সমস্ত রেওয়াজাত বর্ণনা করিয়াছেন। এইগুলি দ্বারা বুঝা যায় যে, জবানের বিষয়টি বড় গুরুত্বপূর্ণ। অথচ এই ব্যাপারে আমরা একেবারে উদাসীন। যাহা ইচ্ছা জবান দিয়া বলিয়া দিলাম; অথচ আল্লাহ তায়ালা দুইজন পাহারাদার দিবারাত্র সর্বদা ডান ও বাম কাঁধে মওজুদ রহিয়াছেন, যাহারা সর্বকম ভাল ও মন্দকে লিখিতেছেন। এত কিছু সত্ত্বেও আল্লাহ তায়ালা ও তাহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কত অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করিব। মানুষ অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনর্থক কথা বলিয়াই ফেলে। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মজলিসের কাফফারা এই যে, উঠিবার পূর্বে তিনবার এই দোয়া পড়িয়া লইবে : سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ এক হাদীসে আছে, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ জীবনে এই দোয়া পড়িতেন। কেহ আরজ করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! পূর্বে আপনি এই দোয়া পড়িতেন না। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, এই দোয়া মজলিসের কাফফারা স্বরূপ।

অন্য এক হাদীসে আছে, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, কিছু কালেমা এমন রহিয়াছে, যে ব্যক্তি মজলিস হইতে উঠিবার সময় তিনবার পড়িয়া লইবে, উহা মজলিসের সমস্ত কথাবার্তার জন্য কাফফারা হইয়া যাইবে। আর যদি নেক মজলিসে পড়া হয়, তবে উক্ত কালেমা দ্বারা ঐ মজলিস নেক হওয়ার উপর মোহর লাগিয়া যায়, যেমন চিঠিপত্র শেষ করিবার পর সিলমোহর লাগান হয়, কালেমাগুলি

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ : এই

হাদীসে চতুর্থ বিবরণ আত্মীয়তা কায়ম রাখা সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে।
উহার বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তী পরিচ্ছেদে আসিতেছে।

(১১) عَنْ أَبِي شَرِيحٍ الْكَعْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَارَتَهُ يَوْمَ وَلَيْلَتِهِ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ كَمَا بَعَدَ فَلَكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَوَلَّى عِنْدَهُ حَتَّى يُعْرِجَهُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ كَذَا فِي الْمَشْكُوتِ)

خُصِمَ أَقْرَبُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا يَكُ
 ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ جلّ شانہ
 پر اور آخرت کے دن پر ایمان لکھتا ہو
 اس کے لئے ضروری ہے کہ اپنے مہمان
 کا اگر ام کہے۔ مہمان کا جائے ایک
 دن رات ہے اور مہمانی تین دن
 اور مہمان کے لئے یہ جائز نہیں کہ
 اتنا طویل قیام کہے جس سے پہلے
 مشقت میں پڑ جائے۔

(২২) হুবুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ও আখেরাতের দিনের উপর ইমান রাখে, তাহার জন্য অঙ্গুরী হইল, সে যেন নিজ মেহমানের একরাম করে। মেহমানের বিশেষ আতিথেরতা একদিন একরাত্র, আর মেহমানদারী তিন দিন তিন রাত্র। মেহমানের জন্য জায়েয নয় যে, এত দীর্ঘ সময় অবস্থান করিবে বাহ্যতে মেজবান কষ্টে পড়িয়া যায়। (মিশকাত : বুখারী, মুসলিম)

ফারদা : উক্ত হাদীসে হুবুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইটি আদব এরশাদ করিয়াছেন, একটি মেজবানের ব্যাপারে, আরেকটি মেহমানের ব্যাপারে। মেজবানের আদব হইল, যদি সে আল্লাহর উপর এবং আখেরাতের দিনের উপর ইমান রাখে—যেমন প্রথম হাদীসে উল্লেখ হইয়াছে, তবে সে যেন মেহমানের একরাম করে। আর মেহমানের একরাম হইল, মেহমানের সহিত হাসিমুখে ভদ্র আচরণ করা ও নম্রভাবে কথাবার্তা কলা। (মাজাহির)

এক হাদীসে আছে, সুন্নত হইল, বিদায়ের জন্য মেজবান মেহমানের সহিত ঘরের দরজা পর্যন্ত গমন করিবে। (মিশকাত)

হযরত ওকবা (রাযিঃ) হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি মেহমানদারী করে না, তাহার মধ্যে কোন কল্যাণ নাই।

হযরত সামুরা (রাযিঃ) বলেন, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেহমানকে খানা খাওয়ানোর হুকুম করিতেন। (মাজমাউয়-যাওয়াইদ)

এক ব্যক্তি দেখিল, হযরত আলী (রাযিঃ) কাঁদিতেন। সে কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন, সাতদিন যাবত কোন মেহমান আসে নাই। আমার ভয় হইতেছে, আল্লাহ তায়ালা আমাকে বেইজ্জত করার ইচ্ছা করিয়াছেন কিনা। (এহইয়া)

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত হাদীসে মেহমানের একরাম করার হুকুম করার পর এরশাদ করিয়াছেন, তাহার বিশেষ আতিথেয়তা একদিন একরাত্র। এই ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের কয়েকটি উক্তি রহিয়াছে।

ইমাম মালেক (রহঃ) হইতে এই ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে যে, ইহা দ্বারা সম্মান এবং বিশেষ হাদিয়া তোহফা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, একদিন এক রাত্র তো তাহার সম্মানে ভাল খানা তৈয়ার করিবে, আর বাকী দিনগুলিতে সাধারণ মেহমানদারী করিবে।

অতঃপর এই বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের দ্বিমত রহিয়াছে যে, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ অনুযায়ী মোট চারদিন অর্থাৎ তিন দিনের মেহমানদারী সেই বিশেষ একদিনের পর হইবে, নাকি সেই বিশেষ আতিথেয়তার একদিনও তিনদিনের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

দ্বিতীয় অর্থ হইল, বিশেষ আতিথেয়তার দ্বারা চলার পথের নাস্তা উদ্দেশ্য। মোটকথা, যদি মেহমান অবস্থান করে, তবে তিনদিন মেহমানদারী করিবে। আর অবস্থান করিতে না পারিলে একদিনের নাস্তার ব্যবস্থা করিবে। (ফতহুল বারী)

তৃতীয় অর্থ এই যে, বিশেষ আতিথেয়তা দ্বারা নাস্তাই উদ্দেশ্য; কিন্তু উহার অর্থ ওলামায়ে কেরাম লিখিয়াছেন যে, তিনদিন মেহমানদারী করিবে আর চতুর্থ দিন বিদায়কালে একদিনের নাস্তা দিবে।

চতুর্থ অর্থ এই যে, বিশেষ আতিথেয়তা দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, কোথাও যাওয়ার সময় পশ্চিমধ্যে অবস্থান করা অর্থাৎ যে ব্যক্তি শুধু মেজবানের মূলকাতের জন্যই আসিল; অন্য কোন কাজে আসে নাই, তাহার তিনদিন অবস্থান করার অধিকার বা হক থাকিবে। আর যে ব্যক্তি রাস্তায় চলিতে চলিতে শুধু পশ্চিমধ্যে পড়িয়াছে বলিয়া অবস্থান করিয়াছে, নতুবা

গন্তব্যস্থল আরো সামনে রহিয়াছে। এমনভাবেই তাহার কেবল একদিন অবস্থান করার হুক থাকিবে। (মুনযিরী)

এইসব উক্তির সারকথা হইল, বিভিন্ন অবস্থা হিসাবে মেহমানের খাতির যত্নের প্রতি গুরুত্ব দান করা। যেমন, একদিনের মেহমানদারী হইলে বিশেষ খাওয়া-দাওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা করিবে এবং বিদায়ের সমস্ত নাস্তারও ব্যবস্থা করিবে। বিশেষতঃ এমন এলাকায় যেখানে পথে খানাপিনা পাওয়া যায় না। উক্ত হাদীসে আরেকটি আদব মেহমানের জন্য বলা হইয়াছে, অর্থাৎ সে যেন কোথাও ঘাইয়া দীর্ঘ সময় অবস্থান না করে, যদ্বারা মেজবানের অসুবিধা এবং কষ্ট হয়।

অন্য এক হাদীসে এইভাবে এরশাদ হইয়াছে যে, এত সময় থাকিবে না যে, মেজবানকে গুনাহগার হইতে হয়। অর্থাৎ মেহমান বেশী সময় অবস্থান করার কারণে মেজবান তাহার গীবত করিতে আরম্ভ করে অথবা এমন কিছু করে যদ্বারা মেহমানের কষ্ট হয় অথবা মেহমানের ব্যাপারে কোন প্রকার খারাপ ধারণা করে। এইসব বিষয় মেজবানকে গুনাহগার বানাইয়া দেয়। কিন্তু এইসব বিষয় তখন প্রযোজ্য হইবে, যখন মেজবানের পক্ষ হইতে মেহমানের অবস্থানের জন্য পীড়াপীড়ি ও চাহিদা না থাকে অথবা মেহমানের প্রবল ধারণা হয় যে, দীর্ঘ সময় অবস্থান করিলে মেজবানের কষ্ট হইবে না।

এক হাদীসে আছে, জনৈক ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কি জিনিস মেজবানকে গুনাহের মধ্যে ফেলিয়া দেয়? হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এতদিন অবস্থান করা যে, মেজবানের নিকট তাহাকে খাওয়ানোর কিছু না থাকে।

হাফেজ (রহঃ) বলেন, এই সম্পর্কে হযরত সালমান (রাযিঃ) এর আপন মেহমানের সহিত একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। (ফাত্হ) সেই ঘটনার প্রতি হাফেজ (রহঃ) ইঙ্গিত করিয়াছেন। ইমাম গায়যালী (রহঃ) উহা বর্ণনা করিয়াছেন : হযরত আবু ওয়ায়েল (রাযিঃ) বলেন, আমি এবং আমার একজন সাথী হযরত সালমান (রাযিঃ) এর সহিত সাক্ষাত করিতে গেলাম। তিনি আমাদের সম্মুখে যবের রুটি ও আধাপিষা লবণ রাখিলেন। আমার সাথী বলিতে লাগিল, ইহার সঙ্গে যদি সান্তার (একপ্রকার পুদিনা) হইত, তবে বড় মজাদার হইত। হযরত সালমান (রাযিঃ) উঠিয়া বাহিরে গেলেন এবং ওজুর লোটা বজ্রক রাখিয়া সান্তার খরিদ করিয়া আনিলেন। যখন আমাদের খাওয়া-দাওয়া শেষ হইল তখন আমার সাথী বলিল : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَنَعَنَا بِمَا رَزَقَنَا (সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি

আমাদেরকে উপস্থিত খানার উপর তুষ্ট থাকিবার তওফীক দিয়াছেন) হয়রত সালমান বলিলেন, উপস্থিত খানার উপর যদি তোমরা তুষ্ট হইতে তবে আমার লোটা বন্ধক রাখিতে হইত না। (এহইয়া)

মোটকথা, মেজবানকে এমন কোন ফরমায়েশ করা যাহাতে তাহার কষ্ট হয়, ইহাও মেজবানকে কষ্টে ফেলার অন্তর্ভুক্ত। অন্যের ঘরে যাইয়া এটা ওটা ফরমায়েশ করা কিংবা ইহা চাই উহা চাই এইরূপ বলা কখনও সমীচীন নয়। মেজবান যাহা হাজির করিতেছে, উহা সবার ও শোকরের সহিত আনন্দটিতে আহ্বার করা চাই। ফরমায়েশ করিলে অনেক সময় মেজবানের কষ্ট ও অসুবিধার কারণ হয়। অবশ্য মেজবানের অবস্থাদৃষ্টে যদি আন্দাজ হয় যে, সে ফরমায়েশের দ্বারা খুশী হইবে, যেমন ফরমায়েশকারী মেজবানের কোন প্রিয় ব্যক্তি হয় এবং যাহাকে ফরমায়েশ করা হইতেছে, সে নিবেদিতপ্রাণ হয়, তখন যাহা ইচ্ছা ফরমায়েশ করা যায়।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বাগদাদে জাফরানী (রহঃ) এর মেহমান ছিলেন। তিনি ইমাম সাহেবের খাতিরে প্রতিদিন আপন বাঁদীকে একটি তালিকা লিখিয়া দিতেন। উহাতে সেই বেলার খাদ্যের বিবরণ থাকিত। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এক বেলা বাঁদীর নিকট হইতে তালিকা লইয়া দেখিলেন এবং উহাতে নিজ কলম দ্বারা একটি জিনিস বাড়াইয়া দিলেন। দস্তুরখানের উপর যখন জাফরানী (রহঃ) ঐ নতুন জিনিসটি দেখিলেন, তখন তিনি বাঁদীর নিকট এই বলিয়া কৈফিয়ত চাহিলেন যে, আমি তো ইহা পাক করিতে বলি নাই। বাঁদী তালিকা লইয়া মনিবের নিকট আসিল এবং উহা দেখাইয়া বলিল, এই জিনিসটি ইমাম সাহেব নিজ হাতে লিখিয়া দিয়াছেন। জাফরানী (রহঃ) যখন ইমাম সাহেবের নিজ হাতে লেখা দেখিলেন, তখন আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেলেন এবং এই আনন্দে তিনি বাঁদীকে মুক্ত করিয়া দিলেন। (এহইয়া) যদি এইরূপ কোন মেহমান হয় এবং এইরূপ মেজবান হয় তখন অবশ্যই ফরমায়েশ খুবই আনন্দদায়ক হয়।

خُصِرَ الرَّسُولُ قُلُوبَ الْمُؤْمِنِينَ كَمَا كَانَ إِسْلَامُهُ

যেহে কহে মুসলমান কৈ এলাহ কিসী কিয়াত মুসলিম

اللَّهُ يُمِيتُكُمْ وَرَبُّكُمْ أَوْدَى رَأْسَكُمْ فَخَيْرُ شَيْءٍ

كَلَامُكَ الْوَلِيُّ الْوَلِيُّ الْوَلِيُّ الْوَلِيُّ الْوَلِيُّ الْوَلِيُّ الْوَلِيُّ الْوَلِيُّ

وَالْوَلِيُّ الْوَلِيُّ الْوَلِيُّ الْوَلِيُّ الْوَلِيُّ الْوَلِيُّ الْوَلِيُّ الْوَلِيُّ الْوَلِيُّ الْوَلِيُّ الْوَلِيُّ الْوَلِيُّ الْوَلِيُّ الْوَلِيُّ الْوَلِيُّ الْوَلِيُّ الْوَلِيُّ الْوَلِيُّ الْوَلِيُّ

২৩ ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মুসলমান ছাড়া কাহারও সহিত বন্ধুত্ব ও উঠাবসা করিও না, আর পরহেযগার লোক ছাড়া তোমার খানা অন্য কেহ যেন না খায়।

(মিশকাত : তিরমিযী, আবু দাউদ, দারিমী)

ফায়সা : উক্ত হাদীসে ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইটি আদব এরশাদ করিয়াছেন, প্রথমতঃ অমুসলিমের সহিত উঠাবসা ও বন্ধুত্ব রাখিও না। ইহা দ্বারা যদি কামেল মুসলমান উদ্দেশ্য হয়, তখন অর্থ হইবে, ফাসেক ফাজের লোকদের সহিত উঠাবসা করিও না। দ্বিতীয় বাক্যে যেহেতু পরহেযগার ব্যক্তির উল্লেখ রহিয়াছে, উহাতেও এই অর্থের সমর্থন হয়। এমনভাবে ঐ হাদীস দ্বারাও সমর্থন হয়, যেখানে ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমার ঘরে পরহেযগার লোক ব্যতীত অন্য কেহ যেন প্রবেশ না করে। (কান্ধ)

আর যদি উহা দ্বারা সাধারণ মুসলমান বুঝানো হইয়া থাকে, তবে অর্থ এই যে, কাফেরদের সহিত যেন বিনা প্রয়োজনে উঠাবসা না করা হয়।

মোটকথা, সৎ সঙ্গ গ্রহণ করার প্রতি সতর্ক করাই উদ্দেশ্য। কেননা, মানুষ যেই প্রকারের লোকের সহিত বেশী উঠাবসা রাখে, ঐ ধরনের প্রভাব মানুষের মধ্যে পয়দা হইয়া থাকে। এইজন্যই ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যাহা উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে। অর্থাৎ, তোমার ঘরে পরহেযগার লোক ব্যতীত অন্য কেহ যেন প্রবেশ না করে। কেননা, ইহাতে তাহাদের সহিত মেলামেশা হইবে। ফলে তাহাদের প্রভাব পড়িবে।

ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সৎ সঙ্গীর উদাহরণ হইল, মেশক অর্থাৎ সুগন্ধী বিক্রেতার মত। তাহার নিকট বসিলে সে তোমাকে কিছু সুগন্ধী উপহারও দিতে পারে অথবা তুমি খরিদ করিয়াও লইতে পার। নতুবা অসুস্তঃ তাহার নিকট বসিবার কারণে মেশকের সুগন্ধীতে তোমার মস্তিস্ক মোহিত হইবে। (ফলে, তুমি আনন্দিত হইবে।) আর অসৎ সঙ্গীর উদাহরণ হইল, কামারের চুলার মত, সেখানে যে বসিবে কোন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উড়িয়া আসিয়া তাহার কাপড় পোড়াইয়া দিবে। না হয় অসুস্তঃ দুর্গন্ধ ও ধোঁয়া তো আসিবেই। (মিশকাত)

অন্য এক হাদীসে আছে, মানুষ তাহার বন্ধুর পথ অনুসরণ করে। অতএব, ভালভাবে চিন্তা করিয়া দেখ কাহার সহিত বন্ধুত্ব করিতেছ।

(মিশকাত) অর্থাৎ, বন্ধুত্ব ও মেলামেশার প্রভাব অনিচ্ছাসত্ত্বেও ধীরে ধীরে মানুষের মধ্যে বিস্তার করিতে থাকে। এক পর্যায়ে মানুষ অন্যের ধর্ম গ্রহণ

করিয়া লয়। এইজন্য সঙ্গী ও বন্ধু-বান্ধবদের ধর্মীয় অবস্থা ভালভাবে দেখিয়া লওয়া চাই। বেদীন লোকদের সহিত উঠাবসা করিলে মানুষের মধ্যে বেদীনি পয়দা হয়। প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা এই যে, শরাব পানকারী বা জুয়াড়ী লোকদের সহিত বেশী উঠাবসা করিলে অল্পদিনেই এই ব্যাধি মানুষের মধ্যে দেখা দেয়।

অন্য এক হাদীসে আছে, ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু রাযীন (রাযিঃ)কে বলিলেন, আমি কি তোমাকে এমন জিনিস বলিয়া দিব যদ্বারা তুমি এমন বিষয়ের উপর শক্তি অর্জন করিবে, যাহা দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের কারণ হইবে? আল্লাহর যিকিরকারীদের মজলিসে বস। যখন একাকী থাক, তখন যতদূর সম্ভব আল্লাহর যিকিরে তোমার জবানকে নাড়াচাড়া করিতে থাক, আর আল্লাহর ওয়াস্তে বন্ধুত্ব কর, আল্লাহর ওয়াস্তে শত্রুতা কর। (মিশকাত) অর্থাৎ যাহার সাথে বন্ধুত্ব অথবা শত্রুতা করিবে উহা যেন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হয়। নিজের নফসের জন্য না হয়।

ইমাম গায়যালী (রহঃ) বলেন, যাহার সঙ্গ অবলম্বন করিবে, তাহার মধ্যে পাঁচটি গুণ থাকা চাই—

প্রথম, বুদ্ধিমান হওয়া। কেননা, বুদ্ধিই হইল, আসল মূলধন। বেওকুফের সঙ্গ অবলম্বনে কোন ফায়দা নাই। উহার পরিণামফল দূরত্ব ও বিচ্ছেদ।

হযরত সুফিয়ান সওরী (রহঃ) হইতে ইহাও বর্ণিত আছে যে, আহমক লোকের চেহারা দেখাও ঠিক নয়।

দ্বিতীয়, যাহার সহিত বন্ধুত্ব করিবে তাহার চরিত্র উত্তম হইতে হইবে। কেননা, যখন মানুষের চরিত্র খারাপ হয়, তখন উহা অনেক সময় বুদ্ধির উপর প্রবল হইয়া যায়। এক ব্যক্তি বুদ্ধিমান, কথা খুব ভাল বুঝে, কিন্তু গোস্বা, প্রবৃত্তির অনুসরণ, কপণতা ইত্যাদি তাহাকে বুদ্ধিমত্তার সহিত কাজ করিতে দেয় না।

তৃতীয়, যাহার সহিত বন্ধুত্ব করিবে সে যেন ফাসেক না হয়। কেননা, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে না, তাহার সহিত বন্ধুত্বের কোন অর্থ নাই। বলা যায় না, কখন সে কোন মুসীবতে ফাসাইয়া দেয়।

চতুর্থ, সে যেন বেদআতী না হয়। কেননা, তাহার সম্পর্কের কারণে বেদআতের সাথে জড়াইয়া যাওয়ার আশংকা থাকে। আর উহার অমঙ্গল অন্যের মধ্যেও ছড়াইয়া যাওয়ার ভয় রহিয়াছে। বেদআতী লোকের সহিত সম্পর্ক থাকিলে উহা ছিন্ন করা চাই। নতুনভাবে সম্পর্ক সৃষ্টি করা তো

দূরের কথা।

পক্ষম এই যে, সে যেন সুনিয়া কামাইয়ের প্রতি গোড়ী না হয়। কেননা, তাহার সঙ্গ বিষতুল্য। কারণ, মানুষের স্বভাব অনুকরণ অনুসরণে বাধ্য হইয়া থাকে এবং অজ্ঞাতসারে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হইতে থাকে।

(এইইয়া)

হযরত ইমাম বাকের (রহঃ) বলেন, আমাকে আমার পিতা হযরত ঘাইনুল আবেদীন (রহঃ) ওসীয়াত করিয়াছেন, পাঁচ ব্যক্তির সঙ্গে থাকিবে না। তাহাদের সহিত কথাও বলিবে না। এমনকি তাহাদের সহিত পঞ্চও চলিবে না। এক—ফাসেক ব্যক্তি। কেননা, সে তোমাকে এক লোকমার বিনিময়ে বরং এক লোকমারও কমে বিক্রয় করিয়া দিবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এক লোকমার কমে বিক্রি করার অর্থ কি? তিনি বলিলেন, এক লোকমার আশায় সে তোমাকে বিক্রয় করিয়া দিবে; অথচ যে লোকমার আশা সে করিয়াছিল, উহাও সে পাইল না (অর্থাৎ, শুধু আশার উপর বিক্রয় করিয়া দেয়)। দ্বিতীয়—কৃপণ লোকের কাছে যাইও না। কেননা, এমন সময় সে তোমার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিবে, যখন তুমি তাহার প্রতি অত্যন্ত মুখাপেক্ষী থাকিবে। তৃতীয়—মিথ্যাকের নিকট যাইও না। সে বালির মত (ধোকা) অর্থাৎ, নিকটকে দূর এবং দূরকে নিকট করিয়া দেখাইবে। চতুর্থ—আহমকের নিকট দিয়া অতিক্রম করিও না। সে তোমার উপকার করিতে চাহিয়াও ক্ষতি করিয়া দিবে। পঞ্চম—আত্মীয়তা ছিন্নকারীর নিকট দিয়া অতিক্রম করিও না। কেননা, আমি কুরআন পাকে তাহার উপর তিন জায়গায় অভিশাপ পাইয়াছি। (রওজ)

প্রভাব গ্রহণ করার বিষয় শুধু মানুষের সহিত সীমাবদ্ধ নয়, বরং যে জিনিসের সহিত মানুষের মিলামিশা বেশী হয়, উহার প্রভাব অজ্ঞাতসারে মানুষের ভিতর আসিয়া যায়।

হযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে কণ্ঠনা করা হইয়াছে যে, যাহারা বকরী চরায় তাহাদের মধ্যে নিরীহ ভাব থাকে। আর ঘোড়াওয়ালাদের মধ্যে গর্ব ও অহংকার থাকে। ইহার কারণ স্পষ্ট যে, এই উভয় প্রকার জন্তুর মধ্যে এই স্বভাবগুলি পাওয়া যায়। উট এবং গরুওয়ালাদের মধ্যে উগ্রতা ও অস্তরের কাঠিন্য পাওয়া সম্পর্কেও বর্ণিত হইয়াছে। বিভিন্ন রেওয়াজাতে চিতাবাঘের চামড়ার উপর আরোহণ করা সম্পর্কে নিষেধ আসিয়াছে। অন্যান্য কারণের মধ্যে উলামায়ে কেরাম ইহার একটি কারণ এই বলিয়াছেন যে, উহার উপর বসার কারণে হিংস্রতার স্বভাব পরদা হয়। (কওকাব)

উক্ত হাদীসে দ্বিতীয় আদব এই বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তোমার খানা যেন পরহেযগার লোকেরাই খায়। এই বিষয়ও বিভিন্ন রেওয়াজাতে আসিয়াছে। এক হাদীসে আছে, তোমার খানা পরহেযগার লোকদেরকে খাওয়াও এবং মুমেনদেরকে তোমার অনুগ্রহের পাত্র বানাও। (এতহাক)

ওলামায়ে কেরাম লিখিয়াছেন, ইহা দ্বারা দাওয়াতের খানা বুঝানো হইয়াছে, প্রয়োজনের খানা নয়। যেমন, এক হাদীসে আছে, তোমার খাওয়ার মধ্যে ঐ ব্যক্তিকে দাওয়াত কর, যাহার সঙ্গে আল্লাহর ওয়াস্তে মহস্বত আছে। (এতহাক)

প্রয়োজনের খানার মধ্যে আল্লাহ তায়ালা কয়েদীদেরকে খাওয়ানোর ব্যাপারেও প্রশংসা করিয়াছেন। ঐ যামানায় কয়েদীরা কাফের ছিল। (মাজাহের) যেমন, ৩৪ নম্বর আয়াতে এই বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। আর ১০ নম্বর হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, এক বেশ্যা মহিলাকে শুধু এইজন্য মাফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, সে একটি পিপাসার্ত কুকুরকে পানি পান করাইয়াছিল।

আরও অনেক বর্ণনা দ্বারা এই বিষয়ের সমর্থন পাওয়া যায়। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো মূলনীতি বলিয়া দিয়াছেন যে, জীবের মধ্যে সওয়াব রহিয়াছে। উহাতে পরহেযগার অপরহেযগার মুসলমান-কাফের মানুষ-জীবজন্তু সবই শামিল রহিয়াছে। এইজন্য অভাব ও জরুরতের খানার মধ্যে এইসব বিষয় দেখা হয় না। সেখানে অভাব বেশী না কম, ইহা দেখা হয়। যত বেশী অভাব হইবে, সওয়াবও তত বেশী হইবে। আর হাদীসে উল্লেখিত খানা দ্বারা দাওয়াত ও সম্পর্কের খানা বুঝানো হইয়াছে। ইহাতেও যদি কোন দ্বীনী ফায়দা থাকে, নেক নিয়ত থাকে, তবে যে পর্যায়ের ফায়দা ও নেক নিয়ত হইবে, সেই পর্যায়ের সওয়াব হইবে। আর যদি দ্বীনী কোন ফায়দা না থাকে, তবে যে খাইবে সে যত বেশী পরহেযগার হইবে, সওয়াবও তত বেশী হইবার কারণ হইবে।

মাযাহের কিতাবের লেখক ও ইমাম গাফযালী (রহঃ) লিখিয়াছেন, পরহেযগার লোকদেরকে খানা খাওয়ানোর দ্বারা এবাদত ও নেক কাজে সাহায্য করা হয়। আর ফাসেকদেরকে খাওয়ানোর দ্বারা মন্দ ও অন্যায় কাজে সাহায্য করা হয়। কেননা, ইহা স্পষ্ট কথা যে, পরহেযগার ও নেক ব্যক্তির মধ্যে যত বেশী শক্তি-সামর্থ্য আসিবে, সে তত বেশী এবাদতে মশগুল হইবে। আর ফাসেক ফাজের লোকদের মধ্যে ভাল খানার দ্বারা যত বেশী শক্তি হইবে, তত বেশী খেল-তামাশা ও অন্যায় কাজে উন্নতি করিবে। ইহাতে তাহাদের সহায়তা করা হইবে।

এক বুযুর্গ তাহার খানা শুধু সুফী ফকীরদেরকে খাওয়াইতেন। কেহ আরজ করিল, আপনি যদি সাধারণ ফকীরদেরকেও খাওয়াইতেন, তবে ভাল হইত। তিনি বলিলেন, সুফী ফকীরদের সমস্ত মনোযোগ আল্লাহ তায়ালার দিকে রহিয়াছে। যখন তাহারা ক্ষুধার্ত হয়, তখন ইহার কারণে তাহাদের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়। আমি এক ব্যক্তির মনোযোগকে আল্লাহ তায়ালার দিকে লাগাইয়া রাখিব; ইহা এইরূপ হাজার মানুষের সহায়তা করা হইতে উত্তম, যাহাদের সমগ্র চিন্তা ও মনোযোগ দুনিয়ার প্রতি রহিয়াছে। হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ) এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত পছন্দ করিলেন। (এহইয়া, ইতহাক)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ)কে জনৈক দর্জি জিজ্ঞাসা করিল, আমি জালেম বাদশাহদের কাপড় সেলাই করি। আপনার মতে আমি কি জালেমদের সহায়তা করিতেছি? তিনি বলিলেন, না, তুমি সহায়তাকারীদের মধ্যে নও; তুমি তো নিজেই জালেম। জালেমের সহায়তাকারী তাহারা, যাহারা তোমার নিকট সুই সুতা বিক্রয় করে।

(এহইয়া)

এক হাদীসে ছুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি ভদ্র মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করে, সে তাহাকে গোলাম বানাইয়া লয়। আর যে ব্যক্তি ছোট লোকের প্রতি অনুগ্রহ করে, সে তাহার শত্রুতা নিজের দিকে টানিয়া লয়। (কানয)

অন্য এক হাদীসে ছুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তোমার খানা পরহেযগার লোকদেরকে খাওয়াও, আর মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহ কর। (মিশকাত)

ইহাতে উপরোল্লিখিত ফায়দাসমূহ ছাড়া পরহেযগার ও মুমিনদের প্রতি সম্মান ও একরাম রহিয়াছে, যাহা ভিন্নভাবে একটি মুস্তাহাব কাজ এবং উহার ফকুমও রহিয়াছে। এইজন্যই উলামায়ে কেরাম ছুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হাদীস সম্পর্কে; যাহাতে তিনি ফাসেকদের দাওয়াত কবুল করিতে নিষেধ করিয়াছেন, উহার অন্যান্য কারণসমূহের মধ্যে একটি ইহাও লিখিয়াছেন যে, ফাসেকের দাওয়াত কবুল করিলে তাহার সম্মান করা হয়।

خُصَّتْ أَهْلُ بَيْتِهِ وَخُصَّ أَهْلُ بَيْتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ سَوَالِ كَيْفَ سَبَّحَ فَخْلٌ مَدِينَةَ كَيْفَ؟

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَى الصَّدَقَةَ

أَفْضَلُ قَالَ بِهَذَا الْمِقْلِ
وَأَبَدًا أَيْمَنُ تَعُولُ
حضرت سید الشہداء و قریباً، کہ نامہ کی انتہائی
کرشمش، اور ایچھا اس حد کہ جس کی
پیش تمہارے خیر ہے۔ (مشکوٰۃ)

(২৪) হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সবচেয়ে উত্তম সদকা কি? হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, গরীবের চরম পর্যায়ে চেষ্টা, আর যাহাদের ভরণ-পোষণ তোমার জিম্মায় তাহাদের হইতে শুরু কর।

(মিশকাত : আবু দাউদ প্রমুখ)

ফায়দা : অর্থাৎ, যে ব্যক্তি নিজে অভাবী, গরীব, যাহার কিছুই নাই সে চেষ্টা করিয়া নিজে কষ্ট করিয়া যে সদকা করে, উহা সর্বোত্তম সদকা।

হযরত বিশর (রহঃ) বলেন, তিনটি আমল বড়ই কঠিন। অর্থাৎ, উহাতে সাহসের প্রয়োজন হয়। এক—অভাবগ্রস্ত অবস্থায় দান করা, দ্বিতীয়—নির্জন অবস্থায় পরহেজগারী ও আল্লাহর ভয়। তৃতীয়—এমন ব্যক্তির সম্মুখে হক কথা বলা, যাহাকে ভয় করা হয় অথবা যাহার নিকট হইতে কিছু আশা করা হয়। (এতহাক) অর্থাৎ, তাহার সহিত স্বার্থ জড়িত রহিয়াছে। আর এই আশংকা করা হয় যে, হক কথা বলিলে আমার স্বার্থ পূরণ করিবে না অথবা কোন ক্ষতি করিবে। কুরআন পাকেও এইদিকে ইশারা করা হইয়াছে বলিয়া পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন, ২৮ নম্বর আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে, তাহারা নিজেদের অভাব ও প্রয়োজন সত্ত্বেও অন্যদেরকে প্রাধান্য দেয়। এই আয়াত প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনাও উল্লেখ করা হইয়াছে।

হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, তিন ব্যক্তি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেদমতে হাজির হইল। একজন আরজ করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার নিকট একশত স্বর্ণমুদ্রা ছিল। আমি উহা হইতে দশটি স্বর্ণমুদ্রা আল্লাহর ওয়াস্তে দান করিয়া দিয়াছি। দ্বিতীয়জন আরজ করিল, আমার নিকট দশটি স্বর্ণমুদ্রা ছিল। আমি একটি স্বর্ণমুদ্রা দান করিয়া দিয়াছি। তৃতীয় ব্যক্তি আরজ করিল, আমার নিকট মাত্র একটি স্বর্ণমুদ্রা ছিল। আমি উহার দশ ভাগের একভাগ দান করিয়াছি। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের তিনজনেরই সওয়াব বরাবর হইয়াছে। কেননা, তোমাদের প্রত্যেকেই নিজের মালের দশভাগের এক ভাগ দান করিয়াছ।

অন্য এক হাদীসে এই ধরনের আরেকটি ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। উহাতেও হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জওয়াবে এই এরশাদ করিয়াছেন যে, তোমরা সকলেই সওয়াবের মধ্যে সমান। কেননা, প্রত্যেকেই তাহার সম্পদের দশভাগের একভাগ দান করিয়াছে। এই হাদীসে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, অতঃপর হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—
لَيَنْفُقَنَّ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ (কান্ধ)

এই আয়াত সূরা তালাকের প্রথম ককুর শেবাংশে রহিয়াছে। পুরা আয়াতের তরজমা এই—বিস্তবান লোকেরা যেন নিজেদের সচ্ছলতা অনুযায়ী খরচ করে। যাহার আমদানী কম, তাহার উচিত—সে যেন আল্লাহ তায়ালা তাহাকে যেই পরিমাণ দিয়াছেন, উহা হইতে খরচ করে। (অর্থাৎ, ধনী লোক নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী আর গরীব লোক নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী খরচ করে। কেননা,) আল্লাহ তায়ালা কাহাকেও তাহার সামর্থ্যের অধিক কষ্ট দেন না। (আর গরীব লোক খরচ করিতে গিয়া যেন এই ভয় না করে যে, খরচ করিলে কিছুই থাকিবে না।) আল্লাহ তায়ালা অভাবের পর শীঘ্রই সচ্ছলতা দান করিবেন।

আল্লামা সুযুতী (রহঃ) দুররে মানসুর কিতাবে উক্ত আয়াত প্রসঙ্গে হযরত আলী (রাযিঃ) এর ন্যায় অনুরূপ রেওয়ায়াত অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম হইতেও বর্ণনা করিয়াছেন। আর এই সমস্ত রেওয়ায়াত হইতে উচ্চ স্তরের একটি সহীহ হাদীসে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করা হইয়াছে যে, এক দেরহাম এক লক্ষ দেরহাম হইতেও সওয়াবের দিক দিয়া বাড়িয়া যায়। আর তাহা এইভাবে যে, কাহারও নিকট মাত্র দুইটি দেরহামই আছে, সে উহা হইতে একটি দান করিয়া দিল। আর এক ব্যক্তি এইরূপ যে, তাহার নিকট প্রচুর পরিমাণে সম্পদ রহিয়াছে, সে উহা হইতে এক লক্ষ দেরহাম দান করিল। এখানে এক দেরহামের সওয়াব বাড়িয়া যাইবে।

আল্লামা সুযুতী (রহঃ) জামে সগীর কিতাবে হযরত আবু যর ও হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) এর রেওয়ায়াত বর্ণনা করিয়াছেন এবং উহাকে সহীহ বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন যে, গরীবের চেষ্টা ইহাই যেমন এক ব্যক্তির নিকট শুধু দুইটি দেরহাম আছে, উহা হইতে সে একটি দান করিয়া দিল। ইহা হইতে আরও উচ্চ পর্যায়ের রেওয়ায়াত হইল, যাহা ইমাম বুখারী (রহঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমাদেরকে সদকা

করার হুকুম করিতেন, তখন আমাদের মধ্যে কেহ কেহ বাজারে যাইতেন এবং বোঝা বহন করিয়া বিনিময়ে এক মুদ (যাহা হানাকীদের নিকট এক সের এবং অন্য ইমামদের নিকট তিন পোয়া হইতেও কিছু কম) কামাই করিতেন এবং উহা সদকা করিয়া দিতেন। (ফাতহ)

কোন কোন রেওয়াজাতে আছে, আমাদের মধ্য হইতে কেহ বাহার নিকট একটি দেহরহামও থাকিত না, বাজারে যাইত এবং লোকদের নিকট ইচ্ছা প্রকাশ করিত, যেন কেহ মজুরীর বিনিময়ে তাহার দ্বারা কাজ করাইয়া লয়। এইভাবে কোমরে বোঝা বহন করিয়া এক মুদ পরিমাণ মজুরী হাসিল করিতেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয়, যথাসম্ভব হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) স্বয়ং নিজের ঘটনাই বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) বুখারী শরীফে এই হাদীসের উপর ভিত্তি করিয়া এই শিরোনাম কায়েম করিয়াছেন : 'ঐ ব্যক্তির বর্ণনা যে এইজন্য মজদুরী করে যে, কোমরের উপর বোঝা বহন করিয়া যাহা উপার্জন হইবে তাহা দান করিবে।' (ফাতহ)

আজ আমাদের মধ্যে এমন আগ্রহী কেহ আছে কি? যে ষ্টেশনে যাইয়া শুধু এইজন্য বোঝা বহন করিবে যে, দুই চার আনা যাহা পাইবে, তাহা দান করিবে? এই সকল বুয়ুর্গগণ যে পরিমাণ আখেরাতের ঋণ্ডার ব্যাপারে চিন্তিত থাকিতেন, আমরা সেই পরিমাণ দুনিয়ার ঋণ্ডার ব্যাপারে চিন্তিত থাকি। আমরা এইজন্য মজদুরী করিয়া থাকি যে, আজকে আমাদের ঋণ্ডার কিছু নাই। কিন্তু তাহারা এইজন্য মজদুরী করিতেন যে, আজকে আখেরাতে জমা করিবার কিছু নাই। ইসলামের প্রথম যুগে কোন কোন মুনাফেক এই সকল ব্যক্তিদের সমালোচনা করিত, যাহারা কষ্ট করিয়া উপার্জন করিতেন এবং সামান্য পরিমাণ সদকা করিতেন। আব্বাছ তায়াল্লা এই সমস্ত মুনাফেকদের ব্যাপারে অসন্তুষ্টির আয়াত নাযিল করিয়াছেন : **الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جَهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ**

অর্থাৎ, এই সকল (মুনাফেক) এমন লোক, যাহারা নফল দান-খয়রাতকারী মুসলমানদের দান-খয়রাতের ব্যাপারে বিক্রম করে এবং বিশেষ করিয়া ঐ সমস্ত লোকদের প্রতি (আরও বেশী) বিক্রম করে, যাহারা মেহনত ও মজদুরী ছাড়া কোন কিছু পায় না। এই সমস্ত (মুনাফেক) লোকেরা তাহাদের প্রতি বিক্রম করে। আব্বাছ তায়াল্লা তাহাদিগকে এই বিক্রমের প্রতিফল (অনুরূপভাবে) দিবেন। (অর্থাৎ, আখেরাতে ঐ সমস্ত

আহমকদের সহিতও প্রথমে ঠাট্টা-বিদ্রোপ করা হইবে।) আর যন্ত্রণাদায়ক আখ্যায়িকো তাহাদের জন্য আছেই (উহা কিছুতেই টলিবার নয়)। (তওবা : ৭৯) মুকাসসিরগণ এই আয়াত প্রসঙ্গে এই ধরনের অনেক রেওয়াজাত উল্লেখ করিয়াছেন যে, এই সকল বুয়ুর্গগণ রাতভর বোঝা বহনের কাজ করিয়া উপার্জন করিতেন এবং উহা দান করিতেন। অল্প-বল্প যাহা কিছু ঘরে থাকিত, উহা তো তাহাদের দৃষ্টিতে দান-খয়রাত করার জন্যই থাকিত। বাধ্য হইয়া কখনও কিছু নিজেরাও ব্যবহার করিতেন।

একবার হযরত আলী (রাযিঃ)এর খেদমতে একজন ভিক্ষুক হাজির হইল। তিনি তাহার পুত্র হযরত হাসান অথবা হযরত হুসাইন (রাযিঃ)কে বলিলেন, তোমার মা (হযরত ফাতেমা)কে বল, আমি যে ছয়টি দেবহাম তোমার নিকট রাখিয়াছি, উহা হইতে একটি দেবহাম যেন দিয়া দেয়। পুত্র মায়ের নিকট গেলেন ; কিন্তু হযরত ফাতেমা (রাযিঃ)এর পক্ষ হইতে এই জওয়াব লইয় আসিলেন যে, আপনি তো উহা আটা খরিদ করিবার জন্য রাখিয়াছেন। হযরত আলী (রাযিঃ) বলিলেন, মানুষ তাহার ইমানের ব্যাপারে ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যবাদী প্রমাণিত হয় না, যতক্ষণ না নিজের নিকট রক্ষিত জিনিসের তুলনায় আল্লাহর নিকট রক্ষিত জিনিসের উপর বেশী ভরসা হয়। তোমার মাকে বল, তিনি যেন ঐ ছয় দেবহাম সম্পূর্ণই দিয়া দেন। হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) তো শুধু স্মরণ করাইবার জন্য বলিয়াছিলেন ; ইহাতে তিনি কেন ইতস্ততঃ করিবেন। হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) সবই দিয়া দিলেন। হযরত আলী (রাযিঃ) সবগুলি দেবহাম ভিক্ষুককে দিয়া দিলেন। ইতিমধ্যে হযরত আলী (রাযিঃ) সেই স্থান ত্যাগ করিবার পূর্বেই এক ব্যক্তি একটি উট বিক্রয় করিবার জন্য আসিল। তিনি দাম জিজ্ঞাসা করিলেন। সে একশত চল্লিশ দেবহাম বলিল। তিনি উহা বাকীতে খরিদ করিয়া লইলেন। পরে মূল্য আদায় করিয়া দেওয়ার ওয়াদা করিলেন। কিছুক্ষণ পর অন্য এক ব্যক্তি আসিয়া উটটিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ইহা কাহার? হযরত আলী (রাযিঃ) বলিলেন, আমার। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, বিক্রয় করিবেন কি? হযরত আলী (রাযিঃ) বলিলেন, হাঁ। লোকটি দাম জিজ্ঞাসা করিল। হযরত আলী (রাযিঃ) দুইশত দেবহাম বলিলেন। সে খরিদ করিয়া লইয়া গেল। হযরত আলী (রাযিঃ) একশত চল্লিশ দেবহাম পাওনাদারকে অর্থাৎ প্রথম মালিককে দিলেন এবং ষাট দেবহাম হযরত ফাতেমা (রাযিঃ)কে আনিয়া দিলেন। হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কোথা হইতে আসিল? হযরত আলী (রাযিঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা তাহার নবীর মাধ্যমে ওয়াদা

করিয়েছেন, যে ব্যক্তি নেক আমল করে, সে একে দশ গুণ বদলা পায়।

(কানযুল উম্মাল)

ইহাও অভাবী লোকের চেষ্টা ও মেহনত ছিল। সর্বমোট ছয়টি দেহহাম ছিল, যাহা আটা খরিদ করার জন্য রাখা হইয়াছিল। আল্লাহ তায়ালা উপর পূর্ণ ভরসা করিয়া উহা খরচ করিয়া দিলেন। আর দুনিয়াতেই উহার দশগুণ বদলা আদায় করিয়া লইলেন। আল্লাহ তায়ালা উপর পূর্ণ ভরসা করিয়া সবকিছু খরচ করিয়া ফেলার আরও অনেক ঘটনা এই সকল বুয়ুর্গদের বর্ণিত রহিয়াছে।

তাবুকের যুদ্ধের সময় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)এর প্রসিদ্ধ ঘটনা রহিয়াছে। যখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদকা করার হুকুম করিলেন, তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) ঘরে যাহা কিছু ছিল সবকিছু আনিয়া পেশ করিয়া দিলেন। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, ঘরে কি রাখিয়া আসিয়াছ? বলিলেন, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অর্থাৎ তাহাদের সন্তুষ্টি রাখিয়া আসিয়াছি। অথচ ওলামায়ে কেরাম লিখিয়াছেন, যখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) ঈমান আনিয়াছিলেন, তখন তাহার নিকট চল্লিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা ছিল। (তারীখুল খুলাফা)

মুহাম্মদ ইবনে আব্বাদ মুহাজ্জাবী (রহঃ) বলেন, আমার পিতা বাদশাহ মামুনুর বশীদেব নিকট গেলেন। বাদশাহ এক লক্ষ দেহহাম হাদিয়া দিলেন। আমার পিতা যখন সেখান হইতে উঠিয়া আসিলেন, তখন সম্পূর্ণ দান করিয়া দিলেন। বাদশাহ মামুন ইহা জানিতে পারিলেন। পরবর্তী সাক্ষাতে মামুন অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিলেন। আমার পিতা বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! উপস্থিত সম্পদকে জমাইয়া রাখার অর্থই হইল, মাবুদের সহিত কুধারণা করা। (এহইয়া)

অর্থাৎ, যে জিনিস মওজুদ আছে, উহা এই ভয়েই খরচ করা হয় না যে, ইহা খরচ হইয়া গেলে পরে কোথা হইতে আসিবে। ইহার অর্থ হইল, যে মালিক এখন দিয়াছেন, পরবর্তীতে দেওয়া তাহার পক্ষে মুশকিল হইয়া যাইবে। আগেকার বুয়ুর্গদের বহু ঘটনা এমন বর্ণিত হইয়াছে যে, অভাবগ্রস্ত হইয়াও যাহা কিছু ছিল সব দান করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এইসব বর্ণনা ও ঘটনাবলীর বিপরীতে বিভিন্ন হাদীসে আরও একটি বিষয় আসিয়াছে। উহা এই যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র ও প্রসিদ্ধ বাণী خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى অর্থাৎ, পরমুখাপেক্ষী না হইয়া যে সদকা করা হয়, উহাই সর্বোত্তম। এই বিষয়টি বিভিন্ন

রেওয়ামাতে বর্ণিত হইয়াছে।

আবু দাউদ শরীফে একটি ঘটনা। হযরত জাবের (রাযিঃ) বলেন, একবার আমরা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। এক ব্যক্তি আসিল এবং ডিম পরিমাণ একটি স্বর্ণের টুকরা পেশ করিয়া আরজ করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই স্বর্ণের টুকরা আমি একটি খনিতে পাইয়াছি। ইহা ছাড়া আমার নিকট আর কিছু নাই। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইলেন। লোকটি অপর দিক হইতে আসিয়া একই কথা আবার বলিল। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই দিক হইতেও মুখ ফিরাইয়া লইলেন। এইভাবে কয়েকবার হইল। অতঃপর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ টুকরাটি লইয়া এত জোরে নিক্ষেপ করিলেন, যদি তাহার শরীরে লাগিত তবে ক্ষয় হইয়া যাইত। অতঃপর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কোন কোন লোক নিজের সমস্ত সম্পদ সদকার জন্য পেশ করিয়া দেয়, তারপর সে লোকদের নিকট ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। ঐ সদকা সর্বোত্তম, যাহা পরমুখাপেক্ষী না হইয়া করা হয়।

হযরত আবু সাদ্দ খুদরী (রাযিঃ) বলেন, এক ব্যক্তি মসজিদে হাজির হইল। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার দুরাবস্থা দেখিয়া লোকদেরকে কাপড় সদকা করার জন্য উৎসাহিত করিলেন। লোকেরা কিছু কাপড় দিল। উহা হইতে দুইটি কাপড় হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত ব্যক্তিকেও দিলেন। ইহার পর আর এক সময় হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় লোকদেরকে সদকা করার জন্য উৎসাহিত করিলেন। তখন সেই ব্যক্তিও তাহার দুইটি কাপড় হইতে একটি দান করিয়া দিল। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে নিবেদন করিলেন এবং তাহার কাপড় ফেরত দিলেন। (আবু দাউদ)

অন্য এক হাদীসে এই ঘটনা সম্পর্কে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদও বর্ণিত হইয়াছে যে, লোকটি অত্যন্ত দুরাবস্থায় মসজিদে আসিয়াছিল। আমি আশা করিয়াছিলাম যে, তোমরা তাহার অবস্থা দেখিয়া নিজেরাই খেয়াল করিবে। কিন্তু তোমরা খেয়াল কর নাই। কাজেই সদকা দেওয়ার জন্য আমাকেই বলিতে হইল। তোমরা সদকা আনিয়াছ এবং তাহাকে দুইটি কাপড় দিয়াছ। ইহার পর আমি যখন দ্বিতীয়বার সদকার জন্য উৎসাহিত করিলাম, তখন এই লোকটিও তাহার দুইটি কাপড় হইতে একটি সদকা করিতে লাগিল। অতঃপর সেই লোকটিকে বলিলেন, লও, তুমি তোমার কাপড় ফেরত লও। (কোনক)

অন্য এক হাদীসে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে, কোন কোন লোক নিজের সমস্ত মাল সদকা করিয়া দেয়। অতঃপর বসিয়া অন্য লোকদের হাতের দিকে তাকাইয়া থাকে। সর্বোত্তম সদকা হইল, যাহা পরমুখাপেক্ষী না হইয়া করা হয়। অন্য এক হাদীসে আছে, যে সদকা দ্বারা অন্যের প্রতি মুখাপেক্ষী হইতে হয়, উহা সদকাই নয়। (কানয)

এই সমস্ত বর্ণনা বাহ্যিকভাবে পূর্বে বর্ণিত রেওয়াজাতসমূহের বিপরীত। যদিও বাস্তবে কোন বিরোধ নাই। কেননা, এই রেওয়াজাতগুলির মধ্যে নিষেধাজ্ঞার কারণ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বলিয়া দিয়াছেন যে, সমস্ত মাল দান করিয়া পরে অন্য লোকদের হাতের দিকে তাকাইয়া থাকে, এমন লোকদের জন্য সমস্ত মাল সদকা করা কোন রকমেই উচিত নয়, বরং অত্যন্ত অনুচিত। কিন্তু, যে সকল লোক এমন যে, তাহাদের নিজেদের নিকট যে সম্পদ রহিয়াছে, উহার তুলনায় আল্লাহ তায়ালা নিকট রক্ষিত সম্পদের উপর বেশী ভরসা হয়। যেমন, কিছু পূর্বে হযরত আলী (রাযিঃ)এর ঘটনায় উল্লেখ করা হইয়াছে। আর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)এর অবস্থা তো উহারও উর্ধ্বে। এইরূপ ব্যক্তিদের সমস্ত মাল সদকা করিয়া দেওয়ার মধ্যে অসুবিধা নাই। অবশ্য চেষ্টা করা উচিত, যেন আমাদের অবস্থাও এই সমস্ত ব্যক্তিদের মত হইয়া যায়। দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি এবং আল্লাহ তায়ালা উপর ভরসা এইরূপ পয়সা হইয়া যায়, যেরাপ তাহাদের ছিল। মানুষ যখন কোন কাজের চেষ্টা করে, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই উহা দান করেন।

প্রবাদ আছে, مَنْ جَدَّ وَجَدَ অর্থাৎ, যে চেষ্টা করে সে পাইয়া যায়।

জনৈক ব্যক্তি এক ব্যুর্গকে জিজ্ঞাসা করিল, কি পরিমাণ সম্পদে কি পরিমাণ যাকাত ওয়াজিব হয়? তিনি বলিলেন, সাধারণ লোকদের জন্য দুইশত দেবহামে পাঁচ দেবহাম, অর্থাৎ চল্লিশভাগের একভাগ শরীয়তের হুকুম রহিয়াছে। কিন্তু আমাদের উপর সমস্ত মাল সদকা করিয়া দেওয়া ওয়াজিব। (এইইয়া আওয়াল)

এই প্রসঙ্গে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐ সমস্ত এরশাদও রহিয়াছে যাহা ১ নং হাদীসে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, যদি উহুদ পাহাড় সম্পূর্ণটাই স্বর্ণে পরিণত হয়, তবু আমি ইহা পছন্দ করি না যে, উহা হইতে এক দেবহাম পরিমাণও রাখি। অবশ্য, উহা ব্যতীত; যাহা করজ আদায়ের জন্য রাখা হয়। এই কারণেই হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামাযের পর অত্যন্ত তাড়াতাড়ি করিয়া ঘরে গেলেন।

আর ঘটনাক্রমে স্বর্ণের যে টুকরাটি অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছিল, উহা সদকা করার জকুম করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। এমনভাবে তাহার অসুস্থতার সময় ঘরে কয়েকটি মুদ্রা থাকিয়া যাওয়ার কারণে অস্থির হইয়া গিয়াছিলেন। যেমন, ৪ নম্বর হাদীসে উল্লেখ করা হইয়াছে।

ইমাম বুখারী (রহঃ) তাহার সহীহ বুখারী শরীফে লিখিয়াছেন, পরমুখাপেক্ষিতার সহিত সদকা হয় না। আর যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় সদকা করে যে, সে নিজে অভাবী হয়, অথবা তাহার পরিবার-পরিজন অভাবগ্রস্ত হয়, অথবা সে ঋণগ্রস্ত হয় তখন ঋণ পরিশোধ করা তাহার জন্য জরুরী। এমন ব্যক্তির সদকা তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। তবে যদি কোন ব্যক্তি সবর ও ধৈর্যের ব্যাপারে প্রসিক্ত হয় এবং অভাব থাকা সত্ত্বেও অন্যকে নিজের উপর প্রাধান্য দেয়, যেমন হযরত আবু বকর সিদ্দীক ছিলেন অথবা আনসারগণ মুহাজিরগণকে নিজেদের উপর প্রাধান্য দিয়াছেন, তবে এমন ব্যক্তির সদকা করিতে কোন দোষ নাই।

আল্লামা তাবারী (রহঃ) বলেন, অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের অভিমত এই যে, যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত নয় এবং অভাব অবস্থায় ধৈর্যধারণ করিতে পারে আর তাহার পরিবার পরিজনও নাই, অথবা থাকিলে তাহারাও তাহার মত ধৈর্যশীল হয়, তবে সমস্ত মাল সদকা করার মধ্যে কোন দোষ নাই। আর যদি বর্ণিত শর্তসমূহের মধ্য হইতে কোন শর্তই পাওয়া না যায়, তবে সমস্ত মাল সদকা করা মকরুহ হইবে। (ফাতহ)

আমাদের হযরত হাকীমুল উম্মত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহঃ) বলিয়াছেন, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ 'সর্বোত্তম সদকা হইল, যাহা পরমুখাপেক্ষী না হইয়া করা হয়'—এর মধ্যে পরমুখাপেক্ষী না হওয়া অর্থাৎ সচ্ছলতা দ্বারা অন্তরের সচ্ছলতা বুঝানো হইয়াছে। (হুজ্বাতুল্লাহ)

এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী এই সমস্ত হাদীস পূর্বে বর্ণিত হাদীসসমূহের বিপরীতও নয়। স্বয়ং হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ অন্যান্য হাদীসেও আসিয়াছে যে, মালের প্রাচুর্যের নাম সচ্ছলতা নয়, বরং আসল সচ্ছলতা মনের সচ্ছলতা। (মিলকাত)

উপরে স্বর্ণের টুকরার যে ঘটনা উল্লেখ করা হইয়াছে, উহাতে এই বিষয়টির ইঙ্গিত পাওয়া যায়, কারণ, লোকটির বারবার এই কথা বলা যে, এই সবটুকু সদকা এবং আমার নিকট ইহা ছাড়া আর কিছু নাই : ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, তাহার অন্তর উহার সহিত সম্পর্কিত হইয়া রহিয়াছে। মাজাহের কিতাবের লেখক বলেন, সদকা সচ্ছলতার সহিত

দেওয়া চাই; চাই মনের সচ্ছলতার সহিত হউক অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার উপর পূর্ণ ভরসা রহিয়াছে। যেমন, আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) সমস্ত মাল আল্লাহর জন্য দিয়া দিলেন এবং ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন যে, পরিবার পরিজনদের জন্য কি রাখিয়া আসিয়াছ? তখন তিনি আরজ করিলেন, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাখিয়া আসিয়াছি। তখন ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার প্রশংসা করিয়াছেন। যদি এই স্তর হাসিল না হয়, তবে অন্ততঃ সম্পদের সচ্ছলতা হইতে হইবে। মোটকথা, পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুল থাকিলে যত ইচ্ছা দান করিবে। পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুল না থাকিলে আগে পরিবার-পরিজনদের দিকে খেয়াল করিবে। (মাজাহের)

কিন্তু নিজের অন্তরকে নিজের এই দুর্বলতার কারণে সতর্ক করিতে থাকিবে এবং লজ্জা দিতে থাকিবে যে, এই নাপাক দুনিয়ার উপর তোমার যতটুকু ভরসা রহিয়াছে, আল্লাহ তায়ালার উপর উহার অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশও নাই। এইভাবে বারবার সতর্ক করিতে থাকিলে ইনশাআল্লাহ অন্তর প্রভাবিত হইবে। আল্লাহ তায়ালা এই সকল ব্যুর্গদের তাওয়াক্কুল ও ভরসার কিছু অংশ এই অধ্যমকেও দান করুন।

حُضِرَ أَمْرُكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَمْرِ
 بے کہ جب عورت اپنے گھر کے کھانے میں
 سے ایسی طرح صدقہ کرے کہ (اسراف
 وغیرہ سے) اس کو ثواب نہ کرے، تو
 اس کو خرچ کرنے کا ثواب ہے اور خاوند
 کو اس لئے ثواب ہے کہ اس نے کیا تھا
 اور کھانے کا انتظام کرنے والے کو (مربوب
 عورت) ایسا ہی ثواب ہے اور لائق تینوں
 میں سے ایک کے ثواب کی وجہ سے دوسرے
 کے ثواب میں کمی نہ ہوگی۔

①۵ عَنْ عَائِشَةَ ۖ قَالَتْ قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ
 مِنْ طَعَامٍ بَيْتَهَا غَيْرَ
 مُفْسِدَةٍ ۖ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا
 بِمَا أَنْفَقَتْ ۖ وَلِرِزْوَانِهَا
 أَجْرُهَا ۖ مَا كَسَبَتْ ۖ وَاللِّقَازِ
 مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ
 أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا -
 (متفق عليه كذا في المشكاة)

②৫ ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন স্ত্রীলোক নিজের ঘরের খাবার হইতে এমনভাবে সদকা করে যে, (অপচয় ইত্যাদি দ্বারা) উহাকে নষ্ট করে না, তবে সে খরচ করার সওয়াব পাইবে।

আর স্বামী এইজন্য সওয়াব পাইবে যে, সে উপার্জন করিয়াছিল। আর খাওয়ার আয়োজনকারীও (পুরুষ হউক অথবা স্ত্রীলোক) অনুরূপ সওয়াব পাইবে। এই তিনজনের মধ্যে একজনের সওয়াবের কারণে অপরজনের সওয়াব কম হইবে না। (মিশকাত : বুখারী, মুসলিম)

ফায়দা : উক্ত হাদীসে দুইটি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এক—স্ত্রীর খরচ করার বিষয়, দ্বিতীয়—সামান হেফাজতকারী কোষাধ্যক্ষ ও ব্যবস্থাপকের বিষয়। উভয় বিষয়েই খবর রেওয়ায়াত বর্ণিত হইয়াছে।

বুখারী ও মুসলিম শরীফের অন্য এক রেওয়ায়াতে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন স্ত্রী স্বামীর উপার্জন হইতে তাহার অনুমতি ব্যতীত খরচ করে, তখন সেই স্ত্রী অর্ধেক সওয়াব পায়। (মিশকাত)

হযরত সা'আদ (রাযিঃ) বলেন, যখন হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদের বাইয়াত গ্রহণ করিলেন, তখন দীর্ঘকালী একজন মহিলা দাঁড়াইলেন। মনে হইতেছিল, মোজার গোত্রের হইবেন। কেননা, তাহাদের গঠন লম্বা ছিল। মহিলা দাঁড়াইয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা মহিলারা আমাদের পিতাদের উপর বোঝাস্বরূপ, সম্ভ্রানদের উপরেও এবং স্বামীদের উপরেও বোঝাস্বরূপ, তাহাদের সম্পদ হইতে আমাদের কি কি জিনিস লওয়ার হক আছে? হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কাঁচা জিনিসসমূহ (যাহা জমা করিয়া রাখিলে নষ্ট হইয়া যাওয়ার আশংকা থাকে)। এরূপ জিনিস তোমরা বাইতেও পার এবং অন্যদেরকে দিতেও পার। (মিশকাত)

অন্য এক হাদীসে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে—আল্লাহ তায়ালা এক লোকমা রুটি এবং এক মুষ্টি খেজুরের কারণে তিন ব্যক্তিকে জাহান্নামে দাখেল করেন। একজন ঘরের মালিক অর্থাৎ স্বামী। দ্বিতীয় স্ত্রী, যে খানা পাক করিয়াছে। তৃতীয় ঐ খাদেম, যে মিসকীনকে দরজা পর্যন্ত দিয়া আসিয়াছে। (কানয)

হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর বোন হযরত আসমা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার নিকট কোন জিনিস নাই; শুধুমাত্র যাহা (আমার স্বামী) হযরত যুবায়ের (রাযিঃ) আমাকে দিয়া থাকেন। আমি কি উহা হইতে খরচ করিব? হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, খুব খরচ কর, বাঁধিয়া রাখিও না, তোমার ব্যাপারেও বাঁধিয়া রাখা হইবে। (কানয) এই রেওয়ায়াতটি এবং প্রায় এইরূপ আরো কয়েকটি রেওয়ায়াত ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

অন্য এক রেওয়াজাতে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যখন স্ত্রী স্বামীর উপার্জন হইতে তাহার অনুমতি ব্যতীত খরচ করে, তখন স্বামী অর্ধেক সওয়াব পায়। (আইনী : মুসলিম)

উপরে একটি রেওয়াজাত ইহার বিপরীত বর্ণিত হইয়াছে যে, এইরূপ অবস্থায় স্ত্রীর জন্য অর্ধেক সওয়াব রহিয়াছে। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করিলে বুঝা যায় যে, স্বামীর উপার্জিত সম্পদ হইতে খরচ করার দুইটি দিক রহিয়াছে। একটি হইল, স্বামী উপার্জন করিয়া মালের কিছু অংশ স্ত্রীকে একেবারে দিয়া দিয়াছে, অর্থাৎ তাহাকে মালিক বানাইয়া দিয়াছে। এইরূপ মাল হইতে যদি স্ত্রী খরচ করে, তবে সে পুরা সওয়াব পাইবে আর স্বামী অর্ধেক সওয়াব পাইবে। কেননা, স্বামী তো স্ত্রীকে পূর্বেই দিয়া দিয়াছে। এখন সে খরচ করিলে উহা স্বামীর মাল হইতে খরচ করা হইবে না, বরং সে নিজের মাল হইতে খরচ করিতেছে। কিন্তু উপার্জন যেহেতু স্বামীর, কাজেই আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানীতে তাহার উপার্জনের কারণে সে-ও উহার অর্ধেক সওয়াব পাইবে। আর স্ত্রীকে দেওয়ার কারণে স্বামীর জন্য তো ভিন্ন সওয়াব পূর্বেই হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় দিক হইল, স্বামী উপার্জন করিয়া স্ত্রীকে মালিক বানায় নাই, বরং সংসারের খরচাদির জন্য দিয়াছে। এই মাল হইতে সদকা করিলে স্বামীর পুরা সওয়াব হইবে। কেননা, সেই আসল মালিক। আর স্ত্রীর অর্ধেক সওয়াব হইবে, কেননা, ইহাতে সে নিজের খরচাদির ব্যাপারে কষ্টের মধ্যে পড়িবে। ইহা ছাড়া আরও বেশ কিছু রেওয়াজাত বিভিন্ন শিরোনামে বর্ণিত হইয়াছে। যাহাতে স্ত্রীলোকদেরকে উৎসাহিত করা হইয়াছে যে, তাহারা যেন খাওয়ার জিনিস হইতে আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় খরচ করে। সামান্য সামান্য জিনিসের ব্যাপারে যেন এই বাহানা তালাশ না করে যে, স্বামীর অনুমতি তো লই নাই। কিন্তু এই সমস্ত রেওয়াজাতের বিপরীতে কিছুসংখ্যক রেওয়াজাতে নিষেধাজ্ঞাও বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত আবু উমামা (রাযিঃ) বলেন, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের ভাষণে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এই কথাও বলিয়াছেন যে, কোন স্ত্রী যেন স্বামীর ঘর হইতে (অর্থাৎ তাহার মাল হইতে) স্বামীর অনুমতি ব্যতীত খরচ না করে। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, হযূর! খাওয়ার জিনিসও কি অনুমতি ছাড়া খরচ করিবে না? হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, খাদ্যজাত জিনিস তো উত্তম মাল। (তিরমিযী : তারমীয) অর্থাৎ, খাওয়ার জিনিসও অনুমতি ছাড়া খরচ করিবে না। প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রথম রেওয়াজাতের সাথে এই রেওয়াজাতের

কোন বিরোধ নাই। প্রথমে বর্ণিত সমস্ত রেওয়াজ সাধারণ অবস্থা ও প্রচলিত অভ্যাস অনুপাতে বর্ণিত হইয়াছে। সব জায়গায় পারিবারিক জীবনে সাধারণ প্রচলন ইহাই যে, যে সমস্ত সামান অথবা টাকা-পয়সা ঘরের খরচাদির জন্য দিয়া দেওয়া হয়, উহাতে এই ব্যাপারে স্বামীদের কোন দ্বিমত থাকে না যে, স্ত্রীলোকেরা উহা হইতে কিছু দান করিয়া দিবে অথবা গরীবদেরকে কিছু খাবার দিয়া দিবে। বরং স্বামীদের এইসব ব্যাপারে আপত্তি করা জিজ্ঞাসা করা বা তদন্ত করা কৃপণতা ও লজ্জার বিষয় বলিয়া গণ্য হয়। তবে এই ধরনের সাধারণ প্রচলন থাকা সত্ত্বেও যদি কোন কৃপণ লোক উহা হইতে কাহাকেও দান করার ব্যাপারে অনুমতি না দেয়, তখন স্ত্রীর জন্য স্বামীর মাল হইতে কিছু সদকা করা বা হাদিয়া দেওয়া জায়েয নয়। তবে স্ত্রী নিজের মাল হইতে যাহা ইচ্ছা খরচ করিতে পারে।

এক ব্যক্তি ছ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার স্ত্রী আমার অনুমতি ছাড়া আমার সম্পদ হইতে খরচ করে। ছ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের উভয়ের সওয়াব হইবে। লোকটি আরজ করিল, আমি তাহাকে নিষেধ করিয়া থাকি। ছ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি তোমার কৃপণতার বদলা পাইবে আর সে তাহার নেক নিয়তের সওয়াব পাইবে। (কান্য়)

উক্ত রেওয়াজাতের দ্বারা জানা গেল যে, এইরূপ সাধারণ জিনিস দান করা হইতে বাধা দেওয়া স্বামীর কৃপণতা, স্বামীর বাধা দেওয়ার পর তাহার মাল হইতে খরচ করা স্ত্রীর জন্য জায়েয নয়। অবশ্য, স্ত্রীর অন্তর যদি খরচ করিতে চায়; কিন্তু স্বামীর বাধ্যবাধকতার কারণে খরচ করিতে পারে না, এমতাবস্থায় তাহার নিয়তের কারণে সে সদকার সওয়াব পাইতেই থাকিবে।

আল্লামা আইনী (রহঃ) বলেন, প্রকৃতপক্ষে এইসব জিনিসের বেলায় বিভিন্ন এলাকার প্রচলন ও অভ্যাস বিভিন্ন রকম হইয়া থাকে। এমনিভাবে স্বামীদের অবস্থাও বিভিন্ন হইয়া থাকে। কেহ এইরূপ খরচ করা পছন্দ করে আবার কেহ পছন্দ করে না। এমনিভাবে, যে জিনিসটি খরচ করা হয়, উহার হিসাবেও অবস্থা বিভিন্ন রকম হইয়া থাকে। এক হইল, সাধারণ কোন জিনিস যাহা মানিয়া লওয়া যায়, আবার কোন জিনিস এমন হয়, যাহার গুরুত্ব স্বামীর অন্তরে বেশী। এমনিভাবে, কোন জিনিস এমন হয় যাহা ঘরে রাখিয়া দিলে নষ্ট হইবার আশংকা থাকে, আবার কোন জিনিস এমন হয় যাহা ঘরে রাখিলে কোন ক্ষতি হয় না।

হাফেজ ইবনে হজর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইহা সর্বসম্মত শর্ত যে, খরচ করার ব্যাপারে স্ত্রী সীমালংঘন না করে।

কোন কোন আলেম বলিয়াছেন, খরচ করার প্রতি উৎসাহ প্রদানের বিষয়টি হেজাযের প্রচলন অনুযায়ী বর্ণিত হইয়াছে। কেননা, এইসব এলাকায় স্ত্রীদের জন্য এই ধরনের খরচ করার সাধারণ অনুমতি থাকিত। যে কারণে তাহারা মিসকীন ও মেহমানদেরকে, পাড়া-প্রতিবেশী মহিলা ও ভিক্ষুকদেরকে খাবার ইত্যাদি জিনিস দিয়া দিত।

এই সমস্ত রেওয়ামাত দ্বারা হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য উদ্ভূতকে এই বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করা যে, আরবদের এই নেক অভ্যাসটি যেন অবলম্বন করা হয়। (মাজাহের) যেমন, আমাদের অঞ্চলেও অনেক ঘরে এই প্রচলন রহিয়াছে যে, যদি কোন ভিক্ষুক অথবা প্রিয়জনকে অথবা অভাবী লোক বা ক্ষুধার্ত লোককে খানাপিনার জিনিস দেওয়া হয়, তবে স্বামীদের দৃষ্টিতে ইহা এমন কোন বিষয় নয় যে, অনুমতি লইতে হইবে; ইহা তাহাদের কোন কষ্টেরও কারণ হয় না।

উপরোক্ত হাদীসে দ্বিতীয় বিষয় ব্যবস্থাপক ও কোষাধ্যক্ষ সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে। অনেক সময় এমন হয় যে, প্রকৃত মালিক কাহাকেও হালিয়া দেওয়ার ও সদকা করিবার ইচ্ছা রাখে; কিন্তু এই কোষাধ্যক্ষ বা ব্যবস্থাপক ব্যক্তি উহাতে বাধা সৃষ্টি করে। বিশেষতঃ আমীর-উমরা ও বাদশাহদের বেলায় অনেক সময় এমন হয় যে, মালিকের পক্ষ হইতে সদকা করার হুকুম জারি হইয়া থাকে। অথচ কর্মকর্তাগণ সবসময় সুযোগ নাই বলিয়া অপারগতা প্রকাশ করে। এইজন্য হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন রেওয়ামাতে উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন যে, এই কর্মকর্তাগণ যদি অত্যন্ত খুশী মনে আনন্দচিহ্নে মালিকের হুকুম তামিল করে, তবে শুধু মাধ্যম হওয়ার কারণে আল্লাহ তায়ালা মেহেরবানীতে তাহারা ভিন্ন সওয়াবের ভাগী হইবে। যেমন, উপরোক্ত বিষয়ের উপর বিভিন্ন রেওয়ামাত পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

এক হাদীসে আছে, যদি আমানতদার মুসলমান কোষাধ্যক্ষ খুশীমনে আনন্দচিহ্নে মালিকের হুকুম তামিল করে, মালিক যে পরিমাণ দিতে হুকুম করিয়াছে, সেই পরিমাণই দেয়, তবে সেও সদকা দানকারীদের মধ্যে গণ্য হইবে। (মিশকাত)

এক হাদীসে আছে, (মনে কর) যদি সদকা সাত কোটি মানুষের হাত ঘুরিয়া আসে, তবে শেষ ব্যক্তিও সেই পরিমাণ সওয়াব পাইবে, যেই পরিমাণ প্রথম ব্যক্তি পাইয়াছে। (কানয)

অর্থাৎ, উদাহরণস্বরূপ কোন বাদশাহ সদকার হুকুম করিল এবং তাহার কর্মচারীদের মধ্য হইতে উপরোক্ত সংখ্যক লোককে মাধ্যম হইতে হইল, তখন সকলেরই সওয়াব হইবে। তাহারাও সদকাকারীর মত সওয়াবের হকদার হইবে, যদিও উভয়ের সওয়াবের মধ্যে মর্তবার পার্থক্য হইবে। মর্তবার পার্থক্যের জন্য ইহা জরুরী নয় যে, কেবল মালিকেরই সওয়াব বেশী হইবে। কোন ক্ষেত্রে মালিকের সওয়াব বেশী হইবে, যেমন কর্মকর্তাকে অথবা কোষাধ্যক্ষকে একশত টাকা দিয়া হুকুম করিল, দরজার নিকট অথবা তোমার নিকট যে লোকটি রহিয়াছে, তাহাকে দিয়া দাও। এইরূপ অবস্থায় অবশ্যই মালিকের সওয়াব বেশী হইবে। আর একটি আনার কাহাকেও দিয়া বলিল, মহল্লায় যে লোকটি অসুস্থ রহিয়াছে, তাহাকে দিয়া আস। এত দূরে যাওয়া কষ্টের দিক দিয়া আনারের মূল্যের চেয়েও বেশী হইয়া যায়; এমতাবস্থায় মাধ্যম লোকটির সওয়াব আসল মালিক হইতেও বেশী হইবে। (আইনী)

এমনিভাবে, মাল হাসিল করিতে যদি কোষাধ্যক্ষের কষ্ট মেহনত বেশী করিতে হয়, অপরদিকে মালিক বিনা কষ্টে বসিয়া বসিয়া পাইয়া যায়, তখন এইরূপ মাল সদকা করিবার মধ্যে অবশ্যই কোষাধ্যক্ষের সওয়াব বেশী হইবে। কেননা, **الْأَجْرُ عَلَى قَدْرِ النَّصَبِ** অর্থাৎ, কষ্ট অনুপাতে সওয়াব হইয়া থাকে। ইহা শরীয়তের একটি মূলনীতি। তবে স্ত্রীর জন্য স্বামীর অনুমতি ছাড়া যেমন মোটামুটি খরচ করিবার অধিকার রহিয়াছে, কোষাধ্যক্ষের জন্য মালিকের অনুমতি ব্যতীত তাহার মাল হইতে খরচ করা জায়েয হইবে না। অবশ্য, যদি মালিকের পক্ষ হইতে খরচ করিবার অনুমতি থাকে, তবে কোন অসুবিধা নাই।

(২৭) **عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا فِي حَدِيثٍ نَفْظُهُ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ وَالذَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلُهُ وَاللَّهُ يُحِبُّ إِعَاثَةَ الْلَهْفَانِ**
 حضور بقدر قس على الله فقير و علم كإرشاد جے کہ ہر
 بھائی صدقہ ہے اور کسی کا خیر پر دے کے کوئی غیب
 دینے کا ثواب ایسا ہی ہے جیسا کہ خود کئے کا ثواب
 ہے اور اللہ جل شانہ مصیبت زدہ لوگوں
 کی مدد کو محبوب مکتبہ ہے۔

(كذا في المقاصد الحسنة وبسط في تخريجها وطرقه وذكر السيوطي في
 الجامع الصغير حديث الدال على الخير كفَاعِلُهُ من رواية ابن مسعود
 وابي مسعود وسهل بن سعد وبريدة وأنس)

(২৬)

হযর সালাম্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, প্রত্যেক নেক কাজই সদকা। কোন নেক কাজে কাহাকেও উৎসাহ প্রদান করার সওয়াব এমনই, যেমন স্বয়ং করিবার সওয়াব। আল্লাহ তায়ালা বিপদগ্রস্ত লোকদের সাহায্য করাকে খুবই পছন্দ করেন।

(মাকাসিদে হাসানা, জামে সগীর)

ফায়দা : উক্ত হাদীসে তিনটি বিষয় রহিয়াছে। প্রথমতঃ প্রত্যেক নেক কাজই সদকা, অর্থাৎ সদকার জন্য শুধু মাল দেওয়া জরুরী নয় এবং মাল খরচ করার মধ্যেই সদকা সীমাবদ্ধ নয় ; বরং যে কোন ভাল আচরণ কাহারো সহিত করা হয়, উহা সওয়াবের দিক দিয়া সদকা সমতুল্য। এক রেওয়াজাতে আছে, মানুষের মধ্যে তিনশত ষাটটি জোড়া আছে। তাহার জন্য জরুরী হইল, প্রত্যেক জোড়ার পক্ষ হইতে প্রতিদিন যেন একটি সদকা করে। সাহায্যে কেবাম আরজ করিলেন, ইয়া রাসূল্লাহ ! এইরূপ করার ক্ষমতা কাহার আছে (যে, প্রতিদিন তিনশত ষাটটি সদকা করিবে) ? হযর সালাম্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, মসজিদে থুথু পড়িয়া থাকিলে উহা পরিষ্কার করিয়া দাও ; ইহাও সদকা। পথে কষ্টদায়ক কোন কিছু পড়িয়া থাকিলে উহা সরাইয়া দাও ; ইহাও সদকা। যদি কিছু না পাও, তবে চালতের দুই রাকাত নফল নামায এই সমস্ত কিছুর ফলাভিষিক্ত হইয়া যাইবে। (মিশকাত) কেননা, নামাযে প্রত্যেক জোড়াকে আল্লাহর ইবাদতে নড়াচড়া করিতে হয়।

এক হাদীসে আছে, প্রতিদিন যখন সূর্যোদয় হয়, তখন মানুষের উপর প্রত্যেক জোড়ার বদলে একটি করিয়া সদকা জরুরী হয়। দুইজন মানুষের মধ্যে ইনসাফ করিয়া দাও, ইহাও সদকা। কাহারও সওয়ালীতে উঠার ব্যাপারে সাহায্য কর, ইহাও সদকা। কাহারও সামান উঠাইয়া দাও, ইহাও সদকা। কালেমায়ে তাইয়্যেবা (অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়া)ও সদকা। প্রত্যেক কদম যাহা নামাযের জন্য চলে, উহা সদকা। কাহাকেও রাস্তা বলিয়া দাও, ইহাও সদকা। রাস্তা হইতে কষ্টদায়ক জিনিস সরাইয়া দাও, ইহাও সদকা। (জামে সগীর)

এক হাদীসে আছে, প্রতিদিন মানুষের উপর প্রত্যেক জোড়ার বদলে সদকা করা জরুরী, প্রত্যেক নামায সদকা, রোযা সদকা, হজ্জ সদকা, সুবহানাল্লাহ বলা সদকা, আলহামদুলিল্লাহ বলা সদকা, আল্লাহ আকবার বলা সদকা।

অন্য এক হাদীসে আছে, কাহারও সহিত রাস্তায় সাক্ষাৎ হইলে তাহাকে সালাম করা সদকা। নেক কাজে আদেশ করা সদকা। মন্দ কাজ

হইতে নিষেধ করা সদকা। (আবু দাউদ)

এই ধরনের আরও বেশ কিছু রেওয়াজাত বর্ণিত হইয়াছে। যদ্বারা জানা যায়, প্রত্যেক ভাল আচরণ, প্রত্যেক নেককাজ, প্রত্যেক অনুগ্রহ সদকা। তবে শর্ত হইল, আল্লাহর ওয়াস্তে হইতে হইবে। উক্ত হাদীসে দ্বিতীয় বিষয় এই বর্ণিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি কাহাকেও কোন ভাল কাজের জন্য উৎসাহ প্রদান করে, তাহারও সওয়াব স্বয়ং আমলকারীর মত হইবে। ইহা প্রসিদ্ধ হাদীস।

বহু সাহায্যে কেলাম হইতে ছুঁর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদ বর্ণনা করা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি নেকীর পথ দেখায় সে এমন, যেমন উহার উপর আমলকারী। আল্লাহ তায়ালার দয়া, অনুগ্রহ, দান ও নেয়ামতের কোন সীমারেখা নাই। তাহার দয়া ও রহমত বিনা পরিশ্রমেই পাওয়া যায় ; কিন্তু আমরা উহা লইতে না চাহিলে করার কি আছে।

এক ব্যক্তি নিজে বেশী নফল পড়িতে পারে না, সে অন্যদেরকে উৎসাহ প্রদান করিয়া নফল পড়াইবে ; সেও উহার সওয়াব পাইবে। নিজে অভাবী হওয়ার কারণে অথবা অন্য কোন কারণে বেশী খরচ করিতে পারে না, অন্যদেরকে উৎসাহ দিয়া খরচ করাইবে ; খরচকারীদের সহিত নিজেও সওয়াবের মধ্যে শরীক হইয়া যাইবে। এক ব্যক্তি নিজে রোযা রাখিতে পারে না, হজ্জ করিতে পারে না, জিহাদ করিতে পারে না, অন্য কোন ইবাদত করিতে পারে না, কিন্তু এই সকল কাজে অন্যদেরকে উৎসাহ প্রদান করে ; ইহাতে সে এই সকল কাজে শরীক হইয়া যায়। অত্যন্ত গভীরভাবে চিন্তা করিবার ও বুঝিবার বিষয় যে, মানুষ যদি স্বয়ং এই সমস্ত এবাদত করে, তবে সে একজনেরই সওয়াব পাইবে, কিন্তু সে যদি এই সমস্ত আমলে উৎসাহ প্রদান করিয়া একশত মানুষকে দাঁড় করাইয়া দেয়, তবে সে একশত লোকের সওয়াব পাইবে। এমনিভাবে, হাজার দুই হাজার অথবা আরও বেশী লোককে লাগাইয়া দেয় অর্থাৎ যত লোককে সে ইবাদতের জন্য প্রস্তুত করিবে, সকলের সওয়াব পাইতে থাকিবে। আল্লাহ তায়ালার আরও মেহেরবানী এই যে, এই উৎসাহ প্রদানকারী যদি মৃত্যুবরণও করে, তবে এই আমলকারীদের আমলের সওয়াব মৃত্যুর পরও তাহার নিকট পৌঁছিতে থাকিবে। আল্লাহ তায়ালার দয়া ও মেহেরবানীর কি কোন সীমারেখা আছে? কত বড় ভাগ্যবান ঐ সমস্ত লোক, যাহারা লক্ষ লক্ষ মানুষকে নিজেদের জীবদ্দশায় দ্বীনি কাজে লাগাইয়া গিয়াছে, এখন মৃত্যুর পর এই সমস্ত আমলকারীদের সওয়াবের মধ্যে শরীক রহিয়াছে।

আমার চাচাজান মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস (রহঃ) বলিতেন এবং অত্যন্ত আনন্দের সহিত বলিতেন, মানুষ মৃত্যুর পরে কিছুসংখ্যক লোক রাখিয়া যায়, আর আমি একটি দেশ রাখিয়া যাইতেছি। তাহার উদ্দেশ্য ছিল, মেওয়াত এলাকার লক্ষ লক্ষ লোক তাহার চেষ্ঠায় নামাযী হইয়াছে, হাজার হাজার লোক তাহাজ্জুদ আদায়কারী হইয়াছে, হাজার হাজার কুরআনের হাফেজ হইয়াছে, সকলের সওয়াব ইনশাআল্লাহ তিনি পাইতে থাকিবেন। এখন এই ভাগ্যবান জামাতটি আরব ও আজমে তবলীগ করিতেছে। এই জামাতের চেষ্ঠায় যত মানুষ কোন দ্বীনী কাজে লাগিয়া যাইবে, নামায ও কুরআন পড়িবে, সকলের সওয়াব এই চেষ্টাকারীদেরও হইবে এবং ঐ ব্যক্তিরও হইবে, যাহার এই আনন্দ ছিল যে, আমি একটি দেশ রাখিয়া যাইতেছি। এই জীবন যে কোন অবস্থায় শেষ হইয়া যাইবেই, মৃত্যুর পর শুধু উহাই কাজে আসিবে, যাহা মানুষ নিজের জীবনে করিয়া নিয়াছে। জীবনের এই মুহূর্তগুলিকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করা উচিত, আর যাহাকিছু সঞ্চয় করা যায়, উহাতে চেষ্টার কোন ক্রটি না করা উচিত। সর্বোত্তম জিনিস উহাই, যাহার সওয়াব মৃত্যুর পরেও পাইতে থাকিবে।

আমার বুয়ুর্গ ও বন্ধুগণ! জীবনের মুহূর্তগুলিকে সুবর্ণ সুযোগ মনে কর, যাহা সঙ্গে লইয়া যাওয়া যায়; লইয়া লও। মৃত্যুর পর পিতা বা পুত্র কেহই জিজ্ঞাসা করিবে না, সকলেই কয়েক দিন কান্নাকাটি করিয়া চুপ হইয়া যাইবে। আর সর্বোত্তম জিনিস হইল, সদকায়ে জারিয়া।

উক্ত হাদীসে তৃতীয় বিষয়, যাহা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা হইল, আল্লাহ তায়ালা বিপদগ্রস্ত লোকদের সাহায্য করাকে পছন্দ করেন। এক হাদীসে আছে, আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তির প্রতি দয়া করেন না, যে মানুষের প্রতি দয়া করে না।

এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত মহিলাদের সাহায্য করে অথবা গরীবের সাহায্য করে, সে এমন, যেমন জিহাদে চেষ্টা করিতেছে। আর সম্ভবত ইহাও বলিয়াছেন, সে এমন, যেমন কোনরূপ অবহেলা না করিয়া সারারাত্রি নফল নামায পড়িতেছে। আর সে এইরূপ, যেমন সবসময় রোযা রাখে; কখনও ইফতার করে না। (মিশকাত)

এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন মুমেনের মুসীবত দূর করিবে, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তাহার মুসীবত দূর করিবেন। যে ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত লোকের সাহায্য করিবে, আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া ও আখেরাত তাহার জন্য সহজ করিয়া দিবেন। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন মুসলমানের দোষ ঢাকিয়া রাখিবে, আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া ও আখেরাতে

তাহার দোষ ঢাকিয়া রাখিবেন। (মিশকাত)

এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ভাইয়ের প্রয়োজন মিটাইয়া দেয়, সে এইরূপ সওয়াবের ভাগী হয়, যেন সে সারা জীবন আল্লাহ তায়ালার খেদমত (অর্থাৎ, এবাদত) করিয়াছে।

এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ভাইয়ের প্রয়োজন, কোন কর্মকর্তার নিকট পৌছাইয়া দিবে, তাহাকে পুলসিরাত অতিক্রম করিতে সাহায্য করা হইবে ; যেদিন উহার উপর পা পিছলাইয়া যাইতে থাকিবে।

এক হাদীসে আছে, আল্লাহ তায়ালার কিছু বান্দা এমন রহিয়াছে, যাহাদেরকে আল্লাহ তায়ালা এইজন্যই পুরদা করিয়াছেন যে, তাহারা মানুষের প্রয়োজন পূরা করিবে, তাহাদের কাজকর্মে সাহায্য করিবে। এইসব লোক কিয়ামতের কঠিন দিনে নিশ্চিন্ত থাকিবে ; তাহাদের কোন ভয় থাকিবে না।

এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি তাহার অসহায় ভাইয়ের সাহায্য করিবে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে ঐ দিন দৃঢ়পদ রাখিবেন, যেইদিন পাহাড়ও নিজ স্থানে জমিয়া থাকিতে পারিবে না (অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন)।

এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে কোন কথার দ্বারা সাহায্য করিবে অথবা তাহার সাহায্যের জন্য চলিবে, আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর তিহাত্তরটি রহমত নাযিল করিবেন। তন্মধ্যে একটি দ্বারা তাহার দুনিয়া ও আখেরাতের সমাধান হইয়া যাইবে আর বাহাত্তরটি আখেরাতে মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য জমা থাকিবে।

কানযুল উম্মাল কিতাবের লেখক এই ধরনের বিষয়বস্তুর উপর আরও অনেক রেওয়ায়াত বর্ণনা করিয়াছেন।

এক হাদীসে আছে, মুসলমানগণ পরস্পর একে অপরের প্রতি দয়া করা, একে অপরের সহিত সম্পর্ক রাখা এবং একে অপরের প্রতি মেহেরবানী করার ব্যাপারে এক শরীরের মত ; যখন শরীরের কোন অঙ্গ আক্রান্ত হয়, তখন সমস্ত অঙ্গ রাত্র জাগরণ ও জ্বরে উহার সঙ্গী হয়। (মিশকাত) অর্থাৎ, যেমন, একটি অঙ্গের কষ্টের কারণে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পেরেশান হইয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, হাতে জখম হইলে অন্য কোন অঙ্গের ঘুম আসে না, সকলেই জাগ্রত থাকে। উপরন্তু, হাতের ব্যথার কারণে সমস্ত শরীর জ্বরাক্রান্ত হইয়া যায়, তদ্রূপ একজন মুসলমানের কষ্টের কারণে সকলের পেরেশান হওয়া উচিত।

অন্য এক হাদীসে আছে, দয়ালু লোকদের উপর পরম দয়ালু আল্লাহ

তায়াল্লাও রহম করেন। তোমরা দুনিয়াবাসীদের উপর রহম কর ; আসমানবাসীগণ তোমাদের উপর রহম করিবেন। আসমানবাসী দ্বারা আল্লাহ তায়াল্লাও উদ্দেশ্য হইতে পারেন এবং ফেরেশতাগণও হইতে পারে।

এক হাদীসে আছে, মুসলমানদের সর্বোত্তম ঘর হইল, যাহাতে কোন এতীম থাকে এবং তাহার সহিত সদ্যবহার করা হয়। আর নিকট ঘর হইল, যাহাতে এতীম থাকে ; কিন্তু তাহার সহিত দুর্ব্যবহার করা হয়।

(মিশকাত)

এক হাদীসে আছে, আমার উম্মতের মধ্য হইতে যে ব্যক্তি কাহাকেও সন্তুষ্ট করার জন্য তাহার প্রয়োজন মিটাইল, সে আমাকে সন্তুষ্ট করিল। আর যে আমাকে সন্তুষ্ট করিল, সে আল্লাহ তায়াল্লাকে সন্তুষ্ট করিল। আর যে আল্লাহ তায়াল্লাকে সন্তুষ্ট করে, আল্লাহ তায়াল্লা তাহাকে জান্নাতে দাখেল করিয়া দেন।

এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্ত লোককে সাহায্য করে, তাহার জন্য মাগফেরাতের ত্রিহাস্তরটি মর্তবা লিখিয়া দেওয়া হয়। তন্মধ্যে একটি দ্বারা তাহার সমাধান হইয়া যায় (অর্থাৎ, উহা তাহার ভুল-ক্রটির বদলা হইয়া যায়)। বাকী বাহাস্তরটি তাহার মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হয়।

অন্য এক হাদীসে আছে, সমস্ত মখলুক আল্লাহ তায়াল্লার পরিবারভুক্ত। মানুষের মধ্যে আল্লাহ তায়াল্লার নিকট সবচেয়ে বেশী প্রিয় ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহ তায়াল্লার পরিজনের সহিত সদ্যবহার করে।

‘সমস্ত মখলুক আল্লাহ তায়াল্লার পরিবার’ একটি প্রসিদ্ধ হাদীস। অনেক সাহাবায়ে কেলাম হইতে এই হাদীস বর্ণিত হইয়াছে, ওলামায়ে কেলাম লিখিয়াছেন, মানুষ যেমন নিজের পরিবার-পরিজনের জীবিকার ব্যবস্থা করার প্রতি যত্নশীল হয়, তদ্রূপ আল্লাহ তায়াল্লা সমস্ত মখলুকের রুজিদাতা। এই হিসাবেই তাহাদেরকে আল্লাহ তায়াল্লার পরিজন বলা হইয়াছে। (মাকাসেদে হাসানা)

আল্লাহ তায়াল্লার এই গুণ শুধু মুসলমানদের জন্যই নয় ; মুসলমান ও কাকের সকলেই ইহাতে শরীক রহিয়াছে। এমনকি, সমস্ত জীবজন্তুও ইহার অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ, সকলেই আল্লাহ তায়াল্লার সৃষ্টি ও তাহার পরিজন। সুতরাং যে ব্যক্তি সকলের সহিত উত্তম আচরণ ও সং ব্যবহার করিবে, সে আল্লাহ তায়াল্লার নিকট সর্বাধিক প্রিয় হইবে।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ سَمِعْتُ خُزَيْمَةَ بْنَ أَبِي دُجَانَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَلَى يَرَأَى فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ سَلَى يَرَأَى فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ يَرَأَى فَقَدْ أَشْرَكَ

جس نے یحییٰ کی نیت سے نماز پڑھی، اس نے شرک کیا۔ جس نے یرا کے ارادہ سے صدقہ دیا، اس نے شرک کیا۔ جس نے یرا کی نیت سے صدقہ دیا، اس نے شرک کیا۔

(رواه احمد معذافى المشغوة)

(২৭) হুম্বুর সাম্বালাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি লোক দেখানোর নিয়তে নামায পড়িল, সে শিরক করিল। যে ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে রোযা রাখিল, সে শিরক করিল। যে ব্যক্তি লোক দেখানোর নিয়তে সদকা করিল, সে শিরক করিল। (মিশকাত : আহমদ)

ফায়দা : অর্থাৎ, যে এই সমস্ত এবাদতের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা সহিত অন্যদেরকে শরীক করিল অর্থাৎ যাহারা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে করিল, তাহারা এবাদতকে আল্লাহ তায়ালা জন্য খালেক রাখিল না। বরং তাহাদের এবাদত শরীকী এবাদত হইয়া গেল এবং এই এবাদতের উদ্দেশ্যের মধ্যে তাহারাও অংশীদার হইয়া গেল, যাহাদেরকে দেখানো উদ্দেশ্য ছিল। ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই আলোচনার উপর পরিচ্ছেদ শেষ করিতেছি। মূল উদ্দেশ্য হইল, যে কোন এবাদত খালেক আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্টি হাসিলের জন্য হইতে হইবে। ইহাতে কোন অসং উদ্দেশ্য যথা লোক দেখানো যশ খ্যাতি ইত্যাদি কখনও হওয়া চাই না। কেননা, ইহাতে নেকী বরবাদ ও গুনাহ অবধারিত হইয়া যায়। বিভিন্ন হাদীসে ইহার উপর খুব বেশী পরিমাণে ধমক ও সতর্কবাণী বর্ণিত হইয়াছে।

এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে, আমি সকল শরীকের মধ্যে সবচেয়ে বেশী বেপরওয়া। যে ব্যক্তি কোন এবাদতে আমার সহিত অন্য কাহাকেও শরীক করে, আমি ঐ এবাদতকারীকে তাহার (মনগড়া) শরীকের সোপর্দ করিয়া দেই। (মিশকাত) অর্থাৎ, সে তাহার বদলা ও সওয়াব ঐ শরীকের নিকট হইতে লইয়া লউক, আমার সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই।

অন্য এক হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করিবে, যে ব্যক্তি তাহার কোন আমলে আল্লাহ তায়ালা সহিত অন্য কাহাকেও শরীক করিয়াছে, সে যেন ঐ শরীকের নিকট হইতে তাহার সওয়াব চাহিয়া লয়। আল্লাহ তায়ালা শিরক হইতে মুক্ত। (মিশকাত)

হুম্বুরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বলেন, একবার হুম্বুর সাম্বালাহ

আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট তশরীফ আনিলেন। আমরা তখন দাজ্জালের আলোচনা করিতে ছিলাম। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন বিষয় বলিব, যে বিষয়ে আমি তোমাদের উপর দাজ্জালের চেয়েও বেশী ভয় করিতেছি? আমরা আরজ করিলাম, অবশ্যই বলুন। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, উহা গোপন শিরক। যেমন, এক ব্যক্তি নামায পড়িতেছে (এখলাসের সহিত শুরু করিয়াছে, কেহ তাহার নামায দেখিতে লাগিল), সে ব্যক্তি মানুষের দেখার কারণে তাহার নামায দীর্ঘ করিয়া দিল।

অন্য এক সাহাবী হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন যে, তোমাদের ব্যাপারে আমার সবচেয়ে বেশী ছোট শিরকের ভয় হয়। সাহাবায়ে কেলাম আরজ করিলেন, ছোট শিরক কি? হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, রিয়া অর্থাৎ লোক দেখানো।

এক হাদীসে উহার পর এই কথাও বর্ণিত হইয়াছে যে, যেইদিন আল্লাহ তায়ালা বান্দাদেরকে তাহাদের আমলের বদলা দান করিবেন, সেইদিন এই সমস্ত লোককে বলিবেন, তোমরা যাহাদেরকে দেখানোর জন্য আমল করিয়াছিলে, দেখ ; তাহাদের নিকট তোমাদের আমলের বদলা আছে কিনা। (মিশকাত)

কুরআন পাকেও আল্লাহ তায়ালা এরশাদ রহিয়াছে : **فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا** অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আপন পরওয়ারদেগারের সহিত সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা রাখে (এবং তাহার প্রিয় ও নিকটবর্তী হইতে চায়), সে যেন নেক কাজ করিতে থাকে এবং এবাদতের মধ্যে আপন পরওয়ারদেগারের সহিত কাহাকেও শরীক না করে। (কাহফ : ১১০)

হযরত ইবনে আক্বাস (রাযিঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জানিতে চাহিল, আমি কোন কোন (বীনী) কাজে আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হই ; কিন্তু আমার মনে চায় যে, আমার এই চেষ্টা লোকেরা দেখুক। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে কোন জওয়াব দিলেন না। অতঃপর উক্ত আয়াত নাযিল হইল।

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করিল, আমি সদকা করি এবং শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্টি আমার উদ্দেশ্য হয় ; কিন্তু আমার মনে চায় যে, লোকেরা আমাকে ভাল বলুক। তখন উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হইল।

এক হাদীসে কুদসীতে আছে, আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি তাহার আমলে আমার সহিত অন্য কাহাকেও শরীক করে, আমি ঐ আমল সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দেই। আমি কেবল ঐ আমলই কবুল করি, যাহা খালেস আমার জন্যই হয়। অতঃপর হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত আয়াত তেলাওয়াত করিলেন।

অন্য এক হাদীসে আছে, আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি আমার সঙ্গীর ব্যাপারে উত্তম বস্তুনিষ্ঠ। যে ব্যক্তি আমার এবাদতে অন্য কাহাকেও আমার সঙ্গী বানায়, আমি আমার অংশও ঐ সঙ্গীকে দিয়া দেই।

এক হাদীসে আছে, জাহান্নামে এমন একটি ময়দান আছে, যাহা হইতে স্বয়ং জাহান্নাম প্রতিদিন চারশত বার পানাহ চাহিয়া থাকে। উহা রিয়াকার কুরীদের জন্য রহিয়াছে।

অন্য এক হাদীসে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা 'যুবুল-হুয়' হইতে পানাহ চাও (অর্থাৎ, জাহান্নামে অবস্থিত চিত্তার কূপ হইতে)। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! উহাতে কাহারো থাকিবে? হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যাহারা তাহাদের আমলের মধ্যে রিয়াকারী করে।

এক সাহাবী (রাযিঃ) বলেন, এই আয়াত কুরআন শরীফে সর্বশেষ নাখিল হইয়াছে। (দুররে মানসূর)

কুরআন পাকে অন্যত্র এরশাদ হইয়াছে : **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا** অর্থাৎ, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা খোটা দিয়া অথবা কষ্ট দিয়া তোমাদের দান-খয়রাতকে বরবাদ করিও না, যেমন ঐ ব্যক্তি (বরবাদ) করে, যে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে তাহার সম্পদ খরচ করে এবং সে আল্লাহ ও কিয়ামতের দিনের উপর ঈমান রাখে না। এই ব্যক্তির উদাহরণ এইরূপ, যেমন একটি মসৃণ পাথর, যাহার উপর কিছু মাটি জমিয়া গিয়াছে (এবং ঐ মাটির উপর কিছু ঘাস ইত্যাদি জন্মিয়া গিয়াছে), অতঃপর সেই পাথরের উপর প্রবল বৃষ্টিপাত হয়, আর বৃষ্টি উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করিয়া দেয় (এমনিভাবে এই খোটাদাতা এবং কষ্টদাতা ও রিয়াকার লোকদের খরচ করাও সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার উড়িয়া যাইবে, আর কিয়ামতের দিন) এইরূপ লোকদের নিজেদের উপার্জন মোটেই হস্তগত হইবে না (অর্থাৎ, ইহারা যে সমস্ত নেককাজ করিয়াছিল, দান-খয়রাত করিয়াছিল, তাহা সবই বরবাদ হইয়া যাইবে)।' (বাকারা : ২৬৪)

উক্ত আয়াত ছাড়া কুরআন পাকে আরও কয়েক জায়গায় রিয়ার নিন্দা বর্ণনা করা হইয়াছে।

এক হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যাহাদের ফয়সালা হইবে, তাহাদের মধ্যে একজন শহীদ ব্যক্তি হইবে, তাহাকে ডাকিয়া দুনিয়াতে তাহার প্রতি আল্লাহ তায়ালায় নেয়ামতসমূহ স্মরণ করানো হইবে। অতঃপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, আল্লাহ তায়ালা এই সকল নেয়ামতের মধ্যে থাকিয়া তুমি কি নেক আমল করিয়াছ? সে আরজ করিবে, আমি তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য জেহাদ করিয়াছি, এমনকি শহীদ হইয়া গিয়াছি (এবং তোমার উপর কুরবান হইয়া গিয়াছি)। এরশাদ হইবে, ইহা মিথ্যা কথা। তুমি জিহাদ এইজন্য করিয়াছিলে যে, লোকেরা বড় বাহাদুর বলিবে। তাহারা তোমাকে অনেক বড় বাহাদুর বলিয়াছে (আমলের যে উদ্দেশ্য ছিল উহা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে)। অতঃপর তাহাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার হুকুম করা হইবে। হুকুম অনুযায়ী তাহাকে উপড় করিয়া টানিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি একজন আলেম হইবে, তাহাকে ডাকিয়া আল্লাহ তায়ালায় নেয়ামতসমূহ স্মরণ করাইয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, আল্লাহ তায়ালা এই সকল নেয়ামতের মধ্যে থাকিয়া তুমি কি আমল করিয়াছ? সে বলিবে, আমি এলেম শিখিয়াছি, লোকদেরকে শিখাইয়াছি, তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য সর্বদা কুরআন পাক পড়িয়াছি। এরশাদ হইবে, এইসব মিথ্যা কথা। এ সমস্ত কিছু এইজন্য করিয়াছ যে, লোকেরা বলিবে, অমুক ব্যক্তি বড় আলেম, বড় কারী। সুতরাং লোকেরা বলিয়া দিয়াছে (এই মেহনতের যে উদ্দেশ্য ছিল, উহা হাসিল হইয়া গিয়াছে)। অতঃপর তাহাকেও জাহান্নামে নিক্ষেপ করার হুকুম করা হইবে। হুকুম অনুযায়ী তাহাকে উপড় করিয়া টানিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে।

তৃতীয় ব্যক্তি একজন দানশীল হইবে, যাহাকে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াতে বড় সচ্ছলতা দান করিয়া রাখিয়াছিলেন। সর্বপ্রকার সম্পদ তাহাকে দান করিয়াছিলেন। তাহাকে ডাকা হইবে এবং যে সমস্ত নেয়ামত আল্লাহ তায়ালা তাহাকে দুনিয়াতে দিয়াছিলেন, উহা স্মরণ করাইয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে, এই সমস্ত নেয়ামতের মধ্যে থাকিয়া তুমি কি করিয়াছ? সে আরজ করিবে, আপনার পছন্দনীয় সব জায়গায় শুধু আপনার সন্তুষ্টি লাভের জন্য খরচ করিয়াছি। এরশাদ হইবে, ইহা মিথ্যা কথা। তুমি শুধু এইজন্য খরচ করিয়াছ যে, লোকেরা বলিবে, বড় দানশীল ব্যক্তি। অতএব বলা হইয়াছে। অতঃপর তাহাকেও জাহান্নামে নিক্ষেপ

করার হুকুম হইবে। হুকুম অনুযায়ী উপুড় করিয়া টানিয়া তাহাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। (মিশকাতঃ মুসলিম)

উক্ত হাদীসে এবং এইরূপ অন্যান্য হাদীসে যেখানে 'এক ব্যক্তি' উল্লেখ করা হইয়াছে, উহা দ্বারা এক শ্রেণীর মানুষকে বুঝানো হইয়াছে। ইহার অর্থ এই নয় যে, উক্ত আচরণ কেবল তিনজন মানুষের সঙ্গেই করা হইবে; বরং অর্থ এই যে, তিন প্রকার মানুষকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করা হইবে। উদাহরণ স্বরূপ প্রত্যেক প্রকারের মধ্য হইতে একেক ব্যক্তিকে উল্লেখ করা হইয়াছে।

উপরোক্ত হাদীস ছাড়া আরও বিভিন্ন হাদীসে এই বিষয়ে অনেক বেশী সতর্ক করা হইয়াছে এবং অত্যধিক গুরুত্বসহকারে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন উম্মতকে এই ব্যাপারে সতর্ক করিয়াছেন যে, যে কাজই করা হউক, উহা যেন খালিস আল্লাহ তায়ালার জন্য করা হয় আর যত বেশী সম্ভব এই ব্যাপারে যেন গুরুত্ব দেওয়া হয়, যাহাতে লোক দেখানো, যশ-খ্যাতি ও লৌকিকতার আভাসও না আসিতে পারে। অবশ্য, এখানে শয়তানের একটি বড় ধোকা হইতে নিশ্চিত হওয়া চাই না। শত্রু যখন শক্তিশালী হয়, সে বিভিন্নভাবে শত্রুতা করে। এই শয়তান অনেক সময় মানুষকে এই কুমন্ত্রণা দেয় যে, আমার তো এখলাস নাই-ই। ইহা দ্বারা সে অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবাদত হইতে বিরত রাখে।

ইমাম গায়খালী (রহঃ) বলেন, শয়তান প্রথমতঃ নেক কাজ হইতে বিরত রাখে এবং এমন ধারণা দিলের মধ্যে ঢালিয়া থাকে, যাহাতে ঐ কাজটি করার ইচ্ছাই পয়দা না হয়। কিন্তু যখন মানুষ হিম্মত করিয়া তাহার মুকাবেলা করে এবং তাহার বাধা উপেক্ষা করে, তখন সে বলে, তোমার মধ্যে এখলাস তো নাই-ই, তোমার এই এবাদত ও কষ্ট বেকার হইবে। যখন এখলাসই নাই, তখন এইরূপ এবাদতের দ্বারা কি লাভ? এই ধরনের মন্ত্রণা পয়দা করিয়া নেক কাজ হইতে ফিরাইয়া দেয়। যখন মানুষ নেককাজ হইতে বিরত হইয়া যায়, তখন শয়তানের উদ্দেশ্য সফল হইয়া যায়। (এহইয়া)

সুতরাং এইরূপ ধারণার বশীভূত হইয়া নেককাজ হইতে বিরত থাক চাই না। বরং নেক কাজের ব্যাপারে এখলাসের চেষ্টা করিতে থাকা চাই এবং এই দোয়াও করিতে থাকা চাই যে, আল্লাহ তায়ালার যেন তাহার দয়া ও মেহেরবানী দ্বারা সাহায্য করেন। যাহাতে ধীনের কাজ নষ্ট না হয়; বরবাদ না হয়। وَمَا ذَلِكُ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কৃপণতার নিন্দা

প্রথম পরিচ্ছেদে যত আয়াত ও হাদীস আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা সম্পর্কে উল্লেখ করা হইয়াছে, উহা দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার ফযীলত, ফায়দা ও উপকারিতার কথা স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এই পাশ্বে খরচ যত কম করা হইবে, লাভও তত কম হইবে। নিন্দা ও চরম কতিব জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা ও তাহার পাক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্কীকরণ ও গুরুত্ব বুঝাইবার জন্য কৃপণতা ও সম্পদ জমাইয়া রাখার ব্যাপারে বিশেষ ধমকও এরশাদ করিয়াছেন। ইহা আল্লাহ তায়ালা মেহেরবানী এবং উম্মতের প্রতি তাহার পাক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরম দয়া যে, তিনি এই ধ্বংসাত্মক রোগের ব্যাপারে বিশেষভাবে সতর্ক করিয়াছেন। কুরআন ও হাদীসে প্রত্যেকটি বিষয় অধিক পরিমাণে বর্ণিত হইয়াছে এবং বিভিন্ন শিরোনামে প্রত্যেক ভাল কাজের জন্য উৎসাহ প্রদান এবং প্রত্যেক মন্দ কাজ হইতে বিরত থাকার জন্য সতর্ক করা হইয়াছে। কোন একটি বিষয়কেও পরিপূর্ণভাবে বর্ণনা করা কঠিন। নমুনা স্বরূপ আলোচ্য বিষয় সম্পর্কেও কয়েকটি আয়াত ও কয়েকটি হাদীস লেখা হইতেছে।

আয়াতসমূহ

① وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى
الْوَهْلِكَةِ (সহজোসক ২৪)

তম রকম অশিক্ষিত লোকেরা
কোমর দিয়ে নিক্ষেপ করো
মিছক

① তোমরা আল্লাহর রাস্তায় খরচ কর এবং নিজেদেরকে নিজেদের

হাতে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করিও না। (বাকারা : ১৯৫)

ফায়দা : এই আয়াত প্রথম পরিচ্ছেদে তিন নম্বরে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই আয়াতে আল্লাহর রাস্তায় খরচ না করাকে স্বয়ং নিজ হাতে নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করা সাব্যস্ত করা হইয়াছে। যেমন, পূর্বে বিস্তারিতভাবে সাহাবায়ে কেরাম হইতে ইহা বর্ণনা করা হইয়াছে। এমন কে আছে, যে নিজের ধ্বংস ও বরবাদী চায়? কিন্তু এমন কয়জন আছে, যাহারা ধ্বংস ও বরবাদীর কারণ জানিবার পরও উহা হইতে বাঁচিয়া থাকে এবং সম্পদ জমা করিয়া রাখে? এইরূপ হওয়ার কারণ ইহা ছাড়া আর কি হইবে যে, গাফলতির পর্দা আমাদের অন্তরের উপর পড়িয়া রহিয়াছে। আর নিজেদের হাতেই আমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া যাইতেছি।

① الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ
وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ
وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً لِّذُنُوبِهِ
وَقَضَاءً أَوْ فَضْلًا أَوْ
عَلِيْمًا ۝ (بقرة ২৫৮)

شیطان تم کو غمزدی (اور فقر) سے راتا ہے
اور تم کو بڑی بات (بخل) کا مشورہ دیتا
ہے اور اللہ تعالیٰ تم سے (خوش کن) کفر
اپنی طرف سے (گنہ) معاف کر دینے کا اور
زیادہ نیچے کا وعدہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ
دوست ملے ہیں (وہ سب کچھ دے سکتے ہیں) خوب جاننے والے ہیں (نیک سوانح
نمودیتے ہیں)۔

② শয়তান তোমাদেরকে অভাব (ও দরিদ্রতা)–র ভয় দেখায় এবং তোমাদেরকে মন্দ বিষয় (কপণতা)–র পরামর্শ দেয়, আর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সহিত (খরচ করিবার উপর নিজের পক্ষ হইতে) ওনাহ মাফ করিয়া দেওয়ার এবং অধিক পরিমাণে দেওয়ার ওয়াদা করেন। আর আল্লাহ তায়ালা প্রাচুর্যের মালিক (তিনি সবকিছু দিতে পারেন), সর্বস্ব (নিয়ত অনুযায়ী ফল দেন)। (বাকারা : ২৬৮)

ফায়দা : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষের ভিতরে একদিকে শয়তান প্রভাব বিস্তার করে, অপরদিকে ফেরেশতা প্রভাব বিস্তার করে। শয়তানের কাজ হইল, খারাপ অবস্থার ভয় দেখানো (যেমন, তুমি দান–সদকা করিলে গরীব হইয়া যাইবে ইত্যাদি ইত্যাদি) এবং সত্যকে মিথ্যা বলা। আর ফেরেশতার কাজ হইল, নেক কাজের ওয়াদা করা,

সত্যকে সত্য বলা। যে ব্যক্তি ইহাকে পায় (অর্থাৎ, যাহার অন্তরে ভাল কথার খেয়াল আসে, সে যেন উহাকে) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে মনে করে এবং তাহার শোকর আদায় করে। আর যে ব্যক্তি অন্যটি পায় (অর্থাৎ, যদি মন্দ খেয়াল অন্তরে আসে) সে যেন শয়তান হইতে পানাহ চায়। অতঃপর হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত আয়াত তেলাওয়াত করিলেন। (মিশকাত) অর্থাৎ, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ কথার সমর্থনে উক্ত আয়াত তেলাওয়াত করিয়াছেন। উহাতে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন—শয়তান অভাবের ভয় দেখায় এবং অশ্লীল বিষয়ের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে। আর ইহাই সত্যকে মিথ্যা বলার অন্তর্ভুক্ত।

হযরত ইবনে আক্বাস (রাযিঃ) বলেন, এই আয়াতে দুইটি বিষয় আল্লাহ তায়ালা পক্ষ হইতে, আর দুইটি বিষয় শয়তানের পক্ষ হইতে বর্ণিত হইয়াছে। শয়তান অভাবের ভয় দেখায় এবং মন্দ কাজের হুকুম করে। সে বলে, মাল খরচ করিও না, সাবধানে রাখিয়া দাও ; তোমার প্রয়োজন পড়িবে। আর আল্লাহ তায়ালা এই সকল গুনাহ ক্ষমা করিবার ওয়াদা করেন এবং ব্রিখিক বৃদ্ধি করিবার ওয়াদা করেন। (দুররে মানসুর)

ইমাম গাফফালী (রহঃ) বলেন, ভবিষ্যতে কি হইবে ; এই চিন্তায় বেশী মগ্ন হওয়া উচিত নয়। বরং আল্লাহ তায়ালা যেহেতু রিযিকের ওয়াদা করিয়া রাখিয়াছেন, কাজেই তাহার উপর ভরসা করা চাই। আর ইহা বুঝিয়া লওয়া চাই যে, ভবিষ্যতের অভাবের ভয় শয়তানী প্রভাব। যেমন, উক্ত আয়াতে বলা হইয়াছে। শয়তান মানুষের দিলে এই খেয়াল পয়দা করিতে থাকে যে, তুমি যদি সম্পদ জমা না করিয়া রাখ, তবে যখন তুমি অসুস্থ হইবে অথবা উপার্জন করিবার ক্ষমতা থাকিবে না অথবা হঠাৎ কোন প্রয়োজন দেখা দিবে, তখন তুমি মুশকিলে পড়িয়া যাইবে এবং তোমার বড় কষ্ট হইবে। এই সমস্ত ধারণার মাধ্যমে তাহাকে দুঃখ ও কষ্টের মধ্যে ফেলিয়া দেয় এবং সবসময় এই কষ্টের মধ্যে লিপ্ত রাখে। অপরদিকে এই বলিয়া বিভ্রম করে যে, এই আহমক ভবিষ্যতের কাল্পনিক কষ্টের ভয়ে বর্তমানের নিশ্চিত কষ্টের মধ্যে পড়িতেছে। (এহইয়া) অর্থাৎ, সবসময় জমা করার ফিকিরে পেরেশান থাকে এবং ভবিষ্যতের চিন্তা তাহার মাথায় সওয়ার হইয়া থাকে।

﴿۳﴾ وَلَا يَخْسِبَنَّ الَّذِينَ
يَبْغُلُونَ بِمَا أَتَاهُمْ اللَّهُ

ہرگز خیال نہ کریں ایسے لوگ جو ایسے چھپکے
خفیہ کہ نہیں بلکہ کرتے ہیں جو ان کو اشد

مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ ط
 بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ط سَيُطَوَّقُونَ
 مَا يَحْلُلُونَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ط
 وَرَبُّهُمِ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ
 وَالْاَرْضِ ط وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (آل عمران ৯৫)
 جَلَّ شَانُهُ مَنْ اِيْضَ فَضْلِهِ عَطَاكَ
 چه كه به بات (يعني گل گنا) ان كيتے كچه
 اچھى جگہ (پرگز نہیں) بلکہ یہ بات انى كوتہ
 بہت ہی جگہ اس سے كروہ وگ تيامت
 كے وہ لوق پيستے تباہی كے اس مال كا
 جس كے ساتھ گل كيا تھ (يعني سانپ بنا
 كے ان كے گدزون ميں ڈال ديا جائے گا) اور اخير ميں آسمان و زمين (اور كچھ ان كے امسجہ
 نكل كے مریدانہ كے جسے) اللہ ہی كا رہ جائے گا (تم اپنے امانہ سے اس كو سے وعدہ كرنا
 بچو ورنہ تراسی كا) اور اللہ جلَّ شَانُهُ تبارك سے سارے اعمال سے خبردار ہیں۔

③ এ সমস্ত লোক যাহারা এমন জিনিস খরচ করিতে কৃপণতা করে, যাহা আল্লাহ তায়ালা তাহাদেরকে শুধুমাত্র নিজ দয়া ও মেহেরবানীতে দান করিয়াছেন, তাহারা যেন মনে না করে যে, ইহা (অর্থাৎ, কৃপণতা করা) তাহাদের জন্য মঙ্গলজনক হইবে (কখনও নয়), বরং ইহা তাহাদের জন্য খুবই অমঙ্গল হইবে। কেননা, তাহাদিগকে কিয়ামতের দিন ঐ সম্পদের বেড়ী পরাইয়া দেওয়া হইবে, যাহাতে তাহারা কৃপণতা করিয়াছিল (অর্থাৎ, সাপ বানাইয়া তাহাদের ঘাড়ে পেঁচাইয়া দেওয়া হইবে) এবং পরিশেষে আসমান ও জমিন (এবং যাহা কিছু উহার মধ্যে রহিয়াছে মানুষের মৃত্যুর পর) আল্লাহরই থাকিয়া যাইবে। (অতএব, যদি নিজ ইচ্ছায় উহা দিয়া দাও, তবে তো সওয়াব পাইবে, নতুবা এই সবকিছু তো একমাত্র তাহারই।) আর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সমস্ত আমলের ব্যাপারে অবহিত আছেন। (আলি-ইমরান : ১৮০)

ফায়দা : বুখারী শরীফে ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে, আল্লাহ তায়ালা যদি কাহাকেও সম্পদ দান করেন, আর সে উহার দাকাত আদায় না করে, তবে ঐ সম্পদকে কিয়ামতের দিন একটি টাক মাথাওয়ালা সাপে পরিণত করা হইবে। (অত্যধিক বিষধর হওয়ার কারণে উহার মাথা চুল থাকিবে না।) উহার মুখের নিচে দুইটি বিন্দু হইবে। (ইহাও অত্যধিক বিষের পরিচয় হইবে।) উক্ত সাপ ঐ ব্যক্তির গলায় পেঁচাইয়া দেওয়া হইবে, উহা তাহার উভয় চোয়াল ধরিয়া ফেলিবে এবং বলিবে, আমি তোমার মাল, আমি তোমার সম্পদ। অতঃপর ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত আয়াত

তেলাওয়াত করিলেন। (মিশকাত)

এই হাদীস পঞ্চম পরিচ্ছেদে যাকাত আদায় না করার উপর ধমকির বর্ণনায় ২ নম্বরে আসিতেছে।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, এই আয়াত কাফেরদের এবং ঐ মুমিন সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে, যাহারা নিজেদের সম্পদ আল্লাহর রাষ্ট্রায় খরচ করার ব্যাপারে কৃপণতা করে।

ইকরিমা (রহঃ) বলেন, যদি সম্পদের মধ্যে আল্লাহ তায়ালায় হক আদায় না করা হয়, তবে ঐ সম্পদ টাকমাথা সাপে রূপান্তরিত হইয়া কিয়ামতের দিন তাহার পিছনে লাগিয়া যাইবে। আর সেই ব্যক্তি ঐ সাপ হইতে পানাহ চাহিতে থাকিবে।

হাজর ইবনে বায়ান (রাযিঃ) হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন, যে আত্মীয় নিজের কোন নিকটাত্মীয়ের নিকট তাহার প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ হইতে সাহায্য চায় আর সে সাহায্য না করে বরং কৃপণতা করে, ঐ সম্পদকে কিয়ামতের দিন সাপ বানাইয়া তাহার গলায় বেড়ী আকারে পরাইয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত আয়াত তেলাওয়াত করিলেন। আরো অনেক সাহাবী হইতেও এই বিষয়টি বর্ণনা করা হইয়াছে।

মাসরুক (রহঃ) বলেন, উক্ত আয়াত ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে, যাহাকে আল্লাহ তায়ালা সম্পদ দান করিয়াছেন এবং সে নিজ আত্মীয়-স্বজনের ঐ সমস্ত হক আদায় করে না, যাহা আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর রাখিয়াছেন। তাহার সম্পদকে সাপ বানাইয়া তাহাকে উহার বেড়ী পরাইয়া দেওয়া হইবে। সেই ব্যক্তি ঐ সাপকে বলিবে, তুমি আমার পিছনে কেন লাগিয়াছ? সে বলিবে, আমি তোমার সম্পদ।

ইমাম রাযী (রহঃ) তফসীরে কবীর কিতাবে লিখেন, উক্ত আয়াতের উপরের আয়াতগুলিতে স্বশরীরে জ্ঞান লইয়া জিহাদে শরীক হওয়ার উপর তাকীদ ও উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে। অতঃপর এই আয়াতে জিহাদে মাল খরচ করার উপর তাকীদ রহিয়াছে এবং সতর্ক করা হইয়াছে যে, যাহারা জিহাদে মাল খরচ করে না, তাহাদের মাল সাপ হইয়া গলার হার হইয়া যাইবে। অতঃপর ইমাম রাযী (রহঃ) এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন যে, উক্ত আয়াতে যে রূপ কঠোর ধমকি ও সতর্কবাণী আসিয়াছে, উহা নফল বা মুত্তাহাব ছাড়িয়া দেওয়ার কারণে হইতে পারে না; বরং কেবল ওয়াজিব ছাড়ার কারণেই হইতে পারে। অবশ্য, ওয়াজিব কয়েক প্রকারের রহিয়াছে, প্রথমতঃ নিজের জন্য ও

নিজের ঐ সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের জন্য খরচ করা, যাহাদের খরচাদি তাহার জিম্মায় ওয়াজিব। দ্বিতীয়, যাকাত। তৃতীয়, যখন মুসলমানদের উপর কাফেরদের হামলা হয় এবং তাহারা মুসলমানদের জান, মাল ধ্বংস করিতে চায়, তখন সকল সম্পদশালী লোকের উপর প্রয়োজন মত খরচ করা ওয়াজিব, যদ্বারা যাহারা প্রতিরক্ষা করিতেছে, তাহাদের সাহায্য হয়। প্রকৃতপক্ষে, এই খরচ নিজেরই জানমালের হেফাজতের জন্য করা হইতেছে। চতুর্থ, অসহায় ব্যক্তির উপর খরচ করা। যদ্বারা তাহার জীবন ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পায়। এইসব খরচাদি ওয়াজিব। (তফসীরে ক্বীর)

② إِنْ اِنَّ اللَّهَ لَا يُعِيبُ مَنْ كَانَ مُتَحَاتًّا فَخُورًا ۝
الَّذِينَ يَبِغُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِغْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا اَنْهَى اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ط
وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ۝ (নস-১৮)

বিশ্বক আল্লাহ্‌র শত্রু, যিহুদি-খ্রিস্ট
নবী-কতাব (দলিল) আপন আপন
বক্তা হল (নিযায়) শত্রু-কি-আমিন-কর্তে
হল (যে-খুদা-ই-খল-কর্তে-হল-আমিন-কর্তে-হল)
কর্তা-কি-তস্বিম-কর্তে-হল-আমিন-কর্তে-হল
শত্রু-মনে-আ-কর্তা-ফضل-কর্তে-হল-আমিন-কর্তে-হল
খুদা-কর্তে-হল-আমিন-কর্তে-হল-আমিন-কর্তে-হল
আমিন-কর্তে-হল-আমিন-কর্তে-হল-আমিন-কর্তে-হল

⑧ নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা এইরূপ লোকদিগকে ভালবাসেন না। যাহারা নিজেদের (অস্তুরে) নিজেদেরকে বড় মনে করে (মুখে অহংকারমূলক কথাবার্তা বলে), যাহারা নিজেরাও কৃপণতা করে এবং অন্যদেরকেও কৃপণতা শিক্ষা দেয়। আর ঐ বস্তুকে গোপন করে যাহা আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে স্বীয় অনুগ্রহে দান করিয়াছেন। আমি এইরূপ অকৃতজ্ঞদের জন্য অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।

(নিসা : ৩৬-৩৭)

ফায়্যদা : অন্যদেরকে কৃপণতা শিক্ষা দেয়—বাক্যটি ব্যাপক। অর্থাৎ, মৌখিকভাবে অন্যদেরকে উৎসাহ প্রদান করে অথবা নিজ কর্ম দ্বারা শিক্ষা দেয়। ফলে, তাহার কাজকর্ম দেখিয়া অন্যরা কৃপণতার প্রতি উৎসাহিত হয়। অনেক হাদীসে এই বিষয়টি বর্ণিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি মন্দ পথ অবলম্বন করে, তাহার আপন কৃতকর্মের জন্য গুনাহ তো হইবেই ; উপরন্তু যত লোক তাহার কারণে উহার উপর আমল করিবে, সকলের সমপরিমাণ গুনাহও তাহার হইবে। আর যাহারা আমল করিয়াছে,

তাহাদের শান্তির মধ্যে কোন প্রকার কম করা হইবে না। কিছু পূর্বে এই বিষয়টি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) হইতে **مُخْتَالًا فَخُورًا** এর তফসীর প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে—ইহা দ্বারা এমন প্রত্যেক অহংকারী ব্যক্তিকে বুঝানো হইয়াছে, যাহারা আল্লাহর দেওয়া সম্পদকে গণিয়া গণিয়া জমা করিয়া রাখে এবং আল্লাহ তায়ালায় শোকর আদায় করে না।

হযরত আবু সাঈদ (রাযিঃ) হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন, কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ তায়ালা সমস্ত মখলুককে এক জায়গায় একত্রিত করিবেন, তখন জাহান্নামের আগুন ধাপে ধাপে উন্নত হইয়া তীব্র গতিতে তাহাদের দিকে অগ্রসর হইবে। উহার উপর নিযুক্ত ফেরেশতারা বাধা দিতে চাহিবে, তখন আগুন বলিবে, আমার রবের ইচ্ছাতের কসম! হয় আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি আমার বন্ধুদেরকে গ্রাস করিয়া লই। নতুবা আমি সকলের উপর ছাইয়া যাইব। তাহারা জিজ্ঞাসা করিবে, তোমার বন্ধু কাহারো? সে বলিবে, প্রত্যেক অহংকারী জ্বালেম। অতঃপর জাহান্নাম জিহ্বা বাহির করিবে এবং প্রত্যেক জ্বালেম অহংকারীকে বাছাই করিয়া নিজের পেটে ভরিয়া লইবে। (যেমন, পশু জিহ্বা দ্বারা ঘাস ইত্যাদি খায়।) ইহাদেরকে লইয়া পিছনে সরিয়া যাইবে। অতঃপর পুনরায় জোরপূর্বক আসিবে এবং বলিবে, আমাকে আমার বন্ধুদেরকে লইয়া যাইতে দাও। যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, তোমার বন্ধু কাহারো? তখন সে বলিবে, প্রত্যেক দস্তকারী অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি। এইভাবে প্রথমবারের মত ইহাদেরকেও জিহ্বা দ্বারা বাছিয়া পেটে ভরিয়া লইবে। অতঃপর আবার দ্রুতগতিতে আসিবে এবং তাহার বন্ধুদেরকে চাহিবে। যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, তোমার বন্ধু কাহারো? তখন সে বলিবে, প্রত্যেক দাস্তিক অহংকারী ব্যক্তি। এই বলিয়া ইহাদেরকেও বাছাই করিয়া তাহার পেটে ভরিয়া লইবে। অতঃপর লোকদের হিসাব-কিতাব শুরু হইয়া যাইবে।

হযরত জাবের ইবনে সুলাইম হুজাইমী (রাযিঃ) বলেন, আমি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম। মদীনা মুনাওয়ারার এক গলির ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সাক্ষাত হইয়া গেল। আমি সালাম করিলাম এবং লুজি সম্পর্কে মাসআলা জিজ্ঞাসা করিলাম। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, লুজি গোছার মোটা অংশ পর্যন্ত হওয়া চাই। যদি তোমার এত উপরে পছন্দ না হয়, তবে আরো কিছু নিচে

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) ও আরও কয়েকজন সাহাবায়ে কেরাম হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, উক্ত আয়াতে সম্পদ জমা করিয়া রাখার দ্বারা ঐ সম্পদকে বৃদ্ধানো হইয়াছে, যাহার যাকাত আদায় করা হয় নাই। আর যে সম্পদের যাকাত আদায় করা হইয়াছে, উহা জমাকৃত সম্পদ নয়।

হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, উক্ত হুকুম যাকাতের বিধান নাছিল হওয়ার পূর্বে ছিল। যখন যাকাতের বিধান নাছিল হইল, তখন আব্বাহ তায়ালার যাকাত আদায় করাকে অবশিষ্ট সম্পদ পবিত্র হইয়া যাওয়ার কারণ বলিয়াছেন।

হযরত সওবান (রাযিঃ) বলেন, যখন উক্ত আয়াত নাছিল হইল, তখন আমরা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত এক সফরে ছিলাম। কোন কোন সাহাবী আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইহা তো সোনা-রূপা জমা করিয়া রাখার পরিণতি হইল, যদি আমরা জানিতে পারিতাম যে, উক্ত সম্পদ কি, যাহা আমরা সম্পদ হিসাবে জমা করিয়া রাখিতে পারি। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আব্বাহ তায়ালার যিকিরকারী জবান, আব্বাহ তায়ালার শোকর আদায়কারী দিল এবং এমন নেক বিবি, যে আখেরাতের কাজে সহযোগিতা করে।

হযরত ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে, যখন উক্ত আয়াত নাছিল হইল, তখন তিনি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই আয়াত তো লোকদের নিকট অত্যন্ত কঠিন মনে হইতেছে। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আব্বাহ তায়ালার যাকাত এইজন্যই ফরজ করিয়াছেন যাহাতে অবশিষ্ট সম্পদ পবিত্র হইয়া যায়। আর মিরাসের হুকুম তো ঐ সম্পদের মধ্যেই জারী হইবে, যাহা মৃত্যুর পর বাকী থাকিবে। সর্বোত্তম জিনিস যাহাকে মানুষ সম্পদের মত হেফাজত করিবে, উহা হইল, নেক বিবি, যাহাকে দেখিয়া অন্তর সন্তুষ্ট হয়। যখন তাহাকে কোন হুকুম করা হয়, সঙ্গে সঙ্গে মানিয়া লয়। আর যখন স্বামী (সফর ইত্যাদির কারণে) অনুপস্থিত থাকে, তখন সে নিজের (এবং স্বামীর সম্পদের) হেফাজত করে।

হযরত বুরাইদা (রাযিঃ) বলেন, যখন উক্ত আয়াত নাছিল হইল, তখন সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে উহার চর্চা হইল।

হযরত আবু বকর (রাযিঃ) হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! জমা করিয়া রাখার জন্য কোন

জিনিস উত্তম? হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যিকিরকারী জবান, শোকর আদায়কারী দিল এবং এমন নেক বিবি, যে ঈমানী কাজে সাহায্য করে।

হযরত আবু যর (রাযিঃ) হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি সোনা-রূপার মুদ্রা বা উহার টুকরা রাখিবে; আল্লাহর রাষ্টায় খরচ করিবে না, উহা জমা করিয়া রাখার অন্তর্ভুক্ত হইবে। কিয়ামতের দিন উক্ত সোনা বা রূপার দ্বারা দাগ দেওয়া হইবে। অবশ্য, করজ আদায় করার জন্য হইলে রাখিতে পারে।

হযরত আবু উম্মা (রাযিঃ) হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি সোনা বা রূপা রাখিয়া মারা যাইবে, কিয়ামতের দিন তাহাকে উহা দ্বারা দাগ দেওয়া হইবে। অতঃপর সে জাহান্নামে যাইবে অথবা তাহাকে মাফ করিয়া দেওয়া হইবে।

হযরত আলী (রাযিঃ) হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন, আল্লাহ তায়ালা মুসলমান ধনীদেব সম্পদের উপর ঐ পরিমাণ যাকাত ফরজ করিয়াছেন, যাহা মুসলমান গরীবদের জন্য যথেষ্ট হয়। গরীব লোকেরা ক্ষুধার্ত অথবা বস্ত্রহীন হওয়ার কষ্ট শুধু এইজন্যই পোহাইতেছে যে, ধনীরা তাহাদেরকে দান করে না। সাবধান হও, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন এই সকল ধনীদেবকে কঠোরভাবে জিজ্ঞাসা করিবেন, অথবা কঠিন শাস্তি দিবেন। (দুররে মানসুর)

কানযুল উম্মাল কিতাবে এই হাদীসের উপর আপত্তি উত্থাপন করা হইয়াছে। হযরত আবু হুরাইরা (রাযিঃ)এর হাদীস হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, যদি আল্লাহ তায়ালা জানিতেন যে, ধনীদেব যাকাত গরীবদের জন্য যথেষ্ট হইবে না, তবে যাকাত ছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থা তাহাদের জন্য করিতেন, যাহা তাহাদের জন্য যথেষ্ট হইয়া যাইত। অতএব, এখন যে সকল গরীব লোক ক্ষুধার্ত রহিয়াছে, তাহারা ধনীদেব জুলুমের কারণে রহিয়াছে। (কান্‌য) কেননা, তাহারা পরিপূর্ণরূপে যাকাত আদায় করে না।

হযরত বেলাল (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা সহিত গরীব অবস্থায় সাক্ষাত কর; ধনী অবস্থায় সাক্ষাৎ করিও না। তিনি আরজ করিলেন, ইহা কিভাবে? হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যখন কোথাও হইতে কিছু পাও, তখন উহাকে লুকাইয়া রাখিও না; কেহ চাহিলে দিতে অস্বীকার করিও না। তিনি আরজ করিলেন, হযুর! ইহা

কিভাবে সম্ভব? ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইহাই, আর যদি ইহা না হয়, তবে জাহান্নাম। (দুররে মানসূর)

হযরত আবু যর গিফারী (রাযিঃ) ও ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন, যাহাদের মতে টাকা-পয়সা মোটেই জমা করিয়া রাখার বস্তু নয়, একটি রৌপ্যমুদ্রা জাহান্নামের একটি দাগ, আর দুইটি রৌপ্যমুদ্রা দুইটি দাগ। তাহার বিভিন্ন ঘটনা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে কয়েকটি ঘটনা প্রথম পরিচ্ছেদে হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে।

একবার সিরিয়ার আমীর হাবীব ইবনে সালামা হযরত আবু যর (রাযিঃ) এর নিকট তিনশত স্বর্ণমুদ্রা পাঠাইয়া আরজ করিলেন, এইগুলি নিজের প্রয়োজনে খরচ করিবেন। হযরত আবু যর (রাযিঃ) এই বলিয়া ফেরত পাঠাইয়া দিলেন যে, আমাকে ছাড়া দুনিয়াতে আল্লাহ তায়ালা ব্যাপারে ধোকা খাওয়া ব্যক্তি আর কাহাকেও পাও নাই? (অর্থাৎ, দুনিয়ার এত বড় পরিমাণ অর্থক নিজের নিকট রাখার অর্থই হইল, আল্লাহ তায়ালা হইতে গাফেল হওয়া।) আর আল্লাহ তায়ালা আযাব হইতে গাফেল হইয়া যাওয়ার অর্থই হইল, আল্লাহ তায়ালা ব্যাপারে ধোকা খাওয়া। আল্লাহ তায়ালা কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় এই বিষয়ে এরশাদ করিয়াছেন। যেমন, ধোকাবাজ শয়তান যেন তোমাদেরকে আল্লাহর ব্যাপারে ধোকায় নিক্ষেপ না করে। ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে দুনিয়া ও আখেরাতের বর্ণনায় ৩৮ নম্বরে এই আয়াত আসিতেছে। ইহার পর হযরত আবু যর (রাযিঃ) বলিলেন, আমার শুধু একটু ছায়ার প্রয়োজন, যেখানে আশ্রয় লইতে পারি। আর তিনটি বকরীর প্রয়োজন, যাহার দুধ দ্বারা আমরা জীবিকা নির্বাহ করিতে পারি। আর একটি বাঁদীর প্রয়োজন, যে আমাদের উপর তাহার খেদমত দ্বারা অনুগ্রহ করিবে। ইহার অতিরিক্ত যাহা হইবে, উহার ব্যাপারে আমি আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করি। তিনি আরও বলিয়াছেন, কিয়ামতের দিন দুই দেহহামের মালিক এক দেহহামের মালিক হইতে বেশী বন্দী অবস্থায় থাকিবে। (দুররে মানসূর)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সামেত (রাযিঃ) বলেন, আমি একবার হযরত আবু যর (রাযিঃ) এর নিকট ছিলাম। বায়তুল-মাল হইতে তাহার ভাতা আসিল, তাহার বাঁদী উহা হইতে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র খরিদ করিয়া আনিবার পর তাহার নিকট সাতটি দেহহাম বাঁচিয়া গেল। তিনি বলিতে লাগিলেন, ইহা ভাংতি করিয়া আন (বন্টন করিয়া দিব)। আমি বলিলাম, এইগুলি আপনার নিকট রাখিয়া দিন, কোন প্রয়োজন দেখা দিবে বা কোন মেহমান আসিয়া পড়িবে। তিনি বলিলেন, আমাকে আমার

প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চূড়ান্তভাবে এই কথা বলিয়া দিয়াছিলেন যে, যেই স্বর্ণ বা রৌপ্যকে (খলিতে) বাঁধিয়া রাখা হইবে, উহা তাহার মালিকের জন্য আগুনের স্ফুলিঙ্গ হইবে। যতক্ষণ না উহাকে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিয়া দিবে। (তবাকীব)

হযরত শাক্কাদ (রহঃ) বলেন, হযরত আবু যর (রাযিঃ) হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে কোন কঠিন হুকুম শুনিতেন, অতঃপর গ্রাম্য এলাকায় চলিয়া যাইতেন। (অধিকাংশ সময় তিনি গ্রাম্য এলাকায় কাটাইতেন।) তাহার চলিয়া যাওয়ার পর ঐ হুকুম কিছু শিখিল করা হইত, যাহা তিনি জানিতেন না। এই কারণে তিনি সেই কঠিন হুকুমের উপরই আমল করিতেন। (দুররে মানসুর)

নিঃসন্দেহে, হযরত আবু যর (রাযিঃ) অত্যন্ত কঠোর নীতির উপর চলিতেন, তবে ইহাতেও কোন সন্দেহ নাই যে, দুনিয়ার প্রতি পূর্ণ অনাসক্তিই তাহার নীতি ছিল। অনেক বড় বড় বুয়ুর্গদেরও ইহা পছন্দনীয় আমল ছিল। কিন্তু এই ব্যাপারে না কাহাকেও বাধ্য করা যাইবে, আর না ইহার উপর আমল না করিলে কাহাকেও জাহান্নামী বলা যাইবে, ইহা স্বেচ্ছায় আগ্রহের সহিত অবলম্বন করার জিনিস। ভাগ্যবান সে, যাহাকে আল্লাহ তায়ালা নিজ দয়া ও মেহেরবানীতে এই দৌলত নসীব করেন। হায়! এই অধমকেও যদি আল্লাহ তায়ালা এই সকল মহৎ ব্যক্তিদের গুণাবলীর কিছু অংশ দান করিতেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সবকিছুর উপর ক্ষমতা রাখেন।

اور ان منافقوں کی خیر غیرت قبول نہ تھی۔
اس کے سوا کوئی چیز مانع نہیں ہے کہ تمہوں
نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ
کفر کیا (ملاقات سے پہلے کو موسیٰ بتاتے ہیں)
یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے مگر بیعت کا بلی ہے۔
(نام سے دل سے) ادنیٰ کلموں میں خدق
نہیں کہتے مگر ناگاری کے ساتھ (پہنچے)
پہنچنے کی وجہ سے) ان (مُرُعدوں) کا مال
اعداء کو آپ کو ثقیب میں ڈالنے (کر ایسے

⑥ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ
مِنْهُمْ تَقَاتُهِمْ إِلَّا أَنْهُمْ
كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا
وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ
إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ ۝ فَلَا
تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا
أَوْلَادُهُمْ ط إِنَّمَا يَرِيدُ
اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِمَا فِي

الْمُحْيِيَةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ ۝
 أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ كَغُرُورًا ۝
 (সূরা ত্বীস ৫)
 مُرُودُونَ بِأَنفُسِهِمْ كَيْلًا ۝
 نَبْلُ شَأْنًا كَالْمَاءِ يَسْجَدُ لَهُ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ
 (সূরা ত্বীস ৫)
 وَقَدْ جَاءَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ آيَاتٌ فَكَيْفَ تَكْفُرُونَ ۝
 (সূরা ত্বীস ৫)

৬) এবং ঐ সকল মুনাফিকদের দান-খয়রাত কবুল হওয়ার ব্যাপারে ইহা ছাড়া আর কোন কারণ নাই যে, তাহারা আল্লাহ তায়ালা ও তাহার রাসুলের সহিত কুফর করিয়াছে (অন্তরে মুনাফিকী রাখিয়া নিজেরদেরকে মুমিন বলে)। তাহারা অলসতার সহিত নামায পড়ে (অর্থাৎ অলস মনে), আর (বদনাম হইতে বাঁচার জন্য) এই সমস্ত (বিতাড়িত) লোকদের এই সম্পদ এবং সম্তানাদি যেন আপনাকে বিস্মিত না করে (একটি একরূপ লোকদের উপর এত সমস্ত নেয়ামত কেন)। আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা এই যে, এই এই সমস্ত বস্তুর কারণে তাহাদিগকে দুনিয়াতে আখাবে গ্রেফতার করিয়া রাখেন (অর্থাৎ, সব সময় যেন ইহার চিন্তায় মগ্ন থাকে) এবং কুফর অবস্থায়ই যেন তাহাদের প্রাণ বাহির হইয়া যায়। (তওবা : ৫৪-৫৫)

ফায়দা : আয়াতের শুরুতে বলা হইয়াছে যে, দান-খয়রাত কবুল না হওয়ার কারণের মধ্যে কুফর ছাড়াও অলসতার সহিত নামায পড়া এবং অসন্তুষ্ট মনে দান করাও রহিয়াছে। নামায সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা অধর্মের লিখিত ফাযায়েলে নামায কিতাবে বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে যে, ইসলামে ঐ ব্যক্তির কোন অংশ নাই যাহার নামায নাই, ঐ ব্যক্তির দীন নাই যাহার নামায নাই। দীনের জন্য নামায একরূপই জরুরী, যেমন মানুষের জন্য মাথা জরুরী। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি খুশ-খুশ সহকারে উত্তমরূপে নামায পড়ে, ঐ নামায অত্যন্ত উজ্জ্বল ও চমকদার হইয়া তাহার জন্য কল্যাণের দোয়া করিতে করিতে যায়। আর যে ব্যক্তি মন্দভাবে নামায পড়ে, তাহার নামায কাল রূপ ধারণ করিয়া এই বদদোয়া করিতে করিতে যায় যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাকেও ধ্বংস করুন, যেমন তুমি আমাকে ধ্বংস করিয়াছ। এইরূপ নামাযকে পুরাতন কাপড়ের মত গুটাইয়া নামাযীর মুখের উপর নিক্ষেপ করা হয়।

এক হাদীসে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব হইবে। যদি উহা ভাল

হয়, তবে অন্যান্য আমলও ভাল হইবে। যদি উহা খারাপ হয়, তবে অন্যান্য আমলও খারাপ হইবে।

অন্য হাদীসে আছে, যদি উহা কবুল হয়, তবে অন্যান্য আমলও কবুল হইবে। আর যদি উহা কবুল না হয়, তবে অন্যান্য আমলও কবুল হইবে না। (ফাযায়েলে নামায)

অতঃপর উক্ত আয়াতে অসম্ভব মনে দান-খয়রাত করার বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। অসম্ভব মনে দান করিলে উহা কবুল না হওয়াই স্বাভাবিক। তবে যদি সেই দান-খয়রাত ফরজ হইয়া থাকে, যেমন যাকাত ; তবে ওয়াজিব আদায় হইয়া যাইবে। এইজন্যই হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাত সম্পর্কিত রেওয়াজাতসমূহে বিভিন্ন জায়গায় **طَيِّبَةً** (তারগীব) **رَافِدَةٌ عَلَيْهِ كُلُّ عَامٍ** (আবু দাউদ) ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। অর্থাৎ, অত্যন্ত সম্ভব মনে যাকাত আদায় করিবে, যাহাতে ফরজ আদায় হওয়ার সাথে সাথে উহার সওয়াবও হয় এবং উহার উপর পুরস্কারও লাভ হয়।

আবু দাউদ শরীফের এক রেওয়াজাতে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি সওয়াবের নিয়তে যাকাত আদায় করিবে, সে উহার সওয়াব পাইবে, আর যে আদায় করিবে না, আমি উহা অবশ্যই উসূল করিয়া লইব। কোন কোন বর্ণনায় উহার সহিত জরিমানার কথাও বর্ণিত হইয়াছে, অর্থাৎ, যাকাত আদায় না করিলে জরিমানা উসূল করিব।

হযরত জাফর ইবনে মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন, তিনি আমীরুল মুমিনীন আবু জাফর মনসুর (রহঃ)এর নিকট গেলেন। সেখানে হযরত যুবায়ের (রাযিঃ)এর বংশদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। যিনি মনসুরের নিকট নিজের কোন প্রয়োজন পেশ করিয়াছিলেন আর ইহাতে মনসুর তাহাকে কিছু দেওয়ার নির্দেশও দিয়াছিলেন। কিন্তু যুবায়েরী লোকটি উহার পরিমাণ কম মনে করিয়া অভিযোগ করিলেন, ইহাতে মনসুর রাগান্বিত হইয়া গেলেন। হযরত জাফর (রহঃ) বলিলেন, আমার বাপ-দাদাদের সূত্রে আমার নিকট হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদ পৌঁছিয়াছে, যে দান মনের সন্তুষ্টির সহিত করা হয়, উহাতে দাতার জন্যও বরকত হয় এবং গ্রহিতার জন্যও বরকত হয়। মনসুর (রহঃ) এই হাদীস শুনিয়াই বলিলেন, আল্লাহর কসম, দেওয়ার সময় তো আমার মনের সন্তুষ্টি ছিল না, কিন্তু তোমার হাদীস শুনিয়া আমার মনে সন্তুষ্টি পয়সা হইয়া গিয়াছে। ইহার পর হযরত জাফর (রহঃ) যুবায়েরী

লোকটির দিকে ফিরিয়া বলিলেন, আমার বাপ-দাদাদের সূত্রে আমার নিকট হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদ পৌঁছিয়াছে, যে ব্যক্তি অল্প রিক্তিকে কম মনে করে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে বেশী হইতে বঞ্চিত করিয়া দেন। যুবায়েরী বলিতে লাগিলেন, আল্লাহর কসম, প্রথমে এই দান আমার দৃষ্টিতে কম ছিল, তোমার হাদীস শুনিবার পর বেশী মনে হইতেছে।

সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনা (রহঃ) যিনি এই ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, আমি যুবায়েরীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, উহার পরিমাণ কি ছিল ; যাহা তোমাকে মনসূর দিয়াছিল। তিনি বলিতে লাগিলেন, তখন তো উহা অনেক কম ছিল ; কিন্তু আমার নিকট পৌঁছিবাব পর আল্লাহ তায়ালা উহাতে এত বরকত এবং লাভ দান করিলেন যে, উহার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার পর্যন্ত পৌঁছিয়া গেল। সুফিয়ান (রহঃ) বলেন, এই সমস্ত লোক (অর্থাৎ, হযরত জাফর (রাযিঃ)এর পরিবারবর্গ এবং তাহাদের বুযুর্গ ব্যক্তিরা) বৃষ্টির ন্যায় ছিলেন, যেখানেই যাইতেন মানুষের উপকারই করিতেন। (কানয)

অর্থাৎ, এখানে দুইটি হাদীস শুনাইয়া দুইজনকেই সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত করিয়া দিলেন। এমনভাবে, তাহারা যেখানেই যাইতেন, আধ্যাত্মিক অথবা জাগতিক ফায়দা অবশ্যই পৌঁছাইতেন। ইহা সাথে সাথে সে যুগের আমীর-উমারাদের মধ্যে ইহাও একটি ঈর্ষনীয় বিষয় ছিল যে, বাদশাহ হওয়া সত্ত্বেও হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ শুনিয়া উহার সম্মুখে মাথা ঝুকাইয়া দিতেন। ইহাই তখনকার সাধারণ পরিবেশ ছিল। অতঃপর উক্ত আয়াতে সন্তান-সন্ততি ও সম্পদকে দুনিয়াতে আযাবের কারণ বলা হইয়াছে। এই সমস্ত জিনিস দুনিয়াতে দুঃখ-কষ্টের কারণ হওয়া তো স্পষ্ট বিষয়। কখনও বা সন্তান-সন্ততি অসুস্থ, কখনও তাহাদের উপর বিপদ আসিয়া পড়ে, কখনও তাহাদের মৃত্যুর জন্য দুঃখ ও আফসোস হইয়া থাকে। এইসব বিষয় মুসলমানদের উপরও আসে, কিন্তু মুসলমানদের জন্য দুনিয়ার প্রত্যেক কষ্ট যেহেতু আখেরাতে সওয়াব ও পুরস্কারের কারণ হয়, সেহেতু উহা কষ্ট থাকে না। কেননা, যে কষ্টের বিনিময়ে উহা হইতে অনেক বেশী পুরস্কার লাভ হইবে উহা কষ্ট নয় বরং আরাহ। আর যাহাদের জন্য আখেরাতে এইসব বিপদের বিনিময়ে কোন পুরস্কার নাই, তাহাদের জন্য এই দুনিয়ার কষ্ট, কষ্ট হিসাবেই রহিয়া গেল। ইবনে য়ায়েদ বলেন, এইসব জিনিস তাহাদের জন্য দুনিয়াতে আযাব হওয়ার দ্বারা মুসীবত বুঝানো হইয়াছে। কেননা, তাহাদের জন্য

ইহা আযাবস্বরূপ। আর মুমিনদের জন্য সওয়াব স্বরূপ।

④ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهُمَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ۝ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۝
(بنی اسرائیل - ع ۱۴)

اور نہ تو (بخل کی وجہ سے) اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے باندھ لینا چاہیے اور نہ بہت زیادہ کھول دینا چاہیے کہ اسراف کی حد تک پہنچ جائے کہ اس مورد میں (طاقت مند اور) فقر کی وجہ سے) شک ہوئے بیٹھے رہو (اور محض کسی کے فقر کی وجہ سے اپنے کو پریشانی میں مبتلا نہ کرنا) نہیں) بیشک تیرا رب جس کو چاہتا ہے زیادہ رزق دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ بیشک وہ اپنے بندوں کی نصائح اور ان کے اعمال سے باخبر ہے (کہ کس کے لئے کتنا مناسب ہے اور کس کے اعمال کو) دیکھنے والا ہے۔

⑤ আর (ক্পণতা বশতঃ) নিজের হাতকে কাঁধের দিকে সংকুচিত করিয়া রাখিও না, আর একেবারে প্রসারিতও করিয়া দিও না (যাহাতে অপচয়ের সীমায় পৌছিয়া যায়, কেননা এইরূপ হইলে) ; তিরস্কৃত ও (অভাবের কারণে) রিক্তহস্ত হইয়া বসিয়া পড়িবে। (এবং শুধুমাত্র অভাবের কারণে নিজেকে পেরেশানীর মধ্যে লিপ্ত করা উচিত নয়) নিশ্চয়ই আপনার রব যাহাকে ইচ্ছা প্রচুর রিয়িক দান করিয়া থাকেন। আর যাহাকে চাহেন সীমিত করিয়া দেন। নিশ্চয়ই তিনি নিজ বান্দাদের (প্রয়োজন ও তাহাদের অবস্থা) সম্পর্কে জানেন (যে, কাহার জন্য কি পরিমাণ প্রয়োজন আর তাহাদের অবস্থাও) দেখেন। (বনী ইসরাঈল : ২৯-৩০)

ফায়দা : বর্ণিত আয়াতে সামাজিক জীবনের নিয়ম-নীতি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে সতর্ক করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ক্পণতা ও অপচয় সম্পর্কে সতর্ক করিয়া মধ্যম পন্থা ও মিত্যব্যয়িতার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে। কোন কোন বর্ণনায় আসিয়াছে, ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কেহ কিছু চাহিল। ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এখন তো কিছু নাই। লোকটি বলিল, আপনি যে

জামাটি পরিধান করিয়া রহিয়াছেন, উহা দিয়া দিন। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামা খুলিয়া দিয়া দিলেন। তখন এই আয়াত নাযিল হইল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, উক্ত আয়াত পারিবারিক খরচাদি সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে। অর্থাৎ, পারিবারিক ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে না বেশী কার্পণ্য করিবে, আর না বেশী প্রশস্ততা অবলম্বন করিবে। বরং মিতব্যয়িতা অবলম্বন করিবে।

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতেও কয়েকটি রেওয়াযাতে এই বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি মধ্যম অবস্থা অবলম্বন করে, সে দরিদ্র হয় না। আয়াতের শেষ অংশে ‘সম্পদে সকল মানুষ সমান অধিকার রাখে’ এই আহমকী চিন্তাধারার বিরোধিতা করিয়া বলা হইয়াছে যে, ইহা কেবল আল্লাহ তায়ালা কুদরতের হাতে রহিয়াছে, তিনি যাহাকে চাহেন, সচ্ছলতা দান করেন আর যাহাকে চাহেন দরিদ্রতা দান করেন। তিনিই বান্দাদের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত, তিনিই তাহাদের সত্যিকার প্রয়োজন সম্পর্কে খুব ভালভাবে জানেন।

হযরত হাসান (রাযিঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের অবস্থা সম্পর্কে খবর রাখেন, যাহার জন্য সম্পদের প্রাচুর্য ভাল মনে করেন, তাহাকে প্রাচুর্য দান করেন। আর যাহার জন্য দরিদ্রতা উপকারী মনে করেন, তাহাকে দরিদ্রতা দান করেন। কুরআন পাকে অন্যত্র এরশাদ হইয়াছে—

اگر اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کیلئے رزق
میں ونست کر دیتا تو وہ دنیا میں شرارت
(اور فساد) کرنے لگتے۔ لیکن حق تعالیٰ شانہ
(جس کیلئے) جتنا رزق مناسب سمجھتا ہے
اُتار تا ہے۔ وہ اپنے بندوں (کی مصالح)

وَنَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ
لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ
وَلَعِنَ يُنَزَّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ
إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ○
(شوری- ۳۷)

سے ہنبر (اور اُن کے احوال کو) دیکھنے والا ہے۔

আল্লাহ তায়ালা যদি তাহার সকল বান্দাদের রিযিক প্রশস্ত করিয়া দিতেন, তবে তাহারা পৃথিবীতে গোলযোগ (ও বিপর্যয়) সৃষ্টি করিত। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা (যাহার জন্য) যেই পরিমাণ রিযিক উপযুক্ত মনে করেন, সেই পরিমাণে নাযিল করেন। তিনি তাহার বান্দাদের (প্রয়োজন) সম্পর্কে অবগত আছেন (এবং তাহাদের অবস্থা) দেখেন। (শূরা : ২৭)

উক্ত আয়াতে এইদিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, সকলকে সচ্ছলতা

দান করা হইলে উহা দুনিয়াতে অবাধ্যতা ও বিপর্যয়ের কারণ হইবে। ইহা যুক্তিসঙ্গত ও অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত যে, আল্লাহ তায়ালা যদি দয়া করিয়া সবাইকে ধনী বানাইয়া দেন, তবে দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা ও শৃংখলা ধ্বংস হইয়া যাইবে। কেননা, সকলেই যদি মনিব হইয়া যায় তবে মজদুরী করিবে কে।

ইবনে যায়েদ (রহঃ) বলেন, আরব দেশে যেই বৎসর অধিক ফসল উৎপন্ন হইত, একজন অপরজনকে বন্দী ও হত্যা করা শুরু করিত। যখন দুর্ভিক্ষ দেখা দিত, তখন এই কাজ ছাড়িয়া দিত। (দুররে মানসুর)

হযরত আলী (রাযিঃ) এবং আরও কয়েকজন সাহাবায়ে কেরাম হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, সুফফার সাহাবীগণ দুনিয়ার আকাক্ষা করিয়াছিলেন। তখন এই আয়াত নাখিল হইয়াছে: **وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ**

হযরত কাতাদা (রহঃ) উক্ত আয়াতের তফসীলে বলেন, উত্তম ব্রিথিক উহা, যাহা না তোমার মধ্যে অবাধ্যতা পয়দা করে, আর না উহা তোমাকে নিজের মধ্যে মশগুল করে। আমাদেরকে বলা হইয়াছে যে, একবার হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি আমার উম্মতের উপর সবচেয়ে বেশী যেই বিষয়ে ভয় করি, উহা হইল, দুনিয়ার চাকচিক্য। কেহ আরজ করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সম্পদও কি অকল্যাণের কারণ হইতে পারে? তখন এই আয়াত নাখিল হয়: **وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ**

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি আমার কোন বন্ধুকে অপমান করে, সে আমার সহিত লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হয়। আমি আমার বন্ধুদের সহায়তা করিতে এমন ক্রোধান্বিত হই, যেমন ক্রুদ্ধ বাঘ। আর কোন বান্দা ফরজ এবাদত দ্বারা যত বেশী আমার নৈকট্য হাসিল করিতে পারিবে, অন্য কোন জিনিস দ্বারা উহার চেয়ে বেশী নৈকট্য হাসিল করিতে পারিবে না। (অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা যে সমস্ত বিষয় ফরজ করিয়া দিয়াছেন, উহা পালন করিলে যত নৈকট্য হাসিল হয়, অন্য কোন বিষয় দ্বারা তাহা হয় না। নফল এবাদত দ্বারা দ্বিতীয় পর্যায়ে নৈকট্য হাসিল হয়।)

আর নফল এবাদত দ্বারা বান্দা আমার নৈকট্য হাসিল করিতে থাকে। (নফল এবাদত যত বেশী হইতে থাকে, নৈকট্যও তত বৃদ্ধি পাইতে থাকে।) এমনকি, সে আমার প্রিয় হইয়া যায়। যখন সে আমার প্রিয় হইয়া যায়, তখন আমি তাহার চোখ, কান, হাত এবং সাহায্যকারী হইয়া যাই। যদি সে আমাকে ডাকে; আমি তাহার ডাকে সাড়া দেই। যদি সে আমার নিকট

কিছু চায় ; আমি তাহার সওয়াব পূরণ করিয়া দেই। আমি যখন কিছু করিতে ইচ্ছা করি, তখন উহাতে আমার এত ইতস্তত হয় না, যত ইতস্ততা কোন মুমিন বাস্তার ক্রম কবজ করিতে হয়। কেননা, সে (কোন কারণে) মৃত্যুকে পছন্দ করিতেছে না, আর আমি তাহার মন খারাপ করিতে চাই না। কিন্তু মৃত্যু অবধারিত। আমার কোন কোন বাস্তা বিশেষ ধরনের এবাদতের প্রতি আগ্রহী থাকে। কিন্তু আমি তাহাকে ঐ এবাদতের সুযোগ এইজন্য দেই না যে, উহার কারণে তাহার মধ্যে অহংকার পয়দা হইবে। আমার কোন কোন বাস্তা এমন রহিয়াছে যে, সুস্থতাই তাহাদের ঈমানকে সঠিক রাখিতে পারে। আমি যদি তাহাদেরকে অসুস্থ করিয়া দেই, তবে তাহাদের অবস্থা খারাপ হইয়া যাইবে। আর কোন কোন বাস্তা এমন রহিয়াছে যে, অসুস্থতাই তাহাদের ঈমানকে সঠিক রাখিতে পারে। আমি যদি তাহাদেরকে সুস্থ করিয়া দেই, তবে তাহারা নষ্ট হইয়া যাইবে। আমি আমার বাস্তাদের অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা করিয়া থাকি। কেননা, আমি তাহাদের দিলের অবস্থা সম্পর্কে অবগত এবং পুরাপুরি খবর রাখি।

(দুররে মানসুর)

এই হাদীসে গভীরভাবে চিন্তা করিবার বিষয় রহিয়াছে। কেননা, ইহাতে সৃষ্টির রহস্য বর্ণিত হইয়াছে। ইহার অর্থ এই নয় যে, কেহ যদি দরিদ্র হয়, তবে তাহাকে আমাদের সাহায্য করার প্রয়োজন নাই। কেহ যদি অসুস্থ হয়, তবে তাহার চিকিৎসার প্রয়োজন নাই। যদি এই অর্থ হয়, তবে সদকা ও দান-খয়রাত সম্পর্কিত সকল হাদীস ও আয়াত বেকার হইয়া যাইবে। যে সমস্ত হাদীসে চিকিৎসা করার হুকুম রহিয়াছে, উহাও বেকার হইয়া যাইবে। বরং ইহার অর্থ এই যে, সৃষ্টির এই ধারা তো চলিতেই থাকিবে। কোন অভিজ্ঞ ডাক্তার অথবা স্বাস্থ্য সংরক্ষণ কেন্দ্র যদি ইহা চায় যে, কেহ অসুস্থ না হউক, তবে ইহা অসম্ভব। কোন রাষ্ট্র যদি এই চেষ্টা করে যে, কেহ গরীব না থাক, ইহা কখনও হইতে পারে না। এইজন্য আমাদের প্রতি নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী তাহাদের প্রতি সহানুভূতি, সাহায্য-সহযোগিতা এবং চিকিৎসা করার হুকুম রহিয়াছে। যে ব্যক্তি যত বেশী চেষ্টা করিবে, তাহার তত বেশী সওয়াব ও পুরস্কার হইবে, দুনিয়া ও আখেরাতে সে তত বেশী বদলা পাইবে। কিন্তু শত চেষ্টা সত্ত্বেও যদি কোন অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ না হয়, চেষ্টা সত্ত্বেও যদি কাহারও আর্থিক অবস্থা ভাল না হয়, তবে ইহা বুঝিয়া লইতে হইবে যে, আল্লাহ তায়ালার নিকট আমার জন্য ইহার মধ্যেই কল্যাণ রহিয়াছে। কাজেই ইহাতে পেরেশান হওয়ার ও ঘাবড়ানোর কারণ নাই। আর যেহেতু গায়েবের জ্ঞান খবর

নাই এবং সৃষ্টির অদৃশ্য বিষয়ের উপর আমল করার জন্য আমাদের প্রতি
হুকুম করা হয় নাই, কাজেই নিজের চেষ্টা, চিকিৎসা, সাহায্য,
সহানুভূতি ও সহযোগিতা বেশী হইতে বেশী করা চাই। আল্লাহ তায়ালা
পছন্দ ও সন্তুষ্টির কাজে তিনিই তওফীকদাতা।

⑧ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ
اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا
تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ
إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ
فِي الْأَرْضِ ط إِنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ○
(قصص - ১৮)

ওরত্বে জরুরী আল্লাহর যত্নে
এস মিলে মিলে আশ্রয়
দিয়ে এটা পক্ষ (আমল
ফরমোশ্‌ ডক্‌ জিস
তৈরী হইল) কিসে
করা (একটুকু
দিয়ে মিলে মিলে
করুন) (১৮)

⑧ আর তোমাকে আল্লাহ তায়ালা যেই পরিমাণ দান করিয়াছেন,
উহাতে পরকালেরও অনুেষণ কর। আর দুনিয়া হইতে নিজ অংশ
(আখেরাতে লইয়া যাইতে) ভুলিয়া যাইও না, আল্লাহ তায়ালা যেইরূপ
তোমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন, তুমিও (বান্দাদের প্রতি) অনুগ্রহ কর।
(আল্লাহ তায়ালা নাকরমানি ও তাহার হক নষ্ট করিয়া) দুনিয়াতে
ফ্যাসাদ সৃষ্টি করিও না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীকে
পছন্দ করেন না। (কাসাস : ৭৭)

ফার্সী : ইহা মুসলমানদের পক্ষ হইতে কারুনকে যে নসীহত করা
হইয়াছে, উহার বিবরণ, যাহা কুরআন পাকে বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ণ ঘটনা
পঞ্চম পরিচ্ছেদের ৩ নম্বর আয়াতে যাকাত আদায় না করার বর্ণনায়
আসিতেছে। সুদী (রহঃ) বলেন, আখেরাত অনুেষণ করার অর্থ হইল,
দান-ব্যয়্যাত করা, আল্লাহ তায়ালা নৈকট্য হাসিল করা এবং
আত্মীয়-স্বজনের সহিত সম্পর্ক বজায় রাখা।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, দুনিয়া হইতে নিজের অংশ
ভুলিও না—ইহার অর্থ হইল, দুনিয়াতে আল্লাহ তায়ালা জন্য আমল
করাকে ছাড়িও না।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, দুনিয়াতে আল্লাহ তায়ালা এবাদত করা ;

ইহা দুনিয়াতে নিজের অংশ, যাহার সওয়াব আখেরাতে পাওয়া যাইবে।

হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, প্রয়োজন পরিমাণ নিজের জন্য রাখিয়া অবশিষ্ট যাহা থাকে, উহা খরচ করিয়া দেওয়া এবং ভবিষ্যতের জন্য পাঠাইয়া দেওয়া—ইহা হইল, দুনিয়াতে নিজের অংশ।

অন্য এক রেওয়াজাতে আছে, এক বৎসরের খরচ রাখিয়া বাকী সব দান করিয়া দেওয়া। (দুররে মানসুর)

মানুষের জন্য দুনিয়া হইতে তাহার আখেরাতের অংশকে ভুলিয়া যাওয়া, নিজের উপর চরম পর্যায়ের জুলুম।

হযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কিয়ামতের দিন মানুষকে আল্লাহ তায়ালা সন্মুখে মেশ শাবকের ন্যায় (দুর্বল ও তুচ্ছ হিসাবে) উপস্থিত করা হইবে। তাহাকে আল্লাহ তায়ালা সন্মুখে দাঁড় করানো হইবে ; সেখানে জিজ্ঞাসা করা হইবে—আমি তোমাকে সম্পদ দিয়াছিলাম, ধন-দৌলত দিয়াছিলাম, তামার উপর বড় বড় অনুগ্রহ করিয়াছিলাম। তুমি আমার নেয়ামতসমূহ দ্বারা কি কাজ করিয়াছ? সে আরজ করিবে, হে আল্লাহ! আমি অনেক সম্পদ জমা করিয়াছি, উহাকে খুব বৃদ্ধি করিয়াছি। যেই পরিমাণ সম্পদ ছিল, উহা হইতে অনেক বেশী বৃদ্ধি করিয়া দুনিয়াতে রাখিয়া আসিয়াছি। আপনি আমাকে দুনিয়াতে ফেরত পাঠাইয়া দিন, আমি ঐ সমস্ত কিছু নিজের সঙ্গে লইয়া আসিব। এরশাদ হইবে, ঐ সম্পদ দেখাও যাহা সঞ্চয় করিয়া ভবিষ্যতের জন্য পাঠাইয়াছিলে। সে পুনরায় উহাই আরজ করিবে, আমি প্রচুর সম্পদ জমা করিয়াছি এবং বৃদ্ধি করিয়াছি। যেই পরিমাণ ছিল, উহা হইতে অনেক বেশী বৃদ্ধি করিয়া রাখিয়া আসিয়াছি, আপনি আমাকে ফেরত পাঠাইয়া দিন। আমি ঐ সমস্ত সম্পদ সাথে লইয়া আসিব। পরিশেষে যখন তাহার নিকট এইরূপ সঞ্চিত কোন সম্পদ থাকিবে না ; যাহা সে ভবিষ্যতের জন্য পাঠাইয়াছিল, তখন তাহাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। (মিশকাত)

এই হইল, আল্লাহ তায়ালা ও তাহার পাক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ। অত্যন্ত গভীর চিন্তা এবং খুবই যত্ন সহকারে আমল করিবার বিষয় ; সাধারণভাবে পড়িয়া ছাড়িয়া দেওয়ার বিষয় নয়। দুনিয়ার এই জীবন যাহা একেবারে স্বপ্নের মত ; অত্যন্ত যত্ন সহকারে আখেরাতের প্রস্তুতির জন্য ইহাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে কর। আর যত বেশী কামাই করিতে পার, কামাই করিয়া লও। আল্লাহ তায়ালা আমাকেও তৌফীক দান করুন। আমীন।

① هَآئِنْتُمْ لَمْ تَكُونُوا تَدْعُونَ
 لِنُفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ بِهِ وَمَنْ
 يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَنْ
 نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَ
 أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ وَ إِنْ
 تَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا
 خَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا
 أَمْثَلَكُمْ ○ (محمد - ۴۷)

تم لوگ ایسے جو کہ تم کو اللہ کی راہ میں تمنا
 (س) خرچہ کرنے کو بوجھ یا تاجہ مہاس پر
 بھی تم میں سے بعض آدمی بخل کرنے لگے ہیں
 (اگر زیادہ اچھا یا تاڑ کیا کہتے) اور جو شخص
 بخل کرتا ہے وہ خود اپنے ہی بخل کا نام
 لاس لے گا اللہ کے راستے میں خرچہ کرنے کا
 نسخہ اسی کو ملے (اللہ تعالیٰ ترغیب دلا رہا
 کہ تم باہر سے ملنے کی پٹیاں نہیں) اور تم محتاج
 ہو (دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی) اور

اسی لئے تمہیں صدقہ کا حکم دیا جاتا ہے کہ اس کا نفع تمہیں کو پہنچتا ہے (لہذا اگر تم اللہ تعالیٰ کے احکام سے روگدانی کرو گے تو خدا تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم پر یہاں کہ جسے گناہ اور پھر وہ تم جیسے (روگدانی کرنے والے) نہ ہوں گے (بلکہ نہایت فخریہ وار جگہ)

৯) তোমরা এমন যে, তোমাদিগকে আল্লাহর রাস্তায় (সামান্য) খরচ করার জন্য আহ্বান করা হয়, ইহাতেও তোমাদের মধ্য হইতে কেহ কেহ কৃপণতা করে। (যদি বেশী চাওয়া হইত, তবে কি করিত) আর যে কৃপণতা করে, সে স্বয়ং নিজের প্রতিই কৃপণতা করে। (কেননা, আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার ফায়দা তো তাহারই হইত।) আল্লাহ তামালা কাহারো মুখাপেক্ষি নহেন। (তোমাদের সম্পদের প্রয়োজন তাহার নাই।) বরং তোমরা মুখাপেক্ষী (দুনিয়াতেও এবং আখেরাতেও। আর এইজন্যই তোমাদেরকে দান-খয়রাত করার হুকুম করা হয়, যাহাতে উহার ফায়দা তোমরা লাভ করিতে পার)। আর যদি তোমরা (আল্লাহ তামালার হুকুম হইতে) বিমুখ হইয়া যাও, তবে আল্লাহ তামালা তোমাদের স্থলে অন্য জাতিকে পয়দা করিবেন। অতঃপর তাহারা তোমাদের মত (বিমুখ) হইবে না। (বরং অত্যন্ত অনুগত হইবে।) (মুহাম্মদ ৪ ৩৮)

ফায়দা : ইহা স্পষ্ট বিষয় যে, আমাদের দীন-খয়রাতে ও সদকা ইত্যাদির সহিত আব্বাহ তায়ালার কোন স্বার্থ জড়িত নাই। তিনি তাহার পাক কালামে এবং পাক রাসুলের মাধ্যমে যত উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন, উহা আমাদেরই ফায়দার জন্য করিয়াছেন। যেমন, প্রথম পরিচ্ছেদে

দান-খয়রাতের মধ্যে দ্বীনী ও দুনিয়াবী অনেক ফায়দার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। যখন একজন বাদশাহ, মালিক ও সৃষ্টিকর্তা কোন ব্যক্তিকে এমন কাজের হুকুম করেন ; যাহার মধ্যে হুকুমদাতার কোন স্বার্থ নাই, বরং যাহাকে হুকুম করা হইয়াছে, তাহারই স্বার্থ রহিয়াছে, এতদসঙ্গেও যদি সে হুকুম অমান্য করে, তবে নিঃসন্দেহে ইহার পরিণতিতে তাহার যত ভোগান্তিই হউক না কেন, তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এক হাদীসে আছে, আল্লাহ তায়ালা অনেক লোককে নেয়ামতসমূহ এইজন্য দান করেন, যেন সে মানুষের উপকার করে। যতদিন তাহারা এইরূপ করিতে থাকে ঐ সমস্ত নেয়ামত তাহাদের নিকট থাকে। আর যখন অবাধ্যতা করিতে আরম্ভ করে, তখন আল্লাহ তায়ালা ঐ সমস্ত নেয়ামত হিনাইয়া লইয়া অন্যদেরকে দান করেন। (কান্য়)

আর এই সমস্ত নেয়ামত শুধু ধন-সম্পদের সহিত সীমাবদ্ধ নয়, মান-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদি সব জিনিসই ইহার অন্তর্ভুক্ত এবং এই সমস্ত কিছুর পরিণতি একই।

কোন কোন হাদীসে আসিয়াছে, যখন এই আয়াত নাযিল হইল, অর্থাৎ তোমরা যদি বিমুখ হও, তবে আল্লাহ তায়ালা অন্য জাতিকে পয়দা করিবেন, তখন সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, হুযূর! ঐ সমস্ত লোক কাহাদের মধ্য হইতে হইবে, যাহারা আমাদের অবাধ্যতার কারণে আমাদের স্থলাভিষিক্ত হইবে? তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হম্বরত সালমান ফারসী (রাযিঃ)এর কাঁধের উপর হাত রাখিয়া এরশাদ করিলেন, এই ব্যক্তি এবং তাহার সম্প্রদায়। ঐ আল্লাহর কসম! যাহার কুদরতী হাতে আমার জীবন, দীন যদি সুরাইয়ার (যাহা কতকগুলি নক্ষত্রের সমষ্টির নাম) উপরও থাকিত, তবু পারস্যের কিছু লোক সেখান হইতেও দীনকে লইয়া আসিত। এই বিষয়টি বিভিন্ন রেওয়াজাতে বর্ণিত হইয়াছে। (দুররে মানসূর)

অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা তাহাদেরকে দ্বীনের এত উর্ধ্বগতি দান করিয়াছিলেন যে, দীন ও এলেম যদি সুরাইয়া নক্ষত্রের উপরেও থাকিত, তবে সেখান হইতেও হাসিল করিত। এই বর্ণনা তিরমিযী শরীফ হইতে মিশকাত শরীফে নকল করা হইয়াছে। অনুরূপ, অন্য একটি রেওয়াজাতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে অনারব লোকদের কথা আলোচনা করা হইল। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আমার তাহাদের উপর অথবা তাহাদের মধ্য হইতে

কাহারও উপর তোমাদের চেয়ে অথবা তোমাদের মধ্য হইতে কাহারো চেয়েও বেশী আস্থা রহিয়াছে। (মিশকাত)

প্রকাশ থাকে যে, অনারবদের মধ্যে কোন কোন বুয়ুর্গ এমন উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন জন্মলাভ করিয়াছেন, যাহারা সাহাবী হওয়ার ফযীলত ছাড়াও অন্যান্য বহু উচ্চ গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন।

হযরত সালমান ফারসী (রাযিঃ)এর অনেক ফযীলত হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে। আর হওয়াও চাই, কারণ তিনি সত্য দ্বীনের তালাশে অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছেন। বহু দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছিলেন। তাহার বয়স আড়াইশত বৎসর হওয়ার ব্যাপারে কোন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির দ্বিমত নাই। কেহ কেহ সাড়ে তিনশত বৎসরও বলিয়াছেন। আবার কেহ আরও বেশী বলিয়াছেন। এমনকি কেহ বলিয়াছেন, তিনি হযরত ঈসা (আঃ)এর যুগও পাইয়াছিলেন।

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত ঈসা (আঃ)এর যমানার মধ্যে ছয়শত বৎসরের ব্যবধান ছিল। তিনি পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহ হইতে শেষ নবী হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেরিত হওয়ার বিষয় জানিয়াছিলেন। তিনি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তালাশে বাহির হইলেন। পাদ্রীদের এবং ঐ যমানার পণ্ডিতদের নিকট হইতে সন্ধান লইতে থাকিলেন। তাহারা তাহাকে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অতিসত্ত্বর জন্মগ্রহণ করার সুসংবাদ ও তাহার পরিচয় বলিয়া দিতে থাকিল। তিনি পারস্যের শাহজাদাদের মধ্যে একজন ছিলেন। শেষ নবীর সন্ধানে বিভিন্ন দেশে ঘুরিয়া ফিরিতেছিলেন। জনৈক ব্যক্তি তাহাকে বন্দী করিয়া গোলাম বানাইয়া বিক্রয় করিয়া দিল। অতঃপর তিনি এইভাবে বার বার বিক্রয় হইতেছিলেন। তিনি নিজেই বলেন—

বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, আমাকে দশজনেরও অধিক মনিব খরিদ করিয়াছে এবং বিক্রয় করিয়াছে। সর্বশেষে মদীনা শরীফের একজন ইহুদী তাহাকে খরিদ করিয়াছে। তখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করিয়া মদীনায় পৌঁছিয়াছিলেন। খবর পাইয়া তিনি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন। যে সমস্ত আলামত বলা হইয়াছিল, উহা যাচাই করিলেন এবং পরীক্ষা করিলেন। অতঃপর মুসলমান হইয়া গেলেন এবং ইহুদী মনিবকে ফিদিয়া দিয়া (অর্থাৎ, বিনিময় প্রদান করিয়া) মুক্তি লাভ করিলেন।

এক হাদীসে আছে. হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ

করিয়েছেন, আল্লাহ তায়ালা চার ব্যক্তিকে ভালবাসেন, তন্মধ্যে একজন সালমান (রাযিঃ)ও রহিয়েছেন। (এসাবা)

ইহার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ তায়ালা অন্য কাহাকেও ভালবাসেন না ; বরং অর্থ হইল, এই চারজন আল্লাহ তায়ালা প্রিয় লোকদের মধ্যে রহিয়েছেন।

অন্য এক হাদীসে আছে, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়েছেন, প্রত্যেক নবীর জন্য আল্লাহ তায়ালা সাতজন নাজীব বানাইয়াছেন, (অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা মকবুল বান্দাদের দ্বারা গঠিত বিশিষ্ট জামাত। যাহারা সেই নবীর জাহেরী ও বাতেনী যাবতীয় কাজের তদারকী করেন এবং সাহায্য-সহযোগিতা করেন।) কিন্তু আমার জন্য আল্লাহ তায়ালা চৌদ্দজন নাজীব নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। কেহ আরজ করিল, তাহারা কাহারা? (এই রেওয়ায়াত বর্ণনাকারী) হযরত আলী (রাযিঃ) বলিলেন, আমি (অর্থাৎ হযরত আলী), আমার দুই পুত্র (হযরত হাসান (রাযিঃ), হযরত হুসাইন (রাযিঃ)), হযরত জাফর (রাযিঃ), হযরত হামযা (রাযিঃ), হযরত আবু বকর (রাযিঃ), হযরত উমর (রাযিঃ), হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের (রাযিঃ), হযরত বেলাল (রাযিঃ), হযরত সালমান (রাযিঃ), হযরত আম্মার (রাযিঃ), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ), হযরত আবু যর গিফারী (রাযিঃ), হযরত মিকদাদ (রাযিঃ)।

(মিশকাত)

এই সাহাবীগণের অবস্থা পর্যালোচনা করিলে ইহা স্পষ্ট হইয়া যায় যে, স্বীনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাহাদের বিশিষ্ট অবদান রহিয়াছে।

বুখারী শরীফে আছে, যখন সূরায়ে জুমআর এই আয়াত নাযিল হয় :
 وَأَخْرَجْنَا مِنْهُمْ لَمَّا يَلْعَقُوا رِيحَهُمْ
 ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই সমস্ত লোক কাহারা? হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিরব রহিলেন। সাহাবীগণ বারবার জানিতে চাহিলেন। এইভাবে তাহারা তিনবার জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সালমান ফারসী (রাযিঃ)এর উপর হাত রাখিয়া বলিলেন, ঈমান যদি সুরাইয়া নফত্রের উপর থাকিত, তবে ইহাদের মধ্য হইতে কোন কোন ব্যক্তি সেখান হইতেও তাহা লইয়া আসিত।

অন্য এক হাদীসে আছে, এলেম যদি সুরাইয়ার উপর থাকিত। আর এক বর্ণনায় আছে, স্বীন যদি সুরাইয়ার উপর থাকিত, তবে পারস্যের কিছু লোক সেখান হইতেও লইয়া আসিত। (ফতহুল বারী)

শাফেয়ী মাযহাবের বিজ্ঞ আলেম আল্লামা সুফুতী (রহঃ) বলেন, এই হাদীস হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)এর ফযীলত সম্পর্কে ভবিষ্যত বাণী হিসাবে সহী ও নির্ভরযোগ্য হাদীস। (মুকাদ্দামায়ে আওজ্জয)

۱۰ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ
 فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ
 إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ
 نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى
 اللَّهِ يَسِيرٌ ۝ لَكَيْلًا تَأْسَوْا
 عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا
 بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
 كُلَّ مُنْتَلِيٍّ فَخُودِ الَّذِينَ
 الَّذِينَ يَبْغُلُونَ وَيَأْمُرُونَ
 النَّاسَ بِالْبَغْلِ وَأَمَّا
 يَقُولُ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ
 الْغَمِيدُ ۝ (حدید - ج ۲)
 کسی اترانے والے شیئی باز کو پسند نہیں کرتا (بالخصوص) جو لوگ ایسے ہیں کہ خود بھی بخل کرتے
 ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی تعلیم کرتے ہیں اور جو (اللہ کے سامنے) غصہ کرتے ہیں
 یا دینی کاموں سے (اعراض کر کے) گاتے، تو اللہ تعالیٰ (کا کیا نقصان کرے گا وہ تو) پہلے نیا
 ہے حمد کے لائق۔

১০) পৃথিবীতে বা বিশেষভাবে তোমাদের জ্ঞানের উপর যে কোন মুসীবত আসে, উহা (সবই) সমস্ত জ্ঞান সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে কিতাবে (অর্থাৎ, লওহে মাহফুজে) লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আর ইহা (অর্থাৎ, ঘটবার এত পূর্বে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা) আল্লাহ তায়ালার পক্ষে সহজ কাজ। (ইহা এইজন্য বলিয়া দেওয়া হইয়াছে) যেন তোমরা (সুখ-সচ্ছন্দ্য, সম্পদ অথবা সম্মান প্রভৃতি) যাহা কিছু তোমাদের হাতছাড়া হইয়া যায়, উহার উপর (বেশী) দুঃখ না কর, আর যাহা তোমরা পাও উহার উপর অহংকার না কর। (কেননা, অহংকার তো সে করিতে পারে, যে নিজের যোগ্যতায়

পাইয়াছে। যদি অন্য কাহারও হুকুমে কোন জিনিস পায়, তবে কি কারণে অহংকার করিবে?) আল্লাহ তায়ালা অহংকারী ও উদ্যত লোকদেরকে পছন্দ করেন না; (বিশেষতঃ) যাহারা এইরূপ যে, নিজেও কৃপণতা করে এবং অন্যদেরকে কৃপণতা শিক্ষা দেয়। আর যাহারা (আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা হইতে অথবা দ্বীনী কাজ করা হইতে) বিমুখ হইবে, তাহারা আল্লাহ তায়ালাকে (কি ক্ষতি করিবে, আল্লাহ তো) অভাবমুক্ত এবং প্রশংসনীয়।

(হাদীদ : ২২-২৪)

ফায়দা : বিপদ-আপদে দুঃখ হওয়া তো স্বাভাবিক ব্যাপার। এই আয়াতের উদ্দেশ্য হইল, এত বেশী দুঃখ না হয়, যাহা দ্বীন ও দুনিয়ার সমস্ত কাজকর্ম হইতে ফিরাইয়া রাখে। আর ইহাও স্বভাবজাত বিষয় যে, যখন কোন বিষয় পূর্ব হইতেই নিশ্চিত হইয়া যায় যে, উহা অবশ্যই ঘটবে। কোনরূপ চেষ্টা-তদবীর দ্বারা উহাকে মূলতবী করা যাইবে না, তখন ঐ বিষয়ের উপর দুঃখ-কষ্ট হালকা হইয়া যায়। পক্ষান্তরে, কোন কিছু যদি অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটিয়া যায়, তবে দুঃখ বেশী হইয়া থাকে। এইজন্যই আয়াতে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, মৃত্যু ও জীবন দুঃখ ও আনন্দ এবং সুখ ও বিপদ এইসব জিনিস আমি পূর্ব হইতেই ফয়সালা করিয়া রাখিয়াছি; উহা সেইভাবেই ঘটবে। সুতরাং ইহাতে অহংকার অথবা দুঃখ করিয়া নিজেকে ধ্বংসের মুখে ফেলিয়া দেওয়ার কি কারণ থাকিতে পারে? উক্ত আয়াতে 'মুখতাল' ও 'ফাখুর' এই দুইটি শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। যাহার অর্থ, দাস্তিক, অহংকারী। তন্মধ্যে দাস্তিকতা নিজে নিজেই হইয়া থাকে, অর্থাৎ ইহা অন্য ব্যক্তি ছাড়াও হয়। আর অহংকার অন্যের সম্মুখে, অন্যের মুকাবেলায় হয়।

কোন কোন আলেম লিখিয়াছেন, দাস্তিকতা মানুষের ভিতরগত গুণাবলীর সহিত সম্পর্কিত। আর অহংকার হইল, বাহিরের জিনিসের সহিত সম্পর্কিত। যেমন, সম্পদ, যশ, খ্যাতি ইত্যাদি। (বয়ানুল কুরআন)

হযরত কায'আ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ)কে মোটা কাপড় পরিহিত অবস্থায় দেখিয়া আরজ করিলাম, আমি খোরাসানের তৈরী নরম কাপড় আনিয়াছি। আপনি যদি ইহা পরিধান করেন, তবে আপনার শরীরে এই পোশাক দেখিয়া আমার চক্ষু শীতল হইবে। তিনি বলিলেন, আমার ভয় হয় যে, এই কাপড় পরিধান করিয়া আমি দাস্তিক অহংকারী না হইয়া যাই। (দুররে মানসূর) অর্থাৎ, ইহা পরিধান করার কারণে নাজানি আমার মধ্যে দস্ত ও অহংকার পয়দা হইয়া যায়।

⑪ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُّوا ۚ وَآيَةُ خَزَائِنِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ۚ (منافقین : ۷)

یہی (منافقین) وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ رسول اللہ (ﷺ) کے پاس جمع ہیں، ان پر کچھ خرچہ نہ کرو، یہاں تک کہ وہ (خزانہ) خالی نہ ہو جائے۔ (منافقین : ۷)

یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں سب خزانے آسمانوں کے اور زمینوں کے لیکن یہ منافق (احتمال میں) سمجھتے نہیں ہیں۔

⑫ এই সকल (موناফیکরাہ) ঐ সমস্ত লোক, যাহারা বলে যে, এই সমস্ত লোক যাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আছে, তাহাদের উপর কিছুই ব্যয় করিও না। এমনকি তাহারা নিজেরাই (স্বরচ না পাওয়ার কারণে) ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে) ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িবে। অথচ (এই আহমক লোকেরা জানে না যে,) জমিন ও আসমানের ভাণ্ডারসমূহ আল্লাহ তায়ালাই অধিকারে রহিয়াছে। কিন্তু এই (আহমক) মূনাফিকরা বুঝে না। (মূনাফিকুন : ৭)

কাহাদা : বিভিন্ন রেওয়াযাতে এই বিষয় বর্ণিত হইয়াছে যে, মূনাফিকদের সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তাহার অনুসারীরা বলিল, এই সমস্ত লোক যাহারা ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে রহিয়াছে, তাহাদের সাহায্য বন্ধ করিয়া দিলে ক্ষুধায় অস্থির হইয়া নিজেরাই ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইবে। তখন এই আয়াত নাযিল হইল। অপরদিকে ইহা একটি বাস্তব সত্য এবং প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা ; শতশত বার ইহা পরীক্ষিত হইয়াছে যে, যখনই কোন দ্বীনী কাজের সহিত জড়িত ব্যক্তিদের প্রতি শত্রুতা ও খারাপ ধারণার কারণে লোকেরা অথবা কোন বিশেষ ব্যক্তি সাহায্য বন্ধ করিয়া দিয়াছে, তখনই আল্লাহ তায়ালা আপন অনুগ্রহ ও মেহেরবানীতে অন্য পথ খুলিয়া দিয়াছেন।

প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই কথা নিশ্চিতভাবে বুঝিয়া লইতে হইবে যে, রিযিক আল্লাহ তায়ালা একমাত্র নিজের হাতেই রাখিয়াছেন। কাহারও বাপের ক্ষমতা নাই যে, রিযিক বন্ধ করিবে। তবে যাহারা সাহায্য বন্ধ করিয়া দিয়াছে, তাহারা যেন আখেরাতে আল্লাহ তায়ালা দরবারে জবাবদিহি করিতে প্রস্তুত থাকে। সেখানে না কোন মিথ্যা চলিবে যে,

আমাদের এই উদ্দেশ্য ছিল বা অমুক উদ্দেশ্য ছিল। না কোন ব্যারিষ্টার বা উকিল কাজে আসিবে, মনগড়া হিলা-বাহানা করিয়া আল্লাহ তায়ালার এবং দ্বীনের কাজ হইতে গা বাঁচানোর দ্বারা নিজের পরিণাম খারাপ করা ছাড়া আর কোন ফায়দা হইবে না। ব্যক্তিগত শত্রুতা এবং দুনিয়াবী অসৎ উদ্দেশ্যের কারণে কোন দ্বীনী কাজে বাধা সৃষ্টি করা অথবা দ্বীনের কাজ করে এমন ব্যক্তির সহযোগিতা করা হইতে বিরত থাকা কিংবা অন্যকে বিরত রাখা নিজেরই ক্ষতি করা ছাড়া অন্য কাহারো ক্ষতি হইবে না।

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে এমন সময় সাহায্য করা হইতে এড়াইয়া চলে, যখন তাহার ইয়যত নষ্ট করা হইতেছিল, তাহাকে অপদস্ত করা হইতেছিল, আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তিকে সাহায্য করা হইতে এমন সময় বিরত থাকেন, যখন সে কোন সাহায্যকারীর সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়। (মিশকাত)

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল উম্মতের জন্য আদর্শ। প্রত্যেক কাজে প্রত্যেক উম্মতের ইহা দেখা জরুরী যে, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা কি ছিল। উহার উপর চলিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে।

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল, তিনি শত্রুকে সাহায্য করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। হাদীস ও ইতিহাসের কিতাবে শত শত ঘটনা ইহার উপর সাক্ষ্যস্বরূপ রহিয়াছে। স্বয়ং মুনাফিকদের সর্দার এই আবদুল্লাহ ইবনে উবাই হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যত পারিয়াছে, কষ্ট দিয়াছে ; উহাতে কোন প্রকার কার্পণ্য করে নাই। যেই সফরে উক্ত আয়াত নাযিল হইয়াছিল, সেই সফরেই এই ব্যক্তি বলিয়াছিল, আমরা যখন মদীনায়া পৌঁছিয়া যাইব, তখন সম্মানী লোকেরা (অর্থাৎ, আমরা) ঐ সমস্ত নিচ লোকদেরকে (অর্থাৎ, মুসলমানদেরকে) মদীনা হইতে বাহির করিয়া দিব। কিন্তু এই সমস্ত কিছু সয্বেও সফর হইতে ফিরিয়া আসিবার কয়েকদিন পর যখন সে অসুস্থ হইল, তখন সে তাহার পুত্রকে যে অত্যন্ত পাকা মুসলমান ছিল, বলিল, তুমি যাইয়া হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার নিকট ডাকিয়া আন। তুমি বলিলে তিনি অবশ্যই আসিবেন। সে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া পিতার আবেদন জানাইল। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৎক্ষণাৎ জুতা পরিধান করিয়া সঙ্গে রওয়ানা হইয়া গেলেন। যখন সে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিল, তখন কাঁদিতে লাগিল। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বলিলেন, হে আল্লাহর দূশমন! তুমি কি ঘাবড়াইয়া গিয়াছ? সে বলিল, এই সময় আমি আপনাকে সতর্কবাণী শুনাইবার জন্য ডাকি নাই, বরং এইজন্য ডাকিয়াছি যে, আপনি এখন আমার উপর দয়া করিবেন। এই কথা শুনিয়া হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখে পানি আসিয়া গেল এবং এরশাদ করিলেন, তুমি কি চাও? সে আরক্ত করিল, আমার মৃত্যুর সময় নিকটে আসিয়া গিয়াছে। আমি মারা যাওয়ার পর আপনি আমার গোসল দেওয়ার সময় উপস্থিত থাকিবেন। আপনার পরিহিত পোশাকে আমাকে কাফন দিবেন। আমার জানাযার সহিত কবর পর্যন্ত যাইবেন এবং আমার জানাযার নামায পড়াইবেন। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার সকল আবেদন কবুল করিয়া লইলেন। তখন এই আয়াত **وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ** (তওবা ৪: ৮৪) নাযিল হইল।

(দুররে মানসুর)

এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মুনাফিকদের জানাযার নামায পড়াইতে নিষেধ করিয়া দিলেন। এই ছিল চিরশত্রুর সহিত হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যবহার। আর এই সমস্ত নিচ প্রকৃতির লোকদের প্রতি এই ছিল তাহার দয়া, যাহারা গালি-গালাজ ও দোষ-ত্রুটি অনুেষণ করিতে কখনও কুণ্ঠা বোধ করিত না। আমরা কি কখনও আমাদের শত্রুদের সহিত এইরূপ কোন ব্যবহার করিতে পারি? এই চিরশত্রুর কষ্ট দেখিয়া রহমাতুল্লিল-আলামীনের চোখে পানি আসিয়া গিয়াছে। কুফর অবস্থায় থাকিয়াও যত করমায়োশ করিয়াছে, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিছ দয়াগুণে সব কয়টি পূরণ করিয়াছেন। নিজের মূবারক জামা খুলিয়া তাহার কাফনের জন্য দিয়াছেন। অন্যান্য আবেদনগুলিও পূরণ করিয়াছেন; যদিও তাহার কুফরের কারণে এইগুলি কোন কাজে আসে নাই; বরং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে ভবিষ্যতে এই ধরনের দয়া দেখাইতে নিষেধ করা হইয়াছে।

ہم نے دلوں کو سامان پیش کر کے
ان کی آناش کر دی ہے اگر یہی سنتوں
کیا عمل کہتے ہیں (جیسا کہ) (ای صحیح ہے) ہم
نے بڑے دلوں کی آناش کی تھی جبکہ ای بڑے
دلوں نے آپس میں قسم کھائی اور عہد کیا کہ
اس بڑے کا پیل فوج سے کہ جا کر توڑ دیں گے

۱۲) اِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا
اَعْصَبَ الْجَنَّةُ بِاِذَا اَفْسَمُوا
لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ
وَلَا يَسْتَشْفُونَ ۝ فطاف
عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّنْ رَبِّكَ
وَهُمْ نَائِمُونَ ۝ فَاَصْبَحَتْ

كَالْقَصْرِ ۝ فَتَنَادُوا
مُصْبِحِينَ ۝ أَنْ اْعُدُوا
عَلَىٰ خُرُوجِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
صَٰرِئِينَ ۝ فَاَنْطَلَقُوا
وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ ۝ أَنْ
تَدْخُلَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ
مُسْكِينٌ ۝ وَاعْدُوا عَلَىٰ
خُرُوجِ قَادِرِينَ ۝ فَلَمَّا
رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَّٰلُونَ ۝
بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ۝
قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ
لَكُمْ لَوْ لَا تَسْبَحُونَ ۝
قَالُوا سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّا
كُنَّا ظَالِمِينَ ۝ فَأَقْبَلَ
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
يَتَلَوُّنَ ۝ قَالُوا يُوَيْلَنَا
إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۝ عَسَىٰ
رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا
مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا
رَاغِبُونَ ۝ كَذٰلِكَ الْعَذَابُ
وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ
لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝
(سورة قلم - ع ۱)

اور (ال کو ایسا پختہ یقین تھا کہ) انشا اللہ
بھی نہ کہا۔ پس اس باغ پر آپ کے نب کی طرف
ہے ایک فذاب پھر گیا (جو ایک آگ جی یا
نور) اور وہ لوگ سو رہے تھے۔ پس صبح کو وہ
باغ ایسا رہ گیا جیسا کہ بناوا کھیت کہ خالی
زمین رہ جاتی ہے اور بعض جگہ اس کو کاٹ
کر اس جگہ آگ بھی لگا دی جاتی ہے) پس صبح
کو سو رہے وہ باغ والے ایک دوسرے کو
آوازیں دینے لگے کہ اگر پہل توڑنا ہے تو سو رہ
چلو۔ پس چلتے ہوئے آپس میں چپکے چپکے باتیں
کرتے جا رہے تھے کہ آج کوئی متوجہ تم تک نہ
آنے پائے وہ اپنے خیال میں اس کے روک لینے
پر اپنے آپ کو قادر سمجھ کر چلے (کہ سب کچھ خود
ہی لے آئیں گے) جب وہاں پہنچ کر اس کو دیکھا
تو کہنے لگے کہ ہم راستہ بھول گئے (کہیں اور پہنچ
گئے یہ تو وہ باغ نہیں ہے) لیکن جب قرآن
سے معلوم ہوا کہ یہ وہی جگہ ہے تو کہنے لگے
کہ ہماری قسمت ہی ٹھوٹ گئی۔ اسی میں جو
ایک آدمی (کسی قدم) نیک تھا (لیکن عمل میں
اُن کا شریک و حال تھا) کہنے لگا کہ میں نے تم
سے کہا تھا (کہ ایسی ہنستی نہ کرو۔ غریبوں
کے دینے سے برکت ہوتی ہے اب) اللہ کی
پاک کیوں نہیں بیان کرتے (یعنی تو بڑا متفرد

তাহাদের সহিত শরীক ছিল) বলিতে লাগিল, আমি কি তোমাদিগকে বলিয়াছিলাম না (যে, এইরূপ খারাপ নিয়ত করিও না, গরীবদেরকে দান করিলে বরকত হইয়া থাকে, এখন) কেন আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা কর না? (অর্থাৎ, তওবা এস্তেগফার কর।) বাগানওয়ালারা বলিতে লাগিল, আমাদের রব পবিত্র, নিশ্চয়ই আমরা অপরাধী। অতঃপর একে অপরকে দোষারোপ করিতে লাগিল (যেমন, সাধারণতঃ দেখা যায়, যখন কোন কাজ নষ্ট হইয়া যায়, তখন প্রত্যেকেই অন্যকে অপরাধী বলিতে থাকে)। অতঃপর তাহারা সকলেই বলিতে লাগিল, নিশ্চয়ই আমরা সকলেই সীমালংঘনকারী ছিলাম (কেহই এককভাবে দোষী নয়, ইহা সকলের জন্য উপদেশ ছিল সুতরাং সকলেই তওবা কর, তওবার বরকতে) হয়ত আমাদের রব আমাদেরকে ইহা হইতে উত্তম বাগান দিয়া দিবেন। এখন আমরা তওবা করিতেছি (অতঃপর আল্লাহ তায়ালা সতর্ক করিয়া বলিতেছেন) এইভাবে (দুনিয়ার) শাস্তি হইয়া থাকে (আমি খারাপ নিয়তের কারণে মূল জিনিসকেই ধ্বংস করিয়া দেই) আর আশেরাতের আযাব ইহা অপেক্ষা গুরুতর। কতই না ভাল হইত যদি ইহারা জানিত (যে, গরীবদের সহিত কৃপণতার পরিণাম ভালো নয়)। (কুসুম : ১৭-৩৩)

ফায়দা : আয়াতে উল্লেখিত ঘটনাটি বড় শিক্ষণীয়। যাহারা গরীব-মিসকিন ও অভাবী লোকদেরকে দান না করার অস্বীকার করে, কসম করিয়া প্রতিজ্ঞা করে যে, এই সমস্ত গরীব-মিসকিনদেরকে একটি পয়সাও দিবে না, একবেলা খাবারও দিবে না, এই সকল অযোগ্য লোক কখনও সাহায্য পাওয়ার উপযুক্ত নয়, ইহাদেরকে দান করা অনর্থক, এই ধরনের লোকেরা ইচ্ছাৎ এক সময় তাহাদের সমুদয় সম্পদ হারাইয়া বসে। আর যে সকল নেক লোক এইরূপ আচরণ পছন্দ করে না কিন্তু কার্যতঃ মন রক্ষার্থে তাহাদের সহিত শরীক থাকে, তাহারাও আযাবের হাত হইতে রক্ষা পায় না।

হয়ত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, উক্ত আয়াতসমূহে যে ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা হাবশার অধিবাসী কিছু লোকের ঘটনা। তাহাদের পিতার অনেক বড় বাগান ছিল। তিনি উহা হইতে ভিক্ষুকদেরকেও দান করিতেন। তাহার মৃত্যুর পর সন্তানেরা বলিতে লাগিল, আব্বাজ্ঞান তো নির্বোধ ছিলেন, সবকিছু গরীব-মিসকীনদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিতেন। অতঃপর শপথ করিয়া বলিতে লাগিল, আমরা ভোরেই সমস্ত ফসল কাটিয়া আনিব। কোন ফকিরকে উহা হইতে কিছু দিব না।

হযরত কাতাদা (রহঃ) বলেন, বাগানের মালিকের অভ্যাস ছিল—তিনি এক বছরের খরচা রাখিয়া অবশিষ্ট সব আল্লাহর রাস্তায় বন্টন করিয়া দিতেন। তাহার সন্তানরা তাহাকে এইরূপ করিতে বাধা দিত। কিন্তু তিনি মানিতেন না। যখন তাহার ইন্তেকাল হইল, তখন সন্তানরা এই চেষ্টা করিল; যাহা উপরে বর্ণিত হইয়াছে। অর্থাৎ, গরীব মিসকীনকে না দিয়া সমস্ত সম্পদ কিভাবে রক্ষা করা যায়।

সাইদ ইবনে যুবায়ের (রহঃ) বলেন, এই বাগানটি ইয়ামানের প্রসিদ্ধ শহর সানআ হইতে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত 'যারওয়ান' নামক স্থানে ছিল।

ইবনে জুরাইজ (রহঃ) বলেন, বাগানের উপর যে আযাব আসিয়াছিল উহা জাহান্নাম হইতে আগুনের একটি উষ্ণা ছিল, যাহা উহার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছিল।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, উহা আগুরের বাগান ছিল।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন, নিজেদেরকে গোনাহ হইতে বাঁচাইতে থাক। মানুষ কোন কোন গোনাহ এইরূপ করে, যাহার পরিণামে সে এলেকের একটি অংশ ভুলিয়া যায় (অর্থাৎ, তাহার স্মরণশক্তি খারাপ হইয়া যায় এবং যাহা পড়িয়াছিল তাহা ভুলিয়া যায়)। কোন কোন গুনাহ এমন রহিয়াছে, যাহার কারণে তাহাজ্জুদের সময় ঘুম হইতে উঠিতে পারে না। আবার কোন কোন গোনাহ এমন রহিয়াছে, যাহার কারণে একেবারে হাতের মুঠায় আসা উপার্জনও হাতছাড়া হইয়া যায়। অতঃপর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন : (الاية) فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ তারপর বলিলেন, এই সকল লোক গোনাহের কারণে তাহাদের বাগানের ফসল হইতে বঞ্চিত হইয়া গিয়াছে।

(দুররে মানসূর)

স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কুরআন পাকের অন্য এক আয়াতে এরশাদ করিয়াছেন : وَمَا أَصَابَكُمْ مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ অর্থাৎ, আর তোমাদের উপর যে কোন বিপদ আসে, উহা তোমাদেরই আমলের কারণে আসিয়া থাকে এবং (প্রত্যেক গুনাহের কারণে আসে না; বরং) বহু গোনাহ তো আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করিয়া দেন। (শূরা : ৩০)

হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, আমাকে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, এই আয়াতের তফসীর তোমাকে বলিয়া দিব কি? হে আলী! তোমার উপর যাহাকিছুই আসে, রোগ হউক বা অন্য কোন

প্রকার আঘাব অথবা দুনিয়াবী কোন বিপদ হউক, উহা তোমার নিজেরই হাতের কামাই।

এই বিষয়টি আমি (লেখক) আমার 'এ'তেদাল' নামক কিতাবে বিস্তারিতভাবে লিখিয়াছি। সেখানে দেখিয়া লইবেন।

۱۳) وَأَمَّا مَنْ أَوْفَىٰ كِتَابَهُ
 بِشَمَالِهِ ۖ فَيَقُولُ يَلَيْتَنِي
 لَمْ أَوْفَ كِتَابِيَةَ ۖ وَلَمْ
 أَدْرِ مَا حِسَابِيَةَ ۖ يَلَيْتَهَا
 كَانَتْ الْقَاضِيَةَ ۖ مَا آخِئِي
 عَنِّي مَالِيَةَ ۖ هَلَكَ عَنِّي
 سُلْطَانِيَةَ ۖ خَدُوهُ
 فَعَلُوهُ ۖ ثُمَّ الْجَحِيمَ
 صَلُّوهُ ۖ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ
 ذَرْعًا سَبْعُونَ ذِرَاعًا
 فَاسْلُكُوهُ ۖ إِنَّهُ كَانَ
 لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ۖ
 وَلَا يَحْضُرُ عَلَىٰ طَعَامِ
 الْيَسْكِينِ ۖ فَلَئِنْ لَّمْ
 يَلْمِزْهُ هُمْنَا حَمِيمٌ ۖ
 وَلَا يَلْعَنَهُ إِلَّا مِنْ
 خُسْرَيْنِ ۖ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا
 الْخَاطِئُونَ ۖ (المائدة: ۱)

اور جس شخص کا نامہ اعمال اس کے آئیں
 ہاتھ میں دیا جائے گا وہ (نہایت ہی حسرت
 سے) کہے گا کیا اچھا ہوتا کہ مجھ کو میرا نامہ
 اعمال ہی ملتا اور مجھ کو خبر ہی نہ ہوتی کہ
 میرا حساب کیا ہے کیا اچھا ہوتا کہ موت
 ہی سبقت نہ ختم کر دیتی (قیامت ہی نہ آتی
 جو حساب کتاب ہوتا) میرا مال بھی میرے کچھ
 کام نہ آیا۔ میری جاہ (آمد) بھی جاتی رہی۔
 (اس کے لئے فرشتوں کو حکم ہوگا) اس کو پکڑ
 اور اس کو طوق پہنا دو، پھر جہنم میں اسکو
 داخل کر دو، پھر ایک ستر گز لمبی زنجیر میں
 اس کو جکڑ دو۔ اس لئے کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ
 پر ایمان نہ رکھتا تھا (اور خود تو کیا کھاتا)
 دوسرے آدمیوں کو بھی غریب کے کھانے کی ترغیب
 نہ دیتا تھا پس نہ تو کج اس کا کوئی بیان ہوگا
 ہے اور نہ اس کے لئے کوئی چیز کھائے کر ہے
 بجز غنیمت کے جس کو بجز بڑے گناہ گاروں
 کے اور کوئی نہ کھائے گا۔

۱۴) আর যে ব্যক্তির আমলনামা তাহার বাম হাতে দেওয়া হইবে, সে
 (অত্যন্ত আক্ষেপের সহিত) বলিবে, কি উত্তম হইত যদি আমার
 আমলনামা আমাকে দেওয়াই না হইত; আর আমি ইহাও জানিতে না
 পারিতাম যে, আমার হিসাব নিকাশ কি? হায় মৃত্যুই যদি সবকিছু শেষ

করিয়া দিত (যদি কিয়ামতই না হইত, তবে হিসাব নিকাশও হইত না)। আমার ধন-সম্পদ আমার কোন কাজে আসিল না। আমার সম্মান (মান-ইযযত্ত)ও বিলুপ্ত হইয়াছে (এইরূপ লোকদের সম্বন্ধে ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হইবে—) এই ব্যক্তিকে ধর, তাহাকে বেড়ী পরাইয়া দাও, অতঃপর তাহাকে দোযখে দাখিল কর, অতঃপর সত্তর গজ লম্বা একটি শিকলে তাহাকে আবদ্ধ কর। কেননা, এই ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালায় প্রতি ঈমান রাখিত না। (সে নিজে অন্যকে খাওয়ানো দূরের কথা) গরীব-মিসকীনকে খাওয়ানোর জন্য অপরকেও উৎসাহ দান করিত না। অতএব, না আজ এখানে তাহার কোন বন্ধু আছে, আর না তাহার খাওয়ার জন্য গিসলীন অর্থাৎ, ক্ষত-বিধৌত পানি ব্যতীত আর কোন খাওয়ার বস্তু আছে। যাহা বড় গোনাহগারদের ব্যতীত আর কেহ ভক্ষণ করিবে না। (আল-হাক্বাহ : ২৫-৩৭)

ফায়দা : প্রসিদ্ধ অর্থে জখম ইত্যাদিকে ধুইবার পর যে পানি জমা হইয়া যায় উহাকে 'গিসলীন' বলে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জখমের ভিতর হইতে যে রক্ত, পুঁজ ইত্যাদি বাহির হয়, উহাকে গিসলীন বলা হয়।

আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন যে, এক বালতী পরিমাণ গিসলীন যদি দুনিয়াতে ঢালিয়া দেওয়া হয়, তবে উহার দুর্গন্ধে সমগ্র দুনিয়া দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া যাইবে।

নওফে শামী (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, সত্তর গজ লম্বা শিকলের প্রতি গজের পরিমাণ সত্তর বাআ' এবং প্রত্যেক বাআ' এর দৈর্ঘ্য মাক্বা হইতে কুফা পর্যন্ত দূরত্বের সমান।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) ও অন্যান্য মুফাসসিরগণ হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, এই শিকল শুহ্যদ্বারে প্রবেশ করাইয়া নাকের ভিতর দিয়া বাহির করা হইবে। অতঃপর ইহা দ্বারা তাহাকে পাঁচাইয়া দেওয়া হইবে। ফলে, সে একেবারে আবদ্ধ হইয়া যাইবে। (দুররে মানসুর)

উক্ত আয়াতে গরীব-মিসকীনদেরকে খাদ্যদ্রব্য খাওয়ানোর জন্য উৎসাহ প্রদান না করার উপরও শাস্তির কথা বলা হইয়াছে। এইজন্য পরম্পর আত্মীয়-স্বজন আপনজন বন্ধু-বান্ধব এবং যাহাদের সহিত সাক্ষাৎ হয় সকলকে দরিদ্র পালন, গরীব-মিসকীনকে খাবার প্রদানের জন্য বিশেষভাবে উৎসাহ প্রদান করা চাই। এইভাবে অন্যদেরকে উৎসাহিত করিলে নিজের ভিতর কৃপণতার স্বভাবও কমিয়া যাইবে।

১৭) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

বড়ী খবর! যে এই শব্দটি বলে, সে পাপ থেকে মুক্তি পাবে।
 এটি হল আল্লাহর নাম, যা দিয়ে শুরু করা হয়।
 এটি হল আল্লাহর নাম, যা দিয়ে শুরু করা হয়।
 এটি হল আল্লাহর নাম, যা দিয়ে শুরু করা হয়।
 এটি হল আল্লাহর নাম, যা দিয়ে শুরু করা হয়।
 এটি হল আল্লাহর নাম, যা দিয়ে শুরু করা হয়।
 এটি হল আল্লাহর নাম, যা দিয়ে শুরু করা হয়।
 এটি হল আল্লাহর নাম, যা দিয়ে শুরু করা হয়।
 এটি হল আল্লাহর নাম, যা দিয়ে শুরু করা হয়।
 এটি হল আল্লাহর নাম, যা দিয়ে শুরু করা হয়।
 এটি হল আল্লাহর নাম, যা দিয়ে শুরু করা হয়।

وَيَلِّحُ لِحْوَ هَمَزَةٍ
 لَمْزَةٍ ۝ بِالَّذِي جَنَعَ
 مَالًا وَعَدَّدَهُ ۝ يُغَسِّبُ
 أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۝ كَلَّا
 لَيَكْبَدَنَّ فِي الْعُطْمَةِ ۝
 وَمَا أَذْرَكَ مَا الْعُطْمَةُ ۝
 نَامُ اللّٰهُ الْمُؤَقَّدَةُ الَّتِي
 تُطْلِعُ عَلَى الْآفِيْدَةِ ۝
 إِنَّمَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ ۝
 عَمْدٌ قَمْدَدَةٌ ۝ (البقرة)

১৪) অতিশয় ধ্বংস রহিয়াছে এমন ব্যক্তির জন্য, যে অগোচরে নিদ্রা করে, সাক্ষাতে শিকার দেয়। যে সম্পদ জমা করিয়া রাখে এবং (অত্যধিক লোভের কারণে) উহাকে বারবার গণনা করে, সে মনে করে যে, তাহার এই সম্পদ তাহার নিকট চিরকাল থাকিবে। কখনও না (এই সম্পদ চিরকাল থাকিবে না) আল্লাহর কসম! এই ব্যক্তি এম- হইবে যে, উহাতে যাহা কিছু পতিত হয়, সেই আগুন উহাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলে। আমাদের কি জানা আছে, সেই চূর্ণ-বিচূর্ণকারী অগ্নি কিরূপ? উহা আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত অগ্নি, যাহা হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত পৌছিয়া যাইবে (অর্থাৎ, দুনিয়ার আগুন তো শরীরের কোন জায়গায় লাগিলে মানুষ মরিয়া যায়, আর সেখানে যেহেতু মৃত্যু নাই, এইজন্য শরীরে লাগিবার সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত পৌছিয়া যাইবে। আর হৃদয়ের সামান্য আঘাতও মানুষের তীব্রভাবে অনুভূত হয়)। আর সেই আগুন তাহাদের উপর আবদ্ধ করিয়া

দেওয়া হইবে, সুদীর্ঘ স্তম্ভসমূহের মধ্যে বেষ্টিত হইবে। (হুমাযাহ)

ফায়দা : 'হুমাযাহ লুমাযাহ' এই দুই শব্দের তফসীরে উলামায়ে কেরামের বিভিন্ন উক্তি রহিয়াছে। তন্মধ্যে একটি তফসীর উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) ও মুজাহিদ (রহঃ) হইতে হুমাযাহ শব্দের অর্থ ভৎসনাকারী আর লুমাযাহ শব্দের অর্থ গীবতকারী বর্ণিত হইয়াছে।

ইবনে জুরাইজ (রহঃ) বলেন, হুমাযাহ ইঙ্গিত দ্বারা হয়, চোখ মুখ হাত অথবা যে কোন অঙ্গের দ্বারা হইতে পারে। আর লুমাযাহ শুধু মুখের দ্বারা হয়।

একবার হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার মেরাজের অবস্থা বর্ণনাকালে এরশাদ করিলেন, আমি পুরুষদের একটি দল দেখিয়াছি, যাহাদের শরীর কাঁচি দ্বারা কাটা হইতেছিল। আমি জিবরাঈল (আঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই সমস্ত লোক কাহারো? তিনি বলিলেন, ইহারা ঐ সমস্ত লোক, যাহারা সাজসজ্জা অবলম্বন করিত (অর্থাৎ, অপকর্মের জন্য সাজসজ্জা করিয়া বাহির হইত)। অতঃপর আমি একটি কুয়া দেখিলাম। যাহার ভিতর হইতে ভীষণ দুর্গন্ধ আসিতেছিল এবং উহার ভিতর হইতে চিৎকারের আওয়াজ আসিতেছিল। আমি জিবরাঈল (আঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই সমস্ত লোক কাহারো? তিনি বলিলেন, ইহারা ঐ সমস্ত মেয়েলোক, যাহারা (অপকর্মের জন্য) সাজসজ্জা করিত এবং হারাম কাজে লিপ্ত হইত। অতঃপর আমি কিছুসংখ্যক ঝুলন্ত নারীপুরুষকে দেখিলাম। তাহারা স্তনের মাধ্যমে ঝুলিয়া রহিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহাদের পরিচয় কি? জিবরাঈল (আঃ) বলিলেন, ইহারা ভৎসনাকারী ও পরনিন্দাকারী। (দুররে মানসুর)

আল্লাহ তায়ালা আপন অনুগ্রহে আমাদেরকে এইসব বিষয় হইতে হেফাজতে রাখুন। কেননা, ইহাতে বড় কঠিন ধমকিও রহিয়াছে। উক্ত সূরাতে বিশেষভাবে কপণতা ও লোভের নিন্দা করা হইয়াছে। কপণতার কারণে সম্পদ জমা করিয়া রাখে আর লোভের কারণে বারবার গণনা করিতে থাকে; যেন কম না হইয়া যায়। উহার সহিত এত মহাবত হইয়া যায় যে, বারবার গণনা করিতেও মজা লাগে। এইরূপ মন্দ অভ্যাস বড়াই ও অহংকারের কারণ হয়। ইহাতে অন্যের দোষ অনুেষণ ও দোষারোপ করার স্বভাব পয়দা হয়। এইজন্য সূরার শুরুতে এইসব দোষের প্রতি সতর্ক করার পর এই মন্দ অভ্যাসের নিন্দা করা হইয়াছে। প্রত্যেকেই এই ধারণায় মত্ত রহিয়াছে যে, অর্থ-সম্পদ বৃদ্ধি পাইলে বিপদ-আপদ ও

দুখটনা হইতে রক্ষা হইবে। তাহারা মনে করে, যেন মালদারদের মতু আসেই না। এই কারণে উক্ত আয়াতে সতর্ক করা হইয়াছে। বহু ঘটনা দ্বারা ইহার সমর্থন পাওয়া যায় যে, যখন কোন বিপদ-আপদ আসিয়া পড়ে, তখন এই সমস্ত অর্থ-সম্পদ কোন কাজে আসে না, বরং সম্পদের প্রাচুর্য অনেক সময় বিপদ টানিয়া আনে। কেহ বিষ প্রয়োগের ফিকিরে থাকে, কেহ হত্যা করিবার পায়তারা করে, লুট-তরাজ, চুরি-ডাকাতি, এমনি ধরনের শত শত আপদ এই সম্পদের কারণে মানুষের উপর আসিয়া পতিত হয়। অর্থ-সম্পদ যখন বেশী হইয়া যায়, তখন আত্মীয় স্বজন, স্ত্রীপুত্র সকলেই মনে মনে কামনা করে যে, এই বৃদ্ধ কখন মরিবে আর সমুদয় সম্পদ আমাদের হাতে আসিয়া যাইবে।

①৫ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱. اَسَاءَتِ الَّذِي يَكْذِبُ ۲. بِالَّذِي ۞ فَاِنَّكَ الَّذِي ۳. يَدْعُ الْيَتِيمَ ۞ وَلَا يَحْضُ ۴. عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ ۞ ۵. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۞ الَّذِينَ ۶. هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۞ ۷. الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ۞ ۸. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۞	১. কি আপনাদের ঐশ্বর্য্য কোন্‌ কিসের ২. দ্বারা হইয়াছে? (যিনি মিথ্যা ৩. কথন বলে) ৞ ফলস্বরূপ তুমি ৪. যিনি যত্ন নেন না (যিনি) ৫. (যিনি) দরিদ্রের খাদ্যে ৬. (যিনি) দরিদ্রের খাদ্যে ৭. (যিনি) দরিদ্রের খাদ্যে ৮. (যিনি) দরিদ্রের খাদ্যে

হী নবীস)

①৫ আপনি কি সেই লোকটিকে দেখিয়াছেন? যে কিয়ামতের দিনকে অবিশ্বাস করে। (তাহার অবস্থা এই যে,) সে এতীমকে ধাক্কা দেয় আর গরীবকে (নিজে কিছু দান করা তো দূরের কথা, অন্যদেরকেও তাহাদেরকে) খাবার দিতে উৎসাহ প্রদান করে না। অতএব, সর্বনাশ এইরূপ নামাযীদের জন্য যাহারা নিজেদের নামাযকে ভুলিয়া থাকে। (অর্থাৎ, নামায পড়ে না, আর যদি কখনও পড়েও তবে) রিয়াকারী করে এবং মাউন (অর্থাৎ, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস দান করা) হইতে বিরত থাকে (একেবারেই দেয় না)। (মাউন)

ফারদা : হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, এতীমকে ধাক্কা দেওয়ার অর্থ হইল, তাহার হক দেয় না।

কাতাদা (রহঃ) বলেন, এতীমকে ধাক্কা দেওয়ার অর্থ, তাহার প্রতি জুলুম করা। আর ইহা কিয়ামতের দিনকে সত্যি মনে না করার কারণে হয়। পক্ষান্তরে, আখেরাতের দিনের উপর যে ব্যক্তির একীন হইবে, আখেরাতের পুরস্কার ও শাস্তির প্রতি যে ব্যক্তি পূর্ণ আস্থাশীল হইবে, সে কাহারও উপর জুলুম করিবে না এবং ধন-সম্পদ জমা করিয়া রাখিবে না; বরং খুব খরচ করিবে। কেননা, যে ব্যক্তির এই বিষয়ে পূর্ণ একীন হইয়া যায় যে, আজ যদি আমি এই ব্যবসায় দশ টাকা বিনিয়োগ করি, তবে কাল অবশ্যই এক হাজার টাকা বৈধ উপায়ে লাভ করিব। তখন সে এই ব্যাপারে কখনও দ্বিধা করিবে না। উক্ত আয়াতে যেসব নামাযীর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদের সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, তাহারা মুনাফেক লোক। যাহারা মানুষের সম্মুখে দেখানোর জন্য নামায পড়ে, আর যখন একা হয় তখন নামায ছাড়িয়া দেয়।

হযরত সাদ ও অন্যান্য কয়েকজন হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, নামায ছাড়িয়া দেওয়ার অর্থ দেবী করিয়া পড়া। অর্থাৎ, অসময়ে নামায পড়ে। মাউন শব্দের ব্যাখ্যায় উলামায়ে কেরামের কয়েক রকম উক্তি রহিয়াছে। কোন কোন আলেম হইতে বর্ণিত আছে, উহা দ্বারা যাকাতকে বুঝানো হইয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ উলামা হইতে বর্ণিত ব্যাখ্যায় দৈনন্দিন জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসসমূহকে বুঝানো হইয়াছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, আমরা হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় মাউন বলিতে এই সমস্ত জিনিসকে বুঝিতাম, যথা—কেহ বালতি চাহিলে তাহা দেওয়া, এমনভাবে হাড়ি-পাতিল, কুঠার, দাড়িপাল্লা ; এমনি ধরনের জিনিস একে অপরের নিকট চাহিলে তাহা দেওয়া, যাহা কাজ শেষ করিয়া ফিরাইয়া দিবে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন, মাউন বলিতে ঐ সমস্ত জিনিস বুঝায়, যাহা দ্বারা লোকেরা পরস্পর একে অপরকে সাহায্য করে। যেমন, কুঠার, ডেকচি, বালতি ইত্যাদি। আরও বেশ কিছু রেওয়ামাতে এই বিষয়টি উল্লেখ করা হইয়াছে।

ইকরিমা (রাযিঃ)কে কেহ মাউন শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, ইহার মূল হইতেছে, যাকাত। আর সর্বনিম্ন স্তর হইতেছে চালুনি, বালতি, সুই প্রদান করা। (দুররে মানসুর)

উক্ত সূরায় কয়েকটি বিষয়ে সতর্ক করা হইয়াছে। তন্মধ্যে এতীমদের সম্পর্কে বিশেষভাবে সতর্ক করা হইয়াছে যে, এতীমকে ধাক্কা দিয়া তাড়াইয়া দেওয়া ধ্বংসের কারণসমূহের মধ্যে একটি। অনেক লোক যাহারা এতীমের অভিভাবক হইয়া তাহাদের সম্পদ আত্মসাৎ করিয়া থাকে। যখন এতীম অথবা তাহার পক্ষ হইতে কেহ দাবী করে, তখন তাহাকে ধমক দেওয়া হয়। এইরূপ লোকদের ধ্বংস ও কঠিন শাস্তির ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই, বরং এইরূপ লোকদের সম্পর্কে এই সূরা নাযিল হইয়াছে বলিয়া বর্ণিত রহিয়াছে। কুরআন পাকে এতীমদের ব্যাপারে বহু সতর্কবাণী ও আয়াত নাযিল হইয়াছে। কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করিতেছি, যদ্বারা অনুমান করা যাইবে যে, আল্লাহ তায়ালা কত গুরুত্ব সহকারে বারবার এই বিষয়টির প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন।

وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ ۖ
(বাকারা : ৮৩)

وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
(বাকারা : ১৭৭)

قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ
(বাকারা : ২১৫)

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ
(বাকারা : ২২০)

وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ
(নিসা : ২)

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ
(নিসা : ৩)

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ (অলি قوله) وَلَا تَاْكُلُوْهَا سُرَآءًا وَّيَدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا
(নিসা : ৬)

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ الْآيَةُ
(নিসা : ৮)

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا الْآيَةُ
(নিসা : ১০)

وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ الْآيَةُ
(নিসা : ৩৬)

وَمَا يَتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ الْآيَةُ
(নিসা : ১২৭)

وَأَنْ تَقْرُمُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ
(নিসা : ১২৭)

১০. (আনআম : ১৫২) وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
 ১৪. (বনী ইসরাইল : ৩৪) وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
 ১৫. (হাশর : ৭) مِمَّا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ الْآيَةَ
 ১৬. (দাহর : ৮) وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا الْآيَةَ
 ১৭. (আল ফাজর : ১৭) كَلَّا بَلْ لَا تَكْرَمُونَ الْيَتِيمَ الْآيَةَ
 ১৮. (বালাদ : ১৪) أَوْ اطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ
 ১৯. (ওয়াদুহা : ৬) أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا
 ২০. (ওয়াদুহা : ৯) فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ

এই বিশটি আয়াত নমুনা স্বরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে। আয়াতের সহিত সম্পর্কিত সূরা ও আয়াত নম্বর লিখিয়া দেওয়া হইল। কোন অনুবাদিত কুরআন শরীফ হইতে এই আয়াতগুলি তরজমা সহ দেখিয়া লইলে জানা যাইবে যে, আল্লাহ তায়ালা বারবার বিভিন্নভাবে এই বিষয়ে সতর্ক করিয়াছেন যে, এতীমদের সংশোধন, তাহাদের মঙ্গল কামনা, তাহাদের ধন-সম্পদে সাবধানতা অবলম্বন, তাহাদের সহিত নম্র ব্যবহার, তাহাদের উন্নতির চেষ্টা ; এমনকি যদি কোন এতীম মেয়েকে বিবাহ করা হয়, তবে তাহার মোহরের পরিমাণ কম না করার প্রতিও সতর্ক করা হইয়াছে, অর্থাৎ, অসহায় বলিয়া তাহার মোহর যেন কম না করা হয়।

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বাণী কয়েকটি হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, আমি এবং এতীমের লালন-পালনকারী জান্নাতে এত কাছাকাছি থাকিব ; যেমন এই দুই অঙ্গুলি। এই বলিয়া হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার শাহাদত ও মধ্যমা অঙ্গুলিদ্বয় মিলাইয়া উহার প্রতি ইশারা করিলেন যে, এই দুইটি অঙ্গুলি যেমন পরস্পর কাছাকাছি এবং মিলিত অবস্থায় রহিয়াছে। তদ্রূপ, আমি এবং ঐ ব্যক্তি জান্নাতে কাছাকাছি থাকিব।

কোন কোন আলেম বলিয়াছেন, মধ্যমা অঙ্গুলি শাহাদত অঙ্গুলি হইতে কিছুটা উপরে দেখা যায়। তখন অর্থ দাঁড়াইবে, আমার মর্যাদা নবুয়তের কারণে কিছুটা উপরে থাকিবে এবং উহার কাছাকাছি সেই ব্যক্তির মর্যাদা হইবে।

এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, যে ব্যক্তি কোন এতীমের মাথায় (স্নেহভরে) হাত বুলাইবে এবং কেবল আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি হাসিলের জন্য এইরূপ করিবে, তাহার হাত এতীমের মাথার যতসংখ্যক চুলের উপর পড়িবে, প্রত্যেক চুলের বদলে সে নেকী হাসিল করিবে। আর যে ব্যক্তি কোন এতীম ছেলে অথবা মেয়ের প্রতি দয়া করিবে, আমি এবং সেই ব্যক্তি জাম্মাতে এইরূপ থাকিব। ইহা বলিয়া ঐ দুই অঙ্গুলি দ্বারাই ইশারা করিলেন, যাহা উপরে বর্ণিত হইয়াছে। আরও কয়েকটি হাদীসে বিভিন্নভাবে এই বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। (দুররে মানসূর)

এক হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন কিছু লোক কবর হইতে এমন অবস্থায় উঠিবে যে, তাহাদের মুখ হইতে আগুন বহির হইতে থাকিবে। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই সমস্ত লোক কাহারা হইবে? হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরে উল্লেখিত ৯ নম্বর আয়াতটি তেলাওয়াত করিলেন : **إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى** যাহার অর্থ—যে সমস্ত লোক জুলুম করিয়া এতীমের সম্পদ ভক্ষণ করে, তাহারা নিজেদের পেটে আগুন ভর্তি করে।

মেরাজের রাত্রিতে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সম্প্রদায়কে দেখিলেন, তাহাদের ঠোট উঠের ঠোটের মত বড় বড় এবং তাহাদের উপর ফেরেশতা নিযুক্ত রহিয়াছে। তাহাদের ঠোট ফাঁক করিয়া উহার মধ্যে আগুনের বড় বড় পাথর ঢুকাইতেছে। ফলে, এই আগুন মুখের ভিতর দিয়া প্রবেশ করিয়া গুহ্যদ্বার দিয়া বাহির হইতেছে। আর এই সমস্ত লোক চিৎকার করিয়া কাদিতেছে। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জিবরাঈল (আঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহারা কাহারা? তিনি বলিলেন, ইহারা এতীমের সম্পদ জুলুম করিয়া ভক্ষণ করিত, তাহাদেরকে আগুন খাওয়ানো হইতেছে।

এক হাদীসে আছে, চার প্রকার মানুষ এমন রহিয়াছে, যাহাদেরকে আল্লাহ তায়ালার না জাম্মাতে দাখেল করিবেন, না জাম্মাতের নেয়ামতের স্বাদ উপভোগ করা তাহাদের ভাগ্যে জুটিবে। এক, ঐ ব্যক্তি যে সবসময় মদপান করে, দ্বিতীয়, সুদখোর, তৃতীয়, ঐ ব্যক্তি যে অন্যায়ভাবে এতীমের সম্পদ ভক্ষণ করে, চতুর্থ, ঐ ব্যক্তি যে পিতামাতার অবাধ্যতা করে।

হযরত শাহ আবদুল আযীয (রহঃ) তাঁহার তফসীর গ্রন্থে লিখিয়াছেন, এতীমদের প্রতি দয়া দুই প্রকার—এক প্রকার যাহা ওয়ারিশদের উপর ওয়াজিব, যেমন, তাহার সম্পদের হেফাজত করা। অর্থাৎ, কৃষি অথবা

ব্যবসা ইত্যাদির মাধ্যমে উহা বৃদ্ধি করা। যদ্বারা প্রয়োজনীয় খরচাদি পূরা হইতে পারে। তাহার খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির খোজ-খবর রাখা। এমনভাবে, তাহার লেখাপড়া ও আচার-আচরণ শিখানোর ব্যাপারেও খোজ-খবর রাখা। দ্বিতীয় প্রকার যাহা সাধারণ মানুষের উপর ওয়াজিব। উহা হইল, এতীমকে কষ্ট না দেওয়া, নম্র ও দয়াসুলভ আচরণ করা, সভা-সমিতি ও মজলিসে নিজের কাছে বসান, তাহার মাথায় হাত বুলান, নিজের সন্তানের মত তাহাকে কোলে নেওয়া, তাহার প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করা। কেননা, যখন সে এতীম ও পিতৃহীন হইয়া গিয়াছে, তখন আল্লাহ তায়ালা সকল বান্দাদেরকে হুকুম করিয়াছেন, তাহারা যেন এতীমের সহিত পিতৃভূল্য আচরণ করে এবং তাহাকে নিজের সন্তানের মত মনে করে। যাহাতে পিতার মৃত্যুর কারণে সাময়িকভাবে তাহার যে অসহায় অবস্থা দেখা দিয়াছে, উহা যেন পিতার স্থলে বহ্নলোকের বাস্তব সহযোগিতার কারণে দূর হইয়া যায়। সুতরাং অন্যান্য প্রচলিত আত্মীয়তার সম্পর্কের ন্যায় শরীয়তের দৃষ্টিতে এতীমও আত্মীয়তার সম্পর্কের অধিকার রাখে। (সূরায়ে বাকার)

দ্বিতীয় বিষয়, যাহা উক্ত আয়াতে বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে উহা হইল, গরীব-মিসকীনদের খাওয়ানোর জন্য অন্যদেরকে উৎসাহিত না করার বিষয়ে সতর্ক করা হইয়াছে। ইহা যেন কৃপণতার সর্বনিম্ন পর্যায়ের দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে, অর্থাৎ নিজের সম্পদ খরচ করা তো দূরের কথা, অন্য কেহ গরীব-মিসকীনকে কিছু দান করিবে, সে ইহাও সহ্য করিতে পারে না।

কুরআন পাকে মিসকীনদেরকে খানা খাওয়ানোর বিষয়ে অনেক আয়াতে উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে। তন্মধ্যে কিছু উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে। সূরা আল-ফাজরে আল্লাহ তায়ালা বলেন : **كُلَّا بَلَّ لَا تُكْرِمُونَ** এই আয়াতে ইহার প্রতিও সতর্ক করা হইয়াছে যে, তোমরা না এতীমদেরকে স্নেহ কর, না মিসকীনদেরকে খানা খাওয়ানোর জন্য উৎসাহ প্রদান কর।

তৃতীয় বিষয়, যাহা উক্ত আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে, উহা মাউন প্রদান না করা প্রসঙ্গে। উহার ব্যাখ্যা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। হযরত শাহ আবদুল আযীয (রহঃ) লিখিয়াছেন, এই সূরার নাম সূরায়ে মাউন এইজন্য রাখা হইয়াছে যে, ইহা অনুগ্রহের সর্বনিম্ন স্তর। সর্বনিম্ন পর্যায়ের অনুগ্রহ না করাও যদি অসম্ভবতার কারণ হয়, তবে উক্ত পর্যায় অর্থাৎ

আল্লাহর হক ও বান্দার হক নষ্ট করার ব্যাপার হইতে আরও কত অধিক ভয় করা উচিত। এই পর্যন্ত উক্ত বিষয়ে কুরআন পাকের কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হইয়াছে। এখন এই বিষয়ে কয়েকটি হাদীস লিপিবদ্ধ করা হইতেছে। যদ্বারা জানা যাইবে যে, কৃপণতা ও সম্পদ জমা করিয়া রাখা কত মারাত্মক অপরাধ।

হাদীসসমূহ

① عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبْتَغِي عَافِي فِي مُؤْمِنٍ الْبَغْلُ وَسُوءُ الْخُلُقِ - (رواه الترمذی)

حُضْرَةُ آدَسُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِرْشَادُہُ کہ دُوْخَلَتَیْنِ ایسی ہیں کہ وہ مومن میں جمع نہیں ہو سکتیں۔ ایک تو بخل و دوسری بد خلقی۔

کذا فی مشکوٰۃ

① ছযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দুইটি অভ্যাস এমন রহিয়াছে, যাহা মুমেন ব্যক্তির মধ্যে একত্রিত হইতে পারে না। একটি কৃপণতা, অপরটি চরিত্রহীনতা। (মিশকাত : তিরমিযী)

ফায়দা : অর্থাৎ, কোন ব্যক্তি মুমেন হইয়া কৃপণও হইবে আবার চরিত্রহীনও হইবে, ইহা মুমেন ব্যক্তির জন্য কখনও সাজে না। এমন ব্যক্তির জন্য তাহার ঈমানের চিন্তা করা উচিত। খোদা না করুন, ইহাতে এমন না হয় যে, ঈমান হইতেই বঞ্চিত না হইয়া যায়। কেননা, প্রত্যেক ভাল গুণ যেমন অন্য একটি ভাল গুণকে আকর্ষণ করে, ঠিক তেমনি প্রত্যেক খারাপ গুণ অন্য একটি খারাপ গুণকে আকর্ষণ করে।

অন্য এক হাদীসে ইহা হইতেও কঠোরভাবে ছযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে যে, শুহ (অর্থাৎ, কৃপণতার সর্বোচ্চ প্রকার) ঈমানের সহিত একত্রিত হইতে পারে না। (মিশকাত)

অর্থাৎ, এই দুইটি জিনিস একটি অপরটির বিপরীত হওয়ার কারণে একত্রিত হইতে পারে না। যেমন, আগুন ও পানি। এই দুইটির মধ্যে যাহার শক্তি বেশী হইবে, উহা অপরটিকে ধ্বংস করিয়া দিবে। পানি শক্তিশালী হইলে আগুনকে নিভাইয়া দিবে, আগুন শক্তিশালী হইলে পানিকে জ্বলাইয়া দিবে। তদ্রূপ, ঈমান ও কৃপণতা একটি অপরটির বিপরীত। যেটি শক্তিশালী হইবে, উহা ক্রমশঃ অপরটিকে ধ্বংস করিয়া দিবে।

এক হাদীসে আসিয়াছে, আল্লাহর কোন ওলী এমন হয় নাই, যাহার মধ্যে আল্লাহ তায়ালা দুইটি অভ্যাস সৃষ্টি না করিয়াছেন। একটি দানশীলতা, অপরটি উত্তম চরিত্র। (কান্ধ)

অন্য এক হাদীসে আছে, আল্লাহর কোন ওলী এমন নাই যাহাকে দানশীলতায় অভ্যস্ত করা না হইয়াছে। (কান্ধ)

ইহা অত্যন্ত স্পষ্ট বিষয় যে, যদি আল্লাহ তায়ালা সহিত সম্পর্ক ও ভালবাসা থাকে, তবে তাহার সৃষ্টির উপর খরচ করিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মন চাহিবে। কেননা, প্রিয়জনের আত্মীয়-স্বজনের প্রতি আন্তরিকতা তাহার প্রতি ভালবাসার কারণেই হয়। আর যেহেতু সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহ তায়ালা পরিবারভুক্ত, কাজেই তাহাদের উপর খরচ করিতে আল্লাহর ওলীর অন্তর অবশ্যই চাহিবে এবং তাহার পরিবারের মধ্যেও যাহার সম্পর্ক আল্লাহ তায়ালা সহিত যত বেশী শক্তিশালী হইবে, ততই তাহার উপর বেশী খরচ করিতে মন চাহিবে। যদি খরচ করিতে মন না চায়, তবে বুঝা যাইবে যে, আল্লাহর মহব্বতের চাইতে মালের মহব্বত বেশী। আর আল্লাহ তায়ালা সহিত মহব্বতের দাবী করা মিথ্যা।

حضرت ابو بکر صدیقؓ نے حضورِ اقدس ﷺ
اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ جنت
میں نہ تو چال باز (دھوکہ باز) داخل ہو
سکتے ہیں، نہ صدقہ کر کے احسان رکھنے سے۔

② عَنْ أَبِي بَكْرٍ يَسْدِيْقٍ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ غَبِيٌّ وَلَا يَغِيْلُ
وَلَا مَنَّانٌ - (رواه الترمذی کذا)

فی مشکوٰۃ

② হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করিয়াছেন, জাহান্নামে না ধোকাবাজ প্রবেশ করিবে, না কপণ, আর না দান-খয়রাত করিয়া অনুগ্রহ প্রকাশকারী।

(মিশকাত : তিরমিযী)

ফায়দা : উলামায়ে কেরাম এরশাদ করিয়াছেন, এই সমস্ত স্বভাব সহকারে কোন ব্যক্তি জাহান্নামে দাখেল হইতে পারিবে না। খোদা না করুন, যদি কোন মুমেন ব্যক্তির মধ্যে এই দোষগুলি পাওয়া যায়, তবে প্রথমতঃ আল্লাহ তায়ালা তাহাকে দুনিয়াতেই তওবার তৌফীক দান করিবেন। আর যদি ইহা না হয়, তবে প্রথমে জাহান্নামে প্রবেশ করিয়া এই সমস্ত দোষ হইতে পবিত্র হইয়া জাহান্নামে প্রবেশ করিতে পারিবে। কিন্তু জাহান্নামে প্রবেশ করা যদিও অল্পসময়ের জন্য হইবে ; ইহা কি কোন সহজ ও

৩ হযরত আবু যর (রাযিঃ) বলেন, আমি একবার হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম। তিনি কাবা শরীফের দেওয়ালের ছায়াতে বসিয়াছিলেন। আমাকে দেখিয়া হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কাবার রবের কসম! ঐ সমস্ত লোক বড় কৃতির মধ্যে রহিয়াছে। আমি আরজ করিলাম, আমার মাতা-পিতা আপনার উপর কোরবান হউন, ঐ সমস্ত লোক কাহারো? হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যাহাদের নিকট বেশী সম্পদ রহিয়াছে। তবে যাহারা ডানে, বামে, সামনে, পিছনে এইভাবে, এইভাবে, এইভাবে খরচ করিবে তাহারা ব্যতীত। কিন্তু এইরূপ লোক খুবই কম।

(মিশকাত : বুখারী, মুসলিম)

কায়দা : হযরত আবু যর (রাযিঃ) দুনিয়াত্যাগী সাহাবীদের মধ্যে ছিলেন, যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহাকে দেখিয়া হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কথা প্রকৃতপক্ষে তাহার সান্ত্বনার জন্য ছিল যে, নিজের অভাব-অনটনের প্রতি কখনও যেন খেয়াল না করেন। ধন-সম্পদের এই প্রাচুর্য প্রকৃতপক্ষে কোন প্রিয় জিনিস নয়, বরং বড় কৃতি ও লোকসানের জিনিস। আর ইহা স্পষ্ট যে, ধন-সম্পদ আল্লাহ তায়ালা হইতে উদাসীনতার কারণ হয়। দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, দরিদ্রতা ব্যতীত আল্লাহ তায়ালা প্রতি মনোনিবেশ খুব কমই হইয়া থাকে। তবে আল্লাহ তায়ালা যাহাদেরকে তৌফীক দান করিয়াছেন, তাহারা ক্ষেত্র অনুপাতে যেখানে এবং যেই দিকে প্রয়োজন মনে করে চারিদিকে দানের হাত প্রসারিত করিয়া রাখে; তাহাদের জন্য সম্পদ ক্ষতিকর নয়। কিন্তু হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বলিয়া দিয়াছেন যে, এইরূপ লোক খুব কম হয়। সাধারণতঃ দেখা যায়, সম্পদের প্রাচুর্যই অন্যায় অপরাধ ও ভোগ-বিলাসিতা লইয়া আসে। অপাত্রে খরচ করা, লোক দেখানোর জন্য খরচ করা সম্পদের সাধারণ কৃতিত্ব। বিবাহ-শাদী ও অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠানে অনর্থক হাজার হাজার টাকা খরচ করিয়া ফেলিবে; কিন্তু আল্লাহর নামে অভাবগ্রস্ত ও ক্ষুধার্ত ব্যক্তিদের জন্য খরচ করার কোন সুযোগই হয় না।

এক হাদীসে আছে, যে সমস্ত লোক দুনিয়াতে অধিক সম্পদশালী হইবে, তাহারাই আখেরাতে কম সম্পদের অধিকারী হইবে। তবে যে ব্যক্তি হালাল উপায়ে উপার্জন করে এবং এইভাবে এইভাবে খরচ করে। (কানয)

পূর্বে বর্ণিত হাদীসের মত এইভাবে এইভাবে দ্বারা এদিক সেদিক খরচ করার প্রতি ইশারা করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে, সম্পদ ঐ ব্যক্তির জন্য

সৌন্দর্য ও সম্মানের কারণ হয়, যে উহাকে এদিক সেদিক খরচ করে। আর যে সম্পদকে হিসাব করিয়া জমা করিয়া রাখে, তাহার জন্য এই সম্পদ সব খরচের বিপদের কারণ হয়। মালিককেও ধ্বংস করে এবং নিজেও তাহার নিকট হইতে শেষ হইয়া যায়। এই নির্লজ্জ সম্পদ ততক্ষণ পর্যন্ত কাহারও দ্বীনী অথবা দুনিয়াবী উপকার করে না, যতক্ষণ সে তাহার নিকট হইতে পৃথক না হইয়া যায়।

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد
 ہے کہ سنی آدمی اللہ سے قریب ہے جنت
 سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے
 جہنم سے دور ہے۔ اور بنی آدمی اللہ
 سے دور ہے، جنت سے دور ہے اور
 جہنم سے قریب ہے۔
 بلکہ شک جابل سنی اللہ کے نزدیک عابد
 بنیئل سے زیادہ محبوب ہے۔

② عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَنِيُّ
 قَرِيبٌ مِنَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْجَنَّةِ
 قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ
 وَالْبَنِيْلُ بَعِيدٌ مِنَ اللَّهِ بَعِيدٌ مِنَ
 الْجَنَّةِ بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ قَرِيبٌ مِنَ
 النَّارِ وَكَجَاهِلٍ سَنِي أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ
 مِنْ عَابِدٍ بِخَيْلٍ۔

(رواه الترمذی كذا في المشکوٰی)

⑧ হযর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দানশীল ব্যক্তি আল্লাহর নিকটবর্তী, জাহান্নামের নিকটবর্তী, মানুষের নিকটবর্তী এবং জাহান্নাম হইতে দূরে। আর কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ হইতে দূরে, জাহান্নাম হইতে দূরে, মানুষের নিকট হইতে দূরে এবং জাহান্নামের নিকটবর্তী। নিঃসন্দেহে মুখ দানশীল আল্লাহর নিকট এবাদতকারী কৃপণ অপেক্ষা অধিক প্রিয়। (মিশকাত : তিরমিযী)

ফায়দা : অর্থাৎ, যে ব্যক্তি অনেক বেশী এবাদত করে, অনেক লম্বা লম্বা নফল পড়ে তাহার চাইতে ঐ ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালায় নিকট বেশী প্রিয়, যে নফল কম পড়ে কিন্তু দানশীল। আবেদ অর্থ বেশী বেশী নফল ইবাদতকারী। ফরজ এবাদত তো দানশীল হউক বা না হউক প্রত্যেকের জন্য জরুরী।

ইমাম গামখালী (রহঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত ইয়াহুয়া ইবনে যাকারিয়া (আঃ) একবার শয়তানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় ব্যক্তি কে এবং সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য ব্যক্তি কে? সে বলিল, আমার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় ব্যক্তি কৃপণ মুমেন আর সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য

ব্যক্তি গোনাহগার দানশীল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার কারণ কি? সে আরজ করিল, কৃপণ ব্যক্তি তো তাহার কৃপণতার কারণে আমাকে নিশ্চিত্ত করিয়া রাখে, অর্থাৎ, তাহার কৃপণতাই তাহাকে জাহান্নামে লইয়া যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু গোনাহগার দানশীলের ব্যাপারে আমি সবসময় চিন্তিত থাকি, নাজ্জানি কখন আল্লাহ তায়ালা তাহাকে দানশীলতার কারণে ক্ষমা করিয়া দেন। (এহইয়া) অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা যদি তাহার দানশীলতার কারণে কখনও তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া যান, তবে আল্লাহ তায়ালা অস্বাভাবিক ও রহস্যময় সমুদ্রে তাহার সারাজীবনের অন্যায় অপরাধ সবই শেষ হইয়া যাইবে। তিনি সবকিছু ক্ষমা করিয়া দিতে পারেন। এমতাবস্থায় তাহার পিছনে আমার সারাজীবনের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল।

এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি দান করে, সে আল্লাহ তায়ালা প্রতি নেক ধারণার কারণে করে, আর যে কৃপণতা করে, সে আল্লাহ তায়ালা প্রতি খারাপ ধারণার কারণে করে। (কানয)

নেক ধারণার অর্থ এই যে, সে মনে করে, যেই মালিক আমাকে এই সম্পদ দান করিয়াছেন, তিনি আবারও দান করিতে পারেন। এইরূপ ব্যক্তি আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার ব্যাপারে কি সন্দেহ থাকিতে পারে। আর খারাপ ধারণার অর্থ এই যে, সে মনে করে এই সম্পদ শেষ হইয়া গেলে পুনরায় কোথা হইতে আসিবে? এইরূপ ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা হইতে দূরে হওয়া স্পষ্ট বিষয়। কেননা, সে আল্লাহ তায়ালা ভাণ্ডারকে সীমিত মনে করে, অথচ উপার্জনের যাবতীয় উপকরণ তিনিই পয়দা করিয়াছেন এবং ঐ সমস্ত উপকরণ দ্বারা উৎপাদন হওয়া তাহারই কুদরতের হাতে রহিয়াছে। তিনি না চাহিলে দোকানদার বেকার বসিয়া থাকিবে, কৃষক বীজ বপন করিবে কিন্তু ফসল পয়দা হইবে না। কাজেই এই সবকিছু যখন তাহারই দান, তবে কোথা হইতে আসিবে; এই চিন্তার কি অর্থ? কিন্তু আমরা মুখে ইহা স্বীকার করা সত্ত্বেও অন্তরে উপলব্ধি করি না যে, ইহা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই দান, ইহাতে আমাদের কোন দখল নাই। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আন্তরিকভাবে বুঝিতেন যে, এই সবকিছু তাহারই দান, তিনি আজ দিয়াছেন, তিনি কালও দিবেন। এইজন্য তাহারা সবকিছু খরচ করিয়া দিতেও কোন দ্বিধাবোধ করিতেন না।

⑤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّعَاءُ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ مَنْ أَكَلَهَا

حُضْرَةَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا ارْتَدَادُ مَنْ كَلَّمَ سَخَاتٍ جَنَّتْ مِنْ أَيْكٍ وَنَحْتِ

بِسْ - پس جو شخص سخی ہوگا وہ اُس کی

ایک ہنسی پکڑے گا، جس کے نتیجے میں وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جہنم کا ایک درخت ہے جو شخص شیعہ (بغلی) ہوگا، وہ اس کی ایک ہنسی پکڑے گا، یہاں تک کہ وہ ہنسی اس کے جہنم میں داخل کیے جائے گی۔

كَانَ سَخِيًّا أَخَذَ بِغَضَبٍ مِنْهَا فَلَمْ يَتْرُكْهُ الْغَضَبُ عَنِّي يُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ وَالشَّعْ شَعْرَةً فِي النَّارِ فَمَنْ كَانَ مُصْحَاً أَخَذَ بِغَضَبٍ مِنْهَا فَلَمْ يَتْرُكْهُ الْغَضَبُ عَنِّي يُدْخِلُهُ النَّارَ (مسند البیہقی فی شعب الایمان کذا فی مشکوٰۃ)

⑤ ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দানশীলতা জাম্মাতের একটি বৃক্ষ। সুতরাং যে ব্যক্তি দানশীল হইবে, সে উহার একটি শাখা ধরিয়া লইবে। যাহা দ্বারা সে জাম্মাতে দাখেল হইয়া যাইবে। আর কপণতা জাহান্নামের একটি বৃক্ষ। যে ব্যক্তি কপণ হইবে, সে উহার একটি শাখা ধরিয়া লইবে। অবশেষে সেই শাখা তাহাকে জাহান্নামে দাখেল করিয়া ছাড়িবে। (মিশকাত : বায়হাকী শু'আবুল ইমান)

ফায়দা : 'শুহ' কপণতার সর্বোচ্চ অবস্থাকে বলা হয়, যেমন, প্রথম পরিচ্ছেদে ১৮ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার অর্থ স্পষ্ট যে, কপণতা যেহেতু জাহান্নামের একটি বৃক্ষ, কাজেই উহার শাখা ধরিয়া যে ব্যক্তি উপরে চড়িবে, সে জাহান্নামেই পৌঁছিবে। এক হাদীসে আছে, জাম্মাতে একটি বৃক্ষ আছে। উহার নাম 'সাখা' অর্থাৎ দানশীলতা। উহা হইতেই সাখাওয়াত (দানশীলতা) পয়দা হইয়াছে। অনুরূপ, জাহান্নামে একটি বৃক্ষ আছে, উহার নাম 'শুহ' (কপণতা)। উহা হইতেই কপণতা পয়দা হইয়াছে। কপণ ব্যক্তি জাম্মাতে দাখেল হইবে না। (কানয) পূর্বে কয়েকবার আলোচনা হইয়াছে যে, শুহ কপণতার সর্বোচ্চ অবস্থা।

অন্য এক হাদীসে আছে, দানশীলতা জাম্মাতের বৃক্ষসমূহের মধ্য হইতে একটি বৃক্ষ, যাহার শাখা দুনিয়াতে ঝুকিয়া রহিয়াছে। যে ব্যক্তি উহার কোন শাখা ধরিয়া লয়, সেই শাখা তাহাকে জাম্মাত পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়। আর কপণতা জাহান্নামের বৃক্ষসমূহের মধ্য হইতে একটি বৃক্ষ। যাহার শাখা দুনিয়াতে ঝুকিয়া রহিয়াছে। যে ব্যক্তি উহার কোন শাখা ধরিয়া লয়, সেই শাখা তাহাকে জাহান্নাম পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়। (কানয)

জানা কথা যে, যদি কেহ এমন রাস্তা দিয়া চলিতে থাকে যাহা টেনে

গিয়াছে, তবে নিঃসন্দেহে একসময় সে ষ্টেশনে পৌঁছিয়া যাইবে। তদ্রূপ, যদি কেহ এই সমস্ত বৃক্ষের শাখাগুলি ধরিয়া উপরে চড়িতে থাকে, তবে বৃক্ষ যেখানে রহিয়াছে, সে সেখানে পৌঁছিয়া যাইবে।

⑥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرُّ مَا فِي الرَّجُلِ شَعْرٌ خَالِعٌ وَجَبْنٌ خَالِعٌ - (বদা' আবু হুরায়দ) وَكَذَلِكَ فِي الْمَشْكُوتِ -

مُسْتَوْدَعٌ مِنْ مَلِكٍ مُشْرَقٍ وَكَمْ كَرَامَتُهُ
 به تیریں عادتیں جو آدمی میں ہوں (دو ہیں)۔
 ایک نخل بہت جلد سے مبرک کٹینے والا ہو
 دوسرے وہ نامردی اور خوف جو جہاں
 نکال دینے والا ہو۔

⑥ হযূর সালাম্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষের মধ্যে নিকটতম অভ্যাস (দুইটি)। প্রথমতঃ এমন কৃপণতা যাহা বৈধ্বংস করিয়া দেয়, দ্বিতীয় এমন কাপুরুষতা ও ভয় যাহা প্রাণ বাহির করিয়া দেয়। (মিশকাত : আবু দাউদ)

ফাযলদা : এই দুইটি নিকটতম অভ্যাস সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা পাক কালামেও সতর্ক করিয়াছেন। আল্লাহ পাক বলেন—

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۖ إِذَا مَتَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۖ وَإِذَا مَتَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۚ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ۚ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ۚ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ۚ لِلْيَسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۚ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بَيُّوتَ الْبُيُوتِ ۚ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابٍ رَجِيهِمْ تَشْفِقُونَ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُومٍ ۚ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۚ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ وَأَلْفَمُوا غَيْرَ مُلَوِّمِينَ ۚ فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۚ وَالَّذِينَ هُمْ لَا مُلْتَمَعَهُمْ وَعَهْدُهُمْ رَاعُونَ ۚ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ ۚ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يَخَافُونَ ۚ أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ ۚ (سورة الاحقاف ١٥)

সব কয়টি আয়াতের তরজমা এই, নিশ্চয়ই মানুষকে দুর্বলমনা (ক্ষুদ্র

ও অপরিপক্ক অন্তরের অধিকারী করিয়া) সৃষ্টি করা হইয়াছে। যখন তাহাকে দুঃখ স্পর্শ করে, তখন সে হায়-ছুতাশ করিতে থাকে। আর যখন সে সম্পদশালী হয়, তখন সে কার্পণ্য করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু সেই নামাযী ব্যতীত, যে স্বীয় নামাযের পাবন্দী করে আর যাহাদের সম্পদের মধ্যে হক নির্ধারিত রহিয়াছে প্রার্থী ও অপ্রার্থী সকলের জন্য, আর যাহারা কিয়ামতের দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, আর যাহারা স্বীয় প্রতিপালকের আযাবকে ভয় করে। নিঃসন্দেহে তাহাদের প্রতিপালকের আযাব নির্ভয়ের বস্তু নহে। (অবশ্যই উহা হইতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সর্বদা উক্ত ভয় করা উচিত।) আর যাহারা স্বীয় লজ্জাস্থানকে (হারাম জায়গা হইতে) হেফাজতে রাখে কিন্তু তাহাদের স্ত্রী অথবা বাদীদের হইতে (হেফাজতের প্রয়োজন নাই)। কেননা, তাহাদের প্রতি উহাতে কোন দোষারোপ নাই। (অর্থাৎ, স্ত্রী ও বাদীদের সহিত সোহবতে কোন আপত্তি নাই) কিন্তু যাহারা উহাদের ব্যতীত (অপর জায়গায় বাহেশ পুরা করিতে) চাহে তাহারা সীমালংঘনকারী। আর যাহারা স্বীয় (রক্ষিত) আমানতসমূহ এবং স্বীয় অঙ্গীকারের প্রতি লক্ষ্য রাখে আর সাক্ষ্যসমূহ ঠিক ঠিক প্রদান করে। আর যাহারা স্বীয় ফরজসমূহ নামায পাবন্দী সহকারে আদায় করে, ইহারাই সসম্মানে জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

উপরে বর্ণিত আয়াতসমূহের তরজমা উল্লেখ করা হইল। প্রায় একই ধরনের বিষয় অন্য জায়গায় সূরা মুমিনূনের শুরুতে বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযিঃ) বলেন, ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পাগড়ীর কিনারা ধরিয়া এরশাদ করিলেন, হে ইমরান! আল্লাহ তায়ালা খরচ করাকে খুবই পছন্দ করেন, জমা করিয়া রাখাকে অপছন্দ করেন। তুমি খরচ কর এবং লোকদেরকে খানা খাওয়াও। কাহারও ক্ষতি করিও না, তাহা হইলে তোমার চাহিদার ব্যাপারেও ক্ষতি হইতে থাকিবে। মনোযোগ সহকারে শোন, সন্দেহযুক্ত বস্তুর ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা সূক্ষ্ম দৃষ্টিকে পছন্দ করেন (অর্থাৎ, যে বিষয়ে জায়েয-না জায়েযের সন্দেহ দেখা দেয়, উহাতে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে সিদ্ধান্ত লওয়া চাই। শুধু হালকাভাবে যাহা ইচ্ছা করা চাই না।) বাহেশের সময় পরিপূর্ণ বুদ্ধি-বিবেচনাকে পছন্দ করেন (প্রবল বাহেশের সময় যেন বুদ্ধি-বিবেচনাকে না হারায়)। আল্লাহ তায়ালা দানশীলতাকে পছন্দ করেন, যদিও কয়েকটি খেজুরই খরচ করিয়াই হউক না কেন। (অর্থাৎ, নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী, বেশী সামর্থ্য না থাকিলে কম খরচ করার বিষয়ে লজ্জাবোধ না করা চাই, যে পরিমাণই সম্ভব হয় খরচ করিতে থাক)।

আল্লাহ তায়ালা সাহসিকতাকে পছন্দ করেন : চাই সাপ বিচ্ছু মারার ব্যাপারেই হউক না কেন। (কানথ)

কাজেই সামান্য ভয়ে ভীত হইয়া যাওয়াকে আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন না। অন্তরে ভয় পয়দা হইলেও উহাকে প্রকাশ করা চাই না। বরং শক্তি ও সাহসের সহিত উহাকে দূর করা চাই।

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে উম্মতের শিক্ষার জন্য যেসব দোয়া বর্ণিত আছে, তন্মধ্যে কাপুরুষতা হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করাও বর্ণিত রহিয়াছে এবং বিভিন্ন দোয়াতে উহা হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। (বুখারী)

④ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ.
 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا
 پاک ارشاد ہے کہ وہ شخص مؤمن نہیں
 جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور پاس
 ہی اس کا پیڑھی بھوکا رہے۔
 (نساء البيهقي في الشعب كذا في المشكاة)

⑤ হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঐ ব্যক্তি মুমিন নয়, যে নিজে তো পেট ভরিয়া খায় ; অথচ নিকটেই তাহার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে। (মিশকাত : বায়হাকী শু'আবুল ইম্যান)

ফায়দা : নিঃসন্দেহে, যেই ব্যক্তির নিকট পেট ভরিয়া খাইতে পারে এই পরিমাণ খাদ্য রহিয়াছে আর তাহার নিকটেই ক্ষুধার্ত প্রতিবেশী রহিয়াছে, তাহার জন্য কখনও উচিত নয় যে, সে নিজে পেট ভরিয়া খায় এবং সেই গরীব প্রতিবেশী ক্ষুধায় ছটফট করিতে থাকে। তাহার জন্য নিজে কিছুটা কম খাইয়া প্রতিবেশীকে সাহায্য করা অত্যন্ত জরুরী।

এক হাদীসে আছে, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, ঐ ব্যক্তি আমার প্রতি ইম্যান আনয়ন করে নাই, যে নিজে পেট ভর্তি করিয়া রাত্রিাপন করে ; অথচ সে জানে যে, তাহার প্রতিবেশী তাহার পার্শ্বে ক্ষুধার্ত অবস্থায় রহিয়াছে। (তারগীব)

অন্য এক হাদীসে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে—কিয়ামতের দিন কতক মানুষ এইরূপ হইবে, যাহারা নিজেদের প্রতিবেশীর আঁচল ধরিয়া আল্লাহ তায়ালা নিকট আরজ করিবে, হে আল্লাহ ! এই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করুন, সে নিজের দরজা বন্ধ করিয়া রাখিত আর তাহার প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিসটি আমাকে দিত

না। (তারগীব)

এক হাদীসে ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে, হে লোকসকল! দান-খয়রাত কর, কিয়ামতের দিন আমি ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিব। সম্ভবতঃ তোমাদের মধ্য হইতে কিছু লোক এমন হইবে, যাহাদের নিকট রাতে পরিতপ্ত হইয়া খাওয়ার পর কিছু বাঁচিয়া থাকিত, অথচ তাহার চাচাতো ভাই ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাত্রিয়াপন করিত। তোমাদের মধ্যে সম্ভবতঃ কিছু লোক এমনও থাকিবে, যাহারা নিজেদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করিত; অথচ তাহার মিসকীন প্রতিবেশী কিছুই কামাই করিতে পারে নাই। (কানয)

অন্য এক হাদীসে ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে, মানুষের কৃপণ হওয়ার জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, সে এইরূপ বলিবে—আমি আমার অংশ সম্পূর্ণ লইব; কিছুমাত্রও ছাড়িব না। (কানয) অর্থাৎ, বন্টনের সময় আত্মীয়-স্বজন অথবা প্রতিবেশীর নিকট হইতে নিজের সম্পূর্ণ অংশ আদায় করিবার ফিকিরে লাগিয়া থাকে, সামান্য ব্যাপারেও একগুঁয়ে মনোভাব প্রকাশ করে; ইহাও কৃপণতার লক্ষণ। যদি অন্যের অংশে সামান্য বেশী চলিয়াই যায়, তবে কি ইহার কারণে সে মরিয়া যাইবে?

حضرت ابن عمرؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ
دونوں نے حضور ﷺ سے کہا کہ ایک عورت کو اس
پر غضب کیا گیا کہ اُس نے ایک بیل کو بائہ
لکھا تھا۔ جو بھوک کی وجہ سے مر گئی۔ تو
اس نے اس کو کھانے کو دیا، تو اُس کو
چوڑا کہ وہ زمین کے جانوروں (چوبے
وغیرہ) سے اپنا پیٹ بھر لیتی۔

⑧ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَذِيبَتْ أَمْرَأَةٌ
فِي هَرَّةٍ أَمْسَكَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ
مِنَ الْجُوعِ فَلَمْ تَكُنْ تُطْعِمُهَا
وَلَا تُزِيلُهَا فَتَأْكُلُ مِنْ عَشَائِ
الْأَرْضِ - (متفق عليه هكذا
في المشكاة)۔

⑧ ছয়রত ইবনে ওমর ও ছয়রত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, এক মহিলাকে এই কারণে শাস্তি দেওয়া হইয়াছে যে, সে একটি বিড়ালকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। বিড়ালটি ক্ষুধার তাড়নায় মরিয়া গিয়াছে। না সে উহাকে খাইতে দিয়াছে, না উহাকে ছাড়িয়া দিয়াছে; যাহাতে সে জমিনের

অন্যান্য জীব-জন্তু (ইদুর ইত্যাদি) খাইয়া তাহার পেট ভরিয়া লইত।

(মিশকাত : বুখারী, মুসলিম)

ফায়দা : যাহারা জীব-জন্তু পালন করে, তাহাদের দায়িত্ব বড়ই কঠিন। এই সমস্ত বোবা প্রাণী নিজেরদের প্রয়োজন প্রকাশ করিতে পারে না, এমতাবস্থায় ইহাদের পানাহারের খোঁজ-খবর রাখা অত্যন্ত জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ। এই ব্যাপারে কৃপণতা করা নিজেকে নিজে আযাবের জন্য তৈরী করা। অনেক লোক জীব-জন্তু পালনে বড় আগ্রহ রাখে কিন্তু ইহাদের ঘাস, দানাপানির জন্য খরচ করিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া যায়।

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বিভিন্ন হাদীসে বিভিন্ন শিরোনামে এই বিষয় বর্ণিত হইয়াছে যে, এইসব জীব-জন্তুর ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করিতে থাক।

একবার হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথাও যাইতেছিলেন। পথে একটি উট দেখিতে পাইলেন। (ক্ষুধার কারণে অথবা শুকাইয়া যাওয়ার কারণে) উহার পেট কোমরের সঙ্গে লাগিয়া গিয়াছিল। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, এই সকল বোবা জীব-জন্তুর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করিতে থাক। ভাল অবস্থায় উহাদের উপর সওয়ার হইও এবং ভাল অবস্থায় উহাদেরকে ভক্ষণ করিও।

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল, এস্তেঞ্জার জন্য লোকালয়ের বাহিরে যাইয়া কোন বাগান অথবা টিলা ইত্যাদির আড়ালে প্রয়োজন সারিতেন। একবার এইরূপ প্রয়োজনে একটি বাগানে গেলেন। সেখানে একটি উট হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়া বিড়বিড় করিতে লাগিল এবং উহার চোখ হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইল। (ইহা একটি জ্ঞানা বিষয় যে, কোন সহানুভূতিশীলকে দেখিলে যে কোন বিপদগ্রস্তের হৃদয় ভারাক্রান্ত হইয়া যায়।) হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহার নিকট গেলেন। উহার কানের গোড়ায় স্নেহের সহিত হাত বুলাইলেন, ইহাতে সে শান্ত হইয়া গেল। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, এই উটের মালিক কে। একজন আনসারী আসিলেন এবং আরজ করিলেন, আমি। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি কি আল্লাহকে ভয় কর না, যিনি তোমাকে ইহার মালিক বানাইয়াছেন। এই উট তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেছে—তুমি উহাকে ক্ষুধার্ত রাখ এবং কাজ বেশী লও।

অন্য এক হাদীসে আছে, একবার হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখিলেন, একটি গাধার মুখে দাগ দেওয়া হইয়াছে। হযূর

سالمائلاہ آلائیہی ویااسالام بالیلین، تومادیر کی ائینو آنا
ہی نای ی، آامی ای باکیر اری ابیشاپ دیایہی، یی آیب-آکتر موی
دان دی ائبا مویر اور ارایر کریر۔ ایسب ورننا آابو دان شریکی
اور کرر اییایہی۔ ایہا آاا آارو ویربم ریرایایاا ایی ویری
ساکر کرر اییایہی ی، آیب-آکتریر آوی-آبر راکار باپاریر یین
کونرکم ابایلا نا کرر ای۔ یین آیب-آکتریر ایی ابایا ای
اوریر باپاریر ااسب ساکرایا ویرت اییایہی، تب ساری سیرا
مانویر ویریایااا آو آارو وینی سسٹ ایب آارو وینی اورورور۔

آیر سالمائلاہ آلائیہی ویااسالام ارشاد کرریایہین، مانویر
وناناییر آنا ایہا یایا ی، یایار اورن-پواییر آیمما اایار اور
ریایایہی، س اورا کربس کرریا دیل۔ کایہی کون آکتریر یی
نیریر کون ارایانیر اورکایا راکا ای، تب اور آایاریر
باپاریر کپناا کرر ایب ای مین کرر ی، ک آانیر پاریر، ک
آبر راکیر ؛ ایہا نیریر اری مارااا آونم۔ آاللاہ اایا
سبکیآ آانیر۔ آار لیریرککاری سبکیآ ریرپورٹ لیریرک
کریرایہین ؛ اور یا وونیر کرر ایاک نا کین۔ آار ایی آپا
کپناا اییر ساری ای۔ ارایا، آیب-آکتر سورییر آنا ایاک
آایا کرر آنا، دویر آنا ایاک آایا آنا ی کون کاییر آنا
ایاک، مانویر ایہا کیر نیریر ارایانیر لالین-پالین کریر۔ کیر
کپناااا کاریر اوریریر ریرااا ریرا کریرایا ارا اورااا
ایایا یای۔

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا ارشاد
نقل کیا گیا کہ قیامت کے وی آدمی ایسا
(اولیل وضیعت) لایا جائے گا جیسا کہ
بیرو کا بچہ جوتا ہے اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ
کے سامنے کڑا کیا جائے گا۔ ارشاد ہو گا
کہ میں نے تجھے مال عطا کیا، ختم و ختم عقیقہ
تجھ پر نعمتیں برساتیں۔ تو نے اسباب اعلیٰ
میں کیا کارگزار کی۔ وہ عرض کرے گا کہ
میں نے خوب مال جمع کیا، اُس کو (اپنی

۹ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
يَعَاؤُ يَابُو آدَمَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
كَأَنَّهُ بَذِجٌ مُيُوتٌ بَيْنَ
يَدَيِ اللَّهِ فَيَقُولُ لَهُ
أَعْطَيْتَكَ وَخَوَّلْتُكَ وَ
أَنْعَمْتُ عَلَيْكَ فَمَا صَنَعْتَ
فَيَقُولُ يَا رَبِّ جَمَعْتُهُ
وَسَمَوْتُهُ وَتَرَكْتُهُ الْفَرَّ

مَا كَانَ فَأَرْجِعْنِي إِلَيْكَ
يَوْمَ كَلَّمَهُ فَيَقُولُ أَرَأَيْتَ
مَا كَدَّمْتُ فَيَقُولُ رَبِّ
جَمَعْتُهُ وَتَرَكْتُهُ وَ
تَرَكْتُهُ أَكْثَرُ مَا كَانَ
فَأَرْجِعْنِي إِلَيْكَ يَوْمَ كَلَّمَهُ
فَإِذَا عَبْدٌ لَمْ يُقَدِّمْ
غَيْرًا فَيُفَضِّلُ بِهِ إِلَى
النَّارِ - (مسوایہ الترمذی
وضعه کذا فی مشکوٰۃ)

پھوڑ آیا۔ آپ مجھے دنیا میں واپس کر دیں، میں فہ سب سے کہ حاضر ہوں لیکن خیر صدقہ کروں تاکہ وہ سب یہاں میرے پاس آجائے (چونکہ اس کے پاس کوئی ذخیرہ ایسا نہ ملے گا جو اس نے اپنے لئے آگے بھیج دیا ہو، اس لئے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔

৯) জ্বর সাপ্লাপ্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কিয়ামতের দিন মানুষকে এমন (অপদস্থ ও দুর্বল অবস্থায়) উপস্থিত করা হইবে, যেমন মেঘ শাবক। তাহাকে আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে দণ্ডায়মান করা হইবে। এরশাদ হইবে, আমি তোমাকে সম্পদ দান করিয়াছি, চাকর-নকর দিয়াছি, তোমার উপর নেয়ামত বর্ষণ করিয়াছি। তুমি এইসব নেয়ামত দ্বারা কি কাজ করিয়াছ? সে আরজ করিবে, আমি অনেক সম্পদ জমা করিয়াছি, উহাকে (নিজের চেষ্টায়) অনেক বৃদ্ধি করিয়াছি। শুরুতে আমার নিকট যত পরিমাণ ছিল, উহার চাইতে অনেক বৃদ্ধি করিয়া ছাড়িয়া আসিয়াছি। আপনি আমাকে দুনিয়াতে পাঠাইয়া দিন, আমি তাহা সবই আপনার নিকট উপস্থিত করিব। এরশাদ হইবে, আমাকে তো উহা বল, যাহা তুমি দুনিয়ার জীবনে (আখেরাতের জন্য সঞ্চয় স্বরূপ) আগে পাঠাইয়াছ। সে পূর্বের কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিবে, হে আমার

বাণিজ্য চলিবে, না বন্ধুত্ব ও সুপারিশ চলিবে। উক্ত পরিচ্ছেদে ৩০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা এই এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি যেন ইহা দেখিয়া লয় যে, আগামীকালের জন্য সে কি পাঠাইয়াছে।

এক হাদীসে আসিয়াছে, যখন মানুষ মারা যায় তখন ফেরেশতারা জিজ্ঞাসা করে, নিজের আমলনামায় কি সঞ্চয় করিয়াছ? আগামীকালের জন্য কি জিনিস পাঠাইয়াছ? অথচ মানুষ জিজ্ঞাসা করে, কি কি সম্পদ রাখিয়া গিয়াছে। (মিশকাত)

অন্য এক হাদীসে আছে, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের মধ্যে কে এমন আছে, যে তাহার নিকট ওয়ারিশদের সম্পদ নিজের সম্পদের চাইতে বেশী প্রিয়। সাহাবায়ে কেরাম আরক্ত করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের মধ্যে কেহই এমন নাই যাহার নিকট নিজের সম্পদ ওয়ারিশের সম্পদ হইতে বেশী প্রিয় নয়। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, মানুষের নিজস্ব সম্পদ উহা, যাহা সে অগ্রিম পাঠাইয়া দিয়াছে। আর যাহা সে রাখিয়া গিয়াছে উহা তাহার সম্পদ নয়, বরং উহা তাহার ওয়ারিশদের সম্পদ।

(মিশকাত : বুখারী)

অন্য এক হাদীসে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে—মানুষ বলে আমার মাল আমার মাল অথচ তাহার মালের মধ্য হইতে তাহার জন্য শুধু তিনটি জিনিস রাখিয়াছে। যাহা খাইয়া শেষ করিয়া দিয়াছে, অথবা যাহা পরিধান করিয়া পুরাতন করিয়া দিয়াছে, অথবা আল্লাহ তায়ালা নিকট তাহার আমলনামায় জমা করিয়া দিয়াছে। ইহা ছাড়া যাহাকিছু রাখিয়াছে, উহা তাহার মাল নয়; বরং উহা মানুষের জন্য রাখিয়া যাইবে। (মিশকাত)

আরও বড় ব্যাপার হইল এই যে, মানুষ অধিকাংশ সময় এমন লোকদের জন্য জমা করে, পরিশ্রম করে, কষ্ট সহ্য করে, অভাব অনটন ভোগ করে, যাহাদেরকে স্বেচ্ছায় সে একটি পয়সাও দিতে চায় না, অথচ জমা করিয়া রাখিয়া যায়। আর তকদীর তাহাদেরকেই সবকিছুর ওয়ারিশ বানাইয়া দেয়, যাহাদেরকে সামান্য পরিমাণ দেওয়াও সে পছন্দ করিত না।

আরতাত ইবনে সাহিতাহ (রহঃ) ইষ্টেকালের সময় কয়েকটি কবিতা পাঠ করিলেন, যাহার অর্থ হইল, মানুষ বলে আমি অনেক মাল জমা করিয়াছি; কিন্তু অধিকাংশ উপার্জনকারী অন্যদের জন্য অর্থাৎ, ওয়ারিশদের জন্য জমা করে। সে তাহার জীবদ্দশায় স্বয়ং নিজেরও হিসাব লইতে থাকে যে, কোথায় কি পরিমাণ খরচ হইয়াছে, কিন্তু পরবর্তীতে

এমন লোকদের জন্য রাখিয়া যায়, যাহাদের নিকট হইতে সে হিসাবও লইতে পারে না যে, সমস্ত সম্পদ কোথায় উড়াইয়া দিয়াছে। অতএব, তুমি তোমার জীবদ্দশায়ই ঝাইয়া ফেল, ঝাওয়াইয়া দাও এবং কৃপণ ওয়ারিশদের নিকট হইতে কাড়িয়া লও। মানুষ তাহার মৃত্যুর পর বঞ্চিত থাকিয়া যায় ; (কেহই তাহাকে সম্পদের মধ্যে স্মরণ রাখে না।) অন্য লোকেরা উহা ভোগ করে। মানুষ নিজে তো তাহার সম্পদ হইতে বঞ্চিত হইয়া যায় ; অথচ অন্য লোকেরা উহা দ্বারা তাহাদের বাহেশ পূরণ করে।

(এতদ্ব্যক্)

উপরের হাদীসে উল্লেখিত ঘটনা অপর এক হাদীসে ভিন্নরূপে বর্ণিত হইয়াছে। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের মধ্যে কি এমন কেহ আছে, যাহার নিকট নিজের সম্পদ তাহার ওয়ারিশদের সম্পদ হইতে বেশী প্রিয়? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিই এমন যে, তাহার নিকট নিজের সম্পদ বেশী প্রিয়। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, চিন্তা করিয়া বল, বুঝিয়া বল। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা তো এইরূপই মনে করি যে, আমাদের প্রত্যেকের নিকট তাহার নিজের সম্পদ বেশী প্রিয়। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের মধ্যে কেহই এমন নাই, যাহার নিকট তাহার নিজের সম্পদ হইতে ওয়ারিশের সম্পদ বেশী প্রিয় নয়। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, হযূর! ইহা কিভাবে? হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের সম্পদ উহা, যাহা তোমরা অগ্রিম পাঠাইয়া দিয়াছ, আর ওয়ারিশের সম্পদ উহা, যাহা পিছনে রাখিয়া গিয়াছ। (কানয)

এখানে একটি বিষয় খেয়াল করিতে হইবে যে, এই সমস্ত রেওয়াজাতের উদ্দেশ্য ওয়ারিশদেরকে বঞ্চিত করা নয়। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং এই বিষয়ে সতর্ক করিয়াছেন।

হযরত সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাযিঃ) যক্ষা বিজয়ের সময় এত যারাত্মক অসুস্থ হইলেন যে, বাঁচিবার আশা ছিল না। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে দেখিবার জন্য গেলেন। তখন তিনি আরজ করিলেন, হযূর! আমার নিকট অনেক সম্পদ রহিয়াছে এবং আমার ওয়ারিশ শুধু আমার একমাত্র কন্যা। আমার ইচ্ছা হয় যে, সমস্ত সম্পদের ব্যাপারে ওসিয়ত করিয়া যাইব (সেই সময় তাহার সন্তান একমাত্র কন্যা ছিল আর তাহার গুরুপোষণ স্বামীর দায়িত্বে ছিল)। হযূর সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিবেদন করিয়া দিলেন। তিনি দুই-তৃতীয়াংশের অনুমতি চাহিলেন। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাও অস্বীকার করিলেন। অতঃপর অর্ধেক সম্পদ ওসিয়তের অনুমতি চাহিলেন। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাও কবুল করিলেন না। তখন তিনি এক-তৃতীয়াংশ ওসিয়তের অনুমতি চাহিলেন। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহার অনুমতি দিলেন এবং এরশাদ করিলেন, এক-তৃতীয়াংশও অনেক। তোমরা নিজেদের ওয়ারিশদেরকে (অর্থাৎ, মৃত্যুর সময় যাহারাই থাকে, যেমন হযরত সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের এই ঘটনার পর আরও সজ্ঞান হইয়াছিল) ধনবান অবস্থায় রাখিয়া যাও। ইহা তাহাদেরকে অভাবগ্রস্ত রাখিয়া যাওয়া হইতে উত্তম। কেননা, তখন তাহারা মানুষের সামনে ভিক্ষার হাত প্রসারিত করিবে। যে কোন খরচ আল্লাহর জন্য করা হয় উহাতে অবশ্যই সওয়াব রহিয়াছে। এমনকি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যদি স্ত্রীকে একটি লোকমা দেওয়া হয়, তবে ইহারও সওয়াব রহিয়াছে। (মিশকাত : বুখারী, মুসলিম)

হাফেয ইবনে হজর (রহঃ) বলেন, হযরত সাদ (রাযিঃ)এর এই ঘটনা পূর্বে বর্ণিত হাদীস—অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যাহার নিকট ওয়ারিশের মাল বেশী প্রিয়—এর বিপরীত নয়। কেননা, এই হাদীসের উদ্দেশ্য হইল, সুস্থ অবস্থায় এবং প্রয়োজনের সময় দান-খয়রাত করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা। পক্ষান্তরে, হযরত সাদ (রাযিঃ)এর ঘটনায় মৃত্যুশয্যা সমস্ত মাল অথবা অধিকাংশ মাল ওসিয়ত করা উদ্দেশ্য ছিল।

(ফাত্হ)

অধম বান্দার নিকট শুধু ইহাই নয় ; বরং ওয়ারিশদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে ওসিয়ত করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন কোন পুরুষ এবং মহিলা আল্লাহ তায়ালার অনুগত থাকিয়া জীবনের ৬০টি বৎসর কাটাইয়া দেয়। যখন মৃত্যুর সময় আসে, তখন ওসিয়তের ব্যাপারে অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করার কারণে জাহান্নামের আগুন তাহাদের জন্য জরুরী হইয়া যায়। অতঃপর ইহার সমর্থনে হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) কুরআন পাকের এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন : **مَنْ بَعْدَ وَحَيْبُهَا** যাহার অর্থ এই যে, উপরের আয়াতে ওয়ারিশদের মধ্যে সম্পদ বন্টনের বিস্তারিত যে ধারা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা ওসিয়ত পরিমাণ সম্পদ পৃথক করার পর হইবে আর যদি মৃত ব্যক্তির

জিম্মায় করজ্ঞ থাকে, তবে করজ্ঞের পরিমাণ আলাদা করিবার পর হইবে। আর এই বন্টন এমনভাবে করিতে হইবে, যাহাতে ওসিয়তকারী ব্যক্তি কোন ওয়ারিশের ক্ষতিসাধন না করে। (নিসা : ১১)

এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি কোন ওয়ারিশকে তাহার মিরাস হইতে বঞ্চিত করিবে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে জাহান্নামের মিরাস হইতে বঞ্চিত করিবেন। (মিশকাত)

অতএব, এই বিষয়টি খুব বেশী খেয়াল রাখিতে হইবে যে, ওসিয়ত এবং আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার ব্যাপারে কাহাকেও মিরাস হইতে বঞ্চিত করা যেন কখনও উদ্দেশ্য না হয়, বরং নিজের প্রয়োজন পূরা করা এবং আখেরাতের জন্য সঞ্চয় করা যেন নিয়ত ও উদ্দেশ্য হয়। এবাদতের মধ্যে মানুষের নিয়ত ও উদ্দেশ্যের অত্যন্ত দখল রহিয়াছে।

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিখ্যাত হাদীস রহিয়াছে اِنَّمَا بِالْاَعْمَالِ النَّبَاتُ অর্থাৎ, নিয়তের উপরই যাবতীয় আমলের ফলাফল নির্ভর করে। নামাযের মত গুরুত্বপূর্ণ এবাদত যখন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয়, তখন কত বেশী সওয়াব পুরস্কার ও নৈকট্যের কারণ হয়; অন্য কোন এবাদত ইহার সমতুল্য নাই। এই নামাযই যদি রিয়া ও লোক দেখানোর জন্য করা হয়, তবে ইহা শিরকে আসগর (ছোট শিরক) ও শাস্তিযোগ্য অপরাধে পরিণত হয়। এইজন্য একমাত্র আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্টি এবং নিজের প্রয়োজন পূরা করা উদ্দেশ্য হওয়া চাই। ইহার সর্বোত্তম পন্থা হইল, নিজের জীবদ্দশায় সুস্থ শরীরে যখন ইহাও জানা থাকে না যে, আমি আগে মরিব নাকি আমার ওয়ারিশ আগে মরিবে এবং কে ওয়ারিশ হইবে আর কে ওয়ারিশ হইবে না; এইরূপ সময়ে আল্লাহর রাস্তায় খুব খরচ করিবে। যত বেশী হইতে বেশী দান-খয়রাত করা যায়, করিবে, ওসিয়ত করিবে, ওয়াকফ করিবে, যেখানে খরচ করিলে বেশী সওয়াবের আশা করা যায় সেই সকল ক্ষেত্রের তালাশ ও ফিকিরে লাগিয়া থাকিবে। এইরূপ যেন না হয় যে, জীবদ্দশায় কপণতা করিবে আর মৃত্যুর সময় দানশীল হইয়া যাইবে। যেমন হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ প্রথম পরিচ্ছেদের ৫ নম্বর হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, সর্বোত্তম দান-খয়রাত উহা, যাহা সুস্থ অবস্থায় করা হয়। এমন না হয় যে, মৃত্যুর সময় বলিবে, এই পরিমাণ সম্পদ অমূকের জন্য, এই পরিমাণ অমূকের জন্য, অথচ সম্পদ তখন অমূকের অর্থাৎ ওয়ারিশের হইয়া গিয়াছে। খুব ভাল করিয়া বুঝিয়া লও, সর্বপ্রথম আমি নিজেকে নসীহত করিতেছি, অতঃপর আমার বন্ধুদেরকে যে, শুধুমাত্র ঐ সম্পদই

সঙ্গে যাইবে, যাহা আল্লাহ তায়ালা ব্যাংকে জমা করা হইয়াছে। আর যে সম্পদ জমা করিয়া খুব বৃদ্ধি করিয়া রাখিয়া দিয়াছে, উহা নিজের কাজে আসিবে না।

পরবর্তীতে না কোন মা-বাপ স্মরণ রাখে, না স্ত্রী-সন্তানেরা জিজ্ঞাসা করে ; তবে তাহারা ছাড়া যাহাদেরকে আল্লাহ তৌফিক দান করেন। মোটকথা, নিজের আমলই নিজের কাজে আসিবে। মা-বাপ পরিবার পরিজনদের ভালবাসার সারমর্ম হইল দুই-চারদিন হায় হায় করা এবং পাঁচ-সাতদিন অনর্থক কান্নাকাটি করা। আর যদি কান্নাকাটি করিতেও পয়সা খরচ করিতে হয়, তবে ইহাও হইবে না। সন্তান-সন্ততির কল্যাণের খেয়ালে সম্পদ জমা করিয়া যাওয়া নফসের ধোকা ছাড়া কিছু নয়। শুধু সম্পদ জমা করিয়া রাখিয়া যাওয়া তাহাদের প্রতি কল্যাণ কামনা নয়, বরং কখনও ইহা তাহাদের প্রতি অকল্যাণ কামনা হইতে পারে। যদি প্রকৃতই সন্তানদের কল্যাণ উদ্দেশ্য হয়, যদি বাস্তবিকই অন্তর চায় যে, সন্তানরা তাহার মৃত্যুর পর যেন বিপর্ষিত, অপদস্থ ও লাঞ্চিত না হয়, তবে তাহাদিগকে মালদার অবস্থায় রাখিয়া যাওয়ার চাইতে দীনদার অবস্থায় রাখিয়া যাওয়া বেশী জরুরী। কেননা, বদ্বীনী অবস্থায় থাকিলে প্রথমতঃ সম্পদও তাহাদের নিকট থাকিবে না। কয়েক দিনের আমোদ-প্রমোদেই তাহা উড়িয়া যাইবে। আর যদি সম্পদ অবশিষ্ট থাকেও, তবে নিজের কোন কাজে আসিবে না। পক্ষান্তরে, দীনদারীর সহিত যদি সম্পদ নাও থাকে, তবে তাহাদের দীনদারী তাহাদের জন্যও কাজে আসিবে এবং নিজের জন্যও কাজে আসিবে। আর সম্পদের মধ্য হইতে তো নিজের কাজে শুধু উহাই আসিবে, যাহা সে সঙ্গে লইয়া গিয়াছে।

হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালা দুইজন ধনী ও দুইজন গরীব ব্যক্তিকে মৃত্যু দিলেন। অতঃপর একজন ধনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি নিজের জন্য অগ্রিম কি পাঠাইয়াছ এবং নিজের পরিবার পরিজনদের জন্য কি রাখিয়া আসিয়াছ? সে আরজ করিল, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদেরকেও সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রত্যেক ব্যক্তির রিয়িকের দায়িত্ব আপনিই গ্রহণ করিয়াছেন। আর আপনি কুরআন পাকে বলিয়াছেন : **مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا** (প্রথম পরিচ্ছেদের পাঁচ নম্বর আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে।) অতএব, আমি আমার সম্পদ অগ্রিম পাঠাইয়া দিয়াছি। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে, আপনি

তাহাদেরকে অবশ্যই রিযিক প্রদান করিবেন। আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, আচ্ছা যাও। তুমি যদি (দুনিয়াতে) জানিতে যে, তোমার জন্য আমার নিকট কি কি (নেয়ামত ও সম্মান) রহিয়াছে, তবে তুমি দুনিয়াতে অনেক আনন্দিত হইতে এবং অনেক কম দুঃখিত হইতে। অতঃপর দ্বিতীয় ধনী ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি নিজের জন্য কি পাঠাইয়াছ এবং পরিবার-পরিজনের জন্য কি রাখিয়া আসিয়াছ? সে আরজ করিল, হে আল্লাহ! আমার সন্তান-সন্ততি ছিল, তাহাদের কষ্ট ও দরিদ্রতার ব্যাপারে আমার ভয় হইয়াছে। আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, আমিই কি তোমাকে এবং তাহাদের সকলকে পয়দা করিয়াছিলাম না? আমি কি তাহাদের সকলের রিযিকের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলাম না? সে আরজ করিল, হে আল্লাহ! নিঃসন্দেহে এইরূপই ছিল। কিন্তু তাহাদের দরিদ্রতার ভয় আমার বেশী হইয়াছিল। আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, তাহারা তো দরিদ্রতার মধ্যে পতিত হইয়াছে, তুমি কি তাহাদের হইতে দরিদ্রতাকে দূর করিতে পারিয়াছ? আচ্ছা যাও, যদি তুমি (দুনিয়াতে) জানিতে পারিতে যে, তোমার জন্য আমার নিকট কি কি (আযাব) রহিয়াছে, তবে অনেক কম হাসিতে এবং অনেক বেশী কাঁদিতে। অতঃপর একজন ফকিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি নিজের জন্য কি জমা করিয়াছ এবং পরিবার পরিজনের জন্য কি রাখিয়া আসিয়াছ? সে আরজ করিল, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে সুস্থ সবল করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, বাকশক্তি দিয়াছেন, আমাকে আপনার পবিত্র নাম শিখাইয়াছেন, আপনার নিকট দোয়া করা শিখাইয়াছেন। আপনি যদি আমাকে সম্পদ দান করিতেন, তবে আশঙ্কা ছিল, আমি উহাতে মশগুল হইয়া যাইতাম। আমি যেই অবস্থায় ছিলাম উহার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট আছি। এরশাদ হইল, আচ্ছা যাও, আমিও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট আছি। যদি তুমি (দুনিয়াতে) জানিতে পারিতে যে, তোমার জন্য আমার নিকট কি রহিয়াছে, তবে তুমি অনেক বেশী হাসিতে এবং অনেক কম কাঁদিতে। অতঃপর দ্বিতীয় গরীবকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তুমি নিজের জন্য কি পাঠাইয়াছ এবং পরিবার-পরিজনের জন্য কি রাখিয়া আসিয়াছ? সে আরজ করিল, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে কিইবা বা দান করিয়াছিলেন, যাহা সম্পর্কে এখন প্রশ্ন করিতেছেন? এরশাদ হইল, আমি কি তোমাকে সুস্থতা দান করিয়াছিলাম না? বাকশক্তি দান করিয়াছিলাম না? শ্রবণশক্তি ও দেখার শক্তি দিয়াছিলাম না? এবং কুরআন পাকে কি এই কথা বলিয়াছিলাম না, **أَعْرَضْنَا عَنْكَ لَكُم** আমার নিকট দোয়া কর, আমি কবুল করিব। সে আরজ করিল, হে

আল্লাহ! এই সবকিছু নিঃসন্দেহে সঠিক, কিন্তু আমার ভুল হইয়া গিয়াছে। এরশাদ হইল, আচ্ছা আজকে আমিও তোমাকে ভুলিয়া গিয়াছি, যাও চলিয়া যাও, যদি তুমি জানিতে যে, তোমার জন্য আমার নিকট কি কি আয়াব রহিয়াছে, তবে অনেক কম হাসিতে এবং অনেক বেশী কৌদিতে। (আনব)

عَنْ حَمْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجَبَابِ مَزْدُوقِي وَالْمُكْرِكُو مَلْعُونُونَ۔ (رواه ابن ماجة والدارمی کذا فی مشکوٰۃ)۔
 حضرت عمرؓ حضورِ اقدسؐ سے فرمایا کہ جو شخص رزق (خود وغیرہ) باہر سے لے کر (تاکہ لوگوں کو انڈال دے) اس کو مذوی دی جاتی ہے، اور جو شخص تک کر کہ وہ ملعون ہے۔

১০) হযরত ওমর (রাযিঃ) হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি (জনসাধারণকে কম মূল্যে দেওয়ার জন্য) বাহির হইতে রিযিক (খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি) আনয়ন করে, তাহাকে কুজি দেওয়া হয়। আর যে ব্যক্তি জমা করিয়া রাখে, সে অভিশপ্ত।

(মিশকাত : ইবনে মাজা, দারিমী)

ফায়দা : ফকীহ আবু লায়স সমরকন্দী (রহঃ) বলেন, 'বাহির হইতে আনয়নকারী' দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে বুঝান হইয়াছে, যে ব্যবসার উদ্দেশ্যে অন্যান্য শহর হইতে খাদ্যসামগ্রী খরিদ করিয়া আনে, যাহাতে সাধারণ লোকদের নিকট (কম দামে) বিক্রয় করিতে পারে। তাহাকে (আল্লাহ তায়ালা পক্ষ হইতে) কুজি দেওয়া হয়। কেননা, তাহার দ্বারা সর্বসাধারণ উপকৃত হয়, তাহাদের দোয়া তাহার পক্ষে কবুল হয়। আর যে 'জমা করিয়া রাখে' ইহা দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে বুঝান হইয়াছে, যে গুদামজাত করিবার উদ্দেশ্যে খরিদ করিয়া রাখে, আর উহাতে সাধারণ লোকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (তানবীহুল গাফেলীন) অর্থাৎ, মূল্যবৃদ্ধির অপেক্ষায় মাল আটকাইয়া রাখে, মানুষের প্রয়োজন সত্ত্বেও বিক্রয় করে না। সে অভিশপ্ত অর্থাৎ কার্পন্য, লোভ এবং বেশী লাভ পাওয়ার উদ্দেশ্যে খাদ্যসামগ্রী ইত্যাদি মানুষের জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ খরিদ করিয়া আটকাইয়া রাখে এবং মূল্যবৃদ্ধির জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে, তাহার প্রতি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হইতে অভিশাপ দেওয়া

হইয়াছে।

অন্য এক হাদীসে ছয়র সাদিকাত আল্লাহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি মুসলমানদের খাদ্যদ্রব্য (তীর প্রয়োজন সত্ত্বেও) চল্লিশ দিন পর্যন্ত আটকাইয়া রাখে (বিক্রয় করে না), আল্লাহ তায়ালা তাহাকে কুষ্ঠরোগ ও দরিদ্রতার মধ্যে লিপ্ত করেন। (মিশকাত)

এই হাদীস দ্বারা জানা গেল, যে ব্যক্তি মুসলমানদের ক্ষতি করে এবং তাহাদেরকে অভাবে লিপ্ত করে, সেই ব্যক্তির উপর দৈহিক শাস্তি (কুষ্ঠ রোগ)ও দেওয়া হয় এবং আর্থিক শাস্তি, দরিদ্রতা ও অভাব দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে, প্রথম হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি অন্য জায়গা হইতে আনয়ন করিয়া সস্তায় বিক্রয় করে, আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং তাহাকে রুজি (ও লাভ) দান করেন।

অন্য এক হাদীসে আছে, খাদ্যদ্রব্য যে আটকাইয়া রাখে, সে কত মন্দ লোক যে, মূল্য কমিয়া গেলে সে দুঃখিত হয়, আর মূল্য বৃদ্ধি পাইলে সে আনন্দিত হয়।

অন্য এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি (মানুষের প্রয়োজন সত্ত্বেও) চল্লিশ দিন খাদ্যদ্রব্য আটকাইয়া রাখে (বিক্রয় করে না) অতঃপর উহা লোকদের উপর সদকা করিয়া দেয়, তবুও এই সদকা করা তাহার ঐ আটক করিয়া রাখার কাফফারা (ক্ষতিপূরণ) হইবে না। (মিশকাত)

এক হাদীসে আসিয়াছে, আগেকার উম্মতের মধ্যে এক বুয়ুর্গ ব্যক্তি একটি বালুর টিলার নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তখন দুর্ভিক্ষের সময় ছিল। তিনি মনে মনে এই আকাঙ্ক্ষা করিতে লাগিলেন যে, এই বালুর টিলা যদি খাদ্যশস্যের স্তূপ হইত, তবে আমি উহা দ্বারা বনি ইসরাঈল গোত্রের লোকদেরকে খুব খাওয়াইতাম। আল্লাহ তায়ালা ঐ সময়ের নবীর প্রতি ওহী পাঠাইলেন যে, অমুক বুয়ুর্গকে সুসংবাদ শুনাইয়া দাও যে, আমি তোমার আমলনামায় এই বালুর টিলা পরিমাণ খাদ্যশস্য লোকদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়ার সওয়াব লিখিয়া দিয়াছি। (তাম্বীহুল গাফেলীন)

আল্লাহ তায়ালা নিকট সওয়াবের কোন কমি নাই। সওয়াব ও পুরস্কার দেওয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালা না কোন শস্যের প্রয়োজন হয়, না কোন আমদানী ও উপার্জনের প্রয়োজন হয়। সমগ্র দুনিয়ার খাদ্য-শস্য তাহার এক ইশারার অধীন রহিয়াছে। তাহার দরবারে মানুষের আমল ও এখলাস দেখা হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করে, তাহার প্রতি দয়া ও অনুগ্রহের ব্যাপারে কোন কমি করা হয় না।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)এর খেদমতে এক ব্যক্তি হাঙ্গির হইয়া আরজ করিল, আমাকে কিছু নসীহত করুন। তিনি বলিলেন, তোমাকে ছয়টি বিষয় নসীহত করিতেছি। সর্বপ্রথম, যে সমস্ত বিষয় আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং দায়িত্ব লইয়া রাখিয়াছেন, উহার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা উপর ভরসা ও একীন রাখ (যেমন, রুজি-রোজগার ইত্যাদি)। দ্বিতীয়, আল্লাহ তায়ালা ফরজসমূহকে সময়মত আদায় কর। তৃতীয়, জবানকে আল্লাহ তায়ালা যিকিরের দ্বারা তরতাজা রাখ। চতুর্থ, শয়তানের কথা মানিও না, কেননা, সে সমস্ত মখলুকের সহিত হিংসা রাখে। পঞ্চম, দুনিয়া আবাদ করার মধ্যে লিপ্ত হইও না, কেননা, ইহা আখেরাতকে বরবাদ করিয়া দেয়। ষষ্ঠ, সর্বদা মুসলমানদের উপকার করিবার চেষ্টা কর।

ফকীহ আবুল লায়স (রহঃ) বলেন, মানুষের সৌভাগ্যের এগারটি নিদর্শন রহিয়াছে এবং মানুষের দুর্ভাগ্যের এগারটি নিদর্শন রহিয়াছে। সৌভাগ্যের এগারটি নিদর্শন এই—

১. দুনিয়ার প্রতি অমনোযোগী ও আখেরাতের প্রতি মনোযোগী হওয়া। ২. বেশী বেশী এবাদত ও কুরআন পাকের তেলাওয়াত করা। ৩. অহেতুক কথাবার্তা ও কাজকর্ম হইতে বাঁচিয়া থাকা। ৪. বিশেষ গুরুত্বসহকারে সময়মত নামায পড়া। ৫. যত ক্ষুদ্রই হউক না কেন, হারাম জিনিস হইতে বাঁচা। ৬. নেক বান্দাদের সান্নিধ্য গ্রহণ করা। ৭. বিনয়ী হওয়া; অহংকার না করা। ৮. দানশীল ও দয়ালু হওয়া। ৯. আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি দয়া প্রদর্শন করা। ১০. সৃষ্টির কল্যাণ সাধন করা। ১১. মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ করা।

আর দুর্ভাগ্যের এগারটি নিদর্শন এই—

১. সম্পদ জমা করার লোভ। ২. দুনিয়াবী ভোগ-বিলাস ও খাহেশের মধ্যে লিপ্ত হওয়া। ৩. অশ্লীল কথাবার্তা ও অধিক কথা বলা। ৪. নামাযে অলসতা করা। ৫. হারাম ও সন্দেহজনক জিনিস খাওয়া এবং বদকার ও দুট লোকদের সহিত মিলামেশা করা। ৬. দুশ্চরিত্র হওয়া। ৭. অহংকারী ও গর্বকারী হওয়া। ৮. মানুষের উপকার না করা। ৯. মুসলমানদের প্রতি দয়া না করা। ১০. কৃপণ হওয়া। ১১. মৃত্যুকে ভুলিয়া যাওয়া।

(ডাক্তার গাফেলীন)

অধম বান্দার খেয়ালে এই সবকিছুর মূল হইল, মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ করা। যদি সর্বদা মৃত্যুর কথা স্মরণ থাকে, তবে প্রথমোক্ত এগারটি নিদর্শন ইনশাআল্লাহ পয়দা হইয়া যাইবে এবং পরবর্তী এগারটি হইতে

বাঁচিয়া থাকিও যাইবে।

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুকুম করিয়াছেন, স্বাদ বিনষ্টকারী মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ কর। (মিশকাত)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ تَوَفَّيَ رَجُلًا مِّنَ السَّعَابَةِ فَقَالَ رَجُلٌ أَبْشِرْ بِالْبَعْثَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ لَا تَذَرْنِي لَعَلَّكُمْ تَحْكُمُونِي مَا لَا يَعْنِيهِ أَوْ يَخْلُ بِمَا لَا يَنْقُصُهُ۔ (رواه الترمذی هكذا في المشكاة)

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو ایک سال بیمار ہوا تو مجمع میں سے کسی نے ان کو بظاہر حالت کے اعتبار سے جنتی بتایا۔ حضورؐ نے فرمایا تمہیں کیا خبر ہے، ممکن ہے کہ یہی انہوں نے بیکاربت زبان سے کوئی نکال دی ہو، یا کہ یہی ایسی چیز میں بخل کیا ہو، جس سے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا تھا۔

(ۧ) ہযরত آناسؓ (রাযিঃ) বলেন, একজন সাহাবী (রাযিঃ) এর মৃত্যুর পর মজলিসে উপস্থিত লোকদের মধ্য হইতে কেহ তাহার বাহ্যিক অবস্থা হিসাবে তাহাকে জ্ঞানাতী বলিল। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার কি জ্ঞানা আছে, সম্ভবতঃ জবান দ্বারা সে কখনও অহেতুক কথা বলিয়াছে অথবা সে কখনও এমন বিষয়ে কার্পণ্য করিয়াছে, যাহাতে (কার্পণ্য না করিলে) তাহার কোন ক্ষতি হইত না।

(মিশকাত : তিরমিযী)

ফায়দা : অর্থাৎ, এই সমস্ত বিষয়ও প্রথম পর্যায়ে জ্ঞানতে প্রবেশের ব্যাপারে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইবে। অথচ অহেতুক কথাবার্তায় লিপ্ত থাকা এবং অহেতুক কথা বলিয়া সময় নষ্ট করা আমাদের এমন প্রিয় কাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, কাহারো খুব কম বৈঠকই ইহা হইতে মুক্ত থাকে। কিন্তু উম্মতের প্রতি হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দয়া ও মেহেরবানীর উপর কুরবান হওয়া উচিত যে, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল সমস্যার সমাধান বলিয়া দিয়াছেন। মাত্র তেইশ বছরের স্বল্প সময়ে সারা দুনিয়ার সকল প্রকার ক্ষরুণী ও প্রয়োজনীয় বিষয়াবলীর সমাধানও নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন।

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাক এরশাদ রহিয়াছে, নিম্নে বর্ণিত দোয়াটি মজলিসের কাফফারা স্বরূপ, মজলিস খতম হওয়ার পর উঠবার পূর্বে এই দোয়া পড়িয়া লইবে—

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ (حصن حصين)

উক্ত হাদীসে দ্বিতীয় বিষয় কৃপণতা সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, হয়ত সেই ব্যক্তি এমন কোন জিনিসের ব্যাপারে কৃপণতা করিয়াছে, যাহাতে তাহার কোন ক্ষতি ছিল না।

অন্য এক হাদীসে এই ঘটনা আরও বিস্তারিতভাবে আসিয়াছে। উহাতে হযূর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ রহিয়াছে যে, হয়ত সে কোন অহেতুক বিষয়ে কথাবার্তা বলিয়াছে অথবা কোন অহেতুক বিষয়ে কৃপণতা করিয়াছে। (কানয)

আমরা অনেক কিছুকেই মামুলী মনে করিয়া থাকি। অথচ আল্লাহ তায়ালায় নিকট সওয়াব ও আযাবের দিক দিয়া উহা অনেক উচ্চ পর্যায়ের হইয়া থাকে। বুখারী শরীফের এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, মানুষ তাহার জ্বান দ্বারা আল্লাহ তায়ালায় সন্তুষ্টির এমন কোন কথা বলে ; যাহাকে সে কোন গুরুত্বপূর্ণ মনে করে না। অথচ উহার কারণে সে অনেক উচ্চ পর্যায়ের অধিকারী হইয়া যায়। এমনভাবে, আল্লাহ তায়ালায় অসন্তুষ্টির এমন কোন কথা বলিয়া বসে, যাহাকে সে কোন গুরুত্বপূর্ণ মনে করে না ; অথচ উহার কারণে তাহাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়। অন্য হাদীসে আছে, তাহাকে পূর্ব হইতে পশ্চিমের দূরত্ব পরিমাণ নিচে নিক্ষেপ করা হয়। (বিশকাত)

أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ خَدِجَةُ امْرَأَتُ رَسُولِ اللَّهِ
مِنْ كَسَى شَيْءٍ مِنْ لَحْمٍ كَأَيْكٍ مِنْ لَحْمِ الْبَقَرِ
بِهَا) بِرَيْكَ طَوْرٍ بِرَيْكَ كَيْسٌ مِنْ لَحْمِ الْبَقَرِ
أَقْدَسَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرُغْمَةٍ كَأَيْكٍ
بِهِتْ شَوْقٍ تَحَاءُ اسْمُهُ مَعْقُودٌ مَسْكُودٌ
لَخَدِجَةَ مَعْقُودٌ فَرَأَى كَرُغْمَةً كَأَيْكٍ
وَمِنْ مَشَايِدِ كَسَى وَكَلَّتْ خَدِجَةُ نَوَاشِلَ فَرَأَى
لَيْسَ - خَدِجَةَ مَعْقُودٌ اسْمُهُ كَرُغْمَةٍ كَأَيْكٍ
لَكَ دِيَا - اسْمُهُ كَرُغْمَةٍ كَأَيْكٍ سَائِلَ آيَا، اَوْر

⑫ عَنْ مَوْلَى لِعُثْمَانَ قَالَ
أُحْدِي لَيْلٍ سَلَمَةٌ رُ
يُضَعُّ مِنْ لَحْمٍ وَكَانَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَعِيبُهُ اللَّحْمَ فَقَالَتْ
لِلْعَاوِمِ فَمِيعُو فِي الْبَيْتِ
لَعَلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَأْكُلُهُ فَوَضَعَتْهُ فِي
كُوَّةِ الْبَيْتِ وَجَاءَ سَائِلٌ

দেওনে পিকটুই জুওক সুওয়াল কিয়াকি আল্লাহ
 কে واسطے দেও! আল্লাহ জল শতা তমবার
 یہاں برکت فوٹے۔ گھر میں سے جواب
 ملا کہ اللہ تعالیٰ التجہ برکت مسدود ارشاد
 تھا کہ کوئی چیز دینے کے لئے موجود نہیں
 وہ سائل تو چلا گیا۔ اتنے میں حضور اقدس
 صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور
 ارشاد فرمایا کہ اُمّ سلمہؓ میں کچھ کھانا پاتا
 ہوں، کوئی چیز تمہارے یہاں ہے حضرت
 اُمّ سلمہؓ نے خادمہ سے فرمایا کہ جاؤ، وہ
 گوشت حضورؐ کی خدمت میں پیش کرو۔
 وہ اندر گئیں اور جا کر دیکھا کہ طاق میں
 گوشت تہہ نہیں، سفید پتھر کا ایک
 ٹکڑا لٹکا ہوا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
 و سلم کو واقعہ معلوم ہوا تو حضورؐ نے فرمایا
 تم نے وہ گوشت جو بکر سائل (فقیر) کو نہ دیا
 اسلئے وہ گوشت پتھر کا ٹکڑا بن گیا۔

فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ
 تَصَدَّقُوا بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ
 فَقَالُوا بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ
 فَذَهَبَ السَّائِلُ فَدَعَلَ
 النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَقَالَ يَا أُمَّ مَسْلَمَةَ هَلْ
 عِنْدَكُمْ شَيْءٌ أَطْعَمُهُ فَقَالَتْ
 نَعَمْ قَالَتْ لِلْخَادِمِ إِذْهَبِي
 فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ اللَّحْمِ
 فَذَهَبَتْ فَلَمْ تَجِدْ فِي
 الْكُوَّةِ إِلَّا قِطْعَةً مَرْدَةٍ
 فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ فَإِنَّ ذَلِكَ اللَّحْمَ عَادَ
 مَرْدَةً لِمَا لَمْ تُعْطُوهُ
 السَّائِلَ۔ (رواه البيهقي في
 دلائل النبوة كذا في المشكاة)

(۱۵) উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রাযিঃ)এর খেদমতে এক
 ব্যক্তি গোশতের একটি (রাগ্না করা) টুকরা হাদিয়া স্বরূপ দান করিল।
 যেহেতু হযূর সালামাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম গোশত খুবই পছন্দ
 করিতেন, এই কারণে হযরত উম্মে সালামা খাদেমাকে বলিলেন, ইহাকে
 ভিতরে রাখিয়া দাও, হযরত কোন সময় হযূর সালামাহ আল্লাইহি
 ওয়াসাল্লাম আহার করিবেন। খাদেমা উহাকে ভিতরে একটি তাকে রাখিয়া
 দিল। কিছুক্ষণ পর একজন ভিক্ষুক আসিয়া দরজায় দাঁড়াইয়া সওয়াল
 করিল, আল্লাহর ওয়াস্বে কিছু দাও, আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে বরকত
 দান করুন। ঘর হইতে জওয়াব আসিল, আল্লাহ তোমাকে বরকত দিন

(ইহার অর্থ, দেওয়ার মত কিছুই নাই)। ভিক্ষুক চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পর ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তলরীফ আনিলেন এবং এরশাদ করিলেন, হে উম্মে সালামা! আমি কিছু বাইতে চাই, তোমার নিকট কিছু আছে কি? হযরত উম্মে সালামা (রাযিঃ) খাদেমাকে বলিলেন, যাও, গোশতের ঐ টুকরাটি ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে রাখ। খাদেমা ভিতরে যাইয়া দেখিল, তাকের উপর গোশত নাই, একটি সাদা পাথরের টুকরা পড়িয়া রহিয়াছে। (ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘটনা জানিলেন, তখন) বলিলেন, তোমরা ঐ গোশত যেহেতু ফকীরকে দাও নাই, এইজন্য উহা পাথরে পরিণত হইয়া গিয়াছে।

(মিশকাত : বায়হাকী দালায়েলুন-নুবুওয়াত)

ফায়দা : ইহা অত্যন্ত শিক্ষণীয় ঘটনা। ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বিবিগণের দানশীলতা ও বদান্যতার মুকাবেলা কে করিতে পারে। যদি গোশতের একটি টুকরা তিনি প্রয়োজনের খাতিরে রাখিয়া দিয়াছেন এবং উহাও নিজের প্রয়োজনে নয় বরং ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রয়োজনে রাখিয়া দিয়াছেন, উহারও এই পরিণতি হইল। আর ইহাও প্রকৃতপক্ষে ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরওয়ালাদের সহিত আল্লাহ তায়ালার বিশেষ অনুগ্রহ ছিল যে, ভিক্ষুককে না দেওয়ার কারণে ঐ গোশতের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল, উহা ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতে বাস্তব আকৃতিতে তাহাদের উপর প্রকাশ পাইয়া গিয়াছে। যাহার অর্থ হইল, অভাবী লোকদের হইতে বাঁচাইয়া এবং অস্বীকার করিয়া যে ব্যক্তি ভক্ষণ করিল, সে প্রতিক্রিয়া ও পরিণতি হিসাবে যেন পাথর ভক্ষণ করিল। কেননা, ইহাতে ঐ বস্তুর প্রকৃত ফায়দা হাসিল হইবে না। বরং দিন কঠিন হইয়া যাইবে এবং উহার উপকারিতা হইতে বঞ্চিত হইয়া যাইবে। এই কারণেই আমরা আল্লাহ তায়ালার অনেক নেয়ামত ভক্ষণ করিয়া থাকি ; কিন্তু উহার যে সমস্ত ফায়দা হাসিল হওয়ার কথা উহা খুব কমই আমাদের হাসিল হয়। অথচ আমরা বলিয়া থাকি যে, দ্রব্যগুণ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের নিয়ত খারাপ হইয়া গিয়াছে। নিয়তের খারাবীর কারণে উপকার কম হইয়া থাকে।

مَنْ عَمِلَ بِمَا فِي هَذِهِ الْقُرْآنِ
أَوْ بِمَا فِي هَذِهِ السُّنَنِ
أَوْ بِمَا فِي هَذِهِ الْكِتَابِ
أَوْ بِمَا فِي هَذِهِ الشَّيْءِ
أَوْ بِمَا فِي هَذِهِ الْوَسْطِ
أَوْ بِمَا فِي هَذِهِ الْوَسْطِ
أَوْ بِمَا فِي هَذِهِ الْوَسْطِ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَعْنِبَعٍ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَوَّلُ صَلَاحٍ

هَذِهِ الْأُمَّةُ الْيَكِينِي وَالرُّهْلُ
وَأَوَّلُ مُسَادِهَا الْبُغْلُ وَالْأَمَلُ
(رواه البيهقي في الشعب كذا
في المشكاة)

اور دنیا سے جلد رخصتی سے ہوتی اور
اس کے فساد کی ابتداء بخل و بخل سے
اُمیدوں سے (ہوگی)۔

①۳) حضور سادہ کلام آلائیہ ہی و یا سادہ کلام ارشاد فرمایا ہے، اے
اسلام کے پیروں کی سچائی (آپ سادہ کلام کے ساتھ) ایک اور دنیوی
پرستی انسانیت کے واسطے ہے اور اے اسلام کے پیروں کی سچائی
کمال و دیر آسائش کے واسطے (ہے)۔ (مشکوٰۃ : باب الحاکم و آداب)

فایادو : ایک وقت کے کمال و دیر آسائش ہی سے ہی پیدا ہوتا ہے۔
کمال، انسان نے کمال کے دور کے پرکھنا چاہتا ہے۔ اسی پر ہی انسان
کمال کا کمال کرنے کی فکر کرتا ہے۔ انسان اگر مہذب کے تصور کرتا ہے
اور اے کمال چاہتا ہے کہ وہ، انسان نہ ہی کمال کے دور
رہتا ہے، تب نہ ہی کمال کے دور کی فکر کرتا ہے، اور نہ ہی کمال
کمال کا کمال کرنے کے واسطے دیکھتا ہے۔ اور اگر کمال کے دور
کمال ہی سے ہے، تب نہ ہی کمال کے دور کی فکر کرتا ہے، اور نہ ہی کمال
کمال کا کمال کرنے کے واسطے دیکھتا ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
الْبَيْتُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
دَخَلَ عَلَى بِلَالٍ وَعِنْدَهُ
مِثْرَةٌ مِنْ تَمْرٍ فَقَالَ مَا
هَذَا يَا بِلَالُ - قَالَ شَيْءٌ
إِدْخَرْتَهُ لِيَقْبَلَ فَقَالَ أَمَا
تَكُنْشِي أَنْ تَرَى لَهُ عِدَا
بُعْدًا فِي نَارِ عَذَابِمْ أَلَوْ
يَا بِلَالُ وَلَا تَكُنْشِي مِنْ
رُؤْيِ الْعَرْشِ إِقْلَادُ - (مسند
البيهقي في الشعب كذا في المشكاة)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک
مرتبہ حضرت بلالؓ کے پاس داخل ہوئے
تو ان کے سامنے کھجوروں کا ایک ڈھیر لگا
ہوا تھا حضورؐ نے دریافت فرمایا، اگر
بلال یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا،
حضورؐ آئندہ کی ہوس یا عذبت کیلئے ذخیرہ ہے
مگر یہ کہ یا۔ حضورؐ نے فرمایا کہ بلال تم
اس سے نہیں کہتے کہ اس کی وجہ سے
کوئی مسکین کیلئے کھجور کی آگ کا دھواں نہ
دیکھو۔ بلال عرض کیا کہ اگر اللہ ارادہ فرمائے
(جملہ جملہ)۔ (مسند ابی حنیفہ و دیگر)

(১৪) ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার হযরত বেলাল (রাযিঃ)এর নিকট যাইয়া তাহার সম্মুখে খেজুরের একটি স্তুপ দেখিতে পাইলেন। ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বেলাল! ইহা কি? তিনি আরজ করিলেন, ছয়! ভবিষ্যতের প্রয়োজনে সংরক্ষণ করিয়া রাখিয়াছি। ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে বেলাল! তুমি কি এই ভয় করো না যে, ইহার কারণে কাল কিয়ামতের দিন তুমি জাহান্নামের আগুনের ধোঁয়া দেখিবে। হে বেলাল! খরচ করিয়া ফেল এবং আরশের মালিক আল্লাহ তায়ালা নিকট হইতে কোন কম হওয়ার আশংকা করিও না। (মিশকাত : বায়হাকী ও আব)

ফায়দা : প্রত্যেক ব্যক্তির ভিন্ন মর্যাদা ও ভিন্ন অবস্থা হইয়া থাকে। আমাদের মত দুর্বল ঈমান ও দুর্বল একীনওয়ালা লোকদের জন্য শরীয়তের দৃষ্টিতে ভবিষ্যতের প্রয়োজনে কিছু সংরক্ষণ করিয়া রাখার অবকাশ থাকিলেও হযরত বেলাল (রাযিঃ)এর মত উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন কামেল ঈমান ও একীনওয়ালা সাহাবীর জন্য ইহাই উপযুক্ত ছিল যে, আল্লাহ তায়ালা নিকট সামান্যতম কমির ভয় বা আশংকাও থাকিবে না। জাহান্নামের ধোঁয়া দেখার জন্য উহাতে প্রবেশ করা জরুরী নয়, কিন্তু ঐ সমস্ত লোকের ভুলনায় অবশ্য কম মর্তবা হইবে, যাহারা জাহান্নামের ধোঁয়াও দেখিবে না। আর কিছু না হোক কমপক্ষে হিসাব-নিকাশের বিষয়টি তো দীর্ঘ হইয়াই যাইবে। কোন কোন হাদীসে মামুলী পরিমাণ অর্থ এক দুই দীনারও কাহারো নিকট পাওয়া যাওয়ার কারণে ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হইতে জাহান্নামের আগুনের ঈশিয়ারী বর্ণিত হইয়াছে। যেমন, বন্ট পরিচ্ছেদে দুই নম্বর হাদীসে আসিতেছে। আর হিসাব নিকাশের বিষয় তো প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য রহিয়াছে। সম্পদ যত বেশী হইবে, হিসাব তত দীর্ঘ হইবে।

ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি জাহান্নামের দরজায় দাঁড়াইয়াছিলাম। দেখিলাম, সেখানে অধিকাংশ গরীব লোক প্রবেশ করিতেছে। আর ধনী লোকেরা তখনও আটক রহিয়াছে এবং জাহান্নামী লোকদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আর আমি জাহান্নামের দরজায় দাঁড়াইয়া দেখিলাম, উহাতে অধিকাংশ মহিলারা প্রবেশ করিতেছে। (মিশকাত)

মহিলাদের অধিক পরিমাণে জাহান্নামে দাখেল হওয়ার কারণ অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। হযরত আবু সাঈদ (রাযিঃ) বলেন, ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিন ঈদগাহে তশরীফ লইয়া

গেলেন। যখন মহিলাদের নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন, তখন হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদেরকে লক্ষ্য করিয়া এরশাদ করিলেন, তোমরা বেশী বেশী দান-খয়রাত কর। আমি মহিলাদেরকে অধিক সংখ্যায় জাহান্নামে দেখিয়াছি। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইহার কারণ কি? হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, মহিলারা অধিক পরিমাণে অভিশাপ (বদদোয়া) করে এবং স্বামীর নাশকরী করে। (মিশকাত)

এই দুইটি অভ্যাস মহিলাদের মধ্যে এত বেশী প্রচলিত যে, উহার সীমা নাই। যে সন্তানের জন্য তাহারা প্রাণ উৎসর্গ করে, সবসময় তাহার সুখ-শান্তি ও আরামের চিন্তা করিয়া থাকে, অতি সামান্য কারণে সবসময় তাহাকে তুই মরিয়া যা, ধ্বংস হইয়া যা, তোর সর্বনাশ হউক, ইত্যাদি কদম্বারা বদদোয়া দেওয়া যেন তাহাদের অভ্যাসে পরিণত হইয়া গিয়াছে। স্বামীর অকৃতজ্ঞতা সম্পর্কে বলার অপেক্ষা রাখে না। স্বামী বেচারা যতই তাহার মন জয় করিতে চেষ্টা করে, স্ত্রীর দৃষ্টিতে সে উদাসীনতাই প্রদর্শন করিয়া থাকে। সবসময় এই চিন্তায় মরিতে থাকে যে, স্বামী তাহার মাকে কোন জিনিস কেন দিয়া দিল, পিতাকে বেতনের মধ্য হইতে কিছু কেন দিয়া দিল, ভাই-বোনদের সহিত কেন ভাল আচরণ করিল।

অন্য এক হাদীসে আছে, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য গ্রহণের নামাযে জাম্মাত ও জাহান্নাম দেখিলেন। জাহান্নামের মধ্যে অধিক পরিমাণে মহিলাদেরকে দেখিলেন। সাহাবায়ে কেবাম (রাযিঃ) ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তাহারা অন্যের অনুগ্রহকে ভুলিয়া যায়, স্বামীর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না। তুমি যদি সারাজীবন তাহাদের কাহারও উপর অনুগ্রহ করিতে থাক, অতঃপর সামান্য কোন কারণে বলিয়া ফেলিবে যে, তোমার নিকট হইতে আমি কখনও কোন ভালো ব্যবহার পাই নাই। (মিশকাত : বুখারী ও মুসলিম)

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই উক্তিও মহিলাদের সাধারণ অভ্যাস সম্পর্কে করা হইয়াছে। তাহাদের সহিত যত উত্তম আচরণই করা হউক না কেন, যদি কখনও কোন কাল তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হইয়া যায়, তবে স্বামীর সারাজীবনের অনুগ্রহ শেষ হইয়া যায় এবং তাহাদের মুখে এই বিশেষ বাক্য উচ্চারিত হয় যে, এই সংসারে আমি কখনও শান্তি পাই নাই। এই সমস্ত বর্ণনায় মহিলাদের অধিক পরিমাণে জাহান্নামে প্রবেশ করার কারণ অবগত হওয়া ছাড়া ইহাও জানা গেল যে, উহা হইতে হেফাজত ও রক্ষার উপায় হইল, অধিক পরিমাণে সদকা ও

দান-খয়রাত করা। যেমন, উপরে বর্ণিত এই সতর্কবানী সম্বলিত হাদীসে আছে যে, ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এই এরশাদ করিতেছিলেন, তখন হযরত বেলাল (রাযিঃ) ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলেন এবং মহিলা সাহাবিয়াগণ ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ শুনিবার পর তাহারা নিজেদের কানের ও গলার অলংকার খুলিয়া খুলিয়া হযরত বেলাল (রাযিঃ)এর ঐ কাপড়ে রাখিতেছিলেন যাহার মধ্যে তিনি চাঁদা জমা করিতেছিলেন। বর্তমান যুগে এই ধরনের কঠিন হাদীসসমূহ শুনিয়া প্রথমে তো মহিলাদের দান-খয়রাতের খেয়ালও হয় না। যদি কাহারও খেয়াল হয়, তবে উহার চাপ স্বামীর উপরেই গিয়া পড়ে যে, স্বামী তাহাদের যাকাত আদায় করিবে, তাহাদের পক্ষ হইতে সদকা বা দান-খয়রাত করিবে, আর যদি তাহারা নিজেরাও দান-খয়রাত করে, তবে উহাও স্বামীর নিকট হইতে উসুল করিয়া করিবে। তাহাদের অলংকারাদির উপর কোন আঁচ আসিবে ইহার কোন অবকাশই নাই? এমনিতে সবকিছু চুরি হইয়া যাইতে পারে, হারাইয়া যাইতে পারে, কিংবা বিবাহ-শাদী ও অহেতুক উৎসব অনুষ্ঠানের জন্য বন্ধক রাখিয়া হাতছাড়া হইতে পারে; কিন্তু নিজ খুশীতে আল্লাহর নিকট জমা করার বিষয়টি কখনও আলোচনায়ও আসে না। এমতাবস্থায় উহা রাখিয়া মৃত্যুবরণ করে, অতঃপর উহা ওয়ারিশদের মধ্যে ভাগ-বন্টন হইয়া কম মূল্যে বিক্রয় হয়। বানাইবার সময় অনেক মূল্যে বানানো হয়, বিক্রয়ের সময় অত্যন্ত সস্তায় বিক্রয় হয়, কিন্তু বানাইবার সময় যে মূল্য বরচ হইয়াছে, উহা যে নষ্ট হইয়া যাইতেছে এই বিষয়ে তাহাদের কোনই গরজ নাই। তাহাদের গরজ শুধু এই যে, এইটা ভাঙ্গিয়া ঐটা বানাইল, আর ঐটা ভাঙ্গিয়া এইটা বানাইয়া লইল। অথচ না এইটা তাহার কোন কাজে আসিল, না ঐটা কাজে আসিল বরং বারবার ভাঙ্গাইবার কারণে সম্পদ নষ্ট হওয়া ছাড়াও বানাইবার মজুরীও নষ্ট হইতে থাকে।

মহিলাদের অধিক হারে জাহান্নামে যাওয়ার বিষয়টি মাঝখানে আসিয়া যাওয়ার কারণে কিছুটা আলোকপাত করা হইয়াছে। আসল বিষয় ছিল—সম্পদের আধিক্য কিছু না কিছু প্রভাব ফেলিয়াই থাকে। এমনকি, মুহাজ্জের সাহাবা (রাযিঃ)দের সম্পর্কে ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কিয়ামতের দিন গরীব মুহাজিরগণ ধনীদের তুলনায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে জাহান্নামের দিকে অগ্রগামী থাকিবেন। (মিশকাত) অথচ এই সকল ব্যক্তির আত্মত্যাগ, অধিক দান-খয়রাত এবং এখলাসের না পরিমাপ সম্ভব, না উহার মুকাবেলা হইতে পারে। একবার

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া করিলেন, **اللَّهُمَّ أَحْيِنِي** (হে আল্লাহ! আমাকে মিসকীন অবস্থায় রাখ এবং মিসকীন অবস্থায় আমাকে মৃত্যু দিও আর আমার হাশরও মিসকীনদের সহিত করিও)। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইহার কারণ কি? অর্থাৎ, আপনি মিসকীনীর দোয়া কেন করিতেছেন? হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, মিসকীনগণ তাহাদের ধনীদের অপেক্ষা চল্লিশ বৎসর আগে জাহান্নাতে যাইবে। হে আয়েশা! তুমি মিসকীনকে বঞ্চিত করিয়া ফিরাইয়া দিও না। খেজুরের একটি টুকরা হইলেও তাহাকে দান কর। হে আয়েশা! মিসকীনদেরকে ভালবাস। তাহাদেরকে নিকটবর্তী কর, আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তোমাকে তাহার নিকটবর্তী করিবেন। (মিশকাত)

কোন কোন আলেম এই হাদীস সম্পর্কে প্রশ্ন তুলিয়াছেন যে, ইহাতে নবীদের চাইতে সাধারণ গরীব লোকদের অগ্রগণ্য হওয়া সাব্যস্ত হয়। অধম লোকদের দৃষ্টিতে এই প্রশ্ন ঠিক নয়। কেননা, এই হাদীসে 'তাহাদের ধনী লোকদের' শব্দ বলা হইয়াছে। যাহার অর্থ হইল, প্রত্যেক দলের ফকীরদের সেই দলের ধনীদের সহিত মুকাবেলা হইবে। নবীগণের মুকাবেলা নবীগণের সহিত এবং সাহাবীগণের মুকাবেলা সাহাবীগণের সহিত হইবে। এমনভাবে অন্যান্য দল।

حضرت کعب بن عیاض
خضروا اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو
ارشاد فرماتے ہوئے سنایا کہ ہر گنت
کے لئے ایک فتنہ ہوتا ہے (جس میں گنت
ہو کہ وہ فتنہ میں پڑ جاتی ہے) میری گنت
کا فتنہ مال ہے۔

①۵ عَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَّاضٍ
قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ
لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أَقْبَى
الْمَالِ - (سرواه الترمذی
كذا فی مشکوٰۃ)

①৫ হযরত কব (রাযিঃ) বলেন, আমি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, প্রত্যেক উম্মতের জন্য একটি ফেতনা রহিয়াছে। (যাহাতে লিপ্ত হইয়া সেই উম্মত ফেতনায় পতিত হয়) আমার উম্মতের ফেতনা হইল, মাল। (মিশকাত : তিরমিযী)

কায়দা : হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বাণী সম্পূর্ণ সত্য। ইহা কোন আকীদাগত বিষয় নয়, বরং দৈনন্দিন জীবনে আমরা

দেখিতেছি যে, সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে যত বেহায়াপনা, বিলাসিতা, সুদ, ঘেনা-ব্যভিচার, সিনেমা দেখা, জুয়া খেলা, জুলুম-অত্যাচার, মানুষকে তুচ্ছ মনে করা, আল্লাহর দীন হইতে গাফেল হওয়া, এবাদত-বন্দেগীতে অমনোযোগী হওয়া, দ্বীনের কাজের জন্য সময় না পাওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি সংঘটিত হয়। পক্ষান্তরে, দারিদ্র্যাবস্থায় উহার এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ এমনকি দশভাগের একভাগও হয় না। এইজন্যই প্রসিদ্ধ প্রবাদ রহিয়াছে : **”زنیست عشق مبین”**

অর্থাৎ, টাকা-পয়সা না থাকিলে বাজারীপ্রেমও মুখের কথা পর্যন্তই থাকিয়া যায়। সম্পদের প্রাচুর্যের মধ্যে এই সবকিছু না হইলেও অস্তুতঃপক্ষে সর্বদা সম্পদ বৃদ্ধি করার ফিকির তো লাগিয়াই থাকে। মাত্র তিন হাজার টাকা কাহাকেও দিয়া দিন, তারপর এই টাকা কোন কাজে লাগাইয়া বৃদ্ধি করিবার ফিকির তাহার সহিত প্রতি মুহূর্তে এমনভাবে লাগিয়া যাইবে যে, কোথায় যাইবে ঘুম, কোথায় যাইবে বিশ্রাম, কোথায় নামায-রোযা, কোথায় হজ্জ-যাকাত ; এখন রাতদিন শুধু দোকান বাড়াইবার ফিকিরে মগ্ন থাকিবে। দোকানের ব্যস্ততা না কোন দ্বীনী কাজে শরীক হইতে দিবে, না দ্বীনের জন্য কোথাও বাহিরে যাওয়ার সময় হইবে। কেননা, ইহাতে দোকানের ক্ষতি হইয়া যাইবে। সবসময় এই চিন্তায় চিত্তিত থাকে যে, কোন্ ব্যবসা এমন যাহাতে লাভ বেশী এবং উদ্দেশ্য সফল হয়। এইজন্যই ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যাহা কয়েকটি হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, যদি কোন মানুষ সম্পদের দুইটি ময়দান পাইয়া যায়, তবু সে তৃতীয়টির তালাশে লাগিয়া যায়। মানুষের পেট একমাত্র (কবরের) মাটিই ভরিতে পারে। (মিশকাত)

এক হাদীসে আছে, মানুষ যদি এক ময়দান সম্পদ লাভ করে, তবে সে দ্বিতীয়টির সন্ধানে লাগিয়া যায়। আর দুইটি হইলে সে তৃতীয়টির সন্ধানে লাগিয়া যায়। মানুষের পেট মাটি ছাড়া অন্য কোন জিনিস ভরিতে পারে না।

এক হাদীসে আছে, যদি মানুষের জন্য খেজুরের একটি ময়দান হয়, তবে আরেকটির আকাঙ্ক্ষা করে, আর যদি দুইটি হয়, তবে তৃতীয়টির, এমনভাবে একের পর এক আকাঙ্ক্ষা করিতে থাকে। তাহার পেট মাটি ব্যতীত কোন জিনিস ভরিতে পারে না। (কানয)

এক হাদীসে আছে, মানুষকে যদি স্বর্ণের একটি ময়দান দিয়া দেওয়া হয়, তবে সে দ্বিতীয়টি তালাশ করে। আর যদি দুইটি দেওয়া হয়, তবে তৃতীয়টি তালাশ করে। মানুষের পেট মাটি ছাড়া কোন জিনিস ভরিতে

পারে না। (বুখারী)

মাটি দ্বারা ভর্তি করার অর্থ হইল, কবরের মাটিতে যাওয়ার পরই তাহার এই **هَلْ مِنْ مُرِيدٍ** (আরও চাই আরও চাই) এর خواهশ বন্ধ হইতে পারে। দুনিয়াতে থাকা অবস্থায় সর্বদা উহার বৃদ্ধির ফিকির লাগিয়াই থাকে।

একটি কারখানা ভালভাবে চলিতেছে। উহার দ্বারা প্রয়োজন পরিমাণ আমদানী আসিতেছে। যখন আরেকটি সুযোগ আসিয়া গেল, উহাতেও দখল দিয়া বসিল। এমনভাবে একটির জায়গায় দুইটি কারখানা হইয়া গেল। দুইটি হইতে তিনটি হইল। মোটকথা, আমদানী যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, ততই ব্যবসা বড় করার ফিকির লাগিয়া থাকিবে। এমন হইবে না যে, যাহা আছে উহার উপর সন্তুষ্ট থাকিয়া কিছু সময় আল্লাহ তায়ালার ফিকিরের জন্য বাহির করিবে। এইজন্যই হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করিয়াছেন : **اَجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قَرَارًا** হে আল্লাহ! আমার সন্তান-সন্ততিকে প্রয়োজন পরিমাণ রিযিক দান কর। অর্থাৎ, প্রয়োজন পরিমাণ হয় ; অতিরিক্ত যেন একেবারেই না হয়। কেননা, ইহাতে আমার আওলাদ সম্পদের চক্রে কাসিয়া যাইবে।

এক হাদীসে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কল্যাণ ও ভালাই ঐ ব্যক্তি পাইল, যাহাকে ইসলাম দান করা হইয়াছে এবং তাহার রিযিক প্রয়োজন পরিমাণে হয় আর সে উহার উপর সন্তুষ্ট থাকে।

অন্য এক হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন কোন গরীব অথবা ধনী এমন হইবে না, যে ইহার আকাঙ্ক্ষা না করিবে যে, হায়, দুনিয়াতে যদি আমার রিযিক শুধু প্রয়োজন পরিমাণ হইত ! (এহইয়া)

বুখারী শরীফে বর্ণিত হাদীসে আছে, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহর কসম ! তোমাদের ব্যাপারে আমি দরিদ্রতা ও অভাব-অনটনের ভয় করি না, বরং আমি এই ভয় করি যে, তোমাদের উপর দুনিয়ার সচ্ছলতা আসিয়া পড়ে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের উপর আসিয়াছিল। অতঃপর উহাতে তোমাদের মন লাগিয়া যায়, যেমন তাহাদের লাগিয়াছিল। অবশেষে এই দুনিয়া তোমাদেরকেও ধ্বংস করিয়া দেয়, যেমন পূর্ববর্তী উম্মতদেরকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। (মিলকাত)

ইহা ছাড়া আরও অনেক হাদীসে বিভিন্ন শিরোনামে বিভিন্ন প্রকার সতর্ক বাণী দ্বারা সম্পদের প্রাচুর্য ও উহার ফিতনার বিষয়ে সাবধান করা

হইয়াছে। ইহা এই কারণে নয় যে, অর্থসম্পদ মৌলিকভাবে অপবিত্র বা দোষণীয় বস্তু, বরং এই কারণে যে, আমাদের অন্তরের খারাবির কারণে সম্পদের দরুন অতি শীঘ্র আমাদের দিলের মধ্যে পচন ও যাবতীয় রোগ পয়দা হইয়া যায়। যদি কোন ব্যক্তি সম্পদের ক্ষতি হইতে বাঁচিয়া উহাকে বৃদ্ধিকরণ হইতে বিরত থাকিয়া শর্তসমূহ পালন করতঃ উহাকে ব্যবহার করে, তবে উহা ক্ষতিকর নয়, বরং উপকারী। কিন্তু, সাধারণতঃ যেহেতু শর্তাবলী পালন করা হয় না এবং আত্মশুদ্ধির কোন ফিকিরও করা হয় না, সেইহেতু এই সম্পদ অতি দ্রুত তাহার বিষাক্ত প্রভাব বিস্তার করিয়া ফেলে। ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হইল, যেমন কলেরা ও ডায়রিয়া রোগে পেয়ারা খাওয়া। মৌলিকভাবে পেয়ারার মধ্যে কোন দোষ নাই। উহার উপকারিতা এখনও উহার মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু বায়ু দূষণের কারণে উহা খাওয়ার ফলে বিশেষতঃ অধিক পরিমাণে খাওয়ার ফলে খুব শীঘ্র উহাতে পরিবর্তন পয়দা হইয়া ক্ষতি ও ধ্বংসের কারণ হইয়া যায়। এইজন্য সাধারণতঃ চিকিৎসকগণ মহামারীর সময়ে পেয়ারা খাইতে কঠোর ভাবে নিষেধ করিয়া দেন। অসংখ্য টুকরি ভর্তি পেয়ারা ফেলিয়া দেওয়া হয়। আশ্চর্যের বিষয় হইল, যদি সাধারণ কোন চিকিৎসক বা ডাক্তার কোন জিনিসকে ক্ষতিকর বলিয়া দেয়, তবে স্বভাবতঃ আমরা উহা খাইতে ভয় পাই। সুতরাং ডাক্তারদের ঘোষণার পর জাদরেল লোকদেরও পেয়ারা খাওয়ার সাহস থাকে না। কিন্তু ঐ মহান ব্যক্তিত্ব যাহার জুতার ধূলিকণার সমানও কোন চিকিৎসক বা ডাক্তার হইতে পারে না, যাহার পরামর্শ ও নির্দেশাবলী নবুওতের নূর হইতে আহরিত, কোন বিষয়ে তাহার ঘোষণা ও সিদ্ধান্ত প্রদানের পর আমাদের অন্তরে সামান্য ভয়ও কি পয়দা হয়?

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু বারবার সম্পদের ফিতনা এবং উহার ক্ষতি হইতে সতর্ক করিতেছেন, কাজেই উহার ক্ষতি হইতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে অবশ্যই অনেক বেশী ভয় করা উচিত। পেয়ারার জন্য যেমন লবণ, মরিচ ও লেবু প্রতিষেধক হিসাবে রহিয়াছে, সম্পদ ব্যবহারের জন্য শরীয়তের দেওয়া বিধি-নিষেধ মানিয়া চলাও ঠিক তদ্রূপ। অতএব, এই সকল বিধি-নিষেধের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করিতে হইবে; সম্পদের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার হুকুমসমূহ আদায়ের ব্যাপারে অনেক বেশী ফিকির করিতে হইবে।

স্বয়ং হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ধন-সম্পদ ঐ ব্যক্তির জন্য ক্ষতিকর নয়, যে আল্লাহকে ভয় করে।

(মিশকাত)

আমার (অর্থাৎ, লেখকের) বংশীয় বুয়ুর্গদের মধ্যে মুফতী এলাহী বখশ কাকলবী (রহঃ) যিনি বিখ্যাত ফকীহ হযরত শাহ আবদুল আযীয দেহলবী (রহঃ) এর বিশিষ্ট শাগরেদ ছিলেন, তিনি তাঁহার শায়েখের ডায়েরী হইতে নিজের ডায়েরীতে নকল করিয়াছেন : “দুনিয়া (অর্থাৎ, সম্পদ) মানুষের জন্য আল্লাহ তায়ালায় মজি মোতাবেক আমল করিবার একটি উৎকৃষ্টতর সহায়ক জিনিস। ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন লোকদেরকে আল্লাহ তায়ালায় দিকে আহ্বান করিয়াছেন, তখন এই সমস্ত সম্পদ ছাড়িয়া দেওয়ার হুকুম করেন নাই। বরং জীবিকা অর্জন ও পরিবার-পরিজনদের খেদমতের প্রতি উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। অতএব, ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনদের মধ্যে বসবাসকে কোন অস্ত্র ব্যক্তিই অস্বীকার করিতে পারে। হযরত উসমান (রাযিঃ) এর ইত্তেকালের সময় তাঁহার খাজাঞ্চির নিকট এক লক্ষ পঞ্চাশটি স্বর্ণমুদ্রা এবং দশ লক্ষ রৌপ্যমুদ্রা ছিল। খয়বারে ‘ওয়াদি কুরা’ ইত্যাদিতে জায়গা-জমিন ছিল, উহার মূল্য দুই লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা ছিল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাযিঃ) এর সম্পদের মূল্য পঞ্চাশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা ছিল। তিনি এক হাজার ঘোড়া ও একহাজার গোলাম রাখিয়া গিয়াছিলেন। হযরত আমর ইবনে আস (রাযিঃ) তিন লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা রাখিয়া গিয়াছিলেন। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাযিঃ) এর অর্থ-সম্পদ কি ছিল ; তাহা হিসাব করাই মুশকিল। এতদসঙ্গেও আল্লাহ তায়ালা কুরআন পাকে তাহাদের প্রশংসা করিয়াছেন : **يَذْكُرُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ** অর্থাৎ, তাহারা আপন প্রতিপালকের এবাদত সকাল সন্ধ্যা (অর্থাৎ, সর্বক্ষণ) শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালায় সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করিয়া থাকেন। (কোহফ : ২৮) অন্যত্র প্রশংসা করিয়া এরশাদ হইয়াছে : **رَجُلٌ لَا تُلِيهِمْ** অর্থাৎ, তাহারা এমন লোক যে, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি তাহাদিগকে আল্লাহর যিকির হইতে বিরত রাখে না।” (নূর : ৩৭)

ডায়েরী আরবীতে লিখা ছিল, এখানে উহার অনুবাদ করা হইয়াছে। উপরোক্ত বর্ণনা এইজন্য সঠিক যে, ঐ যুগে মুসলমানদের বহু দেশ বিজয়ের কারণে সাধারণতঃ তাহাদের আর্থিক অবস্থা এমনই ছিল। দুনিয়া এবং ধন-সম্পদ তাহাদের জুতার সহিত জড়াইয়া ছিল আর তাহারা উহাকে দূরে সরাইতে চাহিতেন ; কিন্তু উহা তাহাদেরকে আরো বেশী জড়াইয়া ধরিত। ইহা সত্ত্বেও দুনিয়ার প্রতি তাহাদের দিলের সম্পর্ক এবং আল্লাহ তায়ালায় প্রতি তাহাদের মগ্নতার অবস্থা কি ছিল, ফাযায়েলে

নামায ও হেকায়াতে সাহাবা কিতাবে কিছু ঘটনা উল্লেখ করা হইয়াছে। শিক্ষা গ্রহণের জন্য গভীর মনোযোগ সহকারে উহা পাঠ করা উচিত।

এই আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযিঃ) তাঁহার এই পরিমাণ ধন-সম্পদ সম্বন্ধে যখন নামাযে দাঁড়াইতেন, তখন মনে হইত যেন একটি ঝুটি পুতিয়া রাখা হইয়াছে। এত দীর্ঘ সেজদা করিতেন যে, পিঠের উপর পাখি আসিয়া বসিয়া যাইত। কোন নড়াচড়াই করিতেন না। যখন তাঁহার উপর বিপক্ষ দলের আক্রমণ হইতেছিল এবং তাহার উপর গোলাবর্ষণ হইতেছিল, তখন তিনি নামায পড়িতেছিলেন। একটি গোলা মসজিদের দেওয়ালে আসিয়া লাগিল, ফলে মসজিদের একাংশ ধসিয়া পড়িল। গোলা তাহার দাড়ির নিকট দিয়া অতিক্রম করিয়াছিল কিন্তু তিনি মোটেও টের পান নাই।

এক সাহাবীর বাগানে খুব খেজুর পাকিয়াছিল। তিনি বাগানে নামায পড়িতেছিলেন। নামাযের মধ্যে বাগানের খেয়াল আসিয়া গেল। ইহাতে তাহার এত দুঃখ ও আফসোস হইল যে, নামাযের পর তৎক্ষণাৎ বাগানটি আমীরুল মুমিনীন হযরত উসমান (রাযিঃ)এর খেদমতে দান করিয়া দিলেন। তিনি ইহাকে পঞ্চাশ হাজারের বিনিময়ে বিক্রয় করিয়া উহার মূল্য দ্বীনী কাজে খরচ করিলেন।

হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর খেদমতে দুই বস্তা ভর্তি রৌপ্য মুদ্রা হাদিয়া স্বরূপ আসিল। উহাতে এক লক্ষাধিক দেহরহাম ছিল। খালা আনিয়া উহাতে ভরিয়া ভরিয়া সম্পূর্ণ বন্টন করিয়া দিলেন। সেইদিন তিনি রোযা রাখিয়াছিলেন। ইফতারের জন্য কিছু রাখিয়া দিবেন অথবা কোন কিছু আনাইয়া লইবেন ; এই খেয়ালও তাহার ছিল না। ইফতারের সময় যখন বাদী এই বলিয়া আফসোস করিল যে, এক দেহরহামের গোস্তু আনাইয়া লইলে আজ আমরা গোস্তু দিয়া খানা খাইতে পারিতাম। তখন তিনি বলিলেন, এখন আফসোস করিয়া কি হইবে? তখন স্মরণ করাইয়া দিলে কিছু আনাইয়া দিতাম।

হেকায়াতে সাহাবা কিতাবে এই ঘটনা এবং এই ধরনের আরও কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সমস্ত ঘটনা ছাড়া তাহাদের আরও হাজার হাজার ঘটনা কিতাবে বর্ণিত রহিয়াছে। ধন-সম্পদ তাহাদের কি ক্ষতি করিতে পারে, তাহাদের নিকট ধন-সম্পদ এবং ঘরের ঝড়কুটার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। আল্লাহ তায়ালা যদি তাহাদের এই সকল গুণাবলীর কিছু অংশ আমি অধমকেও দান করিতেন।

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে বুলিয়া লইতে হইবে যে, এই সকল

সম্পদশালী সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা দ্বারা অধিক সম্পদ বৈধ হওয়ার প্রমাণ তো পেশ করা যায়, কেননা, সাহাবীদের পরবর্তী যুগ এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগেও এইরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ; কিন্তু বিষতুলা এই দুনিয়াকে নিজের নিকট জমা করিয়া রাখিবার জন্য তাহাদের অনুসরণকে সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করা এমন, যেমন কোন টিবি রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি কোন সুস্থ-সবল যুবক ব্যক্তির অনুসরণে প্রতিদিন যৌনসম্ভোগ করে। এইরূপ করিলে সে তিন চারদিনের মধ্যেই কবরের গর্তে পৌঁছাবে।

এই কিতাবের শেষাংশে চুয়ার নম্বর ঘটনায় বর্ণিত একজন আরেফ ব্যক্তির উক্তি গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ করা উচিত।

ইমাম গাযালী (রহঃ) বলেন, সম্পদের দৃষ্টান্ত একটি সাপের মত। যাহার মধ্যে বিষও রহিয়াছে এবং বিষ প্রতিষেধকও রহিয়াছে। তদ্রূপ, সম্পদের উপকারসমূহ উহার বিষ প্রতিষেধকের মত এবং সম্পদের ক্ষতিসমূহ বিষের মত। যে ব্যক্তি ইহার উপকারিতা ও ক্ষতিসমূহ জানিতে পারিবে, সে-ই সম্পদের কল্যাণসমূহ হাসিল করিতে এবং উহার ক্ষতি ও অকল্যাণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইবে। সম্পদের উপকারিতা দুই প্রকার—দুনিয়াবী ও দ্বীনী। দুনিয়াবী উপকারিতা তো প্রত্যেক ব্যক্তিই জানে, যেই কারণে সমগ্র দুনিয়ার মানুষ উহা কামাই করিবার জন্য মরিয়া হইয়া লাগিয়াছে।

আর দ্বীনী উপকারিতা তিনটি—প্রথম এই যে, সম্পদ পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে এবাদতের উপকরণ। প্রত্যক্ষভাবে যেমন, হজ্জ, জেহাদ ইত্যাদি। কেননা, ইহা টাকা-পয়সা দ্বারাই হইতে পারে। আর পরোক্ষভাবে যেমন, নিজের খানাপিনা এবং প্রয়োজনীয় কাজে খরচ করা। কেননা, এইসব প্রয়োজন পূরা না হইলে মানুষের দিল ঐ দিকে মশগুল থাকে। ফলে, দ্বীনী কাজে মগ্ন থাকিবার সুযোগ হয় না। অতএব, সম্পদ যেহেতু পরোক্ষভাবে এবাদতের মাধ্যম সুতরাং উহাও এবাদত হইল। কিন্তু শুধু ততটুকুই এবাদতের অন্তর্ভুক্ত হইবে, যতটুকু দ্বারা দ্বীনী কাজে সহায়তা হইবে ; ইহার অতিরিক্ত পরিমাণ এবাদতের অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

সম্পদের দ্বিতীয় দ্বীনী উপকারিতা হইল, অন্য কাহারও উপর সম্পদ খরচ করা। ইহা চার প্রকারে বিভক্ত—

ক. অভাবী ও গরীবদের উপর সদকা করা। ইহার অসংখ্য ফযীলত রহিয়াছে, যেমন ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হইয়াছে।

খ. সৌজন্যমূলক আচরণে ধনী লোকদের দাওয়াত ও হাদিয়া

ইত্যাদিতে খরচ করা। ইহা সদকা নয়, কেননা, সদকা গরীবদের উপর হয়। এই প্রকারটির মধ্যেও অনেক দ্বীনী উপকারিতা রহিয়াছে। কেননা, ইহাতে পরস্পর সম্পর্ক মজবুত হয়। দানশীলতার উৎকৃষ্ট অভ্যাস পায়। হাদিয়া প্রদান ও খানা খাওয়ানোর ফযীলত সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। এই ধরনের লোকের উপর খরচের ব্যাপারে তাহাদের দরিদ্র হওয়া শর্ত নয় (অধমের মতে এই উপকারিতা অনেক সময় প্রথম প্রকারকেও ছাড়াইয়া যায়। কিন্তু ইহা তখনই হইতে পারে, যখন ইহাতে খরচ করা হইবে। কিন্তু যেই ব্যক্তি সম্পদ জমা করিবার লোভে পড়িয়া যায়, তাহার জন্য না এই সমস্ত ফযীলত কার্যকর হয়, আর না যে সমস্ত ফযীলত বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে উহা তাহার উপর কোন প্রভাব ফেলে)।

গ. নিজের সম্মান রক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় করা। অর্থাৎ, এমন ক্ষেত্রে সম্পদ খরচ করা, যদি সেখানে সম্পদ খরচ না করা হয়, তবে নিচু প্রকৃতির লোকদের পক্ষ হইতে মন্দ কথা, অশ্লীল আচরণ ইত্যাদি ক্ষতির আশংকা থাকে। এইরূপ খরচও সদকার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

হযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষ নিজের সম্মানের হেফাজতের জন্য যাহা খরচ করে, উহাও সদকার অন্তর্ভুক্ত। (অধম লিখকের মতে জুলুম প্রতিরোধ করিবার জন্য ঘুষ দেওয়াও এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত) কোন উপকার লাভ করার জন্য ঘুষ দেওয়া হারাম, নাজায়েয। ঘুষদাতা তেমনি গোনাহগার হইবে, যেমন ঘুষগ্রহীতা। কিন্তু জালেমের জুলুমকে হটাইবার জন্য ঘুষদাতার পক্ষে জায়েয; কিন্তু গ্রহীতার পক্ষে হারাম।)

ঘ. শ্রমিকের পারিশ্রমিক দেওয়া। অনেক কাজ মানুষ নিজ হাতে করিতে পারে না। আবার কিছু কাজ এমনও আছে, যাহা মানুষ নিজে স্তো করিতে পারে; কিন্তু উহাতে অনেক মূল্যবান সময় খরচ হইয়া যায়। যদি এই কাজগুলিকে পারিশ্রমিক দিয়া করাইয়া লয়, তবে তাহার এই সময় এলেম ও আমল, যিকির ও ফিকির, ইত্যাদি এমন কাজে খরচ হইতে পারে, যাহা অন্য কেহ তাহার স্থলে করিতে পারে না।

তৃতীয় দ্বীনী ফায়দা, সাধারণ কল্যাণমূলক কাজে সম্পদ ব্যয় করা। ইহাতে কোন ব্যক্তি বিশেষের উপর খরচ করা হয় না যাহা দ্বিতীয় নম্বরে উল্লেখ করা হইয়াছে। তবে ইহাতে সাধারণ লোকদের কল্যাণ হাসিল হয়, যেমন, মসজিদ নির্মাণ করা, মুসাফিরখানা, সেতু ইত্যাদি নির্মাণ করা, মাদরাসা, চিকিৎসালয় ইত্যাদি এমন জিনিস নির্মাণ করা। যাহার সওয়াব

এবং উহা দ্বারা ফায়দা হাসিলকারী নেক লোকদের দোয়া মৃত্যুর পরেও পৌঁছিতে থাকে। এখানে ফায়দাগুলি সংক্ষেপে বলা হইল। পুরাপুরি ফায়দা যাহা হাসিল হইতে পারে, তাহা ইহার মধ্যে আসিয়া গিয়াছে।

হযরত শাহ আবদুল আযীয (রহঃ) বলেন, সম্পদ খরচ করার মধ্যে সাত প্রকারের এবাদত রহিয়াছে—১. যাকাত, ইহার মধ্যে উশর (উৎপন্ন ফসলের দশভাগের একভাগ দান করা)ও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। ২. সদকায়ে ফিতর। ৩. নফল দান—খয়রাত, ইহার মধ্যে মেহমানদারীর খরচ এবং ঋণগ্রস্তদের সাহায্যও রহিয়াছে। ৪. ওয়াকফ, মসজিদ নির্মাণ, সরাইখানা, সেতু ইত্যাদি নির্মাণ করা। ৫. হজ্জ, ফরজ হটক বা নফল হটক কিংবা অন্য কাহারও হজ্জ পালনে পাথের বা যানবাহন দিয়া সাহায্য করা হটক। ৬. জিহাদে খরচ করা। ইহাতে এক দেহহাম সাতশত দেহহামের সমতুল্য। ৭. যাহাদের ভরণ-পোষণ নিজ দায়িত্বে ন্যস্ত, তাহাদের জন্য খরচ করা, যেমন শ্রী. ও ছোট সন্তান-সন্ততির জন্য খরচ এবং নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত অভাবী আত্মীয়-স্বজনের জন্য খরচ ইত্যাদি। (তফসীরে আযীযী)

ইমাম গাম্বালী (রহঃ) বলেন, ধন-সম্পদের কতিও দুই প্রকার—দ্বীনী ও দুনিয়াবী। দ্বীনী কতি তিন প্রকার—

ক. অধিক পরিমাণে গোনাহের কারণ হয়। অধিকাংশ মানুষ সম্পদের কারণেই বাহেশের কাজে লিপ্ত হয়। পক্ষান্তরে, অভাব ও দরিদ্রতা এই সমস্ত অপকর্মের দিকে মনোযোগ দেওয়ারই সুযোগ দেয় না। কেননা, যখন কোন গোনাহের ব্যাপারে মানুষ নিরাশ হয়, তখন মন সেইদিকে বেশী আকৃষ্টও হয় না। আর যখন নিজেকে উহার উপর সক্ষম মনে করে, তখন সেইদিকে বেশী বেশী মনোযোগী হয়। আর সম্পদ হইল, কোন কাজে সক্ষম হওয়ার বড় উপকরণ। এই কারণেই সম্পদের ফেতনা দরিদ্রতার ফেতনা হইতে মারাত্মক।

খ. সম্পদ বৈধ জিনিসের মধ্যে অধিক ভোগ-বিলাসের কারণ হয় উন্নত হইতে উন্নত খাবার, উন্নত হইতে উন্নত লেবান-পোশাক ইত্যাদি সম্পদশালী ব্যক্তির দ্বারা ইহা সম্ভব নয় যে, সে যত্নের কুটি খাইবে এবং মোটা কাপড় পরিধান করিবে। আর বিলাসিতা এমন বস্তু যে, ইহা একটি অপরাটিকে টানিয়া আনে, আর ধীরে ধীরে খরচ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আর যখন আমদানী যথেষ্ট না হয়, তখন অবৈধ উপায়ে সম্পদ উপার্জনের ফিকির পায়দা হইতে থাকে। আর ইহা দ্বারা মিথ্যা, মুনাফেকী ইত্যাদি মন্দ অভ্যাস সৃষ্টি হয়। কেননা, সম্পদের আধিক্যের কারণে বন্ধু-বান্ধবদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহাদের সহিত সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য এই

ধরনের খারাপ অভ্যাসসমূহ অধিক পরিমাণে পয়দা হইবে। সম্পর্ক বেশী হওয়ার কারণে উভয় পক্ষের মধ্যে অধিক পরিমাণে ঘৃণা, শত্রুতা, হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি পয়দা হইবে। এইভাবে অসংখ্য ব্যাধি মানুষের সহিত লাগিয়া যাইবে। যেইগুলি হইতে সম্পদ ধাকা অবস্থায় মুক্তি পাওয়া কঠিন ব্যাপার। গভীর চিন্তা করিলে দেখা যায়, এই সমস্ত ক্ষতি পরবর্তীতে ব্যাপক আকার ধারণ করে এবং এই সবকিছু সম্পদের প্রাচুর্যের কারণেই পয়দা হইয়া থাকে।

গ. কমপক্ষে ইহা হইতে তো কোন ধনী ব্যক্তি বাঁচিয়া থাকিতে পারে না যে, তাহার অন্তর সম্পদের উন্নয়ন ও সংরক্ষণের চিন্তায় আল্লাহ তায়ালার যিকির ও ফিকির হইতে গাফেল থাকিবে। আর যে জিনিস আল্লাহ তায়ালা হইতে গাফেল করিয়া দেয়, উহা ক্ষতি ছাড়া কিছুই নয়। এইজন্য হযরত ঈসা (আঃ) বলিয়াছেন, সম্পদের মধ্যে তিনটি আপদ রহিয়াছে—প্রথম এই যে, উহা অবৈধ উপায়ে উপার্জন করা হয়। কেহ আরজ করিল, যদি বৈধ উপায়ে উপার্জন করা হয়? তিনি বলিলেন, অগাধে খরচ হয়। কেহ আরজ করিল, যদি সঠিক স্থানে খরচ করা হয়? তখন তিনি বলিলেন, উহার উন্নয়নের ফিকির আল্লাহ তায়ালা হইতে অন্যমনস্ক করিয়া দিবেই এবং ইহা এমন একটি রোগ যাহার কোন চিকিৎসা নাই। কেননা, আল্লাহ তায়ালার যিকির ও ফিকির সমস্ত এবাদতের সারাংশ এবং মগজস্বরূপ। আর উহার জন্য খালি ও মুক্ত অন্তরের প্রয়োজন। আর যাহাদের জায়গা-জমিন রহিয়াছে, তাহারা তো দিন-রাত কৃষকদের ঝায়-ঝামেলার চিন্তায় পড়িয়া থাকে। তাহাদের নিকট হইতে শস্য উসুলের হিসাব-কিতাবে ও শরীকদের সহিত লেন-দেনের ফিকিরে থাকে। কখনও তাহাদের অংশ লইয়া ঝগড়া, কখনও জমিনের পানি বণ্টনের ঝগড়া, কখনও পানি উঠাইবার বালতি ইত্যাদি লইয়া ঝগড়া। সরকারী কর্মচারী ও তাহাদের প্রতিনিধিদের ঝগড়া তো সবসময় লাগিয়াই রহিয়াছে। চাকর-নকর ও মজদুরদের খোঁজ-খবর রাখা ও তাহাদের দেখা-শোনা করা একটি স্বতন্ত্র ব্যস্ততা। এমনভাবে ব্যবসায়ীদের অবস্থা। যদি শরিকানা ব্যবসা হয়, তবে শরিকদের আচার-আচরণ সবসময় একটি স্বতন্ত্র মুসীবত ও ব্যস্ততার কারণ হইয়া পড়ায়। আর একক ব্যবসা হইলে লাভ বৃদ্ধি করার ফিকির, সবসময় নিজের মেহনত বাড়ানোর খেয়াল, ব্যবসায় ক্ষতির আশংকা—এই সমস্ত বিষয় এমন, যাহা সর্বদা মাথায় চড়িয়া থাকে। ব্যস্ততার দিকে লক্ষ্য করিলে সবচেয়ে কম ব্যস্ততা ঐ সম্পদে রহিয়াছে, যাহা নগদ নিজের

কাছে থাকে। কিন্তু উহার হেফাজত, ধ্বংস হইয়া যাওয়ার আশংকা, চুরি হওয়ার ভয় এবং উহা কোথায় খরচ করিবে; ইহার ফিকির এবং অন্যান্য লোকদের কুদৃষ্টি ইহাতে বাঁচাইবার ফিকির, এমন সব চিন্তা যাহার কোন শেষ নাই। আর এই সবই দুনিয়াবী ক্ষতির দিক, যাহা সম্পদের সহিত লাগিয়াই থাকে। আর যাহার নিকট প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদ থাকে, সে এই সমস্ত দুশ্চিন্তা ইহাতে মুক্ত থাকে।

لَا زِرَ إِلَّا بِاللَّهِ
لَمْ يَكُنْ دُونَكَ عِلْمٌ كَاللَّهِ

অর্থাৎ, একটি লুঙ্গি নিচে, একটি লুঙ্গি উপরে, না চোরের ভয়, না পুঞ্জির চিন্তা। অর্থাৎ, কিভাবে ইহা রক্ষা করিব, প্রতিদিনের অতিরিক্ত খরচ কিভাবে পূরণ করিব এই চিন্তা থাকে না। সুতরাং সম্পদের প্রতিষেধক এই যে, উহা হইতে প্রয়োজন পরিমাণ নিজের কাজে খরচ করার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে, উহাকে নেকীর বিভিন্ন খাতে খরচ করিয়া দিবে। ইহা ব্যতীত সমস্তই কেবল বিষই বিষ, আপদই আপদ। আল্লাহ তায়ালা আপন দয়া ও মেহেরবানীতে এই বিষ হইতে এই অধমকেও রক্ষা করুন এবং ভাল খাতসমূহে খরচ করার তৌফীক দান করুন। (এইহিয়া)

সম্পদের উদাহরণ একেবারে সাপের মত। যে সমস্ত লোক সাপ ধরিতে পারদর্শী; সাপ ধরিবার পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল, তাহাদের জন্য উহা ধরার মধ্যে কোন ক্ষতি নাই, বরং তাহারা উহা দ্বারা বিষ প্রতিষেধক প্রস্তুত করিতে পারিবে এবং আরও অন্যান্য উপকারিতাও হাসিল করিতে পারিবে। কিন্তু কোন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি যদি এই পারদর্শী লোকদেরকে দেখিয়া লোভের বশবর্তী হইয়া সাপ ধরিয়া লয়, তবে সে ধ্বংস হইয়া যাইবে। তদ্রূপ, ধনী সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)কে দেখিয়া লোভবশতঃ আমরা যদি এই বিষ বেশী ব্যবহার করি, তবে ধ্বংস ছাড়া কিছু নাই। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) সম্পর্কে ইহা শুধু ভক্তিপূর্ণ কথা নয়, তাহাদের জীবনের একেকটি ঘটনা এই বিষয়ে পরিষ্কার সাক্ষ্য দেয় যে, সম্পদের গুরুত্ব তাহাদের নিকট জ্বালানী কাঠের চাইতে বেশী ছিল না। সম্পদের অস্তিত্ব তাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালা প্রতি মনোযোগ ইহাতে সামান্যতমও সরাইতে পারে নাই। এতদসঙ্গেও তাহারা সম্পদকে ভয় করিতেন। যেমন, তাহাদের জীবনী ইহার সাক্ষ্য বহন করে। আল্লাহ তায়ালা পছন্দ ও সন্তুষ্টির কাজে তিনিই একমাত্র তওফীকদাতা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আত্মীয়-স্বজনের সহিত সুসম্পর্ক বজায় রাখা

এই পরিচ্ছেদ প্রকৃতপক্ষে পূর্বোক্ত পরিচ্ছেদসমূহের পরিপূরক। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাহার পাক কালামে এবং হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার পবিত্র হাদীসে ইহার প্রতি বিশেষভাবে তাকিদ করিয়াছেন এবং সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন ; এইজন্য গুরুত্বের কারণে বিষয়টিকে ভিন্ন পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হইল।

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আত্মীয়-স্বজনের উপর সদকা দ্বিগুণ সওয়াব রাখে। (কানয)

উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মুনা (রাযিঃ) একটি বাঁদী আবাদ করিলে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি যদি তাহাকে তোমার মামাদেরকে দিয়া দিতে, তবে উহা বেশী উত্তম ছিল। (কানয)

কাজেই সদকা ও দান-খয়রাতে মध्ये যদি গুরুত্বপূর্ণ কোন দ্বীনী প্রয়োজন না থাকে, তবে সাধারণভাবে সদকা করা হইতে আত্মীয়-স্বজনের উপর সদকা করা বেশী উত্তম। অবশ্য, যদি কোন দ্বীনী প্রয়োজন থাকে, তবে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার সওয়াব সাতশতগুণ পর্যন্ত হইয়া থাকে। কুরআন পাকে ও হাদীস শরীফে অনেক বেশী পরিমাণে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং সম্পর্ক ছিন্ন করার বিষয়ে সতর্কবাণী বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু কিতাব দীর্ঘ হইয়া যাইবে এই আশংকায় শুধু উৎসাহ প্রদান সম্পর্কিত তিনটি এবং ঈশিয়ারী সম্পর্কিত তিনটি আয়াত উল্লেখ করিয়া উক্ত বিষয়ের সহিত সম্পর্কিত কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করিতেছি। কেননা, সামান্য পরিমাণও দীর্ঘ হইয়া গেলে আমরা ইহা পড়িবার অবসরও পাইব না। কিন্তু এই সমস্ত বিষয় এত বেশী গুরুত্বপূর্ণ

যে, সংক্ষেপ করা সত্ত্বেও কিতাব দীর্ঘ হইয়াই চলিয়াছে। এইজন্য সম্ভবতঃ এক খণ্ডের পরিবর্তে দুই খণ্ড করিতে হইবে।

① إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ
بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَا
ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْ
بَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ○ (نحل- ১৮)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِحْسَانِ ۖ وَالْإِحْسَانُ قَرَابَةُ
فَرَاتِهِ ۖ هِيَ ۖ وَنَهَىٰ عَنْ
أَوْ بَرٍّ ۖ بَارِعٌ ۖ وَكَسَىٰ
عَنْ ۖ وَكَسَىٰ ۖ وَكَسَىٰ ۖ
هِيَ ۖ وَكَسَىٰ ۖ وَكَسَىٰ ۖ

① নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা ন্যায়পরায়নতা ও পরোপকার করার এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার হুকুম করিতেছেন, আর নিবেধ করিতেছেন নির্লজ্জতা ও মন্দ কাজ হইতে এবং কাহারও প্রতি জুলুম করা হইতে। আর তোমাদেরকে (এই সকল বিষয়ে) নসীহত করিতেছেন, যেন তোমরা নসীহত গ্রহণ কর। (নাহল : ৯০)

ফাযলদা : আল্লাহ তায়ালা কুরআন পাকে অনেক জায়গায় আত্মীয়-স্বজনের কল্যাণ কামনা এবং তাহাদেরকে দান করার হুকুম ও উহার প্রতি উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। কিছুসংখ্যক আয়াতের দিকে এখানে ইশারা করা হইতেছে। যাহার দিল চায়, সে যেন কোন কুরআন শরীফের অনুবাদ দেখিয়া লয়।

১. وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ (বাকারা : ৮৩)
২. قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ (বাকারা : ২১৫)
৩. نِيسَا : ১-১০
৪. وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ (নিসা : ৩৬)
৫. وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا (আনআম : ১৫১)
৬. وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ (আনফাল : ৭৫)
৭. لَا تَشْرِبْ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ تَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ (হুদুসূফ : ৯২)
৮. وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ (রাদ : ২১)

৯. رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ (হযরাতীম : ২১)
১০. وَيَا وَالِدَيْهِ إِحْسَانًا (বনী ইসরাইল : ২৩)
১১. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ (বনী ইসরাইল : ২৪)
১২. وَأَبِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ (বনী ইসরাইল : ২৬)
১৩. وَكَانَ تَقِيًّا. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ (মারইয়াম : ১৪)
১৪. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي (মারইয়াম : ৩২)
১৫. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ (মারইয়াম : ৪২)
১৬. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ (মারইয়াম : ৫৫)
১৭. وَأَمُرَ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ (ঈ-হা : ১৩২)
১৮. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا (ফুরকান : ৭৪)
১৯. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي (আহ্কাফ : ১৫)
২০. رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ (নূহ : ২৮)

এই কয়েকটি আয়াত নমুনা স্বরূপ উল্লেখ করা হইল। পূর্ণ আয়াত ও তবরুজমা লিখিলে দীর্ঘ হইয়া যাওয়ার ভয় ছিল। উল্লেখিত আয়াতগুলি ঐ তিন আয়াত ব্যতীত, যাহা এখানে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সমস্ত আয়াত ছাড়া এই বিষয়ে আরও অনেক আয়াত পাওয়া যাইবে। যে বিষয়টি আল্লাহ তায়ালা তাহার পাক কালামে বারবার এরশাদ করিয়াছেন, উহার গুরুত্ব কত বেশী তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না।

হযরত কা'ব আহবার (রহঃ) বলেন, ঐ পাক যাতেব কসম, যিনি সমুদ্রকে হযরত মুসা (আঃ) ও বনী ইসরাইলের জন্য দুই ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। তওরাতে লেখা আছে, তুমি আল্লাহকে ভয় করিতে থাক এবং আত্মীয়-স্বজনের সহিত সুসম্পর্ক বজায় রাখ, আমি তোমার আয়ু বৃদ্ধি করিয়া দিব, সহজসাধ্য জিনিসসমূহ তোমার জন্য সহজ করিয়া দিব, কঠিন সমস্যাসমূহ দূর করিয়া দিব।

আল্লাহ তায়ালা কুরআন পাকের কয়েক জায়গায় আত্মীয়তার সম্পর্ক

বজায় রাখার নির্দেশ দিয়াছেন। যেমন, এরশাদ হইয়াছে : **وَاتَّقُوا اللَّهَ** অর্থাৎ, আল্লাহকে ভয় করিতে থাক, যাহার নামে তোমরা একে অন্যের নিকট হইতে অধিকার দাবী করিয়া থাক এবং আত্মীয়তার বিষয়টিকে ভয় করিতে থাক। (নিসা : ১) অর্থাৎ, তাহাদের সহিত সম্পর্ক জুড়িয়া রাখ ; ছিন্ন করিও না।

অন্য আয়াতে এরশাদ হইয়াছে : **وَإِنِ الْقُرْبَىٰ حَقٌّ** অর্থাৎ, আত্মীয়-স্বজনের সহিত সদ্যবহার ও সুসম্পর্কের যে হক রহিয়াছে, উহা আদায় করিতে থাক।

তৃতীয় জায়গায় এরশাদ হইয়াছে : **إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ** অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা তওহীদ ও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর সাক্ষ্য দেওয়ার হুকুম করিতেছেন এবং লোকদের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ ও তাহাদেরকে ক্ষমা করার হুকুম করিতেছেন। আত্মীয়-স্বজনকে দান করার, অর্থাৎ তাহাদের সহিত সদ্যবহার ও সম্পর্ক বজায় রাখিবার হুকুম করেন। এই তিনটি বিষয়ের হুকুম করিবার পর আল্লাহ তায়ালা তিনটি বিষয় নিষেধ করিয়াছেন। ফাহেশা কাজ, অর্থাৎ গোনাহের কাজ হইতে এবং মুনকার, অর্থাৎ এমন কাজ হইতে নিষেধ করিয়াছেন, শরীয়ত ও সুন্নতের মধ্যে যাহার কোন দলীল বা ভিত্তি নাই, আর জুলুম হইতে, অর্থাৎ মানুষের উপর বড়াই করিতে নিষেধ করিয়াছেন। অতঃপর এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা এই সকল বিষয়ে তোমাদেরকে নসীহত করিতেছেন, যাহাতে তোমরা নসীহত গ্রহণ কর।

হযরত উসমান ইবনে মাজ্জউন (রাযিঃ) বলেন, ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আমার খুবই মহব্বত ছিল। এই মহব্বতের কারণেই আমি লজ্জায় মুসলমান হইয়াছিলাম। কেননা, ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে মুসলমান হইতে বলিতেন। এই কারণে আমি মুসলমান হইয়া গিয়াছি। কিন্তু আমার অন্তরে ইসলাম মজবুত হইয়াছিল না। একবার আমি ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসিয়া কিছু আলোচনা করিতেছিলাম। ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সহিত কথা বলিতে বলিতে অন্যদিকে এমন মনোযোগী হইয়া গেলেন, যেন অন্য কাহারও সহিত কথা বলিতেছেন। কিছুক্ষণ পর পুনরায় আমার প্রতি মনোযোগী হইলেন এবং এরশাদ করিলেন, হযরত জিবরাঈল (আঃ) আসিয়াছিলেন এবং এই আয়াত শরীফ **إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ** শেষ পর্যন্ত নাযিল হইয়াছে। আয়াতের বিষয়বস্তু দ্বারা আমি খুবই আনন্দিত হইলাম এবং ইসলাম আমার অন্তরে

মজবুত হইয়া গেল। আমি সেখান হইতে উঠিয়া হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আবু তালেবের নিকট গেলাম। (তিনি মুসলমান ছিলেন না) আমি তাহাকে বলিলাম, আমি আপনার ভাতিজার নিকট ছিলাম। তাহার উপর এখন এই আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে। তিনি বলিতে লাগিলেন, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর অনুসরণ কর, তুমি সফলকাম হইবে, আল্লাহর কসম, তিনি তাহার নবুওতের দাবীতে সত্যবাদী হউন বা মিথ্যাবাদী হউন, কিন্তু তোমাদেরকে তো ভাল অভ্যাস ও উত্তম চরিত্র শিক্ষা দিতেছেন। (তাস্বীহুল গাফেলীন)

ইহা এমন এক ব্যক্তির উপদেশ, যিনি নিজেও মুসলমান নহেন ; অথচ তিনিও ইহা স্বীকার করিতেছেন যে, নবুওতের দাবী সত্য হউক বা মিথ্যা হউক ; কিন্তু ইসলামের শিক্ষা অতি উত্তম শিক্ষা। ইসলাম উত্তম চরিত্র শিক্ষা দেয়। কিন্তু আফসোস যে, আজ আমরা মুসলমানরাই চরিত্রের দিক দিয়া সরুচেয়ে বেশী অধঃপতনে রহিয়াছি।

② وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○ (نূর, ২৮)

ফারুদা : এই আয়াত (নূর : ২২) এবং উহার তরজমা প্রথম পরিচ্ছেদের ১৮ নম্বরে বর্ণিত হইয়াছে। সতর্ক করার উদ্দেশ্যে পুনরায় উল্লেখ করিয়াছি, যাহাতে আমরা আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গদের আচার-আচরণ এবং আল্লাহ তায়ালায় উৎসাহ প্রদানের প্রতি গভীরভাবে চিন্তা করিতে পারি। কত কঠিন ও গুরুতর ঘটনা যে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী সকল মুসলমানের মা ; তাহার উপর সন্তানদের পক্ষ হইতে ভিত্তিহীন অপবাদ লাগান হইল আর ঐ সময় নিকট আত্মীয়রাই উহাকে ছড়াইল, যাহাদের জীবিকা নির্বাহ হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর পিতারই সাহায্যের উপর ছিল। ইহাতে পিতা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)এর কি পরিমাণ মনোকষ্ট ও ব্যথা হইয়াছে, তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না। এতদসঙ্গেও আল্লাহ তায়ালায় পক্ষ হইতে এই উৎসাহ প্রদান করা হইতেছে যে, তিনি যেন ক্ষমা করিয়া দেন। আর হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাযিঃ)এর পক্ষ হইতে এই ব্যবহার হিল যে, পূর্বে যেই পরিমাণ তাহাদের উপর খরচ করিতেন, উহাকে আরও বৃদ্ধি

করিয়া দিলেন, যেমন, পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। আমরাও কি আমাদের আত্মীয়-স্বজনের সহিত এইরূপ আচরণ করিতে পারি যে, কেহ আমাদের উপর অপবাদ আরোপ করে, আমাদের পরিবার-পরিজনদের প্রতি এইরূপ কঠিন অপবাদের কালিমা লেপন করে অতঃপর আমরা কুরআন পাকের এই আয়াত তেলাওয়াত করিয়া ঐ সকল আত্মীয়-স্বজনের সহিত সম্পর্কের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কোন প্রকার সাহায্য করা সহ্য করিয়া লইব? কখনও নয়। বরং সারাজীবনের জন্য শুধু তাহার সহিত নয়, তাহার বংশধরের সহিতও শত্রুতা রাখিয়া যাইবে। এমনকি, অন্যান্য যে সকল আত্মীয়-স্বজন তাহার সহিত সম্পর্ক রাখিবে, তাহাদের সহিতও সম্পর্ক ছিন্ন করিব এবং যে কোন আচার-অনুষ্ঠানে তাহারা শরীক হইবে, আমাদের উহাতে শরীক হওয়া অসম্ভব ব্যাপার হইবে। কেন? শুধু এইজন্য যে, ইহারা এমন ব্যক্তির দাওয়াত বা অনুষ্ঠানে শরীক হইয়াছে, যে আমাদেরকে গালি দিয়াছে, আমাদের ইয়্যত নষ্ট করিয়াছে, আমাদের বউ-বেটীর উপর অপবাদ দিয়াছে। চাই তাহারা গালিদাতার কার্যকলাপে যতই অসন্তুষ্ট হউক, কিন্তু তাহার অনুষ্ঠানে শরীক হওয়ার অপরাধে তাহাদের সহিতও আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন হইবে। আল্লাহ তায়ালায় পবিত্র এরশাদ হইল, আমরা নিজেরাও যেন তাহার সাহায্য-সহযোগিতা হইতে বিরত না থাকি। অথচ আমাদের আমল হইল, অন্য কোন ব্যক্তিও যদি তাহাকে দাওয়াত করে, তবে আমরা সেই ব্যক্তির সহিতও সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ফেলি। কিন্তু যাহাদের অন্তরে প্রকৃত ঈমান রহিয়াছে, আল্লাহ তায়ালায় মহত্ব যাহাদের অন্তরে দৃঢ়ভাবে বসিয়া গিয়াছে এবং আল্লাহ তায়ালায় পবিত্র বাণীর প্রতি যাহাদের দিলে গুরুত্ব রহিয়াছে, তাহারা ইহার উপর আমল করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে, আনুগত্য ইহাকে বলে, আনুগত্যকারী এইরূপ হইয়া থাকে। মহান আল্লাহ তায়ালা আপন শান অনুযায়ী তাহাদের উপর রহমত নাযিল করুন এবং তাহাদেরকে উপযুক্ত উচ্চ মর্যাদা দান করুন। আর যাহাই হউক; তাহাদেরও আবেগ ছিল, আত্মসম্মান ও মর্যাদাবোধ ছিল, তাহাদের বুকের মধ্যেও অন্তর ছিল এবং উহাতে আবেগ ছিল। আল্লাহ তায়ালায় সন্তুষ্টির মুকাবেলায় কিসের দিল, কিসের আবেগ, কি রকম আত্মসম্মানবোধ, কোথাকার বদনামীর ভয়! আল্লাহ তায়ালায় সন্তুষ্টির মোকাবেলায় তাহাদের এই সমস্ত কিছু ফানা ও বিলীন হইয়া গিয়াছিল।

⑤ وَوَقَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ط حَمَلَتْهُ
 أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ط وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ
 ثَلَاثُونَ شَهْرًا ط حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ
 أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ
 نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَتِي وَأَنْ
 أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي
 اتَّبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ○ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
 نَقْبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَتَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ
 فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ ط وَعَدَ الصَّادِقُ الذِّي كَانُوا
 يُوعَدُونَ ○ (احقاف, ٢٤)

③ আর আমি মানুষকে তাহার পিতামাতার সহিত সদ্ব্যবহার করিবার নির্দেশ দিয়াছি। (বিশেষতঃ মায়ের সহিত আরও বেশী সদ্ব্যবহারের, কেননা,) তাহার মাতা তাহাকে বড় কষ্টের সহিত গর্ভে ধারণ করিয়াছে এবং অতি কষ্টে তাহাকে প্রসব করিয়াছে। আর তাহাকে গর্ভে ধারণ হইতে দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত (অধিকাংশ সময় কমপক্ষে) ত্রিশ মাস লাগিয়া যায় (কত দীর্ঘ সময়ের কষ্ট)। এমনকি যখন সেই শিশু যৌবনে উপনীত হয় (এবং পরিপূর্ণ জ্ঞানের বয়স) চল্লিশ বৎসরে উপনীত হয়, তখন (যে নেক-বখত হয়, সে) বলিতে থাকে, হে আমার রব্ব! আমাকে সর্বদা তওফীক দান করুন, যেন আপনার সেই সমস্ত নেয়ামতের শোকর-ওয়ারী করি, যাহা আপনি আমাকে ও আমার পিতামাতাকে দান করিয়াছেন, আর (ইহার তওফীক দান করুন যে,) আমি যেন এমন নেক কাজ করি, যাহাতে আপনি সন্তুষ্ট হন এবং আমার সন্তানদের মধ্যেও আমার (উপকারের) জন্য যোগ্যতা পয়দা করিয়া দিন। আমি (আমার সমস্ত গোনাহ হইতে) তওবা করিতেছি। আমি আপনার অনুগতদের মধ্যে একজন। (অতঃপর আব্বাহ তায়ালা এইরূপ লোকদের সম্পর্কে বলিতেছেন,) ইহারাই এমন সমস্ত লোক, যাহাদের নেক কাজকে আমি কবুল করিব এবং তাহাদের গুনাহসমূহ আমি ক্ষমা করিব। এইভাবে যে, তাহারা জামাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে। ইহা সেই প্রতিশ্রুতির কারণে, যাহা দুনিয়াতে তাহাদিগকে দেওয়া হইত। (অর্থাৎ, নেক আমলের বিনিময়

জান্নাত হইবে) (আহকাফ : ১৫-১৬)

ফারদা : আল্লাহ তায়ালা আত্মীয়-স্বজন ও পিতামাতা সম্পর্কে বারবার তাকিদ করিয়াছেন। যেমন, প্রথম আয়াতের আলোচনায় উল্লেখ করা হইয়াছে। এই আয়াতে প্রধানতঃ পিতামাতা সম্পর্কে সদ্যবহারের বিষয়ে এই বলিয়া বিশেষ তাকিদ করা হইয়াছে যে, আমি পিতামাতার সহিত ভাল ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়াছি। এই বিষয়টি এই ভাষায় অর্থাৎ 'আমি পিতামাতার সহিত ভাল ব্যবহারের নির্দেশ দিয়াছি' কুরআন পাকে তিন আয়গায় বর্ণিত হইয়াছে। সূরা আনকাবুতের ১ম রুকুতে, অতঃপর সূরা লোকমানের ২য় রুকুতে, তৃতীয় বার এই আয়াতে ; যাহা দ্বারা অনেক বেশী তাকিদ বুঝা যায়। তফসীরে খায়েনের লেখক লিখিয়াছেন, উক্ত আয়াত হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)এর শানে নাথিল হইয়াছে। প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত শাম দেশের সফরে সঙ্গী হইয়াছিলেন। তখন তাহার বয়স ছিল আঠার বৎসর আর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স ছিল বিশ বছর। উক্ত সফরে পথে একটি কূল গাছের নিকট তাহারা উভয়ে অবস্থান করিয়াছিলেন। সেখানে একজন পাদ্রী ছিল। হযরত আবু বকর (রাযিঃ) তাহার সহিত সাক্ষাত করিতে গেলেন। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাছের ছায়াতে বসিয়াছিলেন। পাদ্রী হযরত আবু বকর (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল, গাছের নিচে বসা লোকটি কে? হযরত আবু বকর (রাযিঃ) বলিলেন, তিনি মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুস্তালিব। পাদ্রী বলিল, আল্লাহর কসম! ইনি নবী। হযরত ইসা (আঃ)এর পর হইতে এই গাছের নিচে আর কেহ বসে নাই। ইনিই শেষ যমানার নবী। যখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চল্লিশ বৎসর বয়সে নবুওত দান করা হইল, তখন হযরত আবু বকর (রাযিঃ) মুসলমান হইলেন। দুই বৎসর পর যখন হযরত আবু বকর (রাযিঃ)এর বয়স চল্লিশ বৎসর হইল, তখন তিনি এই দোয়া করিলেন : رَبِّ اَوْزِعْنِي অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাকে তওকীক দান করুন, আমি যেন সেই নেয়ামতের শোকর-গুযারী করি, যাহা আমাকে এবং আমার মাতাপিতাকে দান করা হইয়াছে।

হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, পিতামাতা উভয় মুসলমান হওয়ার এই ফযীলত মোহাজিরদের মধ্যে হযরত আবু বকর ছাড়া আর কাহারও হাসিল হয় নাই। দ্বিতীয় দোয়া তিনি সন্তানদের যোগ্যতা সম্পর্কে করিয়াছেন। এই দোয়ার ফলে তাহার সন্তানরাও মুসলমান হইয়াছে। (খায়েন)

সূরা আনকাবুতে বর্ণিত সর্বপ্রথম আয়াতটি আরও বেশী কঠিন। উক্ত আয়াতে কাফের পিতামাতার সহিত ভাল ব্যবহারের হুকুম করা হইয়াছে। আর যখন আল্লাহ তায়ালা পক্ষ হইতে কাফের পিতামাতার সহিতও সদ্যবহার ও অনুগ্রহের হুকুম রহিয়াছে, তখন মুসলমান পিতামাতার সহিত ভাল ব্যবহার ও অনুগ্রহের তাকিদ আরও বেশী গুরুত্ব রাখে।

হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাযিঃ) বলেন, আমি যখন মুসলমান হইলাম, তখন আমার মা এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর দ্বীন হইতে না ফিরিবে, ততক্ষণ আমি খানা খাইব না, পানি পান করিব না। তিনি খানাপিনা ছাড়িয়া দিলেন। এমনকি জোর করিয়া তাহার মুখে খাদ্য দেওয়া হইত। তখন উক্ত আয়াত নাযিল হইল। (দুররে মানসূর)

এখানে শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে যে, এত কঠিন অবস্থায়ও আল্লাহ পাক বলিতেছেন, আমি মানুষকে তাহার পিতামাতার সহিত ভাল ব্যবহারের হুকুম করিয়াছি। অবশ্য, যদি তাহারা মুশরিক বানাইবার চেষ্টা করে, তবে ইহাতে আনুগত্য করা যাইবে না।

হযরত হাসান (রাযিঃ)কে কেহ জিজ্ঞাসা করিল, পিতামাতার সহিত সদ্যবহারের পরিমাণ কি? তিনি বলিলেন, যাহা কিছু তোমার মালিকানায় রহিয়াছে তাহাদের উপর খরচ কর। তাহারা যাহা হুকুম করেন, উহা মান্য কর। তবে কোন গোনাহের বিষয়ে হুকুম করিলে উহাতে কোন আনুগত্য নাই। এই ছিল ইসলামের শিক্ষা, মুসলমানদের আমল। মুশরিক পিতামাতা যদি সন্তানকে মুশরিক বানাইবার চেষ্টাও করে, তবুও তাহাদের সহিত ভাল ব্যবহারের হুকুম রহিয়াছে। তবে শিরক করার ব্যাপারে তাহাদের কোন আনুগত্য নাই। কেননা, ইহা সৃষ্টিকর্তার হুকুম। পিতামাতার হুকুম চাই যতই হউক না কেন, আল্লাহ তায়ালা হকের মোকাবেলায় কাহারও হুকুম নাই। لَا طَاعَةَ لِلْمَخْلُوقِ بِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ 'সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতায় কোন সৃষ্টির আনুগত্য নাই।' কিন্তু তাহাদের গোনাহের নির্দেশ এবং সন্তানদেরকে মুশরিক বানাইবার চেষ্টা সত্ত্বেও তাহাদের সহিত অনুগ্রহ ও ভাল ব্যবহারের হুকুম রহিয়াছে।

অন্য এক হাদীসে সূরায়ে লোকমানের আয়াত সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে, ইহা হযরত সাদ (রাযিঃ)এর ঘটনা সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে। এই হাদীসে আছে, হযরত সাদ (রাযিঃ) বলেন, আমি আমার মায়ের সহিত খুবই সদ্যবহার করিতাম। যখন আমি মুসলমান হইয়া গেলাম, তখন আমার মা বলিলেন, সাদ, ইহা কি করিলে? হয়ত এই দ্বীন ছাড়িয়া

করা হইয়াছে) কেবল ফাসেকদিগকেই বিপথগামী করেন, যাহারা আল্লাহর সঙ্গে দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার পর উহা এবং তাহারা ঐ সমস্ত সম্পর্কে ছিন্ন করে, যাহা বজায় রাখিবার জন্য আল্লাহ তায়ালা আদেশ দিয়াছেন এবং তাহারা অশান্তি সৃষ্টি করে ভূপৃষ্ঠে। ইহারাই পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত।

(বাকারা : ২৬-২৭)

ফায়দা : আল্লাহ তায়ালা কুরআন পাকের কয়েক জায়গায় আত্মীয়-স্বজনের সহিত সদ্যবহার বিশেষতঃ পিতামাতার হক আদায়ের প্রতি হুকুম ও উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। যেমন, উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে। তেমনি অনেক জায়গায় তাহার পবিত্র কালামে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা বিশেষতঃ পিতামাতার সহিত অসদ্যবহার সম্পর্কেও সতর্ক করিয়াছেন। পূর্বের মত এই বিষয়েও কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করিতেছি। বন্ধুগণ! গভীরভাবে চিন্তা করুন, আল্লাহ তায়ালা পাক কালামে যখন বারবার বিষয়টির উপর হুঁশিয়ারী আসিয়াছে, কাজেই ইহাতে চিন্তা করুন ও শিক্ষা গ্রহণ করুন। আল্লাহ পাক এরশাদ করিতেছেন—

১. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ (নিসা : ১১)
২. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ أَمْلَاقٍ (আনআম : ১৫১)
৩. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ (বনী ইসরাইল : ৩১)
৪. وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ ابْنَةُ (আহকাফ : ১৭)
৫. أَنْ تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقْطِعُوا أَرْحَامَكُمْ (মুহাম্মদ : ২২)

হযরত মুহাম্মদ বাকের (রহঃ)কে তাহার পিতা বিশেষভাবে গুরুত্বসহকারে যে ওসিয়ত করিয়াছিলেন, যাহা প্রথম পরিচ্ছেদে ২৩ নম্বর হাদীসের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হইয়াছে, উহা অত্যন্ত অভিজ্ঞতাপূর্ণ কথা ছিল। তিনি বলেন, আমাকে আমার পিতা (হযরত ইমাম যাইনুল আবেদীন (রহঃ)) ওসিয়ত করিয়াছেন, পাঁচ প্রকার লোকের সহিত মিশিও না, তাহাদের সহিত কথা বলিও না ; এমনকি পথচলা অবস্থায় ঘটনাক্রমেও তাহাদের সহিত চলিও না। ১. ফাসেক ব্যক্তি, সে এক লোকমার বিনিময়ে তোমাকে বিক্রয় করিয়া দিবে। এমনকি এক লোকমার কমেও বিক্রয় করিয়া ফেলিবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এক লোকমার কমে কিভাবে বিক্রয় করিবে? তিনি বলিলেন, এক লোকমার আশায়

তোমাকে বিক্রয় করিয়া দিবে অথচ ঐ লোকমাও সে পাইবে না। ২. কৃপণ ব্যক্তি, সে তোমার কঠিন প্রয়োজনের সময়ও তোমার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইবে। ৩. মিথ্যাবাদী ব্যক্তি, সে বালুর মত তোমাকে ধোকায় ফেলিয়া রাখিবে, দূরবর্তী জিনিসকে নিকটবর্তী বলিবে, আর নিকটবর্তী জিনিসকে দূরবর্তী দেখাইবে। ৪. নির্বোধ লোকের নিকট যাইও না, সে তোমার উপকার করিতে চাহিলেও তাহার নিবুদ্ধিতার কারণে ক্ষতি করিয়া দিবে। প্রবাদ বাক্য রহিয়াছে, নাদান দোস্তের চেয়ে জ্ঞানী দুশমন উত্তম। ৫. আত্মীয়-স্বজনের সহিত সম্পর্ক ছিন্নকারীর নিকট যাইও না। আমি কুরআন পাকে তিন জায়গায় তাহার উপর লানত পাইয়াছি। (রওজ)

② وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ
عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ
وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ
أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي
الْأَرْضِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمُ
الْعَذَابُ وَلَهُمْ سَوْءُ الدَّارِ ۝
(سورة مائدة: ১০)

اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے معاہدہ کو اس
کی پٹنگلی کے بعد توڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ
نے جس تعلقات کے جوڑنے کا حکم فرمایا
اُن کو توڑتے ہیں، اور دنیا میں فساد
کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر لعنت
ہے، اور اُن کے لئے اس جہان میں
خوابی ہے۔

② আর যাহারা আল্লাহ তায়ালায় অঙ্গীকারসমূহকে উহা দৃঢ় করার পর ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ তায়ালা যে সমস্ত সম্পর্ককে বহাল রাখার হুকুম করিয়াছেন উহাকে ছিন্ন করে এবং দুনিয়াতে অশান্তি সৃষ্টি করে, এই সমস্ত লোকের উপর লানত রহিয়াছে এবং পরকালে ইহাদের জন্য অশুভ পরিণতি রহিয়াছে। (রাদ : ২৫)

ফায়দা : হযরত কাতাদা (রহঃ) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে। তিনি বলেন, অঙ্গীকার করিয়া উহা ভঙ্গ করা হইতে অনেক বেশী বাঁচিয়া থাক। আল্লাহ তায়ালা ইহাকে অত্যন্ত অপছন্দ করিয়াছেন। বিশটিও অধিক আয়াতে এই ব্যাপারে ঈশিয়ারী উচ্চারণ করিয়াছেন, যাহা উপদেশ ও কল্যাণ কামনা হিসাবে এবং দলীলস্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ তায়ালা অঙ্গীকার ভঙ্গ করার উপর যত বেশী সতর্ক করিয়াছেন, উহা হইতে বেশী আর কোন বিষয়ে সতর্ক করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে অঙ্গীকার করে, সে যেন অবশ্যই উহা পূরণ করে।

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

খোতবার মধ্যে বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমানত পরিশোধ না করে, তাহার ঈমান নাই। আর যে অঙ্গীকার পূরণ না করে, তাহার ধীন নাই।

হযরত আবু উমামা ও হযরত উবাদা (রাযিঃ) হইতেও এই বিষয়টি বর্ণনা করা হইয়াছে। (দুররে মানসূর)

হযরত মাইমুন ইবনে মেহরান (রহঃ) বলেন, তিনটি জিনিস এমন রহিয়াছে, যাহাতে কাফের ও মুসলমানের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই ; সকলের জন্য সমান হুকুম। প্রথম, যাহার সহিত অঙ্গীকার করা হয়, উহা পূরণ করা চাই ; সেই অঙ্গীকার কাফেরের সহিত করা হউক বা মুসলমানের সহিত করা হউক। কেননা, প্রকৃতপক্ষে অঙ্গীকার আল্লাহ তায়ালার সহিত করা হয়। দ্বিতীয়, যাহার সহিত আত্মীয়তার সম্পর্ক রহিয়াছে, তাহার সহিত সুসম্পর্ক বজায় রাখা চাই ; সেই আত্মীয় মুসলমান হউক বা কাফের হউক। তৃতীয়, যেই ব্যক্তি আমানত রাখিয়াছে, তাহার আমানত ফিরাইয়া দেওয়া চাই ; আমানতদাতা মুসলমান হউক বা কাফের হউক।

(তাম্বীহুল গাফেলীন)

কুরআন পাকে বহু আয়াতে এই বিষয়টি বর্ণিত হইয়াছে, উপরন্তু এক জায়গায় বিশেষভাবে ইহার প্রতি হুকুম দেওয়া হইয়াছে : وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ, অর্থাৎ, তোমরা অঙ্গীকার পূরণ কর, নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে। (বনী ইসরাঈল : ৩৪)

হযরত কাতাদা (রহঃ) বলেন, যে সব সম্পর্ক বজায় রাখার হুকুম করা হইয়াছে, উহা দ্বারা নিকট ও দূরবর্তী উভয় প্রকার আত্মীয়তার সম্পর্ককে বুঝানো হইয়াছে। (দুররে মানসূর)

উপরোক্ত আয়াতে অপর বিষয়টি সম্পর্ক ছিন্ন করা সম্পর্কে এরশাদ করা হইয়াছে। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে, তাহার সহিত মেলামেশা করিও না। কেননা, আমি কুরআন পাকে দুই জায়গায় তাহাদের উপর লানত দেখিয়াছি। একটি উপরে বর্ণিত আয়াত, আর দ্বিতীয়টি সূরা মুহাম্মদের আয়াত। (দুররে মানসূর)

সূরা মুহাম্মদের আয়াত কিছু পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। উহাতে সম্পর্ক ছিন্ন করার বিষয় উল্লেখ করিয়া এরশাদ করা হইয়াছে, ইহারা ঐ সমস্ত লোক, যাহাদের উপর আল্লাহ তায়াল লানত করিয়াছেন। অতঃপর (এই সমস্ত লোককে আল্লাহ তায়াল নিজে হুকুম-আহকাম শ্রবণ করা হইতে) বধির করিয়া দিয়াছেন এবং (সত্যপথ) দেখা হইতে অন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) দুই জায়গায় লানতঃ কথা বলিয়াছেন এবং হযরত যাইনুল আবেদীন (রহঃ) তিন জায়গায় কথা বলিয়াছেন। যেমন কিছু পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার কারণ সম্ভবতঃ এই হইবে যে, দুই জায়গায় তো সরাসরি লানত শব্দ রহিয়াছে, অর্থাৎ সূরা রাদে ও সূরা মুহাম্মদে। আর তৃতীয় জায়গায় তাহাদেরকে পঞ্চত্রয় ও ক্ষতিগ্রস্ত বলা হইয়াছে, যাহা লানতের অর্থের কাছাকাছি। যেমন আলোচ্য নম্বরের পূর্বের নম্বরে সূরা বাকারার আয়াতে এইমাত্র অতিবাহিত হইয়াছে।

হযরত সালমান (রাযিঃ) ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র এরশাদ বর্ণনা করেন যে, যখন কথা প্রকাশ হইয়া যায় এবং আমল কোষাগারে চলিয়া যায় অর্থাৎ বক্তৃতা বেশী হইতে আরম্ভ করে এবং অধিক পরিমাণে বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ লেখা হইতে থাকে কিন্তু আমল বলিতে কিছুই থাকে না যেন উহা তালাবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে ; আর পরস্পর মৌখিক একতা হইয়া যায় অথচ অন্তরসমূহ পৃথক থাকিয়া যায় ; আত্মীয়-স্বজন পরস্পর সম্পর্ক ছিন্ন করিতে থাকে, তখন আল্লাহ তায়ালা তাহাদেরকে আপন রহমত হইতে দূর করিয়া দেন এবং অন্ধ বধির করিয়া দেন।

হযরত হাসান (রাযিঃ) হইতেও ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদ বর্ণনা করা হইয়াছে, যখন লোকেরা এলেককে প্রকাশ করে, আমলকে ধ্বংস করিয়া দেয়, মুখে মহব্বত প্রকাশ করে আর অন্তরে বিদ্বেষ পোষণ করে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে, তখন আল্লাহ তায়ালা ঐ সমস্ত লোককে আপন রহমত হইতে দূর করিয়া দেন এবং অন্ধ বধির করিয়া দেন। (দুররে মানসুর) অর্থাৎ, তখন তাহারা সোজা পথ দেখে না এবং হক কথা তাহাদের কানে পৌঁছে না।

এক হাদীসে আসিয়াছে, জাম্মাতের খুশবু এতদূর পর্যন্ত যায় যে, সেই দূরত্ব অতিক্রম করিতে পাঁচশত বৎসর লাগিয়া যায়। পিতামাতার অবাধ্য এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জাম্মাতের খুশবুও পাইবে না। (এহইয়া)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা (রাযিঃ) বলেন, আমরা আরাফার দিন সন্ধ্যায় ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়াছিলাম। ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই মজলিসে যদি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী এমন কোন ব্যক্তি থাকে, তবে সে যেন উঠিয়া যায় ; আমাদের নিকট না বসে। ভরা মজলিস হইতে শুধু এক ব্যক্তি উঠিয়া গেল, যে দূরে বসিয়াছিল। আবার

কিছুক্ষণ পর লোকটি আসিয়া বসিয়া গেল। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার বলার পর মজলিস হইতে শুধু তুমি উঠিয়া গেলে, অতঃপর ফিরিয়া আসিয়া বসিয়া গেলে, ইহার কারণ কি? লোকটি আরজ করিল, হযূরের এরশাদ শুনিয়া আমি আমার খালার নিকট গিয়াছিলাম, তিনি আমার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমি যাওয়ার পর তিনি বলিলেন, তুমি অসময় কিভাবে আসিলে? আমি তাহাকে আপনার পবিত্র এরশাদ শুনাইলাম। তিনি আমার জন্য মাগফেরাতের দোয়া করিলেন। আমিও তাহার জন্য মাগফেরাতের দোয়া করিলাম (অর্থাৎ, পরস্পর সমঝোতা করিয়া ফিরিয়া আসিলাম)। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তুমি খুবই ভাল কাজ করিয়াছ, বসিয়া পড়। সেই কওমের উপর আল্লাহ তায়ালার রহমত নাথিল হয় না, যাহাদের মধ্যে কেহ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী থাকে।

ফকীহ আবুল লাইস (রহঃ) ঘটনাটি বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু কানয কিতাবের লেখক ইবনে মাসীন (রহঃ) হইতে উহার একজন বর্ণনাকারী সম্পর্কে মিথ্যার সম্পৃক্তি নকল করিয়াছেন। (কানয)

ফকীহ আবুল লাইস (রহঃ) বলেন, এই ঘটনা হইতে জানা যায় যে, আত্মীয়তা ছিন্ন করা এত কঠিন গোনাহ যে, উহার কারণে এইরূপ ব্যক্তির নিকট যাহারা বসে, তাহারাও আল্লাহ তায়ালার রহমত হইতে বঞ্চিত হইয়া যায়। যে ব্যক্তি ইহাতে লিপ্ত রহিয়াছে, তাহার জন্য ইহা হইতে তওবা করা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরী।

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা হইতে বড় কোন নেকী নাই; যাহার সওয়াব অতি তাড়াতাড়ি পাওয়া যায়। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা ও জুলুম করা হইতে বড় কোন গুনাহ নাই; যাহার শাস্তি আখেরাত ছাড়া দুনিয়াতেও পাইতে হয়। (তাম্বীহুল গাফেলীন)

বিভিন্ন রেওয়াযাতে ইহা বর্ণিত হইয়াছে যে, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার শাস্তি আখেরাত ছাড়া দুনিয়াতেও ভোগ করিতে হয়। আর আখেরাতে খারাপ পরিণতি হওয়ার বিষয় তো স্বয়ং এই আয়াতেই বর্ণিত হইয়াছে।

ফকীহ আবুল লাইস (রহঃ) একটি আশ্চর্য ঘটনা লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, মক্কা মুকাররমায় খোরাसानবাসী একজন আমানতদার নেক ব্যক্তি ছিল। লোকেরা তাহার নিকট নিজেদের আমানতসমূহ রাখিত। এক ব্যক্তি

তাহার নিকট দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা আমানত রাখিয়া নিজের কোন প্রয়োজনে সফরে চলিয়া গেল। যখন সে সফর হইতে ফিরিয়া আসিল, তখন ঐ খোরাসানী লোকটির এতেকাল হইয়া গিয়াছিল। তাহার পরিবার-পরিজনদের নিকট আমানতের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কিছুই জানে না বলিয়া প্রকাশ করিল। লোকটি অত্যন্ত চিন্তায় পড়িল। কেননা, বড় অংকের টাকা ছিল। ঘটনাক্রমে সেই সময় মক্কা মুকাররমার কিছুসংখ্যক উলামায়ে কেরাম এক মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। লোকটি তাহাদের নিকট মাসআলা জিজ্ঞাসা করিল যে, এখন আমার কি করা উচিত? তাহারা বলিলেন, তিনি তো বড় সংলোক ছিলেন, আমাদের ধারণায় তিনি জালাতী মানুষ ছিলেন। তুমি এক কাজ কর, অর্ধরাত্রে অথবা রাত্রে দুই-তৃতীয়াংশ কাটিয়া যাওয়ার পর তুমি জমজম কূপের নিকট যাইয়া তাহার নাম ধরিয়া ডাকিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা কর। লোকটি তিন দিন পর্যন্ত এইরূপ করিল। সেখান হইতে কোন উত্তর আসিল না। লোকটি পুনরায় উলামায়ে কেরামের নিকট বিষয়টি জানাইল। ইহা শুনিয়া তাহারা ইমালিগ্লাহ পড়িলেন এবং বলিলেন, আমাদের তো আশংকা হইতেছে, হয়ত সে জালাতী নয়। তুমি অমুক জায়গায় যাও। সেখানে বারহত নামে একটি উপত্যকা আছে, উহাতে একটি কূপ আছে। ঐ কূপের নিকট যাইয়া তুমি আওয়াজ দাও। লোকটি তাহাই করিল। প্রথম আওয়াজেই সেখান হইতে উত্তর আসিল যে, তোমার সম্পদ ঐভাবেই হেফাজতে রাখিয়াছি। আমি আমার সন্তানদের ব্যাপারে নিশ্চিত না হওয়ার কারণে আমার ঘরের ভিতর অমুক জায়গায় পুতিয়া রাখিয়াছি। আমার পুত্রদেরকে বল, তাহারা যেন তোমাকে ঐ জায়গায় পৌছাইয়া দেয়। সেখানে মাটি খুঁড়িয়া উহা বাহির করিয়া লও। সুতরাং সে এইরূপই করিল এবং সম্পদ পাইয়া গেল। লোকটি অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত খোরাসানীকে কূপের নিকট ইহাও জিজ্ঞাসা করিল যে, তুমি তো নেক লোক ছিলে, এখানে কিভাবে পৌছিলে? কূপের ভিতর হইতে আওয়াজ আসিল, খোরাসানে আমার কিছু আত্মীয়-স্বজন ছিল। আমি তাহাদের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিলাম এবং সেই অবস্থায়ই আমার মৃত্যু হইয়া গিয়াছে। উহার শাস্তিস্বরূপ আমি এখানে বন্দী হইয়া রহিয়াছি। (তাম্বীহুল গাফেলীন)

হযরত আলী (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে, সমস্ত উপত্যকার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ উপত্যকা হইল, মক্কায়ে মুকাররমার উপত্যকা এবং হিন্দুস্থানের ঐ উপত্যকা, যেখানে হযরত আদম (আঃ) জাম্বাত হইতে

অবতরণ করিয়াছিলেন, সেইখানেই ঐ সমস্ত খুশবু অধিক পরিমাণে
রহিয়াছে, যাহা লোকেরা ব্যবহার করে। আর সর্বনিকৃষ্ট উপত্যকা হইল,
আহকাফ ও হাজ্জরামাউত উপত্যকা, যাহাকে বারহুত উপত্যকা বলে। আর
দুনিয়াতে সর্বশ্রেষ্ঠ কূপ হইল, জমজমের কূপ। আর সর্বনিকৃষ্ট কূপ হইল
বারহুতের কূপ, যেখানে কাফেরদের রূহ সমবেত হয়। (দুররে মানসুর)

এই সকল স্থানে কোন সময় এই সমস্ত রাহের অবস্থান করা শরীয়ত সমর্থিত দলীল নয় ; ইহা কাশফের সহিত সম্পর্ক রাখে। আব্বাহ তায়ালা যাহার জন্য চাহেন কখনও প্রকাশ করিয়া দেন। কিন্তু এই কাশফও শরীয়তসম্মত হুজ্জত বা দলীল নয়।

۳) اِنَّمَا يَبْتَلِيَنَّكَ عِنْدَكَ
الْكِبَرُ اَحَدُهُمَا اَوْ رِكَالَهُمَا
فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ
وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا
قَوْلًا كَرِيمًا ۝ وَاخْفِضْ
لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ
الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا
كَمَا رَّبِّيَنِي صَغِيرًا ۝
رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا رَفِيَ
نُفُوسِكُمْ ۝ اِنْ تَكُونُوا
صَادِقِينَ فَاِنَّهُ كَانَ
بِلَا ذَوَابِّينَ غَفُورًا ۝

(سورة بنی اسرائیل ۲۸) میں ہے پالا ہے (اور صرف ظاہر داری
 ہی نہیں بلکہ دل سے ان کا احترام کرنا) تبیا ما رب تبیا سے دل کی بات کو خوب جانتا ہے
 اگر تم سدا تمند ہو (اور غلطی سے کوئی بات خلاف ادب سرزد ہو جائے اور تم تو بیکرد) تو
 وہ تو بے گناہ نہ والے کی خطائیں ہنسی کثرت سے معاف کرنے والا ہے :-

(অর্থাৎ, পিতামাতা) একজন অথবা উভয়ে বার্বাকো উপনীত হয়, (এবং বার্বাকোর কোন কোন কথা যুবকদের নিকট বিরক্তিকর অনুভব হয়, আর এই কারণে তাহাদের কোন কথা তোমার নিকট ভারী মনে হইলে,) তবুও তাহাদিগকে উহু পর্যন্তও বলিও না, আর তাহাদিগকে ধমক দিও না এবং তাহাদের সহিত খুব আমবের সহিত কথা বলিও এবং তাহাদের সম্মুখেও বিনয়ের সহিত নত হইয়া থাকিও, আর এইরূপ দোয়া করিতে থাকিও, হে আমাদের পরওয়ারদিগার! আপনি তাহাদের উভয়ের প্রতি দয়া করুন, যেইরূপ তাহারা শৈশবে আমাকে লালন-পালন করিয়াছেন। (আর শুধু বাহ্যিকভাবেই নয়, বরং আন্তরিকভাবে তাহাদের সম্মান করিবে) তোমাদের রব্ব তোমাদের অন্তরের অবস্থা উত্তমরূপে জানেন। যদি তোমরা নেক-বখত হও (আর জুলবশতঃ যদি কোন কথা আমবের খেলাপ উচ্চারিত হইয়া যায়, আর তোমরা তওবা করিয়া লও), তবে তিনি তওবাকারীদের অপরাধসমূহ অনেক বেশী ক্ষমাকারী। (বনী ইসরাঈল : ২৩-২৫)

ফায়দা : হযরত মুজাহিদ (রহঃ) হইতে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হইয়াছে, যদি তাহারা বৃদ্ধ হইয়া যায় এবং তাহাদের প্রস্রাব-পায়খানা তোমাদের ধুইতে হয়, তবে কখনও উহু পর্যন্তও বলিও না। যেমন, তাহারা শৈশবে তোমার প্রস্রাব-পায়খানা ধুইয়াছেন।

হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, বেয়াদবীর জন্য উহু বলার চেয়েও যদি নিম্ন পর্যায়ের কোন কিছু হইত, তবে আল্লাহ তায়ালা উহাও হারাম করিয়া দিতেন।

হযরত হাসান (রাযিঃ)কে কেহ জিজ্ঞাসা করিল, পিতামাতার অবাধ্যতার পরিমাণ কি? তিনি বলিলেন, নিজের সম্পদ হইতে তাহাদেরকে বঞ্চিত রাখা, দেখা-সাক্ষাৎ ছাড়িয়া দেওয়া এবং তাহাদের প্রতি কড়া দৃষ্টিতে দেখা।

হযরত হাসান (রাযিঃ)কে কেহ জিজ্ঞাসা করিল, পিতামাতার সহিত কওলে কারীমের অর্থ কি? তিনি বলিলেন, তাহাদিগকে আশ্রম আশ্রম বলিয়া সম্বোধন করা, নাম না লওয়া।

হযরত যুবায়ের ইবনে মুহাম্মদ (রহঃ) হইতে ইহার ব্যাখ্যা বর্ণনা করা হইয়াছে যে, যখন তাহারা ডাকেন, তখন জ্বি হাজির আছি, হাজির আছি বলিয়া সাড়া দিবে। হযরত কাতাদা (রহঃ) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, নম্রভাবে কথা বলিবে।

হযরত সাদ্দ ইবনে মুসাইয়াব (রহঃ)কে কেহ জিজ্ঞাসা করিল, কুরআন পাকে সং ব্যবহারের আদেশ তো অনেক জায়গায় করা হইয়াছে:

আমি উহা বুঝিয়াছি, কিন্তু কওলে কারীমের অর্থ আমার বুঝে আসে নাই। তিনি বলিলেন, কোন কঠিন অপরাধী গোলাম, কঠোর মেজাজ মনিবের সহিত যেভাবে কথা বলে।

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এক ব্যক্তি হাজির হইল। তাহার সহিত একজন বয়স্ক লোকও ছিল। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই লোকটি কে? সে বলিল, ইনি আমার পিতা। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহার আগে আগে চলিবে না, তাহার আগে বসিবে না, তাহার নাম ধরিয়া ডাকিবে না, তাহাকে কটু কথা বলিবে না।

হযরত ওরওয়া (রহঃ)এর নিকট কেহ জিজ্ঞাসা করিল, কুরআন পাকে পিতামাতার সম্মুখে নত থাকিবার আদেশ করা হইয়াছে, ইহার অর্থ কি? তিনি বলিলেন, তাহারা যদি তোমার অপছন্দের কোন কথা বলে, তবে তাহাদেরকে বক্রদৃষ্টিতে দেখিও না। কেননা, মানুষের বিরক্তি প্রথমে তাহার দৃষ্টি হইতেই বুঝা যায়।

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি পিতার দিকে কড়া দৃষ্টিতে দেখিল, সে বাধ্যগত সন্তান নয়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, আমি হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আল্লাহ তায়ালার নিকট সবচেয়ে বেশী পছন্দনীয় আমল কি? তিনি বলিলেন, সময় মত নামায পড়া। আমি আরজ করিলাম, উহার পর কোন আমল? তিনি বলিলেন, পিতামাতার সহিত ভাল ব্যবহার করা। আমি আরজ করিলাম, উহার পর? তিনি বলিলেন, জিহাদ।

অন্য এক হাদীসে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে, আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।

(দূররে মানসুর)

মাজাহের কিতাবের লেখক লিখিয়াছেন, পিতামাতার হকসমূহের মধ্যে ইহাও যে, এমন বিনয় ও খোশামোদ অবলম্বন করিবে এবং খেদমত করিবে, যাহাতে তাহারা সন্তুষ্ট হইয়া যান। বৈধ কাজে তাহাদের অনুসরণ করিবে, বেআদবী করিবে না, অহংকারমূলক আচরণ করিবে না; যদিও তাহারা কাফের হয়। নিজের আওয়াজকে তাহাদের আওয়াজ হইতে উচ্চ

করিবে না। তাহাদেরকে নাম ধরিয়া ডাকিবে না। কোন কাজ তাহাদের আগে শুরু করিবে না। সংকাজে আদেশ ও অসং কাজে নিষেধের ব্যাপারে নম্রতা অবলম্বন করিবে। একবার বলিবে, যদি কবুল না করেন, তবে নিজে ভাল ব্যবহার করিতে থাকিবে। তাহাদের জন্য দোয়া ও এস্তেগফার করিতে থাকিবে। এই কথাগুলি কুরআন পাক হইতে লওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ, হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর আপন পিতাকে নসীহত করার বর্ণনা হইতে লওয়া হইয়াছে। (মাক্কাহির ; কিষ্টিং পরিবর্তিত)

অর্থাৎ, হযরত ইবরাহীম (আঃ) একবার নসীহত করিবার পর বলিয়া দিয়াছিলেন যে, আচ্ছা, এখন আমি আব্রাহাম তায়ালার নিকট আপনার জন্য দোয়া করিতেছি। যেমন, সূরা মারিয়ামের তৃতীয় রুকুতে আসিয়াছে। এমন কি কোন কোন আলেম লিখিয়াছেন, হারাম বিষয়ে তাহাদের আনুগত্য নাজায়েয, কিন্তু সন্দেহজনক বিষয়ে ওয়াজিব। কেননা, সন্দেহজনক বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা পরহেজগারীর অন্তর্ভুক্ত, আর তাহাদের সন্তুষ্টি অর্জন করা ওয়াজিব। সুতরাং যদি তাহাদের সম্পদ সন্দেহজনক হয় ; আর তুমি পৃথক খাওয়া-দাওয়া করিলে তাহারা বিরক্ত হন, তবে তাহাদের সহিত খাওয়া-দাওয়া করা উচিত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, যে কোন মুসলমান তাহার পিতামাতার জীবদশায় তাহাদের সহিত উত্তম ব্যবহার করে, তাহার জন্য জাহান্নামের দুইটি দরজা খুলিয়া যায়। আর যদি তাহাদিগকে অসন্তুষ্ট করে, তবে আব্রাহাম তায়ালার ততক্ষণ পর্যন্ত সন্তুষ্ট হন না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাহাদিগকে সন্তুষ্ট না করিয়া লয়। কেহ আরজ করিল, তাহারা যদি জুলুম করে? ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলিলেন যদিও তাহারা জুলুম করে।

হযরত তালহা (রাযিঃ) বলেন, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এক ব্যক্তি হাজির হইল এবং জিহাদে শরীফ হওয়ার আবেদন করিল। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার মা বাঁচিয়া আছেন কি? লোকটি আরজ করিল, হ্যাঁ, বাঁচিয়া আছেন। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, খুব ভালভাবে তাহার খেদমত কর, কেননা, জাহান্নাম তাহার পদতলে রহিয়াছে। অতঃপর দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই কথা বলিলেন।

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিল, ইয়া রাসূলল্লাহ! আমার জিহাদ করিতে খুব মন চায় ; কিন্তু আমার শক্তি নাই। হযুর

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার পিতামাতার মধ্য হইতে কেহ জীবিত আছেন কি? সে আরজ করিল, যা জীবিত আছেন। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। (তাহার হক আদায় করার ব্যাপারে ফতোয়া হইতে অগ্রসর হইয়া তাকওয়ার উপর আমল করিতে থাক।) যখন তুমি এইরূপ করিবে, তখন তুমি হজ্জও আদায় করিলে, ওমরাও আদায় করিলে, জিহাদও করিলে। অর্থাৎ, যত সওয়াব এই সমস্ত আমলের মধ্যে রহিয়াছে, সেই পরিমাণ সওয়াব তুমি পাইবে।

হযরত মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির (রহঃ) বলেন, আমার ভাই ওমর তো সারারাত্র নামায পড়িয়া কাটাইয়া দিত আর আমি মায়ের পা টিপিয়া রাত্র কাটাইতাম। আমি কখনও এমন আকাঙ্ক্ষা করি নাই যে, আমার রাত্রের পরিবর্তে আমি তাহার রাত্রের সওয়াব পাইয়া যাই।

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, আমি হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মহিলার উপর সবচেয়ে বেশী হক কাহার? হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, স্বামীর। আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, পুরুষের উপর সবচেয়ে বেশী হক কাহার? হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, মায়ের।

এক হাদীসে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ রহিয়াছে, তোমরা অন্যদের স্ত্রীদের ব্যাপারে পবিত্র থাক; তোমাদের স্ত্রীরাও পবিত্র থাকিবে। তোমরা তোমাদের পিতামাতার সহিত ভাল ব্যবহার কর; তোমাদের সন্তানরা তোমাদের সহিত ভাল ব্যবহার করিবে।

(দুররে মানসূর)

হযরত তাউস (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তির চার পুত্র ছিল। লোকটি অসুস্থ হইল। পুত্রদের মধ্য হইতে একজন বাকী তিন ভাইকে বলিল, তোমরা যদি এই শর্তে পিতার দেখাশুনা কর যে, পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হইতে কিছু পাইবে না, তবে তোমরা কর। নতুবা আমি এই শর্তে দেখাশুনা করিব যে, তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হইতে কিছুই লইব না। তাহারা ইহাতে সম্মত হইল যে, তুমিই উক্ত শর্তে দেখাশুনা কর, আমরা করিব না। সে খুব খেদমত করিল, অবশেষে পিতার ইন্তেকাল হইয়া গেল। শর্ত অনুযায়ী সে কিছুই লইল না। রাতে স্বপ্নে দেখিল, অনেক ব্যক্তি বলিতেছে, অমুক জায়গায় একশত স্বর্ণমুদ্রা পুতিয়া রাখা আছে, তুমি উহা লইয়া লও। সে স্বপ্নের মধ্যেই জিজ্ঞাসা করিল, উহাতে কি বরকত হইবে? সে বলিল, উহাতে বরকত নাই। সকালে স্ত্রীর নিকট স্বপ্নের

বিবরণ শুনাইল। সে উহা বাহির করিয়া লওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করিল, কিন্তু সে মানিল না। দ্বিতীয় দিন আবার স্বপ্ন দেখিল। ইহাতে অন্যত্র দশটি স্বর্ণমুদ্রার কথা বলা হইল। সে পুনরায় বরকতের প্রশ্ন করিল। লোকটি বলিল, উহাতে বরকত নাই। সকালে সে স্ত্রীর নিকট এই স্বপ্নের কথাও বলিল। স্ত্রী পুনরায় পীড়াপীড়ি করিল, কিন্তু সে মানিল না। তৃতীয় দিন সে আবার স্বপ্ন দেখিল। কোন ব্যক্তি বলিতেছে, অমুক জায়গায় যাও, সেখানে তুমি একটি স্বর্ণমুদ্রা পাইবে, উহা লইয়া লও। সে আবার একই বরকতের প্রশ্ন করিল। লোকটি বলিল, হাঁ, উহাতে বরকত রহিয়াছে। সে যাইয়া ঐ স্বর্ণমুদ্রাটি লইয়া আসিল এবং বাজার হইতে উহার বিনিময়ে দুইটি মাছ খরিদ করিল। প্রত্যেকটি মাছের ভিতর হইতে একটি করিয়া এমন ধরনের মুক্তা বাহির হইল, যাহা জীবনে কেহ দেখে নাই। তখনকার বাদশাহ অনেক পীড়াপীড়ি করিয়া নব্বইটি খচ্চর বোঝাই স্বর্ণের বিনিময়ে মুক্তা দুইটি খরিদ করিল।

হাদীসসমূহ

① عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ مَخَافَتِي قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أَبُوكَ وَفِي مَعَايَةِ قَالَ أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أَبَاكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ فَلَمَّا نَالَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ كَذَا فِي الْمَشْكُوتِ)

حُضُورِ اللَّهِ كَسَّ قُلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 کسی نے دریافت کیا کہ میرے بہترین
 تعلقات (احسان و سلوک) کا سب سے
 زیادہ مستحق کون ہے۔ حضور نے ارشاد
 فرمایا۔ ماں، پھر دو بارہ سے بارہ ماں کو
 ہی بتایا۔ پھر فرمایا کہ باپ۔ پھر
 رشتہ دار اگر قریب قریب (مستحق) ہو، (اتنا ہی مستحق ہے)۔

① এক ব্যক্তি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল, আমার উত্তম ও সদ্যবহার পাওয়ার সর্বাপেক্ষা বেশী উপযুক্ত কে? হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, মা। অতঃপর দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার মায়ের কথাই বলিলেন। তারপর বলিলেন, পিতা। অতঃপর পর্যায়ক্রমে অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন (যে যত নিকটবর্তী সে তত অগ্রগণ্য হইবে)। (মিশকাত : বুখারী, মুসলিম)

ফায়দা : উক্ত হাদীস হইতে কোন কোন আলেম এই মাসআলা বাহির করিয়াছেন যে, উত্তম ব্যবহার ও অনুগ্রহের ব্যাপারে মায়ের হক তিন অংশ আর পিতার হক এক অংশ। কেননা, ছযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার মায়ের কথা বলিয়া চতুর্থবার পিতার কথা বলিয়াছেন। ইহার কারণ উলামায়ে কেরাম বলেন যে, সন্তানের জন্য মা তিনটি কষ্ট সহ্য করেন— গর্ভধারণ, প্রসব, দুধপান করান। এইজন্য উলামায়ে কেরাম ইহার কারণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অনুগ্রহ ও উত্তম ব্যবহার পাওয়ার ক্ষেত্রে মায়ের হক পিতার উপর অগ্রগণ্য। যদি কোন ব্যক্তি দরিদ্রতার কারণে পিতামাতা উভয়ের সহিত সং ব্যবহার ও অনুগ্রহ করিতে না পারে, তবে মায়ের সহিত সদ্যবহার করা জরুরী। অবশ্য, সম্মান ও আদব-তাজিজের ক্ষেত্রে পিতার হক মায়ের উপর অগ্রগণ্য।

(মাজাহেরে হক)

ইহাও স্পষ্ট যে, নারী হওয়ার কারণে মা অনুগ্রহের বেশী মুখাপেক্ষী। পিতামাতার পর অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের হক—যে যত নিকট আত্মীয় হইবে, তাহার হক তত অগ্রগণ্য হইবে।

এক হাদীসে আছে, সর্বপ্রথম সদ্যবহার তোমার মায়ের সহিত শুরু কর। অতঃপর পিতার সহিত, অতঃপর বোনের সহিত, অতঃপর ভাইয়ের সহিত। এইভাবে পর্যায়ক্রমে নিকটবর্তীদের সহিত আর তোমার প্রতিবেশী ও অভাবী লোকদেরকে ভুলিও না। (কানয)

হযরত বাহ্য ইবনে হাকীম (রহঃ) তাহার দাদা হইতে বর্ণনা করেন, তিনি ছযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিলেন, ছযুর! আমি ভাল ব্যবহার ও অনুগ্রহ কাহার সহিত করিব? ছযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার মায়ের সহিত। তিনি পুনরায় একই প্রশ্ন করিলেন। ছযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় একই জবাব দিলেন। এইভাবে তৃতীয়বারও বলিলেন। চতুর্থবার ছযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, পিতার সহিত। অতঃপর অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন; যে যত নিকটতম সে তত অগ্রগণ্য।

অন্য এক হাদীসে আছে, এক ব্যক্তি ছযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিল, আমাকে কোন আদেশ করুন, আমি উহার উপর আমল করিব। ছযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার মায়ের সহিত উত্তম ব্যবহার কর। দ্বিতীয় ও তৃতীয়বারের পর ছযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, পিতার সহিত উত্তম ব্যবহার কর। (দুররে মানসুর)

এক হাদীসে আছে, তিনটি বিষয় যাহার মধ্যে পাওয়া যাইবে—আল্লাহ তায়ালা মৃত্যুর সময় তাহার জন্য সহজ করিয়া দিবেন এবং তাহাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাইবেন—দুর্বলের প্রতি দয়া, পিতামাতার প্রতি মমতা এবং অধীনস্থদের প্রতি অনুগ্রহ। (মিশকাত)

۲) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبَسِّطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (مُتَّفَقٌ)

২ জ্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি চায় যে, তাহার রিযিক প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হউক এবং তাহার পদচিহ্নসমূহে বিলম্ব করা হউক, সে যেন আত্মীয়-স্বজনের সহিত সংব্যবহার করে। (মিশকাত : বুখারী, মুসলিম)

ফায়দা : পদচিহ্নসমূহে বিলম্ব করা দ্বারা আয়ু বৃদ্ধি বুঝানো হইয়া থাকে। কেননা, যেই ব্যক্তির আয়ু যত বেশী হইবে ; ততদিন তাহার চলার কারণে পায়ের চিহ্নসমূহ জমিনের উপর পড়িবে, আর যে মরিয়া গেল তাহার পায়ের চিহ্ন জমিন হইতে মিটিয়া গেল। এখানে এই প্রশ্ন করা হয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তির আয়ু নির্দিষ্ট রহিয়াছে, কুরআন পাকে কয়েক জায়গায় এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তির একটি নির্ধারিত সময় রহিয়াছে। উহা হইতে এক মুহূর্ত না আগে হইবে, না পরে হইবে। এইজন্য কোন কোন আলেম আয়ু বৃদ্ধি কথাটির অর্থ দ্বিখিক বৃদ্ধির মত বরকত অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ, তাহার সময়ের মধ্যে এত বরকত হয় যে, অন্যরা যে কাজ কয়েক দিনে করে, সে উহা কয়েক ঘণ্টায় করিয়া ফেলে। আর অন্যরা যে কাজ কয়েক মাসে করে, সে উহা কয়েক দিনে করে। আবার কোন কোন আলেম আয়ু বৃদ্ধির দ্বারা সেই ব্যক্তির উত্তম আলোচনার অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ, দীর্ঘ দিন পর্যন্ত তাহার কৃতিত্বের নিদর্শনসমূহ ও প্রশংসা চলিতে থাকে। কোন কোন আলেম লিখিয়াছেন, তাহার সম্মান-সম্মতি বৃদ্ধি পায় এবং এই দ্বারা তাহার মৃত্যুর পরও দীর্ঘদিন পর্যন্ত চলিতে থাকে। আয়ু বৃদ্ধির অর্থে এই সবগুলি ব্যাখ্যাই হইতে পারে। যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম আয়ু বৃদ্ধির সংবাদ দিয়াছেন, আর তাহার কথা সত্য এবং তাহার এরশাদ অবশ্যই হক, অতএব উহা যে ভাবেই হউক, বাস্তবে পরিণত হওয়া নিশ্চিত। আর আল্লাহ তায়ালার পবিত্র সত্তা একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী এবং সমস্ত উপকরণের সৃষ্টিকর্তা, তাহার জন্য উপকরণ সৃষ্টি করা কোন মুশকিল নয়। তিনি যাহা করিতে চাহেন, উহার জন্য এমন উপকরণ পয়দা করিয়া দেন যে, জ্ঞানী লোকদের জ্ঞান পর্যন্ত হতভম্ব হইয়া যায়। কাজেই এই ব্যাপারে না কোন প্রশ্ন থাকিতে পারে এবং না কোন প্রতিবন্ধকতা থাকিতে পারে। (মাজাহের; কিষ্কিৎ পরিবর্তিত)

ভকদীরের বিষয় আপন জায়গায় অটল রহিয়াছে; কিন্তু এই দুনিয়াকে আল্লাহ তায়ালার আসবাব বা উপকরণের জগত বানাইয়াছেন এবং প্রত্যেক জিনিসের জন্য জাহেরী অথবা বাতেনী উপকরণ পয়দা করিয়াছেন। ডায়রিয়া রুগীর জন্য মানুষ চিকিৎসক ও ডাক্তারের পিছনে মিনিটে মিনিটে ছোটাদুটি করে। এই আশায় যে, হয়ত এই ঔষধ দ্বারা উপকার হইবে অথবা ঐ ঔষধ দ্বারা উপকার হইবে। কারণ কি? কারণ, ইহাই যে, রুগীর আয়ু বাকী থাকে। অথচ আয়ু একটি নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট জিনিস। সুতরাং আয়ু বাকী রাখার জন্য চিকিৎসার চেষ্টা হইতে অধিক চেষ্টা আত্মীয়-স্বজনের সহিত সম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারে না করার কোন কারণ থাকিতে পারে না। কেননা, ইহা আয়ু বৃদ্ধি ও দীর্ঘায়ুর নিশ্চিত উপকরণ এবং এমন চিকিৎসকের কথা, যাহার ব্যবস্থাপত্রে কখনও ভুল হয় নাই; অথচ এই সমস্ত সাধারণ হাকীম ডাক্তারদের ব্যবস্থাপত্র ও রোগ নির্ণয়ের মধ্যে শত শত ভুলের সম্ভাবনা রহিয়াছে।

উপরে বর্ণিত হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদ বিভিন্ন হাদীসে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং ইহাতে কোনরূপ দ্বিধা বা সন্দেহ নাই।

এক হাদীসে হযরত আলী (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে, যে ব্যক্তি একটি বিষয়ের দায়িত্ব লইবে, আমি তাহার জন্য চারটি বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করিব। যে ব্যক্তি আত্মীয়-স্বজনের সহিত সং ব্যবহার করে, তাহার আয়ু দীর্ঘ হয়, আত্মীয়-স্বজন তাহাকে মহব্বত করে, তাহার রিযিক প্রশস্ত হয় এবং সে জামাতে দাখেল হয়। (কানয)

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)কে বলিলেন, তিনটি বিষয় সম্পূর্ণ সত্য (এবং নিশ্চিত)—১. যাহার উপর জুলুম করা হয় আর সে ক্ষমা করে, তাহার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়; ২. যে ব্যক্তি সম্পদ বৃদ্ধি করার জন্য সওয়াবল করে তাহার সম্পদ কমিয়া

যায় ; ৩. যে ব্যক্তি দান-খয়রাত ও আত্মীয়-স্বজনের সহিত সং-
ব্যবহারের দরজা খুলিয়া দেয়, তাহার সম্পদ বৃদ্ধি পায়। (দুররে মানসুর)

ফকীহ আবুল লায়স (রহঃ) বলেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার
মধ্যে দশটি জিনিস প্রশংসনীয়। প্রথম, ইহাতে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি ও
রেজামন্দী রহিয়াছে। কেননা, আল্লাহ পাক আত্মীয়-স্বজনের সহিত সং-
ব্যবহারের হুকুম করিয়াছেন। দ্বিতীয়, আত্মীয়-স্বজন আনন্দিত হয়। তৃতীয়
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র এরশাদ রহিয়াছে, সর্বোত্তম
আমল হইল, মুমিনকে খুশী করা। তৃতীয়, ইহাতে ফেরেশতারাও অত্যন্ত
আনন্দিত হয়। চতুর্থ, মুসলমানদের পক্ষ হইতে তাহার প্রশংসা করা হয়।
পঞ্চম, ইহাতে অভিশপ্ত শয়তানের বড় কষ্ট হয়। ষষ্ঠ, ইহার কারণে আয়
বৃদ্ধি পায়। সপ্তম, রিযিকে বরকত হয়। অষ্টম, মৃত ব্যক্তির ইহাতে
আনন্দিত হয়। যাহাদের বাপদাদা ইন্তেকাল করিয়াছেন, তাহারা ইহার
সংবাদ পাইয়া আনন্দিত হয়। নবম, পারস্পরিক সম্পর্ক শক্তিশালী হয়।
যখন তুমি কাহাকেও সাহায্য করিবে, কাহারও প্রতি অনুগ্রহ করিবে,
তোমার প্রয়োজন ও কষ্টের সময় সে আন্তরিকভাবে তোমাকে সাহায্য
করিতে চাহিবে। দশম, মৃত্যুর পরেও তুমি ইহার সওয়াব পাইতে থাকিবে।
কেননা, তুমি যাহাকে সাহায্য করিবে, তোমার মৃত্যুর পর সর্বদা সে
তোমাকে স্মরণ করিয়া নেক দোয়া করিতে থাকিবে।

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, তিন প্রকারের লোক কেয়ামতের দিন
রহমানের আরশের ছায়াতে থাকিবে। এক, আত্মীয়-স্বজনের সহিত সং-
ব্যবহারকারী। দুনিয়াতেও তাহার আয় বৃদ্ধি করা হয়, রিযিকের প্রশস্ততা
দান করা হয় এবং তাহার কবরকেও প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হয়। দ্বিতীয়, ঐ
মহিলা, যাহার স্বামী মারা গিয়াছে, অতঃপর সে ছোট ছোট সন্তানের
লালন-পালনের খাতিরে তাহাদের জওয়ান হওয়া পর্যন্ত বিবাহ বন্ধনে
আবদ্ধ হয় না। বাহাতে তাহাদের লালন-পালনে অসুবিধা সৃষ্টি না হয়।
তৃতীয়, ঐ ব্যক্তি, যে খানা প্রস্তুত করিয়া এতীম-মিসকীনদেরকে দাওয়াত
দেয়।

হযরত হাসান (রাযিঃ) হযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে
বর্ণনা করেন যে, দুইটি কদম আল্লাহ তায়ালার নিকট অতি প্রিয়। এক, ঐ
কদম যাহা ফরজ নামায আদায় করার জন্য উঠে। দ্বিতীয়, ঐ কদম যাহা
কোন মাহরাম (নিকট) আত্মীয়ের সাক্ষাতের জন্য উঠে।

কোন কোন আলেম লিখিয়াছেন, পাঁচটি জিনিস এমন রহিয়াছে,
যাহার উপর সর্বদা দৃঢ়ভাবে আমল করিলে আল্লাহ তায়ালার নিকট হইতে

উচু উচু পাহাড়সম নেক লাভ হয় এবং উহার কারণে রিষিকের মধ্যেও প্রশস্ততা হয়। এক, কম হউক বা বেশী ; সবসময় দান-খয়রাত ও সদকা করিতে থাকা। দ্বিতীয়, কম হউক বা বেশী ; সবসময় আত্মীয়-স্বজনের সহিত সৎ ব্যবহার করা। তৃতীয়, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। চতুর্থ, সবসময় ওয়ূর সহিত থাকা। পঞ্চম, সবসময় পিতামাতার অনুগত হইয়া থাকা। (তান্বীয়েল গাফেলীন)

এক হাদীসে আসিয়াছে, যেই আমলের সওয়াব ও বিনিময় সবচাইতে
 ভাড়াভাড়ি পাওয়া যায়, উহা হইল আত্মীয়-স্বজনের সহিত সং ব্যবহার।
 কোন কোন মানুষ গোনাহগার হওয়া সত্ত্বেও আত্মীয়-স্বজনের সহিত সং
 ব্যবহারের কারণে তাহাদের সম্পদেও বরকত হয় এবং তাহাদের
 আওলাদেও বরকত হয়। (এহইয়া)

এক হাদীসে আছে, নিয়ম অনুযায়ী সদকা করা, ন্যায়পথ অবলম্বন করা, পিতামাতার প্রতি অনুগ্রহ করা এবং আত্মীয়-স্বজনের সহিত সৎ ব্যবহার করা মানুষকে দুর্ভাগ্য হইতে সৌভাগ্যের দিকে ফিরাইয়া দেয়, আয়ু বৃদ্ধির কারণ হয় এবং অপমৃত্যু হইতে হেফাজত হয়। (কানয)

আয়ু ও রিথিক বৃদ্ধি সম্পর্কে যেকোন অধিক পরিমাণে রেওয়ান্নাত উল্লেখ করা হইল, ইহা দ্বারা নমুনা জানা হইয়া গেল। এই দুইটি বিষয় এমন যাহার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তি যেন মরিয়া হইয়া লাগে, কেননা, দুনিয়ার সমস্ত চেষ্টা-মেহনত এই দুইটি জিনিসের জন্যই। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুইটি জিনিস হাসিলের অত্যন্ত সহজ পন্থা বলিয়া দিয়াছেন যে, আত্মীয়-স্বজনের সহিত সৎ ব্যবহার করার দ্বারা উভয় আকাঙ্ক্ষা পূরণ হইবে।

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার উপর যদি একীভূত থাকে, তবে আয়ু ও রিযিক বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষাকারীদের এই ব্যবস্থাপত্রের উপর বেশী হইতে বেশী আমল করা উচিত। আর যথাসম্ভব আত্মীয়-স্বজনের উপর খরচ করা উচিত। ইহাতে রিযিক বৃদ্ধির ওয়াদার কারণে খরচের বিনিময়ও পাওয়া যাইবে আর আয়ু বৃদ্ধির বিষয়টি অতিরিক্ত পাওয়া গেল।

۳) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ مِنْ أَبْرَارِ الْيَوْمِ جَمَلَةُ الرَّجُلِ

أَهْلَ وَدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُؤْتَى
 كَسَاةَ ثَعْلَبَاتٍ كَسَدَ الْوَلَدِ كَسَاةَ
 (سواء مسلم كذا في المشكاة) غرس سوك كسـ

③ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, পিতার সহিত সৎ ব্যবহারের সর্বোচ্চ পর্যায় হইল, তাহার চলিয়া যাওয়ার পর তাহার বন্ধু-বান্ধবদের সহিত সৎ ব্যবহার করিবে। (মিশকাত : মুসলিম)

ফাযলদা : চলিয়া যাওয়া দ্বারা সাময়িক চলিয়া যাওয়াও হইতে পারে, আবার চিরন্তনে চলিয়া যাওয়া অর্থাৎ মৃত্যুবরণ করাও হইতে পারে। আর ইহা উচ্চ পর্যায় এইজন্য যে, পিতার জীবদ্দশায় তাহার বন্ধুদের সহিত সৎ ব্যবহারের পিছনে নিজস্ব স্বার্থের সম্ভাবনাও থাকে যে, তাহাদের সহিত দৃঢ় সম্পর্ক ও ভাল ব্যবহার বজায় রাখার দ্বারা ঐ সকল ব্যক্তিগত স্বার্থ হাশিলের ব্যাপারে সাহায্য পাওয়া যাইবে যাহা পিতার সহিত সম্পর্কযুক্ত রহিয়াছে। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর তাহাদের সহিত ভাল ব্যবহার ও অনুগ্রহ করা নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধ্বে হয়। ইহাতে শুধু পিতার সম্মান করাই খাঁটিভাবে থাকিয়া যায়।

এক হাদীসে আছে, ইবনে দীনার (রহঃ) বলেন, হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) মক্কার পথ দিয়া কোথাও যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে একজন বেদুঈনকে দেখিয়া হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) তাহাকে নিজের সওয়ারী দিয়া দিলেন এবং নিজের মাথা হইতে পাগড়ী খুলিয়া দান করিলেন। ইবনে দীনার (রহঃ) আরজ করিলেন, জনাব ! এই লোকটি তো ইহা হইতে কম দান করিলেও সন্তুষ্ট হইত (অথচ আপনি পাগড়ীও দিয়া দিলেন এবং সওয়ারীও দিয়া দিলেন)। হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, তাহার পিতা আমার পিতার বন্ধু ছিলেন। আর আমি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনিয়াছি যে, মানুষের সর্বোত্তম সৎ ব্যবহার হইল, তাহার পিতার বন্ধুদের প্রতি অনুগ্রহ করা।

হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন, আমি মদীনা শরীফে হাজির হইলে হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) আমার সহিত সাক্ষাত করিতে আসিলেন এবং বলিলেন, তোমার জানা আছে কি, আমি কেন আসিয়াছি? আমি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি তাহার পিতার সহিত তাহার কবরে সৎ ব্যবহার করিতে চায়, সে যেন পিতার বন্ধুদের সহিত সৎ ব্যবহার করে। আর আমার পিতা ওমর (রাযিঃ) ও তোমার পিতার মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল, আমি এইজন্য আসিয়াছি। কারণ, বন্ধুর সম্মানও বন্ধু হইয়া থাকে। (তারগীব)

অন্য এক হাদীসে আছে, হযরত আবু উসাইদ মালেক ইবনে রবীআ (রাযিঃ) বলেন, আমরা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। বনু সালিমা গোত্রের এক ব্যক্তি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিল, ইয়া রাসূলল্লাহ! আমার পিতামাতার ইন্তেকালের পর তাহাদের সহিত সৎ ব্যবহারের কোন পন্থা আছে কি? হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ, হাঁ তাহাদের জন্য দোয়া কর। তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। কাহারও সহিত তাহারা ওয়াদা করিয়া থাকিলে উহা পূরণ কর। তাহাদের আত্মীয়-স্বজনের সহিত সৎ ব্যবহার কর। তাহাদের বন্ধুদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর। (মিশকাত : আবু দাউদ)

অন্য এক হাদীসে এই ঘটনার পর ইহাও রহিয়াছে যে, ঐ ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রাসূলল্লাহ! ইহা কত উত্তম ও উন্নত ব্যবস্থা! হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কাজেই তুমি ইহার উপর আমল কর। (তরগীব)

② عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَمُوتُ وَالِدَاهُ أَوْ لَحَدَاهُ وَأَنَّهُ لَهُمَا لَعَنَاقٌ فَلَا يَزَالُ يَدْعُو لِحَمَاهُمَا وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمَا حَتَّى يَتَّبِعَهُ اللَّهُ بَأْسًا (رواه البيهقي في الشعب كذا في المشكوة)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر شخص کے ماں باپ فوٹوں یا لہجوں میں سے کوئی ایک مر جائے اور وہ شخص ان کی نافرمانی کرے فاللہ! تو اگر وہ ان کے لئے ہمیشہ دعا کرتے نہیں کرتا رہے اس کے بعد وہ ان کے لئے اور دعائیں کرتا رہے تو وہ شخص قرابہ بڑا ہے میں شمار ہو جائے گا۔

⑧ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তির পিতামাতা উভয়ে অথবা তাহাদের মধ্যে কোন একজন মৃত্যুবরণ করে এবং সে তাহাদের নافرমানী করিয়া থাকে, তবে সে যদি তাহাদের জন্য সবসময় গোনাহমাকীর দোয়া করিতে থাকে এবং ইহা ছাড়া আরও অন্যান্য দোয়াও করিতে থাকে, তবে সে বাধ্য সন্তানদের মধ্যে शामिल হইয়া যাইবে। (মিশকাত : বায়হাকী শু'আব)

ফায়দা : ইহা আল্লাহ তায়ালা কত বড় দান, অনুগ্রহ ও মেহেরবানী যে, পিতামাতার জীবদ্দশায় অনেক সময় অপছন্দনীয় বিষয়ের সম্মুখীন

হওয়ার কারণে মনোমালিন্যতা সৃষ্টি হয়, কিন্তু যতই কষ্ট হউক না কেন, পিতামাতা এমন জিনিস নহে যে, তাহাদের মৃত্যুর পরেও অন্তরে দুঃখ-কষ্ট বাকী থাকিতে পারে এবং তাহাদের স্নেহ ও অনুগ্রহের কথা স্মরণ হওয়ার পর মানুষ ব্যাকুল না হইয়া যায়। কিন্তু এখন তাহারা মরিয়া গিয়াছেন, কতিপূরণ কিভাবে হইতে পারে। আল্লাহ তায়ালা আপন মেহেরবানীতে ইহার দরজাও খুলিয়া দিয়াছেন যে, তাহাদের মৃত্যুর পর তাহাদের জন্য দোয়া করিবে। আল্লাহ তায়ালা নিকট তাহাদের গোনাহের জন্য ক্ষমা চাহিতে থাকিবে। তাহাদের জন্য আমল ও মাল বরজের মাধ্যমে ঈসালে সওয়াব করিতে থাকিবে। ইহা দ্বারা তাহাদের জীবদ্দশায় তাহাদের যে সমস্ত হক নষ্ট হইয়াছে, উহার কতিপূরণ হইয়া যাইবে। অবাধ্য সন্তানের স্থলে বাধ্যগত সন্তানদের মধ্যে शामिल হইয়া যাইবে। ইহা আল্লাহ তায়ালা কত বড় দয়া ও অনুগ্রহ যে, সময় হাতছাড়া হইয়া যাওয়ার পরও উহার রাস্তা খুলিয়া দিয়াছেন, যদি এই সুযোগও নষ্ট করা হয়, তবে ইহা কত বড় নির্লজ্জতা ও পাষণ্ড হৃদয়ের পরিচায়ক হইবে। এমন কে আছে, যাহার দ্বারা সর্বদা পিতামাতার সন্তুষ্টির কাজই হইতে থাকে। হক আদায়ের ব্যাপারে কিছু না কিছু ক্রটি-বিচ্যুতি তো হইয়াই যাবে, যদি নিজের কোন আমল এবং কোন নিয়ম এইরূপ নির্ধারিত করিয়া লওয়া হয়, যদ্বারা তাহাদের জন্য সওয়াব পৌছিতে থাকে, তবে ইহা দ্বারা কত উচ্চ মর্যাদার বিষয় হাসিল হইতে পারে।

এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি তাহার পিতামাতার পক্ষ হইতে হজ্জ করে, ইহা তাহাদের জন্য বদলী হজ্জ হইতে পারে। তাহাদের রূহকে আসমানে ইহার সুসংবাদ শুনাইয়া দেওয়া হয়। আর এই ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা নিকট নেক সন্তানদের মধ্যে গণ্য হয়। যদিও সে পূর্বে অবাধ্য সন্তানদের মধ্যে ছিল।

অন্য এক রেওয়াজাতে আছে, যদি কোন ব্যক্তি তাহার পিতামাতার মধ্যে কাহারও হজ্জ করে, তবে তাহার জন্য এক হজ্জের সওয়াব হয়। আর হজ্জকারীর জন্য নয় হজ্জের সওয়াব হয়। (বাহমাতুল মুহাদ্দত)

আল্লামা আইনী (রহঃ) বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা কিতাবে একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন যে, যেই ব্যক্তি একবার এই দোয়া পড়িবে—

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ السَّمَوَاتِ رَبِّ الْأَرْضِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْحُكْمُ يَوْمَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ
الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ۝ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ

رَبِّ الْعَالَمِينَ ط وَلَهُ الْعِظَمَةُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ط هُوَ الْمَلِكُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ
وَرَبُّ الْعَالَمِينَ ط وَلَهُ النُّشُورُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ط

অতঃপর এই দোয়া করিবে যে, হে আল্লাহ! ইহার সওয়াব আমার পিতামাতার নিকট পৌছাইয়া দিল, সে পিতামাতার হক আদায় করিয়া দিল।

অন্য এক হাদীসে আছে, যদি কাহারো পিতামাতা মুসলমান হয় আর সে নফল সদকা করিয়া তাহার পিতামাতার জন্য উহার সওয়াব বখশাইয়া দেয়, তবে কি ক্ষতি? ইহাতে তাহাদের নিকট সওয়াব পৌছিয়া যাইবে, আর সদকাকারীর সওয়াবের মধ্যে কোনরূপ কম হইবে না। (কানয)

এই হাদীস অনুযায়ী কিছু করারও প্রয়োজন হয় না। সময় সুযোগে যখন যাহা খরচ করা হয়, উহার সওয়াব নিজের পিতামাতাকে পৌছাইয়া দিবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাযিঃ) বলেন, ঐ পবিত্র সন্তার কসম! যিনি হযুর সালামুল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্যকথা দিয়া পাঠাইয়াছেন! আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কলামে আছে, যে ব্যক্তি তোমার পিতার সহিত সং ব্যবহার করে, তুমি তাহার সহিত আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করিও না, ইহাতে তোমার নূর চলিয়া যাইবে।

এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি প্রতি জুমার দিন তাহার পিতামাতা অথবা তাহাদের মধ্যে হইতে কোন একজনের কবর ভিজারত করে, তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে এবং সে বাধ্যগত সন্তানদের মধ্যে গণ্য হইবে।

আওয়াযী (রহঃ) বলেন, আমার নিকট এই কথা পৌছিয়াছে যে, যদি কোন ব্যক্তি তাহার পিতামাতার জীবদ্দশায় অবাধ্য থাকে, আর তাহাদের ইস্তেকালের পর তাহাদের জন্য এস্তেগফার করে, তাহাদের জিম্মায় ঋণ থাকিলে পরিশোধ করে এবং তাহাদের কোন দোষচর্চা না করে, তবে সে নেক সন্তানদের মধ্যে গণ্য হইয়া যায়। আর যে ব্যক্তি পিতামাতার জীবদ্দশায় নেক সন্তান ছিল; কিন্তু মৃত্যুর পর তাহাদের দোষচর্চা করে, তাহাদের ঋণও পরিশোধ করে না, তাহাদের জন্য এস্তেগফারও করে না, সে অবাধ্য সন্তানদের মধ্যে গণ্য হইয়া যায়। (দুররে মানসূর)

مُحَمَّدٌ رَأْسُ الدِّينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ
 رَتْبَهُ رَأْسُ الدِّينِ وَأَمَّا كَيْفَ مِنْ تَبِيعِي بَيْتِي مَدِينَةٍ
 بِنْتَانَا بُول - تَبِيعِي وَهَذَا كَيْ (اس کا عمل)
 ہے جو لوٹ کر تیرے ہی پاس آگئی جو اود
 اس کے لئے تیرے سوا کوئی مکمل نہ والا
 وہ ہو (کہ ایسی لڑکی پر جو بھی حقوق کی بنا گیا
 وہ بہترین صدمہ ہے)

⑤ عَنْ سُرَاقَةَ بِنِ مَالِكٍ
 أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ قَالَ إِلَّا أَدُلَّكُمْ عَلَى
 أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ ابْنَتُكَ
 مُرْدُودَةٌ إِلَيْكَ لَيْسَ لَهَا
 كَأْسِبٌ غَيْرُكَ - (رواه ابن
 ماجة كذا في المشكوة)

⑤ ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার এরশাদ করিয়াছেন, আমি তোমাদেরকে সর্বোত্তম সদকা বলিয়া দিতেছি। তোমার ঐ কন্যা, যে তোমার কাছেই ফেরত আসিয়াছে এবং তাহার জন্য তুমি ছাড়া কেহ উপার্জনকারী নাই (এইরূপ কন্যার উপর যাহা কিছুই খরচ করা হইবে, উহা সর্বোত্তম সদকা)। (মিশকাত : ইবনে মাজা)

ফায়দা : ফেরত আসিবার অর্থ এই যে, কন্যাকে বিবাহ দেওয়া হইয়াছিল ; তাহার স্বামী মারা গিয়াছে অথবা স্বামী তালাক দিয়াছে অথবা অন্য কোন অসুবিধা দেখা দিয়াছে, যেই কারণে কন্যা পুনরায় পিতার দায়িত্বে আসিয়া গিয়াছে। এমতাবস্থায় তাহার বোঁজ-খবর লওয়া, তাহার জন্য খরচ করা সর্বোত্তম সদকা। সর্বোত্তম সদকা হওয়া একেবারেই স্পষ্ট বিষয়, কারণ উহাতে প্রথমতঃ সদকা হইল, দ্বিতীয়তঃ বিপদগ্রস্তের সাহায্য হইল, তৃতীয়তঃ আত্মীয়ের সহিত সং ব্যবহার হইল, চতুর্থতঃ সন্তানের বোঁজ-খবর লওয়া হইল, পঞ্চম, দুশ্চিন্তাগ্রস্তের প্রতি সহানুভূতি হইল, কেননা, সন্তান-সন্ততি শুরুতে পিতামাতার দায়িত্বে থাকা কষ্টের পরিবর্তে আনন্দের বিষয় হয়, কিন্তু তাহার নিজের সংসার হইয়া যাওয়ার পর এবং নিজের ঠিকানা নির্দিষ্ট হইয়া যাওয়ার পর পুনরায় পিতামাতার দায়িত্বে আসিয়া যাওয়া অধিকতর কষ্টের কারণ হয়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করে, তাহার জন্য গোনাহমাকীর তিহাজুরটি স্তর লেখা হয়। তন্মধ্যে একটি দ্বারা তাহার যাবতীয় বিষয়ের সংশোধন করিয়া দেওয়া হয়। আর বাহাজুরটি স্তর তাহার জন্য কিয়ামতের দিন উন্নতির কারণ হয়। এই বিষয় সম্পর্কিত অনেকগুলি রেওয়াজাত প্রথম পরিচ্ছেদের ছাব্বিশ নম্বর হাদীসের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা

হইয়াছে।

উম্মুল মুমেনীন হযরত উম্মে সালামা (রাযিঃ) হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার পূর্বের স্বামী আবু সালামা (রাযিঃ) এর যে সকল সন্তান আমার নিকট রহিয়াছে, তাহাদের জন্য খরচ করিলেও কি আমি সওয়াব পাইব? তাহারা তো আমারই সন্তান। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহাদের জন্য খরচ কর, ইহার সওয়াব তুমি পাইবে। (মিশকাত)

আর সন্তানের প্রতি ভালবাসা ও স্নেহ-মমতা তো এমন জিনিস যে, তাহারা অভাবগ্রস্ত না হইলেও শরীয়তের দৃষ্টিতে স্বতন্ত্র একটি পছন্দনীয় আমল।

একবার হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাহার উভয় দৌহিত্র হাসান ও হসাইন (রাযিঃ) এর মধ্য হইতে একজন উপস্থিত ছিলেন। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে আদর করিলেন। ভাষীম গোত্রের সর্দার আকরা ইবনে হাবেসও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, আমার দশটি পুত্রসন্তান রহিয়াছে। আমি তাহাদের কাহাকেও কখনও আদর করি নাই। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিয়া বলিলেন, যে দয়া করে না, তাহার প্রতিও দয়া করা হয় না।

অন্য এক হাদীসে আছে, জনৈক বেদুঈন ব্যক্তি আরজ করিল, তোমরা সন্তানদেরকে আদর কর, আমরা তো করি না। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি ইহার কি চিকিৎসা করিব? আল্লাহ তায়ালাই তোমার অন্তর হইতে রহমতের মূল বাহির করিয়া দিয়াছেন। (তরগীব)

সন্তান হওয়া ছাড়াও বিপদগ্রস্ত হওয়া সওয়াবের জন্য একটি স্বতন্ত্র কারণ।

عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ الْقَدَقَةُ عَلَى الْوَسِيكِي
مَذْكُومَةٌ كَوَيْتٍ عَلَى ذِي الرَّحِمِ
يُنْتَابُ مَذْكُومَةٌ وَوَسْلَةٌ

تُحْضِرُ اللَّهَ سَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَأَنَّ شَاوَجَهُ كَزَيْبٍ بِرَمَدٍ كَرْنَا
مَرَفٌ مَذْكُومَةٌ هِيَ أَوْ رَشْتٌ مَذْكُومَةٌ
مَذْكُومَةٌ كَزَيْبٍ هِيَ أَوْ رَشْتٌ مَذْكُومَةٌ
مَذْكُومَةٌ هِيَ أَوْ رَشْتٌ مَذْكُومَةٌ

(سواء احمد والترمذى وغيرهما هكذا في المشكوة)

⑥ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, গরীবের

উপর সদকা করা শুধুই সদকা হয়, আর আত্মীয়-স্বজনের উপর সদকা করার দ্বারা সদকাও হয় এবং আত্মীয়-স্বজনের সহিত সদ্যবহারও হয়; দুইটি জিনিস হাসিল হয়। (মিশকাত : আহমদ, তিরমিযী)

ফায়দা : যতদূর পৰ্বন্ত আত্মীয়তার সম্পর্ক রহিয়াছে, তাহাদের উপর সদকা করা সাধারণ গরীবদের উপর সদকা করা অপেক্ষা অগ্রগণ্য ও উত্তম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনেক রেওয়ায়াতে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন শিরোনামে এই বিষয়টিও অধিক পরিমাণে বর্ণিত হইয়াছে।

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, একটি স্বর্ণমুদ্রা তুমি আল্লাহর রাস্তায় খরচ কর, একটি স্বর্ণমুদ্রা তুমি গোলাম আজাদ করার ব্যাপারে খরচ কর, একটি স্বর্ণমুদ্রা তুমি কোন ফকীরকে দান কর, একটি স্বর্ণমুদ্রা তুমি নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ কর। ইহার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হইল, যাহা তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করিলে। (তবে শুধু আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য খরচ করিতে হইবে এবং তাহার অভাবীও হইতে হইবে। এই বিষয়ে সামনে আলোচনা আসিতেছে।)

অন্য এক হাদীসে আছে, হযরত মাইমুনা (রাযিঃ) একটি বাদী আযাদ করিলেন। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি যদি বাদীটি তোমার মামাদেরকে দিতে, তবে বেশী সওয়াব হইত।

একবার হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদেরকে বিশেষভাবে সদকা করিবার জন্য উৎসাহ প্রদান করিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বিখ্যাত সাহাবী এবং ফকীহ ছিলেন। তাহার স্ত্রী হযরত যম্নাব (রাযিঃ) তাহাকে বলিলেন, আজ হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সদকা করার হুকুম করিয়াছেন। আপনার আর্থিক অবস্থা দুর্বল, আপনি হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করুন, আমি যদি আপনাকে সদকার মাল দান করি, তবে ইহা যথেষ্ট হইবে কিনা। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলিলেন, তুমি স্বয়ং জিজ্ঞাসা করিয়া লও। (নিজের জন্য জিজ্ঞাসা করিতে সম্ভবতঃ লজ্জাবোধ করিয়াছেন অথবা নিজের স্বার্থের খেয়াল আসিয়া থাকিবে।) হযরত যম্নাব (রাযিঃ) হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন। সেখানে দরজায় দেখিলেন, অপর একজন মহিলাও একই মাসআলা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। কিন্তু হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

উক্ত মর্যাদার ভয়ে জিজ্ঞাসা করার সাহস হইতেছে না, এমন সময় হযরত বেলাল (রাযিঃ) আসিয়া গেলেন। তখন তাহারা উভয়েই হযরত বেলাল (রাযিঃ)এর নিকট দরখাস্ত করিলেন, তিনি যেন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিয়া দেন যে, দুইজন মহিলা দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন এবং তাহারা জানিতে চাহিতেছেন যে, তাহারা যদি তাহাদের স্বামীদের উপর এবং তাহাদের পূর্বের স্বামীর এতীম সন্তানগণ যাহারা তাহাদের নিকট রহিয়াছে তাহাদের উপর সদকা করেন, তবে ইহা যথেষ্ট হইবে কি না। হযরত বেলাল (রাযিঃ) হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পয়গাম পৌছাইলেন। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদের পরিচয় জানিতে চাহিলেন। হযরত বেলাল (রাযিঃ) আরজ করিলেন, একজন অমুক আনসারী মহিলা, আর একজন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ)এর স্ত্রী যয়নাব। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ, তাহাদের জন্য দ্বিগুণ সওয়াব হইবে। সদকার সওয়াবও হইবে, আত্মীয়ের সহিত সং ব্যবহারের সওয়াবও হইবে। (মিশকাত)

হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, আমি আমার কোন ভাইকে একটি দেৱহাম দ্বারা সাহায্য করি, ইহা আমার নিকট অন্যের উপর বিশ দেৱহাম খরচ করা হইতে বেশী পছন্দনীয়। আর আমি তাহার জন্য একশত দেৱহাম খরচ করি, ইহা আমার নিকট একটি গোলাম আবাদ করা হইতে বেশী পছন্দনীয়। (এইইয়া, এতহাক)

এক হাদীসে আছে, যখন মানুষ নিজেই অভাবী হয়, তখন সে নিজের উপর খরচ করার ব্যাপারে অগ্রাধিকার রাখে। যখন নিজের খরচ হইতে অতিরিক্ত হয়, তখন পরিবার-পরিজনের উপর খরচ করা অগ্রাধিকারযোগ্য। ইহার বেশী হইলে খরচের ব্যাপারে অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য হইবে। ইহা হইতেও যদি অতিরিক্ত হয়, তবে এদিক সেদিক অন্যান্যদের উপর খরচ করিবে।

(কানয)

এই বিষয়টি কানযুল উম্মাল প্রভৃতি কিতাবে কয়েকটি রেওয়াজাতে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা বুঝা গেল যে, খরচের ব্যাপারে অন্যদেরকে পিছনে রাখা তখনই হইতে পারে, যখন নিজের এবং নিজের পরিবার-পরিজনের অভাব বেশী হয়। আর যদি অন্যান্যরা নিজের চাইতে বেশী অভাবী হয়, অথবা নিজে অভাব সত্ত্বেও ধৈর্যধারণ করিতে পারে এবং আল্লাহ তায়ালার উপর পূর্ণ ভরসা থাকে, তবে অন্যদেরকে অগ্রাধিকার

দেওয়া সর্বোত্তম। প্রথম পরিচ্ছেদের আটাইশ নম্বর আয়াত **رُؤُوسُهُمْ عَلَى** এর ব্যাখ্যায় এই বিষয়টি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, আমি তোমাদেরকে আমার নিজের এবং (আমার স্ত্রী হযরত) ফাতেমা (রাযিঃ) এর ঘটনা শুনাইব। তিনি হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বাধিক প্রিয় ও আদরের দুলালী ছিলেন। তিনি আমার ঘরে থাকিতেন। নিজ হাতে ঘাঁতা পিষিতেন, ইহাতে তাহার হাতে গিট পড়িয়া গিয়াছিল। নিজে পানি ভরিয়া আনিতেন। ইহাতে মশকের ঘষায় তাহার শরীরে রশির দাগ পড়িয়া গিয়াছিল। নিজ হাতে কাড়ু দেওয়া ইত্যাদি কাজ করিতেন। ফলে, তাহার কাপড়-চোপড় ময়লা থাকিত। নিজ হাতে রান্না করিতেন। ইহাতে ধোয়ার কারণে কাপড় কালো থাকিত। মোটকথা, সব ধরনের কষ্ট করিতেন। একবার হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কিছু দাস-দাসী ও অন্যান্য জিনিস আসিলে আমি বলিলাম, তুমিও যাইয়া একজন খাদেম চাহিয়া লও। ইহাতে তোমার কষ্ট কিছুটা লাঘব হইবে। তিনি হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন। সেখানে কিছু লোকজন ছিল, লজ্জায় কিছু বলিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

এক হাদীসে আছে, হযরত আয়েশা (রাযিঃ) এর নিকট বলিয়া চলিয়া আসিলেন। পরদিন হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তশরীফ আনিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ফাতেমা! তুমি গতকাল কি বলিতে গিয়াছিলে? তিনি লজ্জার কারণে চুপ হইয়া গেলেন। হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, আমি তাহার সমস্ত অবস্থা পানি ইত্যাদি ভরিয়া আনার বিষয় বর্ণনা করিয়া আরম্ভ করিলাম, আমি তাহাকে আপনার নিকট হইতে একজন খাদেম চাহিয়া আনিবার জন্য পাঠাইয়াছিলাম। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি তোমাদেরকে খাদেম, অপেক্ষা উত্তম জিনিস বলিয়া দিব। যখন ঘুমাইবার জন্য শয়ন কর, তখন সুবহানাল্লাহ তেরিশ বার, আলহামদুলিল্লাহ তেরিশবার, আল্লাহু আকবর তেরিশ বার পড়িও, ইহা খাদেম হইতে উত্তম। (আবু দাউদ)

অন্য এক হাদীসে উক্ত ঘটনায় হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদও বর্ণিত হইয়াছে যে, যখন ক্ষুধার তাড়নায় আহলে সুফফার সাহাবীদের পেটের চামড়া পেঁচাইয়া রহিয়াছে। এমনতাবস্থায় আমি তোমাদেরকে কখনও দিতে পারি না। আমি এই গোলাম-বাদী বিক্রয় করিয়া উহার মূল্য আহলে সুফফাদের জন্য খরচ করিব। (ফাতহুল বারী)

حضرت انسہ فرماتی ہیں کہ جس زمانہ میں
حضرت کا قریش سے معاہدہ ہو رہا تھا اس
وقت میری کافر والدہ (مکہ مکرمہ میں
طیبہ) آئیں۔ میں نے حضرت سے دریافت
کیا کہ میری والدہ (میری اعانت کی طلب
ہیں کہ آئی ہیں) ان کی اعانت کروں۔
حضرت نے فرمایا۔ ہاں ان کی اعانت کرو۔

② عَنْ أَنَسٍ مِّنْ أَهْلِ بَكْرَةَ
قَالَتْ قَدِمْتُ عَلَى أَبِي وَ
مَعِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ
فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي
قَدِمْتُ عَلَى وَحْدِي سَرِيعَةً
أَفَأَصِلُهَا قَالَ نَعَمْ عَلَيْهَا
(متفق عليه كذا في المشكاة)

① হযরত আসমা (রাযিঃ) বলেন, যখন কুরাইশদের সহিত হযুর
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুক্তি হইতেছিল, তখন আমার মা
কাফের অবস্থায় (মক্কা মুকাররমা হইতে মদীনা শরীফে) আসিলেন। আমি
হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার
মা (আমার নিকট সাহায্য পাওয়ার আশায় আসিয়াছেন, আমি কি
তাহাকে সাহায্য করিব? হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন,
হাঁ, তাহাকে সাহায্য কর। (মিশকাত : বুখারী, মুসলিম)

কায়দা : ইসলামের প্রাথমিক যুগে কাফেরদের পক্ষ হইতে
মুসলমানদের উপর যে পরিমাণ অত্যাচার হইয়াছে, উহা অবর্ণনীয়।
ইতিহাসের পাতা সেই সমস্ত বর্ণনায় পরিপূর্ণ রহিয়াছে। এমনকি
মুসলমানরা মক্কা শরীফ হইতে হিজরত করিতে বাধ্য হইলেন। মদীনা
শরীফে পৌঁছবার পরও মুশরিকদের পক্ষ হইতে সর্বপ্রকার যুদ্ধ ও নির্যাতন
চলিতে থাকিল। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের
একটি জামাত লইয়া শুধু ওমরা করিবার নিয়তে মক্কা মুকাররমায়
তশরীফ আনিলেন। তখন কাফেররা তাহাদেরকে মক্কায় প্রবেশ করিতেও
দিল না। মক্কার বাহির হইতেই ফিরিয়া যাইতে হইল। কিন্তু ঐ সময়
তাহাদের মধ্যে কয়েক বৎসরের জন্য একটি চুক্তিপত্র হইয়াছিল। উহাতে
কিছু শর্তের উপর কয়েক বৎসর পরস্পর লড়াই না করার সিদ্ধান্ত
হইয়াছিল। ইহা একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা। হযরত আসমা (রাযিঃ) এই
চুক্তিপত্রের প্রতিই উক্ত হাদীসে ইঙ্গিত করিয়াছেন। অর্থাৎ, যখন
কুরাইশদের সহিত চুক্তি হইতেছিল, ঐ সময় হযরত আবু বকর
(রাযিঃ)এর এক স্ত্রী হযরত আসমা (রাযিঃ)এর মা ছিলেন এবং
মুসলমান ছিলেন না। তাহার কন্যা হযরত আসমা (রাযিঃ)এর নিকট

কিছু সাহায্যের আশায় আসিয়াছিলেন। যেহেতু তিনি মুশরিক ছিলেন, এইজন্য হযরত আসমা (রাযিঃ) এর মনে প্রশ্ন জাগিল যে, তাকে সাহায্য করা যাইবে কিনা। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহায্য করার হুকুম দিলেন।

ইমাম খাত্তাবী (রহঃ) বলেন, এই ঘটনা দ্বারা জানা গেল যে, সম্পদ দ্বারা কাফের আত্মীয়-স্বজনের সহিতও সং ব্যবহার করা জরুরী, যেমন মুসলমান আত্মীয়-স্বজনের সহিত করিতে হয়।

এক বেওয়াযাতে আছে, এই ঘটনার প্রেক্ষিতেই কুরআন পাকের আয়াত (মুমতাহিনা : ৮) لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ (৮) وَلَا يَخْرُجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ السَّافِلِينَ নাযিল হইয়াছে। (ফাতহুল বারী)

যাহার তরজমা এই—আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে ঐ সমস্ত লোকের সহিত অনুগ্রহ ও ইনসাফের আচরণ করিতে নিষেধ করেন না, যাহারা তোমাদের সহিত দ্বীনের ব্যাপারে লড়াই করে না এবং যাহারা তোমাদেরকে তোমাদের ঘরবাড়ী হইতে বাহির করে নাই। আল্লাহ তায়ালা ইনসাফকারীদেরকে ভালবাসেন।

হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা খানবী (রহঃ) বলেন, এখানে ঐ সমস্ত কাফেরদের কথা বলা হইয়াছে, যাহারা জিম্মী অথবা সন্ধিকারী। অর্থাৎ, অনুগ্রহের আচরণ তাহাদের সহিত জায়েয রহিয়াছে। আর ইহাকেই ইনসাফের আচরণ বলা হইয়াছে। সুতরাং ইনসাফ দ্বারা এখানে বিশেষ ইনসাফ উদ্দেশ্য, অর্থাৎ, তাহাদের জিম্মী বা সন্ধি অবস্থায় ইনসাফের দাবী ইহাই যে, তাহাদের সহিত নির্বিধায় অনুগ্রহের আচরণ করা। নতুবা সাধারণ ইনসাফ তো প্রত্যেক কাফের বরং জীব-জন্তুর সহিতও করা ওয়াজিব। (বদানুল কুরআন)

হযরত আসমা (রাযিঃ) এর এই মায়ের নাম ছিল, কামলা অথবা কুতাইলা বিনতে আবদুল ওজ্জা। তিনি যেহেতু মুসলমান ছিলেন না, এইজন্য হযরত আবু বকর (রাযিঃ) তাহাকে তালাক দিয়াছিলেন। কোন কোন বর্ণনায় রহিয়াছে, তিনি কিছু ঘি পনির ইত্যাদি হাদিয়া স্বরূপ সঙ্গে লইয়া তাহার কন্যা হযরত আসমা (রাযিঃ) এর নিকট গেলেন। তিনি তাহাকে নিজের ঘরে প্রবেশ করিতে দিলেন না। তাহার বৈমাত্রেরা বোন হযরত আয়েশা (রাযিঃ) এর নিকট এই বলিয়া মাসআলা জিজ্ঞাসা করিতে

লোক পাঠাইলেন যে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া যেন জানাইয়া দেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে প্রবেশ করিতে অনুমতি দিলেন। এই ঘটনার প্রেক্ষিতেই উক্ত আয়াত নাখিল হইয়াছে। (দুররে মানসুর)

এই ছিল তাহাদের স্বীনের উপর দৃঢ়তা এবং সর্বাযোগ্য স্বীনী জযবা যে, যা ঘরে আসিয়াছেন শুধুমাত্র কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য, কেননা, তখন পর্যন্ত তো সাহায্য চাহিবার সুযোগই আসিয়াছিল না। কিন্তু হযরত আসমা (রাযিঃ) হাসআলা জানিবার জন্য এই বলিয়া লোক পাঠাইয়া দিলেন যে, আমি আমার মাকে ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি দিতে পারি কিনা। বিভিন্ন রেওয়াজাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, সাহাবায়ে কেরাম ইসলামের প্রাথমিক যুগে অমুসলিমদের উপর সদকা করা পছন্দ করিতেন না। তখন আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত **لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا تُنْفِقُكُمْ** নাখিল

করিয়াছেন। অর্থাৎ, তাহাদের হেদায়াত আপনার জিম্মায় নহে, ইহা তো আল্লাহ তায়ালায় কাজ। তিনি যাহাকে চাহেন হিদায়াত দান করেন, আর তোমরা যাহা কিছু (দান-খয়রাত ইত্যাদিতে) খরচ করিয়া থাক, উহা তোমাদের উপকারের জন্য করিয়া থাক। আর আল্লাহ তায়ালায় সন্তুষ্টি কামনা ছাড়া অন্য কোন পার্থিব উদ্দেশ্য কর না। (বাকারা : ২৭২) অর্থাৎ, তোমরা তো সদকা ইত্যাদি আল্লাহ তায়ালায় সন্তুষ্টির জন্য করিয়া থাক, ইহাতে প্রত্যেক অভাবী লোক অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। সে কাফের হউক অথবা মুসলমান হউক।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, লোকেরা তাহাদের কাফের আত্মীয়-স্বজনের প্রতি অনুগ্রহ করাকে পছন্দ করিত না, যেন তাহারাও মুসলমান হইয়া যায়। তিনি এই সম্পর্কে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন উক্ত আয়াত অর্থাৎ **لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ** নাখিল হয়। আরও বেশ কিছু রেওয়াজাতে এই বিষয়টি বর্ণিত হইয়াছে। (দুররে মানসুর)

ইমাম গামযালী (রহঃ) লিখিয়াছেন, একজন অগ্নিপূজক হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর বেদমতে হাজির হইয়া তাহার মেহমান হইতে চাহিল। তিনি বলিলেন, তুমি যদি মুসলমান হইয়া যাও, তবে আমি তোমাকে মেহমান হিসাবে গ্রহণ করিব। ইহা শুনিয়া অগ্নিপূজক চলিয়া গেল। আল্লাহ তায়ালায় পক্ষ হইতে ওহি আসিল, হে ইবরাহীম। তুমি এক

ওয়াস্তের খানা ধর্ম পরিবর্তন না করিবার কারণে খাওয়াইতে পারিলে না আর আমি সস্তর বছর যাবত তাহার কুফুরী সম্বন্ধে তাহাকে খান খাওয়াইতেছি। এক বেলা খানা খাওয়াইয়া দিলে কি ক্ষতি ছিল? হয়রত ইবরাহীম (আঃ) তৎক্ষণাৎ তাহার খোঁজে দৌড়াইতে লাগিলেন এবং তাহাকে পাইয়া গেলেন। তাহাকে সঙ্গে করিয়া ফিরাইয়া আনিলেন এবং খানা খাওয়াইলেন। অগ্নিপূজক লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কেন নিজে আমার তালাশে বাহির হইলেন? হয়রত ইবরাহীম (আঃ) ওহির ঘটনা শুনাইলেন। শুনিয়া অগ্নিপূজক বলিতে লাগিল, আমার সহিত তাহার এই আচরণ! তাহা হইলে আপনি আমাকে ইসলাম শিক্ষা দিন। এই বলিয়া সে তখনই মুসলমান হইয়া গেল। (এহইয়া)

এক হাদীসে আছে, তিনটি বিষয় এমন রহিয়াছে, যাহার মধ্যে কাহারো জন্য অন্য কেন অবকাশ নাই। ১. পিতামাতার সহিত সং ব্যবহার করা; তাহারা মুসলমান হউক বা কাফের হউক। ২. কাহারও সহিত ওয়াদা করিলে উহা পূরণ করা; মুসলমানের সহিত ওয়াদা করা হউক বা কাফেরের সহিত। ৩. আমানত ফেরত দেওয়া; উহা মুসলমানের আমানত হউক বা কাফেরের আমানত। (জামে সগীর)

মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া (রহঃ), আভা (রহঃ) ও কাতাদা (রহঃ) এই তিনজন হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালার পবিত্র এরশাদ 'إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ كَمَا مَعْرُوفًا' (আহযাব : ৬) ইহাতে মুসলমানদেরকে অমুসলিম ইহুদী, নাসারা আত্মীয়-স্বজনের জন্য ওসিয়ত করার কথা বলা হইয়াছে। (মুগনী)

⑧ عَنْ أَنَسٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخُلُقُ عِيَالٌ أَلِفُوا فَاحْبِبُوا الْخُلُقَ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَحْسَنِ إِلَى عِيَالِهِ - (رواه البيهقي في الشعب)

حُضُورِ أَهْلِ بَيْتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا إِرْشَادِهِ كَمَا مَعْلُوقِ سَارِي كَيْ سَايَ اللَّهُ تَعَالَى كَيْ عِيَالِهِ بِرِ اللَّهِ تَعَالَى كَوْفِهِ شَفْعِهِ بِهَيْتِ مَحْبُوبِهِ جِوَارِي كَيْ عِيَالِهِ كَيْ سَاوَةِ إِحْسَانِهِ كَيْ -

هَذَا فِي الْمَشْكُوتَةِ

⑨ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সমস্ত মাখলুক আল্লাহ তায়ালার পরিবারভুক্ত। সুতরাং আল্লাহ তায়ালার নিকট ঐ ব্যক্তি বেশী প্রিয়, যে তাহার পরিবারের সহিত সং ব্যবহার করে।

(মিশকাত : বায়হাকী ৩/আব)

ফায়দা : মখলুকের মধ্যে মুসলমান কাকের মানুষ জীবজন্তু সবই রহিয়াছে। প্রত্যেক মখলুকের সহিত সং ব্যবহার করা ইসলামের শিক্ষা এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রিয়। প্রথম পরিচ্ছেদে দশ নম্বরে এই হাদীস বর্ণিত হইয়াছে যে, একজন পতিতা মহিলাকে এইজন্য ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, সে একটি পিপাসার্ত কুকুরকে পানি পান করাইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আট নম্বরে হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, একজন মহিলার এই কারণে শাস্তি হইয়াছে যে, সে একটি বিড়াল পুষ্টি, কিন্তু উহাকে খাইতে দেয় নাই। যখন জীবজন্তুর ব্যাপারে এই অবস্থা, তখন মানুষ তো সৃষ্টির সেরা, তাহার প্রতি দয়া ও সং ব্যবহার করিলে কি পরিমাণ সম্ভাব্য হইবে; উহা বলার অপেক্ষা রাখে না।

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রসিদ্ধ এরশাদ রহিয়াছে :
 اَرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ, অর্থাৎ, তোমরা
 ভূমিনবাসীর উপর রহম কর, আসমানওয়ালা তোমাদের উপর রহম
 করিবেন।

অন্য এক হাদীসে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ
 করিয়াছেন, যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ তায়ালা তাহার
 প্রতি দয়া করেন না।

আরও এক হাদীসে আছে, দয়া এমন ব্যক্তির অন্তর হইতেই বাহির
 করিয়া দেওয়া হয়, যে হৃদভাগ্য। (মিশকাত)

স্বয়ং হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোটা জীবনই সারা
 দুনিয়ার জন্য রহমত ছিল। তাহার জীবনের একেকটি ঘটনা ইহার সাক্ষ্য
 প্রদান করে। উম্মতের জন্য জরুরী হইল, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি
 ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনের ঘটনাসমূহ অনুসন্ধান করিয়া উহার অনুসরণ
 করা। আল্লাহ তায়ালার পবিত্র এরশাদ হইতেছে : وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً
 وَلِلْعَالَمِينَ, অর্থাৎ, আমি আপনাকে আর কোন বিষয়ের জন্য পাঠাই নাই;
 শুধুমাত্র সমগ্র জগতের মানুষের প্রতি দয়া ও মেহেরবানী করার জন্য
 পাঠাইয়াছি। (আলবাক্বা : ১০৭)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) এই আয়াতের তফসীরে বলেন, যাহারা
 হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনিয়াছে, তাহাদের
 জন্য তো তিনি দুনিয়া ও আখেরাতে অবশ্যই রহমতস্বরূপ। কিন্তু যাহারা
 ঈমান আনে নাই তাহাদের জন্যও তিনি এই হিসাবে রহমত স্বরূপ যে,
 তাহারা পূর্ববর্তী উম্মতের মত দুনিয়ার শাস্তি—যেমন চেহারা বিকৃত হইয়া
 যাওয়া, ভূমিনে ধসিয়া যাওয়া এবং আসমান হইতে পাথরের বর্ষণ

ইত্যাদি হইতে রক্ষা পাইয়া গিয়াছে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, কোন কোন লোক হযরত সালাহাত আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দরখাস্ত করিল, কুরাইশের লোকেরা মুসলমানদেরকে অনেক কষ্ট দিয়াছে, অনেক ক্ষতি করিয়াছে; আপনি তাহাদের জন্য বদদোয়া করুন। হযরত সালাহাত আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি বদদোয়া দেওয়ার জন্য প্রেরিত হই নাই, আমি মানুষের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরিত হইয়াছি। এই বিষয়টি আরও বহু সংখ্যক রেওয়াযাতে বর্ণিত হইয়াছে। (দুরের মানসূর)

হযরত সালাহাত আলাইহি ওয়াসাল্লামের তায়েফ সফরের হৃদয়বিদারক ঘটনা হেকায়াতে সাহাবা কিতাবের শুরুতে লিখিয়াছি যে, সেই হতভাগ্যরা কত কঠিন কষ্ট দিয়াছে। হযরত সালাহাত আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীর মোবারক হইতে রক্ত প্রবাহিত হইয়াছে। আর এই অবস্থায় যখন পাহাড়ের দায়িত্বে নিযুক্ত ফেরেশতা আসিয়া দরখাস্ত করিল যে, আপনি যদি বলেন, দুই পার্শ্বের উভয় পাহাড়কে মিলাইয়া দিব; মাঝখানে ইহারা পিষিয়া যাইবে। তখন হযরত সালাহাত আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি আল্লাহ তায়ালায় নিকট এই আশা রাখি যে, যদি ইহারা মুসলমান নাও হয়, তবে তাহাদের সন্তানদের মধ্য হইতে কিছু লোক আল্লাহ তায়ালায় নাম লওয়ার মত পয়দা হইয়া যাইবে।

ওহদের যুদ্ধে যখন হযরত সালাহাত আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কঠিন হামলা করা হইল, তাহার দান্দান মুবারক শহীদ হইয়া গেল, তখন লোকেরা কাফেরদের উপর বদদোয়া করার জন্য দরখাস্ত করিল। কিন্তু হযরত সালাহাত আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, হে আল্লাহ! আমার কণ্ঠকে হেদায়াত দান করুন, ইহারা জানে না। হযরত ওমর (রাঃ) আরম্ভ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি আপনিও নূহ (আঃ) এর মত বদদোয়া করিতেন, তবে আমরা সকলেই ধ্বংস হইয়া যাইতাম। কেননা, আপনাকে সর্বপ্রকার কষ্ট দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু আপনি সর্বদা এই দোয়াই করিয়াছেন যে, হে আল্লাহ! আমার কণ্ঠকে মাফ করিয়া দিন, কেননা, তাহারা জানে না।

কাজী ইয়াজ (রহঃ) বলেন, অত্যন্ত গভীরভাবে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, এই সমস্ত ঘটনা ধৈর্য ও আত্মলাকের কত উন্নত আদর্শ এবং মহত্ব ও উদারতার কত চরম পর্যায় ছিল যে, এইরূপ কঠিন হইতে কঠিন কষ্টের পরও হযরত সালাহাত আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও ক্ষমার জন্য, আবার কখনও হেদায়াতের জন্য দোয়া করিতে রহিয়াছেন।

গওয়াস ইবনে হারেসের প্রসিদ্ধ ঘটনা রহিয়াছে। যখন এক সফরে ছ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাকী ঘুমাইতেছিলেন, সে তলোয়ার হাতে লইয়া ছ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছিয়া গেল। ছ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন সময় জাগ্রত হইলেন, যখন সে তলোয়ার উত্তোলন করিয়া কাছে দাঁড়ান ছিল। সে ছৎকার দিয়া বলিল, বল, এখন তোমাকে কে রক্ষা করিবে? ছ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহ জাল্লা শানুহু। ছ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা বলার সাথে সাথে তাহার হাত কাঁপিতে লাগিল এবং হাত হইতে তলোয়ার পড়িয়া গেল। ছ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই তলোয়ার নিজ হাতে লইয়া বলিলেন, এখন তুমি বল, তোমাকে কে রক্ষা করিবে? সে বলিল, আপনি, উত্তম তরবারী ধারণকারী (অর্থাৎ, আমাকে ক্ষমা করিয়া দিন)। ছ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিলেন।

ইহুদী মহিলা কর্তৃক ছ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিষ প্রয়োগের ঘটনাও প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। উক্ত মহিলা ইহা স্বীকারও করিয়াছিল যে, আমি ছ্যুরকে বিষ দিয়াছি। কিন্তু ছ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নাই।

লাবিদ ইবনে আসাম ছ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যাদু করিয়াছিল। ইহা জানা সত্ত্বেও ছ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত ঘটনা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করাও পছন্দ করেন নাই। মোটকথা, কেবল দুই চারটি ঘটনাই নহে, শত্রুর প্রতি দয়া প্রদর্শনের এইরূপ হাজার হাজার ঘটনা রহিয়াছে। (শিফা)

ছ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমেন হইতে পার না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা একে অন্যের সহিত দয়া না করিবে। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিই তো দয়া করে। ছ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইহা দয়া নয়, যাহা কেবল আপনজনদের সহিত হয়। বরং দয়া উহা, যাহা ব্যাপকভাবে হয়। ছ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ঘরে তশরীফ লইয়া গেলেন। সেখানে কয়েকজন কুরাইশী লোক বসিয়াছিল। ছ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, বাদশাহী ও রাজত্বের ধারা কুরাইশদের মধ্যে থাকিবে; যতদিন পর্যন্ত তাহারা এই নীতি অবলম্বন করিবে যে, কেহ তাহাদের নিকট দয়া চাহিলে তাহার প্রতি দয়া করিবে, যখন কোন ছকুম

দিবে তখন ইনসাফের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে, যখন কোন কিছু বণ্টন করিবে, তখন ইনসাফের সহিত বণ্টন করিবে। আর যে ব্যক্তি ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবে না, তাহার উপর আল্লাহর লানত, ফেরেশতাদের লানত, সমস্ত মানুষের লানত।

একবার ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ঘরে তশরীক লইয়া গেলেন। যেখানে মুহাজির ও আনসারদের একটি জামাত অবস্থান করিতেছিল। ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আসিতে দেখিয়া প্রত্যেকেই নিজ নিজ জায়গা হইতে সরিয়া গেলেন। তাহারা মনে করিয়াছিলেন যে, ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসিবেন। কিন্তু ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দরজায় দাঁড়াইয়া উভয় কপাটের উপর হাত রাখিয়া এরশাদ করিলেন, তোমাদের উপর আমার অনেক হক রহিয়াছে। রাজত্ব পরিচালনার এই ধারা কুরাইশদের মধ্যে থাকিবে; যতদিন পর্যন্ত তাহারা তিনটি বিষয়ে যত্নশীল থাকিবে— ১. যে কেহ তাহাদের নিকট দয়ার আবেদন করিবে, তাহার উপর দয়া করিবে। ২. যে কোন ফয়সালা করিবে, তাহা ইনসাফের সহিত করিবে। ৩. কাহারও সহিত চুক্তি করিলে উহা পূরা করিবে আর যে ব্যক্তি এইরূপ করিবে না, তাহার উপর আল্লাহর লানত, ফেরেশতাদের লানত, সমস্ত মানুষের লানত।

ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি একটি পারিকেও অন্যায়ভাবে জবাই করিবে, কিয়ামতের দিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, উহার হক কি? ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, জবাই করিয়া যেন উহাকে খাওয়া হয়। এমন যেন না হয় যে, শুধু শুধু জবাই করিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইল। অনেক হাদীসে এই বিষয়টি বর্ণিত হইয়াছে যে, তোমরা নিজেরা যাহা খাও উহা হইতে তোমাদের অধীনস্থ গোলামদেরকেও খাওয়াও। তোমরা নিজেরা যাহা পরিধান কর উহা হইতে তাহাদেরকেও পরিধান করাও। আর যাহার সহিত বনিবনা না হয়, তাহাকে বিক্রয় করিয়া দাও; তাহাকে শাস্তি দেওয়ার কোন অধিকার নাই। (ভারগীব)

ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও এরশাদ করিয়াছেন, যখন তোমাদের কোন খাদেম তোমাদের জন্য কোন জিনিস রান্না করিয়া আনে, তখন সে যেহেতু তাপ ও ধোয়ার কষ্ট সহ্য করিয়াছে, তোমাদের উচিত—তাহাকেও খাওয়ার মধ্যে নিজের সাথে শরীক কর। আর যদি তাহাকে শরীক করার মত পরিমাণ না থাকে, তবে উহা হইতে সামান্য তাহাকেও দিয়া দাও। (মিশকাত)

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, অধিনস্থদের সহিত ভাল ব্যবহার করা সৌভাগ্যের বিষয়। তাহাদের সহিত দুর্ব্যবহার করা দুর্ভাগ্যের বিষয়। (মিশকাত)

মোটকথা, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মখলুকের প্রতি সর্ব প্রকারে দয়া করার তাকীদ করিয়াছেন। বিভিন্ন প্রকারে উহাদের সহিত ভাল আচরণের উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন।

① عَنِ ابْنِ عُثْمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُتَكَبِّرِ وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رِجْلُهُ وَصَلَهُهُ (معناه البخاری کذا فی مشکوٰۃ)

مُحَمَّدٌ أَدْرَسَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا بَكَرَ
ارشاد ہے کہ وہ شخص جو برابر کسی کے ساتھ ہو۔
والا نہیں ہے جو برابر برابر کسی کے ساتھ ہو۔
ہو۔ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہے جو خود کو
کہہ رہا ہے کہ وہ ہے جو خود کو

② হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঐ ব্যক্তি আত্মীয়-স্বজনের সহিত সদ্যবহারকারী নয়, যে সমান সমান আচরণ করে। সদ্যবহারকারী হইল, ঐ ব্যক্তি, যে অপরপক্ষ সম্পর্ক ছিন্ন করিলেও সদ্যবহার করে। (মিশকাত : বুখারী)

ফায়দা : অভ্যস্ত স্পষ্ট কথা—যখন আপনি প্রত্যেক বিষয়ে এই চিন্তা করেন যে, অপর পক্ষ যেইরূপ আচরণ করিবে আমিও সেইরূপ করিব, তখন আপনি কি সদ্যবহার করিলেন? এইরূপ আচরণ তো যে কোন অপরিচিত লোকের সহিতও হইয়া থাকে। কেননা, যখন অন্য ব্যক্তি আপনার প্রতি অনুগ্রহ করিবে, তখন আপনি নিজে তাহার প্রতি অনুগ্রহ করিতে বাধ্য। আত্মীয়-স্বজনের সহিত প্রকৃত সং ব্যবহার তো ইহাই যে, যদি অন্যের পক্ষ হইতে অমনোযোগিতা, উদাসীনতা প্রদর্শন ও সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়, তখন তুমি উহা জুড়িয়া রাখার চিন্তা কর। ইহা দেখিও না যে, সে কি আচরণ করে। সর্বদা এই চিন্তা কর যে, আমার জিন্মায় তাহার কি হক রহিয়াছে, আমার কি করা উচিত। অন্যের হক আদায় করিতে থাক, এমন যেন না হয় যে, তাহার কোন হক তোমার জিন্মায় থাকিয়া যায়, যে জন্য তোমাকে কিয়ামতের দিন জবাবদিহি করিতে হয়। তোমার হক আদায় হইল কিনা ; এই ধারণাও তোমার অন্তরে আনিও না, বরং যদি উহা পুরা না হয়, তবে আরও বেশী আনন্দিত হইও। কেননা, পরজগতে উহার জন্য যে নেকী ও সওয়াব পাইবে, তাহা এখানের পাওনা হইতে অনেক বেশী হইবে।

এক সাহাবী হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার আত্মীয়-স্বজন রহিয়াছে। আমি তাহাদের সহিত সং ব্যবহার করি কিন্তু তাহারা সম্পর্ক ছিন্ন করে। আমি তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ করি; কিন্তু তাহারা আমার সহিত দুর্ব্যবহার করে। আমি সব ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করি; তাহারা মুখতাসুলত ব্যবহার করে। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যদি তোমার কথা সঠিক হয়, তবে তুমি তাহাদের মুখে মাটি নিক্ষেপ করিতেছ (অর্থাৎ, তাহারা অপদস্থ হইবে)। আর তোমার সহিত আল্লাহ তায়ালা সাহায্য শামিল থাকিবে; যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তোমার এই অভ্যাসের উপর অবিচল থাকিবে। (মিশকাত) আর যতক্ষণ পর্যন্ত কাহারও সহিত আল্লাহ তায়ালা সাহায্য শামিল থাকে, ততক্ষণ না কাহারও দুর্ব্যবহার তাহার ক্ষতি করিতে পারে, না কাহারও সম্পর্ক ছিন্নতা তাহার লাভের পথে বাধা হইতে পারে।

كُونُ مُحَمَّدٍ لِّجَمَّةٍ يَأْتِي تِرَاجُثَابَةَ غَضَبٍ
يُولِي رَاضِي بِلِجَّةٍ يَأْتِي نَمَازُ مُحَمَّدٍ

অর্থাৎ, সমকালীন সকল মানুষ যদি আমাকে ছাড়িয়া দেয়, তবে আমি রাজি আছি। কিন্তু হে প্রতিপালক! তুমি আমার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইও না। কেননা, তোমার বিচ্ছিন্ন হওয়া আমার জন্য বিরাট ক্ষতের কারণ। ইহা স্পষ্ট বাস্তব কথা যে, আল্লাহ তায়ালা কাহারও সাহায্যকারী হইলে তাহার অন্য কাহারও সাহায্যের প্রয়োজন থাকে না। বরং সমগ্র দুনিয়া বাধ্য হইয়া তাহার সাহায্যকারী হইয়া যায় এবং সারা দুনিয়া একত্রিত হইয়াও তাহার কোন ক্ষতি করিতে চাহিলে ক্ষতি করিতে পারে না।

এক হাদীসে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমাকে আমার রব্ব নয়টি বিষয়ের হুকুম করিয়াছেন—১. আল্লাহ তায়ালা ভয়; প্রকাশ্যে এবং গোপনে (অর্থাৎ অন্তরে ও প্রকাশ্যে অথবা নির্জনে ও লোক সমাবেশে)। ২. ইনসাফের কথা বলা; খুশী ও গোঁড়া উভয় অবস্থায়। (মানুষ যখন কাহারও প্রতি খুশী হয়, তখন তাহার দোষসমূহ গোপন করিয়া প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া যায়, আর যখন অসন্তুষ্ট হয়, তখন মিথ্যা দোষারোপ করে। আমাকে হুকুম করা হইয়াছে, যেন সর্বাবস্থায় ইনসাফের কথা বলি।) ৩. মিতব্যয়িতা অবলম্বন করা; দারিদ্র ও সচ্ছল উভয় অবস্থায়। (অভাবের অবস্থায় যেন কৃপণতা না করি, আর সচ্ছল অবস্থায় যেন অপচয় না করি অথবা দারিদ্র্য অবস্থায় যেন হাছতাশ

না করি। আর প্রাচুর্যের অবস্থায় যেন অহংকার না করি।) ৪. যে ব্যক্তি আমার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করে, আমি যেন তাহার সহিতও সম্পর্ক জুড়ি। ৫. যে ব্যক্তি আমাকে তাহার দান হইতে বঞ্চিত করে, আমি যেন তাহার সহিত উত্তম ব্যবহার করি। ৬. যে ব্যক্তি আমার উপর জুলুম করে, আমি যেন তাহাকে মাফ করিয়া দেই (অর্থাৎ, প্রতিশোধ লওয়ার গিছনে না পড়ি)। ৭. আমার চুপ থাকা যেন (আখেরাত অথবা আল্লাহ তায়ালায় নিদর্শনসমূহের মধ্যে) ফিকিরে হয়। ৮. আমার কথা বলা যেন আল্লাহ তায়ালায় ফিকির হয় (তসবীহ ইত্যাদি অথবা আল্লাহ তায়ালায় হুকুম-আহকাম বর্ণনা করা হয়)। ৯. আমার দৃষ্টি যেন শিক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য হয় (অর্থাৎ, যে জিনিসের প্রতি দেখি, যেন শিক্ষা গ্রহণের দৃষ্টিতে দেখি)। ১০. আর আমি নেক কাজের হুকুম যেন করিতে থাকি। (মিশকাত)

গুরুতে নয়টি জিনিসের কথা বলা হইয়াছে ; কিন্তু বিবরণে দশ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই দশম বিষয়টি পূর্ববর্তী নয়টি বিষয়ের সংক্ষিপ্তসারও হইতে পারে। আর সাত ও আট নম্বরকে পাশাপাশি হওয়ার কারণে একটি ধরা যাইতে পারে। যেমন, গুরুতে প্রকাশ্য ও গোপনকে একটি ধরা হইয়াছে এবং খুশী ও গোস্বার অবস্থাকে একটি ধরা হইয়াছে।

হযরত হাকীম ইবনে হেযাম (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল, সর্বোত্তম সদকা কি? হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, 'কাশেহ' আত্মীয়-স্বজনের সহিত সং ব্যবহার করা। (তরগীব) কাশেহ ঐ ব্যক্তিকে বলে, যে অন্য কাহারও প্রতি অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রাখে।

এক হাদীসে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন উচ্চ বাসস্থান ও উচ্চ মর্যাদাসমূহ লাভ করিতে পছন্দ করে, তাহার উচিত—সে যেন ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা করিয়া দেয়, যে তাহার উপর জুলুম করে। যে তাহাকে আপন দান হইতে বঞ্চিত রাখে, সে যেন তাহার প্রতি অনুগ্রহ করে এবং যে তাহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করে, সে যেন তাহার সহিত সম্পর্ক জুড়ে। (দুররে মানসুর)

এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, যখন এই আয়াত **خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ** (ক্ষমা অবলম্বন করুন, সং কাজে আদেশ করুন এবং মুর্থদের হইতে একদিকে সরিয়া থাকুন (আ'রাক : ১৯৯)) নাযিল হইল, তখন হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরাঈল (আঃ) এর নিকট ইহার তফসীর জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন তিনি আরজ করিলেন, যিনি জানেন অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালায় নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া আরজ

করিব। এই বলিয়া তিনি ফিরিয়া গেলেন। অতঃপর আসিয়া আরজ করিলেন, আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আপনার উপর জুলুম করে, তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিন। যে আপনাকে তাহার দান হইতে বঞ্চিত রাখে, আপনি তাহাকে দান করুন। আর যে আপনার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করে, আপনি তাহার সহিত সম্পর্ক স্থাপন করুন।

অন্য এক হাদীসে এই ঘটনার পর ইহাও রহিয়াছে যে, অতঃপর হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আমি কি তোমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের সর্বোত্তম আখলাক বলিয়া দিব? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, অবশ্যই বলিয়া দিন। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যে তোমাদের উপর জুলুম করে, তাহাকে ক্ষমা কর, যে তোমাদেরকে তাহার দান হইতে বঞ্চিত রাখে, তাহাকে দান কর, আর যে তোমাদের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করে, তাহার সহিত আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখ।

হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, আমাকে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি কি তোমাকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের উত্তম চরিত্র বলিয়া দিব? আমি আরজ করিলাম, অবশ্যই বলিয়া দিন। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যে ব্যক্তি তোমাকে তাহার দান হইতে বঞ্চিত রাখে, তাহাকে দান কর, যে তোমার উপর জুলুম করে, তাহাকে ক্ষমা কর। আর যে ব্যক্তি তোমার সহিত আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে, তাহার সহিত সম্পর্ক জুড়িয়া লও।

হযরত উকবা (রাযিঃ) বলেন, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, আমি কি তোমাকে দুনিয়া ও আখেরাতের উত্তম আখলাক বলিব? অতঃপর উপরোক্ত তিনটি বিষয় এরশাদ করিলেন। আরও অনেক সাহাবায়ে কেরাম হইতে এই বিষয়টি বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন, মানুষ ঐ পর্যন্ত প্রকৃত ঈমান লাভ করিতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে ইহা না করে যে, তাহার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্নকারীদের সহিত সে সম্পর্ক জুড়িয়া লয়, তাহার উপর জুলুমকারীদেরকে সে ক্ষমা করিয়া দেয়, তাহাকে গালিগালাজকারীদেরকে সে মাফ করিয়া দেয়, আর যে তাহার সহিত দুর্ব্যবহার করে, সে ঐ ব্যক্তির সহিত সং ব্যবহার করে।

(দুররে মানসুর)

① عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ عَيْنٌ فِي عَيْنِ مَنْ كَفَرَ بِهِ فَلْيُغْفِرْ لَهُ

چه كنيز چه كني گناه جز يادۀ شتر
اس باء كابر كرس كا و بال آيت مي
و غيره و بشك با و جرد دنيا مي اس كي سزا
بهت جلد ميگفتي شدي مي دكك الله
ايك علم و سزا قطع مي.

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ
ذَنْبٍ أَغْرَى أَنْ يُعْجَلَ اللَّهُ
لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ
مَا يَكُونُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ
الْبُئْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ.

(رواه الترمذی و ابوداؤد حكذا في المشكوة)

১০) হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দুইটি গোনাহ এমন রহিয়াছে যে, উহার শাস্তি আখেরাতে সঞ্চিত থাকে। সত্ত্বেও দুনিয়াতেও উহার শাস্তি অতি তাড়াতাড়ি ভোগ করিতে হয়। একটি হইল, জুলুম করা, অপরটি হইল, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা।

(মিশকাত : তিরমিযী, আবু দাউদ)

ফায়দা : অর্থাৎ, জুলুম ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা এই দুইটি গোনাহ এমন যে, আখেরাতে উহার শাস্তি যাহা কিছু হওয়ার উহা তো হইবেই, আখেরাত ছাড়া দুনিয়াতেও উহার শাস্তি অনেক জলদি হইয়া যায়।

অন্য এক হাদীসে আছে, আল্লাহ তায়ালা যখন চাহেন, সমস্ত গোনাহ মাক করিয়া দেন ; কিন্তু পিতামাতার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করার শাস্তি যত্নের আগেই দিয়া দেন। (মিশকাত)

এক হাদীসে আছে, প্রত্যেক গোনাহের শাস্তি আল্লাহ তায়ালা আখেরাতের জন্য রাখিয়া দেন ; কিন্তু পিতামাতার নাফরমানীর শাস্তি খুব শীঘ্র দুনিয়াতে দিয়া দেন। (জামে সগীর)

বহু হাদীসে এই বিষয়ও বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন রেহেম (অর্থাৎ আত্মীয়তার সম্পর্ককে কথা বলার শক্তি দান করিবেন, সে আরশ ধরিয়া আবেদন করিতে থাকিবে, হে আল্লাহ ! যে আমাকে জুড়িয়াছে তুমি তাহাকে জুড়িয়া লও। আর যে আমাকে ছিন্ন করিয়াছে তুমি তাহাকে ছিন্ন কর। বহু হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, আল্লাহ তায়ালা বলেন, রেহেম শব্দটি আল্লাহ তায়ালা পবিত্র নাম রহমান হইতে বাহির করা হইয়াছে। যে ব্যক্তি উহাকে জুড়িবে, রহমান তাহাকে জুড়িবেন। আর যে উহাকে ছিন্ন করিবে, রহমান তাহাকে ছিন্ন করিবেন।

এক হাদীসে আছে, ঐ সম্প্রদায়ের উপর রহমত নাযিল হয় না, যাহাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক ছিন্নকারী থাকে।

এক হাদীসে আছে, প্রতি বৃহস্পতিবারে আল্লাহ তায়ালার নিকট আমলসমূহ পেশ করা হয়। আত্মীয়তার সম্পর্ক হিন্নকারীর কোন আমল কবুল হয় না। (দুররে মানসুর)

ফকীহ আবুল লায়স (রহঃ) বলেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক হিন্ন করা এমন নিকট গোনাহ যে, এইরূপ লোকের নিকটে যাহারা বসে, তাহাদেরকেও রহমত হইতে বঞ্চিত করিয়া দেয়। এইজন্য সমস্ত গোনাহ হইতে অতি নীচ তওবা করা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য জরুরী।

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আত্মীয়-স্বজনের সহিত সং ব্যবহার ছাড়া আর কোন নেক কাজ এইরূপ নাই, যাহার সওয়াব অতি তাড়াতাড়ি পাওয়া যায়। আর আত্মীয়তার সম্পর্ক হিন্ন করা ও জুলুম করা ছাড়া কোন গোনাহ এমন নাই, যাহার শাস্তি আখেরাতে তো হইবেই; দুনিয়াতেও তাড়াতাড়ি পাওয়া যায়।

(তাস্বীফুল গাফেলীন)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) একবার ফজরের নামাজের পর এক মজলিসে বসিয়াছিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, আমি তোমাদেরকে কসম দিতেছি, যদি এই মজলিসে আত্মীয়তার সম্পর্ক হিন্নকারী কোন ব্যক্তি থাকে, সে যেন চলিয়া যায়। আমরা আল্লাহ তায়ালার নিকট একটি দোয়া করিতে চাহিতেছি। আত্মীয়তার সম্পর্ক হিন্নকারীর জন্য আসমানের দরজা বন্ধ হইয়া যায়। (তারগীব) অর্থাৎ, তাহার দোয়া আসমানের উপর যায় না, উহার পূর্বেই দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। যখন তাহার সহিত আমাদের দোয়া হইবে, তখন দরজা বন্ধ হইয়া যাওয়ার কারণে আমাদের দোয়া বাহিরে থাকিয়া যাইবে।

ইহা ছাড়া বহু সংখ্যক রেওয়ায়াত হইতে এই বিষয় জানা যায় এবং দুনিয়ার বহু ঘটনা ইহার সাক্ষ্য দেয় যে, আত্মীয়তার সম্পর্ক হিন্নকারী দুনিয়াতেও এমন মুসীবতে পড়িয়া যায় যে, তখন শুধু কাদিতেই থাকে এবং নিজের নির্বুদ্ধিতা ও মূর্খতার কারণে ইহাও বুঝে না যে, যতদিন পর্যন্ত এই গোনাহ হইতে তওবা না করিবে, উহার ক্ষতিপূরণ না করিবে, উহার বদলা আদায় না করিবে, ততদিন পর্যন্ত হাজার চেষ্টা তদবীর করিলেও এই আযাব হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না। আর দুনিয়ার কোন আপদ-বিপদে লিপ্ত হইয়া যাওয়া কোন বে-ব্বীনী কাজে গ্রেফতার হওয়া অপেক্ষা অনেক সহজ। কারণ, খোদা না করুন, কোন বে-ব্বীনী কাজে জড়িত হইয়া গেলে তো তওবা করারও অনুভূতি থাকিবে না। আল্লাহ তায়ালার আপন দয়া ও মেহেরবানীতে সকলকে হেফাজত করুন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

যাকাত আদায়ের গুরুত্ব ও ফাযায়েল

যাকাত আদায় করা ইসলামের রুকনসমূহের মধ্য হইতে একটি গুরুত্বপূর্ণ রুকন। প্রসিদ্ধ অভিমত অনুযায়ী আল্লাহ তায়ালা কালামে পাকে বিরাশি জায়গায় নামাযের সাথে সাথে যাকাতের হুকুম করিয়াছেন। ইহা ছাড়া আরও বিভিন্ন জায়গায় শুধু যাকাতের হুকুম করা হইয়াছে।

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রসিদ্ধ হাদীস রহিয়াছে, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি জিনিসের উপর—১. কালেমা তাইয়েবার স্বীকারোক্তি, ২. নামায, ৩. যাকাত, ৪. রোযা, ৫. হজ্জ।

এক হাদীসে আছে, আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তির নামায কবুল করেন না, যে যাকাত আদায় করে না। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা (কুরআন পাকে) যাকাতকে নামাযের সহিত একত্রিত করিয়াছেন। অতএব, তোমরা এই দুইটির মধ্যে পার্থক্য করিও না। (কানয)

ওলামায়েকেরাম এই ব্যাপারে একমত যে, এইগুলির মধ্য হইতে কোন একটিকে অস্বীকারকারী কাকের। এই পাঁচটি জিনিসই ইসলামের ভিত্তি। এইগুলিই গুরুত্বপূর্ণ এবাদত। এই সমস্ত বিষয়গুলির উপরই ইসলাম নির্ভরশীল। কিন্তু গভীর দৃষ্টিতে যদি দেখিলে বুঝা যায় যে, এই সমস্ত কিছুর সারাংশ হইল, আবদীয়ত বা গোলামী স্বীকার করার পর মনিবের দরবারে মাহবুবের খেদমতে শুধু দুইটি হাজিরা দেওয়া। প্রথম হাজিরা হইল রাহনী, যাহা নামাযের দ্বারা হয়। এইজন্যই হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নামাযী ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা সহিত কথা বলে। এইজন্যই নামাযকে মুমেনের মেরাজ বলা হয়। নামাযের এই হাজিরা হইল, বান্দার সার্বক্ষণিক অভাব ও প্রয়োজনাদি মালিকের দরবারে পেশ করিবার উপযুক্ত সময়। যেহেতু বান্দার প্রয়োজন ও জরুরত ইত্যাদি সব সময়ই দেখা দিতে থাকে, সেহেতু বারবার হাজিরা দেওয়ার প্রয়োজন। এইজন্যই অনেক হাদীসে অধিক পরিমাণে এই বিষয়টি বর্ণিত হইয়াছে যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং

সমস্ত আশ্বিয়ায়ে কেবাম যখনই কোন প্রয়োজনের সম্মুখীন হইতেন তখনই তাহারা নামাযের দিকে মনোযোগী হইতেন। এই হাজিরার মধ্যে বান্দার পক্ষ হইতে আল্লাহ তায়ালায় প্রশংসা ও গুণাবলী বর্ণনার পর সাহাবা চাওয়া হয়। আর আল্লাহ তায়ালায় পক্ষ হইতেও কবুলের ওয়াদা রহিয়াছে। বহু হাদীসে সূরায় ফাতেহার তফসীরে ইহা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এইজন্যই যখন নামাযের জন্য আহ্বান করা (অর্থাৎ, আমান দেওয়া) হয়, তখন একদিকে যেমন নামাযের জন্য আস বলা হয় তেমনি সাথে সাথে এই ঘোষণাও করা হয় যে, সফলতার দিকে আস। অর্থাৎ, উভয় জাহানের কামিয়াবীর জন্য আস। ইহার সমর্থনে অনেক হাদীস মওজুদ রহিয়াছে। আর নামাযের দ্বারা যেহেতু উভয় জাহানের সফলতা ও কামিয়াবীই মনিবের দরবার হইতে লাভ হয়, সেহেতু দীন ও দুনিয়া উভয়টিই দান করা হইল। সুতরাং যাকাত যেন নামাযের জন্য সম্পূরক ও পরিপূর্ণতা স্বরূপ অর্থাৎ আমার দরবার হইতে যাহা দান করা হয়, উহা হইতে অতি সামান্য পরিমাণ অর্থাৎ শতকরা আড়াই টাকা আমার নাম স্মরণকারী ফকিরদেরকেও দান করিও। ইহা যেন মহান দরবার হইতে পাওয়া দানের শোকরানা স্বরূপ হইল, যাহা বিবেকসম্মত ও স্বভাবসম্মত। আর প্রচলিত নিয়মও ইহাই যে, দরবারী দান-দক্ষিণা হইতে দরবারের চাকর-নকরদেরকেও দেওয়া হইয়া থাকে। এই কারণেই কুরআন পাকে বেশীর ভাগ যেখানে নামাযের হুকুম আসিয়াছে, সেখানে উহার পর সঙ্গে সঙ্গেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে যাকাতের হুকুম হইয়াছে। অর্থাৎ, নামাযের মাধ্যমে আমার নিকট হইতে চাহিয়া নও। অতঃপর যাহা পাও, উহা হইতে সামান্য পরিমাণ আমার নাম স্মরণকারীদেরকে দান কর। আর উপর্যুপরি দয়া এই যে, এই সামান্য পরিমাণ আদায় করার মধ্যেও পৃথক সওয়াব রহিয়াছে এবং প্রচুর পুরস্কারের ওয়াদাও রহিয়াছে।

আর দ্বিতীয় হাজিরা হইল, মাহবুবের ঘরে স্বশরীরে উপস্থিত হওয়া, যাহাকে হজ্জ বলে। ইহাতে যেহেতু সাধারণতঃ শারীরিক ও আর্থিক কষ্ট রহিয়াছে, এইজন্য সামর্থ্যবান হইলে জীবনে মাত্র একবার হাজির হওয়া জরুরী করা হইয়াছে। আর সেইখানে হাজিরা দেওয়ার জন্য নিজেকে সর্বপ্রকার অপবিত্রতা হইতে পবিত্র করিবার জন্য কিছুদিন রোযা রাখার হুকুম করা হইয়াছে। কেননা, সমস্ত অপবিত্রতার মূল হইল, পেট ও লজ্জাস্থান। অল্প কয়েক দিন গুরুত্ব সহকারে যেন উহার হেফাজত করা হয়, যাহাতে সেইখানে হাজিরা দেওয়ার যোগ্যতা পয়দা হয়। এইজন্যই রোযার মাস শেষ হইতেই হজ্জের সময় শুরু হইয়া যায়। এই যুক্তিযুক্ত

কারণেই সম্ভবতঃ ফেকাহবিদগণ তাহাদের কিতাবে এই নিয়মেই এবাদতসমূহকে উল্লেখ করিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া রোযার মধ্যে আরো অন্যান্য বৈশিষ্ট্য থাকাও ইহার পরিপন্থী নয়। সম্পদ খরচ না করার ব্যাপারে কুরআনে যে সমস্ত সতর্কবাণী আসিয়াছে উহার অংশবিশেষ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে, অধিকাংশ উলামায়ে কেবামের মতে উহা যাকাত আদায় না করার ব্যাপারেই অবতীর্ণ হইয়াছে। এই বিষয়ে সমস্ত আয়াত ও হাদীস উল্লেখ করা তো কঠিন বিষয়। নমুনা স্বরূপ কিছু আয়াত ও হাদীস উল্লেখ করা হইতেছে। মুসলমানের জন্য তো একটি আয়াত অথবা ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীসই যথেষ্ট। আর যে শুধু নামমাত্র মুসলমান, তাহার জন্য সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ এবং হাদীসের সম্পূর্ণ ভাণ্ডারও বেকার। প্রকৃত ফরমাবরদার ব্যক্তির জন্য তো এই কথা একবার জানিতে পারাই যথেষ্ট যে, ইহা আমার মনিবের হুকুম। আর নাফরমানের জন্য হাজার সতর্কবাণীও বেকার। যতক্ষণ আযাবের জুতা না পড়ে ততক্ষণ কি আর বুকে আসে?

আয়াতসমূহ

① وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاسْكُفُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ○
 اور قائم کرو تم لوگ نماز کو اور زکوٰۃ
 کو، اور عاجزی کو عاجزی کرنی والوں
 کے ساتھ (یا رکوع کو رکوع کرنے
 (سورة بقره ۵) والوں کے ساتھ) -

① আর তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও এবং বিনয়ীদের সহিত বিনয় প্রকাশ কর অথবা রুকুকারীদের সহিত রুকু কর।

(বাকারা : ৪৩)

ফায়দা : হযরত মাওলানা থানবী (রহঃ) লিখেন, ইসলামের শাখাগত বিষয়াবলীর মধ্যে আমল দুইভাগে বিভক্ত, জাহেরী আমল ও বাতেনী আমল। জাহেরী আমল দুই প্রকার—এক শারীরিক এবাদত, দ্বিতীয় আর্থিক এবাদত। এইভাবে তিনটি মৌলিক বিষয় হইল। আয়াতে এই তিনটি মৌলিক বিষয়ের প্রত্যেকটির একটি করিয়া শাখা উল্লেখ করা হইয়াছে। নামায হইল, শারীরিক এবাদত, যাকাত হইল, আর্থিক এবাদত, আর 'সুপু'-খুযু বা বিনয় হইল, বাতেনী এবাদতের অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু আভ্যন্তরীণ বিনয় হাসিলের ব্যাপারে বিনয়ী লোকদের সাহচর্যের বিরূপ

দখল রহিয়াছে, সেহেতু **مَعَ الرَّائِعِينَ** শব্দ বৃদ্ধি করা যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে।

(যয়ানুল কুরআন)

উপরোক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী রুকু দ্বারা খুশ'-খুযু বুঝানো হইয়াছে। এই হিসাবে আয়াত দ্বারা অনেকগুলি অতি সূক্ষ্ম বিষয় পরিষ্কার হইয়া যায়—

১. সমস্ত এবাদতের মধ্যে নামায সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ এবাদত। এইজন্যই ইহাকে সমস্ত এবাদতের আগে উল্লেখ করা হইয়াছে।

২. যাকাত দ্বিতীয় পর্যায়ে হওয়ার কারণে ইহাকে দ্বিতীয় নম্বরে উল্লেখ করা হইয়াছে।

৩. যাকাত হইল, ঐ দানের শোকরানাস্বরূপ। যেমন ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

৪. এবাদতসমূহের মধ্যে আর্থিক এবাদতের উপর শারীরিক এবাদতের অগ্রাধিকার রহিয়াছে। এইজন্য শারীরিক এবাদতকে প্রথমে এবং আর্থিক এবাদতকে দ্বিতীয় নম্বরে উল্লেখ করা হইয়াছে।

৫. এবাদতসমূহের মধ্যে বাতেনী অবস্থার উপর যাহেরী অবস্থার অগ্রাধিকার রহিয়াছে, এইজন্যই খুশ'-খুযু বা বিনয় ও নম্রতাকে তৃতীয় নম্বরে উল্লেখ করা হইয়াছে।

৬. বিনয় ও নম্রতা পয়সা করার ব্যাপারে বিনয়ী লোকদের সাহচর্য গ্রহণ করার বড় দখল রহিয়াছে। এই কারণেই মাশায়েখগণ ঝানকা প্রতিষ্ঠা করার বিষয়কে গুরুত্ব দিয়া থাকেন। কেননা, তাহাদের খেদমতে থাকার দ্বারা এই গুণ তাড়াতাড়ি পয়সা হয়।

৭. উক্ত তিন প্রকার এবাদতের মধ্যে মুসলমানদের মধ্য হইতে সাধারণ লোকদের আমল বিশেষ গুরুত্ব রাখে। এইজন্যই সর্বত্র বহুবচন ব্যবহার করা হইয়াছে। গভীর চিন্তা করিলে আরও সূক্ষ্ম বিষয় বুঝা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হইল, রুকু দ্বারা নামাযের রুকু বুঝানো হইয়াছে। আমাদের হযরত শাহ আবদুল আযীয (রহঃ) তফসীরে আযীযী কিতাবে যাহা লিখিয়াছেন উহার সারকথা হইল, নামায পাঠকারীদের সহিত নামায পড়। অর্থাৎ, জামাতের সহিত নামায আদায় কর। এই শব্দের ভিতরে যেন জামাতের প্রতি তাকিদ রহিয়াছে। আর জামাতের সহিত নামায আদায় করা শুধু ইসলামেরই বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য ধর্মে ইহা নাই। বিষয়টিকে রুকু শব্দ দ্বারা এইজন্য বর্ণনা করা হইয়াছে যে, পূর্ব হইতে ইহুদীদের আলোচনা চলিয়া আসিতেছে। আর তাহাদের নামাযের মধ্যে রুকু নাই। অতএব, আয়াতে যেন এইদিকে ইশারা করা হইয়াছে যে, নামায

মুসলমানদের মত পড়। (ভফসীরে আযীযী)

নামাযের ব্যাপারে আমাদের বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। 'ফাযায়েলে নামায' কিতাবে এই সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হইয়াছে। এমনকি ফেকাহবিদগণ জামাত ছাড়া নামায আদায়কে অসম্পূর্ণ আদায় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

② وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَفَسَا كُتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ (اعراف: ١٩)

اور میری رحمت (ایسی عام ہے کہ) چھوڑوں کو محیط ہے۔ پس اس کو ان لوگوں کے لئے (کامل ہے) جو تقویٰ میں ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہمارے آیتوں پر ایمان لگاتے ہیں۔

② আমার রহমত (এত ব্যাপক যে,) সকল বস্তুকে পরিবেষ্টন করিয়া আছে। অতএব, সেই রহমত তাহাদের জন্য (পরিপূর্ণরূপে বিশেষভাবে) লিখিয়া দিব, যাহারা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে এবং যাকাত প্রদান করে এবং যাহারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান আনয়ন করে।

(আব্রাফ : ১৫৬)

ফায়দা : হযরত হাসান ও কাতাদা (রহঃ) হইতে বর্ণিত যে, দুনিয়াতে প্রত্যেক ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা রহমতের মধ্যে शामिल রহিয়াছে ; নেককার হউক অথবা বদকার হউক, কিন্তু আখেরাতে উহা বিশেষভাবে মুস্তাকী লোকদের জন্যই রহিয়াছে। এক বেদুঈন মসজিদে আসিয়া নামায পড়িয়া দোয়া করিল, হে আল্লাহ! আমার এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি রহম করুন। আর আমাদের সহিত রহমতের মধ্যে অন্য কাহাকেও শরীক করিবেন না। ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার এই দোয়া শুনিয়া বলিলেন, তুমি আল্লাহ তায়ালা রহমতকে সংকীর্ণ করিয়াছ। আল্লাহ তায়ালা রহমতকে একশত ভাগ করিয়া এক ভাগ দুনিয়াতে অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং এই এক ভাগকে সারা দুনিয়ার মধ্যে বন্টন করিয়া দিয়াছেন। এই এক ভাগের কারণেই সমস্ত মাখলুক জিন, ইনসান, চতুষ্পদ জন্তু একে অন্যের প্রতি (সন্তান-সন্ততির প্রতি, নিজের প্রতি, অপরিচিতদের প্রতি) রহম করে। অবশিষ্ট নিরানব্বই ভাগ রহমত নিজের কাছে রাখিয়াছেন।

অন্য এক হাদীসে আছে, আল্লাহ তায়ালা রহমতের একশত ভাগ রহিয়াছে। তন্মধ্যে একটির কারণে মাখলুক একে অপরের প্রতি দয়া করে।

ইহারই কারণে জীবজন্তু উহাদের সন্তান-সন্ততির প্রতি রহম করে। আর নিরানব্বই ভাগ কিয়ামতের দিনের জন্য রাখিয়া দিয়াছেন। আরও বড় হাদীসে এই বিষয়টি বর্ণিত হইয়াছে। (দুররে মানসূর)

কত আনন্দের বিষয় যে, মায়েরা তাহাদের সন্তানদের কত স্নেহ করে যে, তাহাদের সামান্যতম কষ্টে ব্যাকুল হইয়া যায়। পিতা সন্তানকে কোন মুসীবতে দেখিলে অধির হইয়া যায়। প্রিয়জন, আত্মীয়-স্বজন, স্বামী-স্ত্রী পরিচিত-অপরিচিত কাহারো বিপদ দেখিলে অধির হইয়া যায়। এই সমস্ত কিছু ঐ রহমতেরই প্রভাব। যাহা আল্লাহ তায়ালা অন্তরসমূহে রাখিয়া দিয়াছেন। সারা দুনিয়ার সমস্ত রহমতকে একত্রিত করিলে সেই রহমতের ষতভাগের এক ভাগ হইবে। যাহার নিরানব্বই ভাগ আল্লাহ তায়ালা নিজের জন্য রাখিয়া দিয়াছেন। এত বড় মেহেরবান ও দয়ালু মাওলার হুকুম-আহকামের প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করা কত বড় নির্লক্ষ্যতার বিষয় ও কত বড় অপরাধ। কোন মা তাহার ছেলেকে অত্যন্ত ভালবাসে, স্নেহ করে, সেই ছেলে যদি মায়ের কথাকে অগ্রাহ্য করে, তবে মায়ের কি পরিমাণ কষ্ট হইবে। অথচ আল্লাহ তায়ালা স্নেহ ও ভালবাসার তুলনায় মায়ের স্নেহ কিছুই নয়। ইহা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা হুকুমের প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করার বিষয়টি অনুমান করা যাইতে পারে।

اور جو چیز تم اس غرض سے دوگے کہ سعد
بہ کر دوگوں کے مال میں بڑھوتری کا سبب
بہ یہ کہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا
جو کہ زکوٰۃ (وغیرہ) دوگے جس سے کہ
اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو تو ایسے لوگ
اپنے دیکھتے ہوئے مال کو اللہ تعالیٰ کے
پس بڑھاتے رہتے ہیں۔

③ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَيْدٍ
لِيُزْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ
ثَلَاثَ يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ
وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضِلُّونَ ۝
(سورة بقرہ ۲۷۳)

⑤ আর যে জিনিস তোমরা এই উদ্দেশ্যে প্রদান করিবে যে, উহা সুদ হইয়া মানুষের সম্পদ বর্ধনের কারণ হইবে, তবে তাহা আল্লাহ তায়ালা নিকট বর্ধিত হয় না। আর যাহা কিছু তোমরা যাকাত (ইত্যাদি) প্রদান করিবে, যদ্বারা তোমাদের উদ্দেশ্য আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট হয়, এইরূপ লোকেরাই নিজদের প্রদত্ত সম্পদ আল্লাহ তায়ালা নিকট বৃদ্ধি করিতে থাকে। (রোম : ৩৯)

ফায়সা : মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, বর্ধিত আকারে পাওয়ার উদ্দেশ্যে সম্পদ দেওয়ার মধ্যে ঐ সমস্ত সম্পদও शामिल, যাহা এই নিয়তে দেওয়া হয় যে, উহা হইতে উত্তম পাওয়া যাইবে ; চাই দুনিয়াতে উত্তম বা বেশী পাওয়ার আশায় খরচ করুক, চাই আখেরাতে বেশী পাওয়ার আশায় খরচ করুক। সবই বর্ধিত আকারে পাওয়ার আশায় খরচ করার মধ্যে शामिल। এইজন্যই সুদ এবং যাকাতকে একসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন।

অন্য এক হাদীসে হযরত মুজাহিদ (রহঃ) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে, বর্ধিত আকারে পাওয়ার আশায় খরচ করার দ্বারা হাদিয়া বুকানো হইয়াছে। (দুররে মানসুর)

অর্থাৎ, কাহাকেও এই উদ্দেশ্যে হাদিয়া ইত্যাদি দেওয়া যে, সে উহার বিনিময়ে আরও বেশী দিবে। যেমন, কাহাকেও এই উদ্দেশ্যে দাওয়াত করা যে, সে পরবর্তীতে এই পরিমাণ নজরানা দিবে, যাহা তাহার দাওয়াতে খরচের পরিমাণ হইতে বেশী হইবে। সেলামী ইত্যাদি প্রথাও ইহার অন্তর্ভুক্ত। কেননা, এই সবকিছু বেশী পাওয়ার আশায় খরচ করা হয়। এই সমস্ত বিষয়ের জন্য একই নীতি যে, আল্লাহ তায়ালার নিকট কেবল ঐ জিনিসই বর্ধিত হয়, যাহা তাহার সন্তুষ্টির জন্য খরচ করা হয়।

হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রহঃ) বলেন, দুনিয়াতে বিনিময় পাওয়ার নিয়তে যে কোন হাদিয়া দেওয়া হয়, আখেরাতে উহার সওয়াব পাওয়া যায় না। কারণ, যখন আখেরাতের উদ্দেশ্যে দেওয়াই হয় নাই, তখন সেখানে কেন পাওয়া যাইবে?

হযরত আবু কুরায়ি (রহঃ) বলেন, কোন ব্যক্তি কাহাকেও এই নিয়তে দিল যে, সে ইহার বিনিময়ে আরও বেশী দিবে ; এই খরচ আল্লাহ তায়ালার নিকট কোনরূপেই বৃদ্ধি পাইবে না। আর যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহর ওয়াস্তে দিল, অর্থাৎ যাহাকে দিয়াছে তাহার নিকট কোনরূপ প্রতিদান বা বিনিময় আশা করে না ; ইহাই ঐ সম্পদ যাহা আল্লাহ তায়ালার নিকট বৃদ্ধি পাইতে থাকে। (দুররে মানসুর)

সুতরাং যাহারা কাহাকেও যাকাত ইত্যাদির মাল দান করিয়া এই আশায় থাকে যে, সে সবসময় কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিবে, তাহারা এই বদনিয়তের কারণে নিজের সওয়াব নিজেই কম করিয়া দেয়। সর্বপ্রথম পরিচ্ছেদে চৌত্রিশ নম্বর আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে : **إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَ لَا شُكُورًا** (অর্থাৎ, আমরা তোমাদিগকে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই খাদ্য দান করিতেছি। না আমরা তোমাদের নিকট ইহার প্রতিদান চাই, আর না ইহার জন্য কৃতজ্ঞতা)।

إِلَّا لِيُطَلِّبَ مَا بَقِيَ مِنْ
أَمْوَالِكُمْ وَإِنَّمَا لَكُمْ مِنَ
الْمَوَارِيثِ وَذَكَرَ كَلِمَةً
يَتَكَلَّمُونَ بِهَا بَعْدَكُمْ فَقَالَ
فَعَبَّرَ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ
لَهُ أَلَا أُنَبِّئُكَ بِخَيْرٍ
مِمَّا يَكْفُرُ الْمَرْءُ الْمَرْأَةَ
الصَّالِحَةَ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا
سَرَّتُهُ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ
وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ
(رواه أبو داود وكذا في المشكاة)

হুসুর্নে আরশাদ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے
نکوۃ اسی سے فرض کی ہے تاکہ نیکو مال کو
حمہ اور طیب بنامہ اور میراث ترک
اسی وجہ سے فرض ہوئی کہ مال بعد میں
باقی رہے حضرت عمرؓ نے خوشی میں اشک
فرمایا۔ پھر حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ میں بہتر
چیز خداد کے طور پر رکھنے کی بتاؤں تو وہ
حور ہے جو نیک ہو کہ جب خاندان اس کو
دیکھے تو اس کی طبیعت خوش ہو جائے اور
جب اس کو کوئی حکم کیے تو وہ اطاعت کرے
اور جب وہ کہیں چلا جائے تو وہ حور
(خاندان کی متروک چیزوں کی) حفاظت کرے (جس میں برکت بھی داخل ہے)۔

⑤ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, যখন কুরআন পাকে এই
আয়াত نَازِلٌ مِنَ السَّمَاءِ فِي يَوْمٍ ذِي قُرْبَىٰ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
কেরামের নিকট ইহা অত্যন্ত ভারী মনে হইল। হযরত ওমর (রাযিঃ)
বলিলেন, আমি এই সমস্যার সমাধান করিব, এই বলিয়া তিনি হযুর
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলেন এবং আরজ
করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই আয়াত তো লোকদের নিকট অত্যন্ত ভারী
মনে হইতেছে। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন,
আল্লাহ তায়ালা অবশিষ্ট সম্পদকে উৎকৃষ্ট ও পবিত্র করিবার জন্যই যাকাত
ফরজ করিয়াছেন। আর মিরাস তো এইজন্যই ফরজ হইয়াছে, যেন সম্পদ
পরবর্তী কালেও বাকী থাকে। হযরত ওমর (রাযিঃ) আনন্দে আল্লাহ
আকবার বলিলেন। অতঃপর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
এরশাদ করিলেন, আমি কি সঞ্চয় করিয়া রাখার মত সর্বোত্তম বস্তু বলিয়া
দিব? উহা হইল, ঐ নেক স্ত্রী, যাহাকে দেখিলে স্বামী খুলী হয়। আর স্বামী
যখন তাহাকে কোন হুকুম করে, সে তাহা পালন করে। যখন স্বামী
কোথাও চলিয়া যায়, তখন সে (স্বামীর রাখিয়া যাওয়া জিনিসপত্র)

হেফাজত করে। (ইহাতে সতীত্বের হেফাজতও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে।)

(মিশকাত : আবু দাউদ)

ফায়দা : দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে পাঁচ নম্বরে এই আয়াতের তরজমা উল্লেখ করা হইয়াছে। এই আয়াতের বাহ্যিক অর্থে বুঝা যায় যে, যে কোন সৎকর্ম, চাই উহা যত প্রয়োজনেই সৎকর্ম করা হউক না কেন কঠিন শাস্তির কারণ হইবে। এইজন্যই সাহাবায়ে কেরামের নিকট ভারী মনে হইয়াছে। কারণ, আল্লাহ তায়ালা ও তাহার পাক রাসূলের হুকুমের উপর আমল করা তো ছিল সাহাবায়ে কেরামের প্রাণ। অথচ কখনও প্রয়োজনে টাকা-পয়সা জমা করিয়া রাখিতে হয়। এইজন্য তাহাদের নিকট ইহা ভারী মনে হইতেছিল।

হযরত ওমর (রাযিঃ) হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিয়া ইহার সমাধান করিলেন। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাস্তুনা দিলেন যে, যাকাত এইজন্যই ফরজ হইয়াছে যে, উহা আদায় করার পর অবশিষ্ট সম্পদ পবিত্র হইয়া যায়। ইহা দ্বারা সম্পদ জমা রাখার বৈধতা প্রমাণ হইয়া গেল। কেননা, যাকাত তো তখনই ওয়াজিব হইবে যখন পুরা বছর সম্পদ মণ্ডলুদ থাকিবে। যদি সম্পদ রাখা জায়েয না হয়, যাকাত কেন ওয়াজিব হইবে? ইহা ছাড়াও উক্ত হাদীস দ্বারা যাকাতের কত বড় ফযীলত জানা গেল যে, যাকাত আদায় করিয়া সওয়াব তো ভিন্নভাবে আছেই। উপরন্তু, অবশিষ্ট সম্পদও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র হইয়া যায়। স্বয়ং কুরআন পাকেও এই দিকে ইশারা রহিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন : **خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً** : **تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا** الآية অর্থাৎ, আপনি তাহাদের সম্পদ হইতে সদকা সংগ্রহ করুন, যাহা দ্বারা আপনি তাহাদিগকে (গোনাহের অপবিত্রতা হইতে) পাক-সাফ করিয়া দিবেন। (তওবা : ১০৩)

এক হাদীসে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা তোমাদের সম্পদের যাকাত আদায় কর, কেননা, ইহা তোমাদের পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম। (কানয)

অন্য এক হাদীসে আছে, যাকাত আদায় কর, কেননা, উহা পবিত্র করে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে (উহা দ্বারা) পবিত্র করিয়া দিবেন।

অন্য এক হাদীসে আছে, তোমাদের সম্পদকে যাকাতের দ্বারা (অপবিত্রতা অথবা ধ্বংস হইতে) নিরাপদ কর এবং সদকা দ্বারা তোমাদের রুগীদের চিকিৎসা কর। আর বালা-মুসীবত দূর করার জন্য দোয়া প্রস্তুত কর। (কানয)

অপর এক হাদীসে আছে, যাকাতের দ্বারা তোমরা তোমাদের সম্পদের হেফাজত কর। সদকার দ্বারা রোগীদের চিকিৎসা কর, বালা-মুসীবত দূর হওয়ার জন্য দোয়া ও বিনয়ের সহিত সাহায্য চাও। (কানয)

অতঃপর হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরোক্ত হাদীসে সম্পদ জমা রাখার বৈধতা সম্পর্কে আরেকটি প্রশ্নের প্রশ্ন করিলেন যে, সম্পদ জমা রাখার বৈধতার জন্যই মিরাসের হুকুম দেওয়া হইয়াছে। যদি সম্পদ জমা রাখা বৈধ না হয়, তবে কোন জিনিসের মিরাস বন্টন হইবে? ইহার পর হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করিয়াছেন যে, বৈধ হওয়া ভিন্ন কথা; কিন্তু সম্পদ জমা করিয়া রাখার বস্তু নয় বরং উহাকে তো খরচই করিয়া দেওয়া চাই। সঞ্চয় করিয়া রাখার মত বস্তু হইল, নেক স্ত্রী।

কোন কোন বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, সাহাবায়ে কেলাম এই ব্যাপারে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। যাহার উত্তরে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহা এরশাদ করিয়াছেন।

হযরত সাওবান (রাযিঃ) বলেন, যখন এই আয়াত **وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ** **الذِّمَّةَ** নাযিল হইল, তখন আমরা হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সফরে ছিলাম। কোন কোন সাহাবী আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি জানিতে পারিতাম যে, কি জিনিস জমা করিয়া রাখা যায়? তখন হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সর্বোত্তম জিনিস হইল, যিকিরকারী জিহ্বা, শোকরকারী দিল, আর দ্বীনের কাছে সাহায্যকারিনী নেক স্ত্রী। (দুররে মানসুর)

এক হাদীসে আছে, যখন উক্ত আয়াত নাযিল হইল, তখন হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সোনারপার সর্বনাশ হউক; কিরূপ খারাপ জিনিস! হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহা তিনবার বলিলেন। অতঃপর সাহাবায়ে কেলাম জিজ্ঞাসা করিলেন, জমা করিয়া রাখার মত উত্তম জিনিস কি? হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যেই জবান আল্লাহর যিকির করে, যেই দিল আল্লাহকে ভয় করে, আর ঐ নেক স্ত্রী, যে দ্বীনের কাছে সহায়ক ও সাহায্যকারিনী হয়। (তফসীরে কবীর)

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা কত পবিত্র ও কত সারগর্ভ। সম্পদ জমা করার বৈধতাও বলিয়া দিলেন আবার জমা করিয়া রাখা যে পছন্দনীয় নয়, তাহাও বলিয়া দিলেন। আবার দুনিয়াতে এমন সুখময় জীবন বাহা আখেরাতে কাছে আসিবে উহাও বলিয়া দিলেন যে,

যিকিরকারী জ্বান, শোকরকারী দিল। আর দুনিয়াতে উপভোগের সেই বস্তুর কথাও বলিয়া দিলেন, যাহা শান্তিতে জীবন যাপনের ওসিলা হইবে এবং উহাতে ঐ সমস্ত ফেতনা হইবে না, যাহা সম্পদের মধ্যে রহিয়াছে। বরং উহা দ্বারা সর্বপ্রকার সুখ-শান্তি লাভ হইবে, আর উহা হইল, স্ত্রী। তবে শর্ত হইল, যদি নেক বীনদার ও অনুগত হয় এবং বুদ্ধিমতী হয়, যে স্বামীর মাল-আসবাবের হেফাজত করে।

② عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الزَّكَاةُ قَطْرَةٌ الْإِسْلَامِ - بِإِسْنَادٍ طَوِيلٍ -

حُضْرَةُ اَللّٰہُ سَلَّمَ عَلٰی اللّٰہِ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا ارشاد ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا رستہ ہے۔

(رواہ الطبرانی فی الاوسط الکبیر حکذا فی الترغیب)

② হযরত সাঈদুল্লাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যাকাত ইসলামের (অনেক বড় মজবুত) সেতু। (তারগীব : তাবারানী আওসাত-কবীর)

ফায়দা : কোন জায়গায় যাওয়ার জন্য যেমন মজবুত সেতু সহজ একটি উপায়, তদ্রূপ ইসলামের হাকীকত ও মূল পর্যন্ত সহজে পৌঁছবার জন্য অথবা আল্লাহ তায়ালায় মহান দরবারে পৌঁছবার জন্য যাকাত হইল, উপায় এবং পথ।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ)এর পৌত্র আবদুল আযীয ইবনে উমায়ের (রহঃ) বলেন, নামায তোমাকে অর্ধেক পথ পর্যন্ত পৌছাইয়া দিবে, রোযা বাদশাহের দরজা পর্যন্ত পৌছাইয়া দিবে, আর সদকা তোমাকে বাদশাহর নিকট পৌছাইয়া দিবে। (ইতহাক)

প্রখ্যাত বুয়ুর্গ ও সুফী হযরত শাকীক বলখী (রহঃ)এর কথায়ও সেতুর সহিত একটি সুন্দর সম্পর্ক আন্দাজ করা যায়। তিনি বলেন, আমি পাঁচটি জিনিস তালাশ করিয়া পাঁচ জায়গায় পাইয়াছি—রুজির বরকত চাশতের নামাযে পাইয়াছি, কবরের আলো তাহাজ্জুদ নামাযে পাইয়াছি, মুনকার নকীরের জওয়াব কুরআন তেলাওয়াতের মধ্যে পাইয়াছি, পুলসিরাতের উপর দিয়া সহজে অতিক্রম করা রোযা ও সদকার মধ্যে পাইয়াছি এবং আরশের ছায়া নির্জনতার মধ্যে পাইয়াছি। (ফাযায়েলে নামায)

③ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَأْتِيَكَ إِنْ أَتَى الرَّجُلُ زَكَاةً مَالَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

حُضْرَةُ اَللّٰہُ سَلَّمَ عَلٰی اللّٰہِ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا ارشاد ہے کہ جو شخص مال کی زکوٰۃ ادا کرے تو اس مال کی شراؤس سے

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَاءَ بِهِ -
أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَقَدْ هَبَّ حَنْتَهُ شَرْعًا - (بهاء الطبرانی فی الاسطوابین
خزیمہ فی مصیحة والحاکم مختصراً وقال مسیح علی شرط مسلم
کذا فی الترغیب)

③ হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন কোন ব্যক্তি মালের যাকাত আদায় করিয়া দেয়, তখন সেই মালের অনিষ্টতা উহা হইতে দূর হইয়া যায়।

(তারগীব : তাবারানী আওসাত, ইবনে ধুইইমা, হাকেম)

ফায়দা : কোন কোন বর্ণনায় এই বিষয়টি এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, যখন তুমি সম্পদের যাকাত আদায় করিয়া দিয়াছ, তখন তুমি ঐ সম্পদের অনিষ্টতাকে দূর করিয়া দিয়াছ। (কানয)

অর্থাৎ, সম্পদ বহুবিধ অনিষ্টের কারণ হয়। কিন্তু যদি উহার যাকাত গুরুত্বসহকারে আদায় হইতে থাকে, তবে উহার অনিষ্ট হইতে হেফাজত হয়। আখেরাতের হিসাবে তো স্পষ্ট যে, ঐ সম্পদের কারণে আযাব হয় না আর দুনিয়ার হিসাবে এইজন্য হেফাজত হয় যে, যাকাত আদায় করা সম্পদের হেফাজতের কারণ। যেমন, পরবর্তী হাদীসে আসিতেছে। আর যদি যাকাত আদায় না করা হয়, তবে সম্পদ ধ্বংস হইয়া যায়। যেমন, পরবর্তী পরিচ্ছেদে ছয় নম্বর হাদীসে আসিতেছে।

④ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ وَذَاوُدًا مَرَّهَا كُنَّ بِالْمَدْفُونِ وَاسْتَقْبَلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالذُّعَاءِ وَالْقَضْرِ (رواه ابوداؤد فی المراسیل و
تفسيره أقدم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما
يرشاد به كراهية ما رواه كزكة كذا
محمود بن داود وأبو داود و
سواء علاج كذا وأبو داود و
مروان كذا وأبو داود و
عاجزى كذا استقبل كذا

رواه الطبرانی والبيهقي وغيرهما عن جماعة من الصحابة مرفوعاً
متصلاً والمرسل أشبه كذا فی الترغیب)

⑤ হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের সম্পদকে যাকাতের মাধ্যমে হেফাজত কর, তোমাদের

রোগীদেরকে সদকার মাধ্যমে চিকিৎসা কর এবং দোয়া ও আল্লাহ তায়ালায়
সম্মুখে বিনয়ের দ্বারা বালা-মুসীবতের ঢেউকে স্বাগত জানাও।

(ভারগীৰ : তাবারানী, বায়হাকী)

ফায়দা : হাদীসে বর্ণিত 'তাহসীন' শব্দের অর্থ, নিজের চারিদিকে দুর্গ
তৈরী করা অর্থাৎ, মানুষ যেমন দুর্গের ভিতর বসিয়া গেলে চতুর্দিক হইতে
নিরাপদ হইয়া যায়, তদ্রূপ যাকাত আদায় করা ঐ সম্পদকে নিরাপদ
করিয়া দেয়, যেন উহা দুর্গের ভিতর সংরক্ষিত হইয়া গেল।

এক হাদীসে আছে, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবা
শরীফের হাতীয়ে বসিয়াছিলেন। এক ব্যক্তি বলিল, অমুক লোকদের বড়
ক্ষতি হইয়া গিয়াছে ; সমুদ্রের ঢেউ তাহাদের ধনসম্পদ ধ্বংস করিয়া
দিয়াছে। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, জঙ্গলে বা
সমুদ্রে, যেখানেই কোন সম্পদ ধ্বংস হয়, উহা যাকাত না দেওয়ার কারণে
হয়। যাকাত আদায়ের মাধ্যমে তোমাদের সম্পদের হেফাজত কর, সদকার
মাধ্যমে তোমাদের রোগীদের চিকিৎসা কর এবং দোয়ার মাধ্যমে
বালা-মুসীবতকে দূর কর। দোয়া ঐ বালা-মুসীবতকেও দূর করিয়া দেয়,
যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, আর ঐ বালা-মুসীবতকেও বাধা দান করে যাহা
এখনও অবতীর্ণ হয় নাই। যখন আল্লাহ তায়ালা কোন জাতির অস্তিত্ব
বাকী রাখিতে চাহেন অথবা তাহাদের উন্নতি চাহেন, তখন ঐ জাতির
মধ্যে গোনাহ হইতে পবিত্রতা ও দানশীলতা দান করেন। আর যখন কোন
জাতিকে ধ্বংস করিতে চাহেন, তখন তাহাদের মধ্যে খেয়ানত পয়দা
করিয়া দেন। (কানয)

حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ جب ہماری
جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں حاضر ہوئی تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ
تمہارے اسلام کی تکمیل اس میں ہے کہ
ماوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔

⑤ رُوِيَ عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ سَأَلَ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ تَمَامَ إِسْلَامِكُمْ
أَنْ تُؤَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ۔
(رواه البزار كذا في الترغيب)

⑤ হযরত আলকামা (রাযিঃ) বলেন, যখন আমাদের জামাত হযূর
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইল, তখন তিনি
বলিলেন, তোমাদের ইসলামের পূর্ণতা সম্পদের যাকাত আদায় করার

بِهَا نَفْسٌ رَأْفَةٌ عَلَيْهِمْ كُلَّ
 عَامٍ وَلَمْ يُعْطِ الْهَرَمَةَ وَلَا الذَّبْدَ
 وَلَا الْمَرِيضَةَ وَلَا الشَّرْطَ الْبَشِيئَةَ
 وَلَكِنْ مِنْ وَسْطِ أَمْوَالِكُمْ فَإِنَّ
 اللَّهَ نَمَّ يَسْأَلُكُمْ نَعْيَكُمْ وَ
 وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ بِشَيْءٍ ۝

(জান্নতুল কাক্বাত মিন) বুন্না জান্নত
 খারশী জান্নত, যার মিন্স বা গুলিয়া কাম
 জান্নত, বসে, বসে, মিন্স জান্নত
 অল্লহ জল সফা, কাক্বাত মিন্স জান্নত
 মাল নহীন চাহতে, মিন্স মাল কাম
 কাম নহীন ফরাত্তে-

(রোহা আবুদাউদ কুতাবু তরখিব)

৬ ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে
 ব্যক্তি তিনটি কাজ করিবে, সে ঈমানের স্বাদ পাইবে—১. শুধুমাত্র আল্লাহ
 তায়ালার এবাদত করে। ২. উত্তমরূপে জানিয়া লয় যে, আল্লাহ ব্যতীত
 কোন মাবুদ নাই। ৩. প্রতি বছর খুশী মনে যাকাত আদায় করে (এবং
 ইহাকে বোঝা মনে না করে), (পশুর যাকাতের ক্ষেত্রে) উহাতে বৃদ্ধ অথবা
 ঝুঁকিলি পাঁচড়াওয়ালা পশু অথবা রোগাক্রান্ত বা নিকট পর্যায়ে পশু
 প্রদান না করে; বরং মধ্যম শ্রেণীর পশু দেয়। আল্লাহ তায়ালার যাকাতের
 মধ্যে তোমাদের উৎকৃষ্ট সম্পদ চান না, কিন্তু নিকট সম্পদেরও হুকুম দেন
 না। (তারগীব : আবু দাউদ)

ফায়দা : এই হাদীসে যদিও পশুর যাকাতের বিষয়টি আলোচনা
 হইয়াছে, কিন্তু সর্বপ্রকার যাকাতেরই মূলনীতি এই যে, উহাতে না উৎকৃষ্ট
 সম্পদ প্রদান করা ওয়াজিব আর না নিকট সম্পদ দেওয়া জায়েয, বরং
 আসল হইল, মধ্যম পর্যায়ে সম্পদ আদায় করা। অবশ্য, যদি কেহ
 সম্ভব হইলে সওয়াব হাসিল করার জন্য এবং আল্লাহ তায়ালাকে রাস্তা
 করার জন্য উৎকৃষ্ট সম্পদ দান করে, তবে উহা তাহার সৌভাগ্য। এই
 ব্যাপারে সাহায্যে কেরামের অবস্থা গভীরভাবে দেখিতে হইবে। তাহাদের
 কর্মপদ্ধতি পর্যালোচনা করিতে হইবে। নমুনাস্বরূপ দুইটি ঘটনা এখানে
 উল্লেখ করিতেছি।

মুসলিম ইবনে শু'বা (রহঃ) বলেন, নাফে' ইবনে আলকামা আমার
 পিতাকে আমাদের গোত্রের সর্দার বানাইয়া দিয়াছিলেন। একবার তিনি
 আমার পিতাকে সমস্ত গোত্রের যাকাত একত্রিত করিয়া লইয়া আসার
 জন্য হুকুম দিলেন। আমার পিতা আমাকে সকলের নিকট হইতে
 যাকাতের মাল উসুল করিয়া একত্রিত করার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। আমি

একজন প্রবীণ লোকের নিকট তাহার যাকাত সংগ্রহ করার জন্য গেলাম। তাহার নাম ছিল সির (রাযিঃ)। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাতিজা! কি ধরনের মাল লইবে? আমি বলিলাম, সবচেয়ে উত্তম মাল লইব। এমনকি বকরীর স্তনও দেখিব যে, উহা বড় না ছোট। অর্থাৎ, একেকটি জিনিস দেখিয়া সর্বোৎকৃষ্ট মাল বাছাই করিয়া লইব। তিনি বলিলেন, প্রথমে আমি তোমাকে একটি হাদীস শুনাইব (যাহাতে তুমি মাসআলা জানিতে পার, অতঃপর তোমার ইচ্ছানুযায়ী নিও)। আমি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এইখানেই থাকিতাম। আমার নিকট হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হইতে দুইজন লোক দূত হিসাবে আসিল। তাহারা বলিল, আমাদেরকে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার যাকাত নেওয়ার জন্য পাঠাইয়াছেন। আমি তাহাদেরকে আমার বকরীর পাল দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহাতে কি পরিমাণ যাকাত ওয়াজিব হইয়াছে? তাহারা গণনা করিয়া বলিল, একটি বকরী ওয়াজিব হইয়াছে। আমি অত্যন্ত উৎকৃষ্ট একটি চর্বিবৃন্ত দুগ্ধবতী বকরী যাকাত হিসাবে দেওয়ার জন্য বাহির করিলাম। তাহারা দেখিয়া বলিল, এই বকরীর বাচ্চা রহিয়াছে। এই ধরনের বকরী গ্রহণ করিতে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হইতে আমাদের প্রতি অনুমতি নাই। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তবে কেমন বকরী গ্রহণ করিবে? তাহারা দুইজন বলিল, ছয় মাসের একটি মেষ অথবা এক বছর বয়সের একটি বকরী। আমি একটি ছয় মাসের মেষ শাবক বাহির করিয়া তাহাদেরকে দিয়া দিলাম। তাহারা লইয়া গেল। (আবু দাউদ)

উক্ত ঘটনায় হযরত সির (রাযিঃ)এর ইচ্ছা প্রথমে ইহাই ছিল যে, সমস্ত বকরীর মধ্যে যাহা সর্বোৎকৃষ্ট উহা আদায় করিবেন। আর ইবনে নাক্ফেকে এই ঘটনা সম্বন্ধে এইজন্য শুনাইয়াছেন, যাহাতে তাহার মাসআলা জানা হইয়া যায়। অতঃপর এই ঘটনা দ্বারা ইহাও জানা গেল যে, তিনি যাকাতের ব্যাপারে তাহার সর্বোৎকৃষ্ট মাল প্রদান করিতে চান।

দ্বিতীয় ঘটনা—হযরত উবাই ইবনে কাব (রাযিঃ) বলেন, আমাকে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার যাকাত উসুল করার জন্য পাঠাইলেন। আমি এক ব্যক্তির নিকট গেলাম। যখন সে তাহার সমস্ত উট আমার সম্মুখে হাযির করিল, তখন আমি দেখিলাম, উহার মধ্যে এক বছর বয়সের একটি উটনী ওয়াজিব হয়। আমি তাহাকে বলিলাম, এক বছর বয়সের একটি উটনী প্রদান কর। সে বলিল, এক বছরের উটনী কি কাজে আসিবে? উহা সওয়ারীর কাজেও আসিবে না, দুধও দিবে না, এই

বলিয়া সে একটি উৎকৃষ্টমানের মোটাতাজা বড় উটনী বাহির করিয়া, বলিল, ইহা লইয়া যাও। আমি বলিলাম, আমি তো ইহা গ্রহণ করিতে পারি না। তবে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই সফরে আছেন এবং তোমার নিকটবর্তী স্থানেই তিনি অবস্থান করিতেছেন। তোমার যদি ইচ্ছা হয়, তবে সরাসরি হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে যাইয়া পেশ কর। যদি হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দেন, তবে আমি গ্রহণ করিব। লোকটি তাহার উটনী লইয়া আমার সঙ্গে চলিল। যখন আমরা হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পৌঁছিলাম, তখন সে আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার দূত আমার নিকট যাকাত উসূল করার জন্য আসিয়াছিল। আল্লাহর কসম! এই সৌভাগ্য ইতিপূর্বে আমার আর কখনও হয় নাই যে, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে অথবা হযূরের কোন দূত কখনও আমার নিকট সম্পদ চাহিয়াছে। আমি আপনার দূতের সম্মুখে আমার উটগুলি হাজির করিলাম। তিনি উহা দেখিয়া বলিলেন, ইহার মধ্যে এক বছরের একটি উটনী ওয়াজিব হয়। হযূর! এক বছরের উটনী না দুধ দিতে পারিবে, না সওয়ারীর কাজে আসিবে, এইজন্য আমি একটি উৎকৃষ্টমানের উটনী তাহার খেদমতে পেশ করিয়াছিলাম। যাহা আমি সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি। তিনি উহা কবুল করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। এইজন্য আমি আপনার খেদমতে লইয়া আসিয়াছি। ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহাকে কবুল করিয়াই লউন। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার উপর ওয়াজিব তো উহাই, যাহা সে বলিয়াছে। তুমি যদি নফল হিসাবে বেশী বয়সের উৎকৃষ্ট উটনী দাও, তবে আল্লাহ তায়ালা তোমাকে উহার বিনিময় দান করিবেন। তিনি আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এইজন্যই সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি, ইহাকে কবুল করুন। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহা গ্রহণ করার অনুমতি দিলেন। (আবু দাউদ)

এই সমস্ত হযরতগণের অন্তরে যাকাত আদায়ের ব্যাপারে এই ছিল আগ্রহ আর উদ্দীপনা। তাহারা এইজন্য গর্ববোধ করিতেন এবং ইহাকে সম্মানের জিনিস মনে করিতেন যে, আল্লাহ ও তাহার রাসূলের দূত আজ আমার নিকট আসিয়াছে, আর আমি ইহার উপযুক্ত হইয়াছি। তাহারা ইহাকে জরিমানা বা কষ্ট মনে করিতেন না। বরং নিজের প্রয়োজন, নিজের স্বার্থ এবং নিজের কাজ মনে করিতেন। আমরা উৎকৃষ্ট সম্পদকে নিজের কাজে আসিবে মনে করিয়া রাখিয়া দেওয়ার চেষ্টা করি। আর

তাহারা নিজের কাছে আসা উহাকেই মনে করিতেন, যাহা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিয়া দিয়াছেন।

হযরত আবু যর (রাযিঃ)এর ঘটনা, প্রথম পরিচ্ছেদের এগার নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত হইয়াছে—যখন বনি সুলাইম গোত্রের এক ব্যক্তি তাহার খেদমতে থাকিবার দরখাস্ত করিল, তখন তিনি বলিলেন, এই শর্তে আমার নিকট থাকিতে পার, যখন আমি কাহাকেও কোন জিনিস দিতে বলিব, তখন আমার মাল হইতে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট জিনিসটি বাছাই করিয়া দিতে হইবে। বিস্তারিত ঘটনা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। পরবর্তী পরিচ্ছেদে দশ নম্বর হাদীসে এই বিষয় বিস্তারিতভাবে আসিতেছে যে, যাকাত ও সদকার মধ্যে বিশেষ করিয়া যাকাতের মধ্যে নিকৃষ্ট মাল কখনও দেওয়া চাই না।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أُدِّيَتْ الزَّكَاةُ فَقَدْ كُفِّيتَ مَا عَلَيْكَ وَمَنْ جَمَعَ مَا لَا حَرَامًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ وَكَانَ إِصْرًا عَلَيْهِ (رواه ابن حبان وابن عزيمة في صحيحهما والحاكم وقال صحيح الإسناد كذا في الترغيب)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب زکوٰۃ کی رقمہ آما کہئے تو جو حق (واجب) تجھ پر تھا وہ تو ادا ہو گیا (آگے صرف زوال کا درجہ ہے) اور جو شخص حرام طریقہ (سوء) ریشوت وغیرہ سے مال جمع کیے مگر کہے، اس کو اس صدقہ کا کوئی ثواب نہیں ہے، بلکہ اس حرام کمائی کا وبال اُس پر ہے۔

৯) হযরত সালাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন তুমি মালের যাকাত আদায় করিয়া দিলে, তখন যে (ওয়াজিব) হক তোমার উপর ছিল উহা আদায় হইয়া গেল (অতঃপর শুধু নফলের পর্যায় রহিয়া গেল)। আর যে ব্যক্তি হারাম পন্থায় (সুদ ঘুষ ইত্যাদির) মাধ্যমে সম্পদ জমা করিয়া সদকা করে, সে ঐ সদকার কোন সওয়াব পাইবে না, বরং তাহার উপর হারাম উপার্জনের আঘাব হইবে।

(তারগীব : ইবনে হিব্বান, ইবনে খুযাইমাহ, হাকেম)

ফায়দা : উক্ত হাদীসে দুইটি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, প্রথম তো এই যে, আদায় করা ওয়াজিবের পর্যায়ে হইল, শুধু যাকাত। ইহা ছাড়া বাকী সবই সদকা ও নফলের পর্যায়ে।

অন্য এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করিল, সে ঐ হুকুম আদায় করিয়া দিল, যাহা তাহার উপর ওয়াজিব ছিল। ইহার অতিরিক্ত যাহা আদায় করিবে উহা তাহার জন্য উত্তম হইবে। (কানয)

হযরত জিমাম ইবনে সালাবা (রাযিঃ) এর বিখ্যাত হাদীস যাহা বুখারী মুসলিম সহ সমস্ত কিতাবে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ইসলাম ও উহার রুকনসমূহ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করিয়াছেন। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিস্তারিতভাবে সমস্ত বিষয় বলিয়া দিয়াছেন। উক্ত হাদীসে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য রুকনের সঙ্গে যাকাতকেও উল্লেখ করিয়াছেন। হযরত জিমাম (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, যাকাত ছাড়া আর কোন জিনিস কি আমার উপর ওয়াজিব রহিয়াছে? হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, না, অবশ্য যদি তুমি নফল হিসাবে আদায় কর, তবে তোমার ইচ্ছা।

হযরত ওমর (রাযিঃ) এর যমানায় এক ব্যক্তি একটি বাড়ী বিক্রয় করিল। হযরত ওমর (রাযিঃ) তাহাকে বলিলেন, ইহার মূল্য সাবধানতার সহিত নিজ ঘরে গর্ত খুঁড়িয়া উহার মধ্যে রাখিয়া দিও। লোকটি আরজ করিল, এইরূপ করিলে উহা কি সম্পদ জমা করিয়া রাখার অন্তর্ভুক্ত হইবে না? হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, যে সম্পদের যাকাত আদায় করা হয়, উহা সম্পদ জমা করিয়া রাখার অন্তর্ভুক্ত হয় না।

হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) বলেন, আমি যদি সম্পদের যাকাত আদায় করিতে থাকি এবং উহাতে আল্লাহর আনুগত্য করিতে থাকি, তবে আমার নিকট উদ্ভদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ থাকিলেও কোন পরওয়া করি না। (দুররে মানসূর)

এই ধরনের অনেক রেওয়াজাত হাদীসের কিতাবসমূহে মওজুদ রহিয়াছে। এই সমস্ত রেওয়াজাতের উপর ভিত্তি করিয়া অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম এবং চার ইমামের অতিমত ইহাই যে, সম্পদের মধ্যে সম্পদ হিসাবে যাকাত ছাড়া আর কোন কিছু ওয়াজিব নয়। অবশ্য অন্য কোন কারণে যদি ওয়াজিব হয়, তবে তাহা ভিন্ন কথা। যেমন, স্ত্রী ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের ডরগ-পোষণ ও এই ধরনের অন্যান্য খরচাদি। অথবা কোন অসহায় ব্যক্তির প্রয়োজন পূরা করা, যেমন, কোন ব্যক্তি ক্ষুধা অথবা পিপাসার কারণে মরণাপন্ন হইয়া গিয়াছে, তাহাকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করা প্রভৃতি কেসায়া।

ইমাম গায়যালী (রহঃ) এহইয়াউল উলূম কিতাবে লিখেন, কোন কোন

তাবেয়ী যেমন, হযরত নাখয়ী, শাবী, আতা ও মুজাহিদ (রহঃ)এর মতে সম্পদের মধ্যে যাকাত ছাড়া আরো কিছু হক রহিয়াছে।

ইমাম শাবী (রহঃ)কে কেহ জিজ্ঞাসা করিল, সম্পদের মধ্যে যাকাত ছাড়াও কি কোন হক রহিয়াছে? তিনি বলিলেন, হাঁ। অতঃপর কুরআন পাকের এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন : **وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ** যাহা প্রথম পরিচ্ছেদের দুই নম্বর আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে। এই সমস্ত হযরতগণ বলেন, মুসলমান হিসাবে যে সকল হক রহিয়াছে, তন্মধ্যে ইহাও একটি যে, সম্পদশালী লোকদের উপর জরুরী হইল, কোন অভাবী লোক দেখিলে তাহার অভাব দূর করিবে। কিন্তু ফেকাহ শাস্ত্র হিসাবে সঠিক ইহাই যে, যখন কোন ব্যক্তি মরণাপন্ন অবস্থায় উপনীত হয়, তখন তাহার প্রয়োজন পূরা করা ফরজে কেফায়া। তবে এই খরচ কর্ত্ত হিসাবে করা হইবে, নাকি সাহায্য হিসাবে করা হইবে ; এই ব্যাপারে ফেকাহবিদগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। একান্ত অনুপায় ব্যক্তি যখন ক্ষুধা, পিপাসার বা অন্য কোন কারণে ধ্বংসের নিকটবর্তী হইয়া যায়, তখন তাহার সাহায্য করা ওয়াজিব—ইহা একটি স্বতন্ত্র বিষয়। আর সম্পদশালী লোকের উপর সম্পদের দিক দিয়া যাকাতের পরিমাণ হইতে বেশী ওয়াজিব নহে—ইহাও একটি স্বতন্ত্র বিষয়। এখানে দুইটি বিষয় লক্ষ্যনীয়। প্রথম হইল, সীমালংঘন করা, আমাদের অভ্যাস হইল, যখনই কোন জিনিসের প্রতি অগ্রসর হই, তখন এত দ্রুত দৌড়াইতে আরম্ভ করি যে, সীমা রক্ষার পরওয়াই করি না। এইজন্য খুবই লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, কাহারো সম্পদ তাহার সন্তুষ্টিতে অনুমতি ব্যতীত লওয়া জায়েয নয়। ফেকাহবিদগণ নিরুপায় ব্যক্তির জন্য অন্যের মাল খাওয়ার অনুমতি অবশ্যই দিয়াছেন। কিন্তু ফেকাহ শাস্ত্রের কিতাবাদিতে স্বয়ং হানাফী মাযহাবে এ ব্যাপারে দুইটি মতের কথা উল্লেখ রহিয়াছে। এক এই যে, এইরূপ নিরুপায় ব্যক্তির জন্য অন্যের মাল খাওয়া অপেক্ষা মৃত পশুর গোশত খাওয়া অগ্রগণ্য হইবে। দ্বিতীয় এই যে, মৃত পশুর গোশত অপেক্ষা অন্যের মাল খাওয়া অগ্রগণ্য হইবে। তবে অন্যের মাল খাওয়ার জন্য জরুরী হইল, তাহার অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌছিয়া যায় যে, তাহার জন্য মৃত পশুর গোশত খাওয়া জায়েয হইয়া যায়। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন—

اَمْساكيس من ايك مد سوه كالمعق
دكمه امدان كوكام كوكام

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْأَسْرِ وَقَدْ كُنْتُمْ إِلَى

الْحُكَّامُ لَنَا كُلُّوْا فَرِيْقًا مِّنْ
 اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ
 تَعْلَمُوْنَ ○ (سورۃ بقرہ ص ۲۴)

غرض سے جسے جاؤ کہ لوگوں کے مال کا
 ایک حصہ بطریق گناہ کے کھا جاؤ اور
 تم اس کو جانتے ہو۔

সম্মুখে ইহা সঠিকভাবে বুঝা যাইবে না যে, কে খুশীমনে অনুমতি দিয়াছে, আর কে দেয় নাই। এইজন্য তোমাদের সর্দারগণ তোমাদের সহিত পৃথকভাবে কথা বলিয়া আমাকে যেন তোমাদের সম্মতি জানাইয়া দেয়।

(বুখারী)

অন্যের সম্পদের মধ্যে সতর্কতা অবলম্বনের ব্যাপারে ইহাই হইল, হুযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ। এই বিষয়ের সমর্থনে বহু হাদীস রহিয়াছে যে, কাহারও সম্পতি ব্যতীত জোরপূর্বক তাহার সম্পদ গ্রহণ করা কখনও জায়েয নয়। হাক্কানী উলামায়ে কেরাম এই ব্যাপারে এত বেশী সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন যে, জনসমাবেশে লজ্জার কারণে কোন নেক কাজে চাঁদা দান করাও তাহারা পছন্দ করেন নাই। এইজন্য একদিকে তো সীমালংঘন করা হইতে বাঁচিতে হইবে, যেমন জোরপূর্বক কাহারও সম্পদ গ্রহণ করা যাইবে না। কোন সাময়িক আন্দোলনে ভীত হইয়া কখনও কথায় বা কাজে লিখনী বা বক্তব্যের মাধ্যমে পূর্ববর্তী সংখ্যাগরিষ্ঠ ওলামায়ে কেরামদের বিরোধিতা করা চাই না। দরিদ্র পালনের আগ্রহ অত্যন্ত মোবারক কাজ, কিন্তু ইহাতে কখনও সীমালংঘন করা চাই না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, ঐ ব্যক্তি নিকৃষ্টতম লোকদের অন্তর্ভুক্ত, যে অন্যের দুনিয়া ঠিক করিতে যাইয়া নিজের আখেরাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। (মিশকাত)

এইজন্য একদিকে যেমন সীমালংঘন হইতে বাঁচিতে হইবে, অপরদিকে তেমনি এই ব্যাপারে শিথিলতা হইতে বাঁচিয়া থাকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বুঝি জরুরী। ইহা ঠিক যে, সম্পদের মধ্যে শুধু ষাকাতই ওয়াজিব। কিন্তু শুধু ওয়াজিব আদায় করিতে পারাকেই যথেষ্ট মনে করা ঠিক নয়।

এই পর্যন্ত যে সমস্ত বিষয় ও রেওয়ায়াতসমূহ এই কিতাবে বর্ণিত হইয়াছে, উহা দ্বারা এই কথা স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, ঐ সম্পদই একমাত্র নিজের কাজে আসিবে, যাহা জীবদ্দশায় দান করা হইয়াছে এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট জমা করা হইয়াছে। মৃত্যুর পর না কোন মাতাপিতা স্মরণ রাখে, না স্ত্রী, না সন্তান-সন্ততি জিজ্ঞাসা করে। সকলেই কয়েকদিন বিনা পয়সার কিছু অশ্রু বিসর্জন দিয়া নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত হইয়া যাইবে। মাসের পর মাস, বছরের পর বছরও মৃত ব্যক্তির কথা কাহারো স্মরণ হইবে না। এই সমস্ত কিছুর পরও উপরোক্ত হাদীস প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক কথাও ভালভাবে বুঝিয়া লইতে হইবে যে, দীন সম্পর্কে একটি নিরর্থক ও বাজে কথা আমাদের মুখে উচ্চারিত হইয়া থাকে যে, আরে ভাই আমাদের মত দুনিয়াদারদের দ্বারা শুধু ফরজ আদায়

হইয়া যাওয়াই অনেক বড় ব্যাপার, নফল তো বড়দের কাজ। ইহা শয়তানের ধোকা। কেননা, নফল তো ফরজের পরিপূর্ণতার জন্যই। কে নিশ্চিত বলিতে পারে যে, আমি আল্লাহ তায়ালায় অন্ততঃ একটি ফরজকেও পরিপূর্ণরূপে আদায় করিয়া দিয়াছি। আর যখন উহাতে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকিয়াই যায়, তখন উহা পূরা করার জন্য নফলের প্রয়োজন হয়।

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষ এমন অবস্থায় নামায শেষ করে যে, তাহার জন্য নামাযের দশভাগের এক ভাগ সওয়াব লেখা হয়, নয়ভাগের একভাগ, আটভাগের এক ভাগ, সাত ভাগের এক ভাগ, ছয় ভাগের এক ভাগ, পাঁচ ভাগের এক ভাগ, চার ভাগের এক ভাগ, তিন ভাগের এক ভাগ, অর্ধেক অংশ লেখা হয়।

(আবু দাউদ)

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহা উদাহরণস্বরূপ বলিয়াছেন। আমরা যে ভাবে নামায পড়ি, উহার তো হাজার ভাগের এক ভাগ বরং লাখ ভাগের এক ভাগও যদি লেখা হয়, তবুও আল্লাহ তায়ালায় দয়া ও মেহেরবানী। নতুবা আমাদের নামায তো আমাদের বদআমল ও এখলাস না থাকার কারণে এমন হয়, যেমন অন্যান্য হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, কোন কোন নামায পুরাতন কাপড়ের মত পেঁচাইয়া মুখের উপর নিক্ষেপ করা হইবে। কারণ, উহা কোন পর্যায়ের কবুল করার মত হইবে না। এইরূপ অবস্থায় বলা যায় না যে, আমাদের ফরজসমূহের কত অংশ লিখা হইয়াছে।

অন্য এক হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব হইবে। আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদেরকে বলিবেন, আমার বান্দার নামায দেখ, উহা কি অসম্পূর্ণ না পরিপূর্ণ। যদি পরিপূর্ণ হয়, তবে পরিপূর্ণ লিখিয়া দেওয়া হয়, আর যদি অসম্পূর্ণ হয়, তবে যেই পরিমাণ ত্রুটিপূর্ণ হয়, তাহা লিখিয়া দেওয়া হয়। যদি তাহার নিকট নফল থাকে, তবে উহা দ্বারা ফরজ পূর্ণ করিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর অনুরূপভাবে যাকাতের হিসাব হয়, অর্থাৎ প্রথমে ফরজের হিসাব হয়, তারপর নফল দ্বারা উহাকে পূর্ণ করা হয়। অতঃপর অনুরূপভাবে অন্যান্য আমলের হিসাব হয়।

(আবু দাউদ)

এমতাবস্থায় কাহারও জন্য কখনও এইরূপ গর্ব করা উচিত নয় যে, আমি হিসাব মত যাকাত আদায় করিয়া থাকি। কেননা, জানা নাই যে, কত ত্রুটি-বিচ্যুতি উহার মধ্যে হইয়া থাকিবে। উহার ক্ষতিপূরণের জন্য

অনেক বেশী পরিমাণ নফল সদকার সঞ্চয় থাকা দরকার। মানুষ যখন মামলা করার জন্য আদালতে যায়, তখন সর্বদা খরচের চাইতে বেশী টাকা পয়সা পকেটে লইয়া যায়। কেননা, জানা নাই হঠাৎ কোন খরচের প্রয়োজন হইয়া যায়, আর আখেরাতের আদালত সর্বোচ্চ আদালত। সেখানে না মিথ্যা চলিবে, না মুখের জোর, না সুপারিশ। তবে আল্লাহ তায়ালার রহমত সবকিছুর উর্ধ্বে, তিনিই প্রকৃত পাওনাদার। সম্পূর্ণই যদি ক্ষমা করিয়া দেন, তবে কাহার কি বলার আছে। কিন্তু ইহা কোন নিয়ম কানুনের জিনিস নহে, আর শাহী ক্ষমার আশায় কেহ অপরাধে লিপ্ত হয় না। এইজন্য ফরজকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে উহার শর্ত ও আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আদায় করিতে থাকা চাই। আর শুধু ফরজ আদায় করিয়া কখনও যথেষ্ট মনে করা চাই না, বরং ফরজের মধ্যে ক্রটি-বিচ্যুতির আশংকায় উহার পূর্ণতার জন্য অনেক বেশী নফলের সঞ্চয় নিজের কাছে রাখা চাই।

আল্লামা সুয়ুতী (রহঃ) 'মিরকাতুস সুয়ুদ' কিতাবে বর্ণনা করিয়াছেন— সমস্তরটি নফল একটি ফরজের সমতুল্য হয়। এইজন্য ফরজকে অনেক গুরুত্ব সহকারে আদায় করা চাই। কেননা, ইহার মধ্যে সামান্যতম ক্রটির কারণে নফলের অনেক বড় সঞ্চয় নিঃশেষ হইয়া যায়। আর ফরজসমূহ গুরুত্ব সহকারে আদায় করা সত্ত্বেও সাবধানতার জন্য নফলের অনেক বড় সঞ্চয় নিজের আমলনামায় সংরক্ষণ করিয়া রাখা চাই।

দ্বিতীয় বিষয় উক্ত হাদীসে এই ছিল যে, যে ব্যক্তি হারাম মাল উপার্জন করিয়া উহা হইতে সদকা করে, সে সদকার সওয়াব পাইবে না। অনেক রেওয়াযাতে এই বিষয় বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা হালাল মাল হইতে সদকা কবুল করেন।

এক হাদীসে আছে, আল্লাহ তায়ালা গুলুলের মালের সদকা কবুল করেন না। গনিমতের মালের মধ্যে খেয়ানত করাকে গুলুল বলে। ওলামায়ে কেরাম লিখিয়াছেন, গুলুলের কথা এই জন্য উল্লেখ করিয়াছেন যে, গনিমতের মালে সকলের অংশ থাকে। সুতরাং যখন উহাতে সদকাকারীর নিজের অংশ থাকা সত্ত্বেও সদকা করিলে কবুল হয় না, তখন যে সম্পদে তাহার কোন অংশ নাই, উহা হইতে সদকা করিলে কবুল হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

এক হাদীসে ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি হারাম মাল উপার্জন করে সে যদি খরচ করে, তবে উহাতে বরকত হয় না। যদি সদকা করে, তবে কবুল হয় না। যদি

পরবর্তীদের জন্য মিরাস হিসাবে রাখিয়া যায়, তবে যেন জাহান্নামের পাথের রাখিয়া গেল।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, যে ব্যক্তি হালাল মাল উপার্জন করে কিন্তু যাকাত আদায় করে না। এইভাবে উহার যাকাত আদায় না করা সেই মালকে খবীস বা অপবিত্র বানাইয়া দেয়। আর যে ব্যক্তি হারাম মাল উপার্জন করে এবং যাকাত আদায় করে। এইভাবে উহার যাকাত আদায় করা সেই মালকে পবিত্র করে না। (দুররে মান্বুর)



পঞ্চম পরিচ্ছেদ

যাকাত আদায় না করার শাস্তির বিবরণ

এই ব্যাপারে কুরআন পাকে অনেক আয়াত নাযিল হইয়াছে। তন্মধ্যে হইতে কিছু আয়াত দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অর্থাৎ, মাল খরচ না করার শাস্তির বিবরণে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই ধরনের আয়াত সম্পর্কে উলামায়ে কেরাম স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, এই শাস্তি যাকাত আদায় না করার ব্যাপারে প্রযোজ্য। আর যেহেতু যাকাত সর্বসম্মতভাবে ফরজ, কাজেই উল্লেখিত শাস্তির আয়াতসমূহের মধ্যে যাকাত আদায় না করার শাস্তিও যে शामिल হইবে, তাহা একেবারেই স্পষ্ট; বলার অপেক্ষা রাখে না। যেমন—

① وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

① এই আয়াত (তওবা : ২৪-২৫) দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৫ নম্বরে তরজমা সহ উল্লেখিত হইয়াছে। অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম ও অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে ইহা যাকাত সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে। আর যে কঠিন আযাবের বিষয় এই আয়াত শরীফে উল্লেখ করা হইয়াছে, উহা যাহারা যাকাত আদায় করে না তাহাদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে। যেমন, পূর্বে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের পাঁচ নম্বরে এই আয়াতের তরজমা সহ ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হইয়াছে। বিভিন্ন হাদীসে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ দ্বারাও এই অর্থের সমর্থন পাওয়া যায় যে, আয়াতে উল্লেখিত আযাব অর্থাৎ তাহার সম্পদকে গরম করিয়া ঐ ব্যক্তির কপাল ও পার্শ্ব ইত্যাদিকে উহা দ্বারা দাগ দেওয়া— যাকাত আদায় না করার শাস্তি। আল্লাহ তায়ালা আপন মেহেরবানীতে হেফাজত করুন। কারণ, উক্ত পদার্থের সামান্য স্পর্শও কঠিন যন্ত্রণাদায়ক হয়, উপরন্তু ধন-সম্পদ যত বেশী থাকিবে, মানুষকে ততবেশী দাগ দেওয়া হইবে। অল্প কিছুদিন এই সোনা-রূপার কয়েকটি টুকরা নিজের কাছে রাখার

ফলে কত কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হইতে হইবে।

② وَلَا يَخْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنْتَهُمُ اللَّهُ مِنْ

نَصْلِهِ

② এই আয়াতও (আলি-ইমরান : ১৮০) তরজমা সহ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তিন নম্বরে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার সমর্থনে বুখারী শরীফের হাদীস হইতে হযুর সালাম্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, যাহাকে আল্লাহ তায়ালা সম্পদ দান করিয়াছেন, আর সে উহার যাকাত আদায় করে না, ঐ সম্পদ সাপে রূপান্তরিত করিয়া তাহার গলায় জড়াইয়া দেওয়া হইবে এবং সেই সাপ বলিবে, আমি তোমার ধন, আমি তোমার সম্পদ। যে ঘরে সাপ দেখা যায়, ভয়ের চোটে অজ্ঞকারে ঐ ঘরে যাওয়া অসম্ভব হইয়া যায়, নাজানি পেঁচাইয়া ধরে। অথচ আল্লাহ তায়ালায় পাক রাসূল সালাম্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিতেছেন, এই সম্পদই যাহাকে আজ মজবুত ওদামে এবং লোহার আলমারিতে রাখা হইতেছে, যাকাত আদায় না করার কারণে কাল উহা সাপ হইয়া তোমাদেরকে পেঁচাইয়া ধরিবে। ঘরের সাপ পেঁচাইয়া ধরা নিশ্চিত নয়, শুধু সম্ভাবনা যে, হয়ত বা পেঁচাইয়া ধরিবে, এতদসত্ত্বেও এই আশংকা ও সম্ভাবনার উপর বারবার চিন্তা ও ভয় হয় যে, নাজানি এই দিক হইতে বাহির হইয়া আসে, না ওইদিক হইতে বাহির হইয়া আসে। পক্ষান্তরে, যাকাত আদায় না করিলে উহার শাস্তি নিশ্চিত। তবুও আমাদের ঐ শাস্তির ভয় হয় না।

③ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَأَتَيْنَهُ مِنَ الْكَنُوزِ مَا إِنَّ مَعَاتِيَهُ لَتَتَوَّاهَا بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ۝ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ط إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۝ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي ط وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَآكُفَرُ جَمْعًا ط وَلَا يُسْأَلُ عَنْ

ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ○ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ط
 قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَلِيتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ
 قَارُونُ ۖ إِنَّهُ لَكُدُّ وَحِطٌّ عَظِيمٌ ○ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
 وَيُؤْتِيهِمُ اللَّهُ ثَوَابًا كَثِيرًا ۖ وَسِعِلَ صَلَاتُهُمْ وَلَا يَلْجَأُ
 إِلَّا الْغَيْرُونَ ○ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبَدَايِهِ الْأَرْضَ نَقَمًا ۖ كَانَ
 لَهُ مِنَ فَتًى يَنْصَرُّوكَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ وَمَا كَانَ مِنَ
 الْمُتَصَرِّينَ ○ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ
 يَقُولُونَ وَيُكَانَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَ
 يَقْدِرُ ۖ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۖ وَيُكَانَ
 لَا يَفْلِحُ الْكَافِرُونَ ○ (سورة قصص، ٨٤)

৩ কারুন হযরত মুসা (আঃ)এর চাচাতো ভাই ছিল। তাহার ঘটনা
 খুবই প্রসিদ্ধ। কুরআন পাকে সূরা কাসাসের অষ্টম রুকু সম্পূর্ণটায় তাহার
 ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। ব্যাখ্যাসহ উহার তরজমা এই—

কারুন (হযরত) মুসা (আঃ)এর সম্প্রদায়ভুক্ত (তাহার চাচাতো ভাই)
 ছিল। অনন্তর সে (সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে) তাহাদের সম্মুখে অহংকার
 করিতে লাগিল। আর আমি তাহাকে এত অধিক পরিমাণ ধনভাণ্ডার দান
 করিয়াছিলাম যে, উহার চাবিসমূহ কয়েকজন শক্তিশালী লোকের জন্য
 অত্যন্ত ভারী বোঝা হইত। (অর্থাৎ, তাহারা অতি কষ্টে বহন করিত, যখন
 ভাণ্ডারের চাবিই এত বেশী, তখন জানা কথা, সম্পদও অনেক বেশী
 হইবে। সে এই অহংকার তখন করিয়াছিল) যখন তাহাকে তাহার
 সম্প্রদায়ের লোকেরা (হযরত মুসা ও অন্যান্যরা উপদেশমূলক) বলিল,
 তুমি (এই ধন-সম্পদের কারণে) গর্ব করিও না, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা
 গর্বকারীদিগকে পছন্দ করেন না। আর তোমাকে আল্লাহ তায়ালা যেই
 পরিমাণ দান করিয়াছেন, উহাতে আখেরাতেরও অনুেষণ কর এবং দুনিয়া
 হইতে তোমার অংশ (আখেরাতে লইয়া যাইতে) ভুলিও না। আর যেইরূপ
 আল্লাহ তায়ালা তোমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন, তদ্রূপ তুমিও (তাহার
 বান্দাদের প্রতি) অনুগ্রহ কর (আর আল্লাহ তায়ালা নাকরমানী ও
 ওয়াজিব হকসমূহ নষ্ট করিয়া) দুনিয়াতে ফাসাদ কামনা করিও না।
 নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা ফাসাদকারীদিগকে পছন্দ করেন না। কারুন

(তাহাদের উপদেশ শুনিয়া) বলিল, এই সমস্ত ধন-সম্পদ আমি নিভেই বুজিমস্তার বলেই পাইয়াছি। (অর্থাৎ, আমার কাজের দক্ষতা দ্বারা এই সম্পদ সংগ্রহ করিয়াছি। ইহাতে কোন অদৃশ্য অনুগ্রহ বা কাহারও কোন হুক নাই। আল্লাহ তায়ালা তাহার এই কথার জওয়াবে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলেন,) সে (করুন) কি ইহা জানে না যে, আল্লাহ তায়ালা তাহার পূর্বে বিগত জাতিসমূহের মধ্য হইতে এমন লোকদেরকে ধ্বংস করিয়াছেন, যাহারা সম্পদের শক্তিতেও ছিল তাহার অপেক্ষা বহুগুণে প্রবল এবং (জনগোষ্ঠী হিসাবেও) তাহাদের সংখ্যা ছিল অনেক বেশী। (ইহা তো দুনিয়াতে হইয়াছে, আর আখেরাতে জাহান্নামের আযাব ভিন্ন রহিয়াছে।) আর পাপীদেরকে তাহাদের পাপকার্য সম্পর্কে (জানিবার উদ্দেশ্যে) জিজ্ঞাসাও করা হইবে না (কেননা, প্রত্যেক ব্যক্তির সম্পূর্ণ অবস্থা আল্লাহ তায়ালা জানেন, তবে নালিশের কারণে জিজ্ঞাসাবাদ করা ভিন্ন কথা।) অতঃপর (করুন একবার) আপন জাঁক-জমকের সহিত সম্প্রদায়ের লোকদের সম্মুখে বাহির হইল। (তাহার সম্প্রদায়ের মধ্যে) যাহারা দুনিয়ার প্রতি আগ্রহী ছিল, তাহারা বলিতে লাগিল, 'আহা! কি উত্তম হইত, আমরাও যদি এই সাক্ষ-সরঞ্জাম প্রাপ্ত হইতাম, যাহা করুন প্রাপ্ত হইয়াছে। বাস্তবিকই সে (করুন) বড় ভাগ্যবান।' (তাহারা সম্পদের আকাঙ্ক্ষা ও লোভের কারণে এইরূপ বলিয়াছিল, ইহাতে তাহারা কাকের হইয়া যায় নাই। এখনও অনেক মুসলমান অন্যান্য সম্প্রদায়ের দুনিয়াবী উন্নতি দেখিয়া সর্বদা লোভ করিতে থাকে এবং এই চেষ্টায় রত থাকে, যাহাতে তাহাদের ন্যায় আমাদেরও পার্শ্ব উন্নতি নসীব হয়।) আর যাহাদেরকে দ্বীনী এলেম (এবং উহার বুঝ) দান করা হইয়াছিল, তাহারা (এই লোভীদেরকে) বলিতে লাগিল, আরে তোমাদের নাশ হউক (তোমরা এই দুনিয়ার ব্যাপারে কিসের লোভ করিতেছ?) আল্লাহ তায়ালা দেওয়া প্রতিদান (এই কয়েকদিনের ধন-সম্পদ হইতে লক্ষ লক্ষ গুণ) উত্তম। যাহা এমন লোকেরা পাইবে, যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং নেক কাজ করিয়াছে (তাহাদের মধ্যেও পূর্ণ মর্যাদার সওয়াব) ঐ সমস্ত লোকদেরকেই দেওয়া হইবে, যাহারা ধৈর্যশীল। অতঃপর (যখন আমি করুনের অবাধ্যতা ও ফাসাদের কারণে) তাহাকে ও তাহার মহলকে জমিনে ধসাইয়া দিলাম, তখন এমন কোন দল হয় নাই, যাহারা তাহাকে আল্লাহর আযাব হইতে বাঁচাইতে পারে এবং সে নিজেও কোন বুদ্ধি করিয়া বাঁচিতে পারে নাই। (নিঃসন্দেহে, আল্লাহ তায়ালা আযাব হইতে কেহ বাঁচাইতে পারে না এবং কেহ বাঁচিতে পারে না। করুনের উপর এই আযাবের অবস্থা দেখিয়া)

গতকল্য যাহারা তাহার মত হইবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছিল, তাহারা বলিতে লাগিল, মনে হইতেছে, (রিষিকের প্রশস্ততা ও সংকীর্ণতার ভিত্তি সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের উপর নয়, বরং) আল্লাহ তায়ালা তাহার বাঙ্গাদে মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা, রুজির প্রশস্ততা দান করেন, আর যাহার জন্য চাহেন, সংকীর্ণ করিয়া দেন। (ইহা আমাদের ভুল ছিল যে, উহার প্রশস্ততাকে সৌভাগ্য মনে করিতেছিলাম। বাস্তবিকই) যদি আমাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা মেহেরবানী না হইত, তবে আমরাও ধসাইয়া দিতেন (কেননা, আমরাও তো গোনাহগার)। এখন বুঝে আসিয়া গেল যে, কাফেরদের জন্য সফলতা নাই (যদিও তাহারা এই কয়েক দিনের জীবনের স্বাদ উপভোগ করিয়া লয়)।

(বয়ানুল কুরআন ; কিষ্টিত পরিবর্তিত) (কাসাস ৪ ৭৬-৮২)

ফায়দা : হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, কারুন হযরত মুসা (আঃ)এর সম্প্রদায়ের লোক ছিল। তাহার চাচাতো ভাই ছিল। (দুনিয়াবী) বিদ্যা-বুদ্ধিতে যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিল। হযরত মুসা (আঃ)এর প্রতি হিংসা পোষণ করিত। মুসা (আঃ) তাহাকে বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে তোমার নিকট হইতে যাকাত উসূল করিতে আদেশ দিয়াছেন। সে যাকাত প্রদান করিতে অস্বীকার করিল এবং লোকদের নিকট বলিতে লাগিল, মুসা যাকাতের নামে তোমাদের সম্পদ আতুসাৎ করিতে চায়। সে নামাযের হুকুম করিয়াছে, তোমরা সহ্য করিয়াছ। সে আরও অন্যান্য হুকুম-আহকাম জারি করিয়াছে, সেইগুলিকে তোমরা সহ্য করিয়াছ। এখন সে তোমাদেরকে যাকাতের হুকুম করিতেছে, তোমরা কি ইহাও সহ্য করিবে? লোকেরা বলিল, আমরা ইহা সহ্য করিব না। তুমিই কোন বুদ্ধি বলিয়া দাও। সে বলিল, আমি এই বুদ্ধি করিয়াছি যে, কোন চরিত্রহীনা মহিলাকে এই মর্মে রাজি করাইব যে, সে মুসার উপর অপবাদ দিবে যে, তিনি আমার সহিত ব্যভিচার করিতে চান। লোকেরা একটি চরিত্রহীনা মহিলাকে অনেক পুরস্কার দিবে বলিয়া এই বিষয়ে সম্মত করাইল। সে রাজি হওয়ার পর কারুন হযরত মুসা (আঃ)এর নিকট গেল এবং তাহাকে বলিল, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে যেই সমস্ত হুকুম-আহকাম দিয়াছেন, উহা সমস্ত বনী ইসরাঈলকে একত্রিত করিয়া গুনাইয়া দিন। হযরত মুসা (আঃ) ইহা পছন্দ করিলেন এবং সমস্ত বনী ইসরাঈলকে সমবেত করিলেন। যখন সবাই সমবেত হইল, তখন হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহ তায়ালা হুকুম-আহকাম বলিতে আরম্ভ করিলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে এই হুকুম করিয়াছেন যে, তোমরা তাহার এবাদত কর, কাহাকেও

তাহার সহিত শরীক করিও না। আত্মীয়-স্বজনের সহিত সং ব্যবহার কর। এইভাবে আরও অন্যান্য হুকুম শুনাইলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি ইহাও বলিলেন যে, যদি কোন বিবাহিত পুরুষ ব্যভিচার করে, তবে তাহাকে পাথর নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করা হইবে। লোকেরা বলিল, যদি আপনি নিজে ব্যভিচার করেন? হযরত মুসা (আঃ) বলিলেন, যদি আমি ব্যভিচার করি তবে আমাকেও পাথর নিক্ষেপ করা হইবে। লোকেরা বলিল, আপনি ব্যভিচার করিয়াছেন। হযরত মুসা (আঃ) (অবাক হইয়া) বলিলেন, আমি! লোকেরা বলিল, জ্বি হাঁ আপনি। এই বলিয়া তাহারা ঐ মেয়েলোকটিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি হযরত মুসা (আঃ) সম্পর্কে কি বল? হযরত মুসা (আঃ)ও তাহাকে কসম দিয়া বলিলেন, তুমি কি বল? মেয়েলোকটি বলিল, যখন আপনি কসম দিলেন, তখন বলিতে হয় যে, ইহারা আমাকে অনেক পুরস্কার দেওয়ার ওয়াদা করিয়াছে, যাহাতে আমি আপনার উপর অপবাদ দেই। আপনি এই অপবাদ হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র। ইহা শুনিয়া হযরত মুসা (আঃ) কাঁদিতে কাঁদিতে সেজদায় পড়িয়া গেলেন। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে সেজদার মধ্যেই ওহী আসিল—হে মুসা! কাঁদিবার কি আছে, তোমাকে আমি এই সকল লোকদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য জমিনের উপর ক্ষমতা দান করিলাম। ইহাদের সম্পর্কে তোমার যাহা ইচ্ছা, জমিনকে হুকুম কর। হযরত মুসা (আঃ) সেজদা হইতে মাথা উঠাইয়া জমিনকে হুকুম করিলেন, ইহাদেরকে গিলিয়া ফেল। জমিন তাহাদেরকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত গিলিয়া ফেলিয়াছিল। তখন তাহারা অনুন্নয়-বিনয় করিয়া হযরত মুসা (আঃ)কে ডাকিতে লাগিল। মুসা (আঃ) পুনরায় হুকুম করিলেন, ইহাদেরকে ধসাইয়া ফেল। এমনকি তাহারা ঘাড় পর্যন্ত ধসিয়া গেল। তখন তাহারা চিৎকার করিয়া হযরত মুসা (আঃ)কে ডাকিতে লাগিল। হযরত মুসা (আঃ) পুনরায় জমিনকে একই হুকুম করিলেন যে, ইহাদেরকে সম্পূর্ণরূপে গিলিয়া ফেল। জমিন তাহাদের সকলকে সম্পূর্ণভাবে গিলিয়া ফেলিল। তখন আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে হযরত মুসা (আঃ)এর নিকট ওহী আসিল, তাহারা তোমাকে ডাকিতেছিল এবং তোমার নিকট অনুন্নয়-বিনয় করিতেছিল, আমার ইচ্ছাভের কসম! যদি তাহারা আমাকে ডাকিত আর আমার নিকট দোয়া করিত, তবে আমি তাহাদের দোয়া কবুল করিয়া লইতাম।

অন্য এক হাদীসে হযরত ইবনে আক্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, উক্ত আয়াতে দুনিয়া হইতে তোমার অংশ ভুলিও না, ইহার অর্থ এই যে,

দুনিয়াতে তুমি আখেরাতের জন্য আমল কর।

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) ইহাতে বর্ণনা করা হইয়াছে, দুনিয়ার অংশ বলিতে আব্রাহাম তায়ালার আনুগত্য বুঝায়, যাহার সওয়াব আশ্বেরাতে পাওয়া যায়।

হযরত হাসান (রহঃ) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে, দুনিয়া হইতে নিজের অংশ ভুলিও না অর্থাৎ, দুনিয়াতে যতটুকু প্রয়োজন উহাকে রাখ। আর যাহা অতিরিক্ত উহা আখেরাতের জন্য পাঠাইয়া দাও।

অন্য এক হাদীসে হযরত হাসান (রহঃ) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে, এক বছরের কুজি রাখিয়া দাও। ইহার অতিরিক্ত যাহা হয়, উহা সদকা করিয়া দাও। (দুররে মানসুর)

এই সম্পর্কিত কিছু বিবরণ কৃপণতার বর্ণনায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের আট নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

शदीममम

حضرت اقدس مصلیٰ اظہار غیثہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص جو سونے کا ٹکڑا جو یا چاندی کا اور اس کا حق (یعنی زکوٰۃ) ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس سونے چاندی کے پترے بنائے جائیں گے اور اسی کو جہنم کی آگ میں ایسا تپایا جائے گا گو یا کہ وہ عموماً گے پترے ہیں۔ پھر اُن سے اس شخص کا پسواؤ پیشانی اور کمر فارغ دسی جائے گا اور ہر ایک اسی طرح تپا تپا کر دلخ دیئے جائے گا۔ قیامت کے روز سے دن میں جس کی مقدار دنیا کے حساب سے پچاس ہزار برس ہوگی اس کے بعد اس کو جہاں جانا ہوگا جنت میں یا جہنم میں چلا جائے گا۔

① عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَا مِنْ صَاحِبٍ دُخِبَ وَلَا فُطِمَ
لَا يُؤْوَى مِنْهَا حَقُّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ
يَوْمَ الْقِيَمَةِ صَلَبَتْ لَهُ مَنَاجِ
مِنْ ثَابٍ فَأُخِصَّ عَلَيْهَا فِي ثَابِ بَهْتَمٍ
فَيُكْرَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَ
ظَهْرُهُ كُلَّمَا رَدَّتْ أُرْعِدَتْ شَلَّةٌ فِي
يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُ أَرْبَعِ خُمُسَيْنِ
أَلْفِ سَنَةٍ عَلَى يُقْضَى بَيْنَ
الْعِبَادِ فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى
الْبَيْتِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ (الحديث
بطوله في المشكوة عن مسلم)

১) ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি স্বর্ণ অথবা রৌপ্যের মালিক হয়, আর সে উহার হক (অর্থাৎ যাকাত) আদায় না করে, কিয়ামতের দিন ঐ স্বর্ণ ও রৌপ্যের দ্বারা পাত বানান হইবে এবং উহাকে জাহান্নামের আগুনে এই পরিমাণ উত্তপ্ত করা হইবে, যেন উহা স্বয়ং আগুনের পাত। অতঃপর উহা দ্বারা ঐ ব্যক্তির পার্শ্বদেশ, কপাল ও কোমরে দাগ দেওয়া হইবে এবং বারবার এইভাবে উত্তপ্ত করিয়া দাগ দেওয়া হইতে থাকিবে। কিয়ামতের সম্পূর্ণ দিন এইরূপ করা হইবে, যাহার পরিমাণ দুনিয়ার হিসাব অনুযায়ী পঞ্চাশ হাজার বছর হইবে। অতঃপর সে বেহেশত বা দোযখ যেখানে যাওয়ার চলিয়া যাইবে।

(মিশকাত : মুসলিম)

ফায়দা : ইহা একটি দীর্ঘ হাদীস। ইহাতে উটের মালিকদের উপর উটের যাকাত না দেওয়ার শাস্তি, গরু ছাগলের মালিকদের উপর উহার যাকাত না দেওয়ার শাস্তি এবং উহার অবস্থা বর্ণনা করা হইয়াছে। এ অঞ্চলে সাধারণতঃ জীবজন্তু এই পরিমাণ হয় না, যাহার উপর যাকাত ওয়াজিব হইয়া থাকে। আরব দেশে এই সমস্ত জীবজন্তু অধিক পরিমাণে ছিল। অবশ্য সোনা-রূপা ও উহার সহিত সংশ্লিষ্ট জিনিসপত্র সাধারণতঃ আমাদের এই সমস্ত দেশে পাওয়া যায় বিধায় উক্ত হাদীসের অংশবিশেষ উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করিয়াছি। ইহা দ্বারাও যাকাত না দেওয়ার পরিণতি সম্পর্কে আন্দাজ করা যাইবে। উক্ত হাদীসে সোনা-চাঁদি দ্বারা জাহান্নামের আগুনের পাত বানাইয়া দাগ দেওয়ার কথা বর্ণিত হইয়াছে। আর ইহাও শুধু কিয়ামতের একদিনের শাস্তি, যাহা বিচারের জন্য পেশ হইবার দিন, আর সেই দিনের পরিমাণও পঞ্চাশ হাজার বছর হইবে। এত দীর্ঘদিন আযাব ভোগ করিবার পর জানা যাইবে যে, তাহার অন্যান্য আমল এই উপযুক্ত রহিয়াছে কিনা, যাহা দ্বারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হইয়া জাহান্নামে যাওয়ার অনুমতি হইবে। আর যদি এইরূপ উপযুক্ত অন্য কোন আমল না থাকে। অর্থাৎ ক্ষমার উপযুক্ত না হয়, অথবা যাকাত না দেওয়ার কারণে এখনও শাস্তি বাকী রহিয়া গিয়াছে, তবে তাহাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। সেখানে যে কি অবস্থা হইবে, তাহা লেখা ও ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

এই হাদীসে কিয়ামতের দিনকে পঞ্চাশ হাজার বছর বলা হইয়াছে। কুরআন পাকে সূরা মাআরিজের শুরুতেও কিয়ামতের দিনকে এই পরিমাণ বলা হইয়াছে। কিন্তু কোন কোন হাদীসে আসিয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা অমুগত বান্দাদের উপর এই দিনটি এত সহজভাবে অতিবাহিত

হইয়া যাইবে, যেমন একটি ফরজ নামায পড়িয়া লইল। আর কোন কোন লোকের উপর তাহাদের আমল হিসাবে এইরূপ হইবে, যেমন যোহর হইতে আছর পর্যন্ত সময়। (দুররে মানসুর)

এত শীঘ্র অতিবাহিত হইয়া যাওয়ার অর্থ হইল, অনুগত বান্দারা সেইদিন আনন্দ ও শ্রমণের মধ্যে থাকিবে। আনন্দ ফুটির সময় যে কয়েক মিনিটে কাটিয়া যায়, তাহা শ্রমণবিলাসী লোকমাত্রই জানে।

এক হাদীসে ঘূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, টাকার উপর টাকা, স্বর্ণমুদ্রার উপর স্বর্ণমুদ্রা রাখিয়া দেওয়া হইবে ; এইরূপ নহে, বরং তাহার শরীরকে এত প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হইবে, যাহাতে এই সমস্ত কিছু পাশাপাশি রাখা যায় এবং তাহাদেরকে বলা হইবে, তোমরা তোমাদের সম্পদের স্বাদ গ্রহণ কর।

হযরত সাওবান (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে, যেই পরিমাণ সোনা-রূপা তাহার কাছে থাকিবে, উহার প্রতি এক কিরাত পরিমাণ (যাহা প্রায় তিন রুস্তি পরিমাণ হয়, বিস্তৃত করিয়া উহা) দ্বারা আগুনের এক টুকরা বানানো হইবে। অতঃপর উহা দ্বারা মুখ হইতে পা পর্যন্ত তাহার সমস্ত শরীরকে দাগ দেওয়া হইবে। ইহার পর ইচ্ছা হয় তাহাকে ক্ষমা করা হইবে, অথবা জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। (দুররে মানসুর)

আগুনে উত্তপ্ত করিয়া দাগ দেওয়ার যেই শাস্তির কথা এই হাদীসে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা কুরআন পাকেও বর্ণিত হইয়াছে। যেমন, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে পাঁচ নম্বর আয়াতে উল্লেখিত হইয়াছে। কোন কোন হাদীসে তাহার সম্পদকে সাপ বানাইয়া বেড়ী পরাইয়া দেওয়ার কথাও আসিয়াছে। যেমন, সামনে আসিতেছে।

حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو اللہ جل شانہ نے مال دیا ہو اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو وہ مال قیامت کے دن ایک ایسا سانپ بنا دیا جائے گا، جو گنجا ہو اور اس کی آنکھوں پر دو سیاہ نقطے ہوں۔ پھر وہ سانپ اس کی گردن میں طوق کی طرح ڈال دیا جائے گا جو اس کے دونوں چہروں کو

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يَوْمَرْكَوْهُ مِثْلَ لَهُ مَالَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَجَا عَاثَرَهُ لَهُ رِيتَانِي يُطْلَقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِمْزَمَتَيْهِ يَقُولُ وَذُنُوبُهُ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالِكٌ أَنَا كَذُوكَ ثُمَّ

تَلَا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ
 الآية (وَالْبَخَالُ كُفْرًا فِي
 الْمَشْكُوتِ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ مَسْنَدِ
 ثَوْبَانَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ حُمَرَ
 بِمَعْنَاهُ فِي التَّوْبَةِ) -
 الْآيَةُ ٢٥ -
 بِكَفْلِهِ كَمَا اسْكَبَهُ لَكُمْ تِيرَافَالِ بَعْدَ تِيرَافَالِ
 غَرَابِطِهِ - اسْكَبَهُ بَعْدَ طَعْنِهِ قَدْ رُوِيَ عَنْ
 قَتَادَةَ وَتَلَمَّحَهُ (اسْكَبَهُ تَعْنِي مِنْ قَوْلِهِمْ
 كَيْ آيَةٍ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ
 الْآيَةُ ٢٥ -)

২) হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যাহাকে আল্লাহ তায়ালা সম্পদ দিয়াছেন, অথচ সে উহার যাকাত আদায় করে না, কিয়ামতের দিন সেই সম্পদকে এমন একটি সাপ বানাইয়া দেওয়া হইবে, যাহার মাথা লোমবিহীন হইবে। আর উহার চোখের উপর দুইটি কালো বিন্দু হইবে। অতঃপর ঐ সাপকে তাহার গলায় বেড়ীর মত পরাইয়া দেওয়া হইবে। উহা তাহার উভয় চোয়াল জড়াইয়া ধরিয়া বলিবে, আমি তোমার ধন, আমি তোমার সম্পদ। অতঃপর হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ইহার সমর্থনে) কুরআন পাকের আয়াত **وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ** **يَبْخُلُونَ** **الْآيَةُ** তেলাওয়াত করিলেন। (মিশকাত : বুখারী)

ফায়দা : তরজমা সহ এই আয়াত দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের তিন নম্বরে বর্ণিত করা হইয়াছে। এই সাপের একটি বৈশিষ্ট্য তো এই বর্ণনা করা হইয়াছে যে, উহা সুজা' সাপ হইবে। কোন কোন আলেম সুজা' অর্থ পুরুষ জাতির সাপ বলিয়াছেন। আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন, সুজা' ঐ সাপকে বলা হয়, যে লেজের উপর সোজা খাড়া হইয়া মোকাবেলা করে।

(ফাতহুল বারী)

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই বলা হইয়াছে, উহা শুজা'। অর্থাৎ উহার মাথা লোমবিহীন হইবে। লোমবিহীন এই জন্য বলা হইয়াছে যে, সাপ যখন অত্যন্ত বিষধর হয়, তখন বিষের তীব্রতার কারণে উহার মাথার লোম পড়িয়া যায়।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য এই বলা হইয়াছে যে, উহার উপর দুইটি কালো বিন্দু থাকিবে। কালো দুইটি বিন্দু থাকাও সাপের অধিক বিষধর হওয়ার লক্ষণ। এইরূপ সাপের আয়ু দীর্ঘ হয়। কোন কোন আলেম দুইটি বিন্দুর পরিবর্তে অত্যন্ত বিষধর হওয়ার কারণে 'সাপের মুখের দুইদিকে বিষের ফেনা থাকিবে' অর্থ করিয়াছেন। কেহ অর্থ করিয়াছেন, উহার মুখের বাহিরে দুইদিকে দুইটি দাত থাকিবে। আবার কেহ কেহ অর্থ করিয়াছেন, দুইটি

বিষের থলি সাপের দুইদিকে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকিবে। (ফাতহুল বারী)

এই হাদীসে যাকাত না দেওয়ার কারণে তাহার সম্পদ সাপ হইয়া গলায় পেঁচাইয়া ধরিবে বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আর পূর্বের হাদীসে আগুনে উত্তপ্ত করিয়া দাগ দেওয়ার কথা বলা হইয়াছে। এই দুই প্রকার আযাবের কথা কুরআন পাকের দুই আয়াতেও উল্লেখ করা হইয়াছে। আর উভয় আয়াতই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আয়াতের বর্ণনায় অতিবাহিত হইয়াছে। এই দুই প্রকার আযাবের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। কারণ, বিভিন্ন সময়ের পার্থক্যের দরুন বা বিভিন্ন প্রকার সম্পদের দরুন বা বিভিন্ন মানুষ হিসাবে আযাবের পার্থক্য হইতে পারে। আবার উভয় প্রকার আযাব একত্রেও হইতে পারে।

হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহঃ) হুজ্জাতুল্লাহিল বালোগাহ কিতাবে বলেন, সাপে পরিণত হইয়া পিছনে লাগিবার মধ্যে এবং পাত বানাইয়া দাগ দেওয়ার মধ্যে পার্থক্য এইজন্য করা হইয়াছে যে, মানুষ যদি সকল প্রকার সম্পদের প্রতিই সমান ভালবাসা পোষণ করে ; কোন প্রকার সম্পদের প্রতি তাহার বিশেষ ভালবাসা না থাকে, তবে তাহার সম্পদ একটি জিনিস অর্থাৎ সাপে পরিণত হইয়া তাহার পিছনে লাগিয়া যাইবে। আর যে ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকার সম্পদের প্রতি বিশেষ ভালবাসা পোষণ করে, সে রৌপ্যমুদ্রা ও স্বর্ণমুদ্রাকে গণিয়া গণিয়া রাখে, আর যাহা কিছু পায় উহাকে মুদ্রায় পরিণত করিয়া রাখে। এমনভাবে তাহার ধন-সম্পদকে আগুনের পাত বানাইয়া দাগ দেওয়া হইবে।

এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি তাহার পিছনে ধনভাণ্ডার রাখিয়া যায়, সেই ধনভাণ্ডার দুই বিন্দুবিশিষ্ট একটি গুঞ্জা অর্থাৎ লোমবিহীন মাথাওয়ালা সাপ হইয়া কিয়ামতের দিন তাহার পিছনে ধাওয়া করিবে। সেই ব্যক্তি ভীত হইয়া বলিবে, তুই আবার কোন্ আপদ! সাপ বলিবে, আমি তোমার ধনভাণ্ডার, যাহা তুমি রাখিয়া আসিয়াছিলে। সেই সাপ প্রথমে তাহার হাত অতঃপর তাহার সম্পূর্ণ শরীরকে খাইয়া ফেলিবে। (তরগীব)

কিয়ামতের শাস্তি সম্পর্কে এই কথা বহুবার আসিয়াছে যে, যে ব্যক্তি কোন আযাবের কারণে চূর্ণ-বিচূর্ণ ও টুকরা টুকরা হইয়া যাইবে, সে পুনরায় শাস্তি পাওয়ার জন্য তাহার পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়া আসিবে এবং পুনরায় আযাবের পাত্রে পরিণত হইবে।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
كَرِهِينَ نَادَتْهُمَا كُنْ كَأَنَّ رَكْعَةً أَدَاكَ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
قَالَ أَمْرُنَا بِأَقَامِ الْعُسْلَةَ وَ

يَمْنَعُ اَعْيَابُهُمْ الْاَفَاقَ
 اللَّهُ يُحَاسِبُهُمْ عَسَابًا
 شَدِيدًا اَوْ يُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا
 اَلِيْمًا - (কذا فی الدرر وقال
 یعنی پیدا ادا نہیں کرتے خود سے کسی
 کو کہ حق تعالیٰ شائد ان کو تنہا
 سخت محاسبہ فرمائیں گے اور (فرض کی
 کوتاہی پر) سخت عذاب دیں گے۔

اخرجه الطبرانی في الاوسط وابو بكر الشافعي في الغيلانيات
 قلت ولفظ المنذرى في التوغييب ويعذبهم بالواو وقال ذاه
 الطبرانی في الاوسط والصغير وقال تفرد به ثابت بن محمد
 الزاهد قال الحافظ ثابت ثقة صدوق روى عنه البخاري وغيره
 وبقية روايته لا بأس بهم وروى موقوفا على علي وهو أشبه
 كذا في التوغييب وعزاء صاحب كنز العمال الى الخطيب في تأييده
 وابن النجار وقال فيه محمد بن سعيد البورقي كذاب يضع

৪) হযরত সালাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ
 তায়ালা ধনীদেৱ উপর তাহাদেৱ সম্পদেৱ মধ্যে এই পরিমাণ ফরজ করিয়া
 দিয়াছেন, যাহা তাহাদেৱ গরীবদেৱ জন্য যথেষ্ট হয়। গরীবরা ক্ষুধা ও
 বস্ত্রহীনতাৱ কষ্টে তখন পতিত হয়, যখন তাহাদেৱ ধনীরা তাহাদেৱ
 ফরজ দায়িত্বকে পালন করে না। অর্থাৎ, পরিপূর্ণভাবে আদায় করে না।
 অত্যন্ত মনোযোগ সহকাৱে শুনিয়া লও, আল্লাহ তায়ালা এই সকল
 ধনীদেৱ নিকট হইতে কঠিন হিসাব লইবেন এবং (ফরজ আদায়েৱ
 ব্যাপাৱে অবহেলাৱ কাৱণে) কঠিন শাস্তি দিবেন। (দুৱৱ : তাবারানী আওসাত)

ফায়লা : মোটকথা, আল্লাহ তায়ালা গায়েবেৱ খবর জানেন, অতএব
 তিনি যাকাতেৱ যেই পরিমাণ ফরজ করিয়া দিয়াছেন, উহা নিঃসন্দেহে
 এইরূপ যথেষ্ট পরিমাণ যে, যদি লোকেৱা উহা পূরাপূরি আদায় করিতে
 থাকে এবং শরীয়তেৱ নিয়ম অনুসাৱে আদায় করিতে থাকে, তবে কোন
 ব্যক্তি ক্ষুধাৱ্ত অথবা বিবস্ত্র থাকিতে পাৱে না। ইহা অত্যন্ত স্পষ্ট ও
 নিশ্চিত কথা।

হযরত আবু যর গিফারী (রাযিঃ)এৱ হাদীসে এই বিষয় আৱণ্ড
 স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। উহা একটি দীর্ঘ হাদীস।

ফকীহ আবুল লাইস সমরকন্দী (রহঃ) তাব্বীহুল গাফেলীন কিতাবে
 বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। উহাতে বর্ণিত অন্যান্য প্রশ্নেৱ মধ্যে এই

প্রশ্নটিও রহিয়াছে যে, তিনি বলেন, 'আমি আরজ করিলাম, হে আল্লাহর নবী! আপনি যাকাতের হুকুম করিয়াছেন, যাকাত কি? হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, হে আবু যর! যে ব্যক্তি আমানতদার নয়, তাহার ঈমান নাই, আর যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করে না, তাহার নামায (কবুল) হয় না। আল্লাহ তায়ালা ধনীদিগের উপর তাহাদের সম্পদের মধ্যে এই পরিমাণ ওয়াজিব করিয়া দিয়াছেন, যাহা তাহাদের গরীবদের জন্য যথেষ্ট হইয়া যায়। আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তাহাদের সম্পদের যাকাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবেন এবং উহার কারণে তাহাদেরকে শাস্তি দিবেন।' এই হাদীস হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাত সম্পর্কেই এই এরশাদ করিয়াছেন।

ইমাম গামযালী (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালা যাকাতের ব্যাপারে অবহেলাকারীদের জন্য কঠিন শাস্তির কথা বলিয়াছেন। যেমন এরশাদ হইয়াছে : **وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الزَّهَبَ الْاَيَةَ** আর এই আয়াতে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার অর্থ, যাকাত আদায় করা। অতঃপর তিনি বলেন, আনুষঙ্গিক বিয়্যাবলি হিসাবে যাকাত ছয় প্রকার—১. পশুর যাকাত, ২. স্বর্ণরৌপ্যের যাকাত, ৩. ব্যবসায়িক মালামালের যাকাত, ৪. প্রদত্ত সম্পদ ও খনিজ-সম্পদের যাকাত, ৫. উৎপাদিত শস্যের যাকাত, ৬. সদকায়ে ক্ষেতর। (এহইয়া)

একমাত্র খনিজ সম্পদ ব্যতীত অন্যান্য সম্পদের যাকাত সম্পর্কে চার ইমাম ঐকমত্য প্রকাশ করিয়াছেন।

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর মতে খনিজ সম্পদে যাকাতের স্থলে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব, যাহা ওয়াজিব হিসাবে যাকাতের মতই। নিঃসন্দেহে যদি মুসলমানগণ সকল প্রকারের যাকাত গুরুত্ব ও যত্ন সহকারে আদায় করিতে থাকে, তবে কোন গরীবকে অসহায় অবস্থায় মরিতে হইবে না।

কোন কোন ওলামায়ে কেদাম ধারণা করিয়াছেন যে, হযরত আলী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত এই রেওয়াজাত দ্বারা যাকাত হইতে অতিরিক্ত প্রদান করা ওয়াজিব বুঝানো হইয়াছে। এই ধারণা ঠিক নয়। কেননা, যদি এই অর্থ হয়, তবে তাহা স্বয়ং হযরত আলী (রাযিঃ) এর অন্য একটি রেওয়াজাতের বিপরীত হইয়া যাইবে। ঐ রেওয়াজাতটি এই যে, হযরত আলী (রাযিঃ) হইতে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করা হইয়াছে যে, যাকাত ওয়াজিব হওয়া যাকাত ব্যতীত অন্যান্য

সদকাকে রহিত করিয়া দিয়াছে। ইহা মারফু হাদীস হিসাবেও বর্ণিত হইয়াছে। অর্থাৎ ইহার সনদ পরস্পর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে।

ইমাম রাযী জাস্‌সাস (রহঃ) আহকামুল-কুরআন কিতাবে লিখিয়াছেন, উত্তম সনদের মাধ্যমে ইহা হযরত আলী (রাযিঃ)এর বক্তব্য বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

‘কানযুল উম্মাল’ কিতাবের লিখক বিভিন্ন কিতাব হইতে এই রেওয়ায়াত বর্ণনা করিয়াছেন, যাহার শব্দগুলি এই যে, যাকাত কুরআনে বর্ণিত অন্যান্য সদকাকে রহিত করিয়া দিয়াছে। জানাবতের গোসল অন্যান্য গোসলকে রহিত করিয়া দিয়াছে। রমযানের রোযা অন্যান্য রোযাকে রহিত করিয়া দিয়াছে। কুরবানী অন্যান্য জবেহকে রহিত করিয়া দিয়াছে।

স্বয়ং হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে সমগ্র দুনিয়ার সম্পদ গ্রহণ করিয়া লয়, সে দুনিয়াত্যাগী পরহেযগার। যেমন, পরবর্তী পরিচ্ছেদের শুরুতে আসিতেছে।

কোন কোন আলেম বলিয়াছেন, যাকাত ফরজ হওয়ার পূর্বে নিজের প্রয়োজন পরিমাণ রাখিয়া অবশিষ্ট সম্পদ খরচ করিয়া দেওয়া জরুরী ছিল, যাকাতের বিধান উহাকে রহিত করিয়া দিয়াছে। যেমন, সুন্নী (রহঃ) হইতে আল্লামা সুয়ুতী (রহঃ) **حَذِّ الْعَفْرُ وَأَمْرٌ بِالْعُرْفِ** (আরাফ : ১৯৯) আয়াতের তফসীরে অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব, হযরত আলী (রাযিঃ)এর উক্ত রেওয়ায়াতে ওয়াজিব বুঝানো উদ্দেশ্য হইলেও উহা রহিত হইয়া গিয়াছে। এমনভাবে, উপরোক্ত হাদীস দ্বারা যাকাত হইতে অতিরিক্ত ওয়াজিবের অর্থ করা হইলে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐ হাদীসেরও বিপরীত হইয়া যায়, যাহাতে বর্ণিত হইয়াছে—যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করিল, সে তাহার উপর অর্পিত হক আদায় করিয়া দিল। আর ইহার অতিরিক্ত যাহা হইবে, উহা দয়া ও অনুগ্রহ। (কানয)

এই বিষয়ে কয়েকটি রেওয়ায়াত পূর্বেও উল্লেখ করা হইয়াছে। হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াত এই বিষয়ে আরও স্পষ্ট, যাহা হযরত আলী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হাদীসেরই সমার্থবোধক, উহাতে এরশাদ হইয়াছে, যদি আল্লাহ তায়ালা ইহা জানিতেন যে, ধনীদের যাকাত গরীবদের জন্য যথেষ্ট হইবে না, তবে যাকাত ছাড়া আরও অন্যান্য বিষয় তাহাদের উপর ফরজ করিতেন। কাজেই এখন যদি গরীবরা ক্ষুধার্ত থাকে,

তবে ধনীদের জুলুমের কারণে থাকে। (কান্‌য) অর্থাৎ, ধনীরা যাকাত পরিপূর্ণভাবে আদায় করে না বিধায় গরীবরা ক্ষুধার্ত থাকে। এইজন্যই মুহাম্মদিস হায়হামী (রহঃ) মাজমাউয-যাওয়ায়িদ কিতাবে হযরত আলী (রাযিঃ)এর উক্ত হাদীসের উপর ভিত্তি করিয়া ফরজ যাকাতের শিরোনাম কায়ম করিয়াছেন। বরং তিনি উক্ত অধ্যায়কে এই হাদীস দ্বারাই শুরু করিয়াছেন। যা দ্বারা যাকাত উদ্দেশ্য হওয়া স্পষ্ট হইয়া যায়। কান্‌যুল উম্মাল কিতাবের লেখকও এই কারণেই উক্ত হাদীসকে যাকাতের অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছেন।

হাফেজ ইবনে আবদুল বার (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালায় এরশাদ **وَالَّذِينَ يَكْتِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ** এবং এই ধরনের আরও অন্যান্য আয়াতে আযাব ও শাস্তি সম্পর্কে বর্ণিত এরশাদসমূহ যাকাত আদায় না করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অধিকাংশ ফেকাহবিদগণেরও একই অভিমত এবং ইহাই হযরত ওমর, হযরত ইবনে ওমর, হযরত জাবের, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)এরও অভিমত। আর ইহার সমর্থন ঐ হাদীস দ্বারা হয়, যাহা ইমাম আবু দাউদ ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ উল্লেখ করিয়াছেন যে, হযরত উম্মে সালামা (রাযিঃ) বলেন, আমি স্বর্ণের একটি অলংকার পরিধান করিতেছিলাম। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহাও কি জমা রাখা সক্ষিত সম্পদের মধ্যে शामिल হইবে? হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যেই জিনিস যাকাতের পরিমাণ পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায়, অতঃপর উহার যাকাত আদায় করিয়া দেওয়া হয়, উহা জমা রাখা সক্ষিত ধন-সম্পদের মধ্যে शामिल নয়। এমনভাবে এই হাদীসের সমর্থন আবু হুরায়রা (রাযিঃ)এর হাদীস দ্বারাও হয়, যাহা ইমাম তিরমিযী ও হাকেম (রহঃ) উল্লেখ করিয়াছেন। উহাতে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে যে, যখন তুমি যাকাত আদায় করিয়া দিলে, তখন তুমি ঐ দ্রব আদায় করিয়া দিলে যাহা তোমার উপর ওয়াজিব ছিল। অনুরূপভাবে, হযরত জাবের (রাযিঃ)এর হাদীসে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করা হইয়াছে যে, যখন তুমি তোমার সম্পদের যাকাত আদায় করিয়া দিলে, তখন তুমি উহার ক্ষতি ও অনিষ্টতাকে দূর করিয়া দিলে।

হাকেম (রহঃ) এই হাদীসকে ইমাম মুসলিম (রহঃ)এর শর্তানুসারে মরফু সনদ সহকারে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বায়হাকী (রহঃ) ইহার সনদ হযরত জাবের (রাযিঃ)এর উপর মওকুফ বলিয়াছেন।

আবু যুরআ (রহঃ) এই হাদীসকে হযরত জাবের (রাযিঃ) হইতে মওকুফ সনদ সহকারে এই শব্দে সहीহ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন যে, যে সম্পদের যাকাত আদায় করিয়া দেওয়া হয়, উহা জমা করিয়া রাখা সক্ষিত ধন নয়। হযরত ইবনে ওমর ও হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতেও এইরূপই বর্ণিত হইয়াছে।

আতা ও মুজাহিদ (রহঃ) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে, যে সম্পদের যাকাত আদায় করিয়া দেওয়া হয়, উহা জমা করিয়া রাখা সক্ষিত সম্পদের মধ্যে शामिल নয় ; যদিও উহা মাটির নিচে গাড়িয়া রাখা হয়। আর যে সম্পদের যাকাত আদায় করা হয় না, উহা জমা করিয়া রাখা সম্পদের মধ্যে शामिल হইবে ; যদিও জমিনের উপর রাখা হয়। আর ইহা স্পষ্ট যে, শরীয়তের পরিভাষা আভিধানিক পরিভাষার উপর অগ্রাধিকার রাখে (অর্থাৎ, অভিধানে যদিও কান্য ঐ সম্পদকে বলে, যাহা মাটির নিচে গাড়িয়া রাখা হয় ; কিন্তু শরীয়তে কান্য ঐ সম্পদকে বলা হয়, যাহার যাকাত আদায় করা হয় নাই)। আর আমি কয়েকজন ব্যক্তি ছাড়া কাহাকেও ইহার বিপরীত মত পোষণ করিতে পাই নাই যে, জমা করিয়া রাখা সম্পদ বলিতে শুধু উহাকেই বুঝায়, যাহার যাকাত আদায় করা হয় নাই। অবশ্য এই কয়েকজন ভিন্নমত পোষণ করিয়াছেন, যেমন—হযরত আলী, হযরত আবু যর (রাযিঃ) ও যাহহাক (রহঃ) এবং আরও কয়েকজন দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত বুয়র্গ ব্যক্তি ; তাহারা এই মত পোষণ করিয়াছেন যে, সম্পদের মধ্যে যাকাত ছাড়াও কিছু হক রহিয়াছে।

তাহাদের মধ্যে হযরত আবু যর (রাযিঃ) তো এমনও বলিতেন যে, যে সম্পদ প্রয়োজনের অতিরিক্ত উহা সম্পূর্ণই জমা করিয়া রাখা সম্পদের অন্তর্ভুক্ত।

হযরত আলী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, চার হাজারের বেশী পরিমাণ জমা করিয়া রাখা সম্পদের অন্তর্ভুক্ত।

যাহহাক (রহঃ) বলেন, দশ হাজার দেহহামের পরিমাণ অধিক সম্পদ বলিয়া গণ্য হইবে।

ইবরাহীম নখরী, মুজাহিদ, শা'বী ও হাসান বসরী (রহঃ)ও এই মত পোষণ করেন যে, সম্পদের মধ্যে যাকাত ছাড়াও কিছু হক রহিয়াছে।

ইবনে আবদুল বার (রহঃ) বলেন, এই সমস্ত হযরতগণ ছাড়া অবশিষ্ট পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উলামায়ে কেরামের অভিমত জমা করিয়া রাখা সম্পদ সম্পর্কে উহাই, যাহা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। (অর্থাৎ, যে সম্পদের যাকাত আদায় করা হয় নাই, উহাই জমা করিয়া রাখা সম্পদ) অপর পক্ষ

যে সমস্ত আয়্যাত ও হাদীস দলীল হিসাবে পেশ করিয়া থাকেন, অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতে সবই মুস্তাহাব পর্যায়ের হুকুম। অথবা যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পূর্বের হুকুম, যাহা যাকাত ওয়াজিব হওয়ার দ্বারা রহিত হইয়া গিয়াছে, যেমন আশুরার রোযা রমযানের রোযার দ্বারা রহিত হইয়া গিয়াছে। অবশ্য, ফযীলতের পর্যায় এখনও বাকী আছে। (ইত্তহাক)

ইহার সমর্থন এই হাদীস দ্বারাও হয় যে, যখন গরীব মুহাজিরগণ অসহায় অবস্থায় হিজরত করিয়া মদীনা শরীফ পৌঁছিলেন এবং হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরম্পর সহানুভূতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে ধনী আনসারী সাহাবীগণের সহিত তাহাদের ভ্রাতৃত্ব বন্ধন করিয়া দিলেন, তখন আনসারগণ এই আবেদন জানাইলেন যে, আমাদের ধন-সম্পদও তাহাদের মধ্যে আধাআধি বন্টন করিয়া দিন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহা অস্বীকার করিলেন। বরং এই বলিয়া দিলেন যে, মুহাজিরগণ তাহাদের বাগানে কাজ করিবে এবং উৎপাদিত ফলের ভাগ বাটোয়ারাতে তাহাদের সহিত শরীক হইবে। এই পরিশ্রেক্ষিতে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ ও সাদ ইবনে রবী (রাযিঃ)এর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন করিয়া দিলেন। হযরত সাদ (রাযিঃ) হযরত আবদুর রহমান (রাযিঃ)কে বলিলেন, সকলেই জানে যে, আনসারদের মধ্যে আমি সর্বাপেক্ষা ধনী ব্যক্তি, আমি আমার অর্ধেক সম্পদ তোমাকে প্রদান করিতেছি। হযরত আবদুর রহমান (রাযিঃ) উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া বলিলেন, আমাকে বাজারের পথ বলিয়া দিন, সেখানে যাইয়া ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ শুরু করিয়া দিলেন। যদি ধনীদের অতিরিক্ত সম্পদের মধ্যে গরীবদের অধিকার থাকিত, তবে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আধাআধি বন্টনকে অস্বীকার করিলেন কেন, আর হযরত আবদুর রহমান (রাযিঃ) কেন নিজের অধিকার গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন।

সুফ্ফায় অবস্থানকারী সাহাবীগণের ঘটনাবলী এত অধিক পরিমাণে হাদীস ও সীরাতের কিতাবে মওজুদ রহিয়াছে যে, উহা বর্ণনা করাও অসম্ভব। তাহারা একাধারে কয়েকদিন পর্যন্ত উপবাসে কাটাইতেন। ক্ষুধার কারণে পড়িয়া যাইতেন। অথচ আনসারদের মধ্যে অনেক মালদারও ছিলেন। কিন্তু হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাহাকেও বাধ্য করেন নাই যে, তোমরা তোমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদের অংশ ইহাদের মধ্যে বন্টন করিয়া দাও। অবশ্য, এই ব্যাপারে উৎসাহ খুব প্রদান করিতেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন, আসহাবে সুফফা সত্তর জন সাহাবী ছিলেন। তাহাদের কাহারও নিকট চাদর ছিল না। (দূরে ঘানসুর)

হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) স্বয়ং নিজের এই ধরনের ঘটনাবলী অনেক বেশী বর্ণনা করিয়াছেন, যাহা হাদীসের কিতাবসমূহে রহিয়াছে। একবারের ঘটনা বর্ণনা করেন—ঐ সত্তর কসম! যিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই! প্রচণ্ড ক্ষুধার কারণে আমি উপুড় হইয়া পড়িয়া থাকিতাম এবং কখনও পেটের উপর পাথর বাঁধিয়া লইতাম। একবার আমি এই আশায় পথে বসিয়া গেলাম যে, হয়ত কেহ আমাকে তাহার সঙ্গে লইয়া যাইবে। এমন সময় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) তশরীফ আনিলেন। আমি তাহাকে একটি আয়াত শুধু এই উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, হয়ত তিনি আমাকে তাহার সঙ্গে লইয়া যাইবেন। কিন্তু তিনি চলিয়া গেলেন। তাহার পর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তশরীফ আনিলেন এবং আমার অবস্থা দেখিয়া মুচকি হাসিলেন এবং বলিলেন, আমার সঙ্গে চল। আমি সঙ্গে চলিলাম। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে তশরীফ লইয়া গেলেন। সেখানে একটি পেয়ালাতে দুধ রাখা ছিল। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কোথা হইতে আসিয়াছে। ঘরের লোকেরা বলিল, অমুক ব্যক্তি হাদিয়া স্বরূপ পাঠাইয়াছে। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, হে আবু হুরায়রা! তুমি সমস্ত আসহাবে সুফফাকে ডাকিয়া আন। আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন, আসহাবে সুফফাগণ ইসলামী মেহমান ছিলেন। না তাহাদের পরিবার-পরিজন ছিল, না তাহাদের নিকট অর্থ-সম্পদ ছিল, না কাহারও দারিতে তাহাদের খানা-পিনার ব্যবস্থা ছিল, না কাহারও উপর তাহাদের খরচের দায়িত্ব ছিল। যখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কোথাও হইতে সদকার কোন কিছু আসিত, তখন তাহাদেরকে দান করিতেন। নিজে উহা হইতে খাইতেন না। আর যখন কোন কিছু হাদিয়া স্বরূপ আসিত, তখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও উহা হইতে আহাৰ করিতেন এবং তাহাদেরকেও উহাতে শরীক করিয়া লইতেন। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বলিলেন যে, আসহাবে সুফফার সকলকে ডাকিয়া আন, তখন আমার বড় কষ্টবোধ হইল যে, মাত্র এক পেয়ালা দুধ; ইহাতে আসহাবে সুফফার কি হইবে। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি আমাকে দিয়া দিতেন, আমি পান করিয়া কিছু শক্তি পাইতাম। যখন আমি তাহাদের সকলকে লইয়া আসিব, তখন সকলকে পান করাইবার জন্য স্বকুম করিবেন। আমি যখন সকলকে পান

করাইব, তখন আমার পালা সকলের শেষে আসিবে। জানিনা তখন কিছু অবশিষ্ট থাকিবে কিনা। কিন্তু হুকুম তামিল করা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। আমি সকলকে ডাকিয়া আনিলাম। তাহারা সকলে আসিয়া হযূরের মজলিসে বসিয়া গেলে হযূর সেই পেয়ালা আমাকে দিয়া বলিলেন, সকলকে পান করাও। আমি সকলকে পান করাইলাম এবং সকলেই তৃপ্তি সহকারে পান করিল। অবশেষে, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আবু হুরায়রা! এখন শুধু তুমি আর আমিই বাকী রহিয়াছি। আমি আরজ করিলাম, জি হাঁ। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, লও, বসিয়া পান কর। আমি অত্যন্ত তৃপ্তি সহকারে পান করিলাম। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আরও পান কর। আমি আরও পান করিলাম। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার বলিলেন, আরও পান কর। আমি আবার আরও পান করিলাম। শেষ পর্যন্ত আমি আরজ করিলাম, হযূর! আমার পক্ষে আর পান করা সম্ভব নয়। অতঃপর অবশিষ্ট দুধ হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে পান করিলেন।

তিনি তাহার অপর একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যে, আমি তিন দিন যাবত ক্ষুধার্ত অবস্থায় ছিলাম। খাওয়ার মত কিছুই পাই নাই। আমি সুফফার দিকে যাইতেছিলাম, রাস্তায় পড়িয়া গেলাম। বালকরা বলিতে লাগিল, আবু হুরায়রা পাগল হইয়া গিয়াছে। আমি বলিলাম, তোমরা পাগল হইয়াছ। অবশেষে, আমি সুফফা পর্যন্ত পৌছিলাম। সেখানে কোথাও হইতে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দুই পেয়ালা সারীদ (এক প্রকার খানা) আসিয়াছিল আর তিনি আসহাবে সুফফাকে খাওয়াইতেছিলেন। আমার প্রতি হযূরের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আমিও বারবার মাথা উচু করিতেছিলাম। যাহাতে তিনি আমাকেও ডাকিয়া লন। ইতিমধ্যে সকলের খাওয়া শেষ হইয়া গেল। পেয়ালাতে কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার মোবারক হাত দ্বারা পেয়ালাগুলির চারিদিক হইতে মুছিয়া লইলেন, ইহাতে এক লোকমা পরিমাণ হইয়া গেল। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহা তাহার আঙ্গুলের উপর রাখিয়া আমাকে বলিলেন, আল্লাহর নাম লইয়া এখন হইতে খাও। আমি খাইলাম। ইহাতে আমার পেট ভরিয়া গেল।

হযরত ফাযালা ইবনে উবায়্যেদ (রাযিঃ) বলেন, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ফজরের নামায পড়িয়া বসিতেন, তখন আসহাবে সুফফার কোন কোন লোক প্রচণ্ড ক্ষুধার কারণে দাঁড়ান অবস্থায়

হইতে পড়িয়া যাইতেন, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের প্রতি তাকাইয়া বলিতেন, যদি তোমরা জানিতে যে, আল্লাহ তায়ালার নিকট তোমাদের কি মর্যাদা রহিয়াছে, তবে ইহার চাইতে অধিক অভাব-অনটনকে পছন্দ করিতে। (তারগীব)

প্রথম পরিচ্ছেদে ত্রিশ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজার গোত্রের একটি জামাতের বিস্তারিত ঘটনা উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহারা ক্ষুধার্ত ও বস্ত্রহীন অবস্থায় হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়াছিল। তাহাদের নিকট পরিধানের জন্য বস্ত্র ছিল না। খাওয়ার জন্য কিছুই ছিল না। ক্ষুধার কারণে খুবই কষ্ট ভোগ করিতেছিল। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ ঘরে তাহাদের জন্য খাবার তাল্লাশ করিলেন, কিছুই পাইলেন না। তখন লোকদেরকে একত্রিত করিয়া সদকার জন্য উৎসাহ প্রদান করিলেন এবং খুব ভালভাবে উৎসাহ দিলেন। ইহাতে বিভিন্ন সামানের দুইটি স্থূপ জমা হইল। অতঃপর উহা তাহাদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিলেন। না কাহারও উপর চাপ সৃষ্টি করিলেন, না কাহারও নিকট তাহার প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদের হিসাব চাহিলেন।

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, এক আনসারী সাহাবী আসিয়া হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সাহায্য চাহিল। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার ঘরে কি কিছুই নাই? তিনি আরজ করিলেন, একটি চট আছে, যাহার অর্ধেক বিছানা হিসাবে ব্যবহার করি আর বাকী অর্ধেক গায়ে দেই। আর পানি পান করার জন্য একটি পেয়ালা আছে। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিনিস দুইটি আনাইয়া দুই দেবহাম মূল্যে বিক্রয় করিয়া দিলেন এবং উহা তাহাকে দিয়া বলিলেন, এক দেবহামের খাদ্যদ্রব্য খরিদ করিয়া ঘরে দিয়া আস, আর এক দেবহাম দ্বারা একটি কুঠার খরিদ করিয়া লইয়া আস। সে লইয়া আসিলে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে উহাতে হাতল লাগাইয়া দিলেন। অতঃপর বলিলেন, যাও কাঠ কাটিয়া বিক্রয় কর। পনের দিনের মধ্যে যেন আমি তোমাকে এখানে না দেখি। সে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা মত কাজ করিল। পনের দিনে দশ দেবহাম উপার্জন করিয়া আনি। উহা হইতে কিছু দ্বারা খাদ্যদ্রব্য খরিদ করিল, আর কিছু দ্বারা কাপড় খরিদ করিল। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইহা মানুষের নিকট সওয়াল করা হইতে উত্তম। কেননা, ভিক্ষা করিলে কিয়ামতের দিন তোমার চেহারায় দাগ হইত। অতঃপর হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, শুধু তিন প্রকার

মানুষের জন্য সওয়াল করার অনুমতি রহিয়াছে : **لِذِي فَقْرٍ مُّذْفِعٍ أَوْلِيٍّ** অর্থাৎ, এক, ঐ ব্যক্তির জন্য, যে জীবন নাশকারী অভাবে লিপ্ত হইয়াছে, দ্বিতীয়, ঐ ব্যক্তির জন্য, যে কোন কঠিন অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে, তৃতীয়, ঐ ব্যক্তির জন্য, যে যন্ত্রণাদায়ক খুনের দায়ে দায়ী হইয়াছে। এই তিন অবস্থাতেও হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু সওয়াল করারই অনুমতি দিয়াছেন। উপরে বর্ণিত ঘটনায় আনসারী লোকটি যেই অভাবে লিপ্ত ছিল, তাহাকে না সওয়ালের অনুমতি দিয়াছেন, না কাহারও উপর তাহার খরচাদি ওয়াজিব করিয়াছেন। মোটকথা, হাদীসের কিতাবসমূহে হাজার হাজার ঘটনা সাক্ষ্য দেয় যে, মালদারদের উপর ওয়াজিব শুধুমাত্র ষাকাতই। ইহার উপর কোন কিছু বৃদ্ধি করিলে তাহা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐ প্রসিদ্ধ হাদীসের ত্বকুমে শামিল হইবে, যাহাতে এরশাদ হইয়াছে : **الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَا نَوَّهَا** অর্থাৎ, সদকার ব্যাপারে সীমালংঘন ও অতিরঞ্জনকারী ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে সদকা প্রদান করে না।

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যাহ্‌হাক ইবনে কায়েস (রাযিঃ)কে সদকা উসূল করার জন্য পাঠাইলেন। তিনি সেই মালের মধ্য হইতে বাছাই করিয়া উৎকৃষ্ট উট লইয়া আসিলেন। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহা দেখিয়া বলিলেন, তুমি তাহাদের উৎকৃষ্ট মাল লইয়া আসিয়াছ! তিনি আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই সমস্ত আপনি জিহাদে যাওয়ার ইচ্ছা করিতেছেন, এইজন্য আমি এইরূপ উট আনিয়াছি, যাহার উপর আরোহণ করা যায় এবং সামান-পত্র বহন করা যায়। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইহা ফেরত দিয়া আস এবং সাধারণ মাল লইয়া আস। (মাজমাউয়-যাওয়াইদ)

অথচ এখানে জিহাদের প্রয়োজনীয়তা একটি স্পষ্ট বিষয় এবং সেই সময় হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্নভাবে এমন এমন উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) তাহার ঘরের সমগ্র সামান লইয়া আসিয়াছেন। হযরত উমর (রাযিঃ) প্রত্যেক জিনিসের অর্ধেক পেশ করিয়া দিয়াছেন। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাযিঃ) একবার আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার নিকট চার হাজার পরিমাণ আছে। দুই হাজার পরিবারের খরচের জন্য রাখিয়া, দুই হাজার আল্লাহর জন্য পেশ করিতেছি। অন্য এক সাহাবী আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি সারারাত্র মজদুরী করিয়া দুই সা' (অর্থাৎ, সাত সের) পরিমাণ খেজুর পারিশ্রমিক হিসাবে পাইয়াছি, তন্মধ্যে

অর্ধেক পরিবারের খরচের জন্য রাখিয়া বাকী অর্ধেক লইয়া হাজির হইয়াছি। (দূরে মানসুর)

হযরত আবু মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদকার হুকুম করিতেন, তখন আমাদের মধ্যে কাহারও কাহারও নিকট কিছুই থাকিত না। তখন সে শুধু এই জন্য বাজারে যাইত, মজদুরী করিত এবং পারিশ্রমিক হিসাবে এক মুদ (অর্থাৎ, দেড় পোয়া) পরিমাণ খেজুর কামাই করিত। অতঃপর উহা সদকা করিয়া দিত। (বুখারী)

প্রথম পরিচ্ছেদের চব্বিশ নম্বর হাদীসে উক্ত বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত কিছু সত্বেও নিয়ম হিসাবে এখানে সাধারণ উটের পরিবর্তে উৎকৃষ্ট উটও গ্রহণ করেন নাই। এইজন্য সম্পদ হিসাবে উহার মধ্যে ওয়াজিব একমাত্র যাকাতই। আর যতদূর খরচ করার বিষয়টি রহিয়াছে, উহা এই যে, মুসলমান সম্পদ জমা করিয়া রাখার জন্য পয়দাই হয় নাই। কুরআন পাকের আয়াত ও হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদসমূহ যাহা প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হইয়াছে, উহা অত্যন্ত জোরদারভাবে এই বিষয়ে উৎসাহ প্রদান ও তাকিদ করিতেছে যে, সম্পদ শুধু এইজন্য যে, উহাকে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির কাজে খরচ করা হইবে।

নিজে সাধ্য অনুযায়ী কষ্ট করিবে এবং অন্যদের জন্য খরচ করিবে। উহাই শুধু নিজের কাজে আসিবে, যাহা আল্লাহ তাআলার ভাণ্ডারে জমা করিয়া দেওয়া হইবে। কেননা, তাহার ব্যাংকে জমা করিয়া দেওয়ার পর না উহা ধ্বংস হইবার আশংকা আছে, না ব্যাংক ফেল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আর এমন প্রয়োজনের সময় কাজে আসিবে, যখন মানুষ চরম মুখাপেক্ষী হইবে।

স্বয়ং আল্লাহ তাআলার এরশাদ, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করিতেছেন, হে মানুষ, তুমি তোমার সম্পদ আমার নিকট প্রবাহিত করিয়া দাও। না আগুন লাগার ভয় থাকিবে, না চুরির ভয় থাকিবে, আর না পানিতে ডুবিয়া যাওয়ার ভয় থাকিবে। আর আমি এমন সময় ঐ সম্পদ তোমাকে পরিপূর্ণরূপে দিব, যখন তুমি অত্যন্ত মুখাপেক্ষী হইবে।

(তাকীম)

প্রথম পরিচ্ছেদের ত্রিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলার বাণী উল্লেখ করা হইয়াছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি যেন চিন্তা করে, কালকিয়ামতের জন্য সে কি জিনিস পাঠাইয়াছে। তোমরা ঐ সমস্ত লোকের মত হইও না, যাহারা আল্লাহ তাআলাকে ভুলিয়া গিয়াছে। ফলে, আল্লাহ তাআলা স্বয়ং

তাহাদের নিজেদেরকে ভুলাইয়া দিয়াছেন। দ্বিতীয় আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে, তোমাদের ধন-সম্পদ সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য পরীক্ষার বস্তু। আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিতে থাক। ইহা তোমাদের জন্য উত্তম হইবে। উক্ত পরিচ্ছেদের এক নম্বর হাদীসে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে, আমার নিকট যদি ওহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ থাকে, তবু আমি ইহা পছন্দ করি না যে, শুধুমাত্র স্বর্ণ আদায়ের পরিমাণ ব্যতীত উহা হইতে সামান্য কিছুও নিজের নিকট রাখি।

তিন নম্বর হাদীসে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে, যে জিনিস প্রয়োজনের অতিরিক্ত, তাহা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিয়া দেওয়া তোমাদের জন্য উত্তম ; জমা করিয়া রাখা মন্দ।

চার নম্বরে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে, গণনা করিয়া খরচ করিও না ; যতটুকু সম্ভব হয়, খরচ করিয়া ফেল।

বিশ নম্বরে এই ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে যে, একটি বকরী জবেহ করিয়া উহার একটি রানের টুকরা ব্যতীত বাকী সব বণ্টন করিয়া দেওয়া হইল। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, কতটুকু বণ্টন করা হইয়াছে। আরজ করা হইল, একটি রান বাকী রহিয়া গিয়াছে এবং বাকী সব খরচ করা হইয়াছে। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, রান ব্যতীত সবই বাকী রহিয়া গিয়াছে। এই ধরনের আরও অনেক হাদীস প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হইয়াছে। এইজন্য কি পরিমাণ খরচ করা ওয়াজিব বা মুস্তাহাব বা উত্তম এই চিন্তা না করিয়া চিন্তা করা উচিত যে, একমাত্র ঐ সম্পদই নিজের কাছে আসিবে, যাহা মানুষ নিজের জীবদ্দশায় আখেরাতের জন্য পাঠাইয়া দিবে। নিজের মেহনত ও কষ্টার্জিত সম্পদ যদি নিজের প্রয়োজনে কাছে আসিবার জন্য কোন জায়গায় হেফাজত করিয়া রাখিতে হয়, তবে উহার উপায় শুধু আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিয়া দেওয়া। উহার লাভ আখেরাতে তো পাওয়া যাইবেই, দুনিয়াতেও অনেক বেশী পাওয়া যাইবে। যেমন, বালা-মুসীবত দূর হওয়া এবং রোগ-শোক হইতে সুস্থ থাকার মধ্যে সদকা খরচাতে অনেক দখল রহিয়াছে। উহার কারণে অপমৃত্যু হইতেও হেফাজত হয়।

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রসিদ্ধ হাদীস রহিয়াছে, দুই ব্যক্তি ঈর্ষার যোগ্য—এক, ঐ ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ তায়ালা কুরআন পাক দান করিয়াছেন ; সে রাত্রদিন উহার তেলাওয়াত ও উহার উপর আমল করার মধ্যে মগন থাকে। দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি, যাহাকে আল্লাহ তায়ালা

অনেক ধন-সম্পদ দান করিয়াছেন, আর সে সব সময় উহাকে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার মধ্যে মাতিয়া থাকে। (মাজমাউয়-যাওয়াযিদ)

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র এরশাদ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের তিন নম্বর হাদীসে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ধনবান ব্যক্তির বড় ক্ষতির মধ্যে রহিয়াছে ; ঐ ব্যক্তি ছাড়া, যে দুই হাতে এদিক-ওদিক ডানে-বামে সামনে-পিছনে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিতে থাকে। সাত নম্বর হাদীসে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে, ঐ ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে মুমিন নয়, যে নিজের পেট ভরিয়া খায় ; অথচ তাহার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকে। মোটকথা, এই কিতাবের প্রথম পরিচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে এই বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে, যাহার সারসংক্ষেপ এই যে, ধন-সম্পদ জমা করিয়া রাখা মুসলমানের জন্য কখনও শোভনীয় নয়। ইহার সঠিক উদাহরণ সম্পূর্ণ পায়খানার মত। এত প্রয়োজনীয় যে, এক দুইদিন না হইলে ডাক্তার-কবিরাজ ও ঔষধপত্র ইত্যাদি সবকিছু করিতে মানুষ বাধ্য হয়। কিন্তু যদি পরিমাণে বেশী হইতে শুরু হয়, তবে উহা বন্ধ করিবার জন্যও ডাক্তার-কবিরাজের প্রয়োজন হয়। যদি কোন ব্যক্তি তাহার ঘরে পায়খানা রাখিয়া দেয়, যেহেতু উহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় জিনিস এবং বড় কষ্টে হাসিল হইয়াছে, তবে ঘর দুর্গন্ধে ভরিয়া যাইবে, মস্তিষ্কও খারাপ হইয়া যাইবে, বিভিন্ন রোগ পয়দা হইবে। ধন-সম্পদের অবস্থাও তদ্রূপ ; প্রয়োজন এত বেশী যে, যদি কয়েক দিন কিছু না থাকে, তবে উহার জন্য সর্ব্বকম চেষ্টা করিতে হয়, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও এত দুর্গন্ধময় যে, যদি তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরিমাণ সম্পদকে পায়খানার মত ঘর হইতে বাহির করা না হয়, তবে উহার কারণে অহংকার পয়দা হয়, দাঙ্কিতা পয়দা হয়, পরস্পর গর্ব পয়দা হয়, অন্যদের প্রতি তুচ্ছ তাচ্ছিল্যতার মনোভাব পয়দা হয়, বেচ্ছাচারিতা ও বিলাসিতা পয়দা হয়। মোটকথা, সবধরনের আপদ ইহার কারণে দেখা দেয়। এইজন্য হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার বংশধরদের জন্য দোয়া করিয়াছেন : **اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقِي** অর্থাৎ, হে আল্লাহ। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তানদেরকে প্রয়োজন পরিমাণ রিযিক দান কর। অর্থাৎ, প্রয়োজনের অতিরিক্ত কখনও দিও না, যাহার ফলে ফেতনা-ফাসাদ দেখা দেয়। এই কারণেই সাইয়েদ বংশীয় লোক সাধারণতঃ বেশী সম্পদশালী হয় না। এক দুইজনের সম্পদশালী হওয়া উক্ত দোয়ার পরিপন্থী নয়। কেননা, অধিকাংশই অধিক সম্পদশালী নয়। আল্লাহ তায়ালী যদি নিজ দয়া ও

মেহেরবানী দ্বারা দুনিয়ার নাপাক প্রকৃত রূপকে এই নাপাক অধমের উপরও প্রকাশ করিয়া দেন, তবে কতই না স্বাদের জীবন লাভ হইবে।

⑤ عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَنَعَ قَوْمٍ مِنَ الزَّكَاةِ إِلَّا ابْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِالتَّيْنِ (رواه الطبرانی في الأوسط ورواه ثقات كذا في الترغيب وفي الباب روايات كثيرة في الترغيب والمكناز وغيرهما)

حضرت انس رضি الله عنه فرماتے ہیں :
 ارشاد ہے کہ جو قوم بھی زکوٰۃ کو روک
 لیتی ہے، حق تعالیٰ اس کو قحط
 میں مبتلا فرماتے ہیں۔

⑤ ছবুর সালামুলাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে কোন সম্প্রদায় যদি যাকাত বন্ধ করিয়া দেয়, তবে আল্লাহ তায়ালা তাহাদেরকে দুর্ভিক্ষে লিপ্ত করিয়া দেন। (তারগীব : তাবারানী আওসাত)

ফায়দা : দুর্ভিক্ষের আপদ আমাদের উপর এমনভাবে চাপিয়া রহিয়াছে, যাহার কোন শেষ নাই। উহা দূর করার জন্য হাজার হাজার চেষ্টা-তদবীর করা হইতেছে ; কিন্তু কোন কাজে আসিতেছে না। যখন আল্লাহ তায়ালা কোন গোনাহের কারণে বিপদ নাযিল করেন, তখন দুনিয়াতে কাহারও শক্তি নাই যে, উহাকে দূর করিতে পারে। লাখো চেষ্টা-তদবীর করুন, হাজার রকমের আইন প্রণয়ন করুন, যে বিপদ সমগ্র জগতের মালিকের পক্ষ হইতে আসিয়াছে, উহা তো তিনিই ইচ্ছা করিলে দূর করিতে পারেন। তিনি রোগ বলিয়া দিয়াছেন ; উহার সঠিক চিকিৎসাও বলিয়া দিয়াছেন। যদি রোগ দূর করিতে হয়, তবে সঠিক চিকিৎসা গ্রহণ করুন। আমরা নিজেরাই রোগের কারণ সৃষ্টি করি, আর এই বলিয়া কাঁদিতে থাকি যে, রোগ বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহা কোন ধরনের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হইল।

এই জগতে যত দুর্ঘটনা ও বিপদ-আপদ দেখা দেয়, সেইগুলির কারণ সম্পর্কে ছবুর সালামুলাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষভাবে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। এই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে আমি আমার 'আল-এতেদাল' কিতাবে লিখিয়াছি। এখানে উহার পুনরাবৃত্তি করিলে কিতাব দীর্ঘ হইয়া যাইবে। কাহারও ইচ্ছা হইলে উক্ত কিতাবে দেখিয়া লইতে পারেন।

উহা পড়ার দ্বারা বুঝিতে পারিবেন যে, ছবুর সালামুলাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম কি পরিমাণ এইতেমাম ও গুরুত্বসহকারে এই বিষয়ে সতর্ক করিয়াছেন যে, যখন আমার উম্মত এইরূপ কাজকর্ম করিতে আরম্ভ করিবে, তখন তাহারা আপদ-বিপদে পড়িয়া যাইবে। তখন অগ্নিবৃদ্ধ, জমিনে ধসিয়া যাওয়া, চেহারা বিকৃতি, ভূমিকম্প, আসমান হইতে পাথর বর্ষণ, শত্রুর বিজয় এবং মুসলমানদের উপর তাহাদের প্রভাব বিস্তার করা, মহামারী, হত্যা, ডাকাতি ও লুটতরাজ ব্যাপক হওয়া, বৃষ্টি বন্ধ হইয়া যাওয়া, তুফান আসা, অন্তরের ভয়-ভীতি বৃদ্ধি পাওয়া, নেক লোকেরা দোয়া করিলে তাহাদের দোয়াও কবুল না হওয়া ; এই সমস্ত বিপদ-আপদের কথা হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়া দিয়াছেন। কি কি কারণে কি কি বিপদ আসে, উহাও হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায় চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে বলিয়া দিয়াছেন, সতর্ক করিয়া দিয়াছেন এবং আমরা আমাদের জীবনে উহা প্রত্যক্ষও করিতেছি। আর এই সমস্ত কথা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হইতেছে, সামান্যতমও পার্থক্য হইতেছে না। হায়! আমরা যদি হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মত দয়ালু নবীর বাণীসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতাম। তিনি শুধু মুসলমানদের জন্যই নয় ; সমস্ত সৃষ্টির জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরিত হইয়াছিলেন। আর এই সমস্ত নিয়ম-নীতির উপর আমল করা সমস্ত মখলুকের জন্য একান্ত উপকারী।

কিন্তু স্বয়ং মুসলমানরাই যখন ইসলামের দাবীদার হওয়া সত্ত্বেও উহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না তখন অন্যদের কি দোষ দেওয়া যাইবে। আর অন্যরা এই ব্যাপারে কি জানিবে যে, আল্লাহ তায়ালা নবী যিনি আপাদমস্তক রহমত ছিলেন সকল প্রকার বিপদ-আপদ হইতে বাঁচিবার জন্য কত মূল্যবান নীতিমালার প্রতি সতর্ক করিয়াছেন। এখনও যদি এই সকল নীতিমালাকে গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করা হয়, তবে সমগ্র পৃথিবী বিপদ হইতে রক্ষা পাইতে পারে। মুসলমান ডাক্তার-কবিরাজের চিকিৎসা অমুসলিমরাও গ্রহণ করিয়া থাকে। আবার অমুসলিম ডাক্তারদের চিকিৎসা মুসলমানরাও গ্রহণ করিয়া থাকে। যদি সেই বিজ্ঞ চিকিৎসক হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী লোকেরা আমল করে, তবে সকলে কতই না সুখ ও আরাম লাভ করিত! এখানে মূল বিষয় যাকাত সম্পর্কিত দুই একটি হাদীস দ্বারা সতর্ক করাই আমার উদ্দেশ্য।

হযরত ইবনে উমর (রাযিঃ) বলেন, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার এরশাদ করিলেন, হে মুহাজিরগণ! পাঁচটি জিনিস

এমন রহিয়াছে, যদি তোমরা উহাতে লিপ্ত হইয়া যাও, আর আল্লাহর নিকট তোমাদের এইসব জিনিসে লিপ্ত হওয়া হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। (তবে তোমরা বড় ধরনের আপদ-বিপদে লিপ্ত হইয়া যাইবে।)

১. যে জাতির মধ্যে প্রকাশ্যে অশ্লীল কাজ আরম্ভ হইবে, তাহাদের মধ্যে এমন নতুন নতুন রোগ দেখা দিবে, যাহা পূর্বে কখনও শোনা যায় নাই।

২. আর যাহারা ওজনে কম দিবে, তাহাদের উপর দুর্ভিক্ষ ও দুঃখ-কষ্ট এবং শাসকের জুলুম চাপাইয়া দেওয়া হইবে।

৩. যে জাতি যাকাত বন্ধ করিয়া দেয়, তাহাদের উপর বৃষ্টি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। যদি জীবজন্তু না থাকিত, তবে এক ফোটা বৃষ্টিও বর্ষিত হইত না। (জীবজন্তু যেহেতু আল্লাহ তায়ালার মখলুক ও নিষ্পাপ, তাহাদের কারণে সামান্য বৃষ্টিপাত হইবে।)

৪. যাহারা ওয়াদা ভঙ্গ করিবে, তাহাদের উপর অন্য জাতি বিজয় লাভ করিবে এবং ধন-সম্পদ লুট করিয়া লইবে।

৫. যাহারা আল্লাহ তায়ালার আইনের বিপরীত ফয়সালা করিবে, তাহাদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাইবে। (তারগীব)

আজ আমাদেরকে অত্যন্ত গভীরভাবে এই সমস্ত দোষের প্রতি লক্ষ্য করা উচিত যে, উহার মধ্য হইতে কোন দোষটি এমন রহিয়াছে, যাহার মধ্যে আমরা লিপ্ত হই নাই। সেই সঙ্গে গভীরভাবে ইহাও চিন্তা করা উচিত যে, উহার কারণে যে সমস্ত বিপদের কথা বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে কোন বিপদটি এমন রহিয়াছে, যাহা আমাদের উপর আসিয়া পড়ে নাই।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, পাঁচটি জিনিসের বিনিময়ে পাঁচটি জিনিস রহিয়াছে। কেহ আরজ করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইহার কি অর্থ? হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যে জাতি ওয়াদা ভঙ্গ করে, তাহাদের উপর শত্রু জয়যুক্ত হইয়া যায়। আর যে সমস্ত লোক আল্লাহ তায়ালার আইনের বিপরীত ফয়সালা করিবে, তাহাদের মধ্যে মৃতের সংখ্যা বাড়িয়া যাইবে। যাহারা যাকাত বন্ধ করিয়া দিবে, তাহাদের উপর বৃষ্টি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। যাহারা মাপে কম দিবে, তাহাদের ফসল কমিয়া যাইবে এবং দুর্ভিক্ষ চাপিয়া বসিবে। (তারগীব)

এই হাদীসে সম্ভবতঃ সংক্ষেপ করা হইয়াছে, কেননা, বর্ণনায় চারটি জিনিস উল্লেখ করা হইয়াছে। এই হাদীসে আল্লাহ তায়ালার হুকুমের

বিপরীত ফয়সালা করিলে মৃতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কথা এবং পূর্বের হাদীসে গৃহযুদ্ধের কথা বলা হইয়াছে। এই দুইটি জিনিস ভিন্ন ভিন্নও হইতে পারে। আর গৃহযুদ্ধের কারণে মৃতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার নমুনা বর্তমানে তো স্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

হযরত আলী ও হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে হাদীস বর্ণনা করা হইয়াছে যে, যখন আমার উম্মত এই পনেরটি দোষনীয় কাজে লিপ্ত হইয়া যাইবে, তন্মধ্যে এই দুই বিষয়ও উভয় হাদীসে রহিয়াছে যে, যাকাত আদায় করা জরিমানা মনে করিবে (অর্থাৎ, যাকাত আদায় করা এমন কষ্টকর হইয়া যাইবে যেমন, জরিমানা আদায় করা কষ্টকর হয় অথবা জরিমানার মত তাহাদের নিকট হইতে যাকাত উসূল করা হয়), তখন অগ্নিঝড়, ভূমিকম্প, জমিনে ধসিয়া যাওয়া, চেহারা বিকৃতি, আসমান হইতে পাথর বর্ষণ, একাধারে এমনভাবে একের পর এক বিপদ-আপদ অবতীর্ণ হইতে থাকিবে, যেমন তসবীহের সুতা ছিড়িয়া গেলে উহার দানা একটির পর একটি পড়িতে থাকে। ‘এ’তেদাল’ কিতাবে এই সমস্ত রেওয়াজাত সম্পূর্ণরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। উহাতে সেই পনেরটি দোষের বিস্তারিত বিবরণও রহিয়াছে। যাহার কারণে কঠিন কঠিন আযাবের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। উপরোক্ত রেওয়াজাতসমূহ ছাড়াও এই ধরনের বিষয়বস্তুর উপর আরও বেশ কিছু রেওয়াজাত উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানে শুধু যাকাতের আলোচনার কারণে এই সমস্ত রেওয়াজাতের দিকে ইঙ্গিত করিয়া দেওয়া হইল।

⑥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا سَمِعْتُهُ مِنْهُ وَكَانَتْ أَكْثَرُهُمْ لِرُؤُوسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُمَرُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَلَفْتُ مَالًا فِي بَيْتٍ وَلَا بَيْعٍ إِلَّا يَحْبِسُ الزَّكَاةَ -

ইরশাদ ہے کہ جو مال کسی جنگل میں یا ویا میں کہیں بھی ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ کے روکتے ہے ضائع ہوتا ہے۔

(رواه الطبرانی في الأوسط وهو غريب كذا في الترهيب وله شاهد من حديث عباد بن الصامت في الكنز برواية ابن عساکر)

৬) হযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে কোন সম্পদ স্থলে অথবা সমুদ্রে যেখানেই নষ্ট হয়, উহা যাকাত আটকাইয়া রাখার কারণে নষ্ট হয়। (তারগীবঃ তাবারানী আওসাত)

ফায়দা : অর্থাৎ, যাকাত আদায় না করার যে ক্ষতি ও শাস্তি আখেরাতে রহিয়াছে, উহা তো আছেই, দুনিয়াতেও উহার ক্ষতি এই যে, সম্পদ ধ্বংসের কারণ হয়।

অন্য এক হাদীসে এই হাদীস সম্পর্কে একটি ঘটনাও বর্ণিত হইয়াছে। হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রাযিঃ) বলেন, হযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা মুকাররমায় হাতীমের ছায়াতে বসিয়াছিলেন। এক ব্যক্তি আসিয়া আরজ করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! অমুক পরিবারের মালপত্র সমুদ্রের তীরে পড়িয়াছিল, উহা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। (সমুদ্রের ঢেউয়ের কারণে সম্ভবতঃ ধ্বংস হইয়াছে) হযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, স্থলভাগে অথবা সমুদ্রে যে কোন সম্পদ (স্থলভাগে বা সমুদ্রে, অর্থাৎ, সমগ্র দুনিয়াতে) এই কারণেই ধ্বংস হয় যে, উহার যাকাত আদায় করা হয় নাই। তোমরা যাকাত আদায়ের মাধ্যমে তোমাদের সম্পদের হেফাজত কর। সদকা ও দান-খয়রাতের মাধ্যমে তোমাদের রোগীদের চিকিৎসা কর, আর আকস্মিক বিপদসমূহকে দোয়ার মাধ্যমে দূর কর, কেননা, দোয়া ঐ সমস্ত বিপদকে দূর করিয়া দেয়, যাহা আসিয়া পড়িয়াছে আর ঐ বিপদকেও দূর করে, যাহা এখনও আসে নাই।

হযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাও বলিতেন যে, আল্লাহ তায়ালা যে জাতির উন্নতি ও টিকিয়া থাকা চাহেন, সেই জাতির মধ্যে পবিত্রতা, নম্রতা ও দানশীলতা দান করেন। আর যে জাতির বিলুপ্তি ও ধ্বংসের ইচ্ছা করেন, তাহাদের মধ্যে খেয়ানত পয়দা করিয়া দেন। অতঃপর হযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন : **إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَاهُمْ مُبْلِسُونَ** এই আয়াত সূরা আনআমের পঞ্চম রুকুতে রহিয়াছে, যাহা **لَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ** দ্বারা শুরু হইয়াছে। ইহার পূর্বের দুই আয়াতে শিক্ষা ও উপদেশ হাসিল করার জন্য পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের ধ্বংসের একটি মূল কারণ এরশাদ করিয়াছেন যে, আমি পূর্বকার উম্মতদের প্রতিও ; যাহারা আপনার পূর্বে ছিল, পয়গাম্বর পাঠাইয়াছিলাম (যখন তাহারা পয়গাম্বরদের কথা মানিল না, তখন) আমি তাহাদেরকে বিপদ-আপদ ও রোগ-ব্যাধির দ্বারা পাকড়াও করিয়াছি। (অর্থাৎ, বিভিন্ন বিপদ-আপদ ও রোগ-ব্যাধির মধ্যে লিপ্ত করিয়াছি) যাহাতে তাহারা বিনয় প্রকাশ করে।

অতঃপর যখন তাহাদের উপর আমার (পক্ষ হইতে বিপদ-আপদের) শাস্তি পৌঁছিয়াছিল, তখন তাহারা বিনয় প্রকাশ করিল না কেন (যাহাতে তাহাদের প্রতি দয়া করা হইত এবং তাহাদের অন্যায় ক্রমা করিয়া দেওয়া হইত)? কিন্তু তাহাদের অন্তর তো কঠিন হইয়া গিয়াছিল। (কাজেই তাহারা কিভাবে নসীহত কবুল করিবে) আর শয়তান তাহাদের আমলসমূহকে (যাহা তাহারা পূর্ব হইতে করিয়া আসিতেছিল, তাহাদের দৃষ্টিতে) সুসজ্জিত করিয়া দেখাইতেছিল (যেই কারণে তাহারা নিজেদের ঐ সমস্ত মন্দ কাজে লিপ্ত রহিল, যাহাকে তাহারা ভাল কাজ বলিয়া মনে করিতেছিল)। অতঃপর যখন তাহারা ঐ সমস্ত কাজ ভুলিয়া রহিল, যাহার প্রতি পয়গাম্ভরদের পক্ষ হইতে তাহাদিগকে নসীহত করা হইত (এবং উহার প্রতি তাহারা মোটেও আক্ষেপ করিল না) তখন আমি তাহাদের উপর (ভোগ-বিলাসিতা ও আরাম আয়েশের) সকল দরজা খুলিয়া দিলাম। অবশেষে, তাহারা যখন ঐ সমস্ত জিনিসের কারণে (যাহা ভোগ-বিলাসের জন্য পাইয়াছিল) অহংকার করিতে লাগিল। (ফলে, তাহাদের গোমরাহি আরও বৃদ্ধি পাইয়া গেল,) তখন আমি তাহাদেরকে (আযাবের মধ্যে এমনভাবে) হঠাৎ গ্রহণতার করিলাম (যে, এই ব্যাপারে তাহারা ধারণাও করিয়াছিল না)। এইভাবে জালেমদের শিকড় পর্যন্ত কাটিয়া গেল।

এই সমস্ত আযাতের মধ্যে বড় শিক্ষণীয় বিষয় রহিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা নাকরমানী সত্ত্বেও যদি কোন প্রকার শাস্তির পরিবর্তে ভোগ-বিলাস ও আরাম আয়েশের ব্যবস্থা হইতে থাকে তবে ইহা অত্যন্ত বিপদজনক।

এক হাদীসে আসিয়াছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন তুমি দেখ, কোন ব্যক্তি অনবরত ওনাহে লিপ্ত থাকে সত্ত্বেও তাহার উপর দুনিয়ার প্রাচুর্য বৃদ্ধি পাইতেছে তখন বুঝিয়া লও যে, তাহাকে আল্লাহ তায়ালা পক্ষ হইতে টিল দেওয়া হইতেছে। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত **فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ** তেলাওয়াত করিলেন।

হযরত আবু হাযেম (রহঃ) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে, যখন তুমি আল্লাহ তায়ালা নাকরমানী করা সত্ত্বেও তোমার উপর তাহার নেয়ামতসমূহ অনবরত বর্ষণ হইতে দেখ, তখন আল্লাহকে ভয় করিতে থাক। আর যে নেয়ামত আল্লাহ তায়ালা নৈকট্য পয়দা না করে, উহা বিপদ স্বরূপ। (দুররে মানসূর)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে সতের নম্বর হাদীসে এই বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আসিতেছে। যেহেতু ধন-সম্পদও আল্লাহ তায়ালায় নেয়ামতসমূহের মধ্যে একটি বড় নেয়ামত, সেহেতু উহাকে আল্লাহ তায়ালায় দরবারে অধিকতর নৈকট্যলাভের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। যদি কোন ব্যক্তি ধন-সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিয়া নৈকট্যলাভ করার পরিবর্তে আল্লাহ তায়ালায় গুরুত্বপূর্ণ ফরজ যাকাতই আদায় না করে, তবে তাহার নাফরমানীর মধ্যে কোন সন্দেহ নাই। এই ধরনের লোকের জন্য নিজের ধন-সম্পদ বাকী থাকার বেশী আশা করা চাই না। কেননা, সে নিজেই উহা ধ্বংস হইয়া যাওয়ার চেষ্টায় লিপ্ত রহিয়াছে। আর খোদা না চাহেন, যদি এইরূপ অবস্থায়ও তাহার সম্পদ ধ্বংস না হয়, তবে ইহা আরও বেশী বিপদজনক। কেননা, এমনতাবস্থায় ইহা আরও বড় কোন বিপদের পূর্বাভাস। আল্লাহ তায়ালা আপন মেহেব্বানীতে হেফাজত করুন।

④ عَنْ عَائِشَةَ ۖ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَالَطَتِ الزَّكَاةُ مَالًا قَطُّ إِلَّا أَهْلَكَتَهُ۔
 حُضْرًا أَقْدَسَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 کا پاک ارشاد ہے کہ جس مال کو حاتمہ
 زکوٰۃ کا مال مل جاتا ہے وہ اس مال کو
 ہلاک کیے بغیر نہیں رہتا۔

(رواه الشافعي والبخاري في تاريخه هكذا في المشكوة
 وعزاه المسندى الى البزار والبيهقى)

① হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই মালের সহিত যাকাতের মাল মিশিয়া যায়, উহা সেই মালকে ধ্বংস না করিয়া ছাড়ে না। (মিশকাত : বুখারী তারীখ, শাফেয়ী)

ফায়দা : ওলামায়ে কেরাম এই হাদীসের দুইটি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উভয়টাই সঠিক এবং উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়। প্রথমতঃ যেই মালে যাকাত ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে, অথচ উহা হইতে যাকাত বাহির করা হয় নাই, সেই মাল সম্পূর্ণই যাকাতের সহিত মিশিয়া গিয়াছে এবং এই যাকাতের মাল সমস্ত মালকেই ধ্বংস করিয়া দিবে। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী উক্ত হাদীস পূর্বে বর্ণিত হাদীসের অর্থই হইল। কেননা, পূর্বের হাদীসে এই বিষয়টিই বর্ণিত হইয়াছে।

হাফেজ ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) 'মুনতাকা' কিতাবে এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। এইজন্যই তিনি এই হাদীসের উপর ভিত্তি করিয়া যাকাত নীঘ

আদায় করার অধ্যায় কয়েম করিয়াছেন।

হুমাইদী (রহঃ) এই হাদীসের উপর লিখিয়াছেন যে, তোমার উপর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পর যদি যাকাত বাহির না কর, তবে হারাম মাল হালাল মালকেও ধ্বংস করিয়া দিবে। অর্থাৎ, যাকাতের মাল যাহাকে আটকাইয়া রাখা হারাম, উহা অবশিষ্ট সেই মালকে ধ্বংস করিয়া দিবে, যাহা স্বমা রাখা হালাল ছিল।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে। যে ব্যক্তি নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়, অর্থাৎ সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা অথবা উহার সমমূল্য কোন জিনিস প্রয়োজনের অতিরিক্ত তাহার নিকট থাকে ; অথচ সে নিজেকে অভাবী প্রকাশ করিয়া কাহারও নিকট হইতে যাকাতের মাল গ্রহণ করে, এমতাবস্থায় এই মাল তাহার পূর্বের নিজের মালকেও ধ্বংস করিয়া দিবে। (মিশকাত)

এই হাদীসের কারণে ঐ সমস্ত লোকদের অত্যন্ত ভয় করিতে থাকা উচিত, যাহারা নেসাবের মালিক হওয়া সত্ত্বেও লোকদের নিকট হইতে যাকাত গ্রহণ করিয়া থাকে। কেননা, এই যাকাতের মাল তাহাদের আসল মালকেও ধ্বংস করিয়া দিবে। সামান্য লাভের জন্য অনেক বড় লোকসানের মধ্যে পড়িতে হইবে। অতঃপর চাই তাহারা চোরকে গালি দিতে থাকুক অথবা জালেমদেরকে বদদোয়া করিতে থাকুক, নিজের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ সম্পদ তো ধ্বংসই হইয়া যাইবে। উপরন্তু, যাকাত গ্রহণ করার উপযুক্ত না থাকা সত্ত্বেও উহা গ্রহণ করার গোনাহ মাথার উপর থাকিয়া যাইবে।

حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں
کہ جو شخص طیب مال (حلال مال) کا مالک
ذکرۃ کا ادا کرنا اس کو خبیث بنا دیتا
ہے، اور جو شخص حرام مال کا مالک ذکرۃ
کا ادا کرنا اس کو پاک نہیں بناتا۔

⑧ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
قَالَ مَنْ كَسَبَ طَيِّبًا خَبِثَتْهُ مَنَعَ
الزَّكَاةَ وَمَنْ كَسَبَ خَبِيثًا لَمْ
تُطَيِّبْهُ الزَّكَاةُ۔

(معاد الطبرانی فی الکبیر موقوفاً باسناد منقطع کذا فی الترغیب)

⑨ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, যে ব্যক্তি পবিত্র মাল (হালাল মাল) কামাই করে, যাকাত আদায় না করা ঐ মালকে অপবিত্র বানাইয়া দেয়। আর যে ব্যক্তি হারাম মাল কামাই করে, যাকাত

আদায় করা ঐ মালকে পবিত্র করে না। (তোরগীব : তাবারানী কাবীর)

ফায়দা : কত বড় কঠিন ধর্মিক। অত্যন্ত মেহনত ও কষ্ট করিয়া জায়েয ও নাজায়েয বিচার করিয়া যেই সম্পদ কামাই করিয়াছিল, সামান্য কৃপণতার কারণে উহার যাকাত আদায় করিল না, ইহাতে তাহার সমস্ত সম্পদ আল্লাহ তায়ালায় নিকট অপবিত্র হইয়া গেল।

এক হাদীসে ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি হারাম পন্থায় মাল কামাই করিল অতঃপর উহা সদকা করিল, ইহাতে তাহার জন্য কোন সওয়াব নাই এবং উহার শাস্তি তাহার উপর বহাল থাকিবে। (তোরগীব) অর্থাৎ, হারাম কামাইয়ের শাস্তি তাহার মাথায় রহিল এবং এই সদকার সওয়াবও সে পাইবে না।

① عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ
تَقْلَدَتْ قِلَادَةً مِنْ ذَهَبٍ
فَلَيْدَتْ فِي عُنُقِهَا مِثْلَهَا مِنْ
النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَيُّمَا
امْرَأَةٍ جَعَلَتْ فِي أُذُنِهَا
خُرْمًا مِنْ ذَهَبٍ جُعِلَ فِي
أُذُنِهَا مِثْلُهُ مِنَ النَّارِ

حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں
کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے گلے میں
سوئے کا ڈال دے گی، اس کے گلے میں
اسی طرح کا آگ کا مار قیامت کے دن
ڈالا جائے گا، اور جو عورت اپنے کان
میں سوئے کی بالی ڈالے گی، اُس کے
کان میں اسی جیسی آگ کی بالی قیامت
کے دن ڈالی جائے گی۔

(رواه ابو داؤد والنسائی بإسناد جيد كذا في الترغيب)

② হযরত আসমা (রাযিঃ) বলেন, ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে মহিলা গলায় স্বর্ণের হার পরিবে, অনুরূপ আগুনের হার কিয়ামতের দিন তাহার গলায় পরানো হইবে। আর যে মহিলা কানে স্বর্ণের বালি পরিবে, অনুরূপ আগুনের বালি কিয়ামতের দিন তাহার কানে পরানো হইবে। (তোরগীব : আবু দাউদ, নাসায়ী)

ফায়দা : উক্ত হাদীস দ্বারা মহিলাদের জন্য স্বর্ণ পরিধান করা নাজায়েয ও হারাম মনে হয়। এই কারণে কোন কোন আলেম ইহাকে ইসলামের প্রাথমিক যুগের হাদীস হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। কেননা, সমস্ত উলামায়ে কেরামের নিকট অন্যান্য হাদীসের ভিত্তিতে মহিলাদের জন্য

স্বর্ণ-রৌপ্যের অলংকার পরিধান করা জায়েয আছে। কিন্তু কোন কোন আলেম উক্ত হাদীসকে এবং এইরূপ অন্যান্য হাদীসকে যাকাত আদায় না করার অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। কোন কোন রেওয়াজাত দ্বারা ইহার সমর্থনও পেশ করিয়াছেন। যেমন, স্বয়ং হযরত আসমা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, আমি এবং আমার খালা হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম। আমাদের হাতে স্বর্ণের চুড়ি ছিল। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি ইহার যাকাত আদায় কর? আমরা আরজ করিলাম, না। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা কি এই বিষয়ে ভয় কর না যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে আগুনের চুড়ি পরাইবেন? ইহার যাকাত আদায় করিও। (তারগীব)

এই রেওয়াজাত এই বিষয়ে অত্যন্ত স্পষ্ট যে, উহার পরিবর্তে জাহান্নামের আগুন পরিধান করা তখনই হইবে, যখন উহার যাকাত আদায় না করা হইবে। মহিলাদেরকে এই বিষয়ে অত্যন্ত খেয়াল রাখিতে হইবে, যে অলংকার আচ্ছ শরীরের শোভা বর্ধন করিতেছে, উহা যাকাত আদায় না করার কারণে কাল জাহান্নামের জ্বলন্ত আগুনে রূপান্তরিত হইয়া শরীরের জন্য শাস্তির কারণ হইবে।

হযরত আসমা (রাযিঃ) হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশ্নের জবাবে বলিলেন, যাকাত আদায় করি না, ইহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, তখনও পর্যন্ত এই মাসআলা তাহার জানা ছিল না। যেমন, অন্য হাদীসে তাহার যাকাত সম্পর্কে প্রশ্ন করার দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয়। ইহাও হইতে পারে যে, তখন পর্যন্ত তিনি অলংকারকে মহিলাদের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসের অন্তর্ভুক্ত মনে করিতেন। অথচ অলংকার প্রকৃতপক্ষে প্রয়োজনীয় বস্তু নয়; বরং একটি অতিরিক্ত জিনিস। এই অর্থ অনুযায়ী ইহা শুধু স্বর্ণের বৈশিষ্ট্য নয় বরং রূপারও একই হুকুম। যেমন, অন্য এক হাদীসে আছে, হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, একবার হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তলবীফ আনিলেন। তখন আমার হাতে রূপার চুড়ি দেখিতে পাইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি? হযরত আয়েশা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, আমি ইহা এইজন্য বানাইয়াছি যে, আপনার জন্য সাজ-সজ্জা করিব। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইহার যাকাত আদায় কর কি? আমি আরজ করিলাম, না। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, জাহান্নামের আগুনের জন্য তো তোমার এতটুকুই যথেষ্ট। (তারগীব)

এই হাদীসে হযরত আয়েশা (রাযিঃ) এর যাকাত না দেওয়া সম্পর্কে উপরোল্লিখিত দুইটি কারণ ছাড়া তৃতীয় কারণ ইহাও হইতে পারে যে, রূপার চুড়ির ওজন সাধারণতঃ এই পরিমাণ হয় না, যাহা নেসাব পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে। আর হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদের অর্থ এই যে, একটি অলংকারের পরিমাণ যদিও নেসাব পরিমাণ নয় ; কিন্তু অন্যান্য অলংকারের সহিত মিলাইলে নেসাব পর্যন্ত পৌঁছিয়া যাইতে পারে। তখন উহার উপর যাকাত ওয়াজিব হইবে।

অন্য এক হাদীসে আছে, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে একজন মহিলা হাজির হইল। তাহার সহিত তাহার কন্যাও ছিল। তাহার হাতে দুইটি ভারী স্বর্ণের চুড়ি ছিল। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি কি ইহার যাকাত আদায় কর? সে আরজ করিল, না। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি কি ইহাতে রাজি আছ যে, আল্লাহ তায়ালা ইহার পরিবর্তে তোমাকে দুইটি আগুনের চুড়ি কিয়ামতের দিন পরাইয়া দিবে? সে ইহা শুনিয়া সঙ্গে সঙ্গে চুড়ি দুইটি এই বলিয়া হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পেশ করিয়া দিল যে, ইহা আল্লাহর ওয়াগ্ধে দান করিতেছি। (তরগীব)

ইহাই ছিল সাহাবায়ে কেরামের পুরুষ ও মহিলাদের বৈশিষ্ট্য, আল্লাহ তায়ালা অথবা তাহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী শুনিবার পর উহার উপর আমল করিবার ব্যাপারে কোনরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব করিতেন না। এই সমস্ত রেওয়াজাত অনুযায়ী সকল প্রকার স্বর্ণ-রৌপ্যের অলংকারের একই হুকুম। যাকাত আদায় না করিলে জাহান্নামের আগুনের শাস্তির ব্যাপারে উভয়ই বরাবর ; যদিও কোন রেওয়াজাতে স্বর্ণের অলংকারের কথা বলা হইয়াছে অথবা কোন রেওয়াজাতে রূপার অলংকারের কথা বলা হইয়াছে। যে সমস্ত রেওয়াজাতে অলংকারের ব্যাপারে যাকাতের উল্লেখ নাই এবং স্বর্ণরৌপ্যের মধ্যে পার্থক্য করা হইয়াছে ঐ সমস্ত রেওয়াজাতের কারণে কোন কোন আলেম ইহাও বলিয়াছেন যে, সেই ক্ষেত্রে জাহান্নামের আগুনের শাস্তি অহংকার, গর্ব ও লোক দেখানোর কারণে হইবে।

একটি রেওয়াজাত দ্বারা এই অর্থের সমর্থনও পাওয়া যায়, যেমন আবু দাউদ শরীফ ও নাসায়ী শরীফের এক রেওয়াজাতে আছে, যে মহিলাগণ। তোমাদের অলংকারের জন্য রূপা কি যথেষ্ট নয়? মনে রাখিও, যে মহিলা সোনার অলংকার বানাইবে এবং উহা প্রকাশ করিবে, উহার কারণে তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইবে। (তরগীব)

সাধারণতঃ দেখা যায়, মহিলাদের মধ্যে বিশেষ করিয়া যাহারা মূর্খতার কারণে নিজেদেরকে উচ্চ বংশীয়া মনে করে, তাহাদের নিকট রূপার অলংকার কোন গুরুত্ব রাখে না। তাহারা রূপার অলংকারকে প্রকাশ করার বা গর্ব করার মত জিনিসই মনে করে না। তাহাদের হাতে যদি রূপার চুড়ি থাকে, তখন উহাকে প্রকাশ করার সামান্যতম মানসিকতাও পয়দা হয় না। কিন্তু হাতে যদি স্বর্ণের চুড়ি থাকে, তখন বিনা কারণে মাছি তাড়াইবার বাহানায় পঞ্চাশ বার হাত নাড়াচাড়া করিবে। বিশ্ববার ওড়না ঠিক করার বাহানায় হাত নাড়াইবে। বিশেষ করিয়া নূতন কোন মহিলা ঘরে আসিলে অথবা সে নিজে অন্য কাহারও ঘরে গেলে তো অবস্থা এমন হয়, না মাছি তাহার শরীর হইতে উড়িয়া যায়, আর না তাহার ওড়না ঠিক হয়; বারবার হাত নাড়াচাড়া করিতে থাকে। এইরূপ নাড়াচাড়া করা দ্বারা অন্যের উপর অহংকার করা ও নিজের অলংকার অন্যকে দেখানো উদ্দেশ্য হয়। সুতরাং উভয় বিষয়েই অত্যন্ত যত্ন সহকারে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, অলংকার দ্বারা যেন গর্ব অহংকার এবং উহা প্রকাশ করা কখনও উদ্দেশ্য না হয় এবং গুরুত্ব সহকারে উহার যাকাত আদায় করা চাই। এই উভয়ের মধ্য হইতে কোন একটির প্রতিও যদি লক্ষ্য না রাখা হয়, তবে শাস্তির জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখিতে হইবে।

حضرت عثمانؓ فرماتے ہیں، کہ جب حق تعالیٰ شانہ نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم فرمایا، تو منافق آدمی بدترین پھیل جو اس کے پاس ہوتے تھے وہ دیا کرتے تھے اس پر حق تعالیٰ شانہ نے قرآن مجید میں آیت شریفہ وَلَا تَقْرَبُوا الْغَيْبَ مِنْهُ تَنْفِقُونَ -	① عَنْ النَّضَّالِ قَالَ كَانَ أَنَسٌ مِنَ الْمَنَافِقِينَ حِينَ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُؤَدَّى الزَّكَاةُ يَجِئُئُونَ بِصَدَقَاتِهِمْ بِأَرْقَامَا وَعِنْدَهُمْ مِنَ الثَّمَرِ فَأَمَّلَ اللَّهُ وَلَا تَيَمَّمُوا الْغَيْبَ مِنْهُ تَنْفِقُونَ -

(اخرجہ ابن جریر وغیرہ کذا فی الدر المنثور)

⑤০ হযরত যাহ্যাক (রহঃ) বলেন, যখন আল্লাহ তায়ালা যাকাত আদায় করার হুকুম করিলেন, তখন মূনাফেকরা তাহাদের নিকট যে ফল থাকিত, উহা হইতে অতি নিকট ফল দান করিত। তখন আল্লাহ তায়ালা কুরআন পাকে এই আয়াত وَلَا تَيَمَّمُوا الْغَيْبَ مِنْهُ নাখিল করিলেন।

(দুরর : ইবনে জারীর)

ফায়দা : উক্ত আয়াতটি সূরা বাকারার সাইত্রিশ নম্বর কুরুর প্রথম আয়াতের অংশবিশেষ। এই আয়াতটি **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طِبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ** হইতে শুরু হইয়াছে। আয়াতের অর্থ এই যে, হে ঈমানদারগণ! তোমরা (নেক কাজে) নিজদের উপার্জন হইতে উৎকৃষ্ট মাল খরচ কর। আর ঐ জিনিস হইতে (উৎকৃষ্ট মাল খরচ কর) যাহা আমি তোমাদের জন্য জমিন হইতে উৎপন্ন করিয়াছি (অর্থাৎ, ফল ইত্যাদি) এবং উহা হইতে নিকৃষ্ট মাল খরচ করার মনস্থ করিও না। অথচ (যদি তোমাদেরকে এইরূপ নিকৃষ্ট জিনিস কেহ তোমাদের পাওনা পরিশোধে অথবা হাদিয়া স্বরূপ প্রদান করে, তবে) তোমরা কখনও উহা গ্রহণ করিবে না ; তবে যদি তোমরা চক্ষু বদ্ধ করিয়া (চক্ষুলজ্জায়) গ্রহণ করিয়া লইয়া লও। আর এই কথা বুঝিয়া লও যে, আল্লাহ তায়ালা কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন (যে, এইরূপ নিকৃষ্ট মাল দ্বারা খুশী হইয়া বাইবেন, তিনি) প্রশংসার যোগ্য।

উপরোক্ত আয়াতগুলি প্রসঙ্গে অনেক হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। সবগুলির মূলকথা একই।

হযরত বারা (রাযিঃ) বলেন, এই আয়াতগুলি আমাদের আনসারদের সম্পর্কে নাথিল হইয়াছে। আমরা বাগানের মালিক ছিলাম। প্রত্যেকেই নিজ নিজ বাগান হইতে কম ও বেশী খেজুর আনিত। কেহ কেহ খেজুরের এক দুই কাঁদি মসজিদে লটকাইয়া দিত।

সুফ্ফায় অবস্থানকারী সাহাবীগণ গরীব ছিলেন। তাহাদের খাওয়া-দাওয়ার কোন বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না। তাহাদের কাহারও ক্ষুধা লাগিলে সে ঐ ঝুলন্ত কাঁদিতে লাঠি দিয়া আঘাত করিত এবং কাঁচা-পাকা খেজুর যাহা নিচে পড়িত উহা খাইয়া লইত। কিছু লোক তাহাদের দান সদকার কাজে তেমন আগ্রহ ছিল না, তাহারা নিকৃষ্ট ধরনের বা নষ্ট হইয়া যাওয়া খেজুরের কাঁদি লটকাইয়া দিত। এই বিষয়ে উক্ত আয়াত নাথিল হইয়াছে। যাহার অর্থ এই যে, যদি তোমাদেরকে হাদিয়া স্বরূপ এইরূপ জিনিস দেওয়া হয়, তবে তোমরা চক্ষুলজ্জায় খাতিরে হয়ত গ্রহণ করিবে, কিন্তু এমনিতে লইবে না। ইহার পর হইতে উৎকৃষ্টমানের খেজুরের কাঁদি আসিতে আরম্ভ হইল। এই বিষয়ের উপর অনেক রেওয়ায়াত বর্ণিত হইয়াছে।

অন্য এক হাদীসে আছে, কোন কোন লোক বাজার হইতে সস্তা মাল খরিদ করিয়া উহা সদকা করিত। তখন এই আয়াত নাথিল হয়।

হযরত আলী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এই আয়াত ফরজ যাকাত সম্পর্কে নাথিল হইয়াছে। যখন লোকেরা খেজুর কাটিত, তখন

উত্তমগুলি বাছিয়া পৃথক করিয়া লইত। যখন যাকাত গ্রহণের জন্য লোক আসিত, তখন নিকটগুলি তাহাদের সম্মুখে পেশ করিত।

এক হাদীসে আছে, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার মসজিদে তশরীফ লইয়া গেলেন। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে একটি লাঠি ছিল। মসজিদে কেহ নিকট খেজুরের একটি কাঁদি লটকাইয়া রাখিয়াছিল। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহাতে লাঠি দ্বারা আঘাত করিয়া বলিলেন, যে ব্যক্তি ইহা লটকাইয়াছে, সে ইহা হইতে উত্তম যদি লটকাইত, তবে কী ক্ষতি হইত? সে জামাতে এইরূপ নিকট খেজুরই পাইবে। (দুররে মানসূর)

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন, মিসকীনদেরকে ঐ মাল খাওয়াইও না, যাহা তোমরা নিজেরা খাইতে পার না। (কানয)

অন্য এক হাদীসে আছে, গোশতের মধ্যে গন্ধ হইয়া যাওয়ার পর হযরত আয়েশা (রাযিঃ) ইচ্ছা করিলেন, উহা কাহাকেও আল্লাহর ওয়াস্তে দিয়া দিবেন। তখন হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এমন জিনিস সদকা করিতেছ, যাহা নিজে খাও না? (জামউল-ফাওয়ায়িদ) অর্থাৎ, যখন আল্লাহ তায়ালার নামে দেওয়া হইতেছে, তখন যথাসম্ভব উত্তম মাল দেওয়া চাই। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, উত্তম দিতে পারিতেছে না বলিয়া নিকট মালও দিবে না। তবে তো একেবারেই বাদ পড়িয়া গেল। বরং উৎকৃষ্ট দেওয়ার তওফীক না হইলে একেবারে না দেওয়ার চাইতে নিকট মাল দেওয়াই উত্তম। যাকাতের মধ্যে নিকট মাল দেওয়া যাকাত না দেওয়ার মতই।

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে যাকাত আদায় করার নিয়ম সম্পর্কে চতুর্থ পরিচ্ছেদের ছয় নম্বর হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালার নামে উত্তম মাল চাহেন আর না নিকট মালের অনুমতি দেন ; বরং মধ্যম ধরনের মাল চাহেন। যাকাত আদায়ের জন্য ইহাই আসল মূলনীতি।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) তাহার অধীনস্থদেরকে যাকাত উসূল করার ব্যাপারে যে সমস্ত নিয়ম লিখিয়া দিয়াছেন, উহাতে যাকাত সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ লিখিয়াছেন। ভূমিকায় লিখিয়াছেন, যে ব্যক্তি এই বিবরণ অনুযায়ী যাকাত উসূল করিবে, তাহার নিকট যাকাত দিবে আর যে ইহার অতিরিক্ত চাহিবে, তাহাকে দিবে না।

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত মুআয (রাযিঃ)কে

ইয়ামানের শাসনকর্তা বানাইয়া পাঠাইলেন, তখন নামাযের হুকুমের পর যাকাত আদায় করার হুকুম দিলেন এবং এরশাদ করিলেন যে, যখন তাহারা যাকাত আদায় করিবে, তখন তাহাদের উত্তম মাল লওয়ার চেষ্টা করিবে না। মজলুমের বদদোয়া হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। কেননা, মজলুমের বদদোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে কোন বাধা থাকে না।

ইমাম যুহরী (রহঃ) বলেন, যখন সরকারী লোক যাকাত উসুল করার জন্য আসিবে, তখন বকরীগুলিকে তিন ভাগ করিবে—উত্তমগুলি এক জায়গায় আর নিকটগুলি এক জায়গায়, তৃতীয় অংশে মধ্যমগুলি হইবে, আর উহা হইতে যাকাতের মাল গ্রহণ করিবে। (আবু দাউদ)

যাকাত উসুলকারীর জন্য ইহাই মূলনীতি। কিন্তু যাকাত প্রদানকারী যদি নিজ খুশীতে সর্বোত্তম মাল দান করে, তবে ইহাতে দোষ নাই। যেমন, ছয় নম্বর হাদীসের ব্যাখ্যায় সাহাবায়ে কেরামের কিছু ঘটনা এবং হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে যে, তোমরা যদি নিজ খুশীতে নিয়মের অতিরিক্ত উত্তম মাল দিতে চাও, তবে আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে ইহার বিনিময় দান করিবেন। যাকাতদাতা এই কথা মনে করিয়া যে, আখেরাতে শুধু ইহাই নিজের কাজে আসিবে; যেন সর্বোত্তম মাল বাছাই করিয়া দেয়।

ইমাম গায়যালী (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আখেরাতের জন্য যাকাত আদায় করিতে চায়, তাহার জন্য কিছু আদব ও কিছু নিয়মনীতি রহিয়াছে, উহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

ইমাম গায়যালী (রহঃ) এই বিষয়ে অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। আমি উহাকে খুব সংক্ষেপে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু ব্যাখ্যা সহকারে উল্লেখ করিতেছি; হুবহু অনুবাদ নয়।

ইমাম গায়যালী (রহঃ) আটটি আদব উল্লেখ করিয়াছেন—

১. সর্বপ্রথম বুঝিয়া লইতে হইবে যে, যাকাত কেন ওয়াজিব হইয়াছে, কেন ইহাকে ইসলামের রোকন সাব্যস্ত করা হইয়াছে। ইহার কারণ তিনটি—

ক. যাকাত এইজন্য ওয়াজিব করা হইয়াছে যে, শুধু জ্বানে কালেমাকে স্বীকার করিয়া লওয়ার অর্থ হইল আল্লাহ তায়ালাকে এককভাবে মাবুদ স্বীকার করা। অর্থাৎ, ইহা স্বীকার করা যে, তাহার সহিত অন্য কোন কিছু শরীক নাই। এই স্বীকৃতি তখনই পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারে, যখন মহব্বতের দাবীদার অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা প্রতি মহব্বতের দাবী করে তাহার অন্তরে একমাত্র ঐ পবিত্র সত্তা ব্যতীত

ইচ্ছাকৃতভাবে অন্য কোন কিছুর অবকাশ না থাকে। কেননা, মহব্বত কখনও অংশীদারিত্বকে সহ্য করে না। আর শুধু মৌখিক মহব্বতের দাবী নিরর্থক; প্রকৃত মহব্বতের পরীক্ষা তখনই হইতে পারে, যখন অন্য কোন প্রিয় জিনিসের সহিত মোকাবেলা হয়। আর ধন-সম্পদ স্বভাবতঃই প্রত্যেকের নিকট প্রিয় হইয়া থাকে। এইজন্য আল্লাহ তায়ালা সহিত মহব্বত এবং এককভাবে তাহাকে মাবুদ হিসাবে স্বীকার করার বিষয়ে পরীক্ষার কষ্টিপাথর স্বরূপ সম্পদ খরচ করাকে ফরজ করা হইয়াছে। উহা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা সহিত মানুষের মহব্বতের প্রমাণ হয়।

এইজন্যই আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন : **إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ** অর্থাৎ, 'নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের নিকট হইতে তাহাদের জ্ঞান, মাল এই বিনিময়ে খরিদ করিয়া লইয়াছেন যে, তাহারা জাহ্নাত লাভ করিবে।' (তওবা : ১১১) জিহাদের মাধ্যমে জ্ঞান খরিদ করিয়া লওয়া হইয়াছে। আর মাল খরচ করা জ্ঞান খরচ করা অপেক্ষা সহজ। আর যখন মাল খরচ করা মহব্বতের পরীক্ষার কষ্টিপাথর, তখন এই পরীক্ষার ক্ষেত্রে মানুষ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে—

প্রথম প্রকার ঐ সমস্ত লোক, যাহারা আল্লাহ তায়ালা একত্বকে সত্যিকারভাবে স্বীকার করিয়াছে যে, তাহার মহব্বতের মধ্যে অন্য কাহারও সামান্যতম অংশীদারিত্বও আসিতে দেয় নাই এবং নিজের অঙ্গীকারকে পূরাপূরিভাবে আদায় করিয়াছে। অর্থাৎ, সমস্ত সম্পদকে তাহার নামে কোরবান করিয়া দিয়াছে। নিজের জন্য না কোন দিনার রাখিয়াছে, না কোন দেহহাম, কাজেই এখানে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

এই কারণেই কোন কোন বুযুর্গ হইতে বর্ণিত আছে, তাহাকে কেহ জিজ্ঞাসা করিল, দুইশত দেহহামের মধ্যে কি পরিমাণ যাকাত ওয়াজিব হয়? তখন তিনি বলিয়াছেন, সাধারণ লোকদের উপর শরীয়তের নিয়ম হিসাবে পাঁচ দেহহাম; কিন্তু আমাদের জন্য সমুদয় সম্পদ খরচ করিয়া দেওয়া জরুরী।

এই কারণেই হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) নিজের সমস্ত মাল হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পেশ করিয়া দিয়াছেন এবং মহব্বতের দাবীকে এমনভাবে পূরা করিয়াছেন যে, মাহবুবকে ছাড়া কিছু রাখেন নাই।

দ্বিতীয় প্রকার হইল, যাহারা মধ্যম পর্যায়ের লোক, তাহারা প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদ রাখিয়া দেয়। তাহারা ঐ সমস্ত লোক, যাহারা

আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসে তো মশগুল হয় না ; তবে প্রয়োজন পরিমাণ জমা করিয়া রাখে, আর প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ খরচ করিয়া দেয়। ইহারা খরচের ব্যাপারে যাকাতের পরিমাণকে যথেষ্ট মনে করে না। বরং অতিরিক্ত সম্পদ যাহা কিছু থাকে, সব খরচ করিয়া ফেলে।

এই কারণেই কোন কোন তাবয়ী যেমন, ইমাম নাখশী, শাবী (রহঃ) প্রমুখ হযরতগণের অভিমত হইল, সম্পদের মধ্যে যাকাত ছাড়াও অন্যান্য ওয়াজিব হক রহিয়াছে। তাহাদের মতে ধনী ব্যক্তিদের ওয়াজিব দায়িত্ব হইল, যেখানেই কোন অভাবী লোক দেখিবে, যাকাতের অতিরিক্ত সম্পদ হইতেও তাহাদের প্রয়োজন মিটাইয়া দিবে। কিন্তু ফেকাহশাম্ব্র অনুযায়ী সঠিক ইহাই যে, যদি কোথাও কোন ব্যক্তি নিরুপায় অবস্থায় পৌছিয়া যায়, তবে তাহার প্রয়োজন পূরা করা ফরজে কেফায়া। আর এই ব্যাপারে উলামাদের মতভেদ রহিয়াছে যে, নিরুপায় ব্যক্তির উপর এই পরিমাণ খরচ করা যাহাতে সে ধ্বংসের হাত হইতে বাঁচিয়া যায় দান হিসাবে জরুরী, নাকি তাহাকে ঋণ হিসাবে দিলেও এই ফরজে কেফায়া আদায় হওয়ার জন্য যথেষ্ট হইবে? যাহারা ঋণ হিসাবে দেওয়ার কথা বলেন, তাহারা যেন তৃতীয় প্রকারেরই অন্তর্ভুক্ত।

আর তৃতীয় প্রকার হইল, নিম্নপর্যায়ের লোকদের। যাহারা শুধু ওয়াজিব অর্থাৎ, যাকাত পরিমাণই আদায় করে ; না উহা হইতে কম করে, না বেশী করে। সাধারণ লোকেরা বেশীর ভাগ এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত, কেননা, সম্পদের সহিত তাহাদের মহক্বত রহিয়াছে। তাহারা উহা খরচ করিতে কৃপণতা করে। আখেরাতের প্রতি তাহাদের আগ্রহ কম।

ইমাম গাযযালী (রহঃ) এই তিন প্রকার মানুষের কথাই লিখিয়াছেন। চতুর্থ প্রকারকে তিনি উল্লেখ করেন নাই। যাহারা ওয়াজিব পরিমাণও পূরাপূরি আদায় করে না, অথবা একেবারেই আদায় করে না। কেননা, এই সমস্ত লোক তো তাহাদের মহক্বতের দাবীতে একেবারেই মিথ্যাবাদী। মিথ্যা মহক্বতের দাবীদারদের আলোচনা করিয়া কি লাভ।

খ. যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ইহাও একটি কারণ যে, যাকাত দ্বারা মানুষকে কৃপণতার দোষ হইতে পবিত্র করা উদ্দেশ্য, যাহা বড় ধ্বংসাত্মক জিনিস।

হযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তিনটি জিনিস অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক—এক, ঐ লোভ ও কৃপণতা, যাহার আনুগত্য করা হয় (অর্থাৎ, কোন ব্যক্তি যদি স্বভাবতগতভাবে কৃপণ হয়, কিন্তু সে তাহার স্বভাবের বিরুদ্ধে আমল করে, স্বভাবের উপর চাপ সৃষ্টি করে, তবে

এই কৃপণতা ধ্বংসাত্মক নয়। যেই কৃপণতা অনুযায়ী আমল করা হয়, উহা ধ্বংসাত্মক।) দ্বিতীয় ধ্বংসাত্মক জিনিস হইল, নফসের ঐ خواهশ, যাহার অনুসরণ করা হয়। (ইহারও একই অর্থ, যেমন কাহারও মধ্যে خواهশ আছে, কিন্তু সে উহাকে কঠোরভাবে বাধা প্রদান করে, তখন উহা ধ্বংসাত্মক নয় বরং ধ্বংসাত্মক তখন হইবে, যখন خواهশ অনুযায়ী আমল করিবে।) তৃতীয় ধ্বংসাত্মক জিনিস হইল, প্রত্যেকের নিজের মতামতকে সকলের চাইতে উত্তম মনে করা।

ইহা ছাড়া কুরআন পাকের বিভিন্ন আয়াত এবং অনেক হাদীসে কৃপণতার নিন্দা বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে হইতে কিছু যেমন, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হইয়াছে। মানুষের মধ্য হইতে কৃপণতার দোষ এইভাবে দূর করা যাইতে পারে যে, তাহাকে জোরপূর্বক সম্পদ খরচ করার ব্যাপারে অভ্যস্ত করা হয়। কেননা, কাহারও সহিত ভালবাসা ও সম্পর্ক ছিন্ন করিতে হইলে নিজেকে তাহার নিকট হইতে দূরে রাখিতে বাধ্য করিতে হয়। যাহাতে তাহার মহব্বত দূর হইয়া যায়। এই হিসাবেই যাকাতকে পবিত্রতার মাধ্যম বলা হয়। কেননা, উহা মানুষকে কৃপণতার অপবিত্রতা হইতে পবিত্র করে। আর যত বেশী পরিমাণ সম্পদ খরচ করিবে, যত বেশী আনন্দচিহ্নে খরচ করিবে আর আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিতে যত ভাল লাগিবে, ততই কৃপণতার অপবিত্রতা হইতে পবিত্রতা হাসিল হইবে।

গ. যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ইহাও একটি কারণ যে, ইহা আল্লাহ তায়ালা সম্পদ জাতীয় নেয়ামতের শুকরানাস্বরূপ। কেননা, প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন ও সম্পদে আল্লাহ তায়ালা এত অধিক পরিমাণ দয়া ও অনুগ্রহ রহিয়াছে যে, উহার কোন শেষ নাই। সুতরাং শারীরিক এবাদতসমূহ, শারীরিক নেয়ামতসমূহের শোকরানা স্বরূপ এবং মাল দ্বারা সংঘটিত এবাদতসমূহ, মাল জাতীয় নেয়ামতসমূহের শোকরানা স্বরূপ। ঐ ব্যক্তি কত নিচ ও অপদস্থ, যে কোন গরীবকে দেখে, তাহার দরিদ্রতা, দুঃখবস্থা এবং অভাব-অনটনের কষ্ট দেখে, তবুও তাহার অন্তরে আল্লাহ তায়ালা ঐ নেয়ামতের শোকরগোয়ারীর খেয়াল আসে না, যাহা আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি করিয়াছেন। অর্থাৎ, তাহাকে ভিক্ষা করা হইতে বাঁচাইয়াছেন এবং সেই ফকিরের মত অন্যের সম্মুখে নিজের প্রয়োজন প্রকাশ করা হইতে রক্ষা করিয়াছেন। বরং তাহাকে এই উপযুক্ত করিয়াছেন যে, অন্যরা তাহার নিকট নিজের প্রয়োজন প্রকাশ করে। ইহার শোকরগোয়ারী কি এই নয় যে, সে নিজের সম্পদের দশভাগের

একভাগ, অথবা চল্লিশভাগের একভাগ আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় খরচ করিবে। (দশভাগের একভাগ দ্বারা উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশ এবং চল্লিশ ভাগের এক ভাগ দ্বারা যাকাতকে বুঝানো হইয়াছে।)

২. দ্বিতীয় আদব যাকাত আদায়ের ব্যাপারে—সময়ের প্রতি খেয়াল রাখা। যাকাত খুব শীঘ্র আদায় করিয়া দিবে। যাকাত ওয়াজিব হওয়ার সময়ের পূর্বেই উহা আদায় করিয়া দিবে। কেননা, ইহাতে আল্লাহ তায়ালার হুকুম পালনের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ পায় এবং গরীবদের অন্তরে আনন্দ সৃষ্টি করা হয়। দেৱী করার মধ্যে নিজের উপর এবং সম্পদের উপর কোন প্রকার রোগ-ব্যাধি ও বিপদ-আপদ আসিয়া পড়ারও সম্ভাবনা থাকে। যে সকল আলোমের মতে তাড়াতাড়ি যাকাত আদায় করা জরুরী, তাহাদের মতে দেৱী করার গুনাহ ভিন্ন হইবে। কাজেই যখনই অন্তরে খরচ করার ইচ্ছা পন্নদা হয়, উহাকে ফেরেশতাদের পক্ষ হইতে মনে করিবে। কেননা, হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, মানুষের অন্তরে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়, উহা একদিকে যেমন ফেরেশতার পক্ষ হইতে হয়, অপরদিকে শয়তানের পক্ষ হইতেও হয়। ফেরেশতার পক্ষ হইতে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়, উহা নেক কাজের প্রতি মনোযোগী করার জন্য এবং হকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের জন্য হয়। মানুষ যখন অন্তরে এইরূপ আলোড়ন অনুভব করিবে তখন আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায় করিবে। পক্ষান্তরে, শয়তান মন্দ কাজের দিকে প্ররোচিত করে এবং সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। অন্তরে এই অবস্থা অনুভব করিলে আউযুবিল্লাহ পড়িবে। (সাদাহ)

অন্য এক হাদীসে আছে, মানুষের অন্তর আল্লাহ তায়ালার দুই অঙ্গুলীর মাঝখানে রহিয়াছে। তিনি যেভাবে চাহেন, পরিবর্তন করেন। কাজেই অন্তরে খরচ করিবার যে খেয়াল আসিয়াছে, উহা পরিবর্তন হইয়া যাওয়ারও আশংকা রহিয়াছে।

ইহা ছাড়াও শয়তান মানুষকে তাহার অভাবের কথা মনে করাইতে থাকে। যেমন, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দুই নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে। মানুষের অন্তরে ফেরেশতা কর্তৃক আলোড়ন সৃষ্টির পর শয়তান আলোড়ন সৃষ্টি করে। এইজন্য শয়তানের পক্ষ হইতে আলোড়ন হওয়ার পূর্বেই যাকাত আদায় করিয়া দেওয়া চাই। আর যদি একসঙ্গে সমস্ত আদায় করিতে চায়, তবে উহার উত্তম পন্থা হইল, যাকাত আদায়ের জন্য কোন একটি মাস নির্ধারণ করিয়া লইবে। উত্তম হইল, ফযীলতপূর্ণ মাসসমূহের মধ্য হইতে কোন মাস নির্ধারণ করা। কেননা, উহাতে খরচ করিলে অধিক সওয়াব হইবে। যেমন, মুহররম মাস, ইহা বৎসরের প্রথম মাস ছাড়াও

সম্মানিত মাসসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এই মাসে আশুরার একটি দিন রহিয়াছে, যেদিনে দান-সদকা করিলে এবং পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করিলে সম্পদে প্রশস্ততার ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং যদি এই মাসে যাকাত আদায় করে, তবে উত্তম হইল, দশম তারিখে আদায় করা।

(সাদাহ)

অথবা রমযান মাস রহিয়াছে। বছ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, জযুর সালাতলাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দান-খয়রাতের ব্যাপারে সকল মানুষের চাইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। আর রমযান মাসে তো তাহার দান-খয়রাত বাতাসের ন্যায় তীব্রগতিতে চলিত। যেমন এই মাসে লাইলাতুল-কদর রহিয়াছে, যাহা হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। এমনিভাবে, এই মাসে আল্লাহ তায়ালায় নেয়ামতসমূহ বান্দাদের উপর প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এমনিভাবে, অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ মাসসমূহের মধ্যে জিলহজ্জ মাসও রহিয়াছে। এই মাসে হজ্জ পালন করা হয়। এই মাসে নির্ধারিত কয়েকটি দিন রহিয়াছে, অর্থাৎ দশ তারিখ এবং তাকবীরে তাশরীকের দিনসমূহ। এই দিনগুলিতে আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করিবার জন্য কুরআন পাকে উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি যাকাত আদায়ের ব্যাপারে রমযান মাসকে নির্ধারণ করে, তবে উহার শেষ দশ দিন উত্তম হইবে। যদি জিলহজ্জ মাসকে নির্ধারণ করে, তবে উহার প্রথম দশ দিন উত্তম হইবে। অধ্যম (লেখক) যাকারিয়ার পরামর্শ হইল, প্রত্যেক ব্যক্তি তো তাহার যাকাতের আনুমানিক পরিমাণ কি হইবে ; তাহা জানেই। এইজন্য বৎসরের শুরু হইতেই যেন প্রয়োজনের ক্ষেত্রসমূহে যাকাতের পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কিছু কিছু করিয়া দিতে থাকে। বৎসর শেষে নিজের মাল ও যাকাতের পুরাপুরি হিসাব করিয়া লইবে। যদি কিছু কম থাকিয়া যায়, তবে তখন উহা পূরা করিয়া দিবে। আর যদি কিছু বেশী আদায় হইয়া থাকে, তবে আল্লাহ তায়ালায় শোকর আদায় করিবে যে, ইহা আল্লাহ তায়ালায় তওফীক ছিল যে, ওয়াজিব হইতে বেশী আদায় হইয়া গিয়াছে। এই পদ্ধতিতে যাকাত আদায় করার মধ্যে তিনটি উপকারিতা রহিয়াছে। প্রথমতঃ যাকাতের পূর্ণ অংক যদি পরিমাণে বেশী হয়, তবে একসঙ্গে বড় অংক খরচ করিতে অধিকাংশ সময় মনের উপর ভারী অনুভব হয় ; অথচ যাকাত আদায় করার ব্যাপারে সন্তুষ্ট মনে খরচ করার অত্যন্ত গুরুত্ব রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ সবসময় প্রয়োজনের ক্ষেত্রে খরচ করার সুযোগ পাওয়া যায় না। এইভাবে যাকাত আদায় করিলে প্রয়োজনের ক্ষেত্রসমূহে খরচ করা হইবে। আর যদি বছরের শেষে হিসাব

করিয়া যাকাতের টাকা এই খেলালে ভিন্ন করিয়া রাখে যে, ক্রমান্বয়ে আদায় করিতে থাকিবে, তবে ইহাতে একদিকে যেমন প্রতিদিন বিলম্ব হইতে থাকিবে, অপরদিকে বলা যায় না যে, যাকাত আদায়ের পূর্বে জীবনের উপর অথবা মালের উপর কোন বিপদ আসিয়া পড়িবে না। আর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পর উহা আদায় না হওয়া সর্বসম্মতভাবে গোনাহের কাজ। তৃতীয়তঃ ক্রমান্বয়ে আদায় করিতে থাকার মধ্যে মানুষ যদি বেশী কপণতা না করে, তবে আশা করা যায় যে, অধিকাংশ ওয়াজিবের পরিমাণ হইতে কিছু বেশী আদায় হইয়া যাইবে, যাহা একটি পছন্দনীয় বিষয়। কিন্তু এক সঙ্গে হিসাব করিয়া উহা হইতে বেশী ব্যয় করা অনেকের জন্য কঠিন ব্যাপার হইবে। এখানে একটি কথা গুরুত্বসহকারে মনে রাখা চাই যে, যাকাতের হিসাব চন্দ্রবর্ষ হিসাবে হয়, সৌরবর্ষ হিসাবে নয়। কিন্তু অনেকেই ইংরেজী মাস হিসাব করিয়া যাকাত প্রদান করে। ইহাতে প্রতিবৎসর দশ দিন বিলম্ব হইয়া যায়। ইহা ছাড়াও হুত্রিশ বৎসরে এক বৎসরের যাকাত কম হইয়া যাইবে। যাহা নিজের যিম্মায় অনাদায় থাকিয়া যাইবে।

৩. যাকাত আদায়ের তৃতীয় আদব হইল, গোপনীয়ভাবে আদায় করা। কেননা, ইহাতে রিয়াকারী ও সুনাম অর্জনের খেলা হইতে নিরাপদ থাকে যায় এবং যাকাত গ্রহণকারীরও গোপনীয়তা ও তাহার সম্মান রক্ষা হয়। আর ইহাই উত্তম যে, প্রকাশ্যে দেওয়ার ব্যাপারে যদি কোন বাধ্য-বাক্য না থাকে, তবে গোপনে আদায় করিবে। কেননা, যাকাতের উদ্দেশ্য কপণতার অপবিত্রতাকে দূর করা এবং মালের মহব্বত দূর করা। অধিক প্রসিদ্ধ হওয়ার মধ্যে মর্যাদালাভের লিস্সা পয়দা হয়। আর এই লিস্সা সম্পদের লিস্সা হইতেও বেশী প্রবল হইয়া থাকে। কপণতা কবরে মানুষকে বিদ্ধ হইয়া দংশন করিবে, আর লোক দেখানো ও যশ-খ্যাতির লিস্সা অজগর হইয়া দংশন করিবে। কপণতা দূর করিয়া রিয়াকে শক্তিশালী করার উদাহরণ এইরূপ যেমন, কোন ব্যক্তি বিদ্ধ মারিয়া সাপকে খাওয়াইয়া দিল। ইহাতে বিদ্ধ তো নিঃসন্দেহে মরিয়া গেল এবং উহার অনিষ্টতাও দূর হইয়া গেল; কিন্তু সাপ অধিক শক্তিশালী হইয়া গেল। অথচ উদ্দেশ্য হইল, উভয়কে মারিয়া ফেলা। আর সাপকে মারা বেশী জরুরী।

৪. যাকাত প্রদানের চতুর্থ আদব হইল, যদি প্রকাশ্যে যাকাত দেওয়ার মধ্যে কোন ধীনী উপকারিতার দিক থাকে, যেমন অন্যদেরকে উৎসাহ প্রদান করা উদ্দেশ্য হয় অথবা যাকাত আদায়কারী অন্যদের জন্য

অনুসরণীয় ব্যক্তি হয় অথবা আরো কোন দ্বীনী উপকারিতা থাকে, তবে প্রকাশ্যে যাকাত দেওয়া উত্তম হইবে। এই দুইটি নম্বরের বিবরণ প্রথম পরিচ্ছেদের নয় নম্বর আয়াতে বিস্তারিতভাবে দেওয়া হইয়াছে।

৫. পঞ্চম আদব এই যে, নিজের সদকাকে অনুগ্রহ প্রকাশ করা ও কষ্ট দেওয়ার মাধ্যমে ধ্বংস না করা। 'মান' শব্দের অর্থ কাহারো উপর অনুগ্রহ প্রকাশ করা অর্থাৎ, যাহার উপর সদকা করিয়াছে তাহাকে আপন সদকা দ্বারা কৃত অনুগ্রহের খোঁটা দেওয়া। আর 'আযা' অর্থ, কষ্ট দেওয়া অর্থাৎ, সদকা গ্রহণকারীকে অন্য কোন উপায়ে কষ্ট দেওয়া ; এই ধারণার বশবর্তী হইয়া যে, সে তো আমার মুখাপেক্ষী, আমাকে ছাড়া তাহার প্রয়োজন মিটে না অথবা আমি যাকাত দিয়া তাহার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছি। এই বিষয়টিও প্রথম পরিচ্ছেদের আট নম্বর আয়াতে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

৬. ষষ্ঠ আদব হইল, নিজের সদকাকে তুচ্ছ মনে করিবে। উহাকে বড় মনে করিলে আত্মগর্ব পয়দা হওয়ায় আশংকা রহিয়াছে। যাহা অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক জিনিস এবং অন্যান্য নেক আমলকে বরবাদ করিয়া দেয়। আল্লাহ তায়ালা কুরআন পাকে বিষয়টিকে তিরস্কার হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন। এরশাদ হইয়াছে : **وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَلَا** অর্থাৎ, হুনাইনের দিনেও (তোমাদেরকে জয়যুক্ত করিয়াছিলেন) যখন (এই অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছিল যে,) তোমাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে তোমাদের মধ্যে অহমিকা পয়দা হইয়া গিয়াছিল। অতঃপর সেই সংখ্যাধিক্য তোমাদের কোন কাজে আসে নাই এবং (কাফেরদের তীরবর্ষণে তোমরা এত বেশী অস্থির হইয়াছিলে যে,) জমিন নিজের প্রশস্ততা সত্ত্বেও তোমাদের উপর সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। অতঃপর তোমরা (যুদ্ধের ময়দান হইতে) মুখ ফিরাইয়া পলায়ন করিয়াছিলে। অবশেষে, আল্লাহ তায়ালা নিজ রাসূল ও মুমিনদের প্রতি সাহুনা নাযিল করিলেন আর এমন সৈন্যদল (ফেরেশতাদের) তোমাদের সাহায্যের জন্য পাঠাইলেন, যাহাদিগকে তোমরা দেখ নাই। (ফেওবাঃ ২৫-২৬)

হাদীসের কিতাবসমূহে ইহা বিখ্যাত ঘটনা। এই ঘটনা সম্পর্কে বহু রেওয়ায়াত বর্ণিত হইয়াছে। যাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, অষ্টম হিজরীর রমযান মাসে যখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয় করিলেন, তখন হাওয়াযেন ও সর্কীফ গোত্রের উপর হামলা করার জন্য রমযান মাসেই তশরীফ লইয়া গেলেন। যেহেতু মুসলমানদের সংখ্যা তখন অন্যান্য যুদ্ধের তুলনায় অনেক বেশী ছিল, সেহেতু তাহাদের মধ্যে

সংখ্যাধিক্যের কারণে আত্মগর্ব পয়দা হইল যে, আমরা সংখ্যায় এতবেশী যে, পরাজিত হইতে পারি না। যেহেতু আল্লাহ তায়ালার নিকট গর্ব ও অহংকার অত্যন্ত অপছন্দনীয়, সেহেতু প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলমানদের পরাজয় হইল। উক্ত আয়াতে সেইদিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, সংখ্যাধিক্যের কারণে তোমাদের মধ্যে অহমিকা পয়দা হইয়াছে। কিন্তু এই সংখ্যাধিক্য তোমাদের কোন কাজে আসে নাই।

হযরত উরওয়া (রহঃ) বলেন, যখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয় করিলেন, তখন হাওয়াযেন ও সতীফ গোত্রের লোকেরা মুসলমানদের উপর আক্রমণ করিল। হুনাইন নামক স্থানে তাহারা সমবেত হইল।

হযরত হাসান (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, মক্কা বিজয়ের পর যখন মক্কাবাসীরাও মদীনাবাসী মুসলমানদের সহিত একত্রিত হইয়া গেল, তখন তাহারা বলিতে লাগিল, আল্লাহর কসম! এখন আমরা একসঙ্গে মিলিয়া হুনাইনবাসীদের সহিত মুকাবেলা করিব। হযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাহাদের এই অহংকারপূর্ণ কথা ভারী মনে হইল এবং অপছন্দ হইল। (দুররে মানসুর)

মোটকথা, আত্মগর্বের কারণে এই পেরেশানী দেখা দিয়াছে। উলামায়ে কেরাম লিখিয়াছেন, নিজের দৃষ্টিতে নেক আমলকে যতই কম মনে করা হইবে, ততই আল্লাহ তায়ালার নিকট উহা বড় হইবে। আর নিজের দৃষ্টিতে গোনাহকে যত বড় মনে করা হইবে, ততই আল্লাহ তায়ালার নিকট উহা হালকা ও কম হইবে। অর্থাৎ, ছোট গোনাহকেও এইরূপ মনে করিবে যে, আমি অনেক বড় বোকামী করিয়াছি, এইরূপ করা কখনও উচিত হয় নাই। কোন গোনাহকে এইরূপ মনে করিবে না যে, ইহাতে আর এমন কি হইবে!

কোন কোন আলেম হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, নেক কাজ তিনটি জিনিসের দ্বারা পূর্ণতা লাভ করে। এক—নেক আমলকে অনেক কম মনে করিবে; যেন কিছুই করে নাই। দ্বিতীয়—যখন নেক কাজের খেয়াল পয়দা হয়, তখন তাড়াতাড়ি উহা করিয়া ফেলিবে। এমন না হয় যে, এই নেক কাজের খেয়াল মন হইতে দূর হইয়া গেল অথবা কোন কারণে করা হইল না। তৃতীয়—নেক কাজ গোপনীয়তার সহিত করিবে। যেই পরিমাণ খরচ করিয়াছে উহাকে কম ও তুচ্ছ মনে করার পছন্দ হইল, বাহা খরচ করিয়াছে, উহাকে নিজের জন্য খরচকৃত ও রক্ষিত অংশের সহিত তুলনা করিবে। অতঃপর চিন্তা করিবে, আমি আল্লাহর রাস্তায় কত খরচ

করিয়াছি এবং আমার নিজের জন্য কত রাখিয়াছি। উদাহরণ স্বরূপ, যেই পরিমাণ তাহার কাছে মওজুদ ছিল উহা হইতে যদি এক তৃতীয়াংশ খরচ করিয়া থাকে, তবে সমগ্র জগতের বাদশাহ, মুনিব ও মাহবুব আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য মাত্র এক তৃতীয়াংশ খরচ করিল, আর মহব্বতের দাবীদার অর্থাৎ নিজের অংশে দুই তৃতীয়াংশ রাখিয়া দিল। যদি কেহ ইহার বিপরীত অর্থাৎ দুই তৃতীয়াংশ খরচ করে অথবা সমস্ত সম্পদও খরচ করিয়া দেয়; যাহার দৃষ্টান্ত বর্তমান যুগে পাওয়া অসম্ভব, তবুও এই চিন্তা করিতে হইবে যে, প্রকৃতপক্ষে সমস্ত সম্পদ তো আল্লাহ তায়ালারই ছিল, তাহারই দেওয়া অর্থ-সম্পদ আমার কাছে ছিল, যাহার মধ্যে তিনি আপন মেহেব্বানী, দয়া ও অনুগ্রহ করিয়া আমাকে খরচ করিবার ও আমার প্রয়োজনে কাজে লাগাইবার অনুমতি দিয়া রাখিয়াছেন, কাজেই এইরূপ করিয়াছি। যেমন, এমন কোন ব্যক্তির আমানত যদি নিজের কাছে থাকে, যে আমানত রাখিবার সময় ইহাও বলিয়া দিয়াছে যে, 'যদি আপনার কোন প্রয়োজন হয়, তবে ইহাকে নিজের সম্পদ মনে করিয়া খরচ করিবেন' অতঃপর তুমি তাহার আমানত কমবেশী ফেরত দিয়া দাও, তবে ইহাতে তোমার কি অনুগ্রহ হইল; যাহাতে তুমি কোন সময় মনে করিতে পার যে, আমি বড় কাজ করিয়াছি। উপরন্তু, আল্লাহ তায়ালাকে দেওয়া জিনিস ফেরত দেওয়ার মধ্যে অর্থাৎ, তাহার নামে খরচ করার মধ্যে তাহার পক্ষ হইতে বিনিময় ও পুরস্কারের এমন ওয়াদা রহিয়াছে যে, উহার মোকাবিলায় তো ইহা বলাও যায় না যে, আমি তাহার আমানত ফেরত দিয়াছি, বরং এইরূপ বলা হইবে যে, কোন ব্যক্তি—উদাহরণ স্বরূপ—একশত টাকা আমানত রাখিয়াছিল, আর উহা হইতে সে পঞ্চাশ বাট টাকা এই ওয়াদার উপর ফেরত লইয়াছে যে, অতিসস্তর এই পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা ইহার বিনিময়ে আমি তোমাকে দিব। অথবা এইরূপ মনে কর যে, পঞ্চাশ টাকা ফেরত লইয়াছে এবং পাঁচশত টাকার ব্যাংকের চেক কাটিয়া তোমাকে দিয়াছে। এমনতাবস্থায় এই কথা বলিয়া অহংকার করার সুযোগ কোথায় যে, আমি আমানতদারতাকে কিছু ফেরত দিয়াছি। এইজন্য ইহাও আদবের অন্তর্ভুক্ত যে, যখন সদকা করিবে তখন গর্ব-অহংকারের পরিবর্তে লজ্জা ও বিনয়ের সহিত খরচ করিবে; যেমন, কেহ কাহারও আমানত এইভাবে ফেরত দেয় যে, উহা হইতে কমবেশী কিছু রাখিয়াও দিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ, কাহারও একশত টাকা আমানত রাখিয়াছে, ফেরত দেওয়ার সময় উহা হইতে শুধু পঞ্চাশ টাকা ফেরত দেয় এবং এই বলিয়া ফেরত দেয় যে, তুমি যেহেতু আমাকে খরচ করার অনুমতি দিয়াছিলে

এইজন্য পঞ্চাশ টাকা আমি খরচ করিয়াছি অথবা আমার কোন প্রয়োজন রাখিয়া দিয়াছি। এইরূপ বলিতে যেমন মানুষ একপ্রকার বাধা, লজ্জা, বিনয় ও অপমান বোধ করে এবং সে নিজেই অনুভব করে যে, আমি এই দানশীল ব্যক্তির সম্পদ খরচ করিয়াছি, তাহার কত বড় অনুগ্রহ যে, সে অবশিষ্ট আমানতের দাবী করে নাই, অনুরূপ অবস্থা আল্লাহ তায়ালা রাস্তায় খরচ করার সময় হওয়া উচিত যে, তাহারই দেওয়া সম্পদের কিছু অংশ তাহারই নিকট এমনভাবে ফেরত দেওয়া হইতেছে যে, উহা হইতে আমি নিজে কিছু খাইয়াছি আবার কিছু রাখিয়া দিয়াছি। ইহা এইজন্য যে, দান-সদকা যাহা কোন গরীবকে দেওয়া হইতেছে অথবা প্রয়োজনের ক্ষেত্রে খরচ করা হইতেছে, উহা তো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালাকেই ফেরত দেওয়া হইতেছে। গরীব তো শুধু বাহক মাত্র, যাহাকে আল্লাহ তায়ালা আমানত ফেরত আনিবার জন্য পাঠাইয়াছেন। এইসব ক্ষেত্রে মানুষ বিভিন্ন প্রকারে বাহকের তোষামোদ করিয়া থাকে, যেমন, তুমি আমার মন্দিরের নিকট, আমার মালিকের নিকট একটু সুপারিশ করিয়া দিও ; বলিয়া দিও যে, এখন সম্পূর্ণ পাওনা পরিশোধ করার মত অবস্থা আমার ছিল না, আমার প্রয়োজন এবং অবস্থার প্রতি দেখিয়া তিনি যেন ইহাই কবুল করিয়া লন, ইত্যাদি ইত্যাদি। মোটকথা, যখন পুরাপুরি হক আদায় করা সম্ভব হয় না, তখন বাহকদের ও কর্মকর্তাদের সহিত যতপ্রকার তোষামোদ করা হয়, ফকির ও সদকা গ্রহণকারীদের সহিত বাস্তবে ইহা হইতে আরও বেশী তোষামোদীর অবস্থা হওয়া চাই। কেননা, ইহারা আল্লাহ তায়ালা পক্ষ হইতে প্রেরিত বাহক, সমগ্র জগতের বাদশাহর দূত। ইহারা সমগ্র জগতের মালিক, একচ্ছত্র ও অভাবমুক্ত আল্লাহ তায়ালা পক্ষ হইতে প্রেরিত লোক, যিনি সবকিছু দান করিয়াছেন, তিনি যখন চাহিবেন মুহূর্তের মধ্যেই সবকিছু কাড়িয়া লইয়া তোমাকেও এইরূপ অভাবী ও মুখাপেক্ষী করিয়া দিতে পারেন, যেইরূপ তোমার সম্মুখে একজন অভাবী লোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আর এই সবকিছু এইজন্য যে, সমগ্র ধন-সম্পদ একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই এবং তাহার রাস্তায় সমস্ত ধন-সম্পদ খরচ করিয়া দেওয়া পছন্দনীয় ; অথচ তিনি মেহেরবানী করিয়া সমস্ত সম্পদ খরচ করা আমাদের উপর ওয়াজিব করিয়া দেন নাই। কেননা, যদি সবকিছু খরচ করা ওয়াজিব করিয়া দিতেন, তবে আমাদের স্বভাবগত কপণতার কারণে খুবই কঠিন হইয়া যাইত।

৭. সপ্তম আদব এই যে, আল্লাহ তায়ালা রাস্তায় সদকা দান-খরচাত বিশেষ করিয়া গুরুত্বপূর্ণ করজ হকুম যাকাত আদায় করার জন্য উত্তম

হইতে উত্তম সম্পদ খরচ করা চাই। কেননা, আল্লাহ তায়ালা নিজে পবিত্র, সর্বপ্রকার দোষ হইতে পবিত্র ; এইজন্য তিনি পবিত্র সম্পদই গ্রহণ করেন। যদি মানুষ চিন্তা করে যে, এই সম্পদ যাহা সদকা করা হইতেছে, তাহা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালাকে দেওয়া হইতেছে, তবে বুঝিতে পারিবে যে, ইহা কত বড় ধৃষ্টতা ও বেয়াদবী যে, যিনি সম্পদের প্রকৃত মালিক, যিনি দান করিয়াছেন, তাহার জন্য নিকট ধরনের সম্পদ খরচ করা হইবে আর স্বয়ং নিজের জন্য উৎকৃষ্ট ও উত্তম সম্পদ রাখিয়া দিবে। ইহার উদাহরণ ঐ চাকর বা বাবুটির মত, যে মনিবের জন্য তো বাসী রুটি ও গন্ধযুক্ত ডাল রাখে আর নিজের জন্য কোম্বা রান্না করে। নিজেই চিন্তা করুন, এইরূপ চাকরের সহিত মনিবের কিরূপ আচরণ হওয়া উচিত। উপরন্তু, দুনিয়ার মনিবদের তো প্রত্যেক বিষয়ের খবরও থাকে না, আর সেই সর্বজ্ঞাত আল্লাহ তায়ালা সম্প্রদায়ের সম্মুখে প্রত্যেকটি বিষয় রহিয়াছে, এমনকি অন্তরের কল্পনাসমূহ সম্পর্কেও তিনি সবসময় জ্ঞাত রহিয়াছেন। এমতাবস্থায় তাহারই সম্পদ হইতে তাহারই জন্য নিকট ও খারাপ জিনিস পাঠান কত বড় নেমকহারামী হইবে ! আর যদি মানুষ এই কথা চিন্তা করে যে, যাহা কিছু সে খরচ করিতেছে উহা তাহার নিজের উপকারের জন্যই, এই সবকিছুর বিনিময় সে অত্যন্ত কঠিন প্রয়োজনের সময় পাইবে, তখন ইহা কত বড় বোকামী যে, মানুষ নিজের জন্য তো দুর্গন্ধযুক্ত নিকট জিনিস রাখে, আর উৎকৃষ্ট ধন-সম্পদ অন্যদের জন্য ছাড়িয়া যায়।

হাদীসে আসিয়াছে, মানুষ বলে আমার মাল আমার মাল ; অথচ তাহার মাল কেবল উহাই যাহা সে দান-খয়রাত করিয়া সম্প্রদায় পাঠাইয়া দিয়াছে অথবা খাইয়া শেষ করিয়া দিয়াছে। অবশিষ্ট যাহা কিছু রহিয়া গিয়াছে, উহা অন্যদের মাল। (অর্থাত্, ওয়ারিশদের।)

এক হাদীসে আসিয়াছে, এক দেরহাম কখনও লক্ষ দেরহাম হইতে বেশী হইয়া যায়। উহা এইভাবে যে, মানুষ হারাম ও অপছন্দনীয় মাল হইতে একলক্ষ দেরহাম খরচ করার পরিবর্তে হালাল কামাই হইতে উৎকৃষ্ট মাল সত্ত্বটিচিন্তে স্বতঃস্ফূর্ত মনে খরচ করে।

৮. অষ্টম আদব এই যে, নিজের সদকা এমন ক্ষেত্রে খরচ করিবে, যাহাতে বেশী সওয়াব পাওয়া যায়। ছয়টি গুণ এমন রহিয়াছে, যাহার মধ্যে উহার একটি গুণও পাওয়া যাইবে, তাহাকে দান করিলে সদকার সওয়াব অনেক বাড়িয়া যাইবে। আর যাহার মধ্যে উক্ত গুণাবলী যত বেশী হইবে, সওয়াবও তত বেশী হইবে এবং সদকার সওয়াবও সেই অনুপাতে বাড়িয়া যাইবে।

ক. গ্রহিতা যেন মুস্বাকী পরহেযগার হয়। দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত এবং আখেরাতের কাজে মশগুল হয়। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, পরহেযগার লোক ছাড়া তোমার খানা অন্য কেহ যেন না খায়। এই হাদীসটি প্রথম পরিচ্ছেদের তেইশ নম্বরে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, মুস্বাকী লোক তোমার এই সদকা ও দানের মাধ্যমে নিজের তাকওয়া ও এবাদত-বন্দেগীর ব্যাপারে সাহায্য হাসিল করিবে। আর তুমি যেন তাহার তাকওয়ার ব্যাপারে সাহায্যকারী হইলে এবং তাহার এবাদতের সওয়াবের মধ্যে শরীক হইয়া গেলে।

খ. গ্রহিতা যেন এলেমওয়ালা হয়। কেননা, তোমার সাহায্য তাহার এলেম হাসিল করার কাজে এবং উহার প্রচার-প্রসারে शामिल হইয়া যাইবে। আর এলেম সমস্ত এবাদতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চ এবাদত। এলেমের কাজে নিয়ত যত বেশী ভাল হইবে, এবাদতও তত বেশী উন্নত হইতে উন্নত হইতে থাকিবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহঃ) যিনি বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও বুখারী ছিলেন। তিনি তাহার দান-সদকাসমূহ শুধু উলামাদের মধ্যে বরচ করিতেন। কেহ আরজ করিল, আলেম ছাড়া অন্যদেরকেও যদি আপনি দান করিতেন, তবে কতই না ভাল হইত! তিনি বলিলেন, আমি নবুওতের মর্যাদার পর এলেমের সম্মান মর্যাদাশীল আর কোন কিছু পাই নাই। যখন কোন এলেমওয়ালা অন্য কোন দিকে মনোনিবেশ করে, তখন তাহার এলেমের কাজে ব্যাঘাত ঘটে। এইজন্য তাহাদেরকে এলেমের কাজে মগ্ন থাকিবার জন্য নিশ্চিত করিয়া রাখা সবচাইতে উত্তম কাজ।

গ. গ্রহিতা যেন তাহার তাকওয়া এবং তাহার এলেমের মধ্যে প্রকৃত তওহীদবাদী হয়। প্রকৃত তওহীদবাদী হওয়ার আলামত এই যে, যখন তাহার প্রতি কেহ অনুগ্রহ করে, তখন সে আল্লাহ তায়ালায় শোকর আদায় করে এবং অন্তর দ্বারা এই কথা বিশ্বাস করে যে, প্রকৃত অনুগ্রহ সেই পবিত্র সত্তার, তিনিই আসল দাতা। আর বাহ্যিক দৃষ্টিতে যে ব্যক্তি দান করিতেছে, সে মাধ্যম ও বাহক মাত্র।

হযরত লোকমান (আঃ) তাহার পুত্রকে ওসিয়ত করিয়াছেন, তোমার এবং আল্লাহ তায়ালায় মাঝখানে অন্য কাহাকেও অনুগ্রহকারী বানাইও না; অন্য কাহারও অনুগ্রহকে তুমি নিজের উপর জরিমানা মনে কর। যে ব্যক্তি মাধ্যমকে প্রকৃত অনুগ্রহকারী মনে করে, সে প্রকৃত অনুগ্রহকারীকে চিনিতেই পারে নাই। সে ইহা বুঝে নাই যে, এই ব্যক্তি মাধ্যম; আল্লাহ তায়ালাই তাহার অন্তরে এই কথা ঢালিয়াছেন যে, অমুক ব্যক্তির উপর

অনুগ্রহ কর, এই কারণে সে তাহার এই অনুগ্রহ করার ব্যাপারে বাধ্য ছিল। যখন মানুষের অন্তরে এই কথা বদ্ধমূল হইয়া যাইবে, তখন তাহার দৃষ্টি আসবাবের প্রতি থাকিবে না। বরং যিনি সকল আসবাবের সৃষ্টিকর্তা তাহার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়া যাইবে। এইরূপ ব্যক্তির উপর অনুগ্রহ করা অনুগ্রহকারীর জন্য বেশী উপকারী হয়। আর যাহারা দীর্ঘ প্রশংসা বাণী ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যমে দান গ্রহণ করে, তাহাদের তুলনায় এইরূপ লোকদের প্রতি অনুগ্রহ করা অনেক শ্রেয়। কেননা, আজ যাহারা অনুগ্রহের কারণে অনেক প্রশংসা করিতেছে, আগামীকাল সাহায্য বন্ধ করিয়া দিলে অনুরূপ দোষ বর্ণনা করিতে শুরু করিয়া দিবে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি প্রকৃত তওহীদবাদী হইবে, সে আগামীকাল দোষ বর্ণনাও করিবে না। কেননা, সে মাধ্যমকে মাধ্যমই মনে করে।

ঘ. যাহাকে সদকা দেওয়া হইবে, সে যেন নিজের অভাব ও প্রয়োজনসমূহ গোপনকারী হয়। মানুষের নিকট তাহার জীবিকা ও আমদানীর অভাব যেন প্রকাশ না করে, বিশেষ করিয়া আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন এমন ব্যক্তি যাহার আমদানী পূর্বাপেক্ষা কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহার আত্মমর্যাদাবোধের অভ্যাস আমদানী বেশী থাকার সময় যেমন ছিল তেমনি রহিয়াছে। এই ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে এমন অভাবী, যাহাকে বাহ্যিক ধনী মনে হয়। এই ধরনের লোকের প্রশংসা করিয়া আল্লাহ তায়ালা কুরআন পাকে এরশাদ করিয়াছেন: **يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ** এই আয়াত সূরায়ে বাকারার সাইত্রিশ নম্বর ককুতে রহিয়াছে। সম্পূর্ণ আয়াত এই **لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ** অর্থাৎ, (সদকা পাওয়ার) প্রকৃত হক ঐ সমস্ত অভাবী লোকেরই যাহারা আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে আল্লাহর রাস্তায় (অর্থাৎ, দ্বীনের খেদমতে এবং এই দ্বীনের খেদমতে আবদ্ধ ও মগ্ন থাকার কারণে) তাহারা (জীবিকার সন্ধানে) দেশের কোথাও ঘোরাফেরা করিতে (সাধারণতঃ) সক্ষম নয়, আর অল্প ব্যক্তি তাহাদেরকে সওয়াল না করার কারণে অভাবমুক্ত মনে করে। (অবশ্য) তোমরা তাহাদিগকে তাহাদের লক্ষণ দ্বারা চিনিতে পার। তাহারা লোকদেরকে জড়াইয়া ধরিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ায় না। ফলে, তাহাদেরকে কেহ অভাবী মনে করে না। অর্থাৎ, তাহারা মোটেই সওয়াল করে না। কেননা, অধিকাংশ লোক যাহারা ভিক্ষা করিতে অভ্যস্ত, তাহারা জড়াইয়া

ধরিয়াই ভিক্ষা করিয়া থাকে। এই সমস্ত লোকদের খেদমতের জন্য) যে মাল তোমরা খরচ করিবে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা উহা খুব ভাল করিয়া জানেন। (অন্য লোকদেরকে দান করা অপেক্ষা তাহাদের খেদমত করিলে মূলতঃ সওয়াব বেশী দান করিবেন।) (বাকারা : ২৭৩)

কায়দা : 'মূলতঃ' শব্দটি এইজন্য ব্যবহার করা হইয়াছে যে, প্রকৃতপক্ষে বেশী সওয়াব ইহাদের খেদমতের মধ্যেই রহিয়াছে। কিন্তু কোন কারণবশতঃ অন্যদের ব্যাপারে খরচ করার মধ্যেও সওয়াব বেশী হইতে পারে। যেমন, অন্যদের অভাব ও প্রয়োজন ইহাদের অপেক্ষা বেশী অথবা নিশ্চিতভাবে আশা করা যায় যে, ইহাদের খেদমত অন্য কোন লোক করিয়া দিবে আর অন্যরা একেবারে বঞ্চিত থাকিয়া যাইবে। মোটকথা, যে সমস্ত ক্ষেত্রে এই ধরনের কোন কারণ না থাকে, সেখানে ইহাদের খেদমত করাই উত্তম। আর বিশেষ কোন কারণবশতঃ যাহারা মোস্তাকী নয়, এমনকি মোমিনও নয়, এমন লোকদের প্রতি অনুগ্রহ করাও উত্তম হইয়া যায়। জানিয়া রাখা উচিত যে, আমাদের দেশে উক্ত আয়াতে তাহাদের উপর সর্বাধিক প্রযোজ্য, যাহারা দ্বীনী এলেম প্রচারে মশগুল রহিয়াছেন। এই কারণে খরচের সর্বাধিক উত্তম খাত হইল, তাগেবে এলেম। কোন কোন অনভিজ্ঞ লোক দোষারোপ করে যে, তাহারা কামাই করে না কেন? এই প্রশ্নের জবাব কুরআন পাকে দেওয়া হইয়াছে। যাহার সারাংশ এই যে, এক ব্যক্তি এমন দুইটি কাজ করিতে পারে না, যে দুইটি কাজে একটির মধ্যে অথবা উভয়টির মধ্যে পুরাপুরি মনোযোগ দিতে হয়। দ্বীনী এলেম সম্পর্কে যে ব্যক্তির সামান্যতমও রুচি রহিয়াছে, সে নিজ অভিজ্ঞতায় বুঝিতে পারে যে, ইহাতে অত্যন্ত মনোযোগ ও একাগ্রতার প্রয়োজন। দ্বীনী এলেমে মগ্নতা ও অর্থ উপার্জন এক সঙ্গে হইতে পারে না। এইরূপ করিলে এলেমে দ্বীনের খেদমত অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। ইহার হাজার হাজার বাস্তব দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। (বয়ানুল কুরআন ; কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, উক্ত আয়াতে গরীবদের দ্বারা আসহাবে সুফফাকে বুঝানো হইয়াছে। আসহাবে সুফফার জামাত প্রকৃতপক্ষে তাগেবে এলেমদেরই জামাত ছিল। যাহারা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে জাহেরী ও বাতেনী এলেম হাসেল করিবার জন্য পড়িয়া থাকিতেন।

মুহাম্মদ ইবনে কাব কুরাজী (রহঃ) বলেন, উক্ত আয়াতে আসহাবে সুফফাকে বুঝানো হইয়াছে। যাহাদের কোন ঘর ছিল না, পরিবার-পরিজনও ছিল না, আল্লাহ তায়ালা তাহাদের উপর দান-সদকা

করার বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন।

কাতাদা (রহঃ) বলেন, উক্ত আয়াতে ঐ সমস্ত গরীব লোককে বুঝানো হইয়াছে, যাহারা নিজেদেরকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য আবদ্ধ রাখিয়াছেন। (অর্থাৎ, নিজেদেরকে জিহাদে মশগুল রাখিয়াছেন। ব্যবসা ইত্যাদি কাজ তাহারা করিতে পারেন না। (দুররে মানসুর)

ইমাম গায্বালী (রহঃ) বলেন, ইহারা ঐ সমস্ত লোক, যাহারা জুড়াইয়া ধরিয়া ভিক্ষা করে না। তাহাদের অন্তর একীনের দৃঢ়তার কারণে অমুখাপেক্ষী। তাহাদের সাধনা আপন নফসের উপর প্রবল থাকে। এইরূপ লোকদের ভালোশ করিয়া দান করা চাই। দীনদার লোকদের ভিতরগত অবস্থার খোঁজ-খবর লওয়া চাই যে, তাহারা কিভাবে জীবিকা নির্বাহ করিতেছে। ঐ সমস্ত লোকদের উপর খরচ করার সওয়াব, ভিক্ষুকদের উপর খরচ করা অপেক্ষা অনেক বেশী। কিন্তু এইরূপ লোকদের সম্ভান পাওয়া খুবই মুশকিল। কেননা, ইহারা নিজেদের অবস্থা অন্যদের নিকট গোপন করিয়া রাখে। ফলে, মানুষ তাহাদেরকে ধনী মনে করিয়া থাকে।

৬. এমন লোক যাহার সম্ভান-সন্ততি রহিয়াছে অথবা এমন লোক, যে কোন রোগে আক্রান্ত রহিয়াছে অথবা অনুরূপ অন্য কোন কারণে সে উপার্জন করিতে পারে না; ইহারাও কুরআন পাকের উক্ত আয়াত **أَحْصُوا** এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা, তাহারাও আবদ্ধ রহিয়াছে। চাই নিজের অভাব-অনটনে আবদ্ধ থাকুক বা জীবিকার স্বল্পতায় আবদ্ধ থাকুক অথবা নিজের আধ্যাত্মিক সংশোধনের কাজে আবদ্ধ থাকুক। ঐ সমস্ত লোকও নিজেদের অপারগতার কারণে প্রয়োজন পরিমাণ উপার্জন করিতে অক্ষম। এইজন্যই হযরত ওমর (রাযিঃ) কোন কোন পরিবারকে দশটি করিয়া বকরী অথবা ইহারও অধিক প্রদান করিতেন।

হযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যখন ফাই অর্থাৎ বিনা যুদ্ধে অর্জিত সম্পদ আসিত, তখন হযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহিতকে দুইভাগ আর অবিবাহিতকে এক ভাগ দান করিতেন। ফাই বলা হয় ঐ সম্পদকে, যাহা কাফেরদের নিকট হইতে বিনা যুদ্ধে লাভ হইয়াছে।

৮. আত্মীয়-স্বজন হইলে, তাহাদের ব্যাপারে দান-সদকার সওয়াব ভিন্ন হইবে এবং আত্মীয়ের সহিত সং ব্যবহারের সওয়াব ভিন্ন হইবে। তৃতীয় পরিচ্ছেদের ছয় নম্বর হাদীসে ঐ বিষয়টি উল্লেখ করা হইয়াছে।

ঐ ছয়টি গুণকে উল্লেখ করিয়া ইমাম গায্বালী (রহঃ) বলেন, ঐ সমস্ত গুণাবলী ঐ ব্যক্তির মধ্যে দেখিতে হইবে, যাহার জন্য খরচ করা

হইতেছে। প্রত্যেকটি গুণের মধ্যে কমবেশী হিসাবে মর্যাদার অনেক পার্থক্য
রহিয়াছে, যেমন তাকওয়া-পরহেযগারীর সর্বোচ্চ প্রকার ও নিম্ন প্রকারের
মধ্যে জমিন ও আসমানের পার্থক্য রহিয়াছে। আত্মীয়তার মধ্যে নিকট
আত্মীয় ও দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় রহিয়াছে। অনুরূপভাবে, অন্যান্য গুণের
মধ্যেও পার্থক্য রহিয়াছে। এইজন্য প্রতিটি গুণের উচ্চ প্রকারকে তালাম
করা জরুরী। আর যদি কোন ব্যক্তির মধ্যে সমস্ত গুণাবলী পাওয়া যায়,
তবে সে তো অত্যন্ত মূল্যবান এক রত্নভাণ্ডার। এইরূপ ব্যক্তির উপর খরচ
করিতে খুবই চেষ্টা করা চাই। এই সমস্ত গুণাবলীর অধিকারী লোকদের
খুবই তালাম করা চাই। যদি চেষ্টার পর প্রকৃতপক্ষে এমন লোক পাওয়া
যায়, তবে তো ইহা অতি উত্তম ও দ্বিগুণ সওয়াবের বিষয়। চেষ্টার জন্য
এক গুণ, সঠিক খাতে খরচ করার জন্য আরও এক গুণ সওয়াব পাওয়া
যাইবে। আর যদি চেষ্টা করিবার পর নিজের অনুসন্ধান অনুযায়ী এই
গুণাবলী সম্পন্ন লোকের উপরই খরচ করিয়াছিল কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে
এইরূপ ছিল না, বরং তাহার অনুসন্धानে ভুল হইয়া গিয়াছে, তবুও চেষ্টার
জন্য একটি সওয়াব তো অবশ্যই পাওয়া যাইবে। আর এই একটির
মধ্যেও প্রথমতঃ কৃপণতা হইতে তাহার নফসের পবিত্র হওয়া রহিয়াছে।
দ্বিতীয়, তাহার অন্তরে আল্লাহ তায়ালায় প্রতি মহব্বত দৃঢ় হওয়া
রহিয়াছে। তৃতীয়, আল্লাহ তায়ালায় আনুগত্যের জন্য চেষ্টা করা
রহিয়াছে। এই তিনটি গুণ এমন যে, তাহার অন্তরকে শক্তিশালী করিবে,
তাহার অন্তরে আল্লাহ তায়ালায় সহিত সাক্ষাতের আগ্রহ পয়দা করিবে।
কাজেই এই উপকারিতা তো যে কোন অবস্থায় রহিয়াছে। আর যদি দ্বিতীয়
সওয়াবও হাসিল হইয়া যায় অর্থাৎ সঠিক খাতে খরচ হইয়া যায়, তবে
তো আরও অনেক ফায়দা হাসিল হইবে। যেমন, সদকা গ্রহণকারীর দোয়া
ও আন্তরিক নেক দৃষ্টি লাভ হইবে। আর আল্লাহ তায়ালায় নেক বাস্তাদের
অন্তরের বড় তাহীর ও বরকত দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে
রহিয়াছে। তাহাদের আন্তরিক নেক দৃষ্টি ও দোয়ার মধ্যে আল্লাহ তায়ালা
বড় প্রভাব রাখিয়াছেন। (এহইয়া, সংক্ষিপ্ত ও বর্ধিত)

তামাম শুদ

যাকারিয়া কাকুলবী

মুকীম, মাজাহেরে উলুম, সাহারানপুর।

ফাযায়েলে সাদাকাত (দ্বিতীয় খণ্ড)

মূল লেখক

শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা
মুহাম্মদ যাকারিয়া ছাহেব কান্ধলভী (রহঃ)

অনুবাদ

মুফতী মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ

মুহাদ্দিস, জামেয়া আরাবিয়াহ, ফরিদাবাদ
খতীব, সিদ্দিক বাজার জামে মসজিদ, ঢাকা।

নজরে ছানী ও সম্পাদনা

হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ যুবায়ের ছাহেব

মাওলানা রবিউল হক ছাহেব

কাকরাইল মসজিদ, ঢাকা।



দারুল কিতাব

৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফাযায়েলে সাদাকাত (দ্বিতীয় খণ্ড)
শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা
মুহাম্মদ যাকারিয়া ছাহেব কান্দলভী (রহঃ).

প্রকাশনা :
দারুল কিতাব
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রথম প্রকাশ :
রজব, ১৪২৪ হিঃ
ভাদ্র, ১৪১০ বাং
সেপ্টেম্বর, ২০০৩ ইং

(সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত)

মূল্য : ১১০.০০ টাকা মাত্র।

মুরুব্বীগণের দোয়া ও অভিমত

● আল্লাহ তায়ালার ঋছ মেহেরবানী ও অশেষ রহমতে দীর্ঘদিনের অপেক্ষার পর হযরত শায়খুল হাদীস যাকারিয়া (রহঃ)এর 'ফাযায়েলে সাদাকাত' কিতাবের পূর্ণাঙ্গ ও বিশুদ্ধ তরজমা প্রকাশিত হইল। মুফতী উবায়দুল্লাহ ছাহেব ইহার বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন অতঃপর মাওলানা হাফেজ যুবায়ের ও মাওলানা রবিউল হক ছাহেবান আদ্যোপান্ত মূলের সহিত ইহাকে মিলাইয়াছেন এবং প্রয়োজনীয় স্থানসমূহে পরিবর্তন, পরিমার্জন ও মূলানুগ করিবার ব্যাপারে রাত্র-দিন যথেষ্ট মেহনত করিয়াছেন।

দোয়া করি আল্লাহ তায়ালা উক্ত মেহনতকে আখেরাতের যব্বীরা হিসাবে কবুল করুন এবং বিশ্বের বাংলাভাষী সকল মুসলমানকে ইহা দ্বারা উপকৃত হওয়ার তওফীক দান করুন। আমীন।



(মোঃ সিরাজুল ইসলাম, কাকরাইল মসজিদ)

৩৭৭-বি, খিলগাঁও আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২১৯

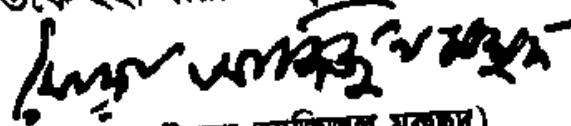
● আল্লাহ তায়ালার অশেষ মেহেরবানীতে শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া ছাহেব (রহঃ)এর 'ফাযায়েলে সাদাকাত' কিতাবখানির তরজমা বাংলাভাষায় পুরাপুরিভাবে করা হইল। হাজী আবদুল মুকীত ছাহেব (রহঃ)এর একান্ত আগ্রহ ও আদেশে মুফতী উবাইদুল্লাহ ছাহেব ইহার যথাযথ তরজমা করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁহার এই প্রচেষ্টাকে কবুল করুন ও পুরা উম্মতকে ইহা দ্বারা উপকৃত করুন, আমীন।



(মাহমুদুল হক)

কাকরাইল মসজিদ, ঢাকা।

● আল্লাহ তায়ালার অশেষ মেহেরবানীতে শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া ছাহেব(রহঃ)এর 'ফাযায়েলে সাদাকাত' কিতাবখানির মোকাম্মাল বাংলা তরজমা প্রকাশিত হইল। হাজী আবদুল মুকীত ছাহেব (রহঃ)এর একান্ত আগ্রহ ও হুকুমে তাঁহারই হেদায়াত মোতাবেক মুফতী উবাইদুল্লাহ ছাহেব ইহার তরজমা করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁহার এই মেহনতকে কবুল করুন এবং উম্মতকে ইহা দ্বারা উপকৃত হওয়ার তওফীক দান করুন, আমীন।



(সৈয়দ আজিজুল মকছুদ)

৬৫নং কুদরতে খোদা রোড, ধানমণ্ডি, ঢাকা।

আলহামদুলিল্লাহ! শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া (রহঃ) রচিত ঈমান আমল ও দাওয়াত-তবলীগের জজ্বা পয়দাকারী মশহুর কিতাব 'ফাযায়েলে সাদাকাত' এর পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হইল। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূল গ্রন্থকার হযরত শায়েখ (রহঃ) এর দেওয়া মৌল নীতি ও দিকনির্দেশনার যথাযথ অনুসরণ করার সর্বাত্মক চেষ্টা করা হইয়াছে। তিনি যে নীতিমালা দিয়াছেন তাহা হইল—

اسی طرح دوسرے مختلف زبانوں میں ترجمہ کرنے والوں پر اس کی پوری پوری ذمہ داری ہے کہ وہ ترجمہ کرتے وقت اس مضمون کو نہ ہی اپنی طرف سے کچھ اضافہ کریں۔ نہ ٹیلی نصاب

হযরত হাজী আবদুল মুকীত ছাহেব (রহঃ) এর সরাসরি নির্দেশ, দিলি তামান্না ও ঐকান্তিক আগ্রহই কিতাবখানি তরজমার ক্ষেত্রে আমাকে অনুপ্রেরণা ও সাহস জোগাইয়াছে। ইত্তিকালের তিন মাস পূর্বেও তিনি এই বলিয়া বিশেষ তাম্বীহ ও বাছ হেদায়েত দিয়াছেন যে, তরজমা এমন সরল সহজ হইতে হইবে যেন সাধারণ মানুষ অনায়াসেই পড়িতে ও তালীম করিতে পারে।

আল্লাহ পাক জাযায়ে খায়ের দান করুন হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ যুবায়ের ছাহেব ও মাওলানা রবিউল হক ছাহেবকে, তাঁহারা কাকরাইলের বর্তমান মুরুব্বীগণের মানশা মোতাবেক পাণ্ডুলিপির আগাগোড়া মূল কিতাবের সহিত অক্ষরে অক্ষরে মিলাইয়া প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিমার্জন করিয়া দিয়াছেন।

কাকরাইলের সকল আহলে শূরা, আকাবেরীন, অন্যান্য মুরুব্বিয়ান ও দোস্ত-আহবাবের নিকট আমি শোকর গুজার যে, তাঁহারা বাছ দোয়া ও তাওয়াজুহ দ্বারা আমাকে হিম্মত দিয়াছেন। আমার শ্রদ্ধেয় আক্বাজান ও ইহার জন্য আন্তরিক দোয়া করিয়াছেন। আল্লাহ পাক দোজাহানে তাঁহাদিগকে বহুত বহুত জাযায়ে খায়ের দান করুন ও দরজা বুলন্দ করুন। কিতাবখানির তরজমা ও প্রকাশের ব্যাপারে যে সকল আহবাব আমাকে সহযোগিতা করিয়াছেন আল্লাহ পাক তাঁহাদেরকেও উভয় জাহানে উত্তম বদলা দান করুন।

পাঠকবর্গের খেদমতে সবিনয় আবেদন যে, কোনপ্রকার ভুল-ত্রুটি ধরা পড়িলে জানাইয়া কৃতার্থ করিবেন। পরবর্তীতে সংশোধন করিয়া দেওয়া হইবে ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে মিনতি পেশ করিতেছি, তিনি যেন আপন দয়ায় কিতাবখানি কবুল করিয়া নেন এবং ইহাকে সকল উম্মতের আমল, হেদায়েত ও নাজাতের ওসীলা হিসাবে কবুল ফরমান।

—বিনীত অনুবাদক।

সূচীপত্র
ফাযায়েলে সাদাকাত
দ্বিতীয় খণ্ড

বিষয়	পৃষ্ঠা
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	
• দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি, অস্পেতুটি ও সওয়াল না করার প্রতি উৎসাহ দান	১১
• মালের হাকীকত ও প্রকৃত স্বরূপ (হাদীস)	১১
• মালের ক্ষতি হইতে বাঁচার উপায়	১৩
• মাল স্বয়ং খারাপ জিনিস নয়	১৩
• মালের প্রাচুর্য অপছন্দনীয় বরং ধ্বংসাত্মক	১৩
• অধিকাংশ গোনাহের কারণ মাল	১৩
• যদি বান্দাদের রিযিক প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হইত তবে তাহারা অবাধ্যতা আরম্ভ করিত	১৪
• আয়াতসমূহ	১৫
• স্ত্রী সন্তান ও মালের মহব্বত খাহেশের মহব্বত	১৬
• দুনিয়ার দ্রব্য-সামগ্রী কেবল অস্থায়ী জরুরত পূরণের জন্য	১৭
(এ সম্পর্কিত ৫০টি আয়াত)	১৮
• সুহুফে ইবরাহীম ও সুহুফে মুসা-এর ব্যাখ্যা	৩৯
• ইসলামের ত্রিশটি অংশের বর্ণনা	৪১
• দশটি নেয়ামত সম্পর্কে কেয়ামতের দিন হিসাব	৪২
• ছয় (সঃ), আবুবকর সিদ্দীক ও ওমর (রাযিঃ)-এর একটি আশ্চর্য ঘটনা	৪৩
• আল্লাহর নেয়ামতের পরিপূর্ণ শুকরিয়ার নিয়ম	৪৪
• মুসীবতে ধৈর্যধারণ করার ফযীলত সম্পর্কিত ৩১টি আয়াত	৪৬

• আল্লাহর উপর ভরসা ও অন্য কাহারও নিকট সওয়াল না করা সম্পর্কে ৪১টি আয়াত	৬৫
• জনৈক এতেকাফকারী ব্যক্তির তাওয়াক্কুল সম্পর্কিত শিক্ষণীয় ঘটনা	৭৫
• উপরোক্ত বিষয়াবলী সম্পর্কে হাদীসসমূহের বিবরণ	৭৬
• লোকদের নিকট নিজের অভাব-অনটন প্রকাশকারী ব্যক্তি অভাবীই থাকিয়া যায় (হাদীস)	৭৬
• কুর্দ গোত্রের জনৈক ডাকাতের তওবার আশ্চর্য ঘটনা	৭৮
• যে অভাবী নিজের অভাবকে গোপন রাখে, তাহার এক বৎসরের হালাল রিযিক লাভ হয়	৮০
• হযরত আওফ ইবনে মালেকের পুত্রের বিস্ময়কর ঘটনা	৮২
• তাওয়াক্কুল পরিত্যাগ করার ক্ষতি	৮৩
• মাল বৃদ্ধির জন্য সওয়াল করা জাহান্নামের অঙ্গার চাহিয়া লওয়ার নামাস্তর	৮৪
• তিন প্রকার লোকের জন্য সওয়াল করা জায়েয	৮৫
• দুই প্রকার লোকের জন্য সওয়াল করা জায়েয নয়	৮৬
• হযরত ওমর (রাযিঃ) ও জনৈক পেশাদার ফকীরের ঘটনা	৮৮
• প্রয়োজনে সওয়াল করার বৈধতা এবং প্রয়োজনের শ্রেণী বিভাগ	৮৯
• সওয়ালের বৈধতার জন্য শর্তসমূহ	৮৯
• অন্যের সাহায্যের জন্য সওয়াল করা জায়েয (যুবাইদী)	৯১
• আলেমগণের শাস্তি হইল অন্তর মরিয়া যাওয়া	৯৫
• মাল সবুজ-শ্যামল ও মিষ্ট বস্তু (হাদীস)	৯৬
• সন্তুষ্টিতে প্রদত্ত মালে বরকত রহিয়াছে	৯৭
• মুমিনদের জন্য কিয়ামতের দিন (পঞ্চাশ হাজার বৎসর) এক ওয়াক্ত নামাযের সমান হইবে	১০১
• সওয়াল ব্যতীত এবং লোভাতুর আশা ব্যতীত যাহা লাভ হয় উহা ফেরত না দেওয়া চাই	১০১
• সওয়াল ব্যতীত প্রাপ্ত মালের মধ্যেও তিনটি বিষয় লক্ষ্যণীয়	১০৪
• জনৈক মক্কাবাসীর বিস্ময়কর ও বিরল ঘটনা	১০৯

• ঋণদাতার জন্য ঋণগ্রহীতার নিকট হইতে কোনরূপ উপকার লাভ করা চাই না	১১১
• বিচারক যদি বিচারক হিসাবে কোন হাদিয়া লাভ করে তবে উহা ঘুষের অন্তর্ভুক্ত (হাদীস)	১১২
• কয়ামতের দিন পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন না করা পর্যন্ত মানুষকে নড়াচড়া করিতে দেওয়া হইবে না	১১৬
• জালালের দুইটি দৃশ্য	১২৫
• হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাযিঃ)-এর ফাযায়েল এবং মালের কারণে তাঁহার পিছনে পড়িয়া থাকা	১২৬
• এলেমওয়ালাদেরকে কয়ামতের দিন জিজ্ঞাসাবাদ	১৩০
• হকানী আলেমগণের আলামত	১৩৫
• হাতেমে আছাম (রহঃ) যে আটটি কথা হযরত শকীক (রহঃ)-এর নিকট শিখিয়াছেন	১৩৮
• শায়েখ আবু হাতেম (রহঃ)-এর একটি শিক্ষণীয় ঘটনা	১৪২
• শায়েখের আরেকটি অতি বিস্ময়কর ঘটনা	১৪৪
• আশীরদের দরজা ফেটনার জায়গা	১৪৭
• সাহাবীগণের পাঁচ কাজে মশগুল হওয়া এবং চার কাজ হইতে বাঁচিয়া চলা	১৪৯
• এবাদতের জন্য অবসর হওয়া দ্বারা অন্তর অভাবশূন্য হইয়া যায়	১৫৭
• দুর্ভাগ্যের চারটি আলামত	১৫৯
• দুনিয়ার মহব্বত আখেরাতের জন্য এবং আখেরাতের মহব্বত দুনিয়ার জন্য ক্ষতিকর	১৬০
• হযরত লোকমান (আঃ)-এর নসীহত ও ঘটনাসমূহ	১৬১
• মৃত্যুর সময় নসীহতসমূহ	১৬৫
• লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর হেফাজত ও সাফা	১৬৬
• দুনিয়ার নিন্দা সম্পর্কিত ইমাম গাফালী (রহঃ)-এর উক্তিঃসমূহ	১৬৭
• কুরআনের আয়াত ও হাদীস শরীফে দুনিয়ার নিন্দা	১৬৮
• দুনিয়ার নিন্দা প্রসঙ্গে হযরত ইসা ও ইবরাহীম (আঃ)-এর উক্তিঃসমূহ	১৭১

বিষয়	পৃষ্ঠা
• দুনিয়ার নিন্দা প্রসঙ্গে সাহাবা ও অন্যান্য বুয়ুর্গগণের উক্তিসমূহ	১৭৬
• আসল জিন্দেগী	১৮৩
• আলা' ইবনে যিয়াদের আশ্চর্য ঘটনা	১৮৮
• গ্রন্থকারের পিতা কর্তৃক বর্ণিত একটি আশ্চর্য ঘটনা	১৯২
• শরীরের তিনশত বাটটি জোড়ার সদকা	১৯৩
• মালের সর্বনিম্ন মন্দতা উহার হিসাব-কিতাব হওয়া	১৯৭
• বৃদ্ধের অন্তর দুইটি জিনিসের ব্যাপারে জোয়ানই থাকে (হাদীস)	১৯৯
• মানুষের মৃত্যু এবং উহার উদাহরণসমূহ	১৯৯
• সবচেয়ে বড় দুনিয়াত্যাগী কে এবং মৃত্যুর স্মরণের ফযীলত	২০২
• হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয ও একটি কবরের কথোপকথন	২০৪
• দুর্ভাগ্যের চারটি আলামত এবং মৃত্যু নিকটবর্তী হওয়ার বর্ণনা	২০৮
• হযরত সালমান ফারসী (রাযিঃ)-এর তিন ব্যক্তির প্রতি বিস্ময় প্রকাশ ও হাসা	২১০
• সংক্ষিপ্ত আশাবাদী লোকদের জন্য চার প্রকার সম্মান	২১২
• যে আমলের কারণে খালেক ও মাখলুক উভয়েই মহব্বত করে (হাদীস)	২১৩
• অস্পেতুষ্টির ফযীলত ও লোভের নিন্দা	২১৫
• দুনিয়াত্যাগের তিনটি আলামত (গায়যালী (রহঃ)	২২০
• হযরত গাজুহী (রহঃ)-এর একটি চিঠি	২২১
• মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক (রহঃ) ও মাওলানা মুহাম্মদ ইমাকুব (রহঃ)-এর একটি ঘটনা	২২২
• ছয় (সঃ) জীবনভর যবের রুটিও পেট ভরিয়া খান নাই	২২৪
• কম খাওয়ার ফযীলত ও পরিতৃপ্ত খাওয়ার নিন্দা	২২৫
• কম খাওয়ার দশটি উপকারিতা (গায়যালী রহঃ)	২২৮
• কম আহারকারী ব্যক্তিদের ঘটনাবলী	২৩৫
• তিনশত বাটটি মেহনতের পর একটি কটি তৈরী হয়	২৩৮
• খাওয়া চার প্রকার : ফরয, মুস্তাহাব, মুবাহ, হারাম	২৪১
• যে আব্বাহর অল্প রিয়িকের উপর রাজী থাকে, আব্বাহ তামালা তাহার অল্প আমলে রাজী হইবেন—এ সম্পর্কে পাঁচটি কথা ...	২৪২

• আরাম-আয়েশ ও বন্দেগীর মধ্যে কোন সম্পর্ক নাই (হাদীস) ...	২৪৫
• হযূর (সঃ)-এর প্রতি সেজদা করা ও তাসবীহ পড়ার ওহী আসিয়াছে ; ব্যবসা ইত্যাদির ওহী আসে নাই	২৪৬
• আল্লাহ তায়ালা চক্ষু কি জন্য দিয়াছেন	২৫৪
• হযূর (সঃ)-এর এবাদত এবং তাঁহার অনুসারীগণের এবাদতের ঘটনাবলী	২৫৮
• মহিলাদের এবাদতের আশ্চর্য ঘটনাবলী	২৬৫
• হযরত ইবরাহীম আদহাম (রহঃ)-এর চার বিষয়ে চিন্তা	২৬৮
• আসবাব-উপকরণ বেশী হওয়ার নাম ধনশালিতা নয় ; বরং অন্তরের ঐশ্বর্যের নাম ধনশালিতা	২৬৯
• চারটি বিষয়কে ভুল পথে অনুেষণ	২৭১
• কাহাকেও সম্পদ অথবা সৌন্দর্যের দিক দিয়া নিজের চেয়ে উন্নত দেখিলে নিজের চেয়ে কম পর্যায়ের লোকদেরকে যেন দেখিয়া লয় (হাদীস)	২৭২
• হযরত আবু যর (রাযিঃ)কে হযূর (সঃ)-এর ৭টি নসীহত	২৭২
• মালদার মহিলাকে বিবাহ করার মধ্যে পাঁচটি জটিলতা	২৭৪
• গোনাহের মধ্যে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও রিয়িকের প্রশস্ততা হইলে ইহা অবকাশ বা টিল দেওয়া হইতেছে	২৭৮
• বুদ্ধিমান কে এবং বেওকুফ কে	২৮০
• রহমতের আশা করিতে পারে কাহারো	২৮৫
• আশা ও আকাঙ্ক্ষার মধ্যে পার্থক্য	২৮৭
• সাবধান ও বুদ্ধিমান লোক কে, মৃত্যুকে স্মরণ করার ফযীলত ..	২৯১
• কবরের অবস্থাসমূহ	২৯৪
• মৃত্যুকে স্মরণ করিলে তিনটি সম্মান আর স্মরণ না করিলে তিনটি শাস্তি	২৯৮
• মৃত্যুর হুকুম কখন শুরু হয়	৩০৫
• মৃত্যুর কষ্ট	৩০৭
• মালাকুল-মউতের হুকুম-আহকাম	৩১০
• এক অহংকারী বাদশাহ ও মালাকুল-মউতের আশ্চর্য ঘটনা	৩১৯
• মৃত্যুর সময় নেককার ও বদকারদের আশ্চর্য অবস্থাসমূহ	৩২১

- কেয়ামতের দিন নেকী ও বদীর ওজন হইবে অতঃপর
হিসাব হইবে—এ সম্পর্কিত ২৭টি আয়াত ৩৪৯
- কেয়ামতের দিন তিনটি সময় এমন যে, উহাতে কেহ
কাহাকেও স্মরণ করিবে না ৩৫৮

সপ্তম পরিচ্ছেদ

- দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত এবং আল্লাহর রাস্তায়
খরচকারীদের ৭০টি ঘটনা ৩৭১





نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি, অল্পে তুষ্টি ও ছওয়াল
না করার প্রতি উৎসাহ দান

সংকলনের সময় এই সবগুলি একখানি কিতাবই ছিল ; কিন্তু মুদ্রণের সময় আকারে বাড়িয়া যাওয়ার কারণে ষষ্ঠ ও সপ্তম পরিচ্ছেদকে আলাদা করিয়া দ্বিতীয় খণ্ড করা হইয়াছে ; উদ্দেশ্য এই যে, সম্ভবতঃ পাঠকদের পক্ষে ইহা সহজ হইবে।

‘কানাআত’ অর্থাৎ অল্পে তুষ্টির ফযীলত, মুসীবতের উপর ছবর—এর প্রতি উৎসাহ ও তাকীদ প্রদান এবং ছওয়াল করার অপকারিতা—এই তিনটি বিষয় কুরআন পাক ও হাদীস শরীফে বিভিন্ন শিরোনাম, বিভিন্ন বিষয়, উদাহরণ, সতর্কবাণী, বিধানসমূহ ও ঘটনাবলীর মাধ্যমে এত বেশী পরিমাণে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, এইগুলিকে সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করিলেও বড় বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন, যাহা এই ক্ষুদ্র কিতাবে সংক্ষিপ্তভাবে লিখিলেও কিতাব দীর্ঘ হইবার কারণ হইয়া যাইবে। তবুও সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা তো করিতেই হয়।

এই বিষয়টি দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শেষের দিকে বর্ণিত হইয়াছে যে, মালের মধ্যে লাভও আছে লোকসানও আছে ; ইহা বিষ-প্রতিষেধকও আবার বিষও। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন : প্রত্যেক উম্মতের জন্য একটি ফেতনা থাকে ; আমার উম্মতের জন্য ফেতনা হইল, মাল। এইজন্য এই ফেতনা এবং ইহার বিষ হইতে নিজেকে রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরী। এই সাপ কাহারও নিকট থাকিলে ইহা দ্বারা যদি তিরিয়াক অর্থাৎ বিষ-প্রতিষেধক ঔষধ বানাইয়া লওয়া যায়,

তবে নিজের জন্যও উপকারী অন্যদেরও ফায়দা। নচেৎ ইহার বিষ নিজেকেও ধ্বংস করিবে অন্যদেরও ক্ষতি করিবে। এইজন্যই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন : এই সম্পদ সবুজ-শ্যামল (অর্থাৎ আকর্ষণীয় তরুতাজা), মিষ্টি বস্তু, যদি উহাকে হক অনুযায়ী (অর্থাৎ শরীয়তের নিয়ম ও তরীকা মুতাবেক) হাসিল এবং হক অনুযায়ী খরচ করা হয়, তবে উহা উপকারী ও সাহায্যকারী বস্তু। আর যে উহাকে অন্যায়ভাবে হাসিল করে, তাহা এইরূপ যেমন মানুষের গো-ক্ষুধা রোগ হইয়া যায়, ফলে সে খাইতেই থাকে অথচ তাহার পেট ভরে না।

(মিশকাত)

ইমাম গায়ালী (রহঃ) বলেন, মালের মধ্যে লাভও আছে ক্ষতিও আছে। উহার উদাহরণ সাপের মত—যে ব্যক্তি মস্ত্র জানে, সে সাপকে ধরিয়া উহার দাঁত বাহির করিয়া লয় অতঃপর উহা দ্বারা তিরিয়াক (অর্থাৎ বিষনাশক ঔষধ) প্রস্তুত করে। তাহাকে দেখিয়া কোন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি যদি সাপ ধরিয়া লয়, তবে সেই সাপ তাহাকে দংশন করিবে এবং সে ধ্বংস হইয়া যাইবে।

সম্পদের বিষ হইতে ঐ ব্যক্তি নিরাপদে থাকিতে পারে, যে পাঁচটি বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দিবে—(১) ইহা চিন্তা করিবে যে, সম্পদের উদ্দেশ্য কি ; কি উদ্দেশ্যে ইহাকে পয়দা করা হইয়াছে, যাহাতে কেবল ঐ উদ্দেশ্যকেই উহার সহিত সম্পর্কিত রাখে। (২) সম্পদের আমদানী ও উপার্জনের পন্থার প্রতি কঠোরভাবে দৃষ্টি রাখিবে। যেন উহাতে কোন নাজায়েয পন্থা शामिल না হইয়া যায়—যেমন, এইরূপ হাদিয়া, যাহার মধ্যে ঘুঘুর সন্দেহ আছে অথবা এইরূপ ছওয়াল, যাহার মধ্যে অপমানের সম্ভাবনা রহিয়াছে। (৩) প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ নিজের কাছে থাকিতে দিবে না ; যে পরিমাণ সম্পদ বাস্তবিকই দরকার উহা তো রাখিতেই হইবে ; কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ সঙ্গে সঙ্গে খরচ করিয়া দিবে। (৪) খরচ করিবার পন্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে, যেন অপাত্রে ও নাজায়েয ক্ষেত্রে খরচ না হইয়া যায়। (৫) সম্পদের আমদানী ও খরচ, প্রয়োজন পরিমাণ জমা রাখা, অনুরূপ প্রত্যেক ব্যাপারে নিয়ত খালেস থাকা চাই ; যেন শুধু আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি হাছিল করা উদ্দেশ্য হয়। যাহা জমা রাখিবে অথবা ব্যবহার করিবে উহা শুধু এই নিয়তে হইবে যে, ইহা দ্বারা আল্লাহ তায়ালার এবাদতের মধ্যে শক্তি হাসিল হইবে। আর যাহা প্রয়োজন হইতে বেশী হয় উহাকে বেকার, অহেতুক ও তুচ্ছ মনে করিয়া জলদি খরচ করিয়া দিবে ; মূল্যবান মনে করিবে না। এই সকল

শর্তের সহিত সম্পদ হওয়া ক্ষতিকর নয়। এইজন্যই হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি সারা দুনিয়ার সম্পদ শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালাকে জন্যই গ্রহণ করে (নিজের স্বার্থে নয়), তবে সে দুনিয়াত্যাগী। আর যদি একেবারে সামান্য অংশও গ্রহণ না করে এবং এই গ্রহণ না করা আল্লাহর জন্য না হয় (বরং দুনিয়াবী কোন স্বার্থ, সম্মানের লিস্সা ইত্যাদি কারণে হয়), তবে সে দুনিয়াদার। (এহুইয়া)

অপর এক হাদীসে আছে, এই মাল সবুজ শ্যামল ও মিষ্ট জিনিস, যে ব্যক্তি ইহাকে ন্যায্যভাবে হাসিল করে, তাহার জন্য ইহাতে বরকত দেওয়া হয়। অন্য হাদীসে আছে, দুনিয়া কতই না উত্তম ঘর ঐ ব্যক্তির জন্য, যে উহাকে আখেরাতের পাথের বানায় এবং আল্লাহ তায়ালাকে (উহার মাধ্যমে) রাজী করিয়া লয়। আর কতই না মন্দ ঐ ব্যক্তির জন্য, যাহাকে এই দুনিয়া আখেরাত হইতে ফিরাইয়া দেয় এবং আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্টি অর্জনে অক্ষমতা সৃষ্টি করিয়া দেয়। (কানয)

মোটকথা, অনেক রেওয়াযাতে এই বিষয় বর্ণিত হইয়াছে যে, সম্পদ প্রকৃতপক্ষে খারাপ জিনিস নয় ; বরং ভাল জিনিস ও কাজের জিনিস—দ্বীনি ও দুনিয়াবী অনেক ফায়দা উহার সহিত জড়িত রহিয়াছে। এইজন্যই অনেক হাদীসে কুজি কামাই করিবার ও মাল হাসিল করিবার প্রতি উৎসাহও প্রদান করা হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে যেহেতু একটি বিষাক্ত উপাদান রহিয়াছে এবং মানুষের অন্তর সাধারণতঃ রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে, এই জন্য অধিক পরিমাণে কুরআন পাকের আয়াত ও হাদীসসমূহে মালের আধিক্য ও প্রাচুর্য হইতে বাঁচিবার উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে। বিশেষভাবে ইহার প্রাচুর্যকে অপছন্দনীয় বরং ধ্বংসাত্মক বলা হইয়াছে। এইজন্যই হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ রহিয়াছে, আল্লাহ তায়ালা যে বান্দাকে মহব্বত করেন, দুনিয়া হইতে তাহাকে এমনভাবে হেফাজত করেন ও বিশেষতঃ বাঁচাইয়া রাখেন যেমন তোমরা আপন রোগীকে পানি হইতে বাঁচাইয়া রাখ। (মিশকাত) অথচ পানি কত গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী জিনিস যে, উহার উপরই জীবন নির্ভর করে ; উহা ছাড়া বাঁচা যায় না। কিন্তু এই সবকিছু সত্ত্বেও যদি চিকিৎসক কোন রোগী সম্পর্কে পানি ক্ষতিকর হওয়ার কথা বলিয়া দেয়, তবে রোগীকে পানি হইতে ফিরাইয়া রাখিবার জন্য কতই না চেষ্টা ও তদবীর করা হয়। ইহা কেন? এইজন্য যে, মালের প্রাচুর্যের দ্বারা সাধারণতঃ ক্ষতি বেশী হইয়া থাকে। আর ইহা এই কারণে যে, আমাদের অন্তর এমন পরিষ্কার নয় যে, সম্পদের নেশার দ্বারা প্রভাবিত হইবে না। এই কারণেই হযূর সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র এরশাদ রহিয়াছে যে, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি কি এমন আছে, যে পানির উপর দিয়া চলিবে অথচ তাহার পা পানিতে ডিজিবে না? সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এমন তো কেহই নাই। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, দুনিয়াদার লোকদেরও এই অবস্থা যে, ওনাহ হইতে বাঁচা তাহাদের জন্য মুশকিল। (মিশকাত)

আর বাস্তবেও ইহা দেখা যায় যে, কৃপণতা, হিংসা, অহংকার, আত্মগর্ব, বিদ্বেষ, রিয়া, পরস্পর অহমিকা ইত্যাদি যত রকম আধ্যাত্মিক রোগ ও পাপাচার রহিয়াছে, সব সম্পদের কারণে অতি জ্বলদি ও অধিক পরিমাণে পয়দা হয়। অনুরূপভাবে স্বেচ্ছাচারিতা, মদ্যপান, জুয়া, সুদখোরী ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার প্রবৃত্তিগত পাপাচারও উহার কারণে অনেক বেশী হইয়া থাকে। তদুপরি মালের প্রতি স্বভাবগত মহব্বত ও আকর্ষণ অন্তরসমূহে এমন পর্যায়ে স্থান করিয়া রাখিয়াছে যে, মানুষের কাছে উহা যত বেশী পরিমাণেই হউক না কেন, সর্বদা আরও বেশী পরিমাণের জন্য আগ্রহী থাকে এবং উহার চেষ্টায় মগ্ন থাকে। এইজন্যই বিভিন্ন রেওয়াজাতে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ রহিয়াছে যে, মানুষের কাছে যদি স্বর্ণের দুইটি ময়দানও থাকে, তবু সে তৃতীয়টির আগ্রহী হয়। দুনিয়ার বাস্তব অভিজ্ঞতা যে, কোন ব্যক্তি কোন পরিমাণের উপরই সন্তুষ্ট হয় না। তবে আল্লাহ পাক কাহাকেও হেফাজত করিলে তাহা ভিন্ন কথা। এই কারণেই কুরআন পাক ও হাদীসসমূহে বেশী পরিমাণে কানাআত অর্থাৎ অল্প তুষ্টির প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে। যাহাতে এই গো-ক্ষুধা রোগের কিছুটা উপশম হয়। এই জন্য দুনিয়ার হাকীকত এবং উহার অপবিত্রতা ও ক্ষণস্থায়িত্ব পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ ও মহব্বত কম হয়। কেননা, যে জিনিস সর্বাবস্থায় শীঘ্রই ধ্বংস হইয়া যাইবে, উহার সহিত মানুষ কেন দিল লাগাইবে? দিল লাগাইবার জিনিস একমাত্র উহাই, যাহা সব সময় থাকে এবং সবসময় কাছে আসে। এইজন্যই হুবরের তাকীদ ও উহার জন্য উৎসাহ প্রদান অধিক পরিমাণে বর্ণিত হইয়াছে। যাহাতে মানুষ এই সম্পদের স্বল্পতাকে কোন রকম মুসীবত মনে না করে। বরং ইহার মধ্যে অনেক সময় আল্লাহ তায়ালা বড় বড় হেকমত ও রহস্য লুকায়িত থাকে। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন : الرِّزْقُ لِعِبَادِ الْاٰیَةِ অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা যদি আপন বান্দাদের রিযিক প্রশস্ত করিয়া দেন, তবে তাহারা পৃথিবীতে অবাধ্যতা শুরু করিয়া দিবে। (শূরা : ২৭) অভিজ্ঞতাও এই যে,

যেখানে সম্পদের প্রাচুর্য রহিয়াছে, সেখানে মাত্রাতিরিক্ত ফাসাদ ও বিপর্যয় দেখা দিয়াছে। আর যেহেতু সম্পদের প্রাচুর্য মূল উদ্দেশ্য নয়, তদুপরি মানুষের অন্তরে সম্পদের প্রতি স্বভাবগত আকর্ষণও রহিয়াছে, এই কারণে ছওয়াল করার নিষিদ্ধতা ও উহার নিন্দা অধিক পরিমাণে উল্লেখ করা হইয়াছে। সম্পদের প্রতি মহব্বত ও আকর্ষণের ফলে মানুষ অশ্রম ও অপারগ না হওয়া সত্ত্বেও ছওয়াল আরম্ভ করিয়া দেয়। কেননা, ইহাতে মেহনত তো কিছুই করিতে হয় না ; সামান্য একটু জ্বান নাড়াচাড়া করিলেই কিছু না কিছু পাওয়া যায় ; আর এইভাবে সম্পদ বৃদ্ধি পায়। এইজন্য এই তিনটি বিষয় অর্থাৎ (১) কানাআত (অল্পে তুষ্টি), (২) মুসীবতের উপর ছবর ও (৩) ছওয়াল করার নিন্দা সম্পর্কে কিছু আয়াত ও হাদীস এই জায়গায় লেখা হইতেছে—

① زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ
 مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
 الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
 وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
 وَالْحَرْثِ ۚ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا
 وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ
 الْمَبَآئِ ۝ قُلْ أَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ
 بِمَا أَبَدَّيْتُمْ ۚ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ
 رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
 الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ
 مُطَهَّرَةٌ وَرِزْقٌ وَاسِعٌ ۖ وَاللَّهُ
 بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ الَّذِينَ
 يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّا أَهْمَانَا
 فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَفِنَا عَذَابَ
 النَّارِ ۝ الصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ

وَالْمُتَّقِينَ وَالْمُتَّقِينَ وَالْمُتَّقِينَ
 بِالْآسَافِ (আল عمران : ১৮) کی خوشنودی ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں کے
 احوال کو خوب دیکھنے والے ہیں (یہ لوگ جی کہتے یہ آخرت کی چیزیں ہیں ایسے لوگ ہیں جو
 کہتے ہیں کہ اسے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے ہیں، پس آپ ہمارے گناہوں کو مٹا
 کر دیتے اور ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا دیتے۔ یہ لوگ وہ ہیں جو مصیبتوں پر صبر کرنے
 والے ہیں، حج پڑھنے والے ہیں (اللہ تعالیٰ کے سامنے) عاجزی کرنے والے ہیں اور
 (نیک کاموں میں مل) خرچ کرنے والے ہیں، اور پہلی رات میں گناہوں کی معافی چاہنے
 والے ہیں۔

⑤ মানুষের জন্য সুসজ্জিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে বাহেশাতের
 মহব্বত—(যেমন) রমণী হউক, সন্তান-সন্ততি হউক, রাশিকৃত স্বর্ণ ও
 রৌপ্য হউক, চিহ্নিত (অর্থাৎ উত্তম ও উন্নত) অশ্ব হউক, অন্যান্য
 গবাদিপশু হউক, আর শস্যক্ষেত্র হউক (কিন্তু এইসব জিনিস) পার্থিব
 জীবনের ব্যবহারিক বস্তু। পরিণামের সৌন্দর্য (ও কাজে আসিবার জিনি
 তো) আল্লাহরই নিকট রহিয়াছে (হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহ
 ওয়াসাল্লাম!) আপনি তাহাদেরকে বলিয়া দিন, আমি কি তোমাদেরকে
 এমন বস্তুর কথা বলিয়া দিব, যাহা এইসমস্ত জিনিস অপেক্ষা (অনেক
 বেশী) উত্তম (উহা কি, তাহা মনোযোগ দিয়া শোন)—এইরূপ লোকদের
 জন্য যাহারা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে, তাহাদের প্রতিপালকের নিকট
 এমন সমস্ত বাগান রহিয়াছে যাহার তলদেশে নহর প্রবাহিত। উহাতে
 তাহারা অনন্তকাল অবস্থান করিবে। আর (তাহাদের জন্য সেখানে)
 পাক-পবিত্রা বিবিগণ রহিয়াছে এবং (এইসব কিছু হইতে বড়) আল্লাহ
 তায়ালা সন্তুষ্টি রহিয়াছে। আর আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের (অবস্থাসমূহ)
 খুব দেখেন। (এই সমস্ত লোক যাহাদের জন্য আখেরাতের এইসব জিনিস
 রহিয়াছে, তাহারা এমন লোক) যাহারা বলে, হে আমাদের
 পরওয়ারদিগার! আমরা ঈমান আনিয়াছি। সুতরাং আপনি আমাদের
 গুনাহ মাফ করিয়া দিন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আশ্রয় হইতে রক্ষা
 করুন। তাহারা ঐ সমস্ত লোক (যাহারা মুসীবতে) ধৈর্যশীল, সত্যবাদী,
 (আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্টি) বিনয়ী এবং (নেক কাজে মাল) খরচকারী
 এবং শেষ রাত্রে গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনাকারী। (আলি-ইমরান : ১৪-১৭)

ফায়দা : আল্লাহ তায়ালা এইসব জিনিসের মহব্বতকে বাহেশাতের

মহাবত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইমাম গাযযালী (রহঃ) বলেন, খাহেশের চরম পর্যায়ে পৌঁছার নামই প্রেম। যাহা চিন্তাশূন্য অন্তরের রোগ। শুরুতেই উহার চিকিৎসা করা প্রয়োজন। অর্থাৎ উহার প্রতি দৃষ্টিপাত কমাইয়া দিবে, উহার প্রতি মনোযোগ কমাইয়া দিবে, অন্যথায় যখন মনোযোগ বাড়িয়া যাইবে, তখন সরানো মুশকিল হইয়া যাইবে। আর শুরুতে ইহা অনেক সহজ। প্রত্যেক জিনিসের প্রতি এশক বা প্রেমের একই অবস্থা। যেমন, ধন-সম্পদ, ইযযত-সম্মান, জায়গা-জমিন, সম্মান-সম্মতি, এমনকি পাখি (কবুতর ইত্যাদি) দ্বারা খেলা করা এবং দাবা ইত্যাদি খেলারও একই অবস্থা। এইসব জিনিস যখন মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া বসে, তখন তাহার দীন ও দুনিয়া উভয়কেই বরবাদ করিয়া দেয়। উহার দৃষ্টান্ত এইরূপ—যেমন কোন ব্যক্তি জানোয়ারের উপর সওয়ার হইল, জানোয়ার বিপথে যাইতে চাহিলে সওয়ারী ব্যক্তি যদি তৎক্ষণাৎ লাগাম টানিয়া অন্য দিকে ফিরাইয়া দেয়, তখন অতি সহজেই উহা সঠিক পথে চলিতে পারে। কিন্তু জানোয়ার যদি অন্য পথে ঢুকিয়া পড়ে তারপর সওয়ারী ব্যক্তি যদি উহার লেজ ধরিয়া পুনরায় পিছনের দিকে টানিতে চায়, তবে উহাকে ফিরাইয়া আনা বড় দুস্কর হইয়া পড়িবে। কাজেই এইসব জিনিসের মহাবতের প্রতি শুরুতেই দৃষ্টি রাখিতে হইবে; যাহাতে সীমা অতিক্রম করিতে না পারে। (এহইয়া)

আলেমগণ বলিয়াছেন, দুনিয়াতে যত জিনিস আছে, উহা তিন প্রকার—খনিজ, উদ্ভিদ, প্রাণীজ। আল্লাহ তায়ালা উক্ত আয়াতে এই তিন প্রকার বস্তুর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া দুনিয়ার সমস্ত জিনিস সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। স্ত্রী ও পুত্রদের উল্লেখ করিয়া সম্মান-সম্মতি, প্রিয়জন, আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধব—এককথায় মানবকুলের সমস্ত প্রিয়জন সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। আর স্বর্ণ-রৌপ্যকে উল্লেখ করিয়া সমস্ত খনিজদ্রব্য সম্পর্কে এবং ঘোড়া, গবাদিপশু উল্লেখ করিয়া সর্বপ্রকার জীব-জন্তু সম্পর্কে এবং খেত-খামারের দ্বারা সর্বপ্রকার উৎপন্ন দ্রব্য সম্পর্কে হুশিয়ার করিয়া দিয়াছেন। আর এই সমস্ত জিনিসই সমগ্র দুনিয়ার সারবস্তু। (এহইয়া)

এইসব জিনিস উল্লেখ করিয়া এবং ইহাদের সম্পর্কে সতর্ক করিয়া এরশাদ করিয়া দিয়াছেন যে, এই সবকিছু কয়েকদিনের জিন্দেগী কাটাইবার সামগ্রী মাত্র। ইহার মধ্যে কোন জিনিসই ভালবাসার উপযুক্ত ও অন্তর লাগানোর যোগ্য নহে। অন্তর লাগানোর যোগ্য শুধু ঐসব বস্তু যাহা চিরস্থায়ী, সবসময় থাকিবে, সবসময় কাজে আসিবে। তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ

হইল—আল্লাহ তায়ালায় সন্তুষ্টি। উহা দুনিয়া ও আখেরাতের সব জিনিস হইতে শ্রেষ্ঠ।

অন্য আয়াতে জাম্মাতের নেয়ামতসমূহ উল্লেখ করিয়া এরশাদ হইয়াছে: **وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ - ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ** অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালায় সন্তুষ্টি এই সমস্ত জিনিস হইতে বড় এবং উহাই বড় সকলতা। (তওবা : ৭২) আর বাস্তবেও না দুনিয়ার কোন জিনিস আল্লাহ তায়ালায় সন্তুষ্টির সমতুল্য হইতে পারে, না আখেরাতের কোন নেয়ামত উহার সমতুল্য হইতে পারে।

উপরোক্ত আয়াতসমূহে দুনিয়ার সমস্ত লোভনীয় বস্তুসমূহকে বিস্তারিত উল্লেখ করিয়া এই ব্যাপারে সতর্ক করা হইয়াছে যে, এই সবকিছু কেবল পার্থিব জীবনের আসবাব মাত্র। কুরআন পাকে বারবার এই বিষয়ের উপর সতর্ক করা হইয়াছে; বিভিন্ন শিরোনামে নসীহত করা হইয়াছে। কোথাও দুনিয়া তলব করার নিন্দা করা হইয়াছে। কোথাও দুনিয়ার প্রাধান্য দানকারীদের নিন্দা বর্ণনা করা হইয়াছে। কোথাও দুনিয়া অস্থায়ী বলিয়া সতর্ক করা হইয়াছে। কোথাও দুনিয়াকে শুধুমাত্র ধোকা বলা হইয়াছে। যাহাতে এই বাস্তব সত্যকে উত্তমরূপে উপলব্ধি করা হয় যে, দুনিয়া এবং দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু কেবল সাময়িক প্রয়োজন মিটাইবার জিনিস। ইহা না চিরস্থায়ী, না অন্তর লাগানোর জিনিস। এইখানে উক্ত বিষয়ের সহিত সম্পর্কিত কয়েকটি আয়াত দ্বারা সতর্ক করিতেছি :

① **أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُتْ**

عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يَنْصَرُونَ ○

① ইহারা ই ঐ সমস্ত লোক যাহারা দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের বিনিময়ে খরিদ করিয়া লইয়াছে। সুতরাং না তাহাদের শাস্তি হালকা করা হইবে, আর না তাহাদিগকে কোনরূপ সাহায্য করা হইবে। (বাকারা : ৮৬)

② **فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن خَلَقٍ ○ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا**

② কিছুসংখ্যক লোক তো এমন যাহারা এইরূপ বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে যাহা কিছু দেওয়ার উহা দুনিয়াতেই দিয়া দিন।

(সুতরাং তাহারা যাহা কিছু পাইবার দুনিয়াতেই পাইয়া যাইবে।) তাহাদের জন্য আখেরাতে কোন অংশ নাই। আর কিছু লোক এইরূপ বলে, হে আল্লাহ! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান করুন এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান করুন এবং আমাদেরকে দোষের আযাব হইতে বাঁচাইয়া দিন। ইহা হইবে ঐ সমস্ত লোক যাহাদের জন্য (সেই সকল নেক আমলের মধ্যে) অংশ রহিয়াছে, যাহা তাহারা উপার্জন করিয়াছে।

(বাকারা : ২০০-২০২)

﴿ ٣ ﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ
وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ۝

৩) আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির বিষয়সমূহের মধ্যে কিছু লোক নিজের জীবনকে বিক্রয় করিয়া দেয়। আল্লাহ তায়ালা এইরূপ বান্দাদের উপর অত্যন্ত দয়াশীল। (বাকারা : ২০৭)

﴿ ٤ ﴾ زَيْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ
الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا قَوْمَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۝ وَاللَّهُ يَرْزُقُ
مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

৪) পার্শ্ব জীবন কাফেরদের জন্য সুসজ্জিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে আর তাহারা মুসলমানদের সহিত ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। অথচ এই মুসলমানগণ যাহারা কুফর ও শিরক হইতে বাঁচিয়া থাকে, কিয়ামতের দিন ঐ সকল কাফেরদের হইতে (মর্যাদার দিক দিয়া) উর্ধ্ব হইবে। (আর শুধুমাত্র সম্পদের প্রশস্ততার কারণে মানুষের অহংকার করা চাই না। কেননা,) রুজি তো আল্লাহ তায়ালা যাহাকে চাহেন, অগণিত দিয়া দেন। (সেইহেতু শুধু ধনী হওয়া কোন গর্বের বিষয় নয়।) (বাকারা : ২১২)

﴿ ٥ ﴾ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ۝

৫) এবং এই (দুনিয়ার জীবনের) দিনগুলিকে আমি লোকদের মধ্যে পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন করিতে থাকি (অর্থাৎ কখনও এক সম্প্রদায় জয়ী হয়, কখনও অন্য সম্প্রদায় জয়ী হয়)। (আলি-ইমরান : ১৭০) এইজন্য জয়ী হওয়া অথবা পরাজিত হওয়ার ফিকির অপেক্ষা বেশী গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী হইল, আখেরাতের ফিকির।

﴿ ٦ ﴾ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ۝ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى ۝

وَلَا تَظْلَمُونَ قَتِيلًا ۝ أَيُّنَ مَا تَكُونُوا يَدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ
كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ ۝

⑥ আপনি বলিয়া দিন, দুনিয়ার ভোগ-বিলাস অতি সামান্য (কয়েক দিনের জন্য মাত্র)। আর আখেরাত সর্বদিক দিয়া উত্তম ঐ ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে। আর তোমাদের উপর সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হইবে না। তোমরা যেখানেই থাক না কেন সেখানেই মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইবে; যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গের ভিতরেই থাক না কেন। (সুতরাং যখন মরিতেই হইবে, তখন সবসময় উহার চিন্তায় মগ্ন থাকা উচিত।) (নিসা : ৭৭-৭৮)

④ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ كَسَتْ مُؤْمِنًا
تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا زَعِنَدَ اللَّهِ مَغَارِمُ كَثِيرَةٌ ۝

⑦ আর এমন ব্যক্তিকে, যে তোমাদের সম্মুখে আনুগত্যের আলামত পেশ করে (যেমন আসসালামু আলাইকুম বলে অথবা কালেমা পড়ে) এইরূপ বলিয়া দিওনা যে, তুমি (আন্তরিকভাবে) মুসলমান নও। তোমরা পার্থিব জীবনের সামগ্রী তালাশ করিতেছ; অথচ আল্লাহ তায়ালা নিকট প্রচুর গনিমতের মাল রহিয়াছে। (নিসা : ৯৪)

ফায়দা : উপরোক্ত আয়াতসমূহে এই বিষয়ে সতর্ক করা হইয়াছে যে, কোন কোন মুসলমান কোন কোন কাফেরকে যাহারা নিজেদেরকে মুসলমান বলিয়া দাবী করিত গনিমতের মালের আগ্রহে কতল করিয়া দিয়াছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে এই সমস্ত আয়াত নাযিল হয় যে, শুধুমাত্র তুচ্ছ দুনিয়ার মাল কামাই করিবার জন্য এই ঘৃণ্য কাজ করা হইয়াছে। অনেক হাদীসে এইসব ঘটনা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। এক হাদীসে ইহাও আসিয়াছে যে, একজন মুসলমান একজন কাফেরের উপর হামলা করিল। সে তাড়াতাড়ি কালেমা পড়িয়া লইল। এতদসঙ্গেও সেই মুসলমান তাহাকে কতল করিয়া দিল। যখন ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিতে পারিলেন, তখন তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। সেই মুসলমান ওজর করিলেন যে, এই ব্যক্তি শুধু ভয়ের কারণে কালেমা পড়িয়াছিল। ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি কি তাহার দিল চিরিয়া দেখিয়া লইয়াছিলে যে, সে ভয়ের

কারণে পড়িয়াছে? অতঃপর এই মুসলমানের মৃত্যু খুবই খারাপভাবে হইয়াছে। (দুরেরে মানসুর)

আল্লাহ তায়ালা সীমালংঘন করিবার অনুমতি কোথাও দেন নাই। অন্য আলোচনা শুরু হইয়া যাইবে ; এইজন্য ইহাকে লিখিতেছি না। কিন্তু শুধু পার্থিব স্বার্থের কারণে কাফেরদের উপর জুলুম ও বাড়াবাড়ি করিতেও শরীয়ত কখনও অনুমতি দেয় না। অনেক আয়াত ও অনেক রেওয়ায়াত এই বিষয় সম্পর্কে বর্ণিত রহিয়াছে। সূরা মায়েদার শুরুতে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন : **وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اِلَٰیةَ** অর্থাৎ, মক্কার কাফেরগণ যাহারা তোমাদিগকে হোদায়বিয়ার ওমরার সময় মক্কা প্রবেশ করিতে বাধা দিয়াছিল এবং তোমাদের ওমরা না করিয়া মক্কা মুকাররমার নিকট হইতে অকৃতকার্য হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল— ইহার গোস্তা ও জিদ যেন তোমাদিগকে সীমা অতিক্রম করিতে না দেয়। এমন যেন কখনও না হয় যে, তোমরা বাড়াবাড়ি করিতে আরম্ভ কর। তোমরা নেক কাজ ও তাকওয়ার কাজে একে অপরকে সাহায্য কর ; গুনাহ ও জুলুমের কাজে কাহাকেও সাহায্য করিও না। (মায়েদা : ২)

একই সূরার দ্বিতীয় রুকুতে এরশাদ হইয়াছে : **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ اِلَٰیةَ** অর্থাৎ, হে মুসলমানগণ ! তোমরা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের জন্য তাহার হুকুম-আহকামের পুরাপুরি পাবন্দি কর। আর (যদি কোথাও প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে) ইনসাফের সহিত সাক্ষ্য প্রদান কর। কোন সম্প্রদায়ের সহিত শত্রুতা যেন তোমাদিগকে ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা হইতে বিচ্যুত না করে। (মায়েদা : ৮)

মোটকথা, অনেক জায়গায় এইসব বিষয়ের উপর সতর্ক করা হইয়াছে। দুনিয়ার মহব্বত মানুষের আকল-বুদ্ধিকেও অকেজো করিয়া দেয়।

(৪) وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلْآٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ

(৮) এবং দুনিয়ার জীবন খেল-তামাশা ব্যতীত কিছুই নয়। আর আখেরাতের ঘর মুত্তাকীদের জন্য উত্তম। তোমাদের কি আকল বুদ্ধি নাই? (এইরূপ পরিষ্কার কথা তোমাদের বুঝে আসে না যে, আখেরাতের উৎকৃষ্ট জীবনের সহিত দুনিয়ার এই খেল-তামাশার কোনই সামঞ্জস্য নাই।)

(আনআম : ৩২)

⑨ وَذُرِّيَّاتٍ اتَّخَذُوا اٰدِيْنَهُمْ لِبَعًا وَّلَهُمْ اَوَّغَرْتَهُمْ
الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا

⑨ এইরূপ লোকদের হইতে একেবারে আলাদা থাক, যাহারা নিজেদের দীনকে খেল-তামাশা বানাইয়া রাখিয়াছে। আর দুনিয়ার জীবন তাহাদিগকে ধোকার মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়াছে। (আনআম : ৭০)

⑩ وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا قُرْذٰى كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرْكٰتُمْ
مَا خَوَّلْنٰكُمْ وَرَءَا ظٰلِمُوْكُمْ

⑩ এবং তোমরা আমার নিকট (মৃত্যুর পর) একা নিঃসঙ্গ হইয়া আসিয়া গিয়াছ—যেমন আমি তোমাদিগকে দুনিয়াতে প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছিলাম (অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন পয়দা হইত)। আর যাহা কিছু আমি তোমাদিগকে (দুনিয়াতে ধন-সম্পদ ও দ্রব্য-সামগ্রী) দান করিয়াছিলাম, সেইগুলিকে সেইখানেই ছাড়িয়া আসিয়াছ। (আনআম : ৯৪)

ফায়দা : অর্থাৎ, মানুষ যেমন মায়ের পেট হইতে ধন-সম্পদ ছাড়া পয়দা হয়, তেমনি কবরের কোলে একা একাই যায়। এখানকার ধন-সম্পদ এখানেই থাকিয়া যাইবে ; শুধুমাত্র ঐ সমস্ত ধন-সম্পদ সাথে যায়, যাহা আল্লাহ তায়ালার নিকট নিজের জীবনে জমা করিয়া দিয়াছে। সেই সঞ্চিত সম্পদ সেখানে পূরাপূরিভাবে পাইবে ; বরং আল্লাহর ভাণ্ডার হইতে উহার সহিত আরও অতিরিক্ত পাইবে।

⑪ وَغَرَّتْهُمْ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا

⑪ আর দুনিয়ার জীবন তাহাদিগকে ধোকায়ে ফেলিয়া রাখিয়াছে।

(আরাফ : ৫১)

⑫ فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوْا الْكِلْبَ يٰۤاٰخِذُوْٓنَ
عَرَضَ هٰذَا الْاٰدٰى زَ وَيَقُوْلُوْنَ سَيُفْقَرُنَا

⑫ অতএব, (নেক বান্দাদের পর) এমন লোক তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে, যাহারা তাহাদের নিকট হইতে কিতাব তো হাশিল করিয়াছে কিন্তু (এমন হারামখোর যে, কিতাবের হুকুম-আহকামের বিনিময়ে) এই নিকট দুনিয়ার ধন-সম্পদ গ্রহণ করে এবং বলে যে, আমাদিগকে অবশ্যই ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে (কেননা, আমরা আল্লাহর প্রিয়জন)।

(আরাফ : ১৬৯)

﴿١٣﴾ وَالذَّارِ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ؕ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

﴿১৩﴾ আর আখেরাতের দ্বার মুতাকী লোকদের জন্য উত্তম। তোমরা কি একেবারেই আকল-বুদ্ধি রাখ না? (যে, এরূপ স্পষ্ট কথাও বুঝ না।)

(আ'রাফ : ১৬৯)

﴿١٤﴾ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ لِّأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

﴿১৪﴾ তোমরা এই কথা জানিয়া রাখ যে, তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি পরীক্ষার বস্তু। (যাহাতে আমি এই পরীক্ষা লই যে, কোন্ ব্যক্তি ইহাদের মহব্বতকে প্রাধান্য দেয়, আর কোন্ ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালায় মহব্বতকে প্রাধান্য দেয়।) এই কথাও জানিয়া রাখ, (যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালায় মহব্বতকে প্রাধান্য দেয়, দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের জীবনের জন্য কাজে লাগায়, তাহার জন্য) আল্লাহ তায়ালায় নিকট অনেক বড় প্রতিদান রহিয়াছে। (আনফাল : ২৮)

﴿١٥﴾ تَرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ؕ

﴿১৫﴾ তোমরা তো দুনিয়ার সম্পদ ও আসবাব চাহিয়া থাক, আর আল্লাহ তায়ালা (তোমাদের নিকট হইতে) আখেরাত চাহেন। (অর্থাৎ তোমাদের উচিত, আখেরাতের ফিকিরে লাগিয়া থাক; উহার প্রস্তুতিতে সবসময় মশগুল থাক।) (আনফাল : ৬৭)

﴿١٦﴾ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ

﴿১৬﴾ তোমরা কি আখেরাতের জীবনের মুকাবেলায় দুনিয়ার জীবনের উপর রাজি হইয়া গিয়াছ? দুনিয়ার জীবন তো আখেরাতের জীবনের তুলনায় কিছুই নয়। (তওবা : ৩৮)

﴿١٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِمَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غٰفِلُونَ ۝ أُولَٰئِكَ مَا يُؤْتِيهِمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

﴿১৭﴾ যাহাদের আমার নিকট আসিবার আশা নাই, তাহারা দুনিয়ার জীবনের উপর পরিতুষ্ট হইয়া গিয়াছে, উহার উপর নিশ্চিন্ত হইয়া গিয়াছে

এবং আমার সতর্ক করা সত্ত্বেও গাফেল হইয়া গিয়াছে। এইরূপ লোকদের ঠিকানা তাহাদের কৃতকর্মের কারণে জাহান্নাম হইবে। (ইউনুস : ৭-৮)

﴿١٨﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَعَثْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَأَنْتَبِهُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِنْهَا يُعَيَّا كُلُّ النَّاسِ وَالْأَنْعَامُ ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا لَا أَتُهَا أَمْرًا نِيلًا أَوْ نَهَارًا فَنَجَعَلُهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنِ بِالْأَمْسِ ۖ كَذَٰلِكَ نَقُصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

﴿১৮﴾ হে লোকসকল ! শুনিয়া রাখ, তোমাদের এই অবাধ্যতা তোমাদের জন্য বিপদের কারণ হইবে। দুনিয়ার জীবনে (কিছুদিন উহা দ্বারা) উপকৃত হইতেছ ; অবশেষে আমার নিকট তোমাদের আসিতে হইবে। তখন আমি তোমাদের সমস্ত কৃতকর্ম তোমাদিগকে জানাইয়া দিব। দুনিয়াবী জীবনের অবস্থা তো এমন, যেমন আমি আসমান হইতে পানি বর্ষণ করিলাম অতঃপর সেই পানি হইতে জমিনের উদ্ভিদগুলি (অর্থাৎ জমিন হইতে উৎপন্ন বস্তুসমূহ) যাহা মানুষ ও জীবজন্তু খায় অত্যন্ত ঘন হইয়া উদগত হইল ; অবশেষে যখন জমিন তাহার সুদৃশ্যের পরিপূর্ণ রূপ ধারণ করিল এবং উহা অত্যন্ত শোভনীয় হইয়া উঠিল (অর্থাৎ ফসল সবজি ইত্যাদি পূর্ণতার চরমে পৌছিল) আর উহার মালিকগণ মনে করিল যে, আমরা এই উৎপন্ন ফসলের উপর সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত্ব লাভ করিয়াছি, তখন হঠাৎ এই উৎপন্ন ফসলের উপর আমার পক্ষ হইতে দিনে অথবা রাত্রে কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা (যেমন ধ্বংসাত্মক পঙ্গপাল ইত্যাদি) আসিয়া পড়িল। অতঃপর আমি উহাকে এমনভাবে নির্মূল করিয়া দিলাম যে, ইতিপূর্বে যেন উহার অস্তিত্বই এখানে ছিল না। (দুনিয়ার জীবন ও উহার শোভা ও চাকচিক্যের এই একই অবস্থা যে, উহা নিজের পূর্ণ যৌবন ও পরিপূর্ণ চাকচিক্য লাভ করা সত্ত্বেও অকস্মাৎ এমনভাবে শেষ হইয়া যায়, যেন উহা ছিলই না।) আমি এইভাবে নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করি ঐ সমস্ত লোকের (বুঝানোর) জন্য যাহারা চিন্তা করে, (আর যাহারা চিন্তা করার ইচ্ছা করে না, তাহারা কি বুঝিবে?) আর (যখন দুনিয়া ও উহার

চাকচিক্যের এই অবস্থা যে, উহা ক্ষণস্থায়ী ও অনিশ্চিত বস্তু ; অতএব আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে দারুণ বাক্য (অর্থাৎ চিরস্থায়ী ঘর, যাহাতে কোন আশংকা নাই)—এর দিকে আহ্বান করেন এবং যাহাকে চাহেন সঠিক পথে চলার তৌফীক দান করেন। (ইউনুস : ২৩-২৫)

﴿١٩﴾ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ

مِمَّا يَجْمَعُونَ ○

(১৯) (পূর্ব হইতে কুরআন পাকের সৌন্দর্য বর্ণনা করার পর এরশাদ হইতেছে—) আপনি বলিয়া দিন, (যখন কুরআন পাক এমন জিনিস,) কাজেই আল্লাহ তায়ালায় নেয়ামত ও রহমতের উপর লোকদের আনন্দিত হওয়া উচিত। (কেননা, তিনি এত বড় দৌলত আমাদিগকে দান করিয়াছেন) উহা (এই দুনিয়া হইতে বহু গুণে) শ্রেষ্ঠ, যাহাকে এইসব লোক জমা করিতেছে। (কারণ, দুনিয়ার উপকারিতা অত্যন্ত নগণ্য ও অতি নীচ ধ্বংস হইয়া যাইবে। আর কুরআন পাকের উপকারিতা অনেক বেশী ও চিরস্থায়ী) (ইউনুস : ৫৮)

﴿٢٠﴾ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفِ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ○ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَئْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطُلْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

(২০) যে ব্যক্তি (নিজের নেক আমল দ্বারা) দুনিয়াবী যিন্দেগী এবং উহার চাকচিক্য কামনা করে (যেমন ধন-দৌলত অথবা সুনাম-সুখ্যাতি ইত্যাদি,) আমি ঐ সকল লোকের আমলের বদলা দুনিয়াতেই পূরাপুরিভাবে ভোগ করাইয়া দেই ; সামান্যও কম করা হয় না। ইহারাই ঐ সমস্ত লোক যাহাদের জন্য আখেরাতে দোযখ ছাড়া আর কিছু নাই। আর তাহারা যাহাকিছু করিয়াছিল, উহা আখেরাতে সম্পূর্ণ অকেজো প্রমাণিত হইবে। (প্রকৃতপক্ষে) ইহারাই যাহাকিছু করিতেছে সব বাতিল (অকেজো)।

(হুম : ১৫-১৬)

﴿٢١﴾ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ○

(২১) আল্লাহ তায়ালা যাহাকে চাহেন, বেশী রুজি দান করেন। আর যাহাকে চাহেন, সংকীর্ণ করিয়া দেন। (রহমত ও গজব ইহার উপর নির্ভর

করে না।) এই সমস্ত লোক দুনিয়াবী যিন্দেগীর উপর আনন্দিত হয় (এবং ইহার ভোগ-বিলাস ও আরাম-আয়েশের উপর অহংকার করে।) অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়াবী যিন্দেগী একেবারে নগন্য। (কিছুই নয়—অস্থায়ী জীবনের কয়েকটি দিন কাটাইতে হইবে ; যেভাবেই হউক কাটিয়া যাইবে।) (রাস : ২৬)

﴿ ٢٢ ﴾ لَا تَمُدَّقَ عَيْنُكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَاهُ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ -

﴿ ২২ ﴾ আপনি আপনার চক্ষু উঠাইয়াও দেখিবেন না ঐ (চাকচিক্য ধন-দৌলত ও আরাম-আয়েশের) দিকে, যাহা আমি বিভিন্ন প্রকারের কাফের (আহলে কিতাব বা মুশরিক)দেরকে দিয়া রাখিয়াছি তাহাদের ভোগ করার জন্য (অর্থাৎ কিছুদিন এইগুলি দ্বারা তাহারা উপকৃত হইবে, অতঃপর এই সবকিছু ধ্বংস হইয়া যাইবে)। (হিজর : ৮৮)

﴿ ٢٣ ﴾ مَا عِنْدَكُمْ يَنْزِلُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ يَاقُطُ

﴿ ২৩ ﴾ যাহা কিছু তোমাদের নিকট (দুনিয়াতে) আছে, উহা (একদিন) শেষ হইয়া যাইবে। (উহা ধ্বংস হইয়া যাক বা তোমরা মরিয়া যাও, উভয় অবস্থাতে শেষ হইয়া যাইবে।) আর যাহা আল্লাহ তায়ালা নিকট আছে, উহা চিরস্থায়ী। (নাহল : ৯৬)

﴿ ٢٤ ﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ -

﴿ ২৪ ﴾ ইহা (উপরের আয়াতসমূহে যে আযাবের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে) এই কারণে যে, এই সমস্ত লোক দুনিয়ার যিন্দেগীকে আখেরাতের তুলনায় ভালবাসিয়াছে। (নাহল : ১০৭)

﴿ ٢٥ ﴾ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ ۖ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ۝ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ۝ كُلًّا ثَمَرًا هُوَ لَهُ ۖ وَهُوَ أَشَدُّ عَطَاءً رَّبِّكَ ۖ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۝ أَنْظَرُ كَيْفَ قَضَيْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۖ وَاللَّآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ۝

(২৫) যে ব্যক্তি দুনিয়া চায় (এবং নিজের চেষ্টা ও আমলসমূহের ফল শুধু দুনিয়াতেই পাইতে চায়), আমি তাহাকে দুনিয়াতে যতটুকু ইচ্ছা করি এবং যাহাকে ইচ্ছা করি দেই। (ইহা জরুরী নয় যে, প্রত্যেককেই দিব। বরং যাহাকে আমার দিল চায় তাহাকে দিব। আর যাহাকে দিব তাহার ব্যাপারেও ইহা জরুরী নয় যে, যতটুকু সে চাহিবে সবই দিয়া দিব বরং যতটুকু আমার দিল চাহিবে দিব।) অতঃপর আখেরাতে তাহার জন্য জাহান্নাম সাব্যস্ত করিয়া দেই, সে উহার মধ্যে দুর্দশাগ্রস্ত ও বিতাড়িত হইয়া জ্বলিতে থাকিবে। আর যে ব্যক্তি আখেরাত চায় এবং উহার জন্য যেরূপ চেষ্টা করা উচিত ; করে, শর্ত হইল সে মুমিন হয়, এইরূপ লোকদের চেষ্টা আল্লাহ তায়ালার নিকট কবুল হইয়া থাকে। প্রত্যেক দলকে (দুনিয়াদার হউক অথবা দীনদার) আপনার প্রতিপালকের দান হইতে আমি সাহায্য করি। আর আপনার প্রতিপালকের (এই দুনিয়াবী) দান কাহারও জন্য বন্ধ নয়। আপনি নিজেই দেখুন, এই দুনিয়াবী দানের ব্যাপারে আমি একজনকে অপরজনের উপর (সে মুসলমান হউক বা কাফের,) কিরূপে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়া রাখিয়াছি। (আপনি ইহা দ্বারা নিজেই বুঝিতে পারিবেন যে, দান অন্য কাহারও পক্ষ হইতে হইতেছে। কেননা, এক ব্যক্তি চেষ্টা অপেক্ষাও কম পাইতেছে আবার অপর ব্যক্তি চেষ্টা ছাড়াই অনেক কিছু পাইতেছে।) আর আখেরাত (যাহা ঈমানের সহিত সম্পর্কিত, এই দুনিয়া হইতে) মর্যাদার দিক দিয়া অনেক বড় এবং ফযীলতের দিক দিয়াও অনেক শ্রেষ্ঠ। (বনী ইসরাঈল : ১৮-২১)

(২৬) وَأَضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَوَةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۝ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَوَةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْبَاقِيَتُ الصَّالِحَتُ خَيْرٌ ۖ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابٌ وَخَيْرٌ ۖ أَمْ لَا ۝

(২৬) আপনি ঐসকল লোককে দুনিয়াবী জিন্দেগীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিয়া দিন—উহা এমন, যেমন আমি আসমান হইতে পানি বর্ষণ করিলাম ; অতঃপর উহার কারণে জমিনের উদ্ভিদসমূহ (ফসলসমূহ) খুব ঘন হইয়া বাহির হইল। অতঃপর (খুব সবুজ সজীব হইবার পর হঠাৎ কোন আকস্মিক দুর্ঘটনায় শুকাইয়া) এমন চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল যে, বাতাস উহাকে উড়াইয়া ফিরিতে লাগিল। (এই দুনিয়াবী জিন্দেগী এবং উহার আরাম-আয়েশ ও ধন-সম্পদেরও একই অবস্থা যে, আজ সবকিছুই

আছে; কিন্তু হঠাৎ কোন মুসীবত আসিল তো কিছুই রহিল না। আর বর্তমান জমানায় তো এই সমস্ত বিষয় ব্যাপকহারে নিজের চোখে দেখা যাইতেছে।) আর আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক জিনিসের উপর পুরাপুরি ক্ষমতা রাখেন (যখন চাহেন যাহাকে চাহেন ধনী বানাইয়া দেন, যাহাকে চাহেন লাখপতি হইতে ফকীর বানাইয়া দেন, যাহাকে চাহেন সম্মানাদি দান করেন, আর যাহাকে চাহেন অধিক সম্মান ও বড় পরিবার হওয়া সম্বন্ধে মুহূর্তের মধ্যে একা নিঃসঙ্গ করিয়া দেন। কাজেই ইহা বুঝিয়া লও যে,) মাল ও সম্মান-সম্পত্তি দুনিয়াবী জিন্দেগীর শুধু চাকচিক্য। আর যে সমস্ত নেক আমল সর্বদা বাকী থাকিবে, উহা সওয়াব ও প্রতিদান হিসাবেও (অনেক গুণে) শ্রেষ্ঠ এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার দিক দিয়াও উত্তম। (এইজন্য শুধু এইগুলিরই আশা-আকাঙ্ক্ষা করা চাই এবং এই আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হওয়ার জন্যই চেষ্টা করা চাই।) (কাহফ : ৪৫-৪৬)

﴿٢٧﴾ يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ۖ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ۝

﴿২৭﴾ (উপরোক্ত আয়াতসমূহে কিয়ামত আসিবার এবং শিক্ষায় ফুঁক দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই দিন এই সমস্ত অপরাধী লোকেরা) চুপে চুপে পরস্পর কথা বলিতে থাকিবে (এবং একে অপরকে বলিতে থাকিবে) যে, তোমরা (দুনিয়াতে) কেবল দশ দিন থাকিয়াছ; তাহারা যাহা বলিবে, আমি উহা খুব ভালভাবে জানি। তাহাদের মধ্যে সবচেয়ে অধিক বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি বলিবে, না; তোমরা তো একদিনই রহিয়াছ। (এই ব্যক্তিকে তাহাদের মধ্যে অধিক বিবেকসম্পন্ন এইজন্য বলা হইয়াছে যে, তাহার একদিনের অভিমত দশদিনের তুলনায় প্রকৃত অবস্থার বেশী নিকটবর্তী। এমনিতে তো আখেরাতের দিনসমূহের তুলনায় দুনিয়ার সারাজীবন একদিন কেন, বরং দশ ভাগের এক ভাগও নয়। আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ায় অবস্থানের ইহাই হইল বাস্তব কথা। (তা-হা : ১০৩-১০৪)

﴿٢٨﴾ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۖ وَرِزْقُ رَبِّكَ غَيْرُ وَابِتٍ ۖ وَأَمَّا أَهْلُكَ بِأَقْصَا الْأَرْضِ ۖ وَاصْطَلَبُوا عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ۝

(২৮) এবং আপনি কখনও চক্ষু উঠাইয়াও ঐ সমস্ত জিনিসের প্রতি তাকাইবেন না, যাহা দ্বারা আমি এই দুনিয়াদারদের বিভিন্ন দলকে পরীক্ষার জন্য ভোগ-বিলাসে রাখিয়াছি। কেননা, এই সবকিছু শুধু দুনিয়াবী জিন্দেগীর চাকচিক্য মাত্র (এবং ইহার পরীক্ষা যে, এই ধন-সম্পদের মধ্যে কে বন্দেগীর হক আদায় করে, আর কে করে না)। এবং আপনার প্রতিপালকের দান (যাহা আখেরাতে পাওয়া যাইবে; উহা দুনিয়ার এই সবকিছু হইতে অনেক গুণে) উত্তম ও স্থায়ী। এবং আপনি আপনার পরিবার-পরিজনকে নামাযের হুকুম করিতে থাকুন এবং নিজেও উহার উপর মজবুত থাকুন। আমি আপনার নিকট রুজি কামাই চাই না, রুজি তো আপনাকে আমি দিব। আর উত্তম পরিণাম তো পরহেজগারীরই।

(ত্বা-হা : ১৩১-১৩২)

﴿٢٩﴾ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ

(২৯) লোকদের জন্য তাহাদের হিসাব (কিতাব)-এর দিন আসিয়া পৌঁছিয়াছে। অথচ তাহারা অসতর্ক অবস্থায় বিমুখ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। (আম্বিয়া : ১)

﴿٣٠﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا

(৩০) অবশেষে যখন তাহাদের মধ্য হইতে কাহারও মাথার উপর মৃত্যু আসিয়া পড়ে (এবং আখেরাতের অবস্থাসমূহ পরিষ্কার হইতে থাকে), তখন বলে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে (মৃত্যু হইতে বাঁচাইয়া) দুনিয়াতে পুনরায় পাঠাইয়া দিন। যাহাতে সেই (দুনিয়া ও ধন-সম্পদ) যাহাকে আমি ছাড়িয়া আসিয়াছি উহার মধ্যে (ফিরিয়া যাইয়া) নেক আমল করিব। (আল্লাহ তায়ালা বলেন,) এইরূপ কখনও হইবে না (যাহার সময় আসিয়া যায় উহাতে আর নড়চড় হয় না)। (এই ব্যক্তি যাহাকিছু বলিতেছে) তাহা একটি বাজে কথা যাহা সে বলিতেছে। (মুমিনুন : ৯৯-১০০)

﴿٣١﴾ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿٣٢﴾ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْئَلُ الْعَادِيْنَ ﴿٣٣﴾ قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا تَوَ أَلَكُمْ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٤﴾ أَفَعَسِبْتُمْ أَنْتُمُ الْخَالِقُكُمْ عِبَادًا وَ أَلَكُمْ إِلَٰهًا لَا تُؤْبَعُونَ ﴿٣٥﴾

৩১) (কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে ঐ সমস্ত লোকের আফসোস ও দুঃখ বাড়ানোর জন্য) এরশাদ হইবে (আচ্ছা, ইহা বল) যে, তোমরা দুনিয়াতে কত বৎসর থাকিয়াছিলে? তাহারা (সেইখানের সময়ের দীর্ঘতা হিসাবে) বলিবে, আমরা তো (দুনিয়াতে) একদিন অথবা উহা হইতেও হয়ত কম থাকিয়াছি। (আর সত্য কথা বলিতে কি; স্বপ্নের মত আমাদের ইহাও জানা নাই যে, কত সময় অতিবাহিত হইয়াছে।) অতএব, গণনাকারীদিগকে (অর্থাৎ ফেরেশতাদিগকে যাহারা প্রত্যেক জিনিসের হিসাব লিখিতেন) জিজ্ঞাসা করিয়া লউন (যে, আমরা কত সামান্য সময় অবস্থান করিয়াছিলাম)। এরশাদ হইবে, যখন তোমরা এত কম সময় অবস্থান করিয়াছিলে, তবে কতই না ভাল হইত যে, যদি তোমরা (এই কথা) জানিয়া লইতে (যে, এই দুনিয়া মাত্র কয়েক দিনের জন্য; খুবই সামান্য কয়েকটি দিন এখানে থাকিতে হইবে। আচ্ছা, ইহা তো বল) তোমরা কি ইহা মনে করিতে যে, আমি তোমাদিগকে এমনিতেই প্রকার পয়দা করিয়াছি? (তোমাদেরকে পয়দা করার পিছনে আমার কোন উদ্দেশ্য ছিল না? অথচ আমি কুরআন পাকে পরিষ্কার বলিয়া দিয়াছিলাম যে, জিন ও ইনসানকে আমি শুধুমাত্র এবাদতের জন্য পয়দা করিয়াছি তোমাদের কি এই ধারণা ছিল যে,) আমার নিকট তোমাদেরকে ফিরাইয়া আনা হইবে না। (মুমিনুন : ১১২-১১৫)

৩২) وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قُرْيَةٍ بِطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فِتْلِكَ
مَسْكِنُهُمْ لَمْ تُشْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا

৩২) (এই সমস্ত লোক যাহারা নিজেদের ভোগ-বিলাসী জীবনের উপর গর্ব করিতেছে, ইহা তাহাদের বোকামী; তাহাদের খবর নাই যে,) আমি এমন অনেক জনপদ ধ্বংস করিয়া দিয়াছি, যাহারা নিজেদের ভোগ-বিলাসের সামগ্রীতে গর্বিত ছিল। অতএব, (তোমরা নিজেরাই দেখিয়া লও যে,) তাহাদের এই সকল ঘর-বাড়ী (খালি পড়িয়া রহিয়াছে, যাহা) তাহাদের পর আবাদই করা হয় নাই; কিন্তু অল্পক্ষণের জন্য

(কাসাস : ৫৮)

৩৩) وَمَا أَرْبَيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَبُّنَا
وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ

৩৩) অতএব, যাহা কিছু তোমাদিগকে (দুনিয়াতে ভোগ-বিলাস ও আরাম-আয়েশের সরঞ্জাম) দেওয়া হইয়াছে, উহা শুধু দুনিয়াবী জিন্দগী

অতিবাহিত করিবার জন্য এবং (এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের) চাকচিক্য মাত্র (যাহা অতি শীঘ্র ধ্বংস হইয়া যাইবে)। আর আল্লাহ তায়ালার নিকট যে পুরস্কার ও সওয়াব রহিয়াছে, উহা ইহা হইতে অনেক গুণ উত্তম ও চিরস্থায়ী। তোমরা কি এইটুকু কথা বুঝ না। (কাসাস : ৬০)

﴿٣٣﴾ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَا فِئَةٍ لَهُ كَمْ يَتْلُو عَنْهُ
مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُخْضَرِينَ ۝

﴿৩৪﴾ আচ্ছা, যে ব্যক্তির সহিত আমি (আখেরাতের) একটি পছন্দনীয় ওয়াদা করিয়া রাখিয়াছি অতঃপর সেই ব্যক্তি ঐ ওয়াদাকৃত জিনিসটি প্রাপ্তও হইবে, সে কি ঐ ব্যক্তির ন্যায় হইতে পারে যাহাকে আমি দুনিয়াবী জিন্দেগীর (অতি নগণ্য) কিছু ভোগের বস্তু দিয়া রাখিয়াছি অতঃপর কিয়ামতের দিন এই ব্যক্তিকে (নিজের অপরাধের শাস্তি হিসাবে) গ্রেফতার করা হইবে। (কাসাস : ৬১)

﴿٣٥﴾ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَلِيتَ لَنَا مِثْلَ
مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ۝

﴿৩৫﴾ যাহারা দুনিয়া তলব করিত তাহারা (তো কারুনের জাঁকজমক ও প্রাচুর্য দেখিয়া) বলিতে লাগিল, আহা কতই না উত্তম হইত যদি আমরাও সেইরূপ সাজ-সরঞ্জাম প্রাপ্ত হইতাম যেমন কারুন প্রাপ্ত হইয়াছে; সে তো বড়ই ভাগ্যবান! (কারুনের বিস্তারিত শিক্ষাপ্রদ ঘটনা যাকাত আদায় না করার বিবরণে পঞ্চম পরিচ্ছেদে বর্ণিত আয়াতসমূহের তিন নম্বরে অতিবাহিত হইয়াছে। ধন-সম্পদের প্রাচুর্যকে যদি আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের ওসীলা না বানানো হয়, তবে ইহাই পরিণতি হয়।) (কাসাস : ৭৯)

﴿٣٦﴾ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُمْ وَلِئِبٍ ط وَإِذَا
الْمَذَارُ الْآخِرَةُ لَهِمُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝

﴿৩৬﴾ আর এই পার্থিব জীবন খেলাধুলা ছাড়া আর কিছুই নয়। আসল জীবন (যাহাকে প্রকৃত অর্থে জীবন বলা যায়) আখেরাতেরই জীবন। হায়! এই সমস্ত লোক যদি এই কথাকে ভালভাবে জানিতে পারিত (তবে আখেরাতের জন্য কতই না চেষ্টা-মেহনত করিত)। (আনকাবুত : ৬৪)

﴿٣٧﴾ يَتْلُمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ
هُمْ غَافِلُونَ ۝

৩৭) এই সমস্ত লোক শুধু দুনিয়াবী জিন্দেগীর বাহ্যিক অবস্থাকে জানে (ইহারই জন্য চেষ্টা করে, ইহারই উপর জীবন উৎসর্গ করে)। এই সমস্ত লোক আখেরাত সম্বন্ধে একেবারেই গাফেল (না আখেরাতের সওয়াবের আশা রাখে, না সেখানকার আযাবের ভয় রাখে)। (ক্বম : ৭)

﴿٦٨﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَحْسُوا يَوْمًا لَا يَجْزِي
وَالِدُ عَنْ وَلَدِهِ رَ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَارُهُنَّ وَلَا يَدُهُ شَيْئًا إِنَّ
وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْعَيْلَةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ
الْعُرُودُ ○

৩৮) হে লোকসকল ! আপন প্রতিপালককে ভয় কর এবং ঐ দিনকে ভয় কর, যেদিন না কোন পিতা আপন সন্তান-সন্ততির পক্ষ হইতে কোন দাবী পূরণ করিতে পারিবে, না কোন সন্তান নিজের পিতার পক্ষ হইতে কোন জিনিস আদায় করিতে পারিবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা (যাহা আখেরাত সম্পর্কে রহিয়াছে) সত্য। অতএব, দুনিয়ার জীক যেন তোমাদিগকে ধোকায়ে ফেলিয়া না দেয়। (যেন তোমরা ইহার মধ্যে হইয়া আখেরাতের দিনকে ভুলিয়া না যাও।) আর ধোকাবাজ (শয়তান যেন তোমাদিগকে আল্লাহ তায়ালা ব্যাপারে ধোকার মধ্যে ফেলিয়া না দেয় (তোমরা যেন শয়তানের দ্বারা প্রতারিত হইয়া আল্লাহ তায়ালা আযাব হইতে নিশ্চিন্ত না হইয়া যাও এবং এই কথা মনে করিতে আরম্ভ কর যে, আমরা দিগকে শাস্তি দেওয়া হইবে না)। (মুক্‌মান : ৩৩)

হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়ের (রাযিঃ) বলেন, শয়তান যেন তোমাদিগকে আল্লাহ তায়ালায় ব্যাপারে ধোঁকায় না ফেলে—ইহার অর্থ এই যে, তোমরা গুনাহ করিতে থাক আর আল্লাহ তায়ালায় নিকট ক্ষমা পাইবার আশা করিতে থাক ; এমন যেন না হয়। (দুররে মানসুর) অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালায় নিকট ক্ষমা চাহিবার মত মুখ তো তখন হইবে, যখন গুনাহ হইতে পরিপক্বভাবে তওবা করিবে এবং গুনাহ না করিবার দৃঢ় সংকল্প করিয়া লইবে। তারপর আল্লাহ তায়ালায় নিকট অতীতের গুনাহ হইতে মাফ চাও। আর ইহা নিছক বোকামী যে, সারাদিন গুনাহের দ্বারা মুখে কালি লেপিয়া বেড়াইবে আর জ্বানে বলিতে থাকিবে, হে আল্লাহ! মাফ করিয়া দিন। এই সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ এই পরিচ্ছেদেরই আঠার নম্বরে আসিতেছে এবং একই বিষয়ে আরো আয়াত আসিতেছে।

﴿٣٩﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُحِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنْتَهَا فَمَتَّعَلَيْنَّ أَمْ تَنْعَكُنَّ وَأُنتُمْ كَكُلِّ فَرَاغٍ جَاهِلِيٍّ ۝ وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ بِمَا تُخْسِنُنَّ مِنْكُمْ ۝

৩৯) হে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে(ও চূড়ান্ত ও স্পষ্ট কথা) বলিয়া দিন, যদি তোমরা দুনিয়াবী জিন্দগী এবং উহার চাকচিক্য চাও, তবে আস আমি তোমাদিগকে কিছু পার্থিব ধন-সম্পদ (মোহর, খরচা ইত্যাদি) দিয়া দেই এবং তোমাদিগকে সুন্দরভাবে (এবং আনন্দচিত্তে তালুক দিয়া) বিদায় করিয়া দেই। আর যদি তোমরা আল্লাহ (তায়ালার সন্তুষ্টি) ও তাঁহার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) বিবাহে অভাব-অনটন ও দরিদ্রতার সহিত থাকা) এবং আখেরাত (এর উন্নত মর্যাদা)কে চাও, তবে (ইহা অন্তরে বসাইয়া লও যে,) তোমাদের মধ্যে নেক আমলকারিণীদের জন্য আল্লাহ তায়ালার অনেক বড় বিনিময় ও সওয়াব তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছেন (যে, যত বেশী নেকী করিবে ততই বেশী বিনিময় ও সওয়াব পাইবে)। (আহযাব : ২৮-২৯)

﴿٤٠﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُودُ ۝

৪০) হে লোকসকল! (ভালভাবে বুঝিয়া লও এবং উত্তমরূপে অন্তরে বদ্ধমূল করিয়া লও যে,) নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা সত্য। এমন যেন না হয় যে, এই পার্থিব জীবন তোমাদিগকে ধোকার মধ্যে ফেলিয়া দেয় এবং এমন যেন না হয় যে, ধোকাবাজ (শয়তান) তোমাদিগকে আল্লাহ তায়ালার সম্বন্ধে ধোকার মধ্যে ফেলিয়া দেয়। (অর্থাৎ উহার ধোকায় আসিয়া তোমরা আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হইয়া যাও।) (ফাতির : ৫)

হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়ের (রহঃ) ইহার তফসীরে বলেন, দুনিয়া ধোকার মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া এইভাবে যে, উহার মধ্যে মগ্ন হইয়া আখেরাতের প্রস্তুতি লওয়া হইতে গাফেল হইয়া যাও। আর শয়তানের ধোকা এই যে, গুনাহ করিতে থাক এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট হইতে ক্ষমা পাওয়ার আশা করিতে থাক। (দুররে মানসুর)

﴿٤١﴾ يَقُومُ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ زَوَاتِ الْأَخِرَةِ

هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ○

(৪১) (ফেরাউনের বংশের ঐ মুমেন ব্যক্তি যে নিজ ঈমানকে গোপন রাখিয়াছিল, আপন আত্মীয়-স্বজনকে নসীহত করিয়া বলিল,) হে আমার কণ্ডম! দুনিয়ার এই জীবন মাত্র কয়েক দিনের। আর অবস্থানের প্রকৃত স্থান তো আখেরাতই। (মুমিন : ৩৯)

﴿٤٢﴾ مَنْ كَانَ يُرِيدُ خَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي خَرْثِهِ ۖ وَمَنْ

كَانَ يُرِيدُ خَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ

نَمِيبٍ ○

(৪২) যে ব্যক্তি আখেরাতের ফসল চায় (অর্থাৎ ফসলের জন্য যেমন বীজ বপন করা হয় অতঃপর উহাতে পানি ইত্যাদি দেওয়া হয়-সহ্যে ফসল উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ যে আখেরাতের ফসল করিতে চায়, সে উহার জন্য বীজ বপন করিয়া ঈমান ও নেক আমল দ্বারা উহার লালন পালন করে) আমি তাহার জন্য তাহার ফসলে উন্নতি দান করিব। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার ফসল চায় (অর্থাৎ সমস্ত চেষ্টা এই জীবনের জন্যই করে) আমি তাহাকে দুনিয়া হইতে কিছু দিয়া দিব এবং এইরূপ ব্যক্তির জন্য আখেরাতে কোন অংশ নাই। (শূরা : ২০)

﴿٤٣﴾ فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَمَا عِنْدَ

اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ○ وَالَّذِينَ

يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْأَثَمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ○

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۖ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ

بَيْنَهُمْ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ○ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ

هُمْ يَنْتَصِرُونَ ○

(৪৩) অনন্তর যাহা কিছু তোমাদিগকে (এই দুনিয়াতে) দেওয়া হইয়াছে, উহা শুধু কয়েক দিনের জীবন অতিবাহিত করার জন্য। (অতি শীঘ্র উহা ধ্বংস হইয়া যাইবে এবং আখেরাতে) যাহা কিছু আল্লাহ তায়ালায় নিকট রহিয়াছে, উহা বহু গুণে উত্তম ও স্থায়ী। (১) এই সবকিছু ঐ সমস্ত লোকের জন্য যাহারা ঈমান আনিয়াছে, আপন প্রতিপালকের উপর তাওয়াক্কুল

করে, যাহারা কবীরা গুনাহ ও অশ্লীল বিষয়সমূহ হইতে বাঁচিয়া চলে, যখন তাহাদের গোষ্ঠা আসে তখন ক্ষমা করিয়া দেয় (২) আর (ইহারা ঐ সমস্ত লোক) যাহারা আপন প্রতিপালকের কথা মানিয়াছে, নামায কায়েম করিয়াছে এবং তাহাদের (প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ) কাজ পরস্পর মাশওয়ারার মাধ্যমে হয়। (৩) আর (তাহারা ঐ সমস্ত লোক যাহাদেরকে) আমি যাহা কিছু দিয়াছি উহা হইতে (খুব) খরচ করে, (৪) তাহারা এমন (ন্যায়পরায়ণ) যে, যদি তাহাদের প্রতি জুলুম করা হয় (এবং তাহাদের প্রতিশোধ লওয়ার প্রয়োজন পড়ে,) তবে সমান সমান প্রতিশোধ গ্রহণ করে (এমন নয় যে, একজনের বদলে দুইজনের নিকট হইতে অথবা একজনের পরিবর্তে অন্যজনের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করে।) (শূরা : ৩৬-৩৯)

উলামায়ে কেরাম লিখিয়াছেন, এই আয়াতগুলিতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও বিশেষ গুণাবলীর দিকে ইঙ্গিত এবং পর্যায়ক্রমে চার খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে।)

﴿٤٢﴾ وَرَحْمَةً رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

(৪৪) এবং আপনার প্রতিপালকের রহমত উহা হইতে বহু গুণে উত্তম, যাহাকে (অর্থাৎ যে দুনিয়াকে) এই সমস্ত লোক জমা করিতেছে। (যুখরুফ : ৩২) (ইহার পর দুনিয়াবী চাকচিক্যের কয়েকটি জিনিস উল্লেখ করিয়া এরশাদ হইয়াছে—) وَالْآخِرَةُ (অর্থাৎ, উপরে স্বর্ণ রূপার ছাদ, দরজা ইত্যাদি উল্লেখ করিবার পর এরশাদ হইয়াছে—) আর এই সবকিছু শুধু পার্থিব জীবনের কয়েক দিনের মনোবাঞ্ছা পূরণ (দুই চার দিনের বাহার) এবং আপনার প্রতিপালকের নিকট আখেরাত তো মুস্তাকী লোকদের জন্য রহিয়াছে।

(যুখরুফ : ৩৫)

﴿٤٥﴾ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادَتِي ۖ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ دِينٍ ۚ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ۝

(৪৫) এবং আমি জিন ও মানুষকে শুধু এইজন্যই পয়সা করিয়াছি যে, তাহারা আমার এবাদত করিবে। আমি তাহাদের নিকট রিযিক পৌছানো চাই না। আর ইহাও চাই না যে, তাহারা আমাকে খাওয়াইবে। আল্লাহ তায়ালা তো নিজেই সকলের রিযিকদাতা, শক্তিশালী ও অত্যন্ত কমতাবান। (যারিয়াত : ৫৬-৫৮)

﴿٨٧﴾ اَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ وَزِينَتُهُ وَ
تَفَاخُرُهُمْ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُهُ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ط كَمَثَلِ غَيْثٍ
أَخْبَبَ الْكَفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهْبِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا
وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ط وَمَا
الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْفُرُورِ ○ سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ
وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا
بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ط ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ
الْعَظِيمِ ○

৪৬) তোমরা খুব ভাল করিয়া জানিয়া লও যে, দুনিয়াবী জিন্দগী (কখনও এই উপযুক্ত নয় যে, মানুষ উহার মধ্যে মত্ত হইয়া যাইবে। ইহা তো) কেবল খেলা ও তামাশা এবং বাহ্যিক জাঁক-জমক ও পরস্পর একে অন্যের প্রতি আত্মগর্ব আর ধন-সম্পদ ও সম্ভান-সম্ভতি সম্বন্ধে একে অপরের উপর আধিক্য প্রদর্শন মাত্র। উহার উদাহরণ এইরূপ—যেমন বৃষ্টি বর্ষিত হইল, উহার কারণে উৎপন্ন ফসল (এমন বাড়িল যে, উহা) কৃষকদের নিকট ভাল মনে হইতে লাগিল। অতঃপর সেই ফসল শুকাইয়া যায়, তখন তুমি উহাকে হরিদ্রা বর্ণের দেখিতে পাও, অতঃপর উহা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায় (দুনিয়ার চাকচিক্য ও বসন্তেরও একই অবস্থা যে, আজ উত্থান ও উন্নতি অতঃপর অবনতি, অতঃপর ধ্বংস ও পতন।) আর আখেরাতের অবস্থা এই যে, উহাতে কঠিন শাস্তি রহিয়াছে (যাহা হইতে বাঁচিবার জন্য চরম চেষ্টা হইতে হইবে।) আর আল্লাহ তায়ালা পক্ষ হইতে ক্ষমা ও সম্ভতি রহিয়াছে (যাহা হাসিল করিবার চেষ্টা আল্লাহ তায়ালা শান অনুযায়ী হওয়া চাই। আর এই কথা অন্তরে বদ্ধমূল করিয়া লওয়া উচিত যে,) দুনিয়ার জিন্দগী ধোকার সামান, (যখন দুনিয়ার এই অবস্থা এবং আখেরাতের এই অবস্থা, তখন সৌভাগ্যের কথা এই যে,) তোমরা আপন প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে ধাবিত হও (এবং তাঁহার শান অনুযায়ী চেষ্টা কর এবং খুব গুরুত্ব সহকারে ধাবিত হও) এমন জান্নাতের দিকে যাহার প্রশস্ততা আসমান ও জমিনের প্রশস্ততার সমান। যাহা এইরূপ লোকদের জন্য তৈরী করা হইয়াছে, যাহারা আল্লাহর উপর ও তাঁহার রাসুলের উপর ঈমান রাখে। আর এই সবকিছু আল্লাহ তায়ালা

পক্ষ হইতে দয়া ও মেহেরবানী মাত্র। তিনি যাহাকে চাহেন, আপন অনুগ্রহ দান করেন। আল্লাহ তায়ালা অতিশয় অনুগ্রহশীল (কিন্তু কেহ তাহার দয়া হইতে অংশ লইতে চাহিলে তো)। (হাদীদ : ২০-২১)

ইমাম গাযযালী (রহঃ) বলেন, শিশুর যখন কিছুটা জ্ঞান-বুদ্ধির সূচনা হয় তখন সে খেলাধুলার দিকে আকৃষ্ট হয় এবং তাহার মধ্যে উহার প্রতি এমন আকর্ষণ পয়দা হয় যাহার তুলনায় কোন কিছুই তাহার নিকট ভাল লাগে না। অতঃপর যখন সে কিছুটা বড় হয়, তখন তাহার মধ্যে সাজগোজ, ভাল কাপড় পরিধান করা, ঘোড়া ইত্যাদির উপর সওয়ার হওয়ার আগ্রহ পয়দা হয়। যাহার মোকাবিলায় খেলাধুলার স্বাদও বেকার হইয়া যায়। অতঃপর তাহার মধ্যে যৌবনের স্বাদ জোরদার হয় ; স্বাহেশ পূরা করিবার মুকাবেলায় তাহার দৃষ্টিতে কোন বস্তুর গুরুত্ব থাকে না। না ধন-সম্পদের গুরুত্ব থাকে, না ইচ্ছত-সম্মানের গুরুত্ব থাকে। অতঃপর তাহার মধ্যে গর্ব-অহংকার এবং নেতৃত্ব ও প্রাধান্য বিস্তারের জয়বা পয়দা হয়, যাহা পূর্বের সকল জয়বার উপর প্রাধান্য লাভ করে। এই সবই দুনিয়াবী স্বাদ-আহলাদ মাত্র। উহার পর আল্লাহ তায়ালা মারেফতের জয়বা পয়দা হয়, যাহার মুকাবেলায় প্রত্যেকটি জিনিস বেকার হইয়া যায়। ইহাই আসল জয়বা, যাহা সবকিছু অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। মোটকথা, প্রথম জমানায় খেলাধুলার আগ্রহ হয়, সাবালক বয়সের শুরুতে স্বাহেশের জোর থাকে, বিশ বৎসর বয়সের পর হইতে নেতৃত্ব ও প্রাধান্য বিস্তারের জয়বা শুরু হয়, আর চল্লিশ বৎসর বয়সের কাছাকাছি সময় হইতে এলেম ও মারেফতের জয়বা শুরু হয়। শিশুরা শৈশবে খেলাধুলার মুকাবেলায় স্ত্রীলোকদের সহিত মেলামেশা এবং নেতৃত্ব হাসিল করাকে যেমন বেকার ও নিরর্থক মনে করে, তদ্রূপ এই দুনিয়াদার লোকেরা ঐ সমস্ত লোকদের উপর হাসে, যাহারা আল্লাহর মারেফতে মশগুল হন। আর এই আল্লাহওয়ালাগণ মনে করেন যে, ইহারা শিশু ; সাবালক বয়সের স্বাদ সম্পর্কে একেবারেই জানে না। (এহইয়া)

উক্ত আয়াতে দুনিয়াবী স্বাদ ও ভোগ-বিলাসের সমস্ত প্রকার উল্লেখ করিয়া এই বিষয়ে সতর্ক করা হইয়াছে যে, সমস্ত স্বাদ ও ভোগ-বিলাস ধোকা মাত্র। আর কাজে আসিবে একমাত্র আখেরাত ও আখেরাতের জীবন। দুনিয়ার যাবতীয় ভোগ-বিলাস ঐ লসাকেতের মত, যাহা সতেজ হইয়া আবার শুষ্ক হইয়া যায়, অতঃপর বাতাস উহাকে উড়াইয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া দেয়।

﴿٢٤﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذُوبُونَ

وَرَأَوْهُمْ يَوْمَ ثُبُوتِ

(৪৭) এই সমস্ত লোক দুনিয়ার সহিত মহব্বত রাখে এবং তাহারা সম্মুখে আগত কঠিন দিনকে পরিত্যাগ করিয়া রাখিয়াছে। (অর্থাৎ কেয়ামতের দিনের ব্যাপারে তাহাদের না কোন চিন্তা আছে, আর না কোন প্রস্তুতি। দুনিয়ার মহব্বত তাহাদেরকে এমন অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে যে, সেই চরম মুসীবতের দিন সম্পর্কে কোন পরওয়াই নাই।) (দোহর : ২৭)

(৪৮) فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى ۚ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى ۚ وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى ۚ فَمَا مِنْ ظَفَى ۚ وَاتَّارَ الْعِيُونَ الدُّنْيَا ۚ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ۚ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ۚ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ۚ

(৪৮) অতএব, যেদিন সেই মহাবিপর্ষয় (বিপদের দিন অর্থাৎ কেয়ামতের দিন) আসিয়া যাইবে ; যেদিন মানুষ স্মরণ করিবে যে, (দুনিয়াতে) কি কাজের জন্য চেষ্টা করিয়াছি এবং দোষখ সেই দিন চোখের সামনে থাকিবে। (সেই দিনের নিয়ম এই হইবে) যে ব্যক্তি (দুনিয়াতে) অবাধ্যতা করিয়াছে এবং দুনিয়াবী জিন্দেগীকে (আখেরাতের উপর) প্রাধান্য দিয়াছে, তাহার ঠিকানা তো জাহান্নাম হইবে। আর যে ব্যক্তি (দুনিয়াতে) আপন প্রতিপালকের সম্মুখে দাঁড়াইবার বিষয়কে ভয় করিয়াছে এবং নফসকে (হারাম) বাহেশাত হইতে বিরত রাখিয়াছে, তাহার ঠিকানা জান্নাত হইবে।

(নাযিআত : ৩৫-৪১)

(৪৯) تَذَاقُلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۚ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ۚ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْعِيُونَ الدُّنْيَا ۚ وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۚ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى ۚ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ۚ

(৪৯) নিঃসন্দেহে সফলকাম হইয়া গিয়াছে ঐ ব্যক্তি, যে (মন্দ কাজ হইতে) পাক-পবিত্র হইয়াছে এবং সর্বদা আপন প্রতিপালকের নাম লইয়াছে ও নামায পড়িয়াছে। (কিন্তু তোমরা কুরআন পাকের উপদেশসমূহের উপর আমলই কর না) বরং তোমরা তো পার্থিব জীবনকে (আখেরাতের জীবনের উপর) প্রাধান্য দিয়া থাক। অথচ আখেরাত (দুনিয়া অপেক্ষা অনেক বেশী) উত্তম ও চিরস্থায়ী। এই বিষয়ই পূর্ববর্তী

সহীফাসমূহের মধ্যে রহিয়াছে—অর্থাৎ ইবরাহীম ও মুসা (আলাইহিস সালাম)—এর সহীফাসমূহের মধ্যে। (আলাঃ ১৪-১৬)

ফায়দা : সাহাবায়ে কেরামের অনেক উক্তি এবং বহু রেওয়াযাতে এই সমস্ত সহীফার বিষয়বস্তু উল্লেখ করা হইয়াছে। এক হাদীসে আছে, হযরত আবু যর (রাযিঃ) হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, মোট কতগুলি কিতাব নাযিল হইয়াছে? হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, একশত সহীফা এবং চারশত কিতাব। তন্মধ্যে হযরত শীস (আঃ)এর উপর পঞ্চাশটি সহীফা নাযিল হইয়াছে। হযরত ইদরীস (আঃ)এর উপর ত্রিশটি। হযরত ইবরাহীম (আঃ)এর উপর দশটি। হযরত মুসা (আঃ)এর উপর তওরাত নাযিল হওয়ার পূর্বে দশটি সহীফা নাযিল হইয়াছে। আর চারটি কিতাব—তওরাত (হযরত মুসা (আঃ)এর উপর), ইঞ্জিল (হযরত ঈসা (আঃ)এর উপর), যবুর (হযরত দাউদ (আঃ)এর উপর) এবং কুরআন (হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর) নাযিল হইয়াছে।

আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! হযরত ইবরাহীম (আঃ)এর সহীফাসমূহে কি ছিল? হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, সমস্তই আমছাল (অর্থাৎ সতর্কবাণী ছিল)। (উহার একটি বিষয় এই যে,) ওহে জোরপূর্বক রাজত্ব দখলকারী বাদশাহ! ওহে দান্তিক অহংকারী! আমি তোমাকে এইজন্য উন্নত করি নাই যে, তুমি একের পর এক দুনিয়া জমা করিতে থাকিবে। আমি তোমাকে এইজন্য উন্নত করিয়াছিলাম যে, মজলুমের ফরিয়াদ তুমি আমার নিকট পৌছিতে দিবে না। (বরং তাহার হক সেখানেই আদায় করিয়া দিবে) কারণ, আমি মজলুমের ফরিয়াদকে কখনও ফিরাইয়া দিব না; চাই সে কাফেরই হউক না কেন। বুদ্ধিমানের জন্য জরুরী যে, যদি তাহার বুদ্ধি লোপ না পাইয়া থাকে তবে সে যেন নিজের সময়কে তিনভাগে ভাগ করিয়া লয়। একভাগে আল্লাহ তায়ালার সহিত আবেদন নিবেদনে (তাহার এবাদতে) মশগুল থাকিবে। আর এক ভাগে নিজের হিসাব লইবে যে, আমি কি করিয়াছি (কতটুকু সময় নেকী কামাইয়ের মধ্যে খরচ করিয়াছি, কতটুকু মন্দ ও গুনাহ কামাইয়ের মধ্যে খরচ করিয়াছি এবং এই সময়ের মধ্যে কি কি নেক কাজ করিয়াছি ও কি কি মন্দ কাজ করিয়াছি। কোন পর্যায়ের নেকী কামাই করিয়াছি এবং কোন পর্যায়ের গুনাহ কামাই করিয়াছি। আর কতটুকু সময় শুধু বেকার নষ্ট করিয়া দিয়াছি)। আর এক অংশে নিজের বৈধ প্রয়োজনে (অর্থাৎ খাওয়া-দাওয়া, কামাই-রোজগারে) খরচ করিবে।

যাহাতে সময়ের এই অংশ প্রথমোক্ত দুই অংশের জন্য সাহায্যকারী হয় এবং মনের স্থিরতা ও প্রথম দুই কাজের জন্য অবসর পাওয়ার কারণ হয়। বুদ্ধিমানের জন্য জরুরী হইল, নিজের সময়কে যেন হেফাজত করে। নিজ কাজকর্মে মনোনিবেশ করে। নিজ জবানের হেফাজত করে। যে ব্যক্তি নিজের কথাবার্তার প্রতি লক্ষ্য রাখিবে, সে অহেতুক কথাবার্তা কম বলিবে। বুদ্ধিমানের জন্য ইহাও জরুরী যে, সে তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে—এক, নিজের জীবিকা ও আয়-উপার্জনের সংশোধনের প্রতি। দ্বিতীয়, আশেরাতের সঞ্চয়ের প্রতি। তৃতীয়, বৈধ আরামের প্রতি (অর্থাৎ খানাপিনা, নিদ্রা ইত্যাদি)। এই তিনটি বিষয় ছাড়া আর যে কোন কাজে সময় খরচ করিবে, উহা একেবারে বেকার ও অনর্থক হইবে। যখন মানুষ কোন কথা বা কাজ শুরু করে, তখন যেন এই চিন্তা করিয়া লয় যে, উক্ত তিন বিষয়ের মধ্যে ইহা কোনটির অন্তর্ভুক্ত।

হযরত আবু যর (রাযিঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! হযরত মুসা (আঃ)এর সহীফাসমূহের মধ্যে কি ছিল? তিনি বলিলেন, সবই নসীহত ও উপদেশমূলক কথা ছিল। (তন্মধ্যে ইহাও ছিল যে,) আমি আশ্চর্যান্বিত হই ঐ ব্যক্তির উপর, যাহার মৃত্যুর প্রতি একীন রহিয়াছে, তা সত্ত্বেও সে কোনো বিষয়ের উপর কিভাবে আনন্দিত হয়! (কেননা, মৃত্যু সবসময় মাথার উপর সওয়ার রহিয়াছে; জানা নাই কখন আসিয়া পড়ে।) আমি আশ্চর্যবোধ করি ঐ ব্যক্তির উপর, যাহার মৃত্যুর প্রতি একীন রহিয়াছে, তবুও কোনো বিষয়ের উপর তাহার হাসি আসে! আমি আশ্চর্যবোধ করি ঐ ব্যক্তির উপর, যে দুনিয়াকে এবং দুনিয়ার উত্থান-পতনকে দেখে (যেমন, আজ যে ব্যক্তি লাঞ্চপতি, কাল সে ফকীর এবং সামান্য জিনিসেরও মুখাপেক্ষী। আজ এক ব্যক্তি জেলখানায়, কাল দেশের শাসনকর্তা)। ইহা সত্ত্বেও সে এই দুনিয়ার কোনো বিষয়ের উপর নিশ্চিন্ত হয়! আরও (আশ্চর্যবোধ করি) ঐ ব্যক্তির উপর, যে তকদীরকে বিশ্বাস করে, তা সত্ত্বেও সে কোনো বিষয়ের উপর দুঃখ করে। আরও (আশ্চর্যবোধ করি) ঐ ব্যক্তির উপর, যে কিয়ামতের দিনের হিসাবের উপর বিশ্বাস রাখে, তবুও সে আমল করে না। (ঐ দিন সর্বপ্রকার জ্ঞান ও মাল সংক্রান্ত দাবীসমূহ নেক আমলের দ্বারাই পূরণ করা হইবে। নিজের কাছে নেক আমল না থাকিলে হিসাব পূরা করিবার জন্য অন্যদের গুনাহ নিজের উপর লইতে হইবে।) আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার উপরেও কি হযরত ইবরাহীম ও হযরত মুসা (আঃ)এর সহীফাসমূহের মধ্যে হইতে কিছু নাযিল হইয়াছে? হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বলিলেন, হাঁ, এই আয়াতটি নাখিল হইয়াছে : قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

(দূররে মানসুর)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালা সূরা নজ্মে হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর প্রশংসায় বলিয়াছেন وَابْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى অর্থাৎ, ঐ ইবরাহীম, যিনি পুরাপুরিভাবে আদায় করিয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি ইসলামের সমস্ত অংশকে পুরা করিয়াছেন। ইসলামের মোট ত্রিশটি অংশ রহিয়াছে। তন্মধ্যে দশটি তো সূরা বারাআতে উল্লেখ করা হইয়াছে অর্থাৎ এই আয়াতগুলির মধ্যে إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ সূরা আহযাবে অর্থাৎ এই আয়াতগুলির মধ্যে إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ আর দশটি সূরা আহারিজ এর মধ্যে قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ আর ছয়টি وَالَّذِينَ يَصْدَقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ এই সবগুলি মিলিয়া ত্রিশটি হইল। যে ব্যক্তি এইগুলির মধ্য হইতে যে কোন একটিও লইয়া আল্লাহ তায়ালা নিকট যাইবে, সে ইসলামের একটি অংশ লইয়া যাইবে। (দূররে মানসুর)

⑤۰ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ أَلْهَكُمُ الشَّكَاوَةُ ۝ حَتَّى نَذْتَمُ الْمَقَابِرَ ۝ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ۝ لَتَرَوُنَّ الْجَبَحِيمَ ۝ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ۝ ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ۝

⑤০ (পার্শ্ব দ্রব্য-সামগ্রীর উপর) পরস্পর গর্ব তোমাদিগকে (আখেরাত হইতে) গাফেল করিয়া রাখিয়াছে। এমনকি তোমরা (মৃত্যুবরণ করিয়া) কবরস্থানে পৌছিয়া যাও। কখনও (এইসব জিনিস গর্ব-অহংকার ও মনোনিবেশের উপযুক্ত) নয়, তোমাদের অতি শীঘ্র (কবরে যাওয়ার সাথে সাথেই) জানা হইয়া যাইবে (যে, দুনিয়া কি ছিল এবং আখেরাত কি)। এতদসঙ্গেও তোমাদিগকে পুনরায় সতর্ক করা হইতেছে যে, কখনও (এইসব জিনিস গর্ব অহংকার ও দৃষ্টিপাতের যোগ্য) নয়। তোমাদের অতি শীঘ্র (কবর হইতে উঠিবার সাথে সাথেই হাশরের ময়দানে) জানা হইয়া যাইবে। তোমাদিগকে তৃতীয়বার সতর্ক করা হইতেছে যে, কখনও (এইসব জিনিস গর্ব-অহংকার ও দৃষ্টিপাতের যোগ্য) নয়। যদি তোমরা নিশ্চিতভাবে (কুরআন ও হাদীস হইতে এই কথা) জানিয়া লইতে (যে, এই সব জিনিস গর্ব-অহংকারের যোগ্য নয়, যেমন মৃত্যুর পর তোমাদের একীভূত হইয়াছে, তবে কখনও এইগুলির মধ্যে মগ্ন হইতে না।) আল্লাহর কসম, তোমরা জাহান্নামকে অবশ্যই দেখিবে। (উহা কোন কল্পিত বস্তু নয়,

পুনরায় তোমাদেরকে গুরুত্বের সহিত) আবার (বলা হইতেছে যে,) আল্লাহর কসম, তোমরা উহাকে এমন দেখিবে যেমন স্বয়ং প্রত্যক্ষ বিশ্বাস (অর্থাৎ উহাকে দেখা একেবারে নিশ্চিত ও অকাট্য)। অতঃপর ঐ দিন তোমাদিগকে সমস্ত নেয়ামতের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইবে (যে, আল্লাহ তায়ালায় নেয়ামতসমূহের কি হক আদায় করিয়াছ)। (তাকসুর)

ফায়দা : এই সমস্ত নেয়ামতের প্রশ্ন সম্পর্কে অনেক বিস্তারিত বিবরণ অনেক হাদীসে আসিয়াছে। এইসব বিস্তারিত বিবরণ সবই উদাহরণস্বরূপ উল্লেখিত হইয়াছে। আল্লাহ তায়ালায় নেয়ামতসমূহ যাহা প্রতি মুহূর্তে সবসময় প্রত্যেক মানুষের উপর বৃষ্টির মত বর্ষিত হইতেছে, উহা কে গণনা করিয়া শেষ করিতে পারে। আল্লাহ তায়ালায় পবিত্র এরশাদ সম্পূর্ণ সত্য। তিনি এরশাদ করিতেছেন : **وَأَنْ تَعْدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا** অর্থাৎ, তোমরা যদি আল্লাহ তায়ালায় নেয়ামতসমূহকে গণিতে আরম্ভ কর, তবে গণিয়া শেষ করিতে পারিবে না। (ইবরাহীম : ৩৪, নাহল : ১৮)

এক হাদীসে আছে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত সূরা তেলাওয়াত করিলেন। যখন এই আয়াত পড়িলেন : **لَنَسْأَلَنَّ يَوْمَئِذٍ** অর্থাৎ, অতঃপর ঐ দিন যাবতীয় নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে ; তখন এরশাদ করিলেন—তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে তোমাদেরকে ঠাণ্ডা পানি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে। গৃহের ছায়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে (অর্থাৎ আমি রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে বাঁচিবার জন্য তোমাদিগকে ছায়া দান করিয়াছিলাম)। পেট ভরিয়া খানা খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুস্থতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে (অর্থাৎ আমি হাত, পা, চক্ষু, নাক, কান ইত্যাদি সঠিক ও সুস্থ দান করিয়াছিলাম ; উহার কি হক আদায় করিয়াছ?) সুখনিদ্রা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে, এমনকি যদি তোমরা কোন স্ত্রীলোকের নিকট বিবাহের পয়গাম দিয়া থাক এবং অন্য কোন ব্যক্তিও সেই স্ত্রীলোকের নিকট বিবাহের পয়গাম দিয়া থাকে আর আল্লাহ তায়ালা সেই স্ত্রীলোকের সহিত তোমার বিবাহ করাইয়া দিয়া থাকেন, তবে ইহা সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, আল্লাহ তায়ালায় পক্ষ হইতে তোমার উপর অনুগ্রহ ছিল যে, মেয়েপক্ষের লোকদের অন্তরে আল্লাহ তায়ালা এই কথা ঢালিয়া দিয়াছেন যে, তাহার তোমার সহিত বিবাহ করাইয়া দেয় ; অপরজনের সহিত যেন না করায়।

উক্ত হাদীস শরীফে যে-সমস্ত জিনিসের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, সেইগুলির মধ্যে মানুষ চিন্তা করিলে অনুমান করিতে পারিবে যে, তাহার

উপর সবসময় আল্লাহ তায়ালা কি পরিমাণ দয়া ও অনুগ্রহ রহিয়াছে। এই সমস্ত নেয়ামতের মধ্যে গরীব ধনী সকলেই শরীক রহিয়াছে। গরীব হইতে গরীব, ফকীর হইতে ফকীর, কে এমন আছে, যাহার উপর সবসময় আল্লাহ তায়ালা অপরিমিত নেয়ামত বর্ষিত না হইতেছে। এক স্বাস্থ্য ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুস্থতাই তো এইরূপ। তদুপরি প্রতি মুহূর্তে শ্বাস-প্রশ্বাসের আসা-যাওয়াও এমন নেয়ামত, যাহা প্রতি মুহূর্তে প্রত্যেক জীবন্ত প্রাণী লাভ করিতেছে।

অন্য এক হাদীসে আছে, যখন এই সূরা নাযিল হইল, তখন এক সাহাবী আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কোন্ নেয়ামতের মধ্যে রহিয়াছি—যবের রুটি; উহাও তো আধ পেটা পাই; পেট ভরা পরিমাণ হয় না। তখন আল্লাহ তায়ালা ওহী পাঠাইলেন, আপনি তাহাদিগকে বলুন, তোমরা কি জুতা পরিধান কর না? ঠাণ্ডা পানি পান কর না? ইহাও তো আল্লাহ তায়ালা নেয়ামতসমূহের মধ্যে রহিয়াছে।

অন্য এক হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যে সমস্ত নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে, তাহা হইল, শরীরের সুস্থতা ও ঠাণ্ডা পানি।

এক হাদীসে আছে, যে সমস্ত নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে, তাহা ঐ রুটির টুকরা যাহা খাওয়া হয়, ঐ পানি যাহা দ্বারা পিপাসা মিটান হয় এবং কাপড়ের ঐ টুকরা যাহা দ্বারা শরীর আবৃত করা হয়।

অন্য এক হাদীসে আছে, একবার প্রখর রৌদ্রের মধ্যে দুপুরের সময় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) মসজিদে নববীতে তশরীফ আনিলেন। হযরত ওমর (রাযিঃ) খবর পাইয়া নিজ ঘর হইতে তশরীফ আনিলেন এবং হযরত আবু বকর (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই সময় কেন আসা হইল? তিনি বলিলেন, প্রচণ্ড ক্ষুধা বাধ্য করিয়াছে। হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, ঐ পবিত্র সত্তার কসম, যাহার হাতে আমার জ্ঞান, এই অস্থিরতা আমাকেও বাধ্য করিয়াছে। তাহারা উভয়ে এই অবস্থাতেই ছিলেন এমন সময় হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ গৃহ হইতে তশরীফ আনিলেন এবং তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা এই সময় কেন আসিলে? তাহারা আরজ করিলেন, হযুর! ক্ষুধার তীব্রতা বাধ্য করিয়াছে। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই অবস্থায় বাধ্য হইয়া আমিও আসিয়াছি। এই তিন হযরতই উঠিয়া হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাযিঃ)এর বাড়ীতে গেলেন। তিনি নিজে তো উপস্থিত ছিলেন না, তাহার স্ত্রী অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিলেন। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, আবু আইয়ুব কোথায়? স্ত্রী

আরজ করিলেন, হযর। তিনি এখনই আসিতেছেন। এমন সময় আবু আইয়ুব (রাযিঃ) আসিয়া গেলেন এবং দ্রুত খেজুরের একটি ছড়া ছিড়িয়া আনিলেন। হযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, পূর্ণ ছড়াটি কেন ছিড়িলে? উহা হইতে পাকা পাকা খেজুরগুলি বাহিয়া কেন লইলে না? তিনি আরজ করিলেন, হযরত! এই খেয়ালে ছিড়িয়াছি যে, পাকা, আধা কাঁচা, শুকনা ও তাজা সব রকমের খেজুর সামনে থাকিবে—যে রূপ খাইতে ইচ্ছা হয় গ্রহণ করিবেন। তাহারা সবারকমের খেজুর ঐ ছড়া হইতে খাইলেন। ইত্যবসরে হযরত আবু আইয়ুব (রাযিঃ) একটি বকরির বাচ্চা জবেহ করিয়া দ্রুত কিছু অংশ আগুনে ভুনা করিলেন, আর কিছু অংশ পাতিলে রান্না করিলেন এবং তাহাদের সম্মুখে আনিয়া রাখিলেন। হযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামান্য গোশত একটি রুটিতে পেঁচাইয়া আবু আইয়ুব (রাযিঃ)কে দিয়া বলিলেন, ইহা ফাতেমাকে দিয়া আস, সেও কয়েক দিন যাবৎ এইরূপ কোন জিনিস খায় নাই। তিনি তাড়াতাড়ি দিয়া আসিলেন। তাহারা গোশত-রুটি খাইলেন। তারপর হযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, (আল্লাহ তায়ালা এত নেয়ামত খাইলাম) গোশত-রুটি, কাঁচা খেজুর, পাকা খেজুর ইহা বলিতে বলিতে হযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চক্ষু মোবারক অশ্রুতে ভরিয়া আসিল। অতঃপর এরশাদ করিলেন, এইগুলিই ঐ সমস্ত নেয়ামত, যাহা সম্পর্কে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করা হইবে। ইহা শুনিয়া সাহাবায়ে কেরামের নিকট বড় কঠিন মনে হইল (যে, এইরূপ কঠিন ক্ষুধার্ত অবস্থায় এই সমস্ত জিনিসও কি জিজ্ঞাসা করার উপযুক্ত?)। হযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, নিশ্চয়ই। তবে উহার প্রতিকার এই যে, যখন খাইতে শুরু কর, তখন বিসমিল্লাহর সহিত শুরু কর, আর যখন শেষ কর, তখন এই দোআ পড় : **الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هُوَ أَشْبَعُنَا وَأَنْعَمَ** ; অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসা শুধু আল্লাহর জন্য, কেননা তিনি আমাদেরকে (কেবল আপন দয়া ও মেহেরবানীতে) পেট ভরিয়া দান করিয়াছেন ; আমাদের উপর নেয়ামত বর্ষণ করিয়াছেন এবং অনেক বেশী পরিমাণে দান করিয়াছেন। (দুররে মানসুর)

এই বিষয়ের অনেক রেওয়াযাত হাদীসের কিতাবসমূহে রহিয়াছে। উহার আলোচনা এখন উদ্দেশ্য নয়, এখানে তো শুধু ইহা দেখান উদ্দেশ্য ছিল যে, দুনিয়া অস্থায়ী, উহা মনোযোগের অযোগ্য, আশ্বেরাতে তুলনায় একেবারেই তুচ্ছ, উহাতে মশগুল হওয়া লোকসানের কারণ, পরিণতিতে আযাব পর্যন্ত পৌছিয়া যাওয়া সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা কত অধিক

परिमाणे कालामे पाके उल्लेख करियाहेन एवं बारबार इहार प्रति सतर्क करियाहेन। तन्मध्ये नमुना स्वरूप शुधु ५० टि आयात এই जायगाम उल्लेख करा हईयाहे। এইगुलि छाड़ा आरओ अनेक आयाते এই विषये सतर्क करा हईयाहे। कि परिमाण आश्चर्य ओ लज्जार कथा ये, यतई आल्लाह तायालार पक्क हईते এই विषये सतर्क करा हईयाहे, आमাদের पक्क हईते ततई अमनोयोगिता प्रदर्शन करा हईतेहे। इहार पर आल्लाह तायालार पाक दरबारे कोन् मुखे हाजिर हईब। অভিযোগ आल्लाह तायालार निकटई आर तिनिई साहाय्यकारी।

मुसीबतेर उपर छवर करार फयीलत

② وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۚ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۚ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ ۚ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ قَدْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْتَدُونَ ۝ (بقره १५६)

अवद हम तबारा امتहान कीस के कीस قدر फलत
 से (जो मुताफिन की طرف से या हादस से
 पेश असे) अवद कीस قدر فقر व फाक से अव
 कीस قدر माल अवद जान अवद पिलों की कीस
 (ऐस तम लूक इस قسم की जो चीजों पेश ओस
 औ पर मबर कना) अवद आप औ मबर कने मल्लों
 को बशरत सुनावे कि (जिन की ये हादस से)
 क जब औ पर कीस मुसिबत पृती बे तरे
 इना यल्लो व इना इलै रीघुन मीघुते
 हैं- ऐसी लूक हैं जो पर अल्ले तैली शान्द की खास खास रहम हैं और रहमत एतरे भी
 है और ऐसी लूक बायत याफते हैं-

② एवं आमी तोमादेर परीक्षा करिव किफित डय द्वारा (याहा विरुधीदेर पक्क हईते अथवा विभिन्न दुधटनार कारणे आसिबे) एवं किफित दरिद्रता ओ झूधा द्वारा, आर किफित माल ओ जान ओ फल-शस्येर कमति द्वारा। (अतएव, এই धरनेर ये समस्त जिनिस तोमादेर सम्मुखे आसिबे उहार उपर छवर करिबे।) आपनि ई समस्त छवरकारीदेरके सुसंवाद गुनाईया दिन (याहादेर अड्यास এই) ये, यखन ताहादेर उपर

কোন মুসীবত আসে, তখন তাহারা ইম্মা লিল্লাহি ওয়া ইম্মা ইলাইহি রাজিউন পড়ে। ইহারাই ঐ সমস্ত লোক, যাহাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা বিশেষ বিশেষ রহমত এবং সাধারণ রহমতও রহিয়াছে। আর এই সমস্ত লোকই হেদায়াতপ্রাপ্ত। (বাকারা : ১৫৫-১৫৭)

ফায়দা : মুসীবতের সময় মৌখিক ইম্মা লিল্লাহ পড়া উপকারী ও সওয়াবের কাজ। অন্তরে উহার অর্থ বুঝিয়া পড়া আরো অধিক কার্যকর, সওয়াব ও প্রশান্তির কারণ। ইহার অর্থ এই যে, আমরা সকলেই (নিজদের জ্ঞান-মাল সহকারে) আল্লাহ তায়ালায়ই মালিকানাভুক্ত, (আর মালিকের জন্য নিজের মালিকানায় সর্বপ্রকার অধিকার খাটাইবার হক রহিয়াছে। তিনি যেভাবে চাহেন অধিকার খাটাইতে পারেন) এবং আমরা সকলেই আল্লাহ তায়ালায়ই দিকে ফিরিয়া যাইব। অর্থাৎ মৃত্যুর পর সকলকেই সেখানে যাইতে হইবে। এই জগতের ক্ষতি ও কষ্টসমূহের বদলা ও সওয়াব অধিক পরিমাণে সেখানে পাওয়া যাইবে। যেমন দুনিয়াতে যদি কোন ব্যক্তির কিছু ক্ষতি হইয়া যায় এবং তাহার পূর্ণ বিশ্বাস থাকে যে, অতি শীঘ্রই এই ক্ষতির বিনিময়ে সে অনেক বেশী পাইয়া যাইবে, তবে উক্ত ক্ষতির কারণে তাহার সামান্য মাত্রও কষ্ট হয় না।

এমনিভাবে, যদি আল্লাহ তায়ালায় নিকট অধিক হইতে অধিক বদলা পাওয়ার একীন হইয়া যায়, তবে সামান্যতম কষ্টও থাকে না। কিন্তু আমাদের মধ্যে ঈমান ও একীনের স্বল্পতার কারণে সামান্য দুঃখ, সামান্য কষ্ট, সামান্য ক্ষতিও আমাদের জন্য বড় মুসীবত হইয়া যায়। আল্লাহ তায়ালা কালামে পাকে এই দিকেও সংক্ষিপ্তভাবে ও বিস্তারিতভাবে অনেক জায়গায় সতর্ক করিয়াছেন যে, এই দুনিয়া কঠিন পরীক্ষার জায়গা এবং বিভিন্ন প্রকারে পরীক্ষা হইয়া থাকে—কখনও সম্পদের প্রাচুর্যের দ্বারা যে, কিভাবে কামাই করিয়াছে এবং কিভাবে খরচ করা হইতেছে, আর কখনও দারিদ্র ও ক্ষুধার দ্বারা যে, উহাকে কিভাবে গ্রহণ করা হইতেছে—হা-হতাশের মাধ্যমে, নাকি ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে। এই জন্যই বারবার ধৈর্য, নামায ও আল্লাহর দিকে রুজু হইবার জন্য উৎসাহিত করা হয় এবং এই ব্যাপারে সতর্ক করা হয় যে, তোমরা বর্তমানে পরীক্ষার মধ্যে রহিয়াছ ; এমন যেমন না হয় যে, এই পরীক্ষায় ফেল হইয়া যাও। নমুনা স্বরূপ কয়েকটি আয়াতের দিকে ইশারা করিতেছি—

① وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ

① এবং সাহায্য হাসিল কর ধৈর্য ও নামাযের দ্বারা। (বাকারা : ৪৫)

হযরত কাতাদা (রাযিঃ) বলেন, এই দুইটি জিনিস আল্লাহর পক্ষ হইতে সাহায্য ; তোমরা এইগুলি দ্বারা সাহায্য লও।

হযরত ইবনে আক্বাস (রাযিঃ) বলেন, আমি একবার হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সওয়ারীর উপর ছিলাম। তিনি বলিলেন, হে বালক ! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা বলিতেছি। আল্লাহ তায়ালা এইগুলির দ্বারা তোমার উপকার করিবেন। আমি আরজ করিলাম, অবশ্যই বলুন। তিনি এরশাদ করিলেন, আল্লাহর হেফাজত কর (অর্থাৎ তাহার হকসমূহ আদায় কর), আল্লাহ তায়ালা তোমার হেফাজত করিবেন। আল্লাহ তায়ালা (হকসমূহের) হেফাজত কর, তুমি তাহাকে (সর্বদা নিজের সাহায্যের জন্য) সম্মুখে পাইবে। সচ্ছলতায় আল্লাহ তায়ালাকে চিনিয়া লও (অর্থাৎ স্মরণ করিয়া লও) তিনি তোমাকে মুসীবতের সময় চিনিবেন (সাহায্য করিবেন)। আর ইহা উত্তমরূপে জানিয়া লও যে, যে কোন মুসীবত তোমার উপর আসিয়াছে, উহা কখনও তোমার উপর হইতে সরিবার ছিল না। আর যাহা আসে নাই তাহা কখনও তোমার উপর আসিবার ছিল না। যদি সমস্ত মখলুক সকলেই মিলিয়া চেষ্টা করে যে, তাহারা তোমাকে কিছু দিবে, আর আল্লাহ তায়ালা উহার ইচ্ছা না করেন, তবে তাহারা সকলে কখনও এই ক্ষমতা রাখে না যে, তোমাকে কিছু দিয়া দিবে। আর যদি তাহারা সকলে মিলিয়া তোমার উপর হইতে কোন মুসীবত দূর করিতে চায় আর আল্লাহ তায়ালা না চাহেন, তবে তাহারা কখনও ঐ মুসীবতকে হটাইতে পারিবে না। তকদীরের কলম এমন প্রত্যেক জিনিসকে লিখিয়া ফেলিয়াছে, যাহা কেয়ামত পর্যন্ত সংঘটিত হইবে। যখন তুমি কোন জিনিস চাও, তখন একমাত্র আল্লাহর নিকটই চাও, যখন সাহায্য চাও তখন একমাত্র আল্লাহর নিকটই সাহায্য চাহিও, যখন ভরসা কর তখন একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা করিও। ইমান, একীন ও শোকরের সহিত আল্লাহ তায়ালায় জন্য আমল কর। ভাল করিয়া জানিয়া লও যে, অপছন্দনীয় বিষয়ের উপর হবর করা অনেক উত্তম জিনিস। আল্লাহর সাহায্য হবরের সহিত রহিয়াছে, আর মুসীবতের সহিত আরাম রহিয়াছে এবং অভাবের সহিত প্রশস্ততা রহিয়াছে। অর্থাৎ যখন কোন কষ্ট হয়, তখন বুঝিয়া লও যে, এখন কোন আরামও হাসিল হইবে। যখন অভাব দেখা দেয় তখন বুঝিয়া লও যে, এখন সচ্ছলতাও আসিবে।

এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি ক্ষুধার্ত অথবা অভাবী হয় এবং সে নিজের অভাবকে লোকদের নিকট হইতে গোপন করিয়া রাখে, তবে

আল্লাহ তায়ালা নিজ জিম্মায় তাহাকে হালাল উপায়ে এক বৎসরের রুজি দান করিবেন। হযরত ছাযফা (রাযিঃ) বলেন, ছযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে যখনই কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থিত হইত, তখন তিনি নামাযে মনোযোগী হইতেন। ছযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, পূর্ববর্তী নবীগণের সম্মুখে যখনই কোন কঠিন বিষয় উপস্থিত হইত, তখন তাহারা নামাযে মগণ্ডল হইতেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) একবার সফরে যাইতেছিলেন, রাস্তায় তাহার পুত্রের ইন্তেকালের খবর পাইলেন। সওয়ারী হইতে নামিয়া দুই রাকাত নামায পড়িয়া ইম্মা লিল্লাহি ওয়া ইম্মা ইলাইহি রাজিউন পড়িলেন। অতঃপর বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে ইহারই হুকুম দিয়াছেন। তারপর তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন :

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ

হযরত উবাদা (রাযিঃ)—এর যখন ইন্তেকালের সময় নিকটবর্তী হইল, তখন তিনি বলিলেন, আমি তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই বিষয়ে নিষেধ করিতেছি। কাজেই কেহ যেন আমার জন্য কান্নাকাটি না করে। যখন আমার প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে, তখন যেন প্রত্যেকেই খুব ভান করিয়া ওয়ু করে এবং মসজিদে যাইয়া দুই রাকাত নামায পড়ে। অতঃপর আমার জন্য এবং নিজের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করে। অতঃপর আমাকে অতি তাড়াতাড়ি দাফন করিয়া দেয়। (দুররে মানসুর)

② يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ

② হে ঈমানওয়ালাগণ ! (মুসীবতের সময়) ধৈর্য এবং নামাযের দ্বারা সাহায্য হাসিল কর। (বাকারা : ১৫৩)

③ وَالضَّيِّقِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَآءِ الْآيَةِ

③ আর যাহারা ধৈর্য ধারণ করে অভাবের সময়, অসুস্থ অবস্থায় এবং ভয় ও যুদ্ধের সময়। (বাকারা : ১৭৭) এই আয়াত সম্পূর্ণ প্রথম পরিচ্ছেদের দুই নম্বরে অতিবাহিত হইয়াছে।

④ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

④ এবং আল্লাহ তায়ালা ধৈর্যধারণকারীদের সহিত আছেন। (বাকারা : ২৪৯) এই বিষয় সম্পর্কিত আয়াত কুরআন পাকের অনেক জায়গায় নাযিল হইয়াছে। বারবার আল্লাহ তায়ালা এই সুসংবাদ ও সাহুনা দান

করিতেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা ধৈর্যধারণকারীদের সহিত রহিয়াছেন।

⑤ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ

⑤ এই আয়াত (আলি-ইমরান : ১৭) সম্পূর্ণ এই পরিচ্ছেদের ১ নম্বরে অতিবাহিত হইয়াছে।

⑥ وَإِنْ تَصَبَّرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضْرَكْكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا

⑥ যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং আল্লাহকে ভয় করিতে থাক, তবে এই সমস্ত কায়েরদের কোন প্রতারণা তোমাদের সামান্যতমও লোকসান করিতে পারিবে না। (আলি-ইমরান : ১২০)

⑦ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ

⑦ তোমরা কি এই ধারণা কর যে, জান্নাতে দাখেল হইয়া যাইবে ; অথচ আল্লাহ তায়ালা এখনও পর্যন্ত ইহা জানিয়া লন নাই (অর্থাৎ এখনও পর্যন্ত পরীক্ষা করিয়া লন নাই) ঐ সমস্ত লোকদেরকে, যাহারা তোমাদের মধ্য হইতে জিহাদ করিয়াছে এবং জানিয়া লন নাই (ও যাচাই করিয়া লন নাই) ধৈর্যধারণকারীদেরকে। (আর ইহা মনে রাখা উচিত যে, দ্বীনের জন্য যে কোন চেষ্টা জিহাদের অন্তর্ভুক্ত)। (আলি-ইমরান : ১৪২)

⑧ وَإِنْ تَصَبَّرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

⑧ যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং পরহেজগার হইয়া থাক, তবে (তো ভাল। কেননা,) ইহা (ধৈর্য ও তাকওয়া) তাকীদপূর্ণ হুকুম-আহকামের অন্তর্ভুক্ত। (আলি-ইমরান : ১৮৬)

⑨ وَلَقَدْ كُنَّا بِمَا نُفَعُّكَ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُنَّا فَعَلُوا وَأَوْدُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا

⑨ অনেক রাসূল যাহারা আপনার পূর্বে অতীত হইয়াছেন তাহাদিগকেও (বে-ইমানদের পক্ষ হইতে) মিথ্যাবাদী বলা হইয়াছে (এবং তাহাদিগকে কঠিন কষ্ট দেওয়া হইয়াছে)। অতঃপর তাহাদিগকে যে মিথ্যাবাদী বলা হইয়াছে ও কষ্ট দেওয়া হইয়াছে—উহার উপর তাঁহারা ধৈর্যই ধারণ করিয়াছেন ; এইভাবে আমার সাহায্য তাহাদের নিকট পৌছিয়াছে। (তদ্রূপ আপনিও তাহাদের কষ্টদানের উপর ধৈর্যধারণ করিতে

থাকুন।) (আনআম : ৩৪)

⑩ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ○ قَالُوا أَوْدَيْنَا مِنْ قَبْلُ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ أَعْدٍ مَا يَحْتَسِبُ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ○

⑪ হযরত মুসা (আঃ) স্বীয় জাতিকে বলিলেন, তোমরা আল্লাহর নিকট সাহায্য চাহিতে থাক এবং ছবর করিতে থাক। জমিন আল্লাহ তায়ালার, তিনি নিজ বান্দাদের মধ্য হইতে যাহাকে চাহেন উহার ওয়ারিস (ও শাসনকর্তা) বানাইয়া দেন। (যেমন এই সময় ফেরাউনকে দিয়া রাখিয়াছেন।) আর পরিশেষে সফলতা তাহাদেরই হয় যাহারা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে (যদি তোমরা ছবর কর ও তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে পরিণামে এই জমিন তোমাদেরই হইবে। হযরত মুসা (আঃ) এর) কণ্ঠ বলিল, আমরা তো সর্বদা মুসীবতের মধ্যেই রহিয়াছি। আপনার তশরীফ আনিবার পূর্বেও (আমাদিগকে কষ্ট দেওয়া হইত এবং আমাদের সম্মান-সম্মতিকে কতল করা হইত) এবং আপনার তশরীফ আনিবার পরও (বিভিন্ন রকমের মুসীবত আমাদের উপর দেওয়া হইতেছে। হযরত মুসা (আঃ) বলিলেন, অতি সত্ত্বর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করিয়া দিবেন এবং তাহাদের স্থলে তোমাদেরকে এই জমিনের মালিক বানাইয়া দিবেন। অতঃপর তোমাদেরকে দেখিবেন যে, তোমরা কিরূপ আমল কর (শোকর ও আনুগত্য কর; নাকি নিয়ামতের না-শোকরী ও নাফরমানি কর। অতঃপর যেমন তোমাদের আমল হইবে, তেমনি তোমাদের সহিত আচরণ করা হইবে।) (আরাফ : ১২৮-১২৯)

⑫ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ ○

⑬ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের নিকট হইতে তাহাদের জ্ঞান ও তাহাদের মাল ইহার বিনিময়ে খরিদ করিয়া লইয়াছেন যে, তাহারা জাহান্নাম পাইবে। (তওবা : ১১১)

ফায়দা : যখন মুসলমানদের জ্ঞান ও মাল সবই আল্লাহ তায়ালার হাতে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, তখন আল্লাহ তায়ালা এমন সব জিনিসের মধ্যে যাহা তাহার নিজেরই সৃষ্টি, অধিকন্তু সেইগুলিকে তিনি খরিদও

করিয়া লইয়াছেন—যে রূপ ইচ্ছা ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন। বরং মুসলমানদের বিক্রয় করিয়া দেওয়ার পর দায়িত্ব এই যে, এখন স্বয়ং তাহারা খরিদার পর্যন্ত তাহার ক্রয়কৃত মাল পৌছাইবার চেষ্টা করিবে এবং স্বয়ং এই কাজে অগ্রগামী হইবে। এখানে এইরূপ কিছুতেই হইতে পারে না যে, তিনি যখন স্বয়ং নিজের ক্রয়কৃত জিনিস লইয়া যান, তখন উহাতে দুঃখ ও কষ্ট অনুভব করিবে।

⑫ **وَاشْتَرِ مَا يُؤْتِيكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَخُذَكَ اللَّهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ**

⑫ আপনার নিকট যাহা কিছু ওহী প্রেরণ করা হয় আপনি উহার অনুসরণ করুন। এবং (তাহাদের কষ্ট প্রদানের উপর) ধৈর্যধারণ করুন—এই পর্যন্ত যে, আল্লাহ তায়ালা (নিজেই তাহাদের) ফয়সালা করিয়া দেন ; (চাই দুনিয়াতে ধ্বংস করার দ্বারা অথবা আখেরাতে আযাব প্রদানের দ্বারা)। আর তিনি সমস্ত ফয়সালাকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম ফয়সালাকারী। (ইউনুস : ১০৯)

⑬ **وَلَيْنَ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مَتَاعَ رَحْمَةٍ ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ ۖ إِنَّهُ لَيَكُونُ مِنْ كَفُورٍ ۖ وَلَيْنَ أَذَقْنَاهُ نِعَمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسَتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي ۖ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ۖ إِلَّا الَّذِينَ سَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۖ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۖ**

⑬ আর যদি আমি মানুষকে (আরাম ও সম্পদ ইত্যাদি দান করতঃ) আমার অনুগ্রহের স্বাদ গ্রহণ করাইয়া তাহার নিকট হইতে ছিনাইয়া লই, তবে সে অত্যন্ত নিরাশ ও অকৃতজ্ঞ হইয়া যায়। আর যদি তাহার উপর আপত্তিত কোন কষ্টের পর কোন নেয়ামতের স্বাদ গ্রহণ করাই, তবে (নিশ্চিন্ত হইয়া) বলিতে আরম্ভ করে যে, আমার দুঃখ-কষ্টের দিন ফুরাইয়া গিয়াছে। (অতঃপর সে) গর্ব ও আত্মপ্রশংসা করিতে থাকে। (অথচ না প্রথম বিষয়টি নিরাশ হওয়া ও নাশকরি করার ছিল, না পরবর্তী অবস্থা দস্ত ও অহংকার করার ছিল।) অবশ্য যে সমস্ত লোক ধৈর্যধারণকারী এবং নেক আমলকারী (তাহারা না মুসীবতের সময় আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ হয়, না আরাম ও সচ্ছলতার সময় দস্ত করে) এমন লোকদের জন্য বিরাট ক্ষমা ও বিরাট সওয়াব রহিয়াছে। (হূদ : ৯-১১)

⑭ **إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ**

১৪) নিঃসন্দেহে যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে এবং (মুসীবতের উপর) ধৈর্যধারণ করে, আল্লাহ তায়ালা এইরূপ নেক আমলকারীদের সওয়াব বরবাদ করেন না। (ইউসুফ : ৯০)

①৫) إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۝ الَّذِينَ يُؤْتُونَ عَهْدَ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ۝ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ۝ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَذَرُونَ بِالْعَسَةِ السَّيِّئَةِ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ۝ جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۝ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ۝

১৫) বস্তুতঃ নসীহত তো বুদ্ধিমান লোকেরাই গ্রহণ করে। তাহারা এমন লোক যে, আল্লাহর সহিত তাহারা যাহা কিছু অঙ্গীকার করিয়াছে, তাহা পূরণ করে এবং সেই অঙ্গীকারকে ভঙ্গ করে না। তাহারা এমন লোক যে, যে সমস্ত সম্পর্ক (আত্মীয়তা ইত্যাদি) কায়েম রাখিবার জন্য আল্লাহ তায়ালা হুকুম করিয়াছেন, উহা কায়েম রাখে (উহাকে ছিন্ন করে না)। আপন প্রতিপালককে তাহারা ভয় করিতে থাকে এবং (কেয়ামতের দিনের) হিসাব-নিকাশের ভয় করে। আর ইহারাই ঐ সমস্ত লোক, যাহারা আপন প্রতিপালকের সন্তুষ্টির জন্য (মুসীবতের উপর) ধৈর্যধারণ করে, নামায কায়েম রাখে এবং যাহা কিছু আমি তাহাদিগকে দান করিয়াছি, উহা হইতে গোপনেও এবং প্রকাশ্যেও খরচ করে। মন্দকে ভালো দ্বারা দূর করে (অর্থাৎ কেহ যদি তাহাদের সহিত দুর্ব্যবহার করে তবুও তাহারা ঐ লোকের সহিত সদ্যবহার করে), ইহারাই ঐ সমস্ত লোক, যাহাদের জন্য রহিয়াছে পরবর্তী ঘর অর্থাৎ চিরকালের জাম্নাতসমূহ। যাহাদের মধ্যে এই সমস্ত লোক প্রবেশ করিবে এবং (তাহাদের সহিত) তাহাদের পিতামাতা, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির মধ্য হইতে যাহারা (জাম্নাতে প্রবেশ করিবার) উপযুক্ত হইবে (অর্থাৎ ঈমানদার হইবে যদিও তাহারা আমল ও মর্যাদার দিক দিয়া তাহাদের সমান না হয় (তাহারাও প্রবেশ করিবে) এবং ফেরেশতাগণ এই সমস্ত লোকদের নিকট জাম্নাতের প্রত্যেক দরজা দিয়া

উপস্থিত হইয়া সালাম করিবে। (অথবা শান্তির সুসংবাদ দান করিবে যে, তোমরা সর্বরকম আপদ হইতে এখন নিরাপদ থাকিবে। এই সবকিছু) এই কারণে যে, তোমরা ধৈর্যধারণ করিয়াছিলে (এবং দীনের উপর মজবুতভাবে কায়ম রহিয়াছিলে।) অতএব, কতই না উত্তম পরবর্তী ঘর।

(রাসদ : ১১-২৪)

ফারদা : হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, যে ব্যক্তি জাম্মাতে সর্বাপেক্ষা নিম্ন পর্যায়ের হইবে, সে একটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও উজ্জ্বল মোতির মতল পাইবে। যাহার মধ্যে ৭০ হাজার কামরা হইবে। প্রত্যেক কামরায় ৭০ হাজার দরজা হইবে এবং প্রত্যেক দরজা দিয়া ৭০ হাজার ফেরেশতা সালাম করিবার জন্য আসিবে।

﴿ ١٦ ﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۖ وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ مَبْشِيرٍ شَكُورٍ ۝

﴿ ১৬ ﴾ এবং আমি মুসা (আঃ)কে আপন নিদর্শনসমূহ দিয়া পাঠাইয়াছি যে, তুমি নিজের কণ্ঠকে অন্ধকার হইতে আলোর দিকে বাহির করিয়া লইয়া আস এবং তাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালায় আচরণসমূহ স্মরণ করাইয়া দাও। (অর্থাৎ যাহাদের উপর আল্লাহ তায়ালায় নিয়ামত বর্ষিত হইয়াছে, উহা কিরূপ হইয়াছে, আর আযাব আসিয়াছে তো উহা কত কঠিন হইয়াছে।) নিঃসন্দেহে এইসব বিষয়ের মধ্যে অনেক শিক্ষা রহিয়াছে প্রত্যেক ধৈর্যধারণকারীর জন্য এবং প্রত্যেক শোকর আদায়কারীর জন্য (অর্থাৎ, তাহারা যেন আল্লাহ তায়ালায় নিয়ামতসমূহের উপর শোকর করে এবং মুসীবতসমূহের উপর ধৈর্যধারণ করে। কেননা, ধৈর্য ও শোকর উভয়টাই তাহার নিকট কাম্য ও পছন্দনীয়)। (ইবরাহীম : ৫)

﴿ ١٧ ﴾ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا إِلَى اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا النَّبِيِّينَ هُمْ فِي الدُّنْيَا خَسِرَةٌ ۖ وَلَا يَجْرُوا الْآخِرَةَ أَكْبَرُ ۝ نَوَكَاؤُا يَعْلَمُونَ ۝
الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝

﴿ ১৭ ﴾ আর যাহারা আল্লাহর জন্য নিজেদের মাতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়াছে (অর্থাৎ হিজরত করিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে কাফের কর্তৃক) নির্যাতিত হওয়ার পর আমরা তাহাদেরকে দুনিয়াতে অবশ্যই উত্তম বাসস্থান দান করিব এবং আখেরাতের প্রতিদান (এই দুনিয়ার বাসস্থান হইতে) অনেক বেশী উত্তম। হায় যদি তাহারা (উহার সৌন্দর্য ও উন্নত

অবস্থা সম্পর্কে) জানিত। ইহারা ঐ সমস্ত লোক, যাহারা আপন মুসীবতের উপর ছবর করিয়াছে এবং এই সমস্ত লোক আপন পরওয়ারদিগারের উপর তাওয়াকুল করে (মাতৃভূমি ছাড়িবার সময় ইহা চিন্তা করে না যে, দারুল ইসলামে যাইয়া খানাপিনার কি ব্যবস্থা হইবে।)

(নাহল : ৪১-৪২)

①৪ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ○ وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَخْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ○ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ○

①৫ আর যদি তোমরা (তোমাদের উপর জুলুমকারীদের নিকট হইতে) প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে ঐ পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ কর যেই পরিমাণ তোমাদের সহিত জুলুম করা হইয়াছে। (আর এই কারণে যে, অন্যরা জুলুমের সূচনা করিয়াছে অতএব প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে যাইয়া তোমরা অতিরিক্ত প্রতিশোধ গ্রহণ কর—এই অধিকার তোমাদের কখনও নাই। আর ইহাও তখন, যখন তোমরা প্রতিশোধ লইতে চাও।) আর যদি তোমরা ছবর করিয়া যাও, তবে ইহা ছবরকারীদের জন্য অতি উত্তম জিনিস। (ইহার পর বিশেষভাবে ছবুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হইয়াছে যে, আপনার শান প্রতিশোধ গ্রহণ করা হইতে উর্ধ্ব ; এইজন্য) আপনি ধৈর্যধারণ করুন এবং আপনার এই ধৈর্যধারণ করা আল্লাহ তায়ালারই তওফীকে হইবে। ঐ সমস্ত লোকের (বিরোধিতার কারণে) দুঃখিত হইবেন না। যাহা কিছু এই সব বিরোধী লোক আপনার বিরোধিতা করিতে গিয়া চেষ্টা তদবীর করে সেজন্য আপনি মন ছোট করিবেন না। (তাহারা আপনার কিছুই করিতে পারিবে না। কেননা, আপনি তাকওয়াওয়ালা ও এহসানওয়ালা।) আল্লাহ তায়াল তাহাদের সহিত থাকেন, যাহারা মুত্তাকী ও এহসানকারী। (নাহল : ১২৬-১২৮)

①৬ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ إِنَّهُمْ أَخْسَنُ

عَمَلًا ○

①৭ আমি জমিনের উপরের সমস্ত জিনিসকে জমিনের জন্য সৌন্দর্য বানাইয়াছি। যাহাতে আমি এই সবকিছুর দ্বারা মানুষের পরীক্ষা লই যে, কে বেশী ভাল আমল করে।

হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) বলেন, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত শরীফ তেলাওয়াত করিলে আমি উহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলাম। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন— যাহাতে আল্লাহ তায়ালা ইহার পরীক্ষা লন যে, কে বেশী বুদ্ধিমান (ও বুদ্ধিমত্তার বিষয়টি অবলম্বন করে), আর কে আল্লাহ তায়ালায় নিষিদ্ধ জিনিসগুলি হইতে বেশী সতর্কতা অবলম্বন করে, আর কে আল্লাহ তায়ালায় আনুগত্যে দ্রুত অগ্রসর হয়। (কাহফ : ৭)

হযরত হাসান (রহঃ) বলেন, পরীক্ষা এই বিষয়ে যে, দুনিয়া ত্যাগের ব্যাপারে কে বেশী কঠোর?

হযরত সুফিয়ান সওরী (রহঃ) বলেন, পরীক্ষা এই বিষয়ে যে, দুনিয়াতে কে বেশী দুনিয়াত্যাগী? অর্থাৎ দুনিয়ার নাজ-নেয়ামত ও স্বাদ আশ্বাদনের ব্যাপারে কে সর্বাধিক ছবরকারী?

② قَامِزٌ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسِمٌ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ
الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ
لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ

②০ অতএব, আপনি তাহাদের কথার উপর ছবর করুন এবং আপন প্রতিপালকের প্রশংসার সহিত তাহার পবিত্রতাও বর্ণনা করিতে থাকুন (যাহার মধ্যে আল্লাহ তায়ালায় হামদ ও ছানা ও নামায সবকিছু অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে) সূর্য উদিত হওয়ার আগে (যাহার মধ্যে ফজরের নামাযও আসিয়া গিয়াছে) এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার আগে (যাহার মধ্যে যোহর, আসরও আসিয়া গিয়াছে) এবং রাত্রের অংশেও পবিত্রতা বর্ণনা করুন (যাহার মধ্যে মাগরিব ও এশাও আসিয়া গিয়াছে) এবং দিনের প্রথম অংশে ও শেষ অংশে (পবিত্রতা বর্ণনা করিবার জন্য পুনরায় বলা হইতেছে, যাহার মধ্যে ফজর ও আসরের নামাযের অধিক তাকিদ আসিয়া গিয়াছে। যেমন অনেক হাদীসে এই দুই নামাযের বিশেষ তাকীদ আসিয়াছে এবং সকাল-সন্ধ্যার তসবীহগুলিও আসিয়া গিয়াছে।) যাহাতে (এই সব জিনিসের কারণে আখেরাতে আপনার অনেক বেশী সওয়াব লাভ হয়। ফলে) আপনি খুশী হইয়া যান। (স্বা-হা : ১৩০)

②۱ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ
وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمُ وَالْقَائِمِينَ الصَّلَاةَ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يُنْفِقُونَ

(২১) আর আপনি (আব্বাহর হুকুমের সামনে) মস্তক অবনতকারীগণকে (আব্বাহর সন্তুষ্টি ও জাম্বাতের) সুসংবাদ শুনাইয়া দিন—যাহারা এমন লোক যে, যখন তাহাদের সম্মুখে আব্বাহ তায়ালায় থিকির করা হয়, তখন তাহাদের অন্তর (আব্বাহর বড়ত্ব ও ভয়ে) ভীত হইয়া যায়, তাহাদের উপর যে মুসীবত আসে, উহার উপর সবর করে, যাহারা নামাযের পাবন্দী করে আর যাহা কিছু আমি তাহাদিগকে দিয়াছি, উহা হইতে খরচ করে।

(হুজ্ব : ৩৪-৩৫)

এই আয়াত প্রথম পরিচ্ছেদের ১৬ নম্বরে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

(২২) اَلَمْ يَحْصِبِ النَّاسُ اَنْ يَتْرُكُوْا اَنْ يَقُوْلُوْا اَمَّاوَهُمْ
لَا يُفْتَنُوْنَ ۝ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ
صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذٰبِيْنَ ۝ اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ
السَّيِّئَاتِ اَنْ يَسْبِقُوْنَآ سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ۝

(২২) লোকেরা কি এই ধারণা করিয়া রাখিয়াছে যে, তাহারা শুধু এতটুকু বলিলেই ছাড়া পাইয়া যাইবে যে, আমরা তো মুসলমান, আর তাহাদিগকে (বিভিন্ন রকম মুসীবতের দ্বারা) পরীক্ষা করা হইবে না। (এইরূপ হইতে পারে না, এই দুনিয়া পরীক্ষার ঘর।) আর আমি তো ঐ সমস্ত লোকের পরীক্ষা লইয়াছি, যাহারা তাহাদের পূর্বে অতীত হইয়া গিয়াছে। (তাহাদের মধ্যেও কেহ কেহ নিজেদের দাবীতে সত্য প্রমাণিত হইয়াছে এবং কেহ কেহ মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে। তদ্রূপ এখনও) আব্বাহ তায়ালা (পরীক্ষার নিয়ম অনুযায়ী) জানিয়া লইবেন ঐ সমস্ত লোকদেরকে যাহারা (নিজেদের ঈমান ও মহব্বতের দাবীতে) সত্য বলিয়াছে এবং ঐ সমস্ত লোকদেরকে যাহারা মিথ্যা বলিয়াছে। (অতএব, এই ধরনের পরীক্ষাসমূহের মধ্যে যাহারা সত্য মুসলমান, তাহারা এইসব আকস্মিক দুর্ঘটনা ইত্যাদির কারণে আরও বেশী আব্বাহর দিকে রুজু হইয়া যায়। আর যাহারা অযোগ্য, তাহারা আরও বেশী পথভ্রষ্টতার মধ্যে লিপ্ত হইয়া যায়। এমনকি কেহ কেহ মুরতাদ হইয়া ইসলামই ছাড়িয়া বসে। অথবা বিপদ-আপদের ভয়ে খারাপ কাজে সাহায্য-সহযোগিতা করিতে আরম্ভ করে।) হাঁ যাহারা খারাপ কাজ করিতেছে, তাহারা কি এই ধারণা করিতেছে যে, আমার হাত হইতে তাহারা কোথাও পালাইয়া যাইবে। তাহাদের এইরূপ সিদ্ধান্ত একান্ত নিরর্থক। (আনকাবুত : ১-৪)

﴿٢٣﴾ نِعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ ﴿٢٣﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢٣﴾
وَكَاتِنٌ مِّنْ ذَاتِهَا لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۚ اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ نَسُوتُوهَا
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٢٣﴾

﴿২৩﴾ নেক আমলকারীদের জন্য কতই না উত্তম সওয়াব রহিয়াছে। যাহারা (মুসীবতের উপর) সবর করিয়াছে এবং তাহারা (সর্বপ্রকার অভাবের সময়—রুজি-রোযগারের অভাব হউক, কিংবা অন্য কোন অভাব হউক) আপন প্রতিপালকের উপর ভরসা রাখে। (আর যদি তোমাদের এই খেয়াল হয় যে, অবশেষে জীবন ধারণের মাধ্যম কি হইবে, তবে চিন্তা করিয়া দেখ যে,) অনেক জীব-জন্তু এমন রহিয়াছে, যাহারা নিজেদের রুজি জমা করিয়া রাখে না। আল্লাহ তায়ালাই উহাদিগকে ত্রিযিক দান করেন, তিনিই তোমাদিগকেও ত্রিযিক দান করেন। তিনি (প্রত্যেক প্রার্থনাকারীর কথা) শ্রবণ করেন এবং (প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থা) জানেন (তাহারই নিকট প্রার্থনা কর, তিনি তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে খুব ভালোভাবে জানেন। যতটুকু তিনি সঙ্গত মনে করিবেন, তোমাদিগকে দান করিবেন। (আনকাবুত : ৫৮-৬০))

﴿٢٤﴾ إِنَّمَا يُؤْتِي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٤﴾

﴿২৪﴾ বস্তুতঃ সবরকারীগণকে বে-হিসাব (অগণিত) পুরস্কার দেওয়া হইবে। (বুকার : ১০)

﴿٢٥﴾ وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ ۖ
أَحْسَنُ ۚ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ ۖ وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا
يُلْقِيهَا ۚ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ۚ وَهُمْ يُلْقِيهَا ۚ إِلَّا تَوْعَظُ عَظِيمًا ۚ وَإِنَّمَا
يَنْزَعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ ۖ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ ﴿٢٥﴾

﴿২৫﴾ আর ভাল কাজ ও মন্দ কাজ কখনও সমান হয় না (বরং প্রত্যেকটির ফল ও প্রতিক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। অতএব) আপনি (এবং অনুরূপভাবে আপনার অনুসারীগণও) অসদ্যবহারকে সদ্যবহার দ্বারা প্রতিরোধ করুন। অতঃপর হঠাৎ করিয়া ঐ ব্যক্তি যাহার ও আপনার মাঝে শত্রুতা ছিল এমন হইয়া যাইবে যেমন অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়। (অর্থাৎ অসদ্যবহারের বদলা অসদ্যবহার দ্বারা প্রদান করা শত্রুতাকে কমায় না

বরং বৃদ্ধি করে। আর যদি অপর পক্ষ একেবারেই নীচ প্রকৃতির লোক না হয়, তবে অসদ্ব্যবহারের বদলে এহসান ও অনুগ্রহ তাহাকে শত্রুতা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করে। এমনকি সে অনুগ্রহে বাধিত হইয়া বন্ধুতে পরিণত হয়। কিন্তু অসদ্ব্যবহার ও কষ্ট দেওয়ার বদলা যেহেতু অনুগ্রহ দ্বারা প্রদান করা অনেক কঠিন, অতএব এরশাদ হইয়াছে,) আর এই স্বভাব তাহাদেরকেই দেওয়া হয়, যাহারা ধৈর্যশীল। (অর্থাৎ, কষ্ট-মুসীবত বরদাশত করা তাহাদের অভ্যাসে পরিণত হইয়া গিয়াছে।) আর এই স্বভাব তাহাদেরকেই দেওয়া হয়, যাহারা বড় ভাগ্যবান হয়। আর যদি এরূপ সময় আপনার মধ্যে শয়তানের পক্ষ হইতে কোন ওয়াস্‌ওয়াসা আসিতে আরম্ভ করে (উদাহরণস্বরূপ ইহা মনে আসে যে, তাহার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করিলে নিজেকে অপমান করা হইবে অথবা তাহার সাহস বাড়িয়া যাইবে ইত্যাদি ইত্যাদি), তবে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করুন।

(श-मीम सिखदाह : ७४-७६)

﴿٢٦﴾ لَا يَسْتَمُ إِلَيْهِ نَسَانٌ مِنْ دُعَاءِ الْغَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَنْوَسْ قَنُوطٌ ۝ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءَ مَمْسَتِهِ لَيَقُولَنَّ هَذَا إِلَىٰ

২৬) মানুষের মন উন্নতির আকাঙ্ক্ষায় কখনও তৃপ্ত হয় না, আর যদি তাহাকে কোন দুঃখ স্পর্শ করে, তবে একেবারে নিরাশ ও হতাশ হইয়া পড়ে (অথচ আল্লাহ তায়ালার মহান সন্তা হইতে কখনও নিরাশ হওয়া চাই না)। আর যদি সেই দুঃখের পর যাহা তাহার প্রতি পৌছিয়াছে আমি আপন রহমতের স্বাদ আন্বাদন করাই, তবে সে বলে, ইহা তো (বিধানগতভাবে) আমার প্রাপ্যই। (অথচ না আল্লাহ তায়ালার মহান সন্তা হইতে নিরাশ হওয়া উচিত, না তাহার কোন প্রাপ্য আছে।)

(হা-মীম সিঙ্করাহ : ৪২-৫০)

﴿٢٤﴾ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ
عَلَى اللَّهِ ذَٰلِكَ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۝ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ
فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ۝ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ
النَّاسَ وَيَنْهَوْنَ فِي الْأَرْضِ عَنْ الْحَقِّ ۚ وَلَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ ۝ وَلَمَنِ صَبَرَوْا غَفْرَاتٍ ذَٰلِكَ لِمَنْ عَزِمَ الْأُمُورُ

২৭ আর মন্দের বদলা অনুরূপ মন্দ (অর্থাৎ যেই ধরনের মন্দ কেহ

করিল, সেই ধরনের মন্দের দ্বারা প্রতিশোধ লওয়া যাইতে পারে। তবে শর্ত এই যে, সেই কাজ জায়েয হইতে হইবে। যেমন, শক্ত কথা প্রতিশোধ শক্ত কথা, মারধরের প্রতিশোধ মারধর। এমন নয় যে, শক্ত কথা প্রতিশোধ মারধরের দ্বারা লওয়া হইল। যে ব্যক্তি (একেবারেই প্রতিশোধ লয় না বরং) ক্ষমা করিয়া দেয় এবং সংশোধন করে (অর্থাৎ তাহার সহিত সম্মুখোন্মুখ করে), তাহার প্রতিদান আল্লাহ তায়ালা জিম্মায়। বাস্তবিকই আল্লাহ তায়ালা জালেমদিগকে পছন্দ করেন না। আর যে ব্যক্তি নিজের উপর জুলুম হওয়ার পর সমান সমান প্রতিশোধ লয়, এইরূপ লোকদের উপর কোন দোষারোপ করা হইবে না। দোষারোপ শুধু তাহাদেরই উপর, যাহারা মানুষের উপর জুলুম করে এবং দুনিয়াতে অন্যায়ভাবে অবাধ্যতা করে। এইরূপ লোকদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে। আর যাহারা (অন্যের জুলুমের উপর) সবর করে এবং (তাহাকে) ক্ষমা করিয়া দেয়—ইহা অবশ্য উচ্চ পর্যায়ের হিম্মতের কাজসমূহের মধ্যে গণ্য। (অর্থাৎ জুলুম ও অন্যায়ের উপর সবর করা এবং ক্ষমা করিয়া দেওয়া উচ্চ পর্যায়ের হিম্মতের কাজ) (শূরা : ৪০-৪৩)

②৮ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
لِلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

②৮ ঐ (পবিত্র) সত্তা বড় মহান, যাহার কক্ষায় রহিয়াছে সর্বময় কর্তৃত্ব (সারা দুনিয়ার রাজত্ব তাহারই কক্ষার মধ্যে) এবং তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতামান। সেই (পবিত্র) সত্তা যিনি জীবন ও মৃত্যুকে এইজন্য সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাতে তোমাদিগকে পরীক্ষা করেন—কে তোমাদের মধ্যে আমলে অধিক উত্তম। (মূলক : ১-২)

হযরত কাতাদা (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালা এই ঘরকে জীবন ও মৃত্যুর ঘর বানাইয়াছেন এবং আখেরাতের ঘরকে প্রতিদান ও স্থায়িত্বের ঘর বানাইয়াছেন। (দুরের মানসুর)

এই ঘরের সমস্ত কষ্টের শেষ মৃত্যু, আর উহা যে অবস্থায়ই হউক অবশ্যই আসিবে। কিন্তু ঐ ঘরের কষ্টের কোন শেষ নাই, কেননা সেখানে মৃত্যুও নাই।

②৯ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا ۝ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ مِّمَّنْ يَبْتَغِيهِ فَعَجَلَنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ۝

(২৯) নিঃসন্দেহে মানুষের উপর কালপ্রবাহে এমন এক সময় অতীত হইয়াছে, যখন সে কোন উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। (অর্থাৎ ইহার পূর্বে সে শুক্রবিন্দু ছিল আর উহারও পূর্বে সে তাহাও ছিল না।) আমি তাহাকে মিশ্র শুক্রবিন্দু হইতে (অর্থাৎ পিতামাতার শুক্রবিন্দুর মিলনের দ্বারা) পয়দা করিয়াছি। যাহাতে আমি তাহাকে পরীক্ষা করি। অতঃপর আমি তাহাকে শ্রবণকারী ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন বানাইয়াছি। (অর্থাৎ চক্ষু, কান দিয়াছি যাহাতে সে সত্য বিষয় নিজে দেখে অথবা অন্যদের নিকট হইতে শোনে। অতঃপর) আমি তাহাকে (কল্যাণের) পথ বলিয়া দিয়াছি। (অতঃপর এই মানুষ দুই প্রকারের হইয়া গিয়াছে:) হয় সে কৃতজ্ঞ (ও মুমিন) হইয়াছে, নাহয় অকৃতজ্ঞ (কাফের) হইয়াছে। (দাহর : ১-৩)

ফায়েদা : যেহেতু ইহা পরীক্ষার ঘর ; কাজেই যে কোন অবস্থায় না-শোকরী করিতে চিন্তা করা উচিত যে, আল্লাহ তায়ালার কত নেয়ামত এমন রহিয়াছে, যাহার উপর শোকর করা এই কষ্ট ও মুসীবত হইতে আরও বেশী জরুরী।

(৩০) فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ ۖ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ۖ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ۖ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ۖ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ۖ وَلَا تَحْضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ۖ وَتَأْكُلُونَ الثَّرَاثَ أَكَلًا لَّمَّا وَتَجْبُونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ۖ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۖ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۖ وَجِئْتُ بِيَوْمٍ ذِي بَهْجَةٍ ۖ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ ۖ يَقُولُ يَدَيَّيْنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ۖ

(৩০) অনন্তর আল্লাহ তায়ালা যখন মানুষকে পরীক্ষা করেন, তখন (পরীক্ষা হিসাবে কখনও) তাহাকে নেয়ামত ও সম্মান দান করেন। (সম্পদ, সম্মান এবং এই ধরনের আরও অনেক কিছু দিয়া থাকেন, যাহাতে এইসব জিনিসের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতার পরীক্ষা হয় এবং ইহা যাচাই করা যায় যে, আল্লাহর এইসব নেয়ামতের মধ্যে সে কি কাজ করিয়াছে। এই সম্পদ ও সম্মান তাহার রাস্তায় খরচ হইয়াছে, নাকি অসন্তুষ্টির রাস্তায়।) তখন সে বলে, আমার প্রতিপালক আমার সম্মান করিয়াছেন (অর্থাৎ নিজের সম্মানিত হওয়ার অহংকার শুরু হইয়া যায়, অথচ ইহা অহংকারের জিনিস নয়। যদিও আল্লাহ তায়ালার শোকর

তাহার নেয়ামতের উপর অত্যন্ত জরুরী, কিন্তু সেইসঙ্গে এইসব নেয়ামতের পরীক্ষার দিকটির ভয়ও থাকে জরুরী। আর যখন আল্লাহ তায়ালা মানুষকে অন্যভাবে পরীক্ষা করার ইচ্ছা করেন) এবং তাহাকে যাচাই এইভাবে করেন যে, তাহার রিযিক সংকুচিত করিয়া দেন (ইহা দ্বারা তাহার সবর এবং আল্লাহর ফায়সালার উপর তুষ্টির পরীক্ষা করা উদ্দেশ্য হয়), তখন সে বলে, আমার প্রতিপালক আমাকে অপমানিত করিয়া দিয়াছেন। (অর্থাৎ আমি সম্মানের উপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও আমাকে মানুষের দৃষ্টি হইতে নিচে নামাইয়া রাখিয়াছেন। অথচ না ধন-সম্পদ সম্মানের দলীল, না দারিদ্র ও ক্ষুধা অপমানের দলীল।) কখনও নয় (এরূপ একেবারেই নয় যে, রিযিকের সংকীর্ণতা অপমানের বিষয় হইবে) বরং (অপমানের জিনিস তো এইগুলি যে,) তোমরা এতীমের সম্মান কর না, মিসকীনকে খানা খাওয়াইবার ব্যাপারে অন্যদেরকেও উৎসাহিত কর না এবং উস্তরাধিকারের মাল সম্পূর্ণ খাইয়া ফেল (এবং অন্যদের প্রাপ্য হকও হজম করিয়া ফেল, বিশেষ করিয়া এতীম ও দুর্বলদের সম্পদ হজম করিয়া ফেল, যাহারা তোমাদের সহিত লড়াইও করিতে পারে না) আর তোমরা ধন-সম্পদকে অনেক বেশী মহব্বত কর, (যাহা সমস্ত মন্দের মূল, সমস্ত জুলুম অত্যাচারের মূল, সমস্ত অন্যায় ও দোষের মূল, এইজন্য যে, দুনিয়ার মহব্বত সকল পাপের মূল, তোমরা এই সমস্ত জিনিসকে হালকা মনে কর) কক্ষণও নয়। (ইহা সাধারণ জিনিস নয় বরং) যখন জমিনকে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দেওয়া হইবে এবং আপনার প্রতিপালক ও সারিবদ্ধভাবে ফেরেশতাগণ (হাশরের ময়দানে) আগমন করিবেন এবং ঐদিন জাহান্নামকে (সামনে) আনা হইবে, সেইদিন মানুষের বুকে আসিবে। আর তখন বুকে আসিবার সময় রহিল কোথায়? (সেদিন বুকে আসার দ্বারা কোন ফায়দা হইবে না) সেদিন মানুষ বলিবে, হায়; আমি যদি আজকের এই জীবনের জন্য কিছু সঞ্চয় আগেই পাঠাইয়া দিতাম।

(ফাজর : ১৫-২৪)

﴿٣١﴾ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفُورٌ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالْقُرْآنِ ۝

৩১) যমানার কসম (যাহার আবর্তন বিবর্তন শিক্ষণীয়—কোথাও দুঃখ, কোথাও আনন্দ, কোথাও প্রাচুর্য, কোথাও দারিদ্র, কোথাও সুস্থতা, কোথাও

দুর্দেহে গঠিত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের
 আত্মাও তাঁহাদের দেহের মতই
 অক্ষয় এবং অমর। (সূরা
 আনফাল - ১৬)

يَتَوَكَّلُونَ عَلَى الَّذِينَ يُقِيمُونَ
 الصَّلَاةَ وَفِيهَا رَزَقْنَهُمْ
 يُنْفِقُونَ ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ
 الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ
 دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ
 مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝
 (سورة الأنفال - ১৬)

পাস میں (اور اُن کے لئے اُن کے گناہوں سے) مُعافی ہے اور عزت کی مدد ہے۔

৩ বস্তুতঃ ঈমানওয়ালারা তো এমন লোক যে, যখন (তাহাদের
 সম্মুখে) আল্লাহ তায়ালার যিকির করা হয়, (তখন উহার বড়ত্ব ও ভয়ের
 কারণে) তাহাদের অন্তর ভীত হইয়া যায়। আর যখন আল্লাহ তায়ালার
 আয়াতসমূহ তাহাদিগকে পড়িয়া শোনান হয়, তখন ঐ সমস্ত আয়াত
 তাহাদের ঈমানকে মজবুত করিয়া দেয়। আর তাহারা শুধু আপন
 প্রতিপালকের উপরই ভরসা করে। আর নামায কায়েম করে এবং যাহা
 কিছু আমি তাহাদিগকে দিয়াছি, উহা হইতে খরচ করে। অতএব, তাহারাই
 প্রকৃত ঈমানওয়াল। তাহাদের জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট বড় বড়
 মর্যাদা রহিয়াছে এবং (তাহাদের জন্য গোনাহের) ক্ষমা রহিয়াছে ও
 সম্মানজনক রিযিক রহিয়াছে। (আনফাল : ২-৪)

উপরোক্ত আয়াত প্রথম পরিচ্ছেদের ১৩নম্বরেও উল্লেখ করা
 হইয়াছে। এখানে দ্বিতীয় বার এইজন্য লেখা হইয়াছে যে, উক্ত আয়াত
 শরীফে কেবল আল্লাহ তাআলার উপর তাওয়াক্কুল করা, তাঁহারই উপর
 ভরসা করা এবং তাঁহারই উপর নির্ভর করা, তাহাকে ছাড়া কাহারও দিকে
 কক্ষপ না করা প্রকৃত মুমিনের শান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। আর উহার
 বিনিময়ে মর্যাদা বৃদ্ধি হওয়া, গোনাহ মাফ হওয়া এবং ইজ্জতের রিযিকের
 ওয়াদা উল্লেখ করা হইয়াছে। এইগুলির মধ্যে প্রত্যেকটি বিষয়ই এমন যে,
 শুধু একটি বিষয়ও তাওয়াক্কুলের জন্য চরম চেষ্টার উপর উদ্বুদ্ধ করিতে
 যথেষ্ট; সেইক্ষেত্রে এইরূপ তিনটি উচ্চ পর্যায়ের ওয়াদা আল্লাহ তায়ালার
 পক্ষ হইতে করা হইয়াছে। অতএব, এই তাওয়াক্কুলের গুণ হাসিল করিবার
 জন্য যতই চেষ্টা করা হইবে, কম হইবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল

করার অর্থ হইল, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাহারও নিকট হইতে কোন আশা রাখা।

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রহঃ) বলেন, আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল ঈমানের সমষ্টি। (দুররে মানসুর)

যদি কুরআন পাকে শুধু একটি আয়াতই আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল ও ভরসা সম্পর্কে নাথিল হইত, তবুও অনেক যথেষ্ট ছিল। কিন্তু কুরআন পাকে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল এবং শুধু তাহারই পবিত্র সন্তার উপর নির্ভর করা ও সর্বপ্রকার মুসীবত ও প্রয়োজনের সময় শুধু তাঁহাকেই ডাকা এবং তাঁহারই নিকট সাহায্য চাওয়া, তাহারই উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা সম্পর্কে এত অধিক পরিমাণে বর্ণিত হইয়াছে যে, অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে এত অধিক পরিমাণে অনেক কমই বর্ণিত হইয়া থাকিবে। বারবার ইহারই হুকুম করা হইয়াছে, আর নেক ও পছন্দনীয় লোকদের বর্ণনায় ইহারই উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহারই প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে। আর এইরূপ হওয়াও চাই। কেননা, প্রকৃতপক্ষে তাওয়াক্কুল তওহীদের ফল। যে ব্যক্তি তওহীদে যতবেশী পাকা হইবে, ততই তাহার তাওয়াক্কুল বেশী হইবে। আর যেহেতু তওহীদই ইসলামের বুনியাদ, ঈমানের শিকড়; তওহীদ ব্যতীত কোন জিনিসই গ্রহণযোগ্য নয়, সম্পূর্ণ মাযহাব ও সম্পূর্ণ শরীয়ত তওহীদের উপরেই নির্ভর করে, কাজেই এই ব্যাপারে যতবেশীই গুরুত্ব আরোপ করা হউক অযৌক্তিক কিছু নয়। আর আল্লাহ তায়ালা কুরআন পাকে তাওয়াক্কুলের উপর এত উচ্চ পর্যায়ের সন্তুষ্টির পরওয়ানা এরশাদ করিয়াছেন যে, উহা অর্জনের জন্য জীবন উৎসর্গ করা যাইতে পারে।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র এরশাদ—‘আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদেরকে মহব্বত করেন’ এইরূপ প্রিয়পাত্র হওয়ার বরাবর কোন গুণ দুনিয়াতে হইতে পারে কি? কোন ব্যক্তি সমস্ত জগতের মালিক, বিশ্ব রাজাধিরাজের প্রিয়পাত্র হইয়া যাইবে—ইহা অপেক্ষা অধিক ইচ্ছত ও গৌরবের বিষয় দুনিয়া-আখেরাতে কি হইতে পারে? তদুপরি আল্লাহ পাক উহার জিম্মাদারীও ওয়াদা করিয়াছেন—‘যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে, আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য যথেষ্ট হইয়া যান।’ এমতাবস্থায় এমন ব্যক্তির কোন প্রয়োজনের জন্য আর কাহারও দরকার হইবে কি? এইজন্যই হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র এরশাদ রহিয়াছে—যদি তোমরা আল্লাহর উপর এইরূপ তাওয়াক্কুল করিয়া লও যেমন উহার হুকুম রহিয়াছে, তবে তোমাদেরকে এমনভাবে রিযিক দান

করিবেন যেমন পাখিদেরকে দান করেন।

অন্য এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি সর্বদিক হইতে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া আল্লাহ তায়ালার দিকে পুরাপুরিভাবে মনোযোগী হইয়া যায়, আল্লাহ তায়ালা তাহার সর্বপ্রকার কষ্টের ব্যাপারে যথেষ্ট হইয়া যান। এমনভাবে তাহাকে রিযিক দান করেন যে, সে উহার ধারণাও করিতে পারে না। হাদীসের বিবরণে প্রথম হাদীসের প্রসঙ্গেও এই বিষয়ের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ অনেকগুলি রেওয়ায়াত আসিতেছে। এখানেও নিয়ম অনুসারে এমন কিছু আয়াতের দিকে ইশারা করা হইতেছে, যাহাতে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল এবং সমস্ত প্রয়োজনে তাহার দিকে রুজু হওয়ার কথা বর্ণিত হইয়াছে। শুধু নমুনা হিসাবে কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হইতেছে। সংক্ষিপ্ত করার খেয়ালে প্রত্যেক জায়গায় ইশারা করা হইয়াছে। স্বীনের প্রতি আমাদের যদি সামান্যতম মনোযোগও থাকে, আখেরাতের প্রতি গুরুত্ব থাকে, দুনিয়ার অনর্থক কাজ হইতে অতি সামান্য সময়ও অবসর পাওয়া যায়, তবে এই সমস্ত আয়াত ও হাদীস অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে ও গভীরভাবে চিন্তা-ফিকির করিবার বিষয়।

আয়াতসমূহ

① وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

① মুমিনদের শুধু আল্লাহ তায়ালার উপরই ভরসা করা উচিত। (অর্থাৎ, অন্য কাহারও উপর সামান্য পরিমাণও ভরসা করা উচিত নয়।)

(আলি-ইমরান : ১২২)

এই বিষয়টি একই শব্দে কুরআন পাকে কয়েক জায়গায় বর্ণিত হইয়াছে ও বারবার নাযিল হইয়াছে। (সূরা আলি ইমরান : রুকু-১৭, মায়দা : রুকু-২, তওবা : রুকু-৭, ইবরাহীম : রুকু-২, মুজাদালা : রুকু-২, তাগাবুন : রুকু-২) এই সমস্ত আয়াতে একই বিষয় এরশাদ করা হইয়াছে।

② قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ○

② (হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম!) আপনি বলিয়া

দিন, নিঃসন্দেহে দয়া (যাহাতে রিযিকও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে) আল্লাহ তায়ালা কছাতেই রহিয়াছে, তিনি যাহাকে চাহেন দান করেন। আল্লাহ তায়ালা বড় প্রশস্ততার মালিক। (তাঁহার নিকট দয়ার কমি নাই) তিনি খুব জ্ঞাত (যে, কাহাকে কখন কি পরিমাণ দিতে হইবে)। নির্দিষ্ট করিয়া দেন আপন রহমত (এবং দয়া)এর সহিত যাহাকে চাহেন, আর আল্লাহ তায়ালা বড় দয়াশীল)। (আলি-ইমরান : ৭৩-৭৪)

② إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ۝

③ আল্লাহ তায়ালা তাওয়াক্কুলকারীদেরকে মহব্বত করেন।

(আলি-ইমরান : ১৫৩)

ফায়দা : আর আল্লাহ তায়ালা যাহাকে মহব্বত করেন, তাহার উন্নতি সম্পর্কে বলার কি আছে !

④ الَّذِينَ قَالْ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ۝ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ دِفْئِهِمْ فَوَضَّلَ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَلَا اتَّبَعُوا رِضْوَانِ اللَّهِ ۝ إِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ۝ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيََاءَهُ ۝ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا مِنِّي إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

⑧ (হুযুর সাব্বান্নাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে একটি বিশেষ ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করিয়া এরশাদ হইয়াছে যে,) তাহারা এমন লোক, যখন তাহাদের নিকট লোকেরা বলিল যে, ঐ সমস্ত লোকেরা (অর্থাৎ দুশমনরা) তোমাদের (মুকাবেলার) জন্য অনেক সরঞ্জাম জমা করিয়া রাখিয়াছে অতএব তাহাদের ব্যাপারে তোমাদের ভয় ও আশংকা করা উচিত, তখন এই সংবাদ তাহাদের ঈমানকে আরও বেশী মজবুত করিয়া দিয়াছে এবং তাহারা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, আমাদের জন্য আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট (প্রত্যেক মুসীবতে তিনিই যথেষ্ট) আর তিনি উত্তম কার্য সম্পাদনকারী। অতএব, এই সমস্ত লোক আল্লাহ তায়ালায় নেয়ামত ও দয়া সহকারে (সেই স্থান হইতে এমনভাবে) ফিরিয়া আসিয়াছে যে, তাহাদের কোন ক্ষতি হয় নাই, আর তাহারা আল্লাহ তায়ালায় সন্তুষ্টির অনুগত থাকিয়াছে। আর আল্লাহ তায়ালা অতি অনুগ্রহশীল। (হে মুসলমানগণ, এইরূপ মুসীবতের সময় একটি কথা বুঝিয়া লও যে, এই ঘটনাবলীতে) শয়তান তাহার বন্ধুদের দ্বারা ভয় দেখায়, তোমরা

তাহাদেরকে ভয় করিও না, শুধু আমাকেই ভয় কর ; যদি তোমরা মুমিন হও।

অর্থ এই যে, যখন দুশমনদের মুকাবেলা ও হামলার সংবাদ শোন, তখন ভীত ও সন্ত্রস্ত হইও না। আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা এবং পুরাপুরি আস্থা রাখিয়া নিজেরা সম্ভাব্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর এবং ভয় শুধু এই বিষয়ে রাখ যে, আমাদের দ্বারা কোন কাজ যেন মালিকের মজির খেলাফ না হইয়া যায়। কেননা, আসল ধ্বংস ইহাই। যাহা দুনিয়ারও ধ্বংস এবং আখেরাতের ধ্বংস তো বটেই। তাহাকে ছাড়া আর কাহাকেও ভয় করার কারণ নাই। কেননা, অপর পক্ষ ইহার বেশী তো কিছুই করিতে পারিবে না যে, তাহারা হত্যা করিয়া ফেলিবে। আর মৃত্যু তো যে-কোন অবস্থায় আসিবেই ; তবে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে আসিতে পারিবে না।

(আলি-ইমরান : ১৭৩-১৭৫)

⑤ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللّٰهِ نَصِيرًا

⑤ আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মদদ (সাহায্য)-এর জন্যও যথেষ্ট এবং তোমাদের পক্ষে সহযোগিতা করার জন্যও যথেষ্ট। (নিসা : ৪৫)

⑥ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفَىٰ بِاللّٰهِ وَكِيلًا

⑥ আপনি আল্লাহর উপরই তাওয়াক্কুল করুন ; তিনি কার্য সম্পাদন করিবার ব্যাপারে যথেষ্ট। (নিসা : ৮১)

⑦ وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

⑦ একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা কর ; যদি তোমরা মুমিন হও।

(মায়দা : ২৩)

⑧ كَلَّا اَغْنٰى اللّٰهُ الْغَنٰى وَبِكَ فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ
طٰلِعُكُمْ وَلَا يَغۜتۜمُ

⑧ আপনি বলিয়া দিন, আমি কি আল্লাহকে ছাড়া আর কাহাকেও সাহায্যকারী বানাইব? ঐ আল্লাহ যিনি আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা—তিনি সকলকে রিযিক দান করেন। তাহাকে কেহ (তাঁহার প্রয়োজন নাই বিধায়) রিযিক দেয় না। (আনআম : ১৪)

⑨ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِخُسۜفٍ فَلَا كَاۡفُۜتَ لَهٗ اِلَّا هُوَ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ بِغُلۜغُلٍ فَمَوْعِدٌ لِّكَ شَىْءٌ قَدِ بُوۡرُ

৯) যদি আল্লাহ তায়ালা তোমাকে কোন ক্ষতি পৌছান, তবে উহা হইতে মুক্তিদাতা তিনি ছাড়া আর কেহ নাই। আর যদি তিনি উপকার পৌছান, তবে (কেহ বাধা প্রদানকারী নাই;) তিনি সর্বশক্তিমান।

(আনআম : ১৭)

① وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

১০) আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে (সে অধিকাংশ ক্ষেত্রে জয়ী থাকে এইজন্য যে,) আল্লাহ তায়ালা নিঃসন্দেহে শক্তিশালী। (তিনি তাহার উপর ভরসাকারীকে জয়ী করেন। আর যদি কখনও এইরূপ না হয়, তবে ইহাতে কোন হেফযত নিহিত থাকে। কেননা) তিনি প্রজ্ঞাশীল। (আনফাল : ৪২)

② وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

১১) আপনি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করুন। নিঃসন্দেহে তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (মানুষের ডাকও শোনে এবং তাহাদের অবস্থা সম্পর্কেও খুব ভাল করিয়া জানেন।) (আনফাল : ৬১)

③ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ

১২) যখন মানুষ কোন কষ্ট পায়, তখন আমাকে ডাকিতে আরম্ভ করে—শোয়া অবস্থায়ও, বসা অবস্থায়ও, দাঁড়ানো অবস্থায়ও। অতঃপর আমি যখন (তাহার কান্নাকাটির কারণে) ঐ কষ্ট দূর করিয়া দেই, তখন পুনরায় সে (আমার সহিত) এমন (সম্পর্কহীন) হইয়া যায় যেন আমাকে কোন কষ্টের কারণে সে ডাকিয়াই ছিল না। (ইহা বড় বোকামী।)

(ইউনুস : ১২)

④ قُلْ مَنْ يَتَذَكَّرْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدِيرُ الْأُمُورَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ بِهِ لَقَدْ أَفْلَحَ تَتَّقُونَ

১৩) আপনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করুন, তিনি কে, যিনি তোমাদিগকে আসমান ও জমিন হইতে রিযিক দান করেন? অথবা তিনি কে, যিনি তোমাদিগকে কান এবং চক্ষুর মালিক বানাইয়াছেন? এবং তিনি কে, যিনি জিন্দাকে মূর্দা হইতে এবং মূর্দাকে জিন্দা হইতে পয়দা করিয়াছেন? এবং

তিনি কে, যিনি সমস্ত কাজ পরিচালনা করেন? অবশ্যই তাহারা ইহাই বলিবে যে, এই সকল কাজ আল্লাহ তায়ালাই করেন। অতঃপর আপনি তাহাদিগকে বলুন যে, তবে তোমরা তাঁহাকে কেন ভয় কর না। (অন্যদেরকে কেন ভয় কর।) (ইউনুস : ৩১)

﴿١٣﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ يُقَوْمُ إِن كُنْتُمْ مُنْتَقِمِينَ ۚ بِإِذْنِ اللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا ۚ إِن كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ ۝ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ۚ

﴿১৪﴾ এবং মুসা (আঃ) (আপন কণ্ঠকে) বলিলেন, হে আমার কণ্ঠ! যদি তোমরা (খাঁটি অন্তরে) আল্লাহর উপর ঈমান রাখিয়া থাক, তবে তাহার উপর তাওয়াক্কুল কর; যদি তোমরা মুসলমান হইয়া থাক। সুতরাং তাহারা (জবাবে) বলিল, আমরা আল্লাহর উপরই তাওয়াক্কুল করিলাম।

(ইউনুস : ৮৪-৮৫)

﴿١٥﴾ وَإِنْ يَسْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۚ وَإِنْ يُرِِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ۚ يُصِيبُ بِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝

﴿১৫﴾ আল্লাহ তায়ালা যদি তোমাদিগকে কষ্ট পৌছান, তবে তিনি ব্যতীত কেহ উহার মোচনকারী নাই। আর যদি তিনি কোন আরাম পৌছাইতে চাহেন, তবে কেহ তাহার দয়ার অপসারণকারী নাই। তিনি আপন দয়া যাহাকে চাহেন দান করেন। তিনি বড় ক্ষমাশীল বড় দয়াশীল।

(ইউনুস : ১০৭)

﴿١٦﴾ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

﴿১৬﴾ এবং কোন প্রাণী জমিনের উপর বিচরণকারী এমন নাই যাহার রিযিক আল্লাহ তায়ালার জিম্মায় নহে (অতএব তাঁহার নিকট হইতেই রিযিক তলব করা উচিত)। (হূদ : ৬)

﴿١٧﴾ قُلْ هُوَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ

﴿১৭﴾ আপনি বলিয়া দিন—তিনিই আমার রব (আমার প্রতিপালক), তিনি ছাড়া কেহ এবাদতের যোগ্য নহে। আমি তাঁহারই উপর ভরসা করিয়াছি এবং তাঁহারই দিকে আমাকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে।

(রাদ : ৩০)

১৮) الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

১৮) এই সমস্ত লোকই (উপরে যাহাদের প্রশংসা করা হইয়াছে) এমন, যাহারা (মুসীবতের সময় ধৈর্য ধারণ করে এবং আপন প্রতিপালকের উপর তাওয়াক্কুল করে। (এই চিন্তা করে না যে, হিজরতের পর খাওয়া-দাওয়ার কি ব্যবস্থা হইবে।) (নাহল : ৪২)

১৯) إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

১৯) তাহার (অর্থাৎ শয়তানের) ক্ষমতা এমন লোকদের উপর চলে না যাহারা ঈমান রাখে এবং আপন প্রতিপালকের উপর (অস্তর দ্বারা) ভরসা রাখে। (নাহল : ৯৯)

২০) وَإِنَّمَا مَوْصَىٰ الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَٰءِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا

২০) এবং আমি মূসা (আঃ)কে কিতাব (তওরাত) দিয়াছি এবং উহাকে বনী ইসরাইলের জন্য হেদায়াত (এর উসীলা) বানাইয়াছি (এবং উহাতে অন্যান্য হুকুম-আহকামের সঙ্গে এই হুকুমও দিয়াছি) যে, তোমরা আমাকে ছাড়া কাহাকেও কার্য সম্পাদনকারী বানাইও না।

(বনী ইসরাইল : ২)

২১) وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَٰهَ ۞ فَلَمَّا نَجَّيْكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ۚ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا

২১) আর যখন সমুদ্রে তোমাদের উপর (তুফান ইত্যাদির) কোন বিপদ আসিয়া পৌঁছে, তখন আল্লাহ তায়ালাকে ছাড়া আর যাহাদিগকে ডাকিতে, (যাহাদের এবাদত করিতে, যাহাদের নিকট সাহায্য চাহিতে, তাহারা) সকলই হারাইয়া যায়। (অন্তরেও তাহাদের খেয়াল আসে না, তখন শুধু আল্লাহ তায়ালাকেই ডাকা হয়।) আর যখন আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে হলভাগে পৌঁছাইয়া দেন, তখন তোমরা তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইতে আরম্ভ কর। বাস্তবিকই মানুষ বড় অকৃতজ্ঞ। (বনী ইসরাইল : ৬৭)

২২) مَا لَكُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ ۚ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدٌ

২২) না তাহাদের জন্য আল্লাহ ছাড়া কোন সাহায্যকারী আছে, আর না তিনি নিজ হুকুমের মধ্যে কাহাকেও শরীক করেন (যে, তিনি

পার্লামেন্টের নিকট হইতে রায় গ্রহণ করিবেন)। (কাহফ : ২৬)

﴿٣٣﴾ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَالَهُمْ يَنْفَعُهُمْ وَمَالَهُمْ يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَسَادُ الْبَهِيمُ ۝

(২৩) আল্লাহ তায়ালাকে ছাড়া এমন জিনিসকে ডাকে (উহার এবাদত করে), যে না ক্ষতি করিতে পারে, না উপকার করিতে পারে। ইহা চরম পক্ষপাতিতা। (হজ্জ : ১২)

﴿٣٤﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ

(২৪) ঐ (পবিত্র) সন্তার উপর, যিনি জিন্দা রহিয়াছেন এবং তাঁহার উপর কখনও মৃত্যু আসিবে না তাওয়াক্কুল করুন। (ফুরকান : ৫৮)

﴿٣٥﴾ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِي ۝ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي ۝

(২৫) তিনিই আমাকে পানাহার করান এবং যখন আমি অসুস্থ হই, তখন তিনিই আরোগ্য দান করেন। (শু'আরা : ৭৯-৮০)

﴿٣٦﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ

(২৬) এবং আপনি ঐ (পবিত্র) সন্তার উপর তাওয়াক্কুল করুন, যিনি সর্বশক্তিমান দয়াময়। (শু'আরা : ২১৭)

﴿٣٧﴾ فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ۚ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

(২৭) অতএব তোমরা রিযিক আল্লাহর নিকট হইতে চাও (কেননা তিনিই রিযিকের মালিক), তাঁহার এবাদত কর, তাঁহার শোকর আদায় কর, তাঁহারই দিকে (কিয়ামতের দিন) ফিরিয়া যাইতে হইবে।

(আনকাবুত : ১৭)

﴿٣٨﴾ وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۚ وَاللَّهُ يَزِرُهَا وَإِيَّاكُمْ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

(২৮) আর অনেক প্রাণী এমন রহিয়াছে, যাহারা নিজেদের খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রাখে না, আল্লাহ তায়ালাই উহাদিগকে রিযিক পৌছান এবং তোমাদিগকেও। (তিনিই ভরসার উপযুক্ত, কেননা) তিনি সব কিছু শোনে, সবকিছু জানেন। (আনকাবুত : ৬০)

(২৭) وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝

(২৬) এবং আপনি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করুন, তিনি কার্যনির্বাহকরূপে যথেষ্ট। (আহযাব : ৩)

(৩০) قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِيكُمْ مِّنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ إِنَّا أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا ۖ أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ۖ وَلَا يَجِدُ دُونَ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝

(৩০) আপনি তাহাদিগকে বলিয়া দিন যে, সে কে, যে তোমাদিগকে আল্লাহর নিকট হইতে বাঁচাইতে পারে। যদি আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে কোন অনিষ্ট (কোন রোগ-ক্ষতি) পৌছাইতে চাহেন (তবে কে ফিরাইতে পারে)। অথবা সে কে, যে আল্লাহর রহমতকে তোমাদের হইতে ফিরাইয়া রাখিতে পারে। যদি তিনি তোমাদের উপর কোন প্রকার মেহেরবানী করিতে চাহেন (তবে সমস্ত দুনিয়া একত্রিত হইয়া ফিরাইতে পারিবে না। ইহাকে খুব ভাল করিয়া বুঝিয়া লউন যে,) তাহারা আল্লাহকে ছাড়া নিজেদের না কোন সহায়ক পাইবে, না কোন সাহায্যকারী। (আহযাব : ১৭)

(৩১) أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا ۖ

(৩১) আল্লাহ তায়ালা কি আপন বান্দার জন্য যথেষ্ট নহেন?

(যুমার : ৩৬)

(৩২) قُلْ أَقْرَأَ يَتِمُّ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّا أَرَادَنِي اللَّهُ بِسُوءٍ ۖ هَلْ هُنَّ كُشِفَتْ مُصْرَبٌ ۖ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ ۖ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ ۖ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ ۖ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝

(৩২) আপনি তাহাদিগকে বলুন, আচ্ছা তবে বল তো, আল্লাহ ছাড়া তোমরা তাহাদিগকে ডাক (তাহাদের বন্দেগী কর) — যদি আল্লাহ তায়ালা আমাকে কোন কষ্ট দিতে চাহেন, তবে কি তাহারা আল্লাহর দেওয়া কষ্টকে দূর করিতে পারে? অথবা যদি আল্লাহ তায়ালা আমার উপর কোন রহমত (অনুগ্রহ) করিতে চাহেন, তবে কি তাহারা সেই অনুগ্রহকে প্রতিরোধ করিতে পারে? আপনি বলিয়া দিন, আমার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট এবং তাহারই উপর তাওয়াক্কুলকারীগণ তাওয়াক্কুল করে। (যুমার : ৩৮)

(৩৩) ذِكْرُكُمْ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۝

(৩৩) এই আল্লাহই আমার প্রতিপালক। তাহারই উপর ভরসা রাখি

এবং তাহারই দিকে মনোনিবেশ করি। (শূরা : ১০)

﴿۳۳﴾ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ

৩৪) আল্লাহ তায়ালা আপন বান্দাদের উপর মেহেরবান। যাহাকে (যত বেশী) চাহেন, রিয়িক দান করেন। তিনি শক্তিশালী ও পরাক্রমশালী।

(শূরা : ১১)

﴿۳۴﴾ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

৩৫) এবং তোমাদের জন্য আল্লাহ ছাড়া না কোন কার্য নির্বাহক আছে, না কোন সাহায্যকারী। (শূরা : ৩১)

﴿۳۵﴾ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

৩৬) আর যাহা কিছু আল্লাহ তায়ালার নিকট আছে, উহা অনেক উত্তম এবং চিরস্থায়ী। তাহা ঐ সকল লোকদের জন্য, যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং আপন প্রতিপালকের উপর তাওয়াক্কুল করে। (শূরা : ৩৬)

﴿۳۶﴾ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ

৩৭) আর তোমাদের রিয়িক এবং যেই সবকিছুর ওয়াদা তোমাদের সহিত করা হইয়াছে, ঐ সবকিছু আসমানে রহিয়াছে। (অর্থাৎ সেখানে লওহে মাহফুজে লিখিত রহিয়াছে অথবা সেখান হইতে বৃষ্টি ইত্যাদির মাধ্যমে নাযিল হয়।) (যারিয়াত : ২২)

﴿۳۷﴾ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

৩৮) (হযরত ইবরাহীম আঃ এর দোয়া) হে আমাদের প্রতিপালক ! তোমারই উপর আমরা তাওয়াক্কুল করিয়াছি। তোমারই দিকে (প্রত্যেক প্রয়োজনে) আমরা রুজু করিয়াছি এবং তোমারই দিকে (কেয়ামত দিবসে) আমাদের ফিরিয়া যাইতে হইবে। (মুমতাহিনা : ৪)

﴿۳۸﴾ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُوا ۚ وَفِيهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ

৩৯) এই সমস্ত মোনাফেকরা একরূপ বলে যে, যাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জমা হইয়া আছে, তাহাদের

উপর খরচ করিও না। অবশেষে (যখন তাহারা ক্ষুধার কারণে মৃত্যুবরণ করিতে আরম্ভ করিবে, তখন) তাহারা নিজেরাই হযুর সালামাহ আলাইটি ওয়াসালামের নিকট হইতে বিক্ৰিও হইয়া সরিয়া যাইবে। (অথচ এই আহমকরা ইহা জানে না যে,) আল্লাহ তায়ালাই হাতে রহিয়াছে আসমান ও জমিনের ভাণ্ডারসমূহ। কিন্তু মুনাফিকরা বুঝে না। (তাহারা আহমক ; এইরূপ মনে করে যে, রিযিক তাহাদের দানের উপর নির্ভরশীল) (মুনাফিকুন : ৭)

﴿ ৭০ ﴾ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۖ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝

(৪০) আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে, আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য নাজাত (এবং সুবিধা) এর রাস্তা বাহির করিয়া দেন। তাহাকে এমন জায়গা হইতে রিযিক পৌছান, যেখান হইতে তাহার ধারণাও হয় না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে, আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য যথেষ্ট। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা (যে কাজের ইচ্ছা করেন) স্বীয় কাজকে পূর্ণ করিয়াই থাকেন। (অবশ্য ইহা জরুরী যে,) আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক জিনিসের একটি পরিমাণ (এবং সময়) নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। (তালাক : ২-৩)

হাদীস সমূহের বিবরণে প্রথম হাদীসের ব্যাখ্যায় এই আয়াত সম্পর্কিত একটি ঘটনাও আসিতেছে।

﴿ ৭১ ﴾ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ۝

(৪১) তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক। তিনি ব্যতীত কেহ এবাদতের উপযুক্ত নাই। তাহাকেই নিজ কার্যসমূহ সোপর্দ করার জন্য সাব্যস্ত করিয়া রাখুন (অর্থাৎ তিনিই যখন পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক, কাজেই তাহার উপর আস্থা ও ভরসা হওয়া চাই)। (মুযাশ্শিল : ১)

এই একচল্লিশটি আয়াত নমুনা হিসাবে উল্লেখ করা হইল। নচেৎ কুরআন পাকের প্রতিটি বিষয় তৌহিদেরই শিক্ষা ; আর তৌহিদেরই ফল হইল, তাওয়াক্কুল। যাহার যত বেশী তৌহিদের মধ্যে পরিপক্বতা ও পরিপূর্ণতা হইবে, ততই তাওয়াক্কুল ও আল্লাহর উপর ভরসা এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য সবকিছু হইতে বিমুখতা হইবে। যেমন প্রসিদ্ধ আছে যে, হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ) কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হইতেছিল,

তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) আসিয়া দরখাস্ত করিলেন যে, আমার উপযুক্ত কোন খেদমত থাকিলে হুকুম করুন। তিনি বলিলেন, না, তোমার সহিত আমার কোন প্রয়োজনের সম্পর্ক নাই। (এহইয়াউল উলূম)

এক মসজিদে একজন ফকীর এতেকাফের নিয়তে যাইয়া বসিয়া গেল। তাহার নিকট খানাপিনার কোন সামান কিছুই ছিল না। মসজিদের ইমাম সাহেব তাহাকে নসীহত করিলেন যে, এইভাবে সামান ইত্যাদি ছাড়া মসজিদে বসিয়া যাওয়া হইতে ইহা ভাল ছিল যে, কোথাও মজদুরী করিতে। (কেননা, পেট পালা ফরজ।) ফকীর তাহার কথা কখন জওয়াব দিল না। ইমাম সাহেব পুনরায় একই কথা বলিলেন। ফকীর এবারও চুপ রহিল। ইমাম সাহেব তৃতীয় বার আবার বলিলেন। ফকীর চুপ করিয়া রহিল। তিনি চতুর্থবার আবার বলিলেন। তখন সে জওয়াব দিল যে, এই মসজিদের নিকটে যে ইহুদীর দোকান আছে, সে আমার জন্য প্রতিদিন দুইটি রুটি নির্ধারণ করিয়া দিয়াছে। ইমাম সাহেব বলিলেন, যদি সে খানা নির্ধারণ করিয়া দিয়া থাকে, তবে বেশ ভাল ; এতেকাফ অবশ্যই কর। ফকীর বলিল, আফসোস! আপনি যদি ইমাম না হইতেন, তবে অনেক ভাল ছিল। আপনি এই অসম্পূর্ণ তওহীদ লইয়া আল্লাহ এবং তাঁহার বান্দাদের মাঝখানে মাধ্যম হইয়া দাঁড়ান। একজন কাকের ইহুদীর ওয়াদাকে আপনি আল্লাহ তায়ালার রিয়িক প্রদানের ওয়াদার উপর স্থান দিয়াছেন (আফসোস আপনার উপর এবং আপনার অবস্থার উপর)।

(রওজ)

ফকীর বাস্তবিকই সত্য বলিয়াছে। এই অবস্থাই আমাদের যে, বান্দার ওয়াদার উপর তো আমরা নিশ্চিত হই ; আল্লাহর ওয়াদার উপর হই না।

উপরোল্লিখিত আয়াতগুলির উপর গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত এবং অধিক হইতে অধিকতর চেষ্টা এই হওয়া উচিত যে, শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালার উপরই যেন আমাদের দৃষ্টি থাকে, তাঁহারই উপর যেন আমাদের ভরসা হয়। তাঁহারই পবিত্র সন্তার নিকট যেন আমাদের আবেদন হয়, তাঁহারই নিকট যেন ডিন্কা চাওয়া হয় ; তিনি ব্যতীত কাহারও সামনে যেন হাত পাতা না হয়। এমনকি অন্তরেও যেন অন্য কাহারও খেয়াল না আসে। বরং সেই পবিত্র সন্তা এবং একমাত্র সেই পবিত্র সন্তাই যেন আমাদের ভরসার স্থল হয়। তিনিই লাভ এবং লোকসানের মালিক—এই কথা যেন অন্তর দিয়া বুঝা হয়। মুখে বলার তো আমাদের সাধারণ অভ্যাস রহিয়াছে, কিন্তু আসল কাজের জিনিস এই যে, আমাদের অন্তরেও যেন এই কথা ভালভাবে জমিয়া যায় যে, তাঁহার ইচ্ছা ছাড়া কোন হাকিম কোন

لَمْ تَسُدَّ فَاثَتَهُ وَمَنْ نَزَلَتْ بِهِ
فَاثَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِاللهِ كَيْدُ شَيْءٍ اللهُ
لَهُ بِرِزْقِي عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ -
(رواه الترمذی وھکذا فی الدرر)

المنثور برواية إبي داؤد والترمذی والحاکم وقد صححه ولفظ إبي داؤد
بموت عجل أو غني عجل وفي المشکوٰۃ بموت عجل أو غني العجل

১) ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি উপবাসের সম্মুখীন হয় আর উহা মানুষের সামনে পেশ করে, তাহার উপবাস বন্ধ হইবে না। আর যে ব্যক্তি আপন উপবাস আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে পেশ করে (এবং তাহার নিকট আবেদন করে), আল্লাহ তায়ালা শীঘ্র তাহাকে রুজি দান করেন; তাৎক্ষণিকভাবে পাইয়া যাইবে অথবা কিছুটা দেরীতে পাইবে। (তিরমিযী)

ফায়দা : যে ব্যক্তি মানুষের নিকট সওয়াল করিয়া বেড়ায়, তাহার উপবাস বন্ধ হইবে না—ইহার অর্থ এই যে, তাহার প্রয়োজন পূরণ হইবে না। আজ কোন এক প্রয়োজনে ভিক্ষা করিল এবং বাহ্যিক দৃষ্টিতে উহা মিটিয়া গেল; কিন্তু আগামীকাল উহা হইতে আরও গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন দেখা দিবে এবং উহা আগের মতই বাকী থাকিয়া যাইবে। আর যদি আল্লাহ তায়ালার পবিত্র দরবারে হাত প্রসারিত করে, তবে এই প্রয়োজন তো পূরণ হইবেই; অন্য প্রয়োজনও দেখা দিবে না। আর যদি প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে উহার ব্যবস্থাও আল্লাহ তায়ালা সঙ্গে সঙ্গে করিয়া দিবেন।

প্রথম পরিচ্ছেদের হাদীসসমূহের বিবরণে আট নং হাদীসের আওতায় হযরত কাবশা (রাযিঃ)এর হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কসম খাইয়া কয়েকটি কথা এরশাদ করিয়াছেন। সেইগুলির মধ্যে একটি ইহাও যে, যে ব্যক্তি মানুষের নিকট চাহিবার দরজা খোলে, আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর অভাবের দরজা খোলেন। সেখানেই অপর এক হাদীসে এই বিষয়ের উপর ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কসম খাওয়ার কথা হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফের রেওয়াযাতে বর্ণিত হইয়াছে। কারণ ইহাই যে, যাহারা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়, তাহারা সবসময় দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তই থাকে।

অন্য এক হাদীসে উক্ত বিষয় এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে—যে ব্যক্তি নিজের কুধা ও প্রয়োজনকে আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে পেশ করে, আল্লাহ

তায়লা অতি তাড়াতাড়ি তাহার অভাব দূর করিয়া দেন— জলদি মৃত্যুর দ্বারা অথবা জলদি সচ্ছলতার দ্বারা। জলদি মৃত্যুর দ্বারা অভাব দূর করার দুই অর্থ—এক এই যে, মৃত্যুর সময় যদি নিকটবর্তী হইয়া থাকে, তবে তাহাকে ক্ষুধার কষ্ট ভোগ করার আগেই আল্লাহ তায়লা মৃত্যু দিয়া দিবেন। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, অন্য কাহারও মৃত্যু তাহার সচ্ছলতার কারণ হইয়া যাইবে। যেমন কাহারও নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পদের অধিকাংশ অথবা পরিপূর্ণ অংশ প্রাপ্ত হইল অথবা কোন ব্যক্তি মৃত্যুর সময় এই বিষয়ে ওসীয়াত করিয়া গেল যে, আমার সম্পদ হইতে এই পরিমাণ অমুক ব্যক্তিকে দিয়া দিবে। এই ধরনের বেশকিছু ঘটনা দেখা গিয়াছে এবং শোনা গিয়াছে যে, মক্কা শরীফে কোন ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে এই ওসীয়াত করিয়াছে যে, হিন্দুস্তানের অমুক শহরে এই নামে এক ব্যক্তি আছে। আমার সম্পদ বিক্রয় করিয়া টাকা-পয়সা যেন তাহার নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

কুর্দ একটি গোত্রের নাম। এই গোত্রে একজন বিখ্যাত ডাকাত ছিল। সে নিজের ঘটনা বর্ণনা করে যে, আমি আমার সাথীদের একদলের সহিত ডাকাতি করিবার জন্য যাইতেছিলাম। রাস্তায় আমরা এক জায়গায় বসিয়াছিলাম। সেখানে আমরা খেজুরের তিনটি গাছ দেখিলাম। তন্মধ্যে দুইটি গাছ খুব ফলে পরিপূর্ণ, আর একটি গাছ একেবারে শুকনা। একটি ছোট পাখি বারবার আসে এবং ফলদার গাছগুলি হইতে তাজা খেজুর ঠোটে লইয়া ঐ শুকনা গাছের উপর যায়। আমরা ইহা দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলাম। আমি দশবার ঐ পাখিটিকে খেজুর লইয়া যাইতে দেখিলাম। তখন আমার খেয়াল হইল যে, গাছটিতে চড়িয়া দেখি, পাখিটি এই খেজুরগুলিকে কি করে। সুতরাং আমি গাছের চূড়ায় যাইয়া দেখিলাম, সেখানে একটি অন্ধ সাপ মুখ খুলিয়া পড়িয়া আছে। আর পাখিটি সেই তাজা খেজুর উহার মুখে ঢালিয়া দেয়। ইহা দেখিয়া আমার এমন শিক্কা হইল যে, আমি কাঁদিতে লাগিলাম। আমি বলিলাম, হে আমার মাওলা! এই সাপ যাহাকে তোমার নবী মারিয়া ফেলিবার হুকুম দিয়াছেন, যখন এই সাপটি অন্ধ হইয়া গিয়াছে, তখন তুমি তাহাকে রিযিক পৌছাইবার জন্য একটি পাখীকে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছ। আর আমি তোমার বান্দা, তোমার একত্ববাদে বিশ্বাসী, তুমি আমাকে মানুষের সম্পদ লুণ্ঠনের কাজে লাগাইয়া দিয়াছ। এই কথা বলার পর আমার দিলে এই কথা ঢালা হইল যে, আমার দরজা তওবার জন্য তো খোলা রহিয়াছে। আমি তখনই আমার তলোয়ার ডাঙ্গিয়া ফেলিলাম—যাহা মানুষের সম্পদ লুণ্ঠনের

ব্যাপারে আমার কাজে আসিত এবং আমি আমার মাথার উপর মাটি নিক্ষেপ করিতে করিতে 'একালাতান একালাতান' (অর্থাৎ কমা কমা) বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিলাম। তখন গায়েব হইতে আমাকে আওয়ারাজ দেওয়া হইল—আমি কমা করিয়া দিলাম, কমা করিয়া দিলাম।

আমি আমার সাধীদের নিকট আসিলাম। তাহারা বলিতে লাগিল, তোমার কি হইয়াছে? বলিলাম, আমি পরিত্যক্ত ছিলাম, এখন সন্ধি করিয়া লইয়াছি। এই বলিয়া আমি সমস্ত ঘটনা তাহাদিগকে শুনাইলাম। তাহারা বলিতে লাগিল, আমরাও সন্ধি করিতেছি। এই বলিয়া সকলেই নিজ নিজ তলোয়ার ডাঙ্গিয়া ফেলিল এবং সমস্ত লুটের মাল ফেলিয়া আমরা এহরাম বাখিয়া মক্কা শরীফের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়া গেলাম। তিন দিন চলিয়া একটি গ্রামে পৌঁছিলাম। সেখানে একজন অন্ধ বৃদ্ধকে পাইলাম। সে আমার নাম লইয়া আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করিল যে, তোমাদের মধ্যে এই নামের কোনো কুর্দী ব্যক্তি আছে কি? লোকেরা বলিল, আছে। সে কিছু কাপড় বাহির করিল এবং বলিল, তিনদিন হইয়াছে, আমার ছেলে মারা গিয়াছে। সে এই কাপড়গুলি রাখিয়া গিয়াছে। আমি তিনদিন যাবৎ প্রতিদিন ছয় সান্নায়াহ্ আলাইহি ওয়াসান্নামকে স্বপ্নে দেখিতেছি। তিনি বলিতেছেন, তাহার কাপড়গুলি অমুক কুর্দী ব্যক্তিকে দিয়া দাও। সেই কুর্দী বলেন, আমি সেই কাপড়গুলি লইয়া লইলাম এবং আমরা সকলেই উহা পরিধান করিলাম। (রওজ)

এই ঘটনার মধ্যে দুইটি জিনিসই শিক্ষণীয়। এক—অন্ধ সাপের জন্য আন্থাহ তায়ালার পক্ষ হইতে রিযিকের ব্যবস্থা এবং ছয় সান্নায়াহ্ আলাইহি ওয়াসান্নামের পক্ষ হইতে কাপড় দান। যখন আন্থাহ তায়ালার কোন ব্যক্তিকে সাহায্য করিতে চাহেন, তখন তাহার জন্য আসবাব ও উপকরণ সৃষ্টি করা কোন মুশকিল নয়। সচ্ছলতা ও অভাবের সমস্ত উপকরণ তিনিই পয়দা করেন। আর সত্যিকার তওবার বরকতে ছয় সান্নায়াহ্ আলাইহি ওয়াসান্নামের পক্ষ হইতে কাপড় পাওয়ার সম্মান স্বয়ং একটি গর্বের বিষয়। এই ঘটনা জলদি মৃত্যুর দ্বারা সচ্ছলতা হাসিল হওয়ার একটি উদাহরণ। মৃত্যুর সময় এরূপ ওসীয়তের আরো বহু ঘটনা অনেক শুনিয়াছি যে, আমার সম্পদ হইতে এই পরিমাণ যেন অমুক ব্যক্তিকে দিয়া দেওয়া হয়।

এক হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) ছয় সান্নায়াহ্ আলাইহি ওয়াসান্নামের এরশাদ বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি ক্ষুধার্ত অথবা অভাবী হয় এবং সে মানুষের নিকট হইতে নিজের প্রয়োজনকে গোপন রাখে, আন্থাহ

তায়ালার উপর (তাহার আপন দয়া ও মেহেরবানীর কারণে) ইহা হক হইয়া যায় যে, তাহাকে হালাল মাল হইতে এক বৎসরের রিযিক দান করিবেন। (মিশকাত)

অন্য এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি ক্ষুধার্ত হয় অথবা অভাবী হয় আর মানুষের নিকট হইতে উহাকে গোপন রাখে এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট চায়, আল্লাহ তায়ালার তাহার উপর এক বৎসরের হালাল রুজির দরজা খুলিয়া দেন। (কানজ)

আর এক হাদীসে হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার নিকট সম্বলতা চায়, আল্লাহ তায়ালার তাহাকে সম্বলতা দান করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার নিকট পবিত্রতা চায়, আল্লাহ তায়ালার তাহাকে পবিত্রতা দান করেন। আর উপরের হাত (অর্থাৎ দানকারীর হাত) উত্তম নিচের হাত (অর্থাৎ গ্রহিতার হাত) হইতে। যে ব্যক্তিই ভিক্ষার দরজা খোলে, আল্লাহ তায়ালার তাহার উপর অভাবের দরজা খুলিয়া দেন।

হযরত আলী (রাযিঃ) এক ব্যক্তির আওয়াজ শুনিলেন, সে আরাফাতের ময়দানে মানুষের নিকট ভিক্ষা করিতেছিল। তিনি তাহাকে চাবুক দ্বারা মারিলেন। এইজন্য যে, এমন দিনে এমন স্থানে আল্লাহ ব্যতীত অপরের নিকট চাহিতেছে।

অন্য এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি ভিক্ষার দরজা খোলে আল্লাহ তায়ালার তাহার উপর দুনিয়া ও আখেরাতে দরিদ্রতার দরজা খুলিয়া দেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দানের দরজা খোলে, আল্লাহ তায়ালার তাহার উপর দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের দরজা খুলিয়া দেন।

অন্য হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি ভিক্ষার দরজা খোলে আল্লাহ তায়ালার তাহার উপর দরিদ্রতার দরজা খুলিয়া দেন।

কোন ব্যক্তি রশি লইয়া লাকড়ি বাঁধিয়া নিজ কোমরে বহন করিয়া বিক্রয় করে এবং উহা দ্বারা আপন জীবিকা নির্বাহ করে—ইহা ভিক্ষা করা হইতে উত্তম ; চাই সেই ভিক্ষা পাওয়া যাক বা না যাক।

আর এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি সদকার দ্বারা বা আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করার দ্বারা দানের দরজা খুলে, আল্লাহ তায়ালার তাহাকে অধিক দান করেন। (অর্থাৎ তাহার সম্পদ বৃদ্ধি করিয়া দেন।) আর যে ব্যক্তি সম্পদ বাড়াইবার নিয়তে ভিক্ষার দরজা খোলে, ইহাতে তাহার অভাব বাড়িয়া যাইতে থাকে অর্থাৎ প্রয়োজন বাড়িতে থাকিবে আর

আমদানী যথেষ্ট না হওয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযিঃ) ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ তায়ালা দিকে মনোযোগী হইয়া যায়, আল্লাহ তায়ালা তাহার সকল প্রয়োজনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তাহাকে এমন জায়গা হইতে রিযিক দান করেন যে, তাহার ধারণাও হয় না। আর যে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে দুনিয়ার প্রতি মগ্ন হইয়া যায়, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে দুনিয়ার হাওয়ালা করিয়া দেন (যে, তুমি জান আর তোমার কাজ জানে, অর্থাৎ মেহনত কর ও কামাই কর, যে পরিমাণ কষ্ট সহ্য করিবে, সেই হিসাবে আমি তোমাকে দিতে থাকিব)।

হযরত আবু যর (রাযিঃ) বলেন, ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি তোমাকে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করার ওসীয়াত করিতেছি; নির্জনেও এবং প্রকাশ্যেও। আর যখন কোন অন্যায় কাজ হইয়া যায়, তখন (ক্ষতিপূরণ হিসাবে) কোন ভাল কাজও কর। আর কাহারও নিকট সওয়াল করিও না। কাহারও আমানত রাখিও না। দুই ব্যক্তির মাঝখানে ফয়সালাকারী হইও না। (কেননা, ইহা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ইহা প্রত্যেকের সামর্থ্যের বিষয় নয়)।

এক হাদীসে ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ রহিয়াছে, যে ব্যক্তি অল্পের উপর রাজি হইয়া যায় এবং সন্তুষ্ট থাকে আর আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে, সে কামাই করার মেহনত হইতে চিন্তামুক্ত হইয়া যায়।

এক হাদীসে ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী হইতে চায়, সে যেন আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে। আর যে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা ধনবান হইতে চায় তাহার উচিত যে, নিজের কাছে জিনিসের উপর যে পরিমাণ ভরসা হয়, উহা অপেক্ষা আল্লাহর নিকট যাহা আছে উহার উপর যেন ভরসা বেশী রাখে। আর যে সবচেয়ে বেশী সম্মানিত হইতে চায়, সে যেন তাকওয়া অবলম্বন করে। (অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে যে, লোকদের উপর মানুষের তাকওয়ার যে পরিমাণ প্রভাব পড়ে, এত প্রভাব অন্য কোন জিনিসের পড়ে না। যে ব্যক্তির মধ্যে তাকওয়া যত বেশী পরিমাণে হইবে, ততই মানুষের অন্তরে তাহার ইয়্যত ও সম্মান বেশী হইবে)।

হযরত ওহাব (রহঃ) আল্লাহ তায়ালা এরশাদ নকল করেন যখন বান্দা আমার উপর ভরসা করে, তখন আসমান জমিন সবকিছু মিলিয়াও

যদি তাহার সহিত ষড়যন্ত্র করে, তবে আমি তাহার জন্য রাস্তা বাধিত
করিয়া দিব।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালা হযরত দীস
(আঃ)এর উপর ওহী পাঠাইলেন যে, আমার উপর তাওয়াক্কুল কর, আমি
তোমার জরুরতসমূহের জিম্মাদার হইয়া যাইব। আমাকে ছাড়া অন্য
কাহাকেও নিজের বন্ধু বানাইও না, যেন আমি তোমাকে ত্যাগ না করি।

অনেক হাদীসে এই ঘটনা উল্লেখ করা হইয়াছে যে, হযরত আওফ
ইবনে মালেক (রাযিঃ)এর পুত্রকে কাফেররা কয়েদ করিল এবং চামড়ার
রশি দ্বারা খুব মজবুত করিয়া বাধিয়া রাখিল। তাহার উপর অত্যন্ত কঠোর
নির্যাতন করা হইত। তাহাকে ক্ষুধার্ত রাখা হইত। তিনি তাহার পিতার
নিকট কোন রকমে নিজের অবস্থা জানাইয়া খবর পাঠাইলেন, যেন হযুর
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তিনি দোয়ার জন্য আবেদন
করেন। যখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিতে পারিলেন,
তখন বলিলেন, তাহার নিকট এই বলিয়া পাঠাও যে, সে যেন আল্লাহ
তায়ালাকে ভয় করিতে থাকে (তাকওয়া অবলম্বন করে) এবং তাহারই
উপর তাওয়াক্কুল করে এবং সকাল-সন্ধ্যা এই আয়াত (তওবা : ১২৮-১২৯)

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ
بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ . فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ
تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

পড়িতে থাকে। তাহার নিকট যখন এই
সংবাদ পৌছিল, তখন তিনি এই আয়াত পড়িতে শুরু করিলেন। একদিন
আপনা আপনিই সেই রশি ছিড়িয়া গেল। তিনি তাহাদের কয়েদ হইতে
ছুটিয়া পালাইয়া আসিলেন এবং তাহাদের কিছু পণ্ড ইত্যাদিও ধরিয়া
লইয়া আসিলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, যে ব্যক্তির কোন বাদশাহের
জুলুমের ভয় হয় অথবা কোন হিংস্র জন্তুর অথবা সমুদ্রে ডুবিয়া যাইবার
ভয় হয়, সে যদি উক্ত আয়াত শরীফ তেলাওয়াত করে তবে ইনশাআল্লাহ
তাহার কোন ক্ষতি হইবে না।

অন্য এক হাদীসে এই ঘটনার মধ্যে লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা
বিল্লাহ-ও বেশী পরিমাণে পড়িবার তুকুম বর্ণিত হইয়াছে। আওফ ইবনে
মালেক (রাঃ)এর পুত্রের ঘটনা প্রসঙ্গেই এই আয়াত শরীফ নাথিল
হইয়াছে: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا

يُخْتِيبُ অর্থাৎ, যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য রাস্তা খুলিয়া দেন এবং এমন জায়গা হইতে তাহার রিয়িক পৌছাইয়া দেন যেখান হইতে তাহার ধারণাও হয় না। (তালাক : ২-৩) আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা উপর ভরসা করে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য যথেষ্ট। সেই সাহাবীর এই ধারণাও ছিল না যে, এই কাফের, যে এমন কঠিন জুলুম করিতেছে—তাহারই সম্পদ হইতে তাহার রিয়িক নির্ধারিত রহিয়াছে।

এক বুযুর্গ বলেন, আমি এবং আমার একজন সাথী একটি পাহাড়ে অবস্থান করিতাম। সবসময় এবাদতে মশগুল থাকাই আমাদের কাজ ছিল। আমার সাথী তো ঘাস ইত্যাদি খাইয়া দিন কাটাইত এবং আমার জন্য আল্লাহ তায়ালা এই ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, একটি হরিণী প্রতিদিন আসিত এবং আমার নিকট আসিয়া তাহার পা গুলি ফাঁক করিয়া দাঁড়াইয়া যাইত। আমি উহার দুধ পান করিয়া লইতাম। সে চলিয়া যাইত। এইভাবেই অনেক দিন অতিবাহিত হইয়া গেল যে, সেই হরিণী প্রতিদিনই আসা-যাওয়া করিত এবং আমি উহার দুধ পান করিতাম। আমার সাথীর অবস্থানের জায়গা ঐ পাহাড়ে আমার চেয়ে কিছু দূরে ছিল। একদিন সে আমার নিকট আসিল এবং বলিতে লাগিল যে, একটি কাফেলা এখানে কাছেই অবস্থান করিয়াছে। চল আমরা কাফেলার লোকদের নিকট যাই। হয়ত সেখানে কিছু দুধ বা অন্য কোন খাওয়ার জিনিস পাওয়া যাইবে। প্রথমে তো আমি সম্পূর্ণ অস্বীকার করিলাম। কিন্তু সে যখন বারবার অনুরোধ করিল, তখন আমিও তাহার সহিত চলিলাম। আমরা দুইজন কাফেলার লোকদের নিকট পৌছিলাম। তাহারা আমাদেরকে খানা খাওয়াইল। আমরা খানা শেষ করিয়া নিজ নিজ জায়গাতে ফিরিয়া আসিলাম। উহার পর আমি সবসময় সেই হরিণীর আসিবার সময়টিতে উহার অপেক্ষা করিতাম ; কিন্তু তাহার আসা বন্ধ হইয়া গেল। কয়েকদিন অপেক্ষা করিবার পর আমি বুঝিলাম যে, আমার এই গুনাহের কারণে ঐ রিয়িক যাহার ওসিলায় আমি নিশ্চিত ছিলাম, তাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

রওজ কিতাবের গ্রন্থকার বলেন, বাহ্যিক দৃষ্টিতে উক্ত ঘটনায় তিনটি গুনাহের বিষয় ছিল। এক—যে তাওয়াক্কুল অবলম্বন করিয়াছিল, উহাকে ছাড়িয়া দিয়াছে। দুই—লোভ করিয়াছে এবং যে রিয়িকের কারণে নিশ্চিত ছিল, উহার উপর তুষ্ট থাকে নাই। তিন—এমন খানা খাইয়াছে, যাহা পবিত্র ছিল না ; ফলে পবিত্র রিয়িক হইতে বঞ্চিত হইয়া গিয়াছে। অত্যন্ত

শিক্ষণীয় ঘটনা। অনেক সময় নিজের লোভ-লালসার কারণে আমরা আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতসমূহ হইতে বঞ্চিত হইয়া যাই। সওয়াল করিবার কারণে বাহ্যিক দৃষ্টিতে সাময়িকভাবে যদিও কিছু পাওয়া যায় ; কিন্তু উহার অমঙ্গলের কারণে আল্লাহ তায়ালার ঐ নেয়ামত হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, যাহা চাওয়া ছাড়া এবং কোনরূপ খোটার সম্ভাবনা ছাড়া লাভ হইত।

হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) এইভাবে দোয়া করিতেনঃ **اللَّهُمَّ كَمَا صُنَّتَ وَجْهِي عَنْ سُجُودٍ غَيْرِكَ فَصْنِ وَجْهِي عَنْ** **مَسْئَلَةٍ غَيْرِكَ** হে আল্লাহ! যেভাবে তুমি আমার মাথাকে তুমি ছাড়া অন্যের সামনে সেজদা করা হইতে হেফাজতে রাখিয়াছ, সেইভাবে আমার জবানকেও অন্য কাহারও নিকট সওয়াল করা হইতে হেফাজতে রাখ।

حُضُورِ أَقْدَسَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارشاد ہے کہ جو شخص اس سے سوال کرتا ہے کہ اپنے مال میں زیادتی کسے وہ جہنم کے اگاسے لگے رہے جس کا دل چاہے تم سے لگے یا زیادہ لگے۔	② عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَعَكُّرًا فَإِنَّهَا يَسْأَلُ بِعَمْرٍأ فليَسْتَقِيلَ أَوْ لِيَسْتَكْثِرَ (رواه مسلم كذا في المشكاة)

② হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে ভিক্ষা করে, সে জাহান্নামের জ্বলন্ত কয়লা চাহিতেছে—যাহার দিল চায়, অল্প চাহিয়া লয় অথবা বেশী চাহিয়া লয়। (মিশকাত : মুসলিম)

ফায়্যদা : প্রথম হাদীসে শুধু আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে গায়েবী সাহায্য বন্ধ হওয়ার ধমকি ছিল। যেহেতু ঐ হাদীসে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সওয়াল করার উল্লেখ ছিল আর এই হাদীসে বিনা প্রয়োজনে শুধু নিজের সম্পদ বাড়াইবার জন্য ভিক্ষা করার কথা উল্লেখিত হইয়াছে, এই কারণে এই হাদীসে অত্যন্ত কঠিন ধমকি আসিয়াছে যে, সে জাহান্নামের জ্বলন্ত কয়লা জমা করিতেছে। এখন মানুষের ইচ্ছা, যত পরিমাণ জ্বলন্ত আগুনের কয়লা মনে চায়, জমা করিয়া লয়।

একবার হযরত ওমর (রাযিঃ) হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করিলেন—অমুক দুই ব্যক্তি আপনার প্রশংসা করিতেছিল

যে, আপনি তাহাদিগকে দুইটি দিনার দিয়াছেন। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কিন্তু অমুক ব্যক্তি যাহাকে আমি দশ হইতে একশ পর্যন্ত স্বর্ণমুদ্রা দিয়াছি ; সে এইরূপ করে নাই। অতঃপর বলিলেন, কিছু মানুষ এমন আছে, যাহারা সওয়াল করে এবং আমি তাহাদের সওয়ালের কারণে যাহা দেই, তাহা বগলদাবা করিয়া লইয়া যায় ; অথচ তাহারা নিজদের বগলের নিচে আগুন দাবাইয়া লইয়া যায়। হযরত ওমর (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! তবে আপনি দেন কেন ? হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি কি করিব ? তাহারা সওয়াল করা ছাড়া থাকিতে পারে না। আর আল্লাহ তায়ালা আমার জন্য কৃপণতাকে পছন্দ করেন না।

অন্য এক হাদীসে এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে—হযরত ওমর (রাযিঃ) আরজ করিলেন—ইয়া রাসূলুল্লাহ ! যখন আপনার জানা আছে যে, উহা আগুন, তখন আপনি কেন দান করেন ? হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি কি করিব ? তাহারা সওয়াল না করিয়া থাকিতে পারে না ; আর আল্লাহ তায়ালা আমার জন্য কৃপণতাকে পছন্দ করেন না।

হযরত কাবীসা (রাযিঃ) বলেন, আমি (জরিমানা ও ক্ষতিপূরণ ইত্যাদির) এক বোঝা আমার জিম্মায় লইয়াছিলাম অর্থাৎ কোন জিনিষের জামিন হইয়াছিলাম। এই ব্যাপারে আমি সাহায্য চাহিবার জন্য হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, অপেক্ষা কর কোথাও হইতে সদকার মাল আসিলে আমি সাহায্য করিব। অতঃপর হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে কাবীসা ! কেবল তিন প্রকার মানুষের জন্য সওয়াল করা জায়েয। এক—ঐ ব্যক্তি, যে কোন জামানত ইত্যাদির বোঝা নিজের ঘাড়ে লইয়াছে। তাহার জন্য ঠিক সেই পরিমাণ সওয়াল করা জায়েয, অতঃপর বিরত থাকিবে ; উহা হইতে বেশী সওয়াল করিবার অধিকার তাহার নাই। দ্বিতীয়—ঐ ব্যক্তি, যে কোন আকস্মিক দুর্ঘটনায় পতিত হইবার কারণে তাহার সমস্ত সম্পদ ধ্বংস হইয়া যায়। (যেমন আগুন লাগিয়া যায়, অথবা অন্য কোন আকস্মিক দুর্ঘটনায় পড়িয়া যায়, ফলে তাহার সবকিছু হারাইয়া যায়) তখন তাহার জন্য ঐ পরিমাণ সওয়াল করা জায়েয, যাহা দ্বারা জীবন নির্বাহ করিতে পারে। তৃতীয়—ঐ ব্যক্তি যাহার উপবাস অবস্থা চলিতে থাকে। অবশেষে তাহার কওমের তিনজন মানুষ বলে যে, তাহার উপবাস চলিতেছে। তখন তাহার

জন্যও এই পরিমাণ সওয়াল করা জায়েয, যাহা দ্বারা তাহার জীবন নির্বাহ হইয়া যায়। এই তিন প্রকার লোক ছাড়া যে ব্যক্তি সওয়াল করে, সে হারাম মাল খায়।

অন্য এক হাদীসে আছে, দুই ব্যক্তির জন্য সওয়াল করা জায়েয নয়। এক—ধনী ব্যক্তির জন্য। দ্বিতীয়—শক্তিমান সুস্থ ব্যক্তির জন্য (যে উপার্জনে সক্ষম)। অবশ্য যে ব্যক্তি দারিদ্রের চরম পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে অথবা করজের ভারে জর্জরিত হইয়া গিয়াছে, তাহার জন্য সওয়াল করা জায়েয। আর যে ব্যক্তি সম্পদ বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে সওয়াল করিতেছে, কিয়ামতের দিন তাহার মুখের উপর জখম থাকিবে এবং সে জাহান্নামের আগুন খাইতেছে। যাহার ইচ্ছা হয়—বেশী সওয়াল করুক আর যাহার ইচ্ছা হয় কম করুক।

অন্য এক হাদীসে আছে, সওয়াল করা কিয়ামতের দিন মুখের উপর জখমে পরিণত হইবে। ফলে, তাহার চেহারা ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যাইবে। যাহার ইচ্ছা—সে আপন চেহারার সৌন্দর্য বাকী রাখুক আর যাহার ইচ্ছা না রাখুক। অবশ্য যদি বাদশাহর নিকট হইতে (অর্থাৎ বাইতুল মাল হইতে—এই শর্তে যে, সেখান হইতে লওয়ার হক তাহার থাকে) চাহিয়া লয় কিংবা অপারগতার কারণে সওয়াল করে, তবে কোন ক্ষতি নাই।

অন্য এক হাদীসে আছে, মানুষ সওয়াল করিতে থাকে। ফলে কিয়ামতের দিন তাহার চেহারা সামান্য পরিমাণও গোশত থাকিবে না।

হযরত মাসউদ ইবনে আমর (রাযিঃ) বলেন, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে নামায পড়িবার জন্য একটি জানাযা আনা হইল। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কি রাখিয়া গিয়াছে? লোকেরা আরজ করিল, দুই তিনটি স্বর্ণমুদ্রা রাখিয়া গিয়াছে। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইহা জাহান্নামের দুই তিনটি দাগ বা চিহ্নস্বরূপ। বর্ণনাকারী বলেন, আমি হযরত আবু বকর (রাযিঃ)এর আজাদকৃত গোলাম আবদুল্লাহ ইবনে কাসেম (রাযিঃ)কে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, এই ব্যক্তি সম্পদ বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে সওয়াল করিত।

হাদীসের কিতাবসমূহে এই ধরনের বিভিন্ন ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। যাহাতে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মামুলী পরিমাণ সম্পদ রাখিয়া যাওয়ার উপর জাহান্নামের দাগ এবং এই ধরনের ধমকিসমূহ এরশাদ করিয়াছেন। উলামায়ে কেরাম এই সম্পর্কে লিখিয়াছেন যে, ইহা ঐ অবস্থায় যখন মানুষের কাছে পূর্ব হইতে কিছু মওজুদ থাকে আর সে

মিথ্যা বলিয়া নিজেকে একেবারে দরিদ্র ও অভাবী প্রকাশ করিয়া ভিক্ষা করে; অভাবী না হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে অভাবীদের দলভুক্ত করে।

ইমাম গায়যালী (রহঃ) বলেন, সওয়াল করার নিষিদ্ধতা অনেক রেওয়াযাতে বর্ণিত হইয়াছে এবং অত্যন্ত কঠোর ধর্মকিসমূহ হাদীসে আসিয়াছে। কিন্তু সেই সঙ্গে অনেক হাদীস দ্বারা সওয়ালের অনুমতিও জানা যায়। এই সম্পর্কে স্পষ্ট বর্ণনা এই যে, এমনিতে সওয়াল করা তো হারাম; কিন্তু অপারগ অবস্থায় অথবা এমন প্রয়োজনে যাহা অপারগতার কাছাকাছি হয়, তখন সওয়াল করা জায়েয। আর যদি এই দুই অবস্থা না হয়, তবে হারাম। হারাম হওয়ার কারণ এই যে, সওয়াল করার দ্বারা তিনটি বিষয় প্রকাশ পায় আর তিনটি বিষয়ই হারাম। প্রথমতঃ ইহাতে আল্লাহ তায়ালার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রকাশ করা হয়; যেন তাহার পক্ষ হইতে নেয়ামত দানে কম করা হইয়াছে। যেমন, কোন গোলাম যদি কাহারও নিকট সওয়াল করে, তবে ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, মনিবের পক্ষ হইতে যেন গোলামকে কম দেওয়া হয়। এই কারণে খুব বেশী অপারগ না হইলে সওয়াল করা হালাল না হওয়া উচিত। যেমন মৃত খাওয়া খুব বেশী অপারগ অবস্থায় হালাল হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ উহাতে সওয়ালকারী ব্যক্তির নিজেকে আল্লাহ ছাড়া অন্যের সামনে বেইযযত করা হয়। অথচ মুমিনের শান হইল, নিজেকে আল্লাহ ছাড়া অন্যের সামনে বেইযযত না করা। অবশ্য পাক মাওলার সম্মুখে নিজেকে বেইযযত করা, নিজের সম্মানেরই নামান্তর। কেননা, মাহবুবের সম্মুখে বেইযযত ও ছোট হওয়া মজার বিষয় এবং মনিবের সম্মুখে বিনয় প্রকাশ করা সৌভাগ্যের বিষয়। তৃতীয়তঃ—অধিকাংশ সময় সওয়ালের মধ্যে ঐ ব্যক্তিকে কষ্ট দেওয়া হয়, যাহার নিকট সওয়াল করা হয়। অনেক সময় দাতার মন স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয় না, শুধু লজ্জা ইত্যাদির কারণে স্বরচ করে। অতএব, যদি সে লজ্জার কারণে অথবা লৌকিকতার খাতিরে দেয়, তবে ইহাও গ্রহিতার উপর হারাম। আর দাতা যদি দিতে অস্বীকারও করে তবুও অনেক সময় এই কারণে তাহার কষ্ট হইবে যে, সে বাহ্যতঃ কৃপণ সাব্যস্ত হইল। এই জন্য সর্বাবস্থায় সওয়ালের মধ্যে কষ্ট দেওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে, যাহার কারণ এই সওয়ালকারী ব্যক্তি হইল। আর একান্ত অপারগ না হইলে, কষ্ট দেওয়া হারাম। যখন সওয়াল সম্পর্কে এই বিষয় পুরাপুরি বুঝে আসিয়া গেল, তখন এই কথাও স্পষ্ট হইয়া গেল যে, ছুর সাপ্লাপ্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হইতে সওয়াল সম্পর্কে এত কঠিন ধর্মকি কেন বর্ণিত হইয়াছে।

হযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমাদের নিকট সওয়াল করিবে, আমরা তাহাকে দিয়া দিব। (আমরা কেন দিতে অস্বীকার করিব? সওয়ালকারী নিজেই তো তাহার সওয়ালের বৈধতার জিম্মাদার)। আর যে অমুখাপেক্ষী হয় (অর্থাৎ সওয়াল করে না বা আল্লাহ তায়ালার নিকট সচ্ছলতা চায়), আল্লাহ তায়াল তাহাকে সচ্ছল করিয়া দেন। আর যে আমাদের নিকট সওয়াল করে না, সে আমাদের নিকট ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক প্রিয় যে সওয়াল করে।

অন্য এক হাদীসে হযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা মানুষের নিকট হইতে অমুখাপেক্ষী থাক। সওয়াল যতই কম হয় ততই ভাল।

হযরত ওমর (রাযিঃ) এক সওয়ালকারীকে মাগরিবের পর সওয়াল করিতে দেখিলেন। তিনি কাহাকেও বলিয়া দিলেন যে, তাহাকে খানা খাওয়াইয়া দাও। তৎক্ষণাৎ সে হুকুম পালন করিল এবং খানা খাওয়াইয়া দিল। হযরত ওমর (রাযিঃ) পুনরায় ঐ ব্যক্তির সওয়ালের আওয়াজ শুনিলেন। তখন তিনি সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম যে, এই ব্যক্তিকে খানা খাওয়াইয়া দাও। সে আরজ করিল, আমি খাওয়াইয়া দিয়াছি। হযরত ওমর (রাযিঃ) ঐ সওয়ালকারীর দিকে তাকাইয়া দেখিলেন যে, তাহার বগলে একটি ঝুলি রহিয়াছে। যাহাতে অনেকগুলি রুটি ছিল। হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, তুমি সওয়ালকারী নও ; বরং ব্যবসায়ী। অর্থাৎ তুমি দরিদ্র নও ; বরং ব্যবসার জন্য ভিক্ষা কর—যাহাতে এইভাবে রুটি জমা করিয়া বিক্রয় করিতে পার। এই বলিয়া তিনি তাহার ঝুলিটি ছিনাইয়া লইয়া সদকার উটের সামনে উল্টাইয়া দিলেন। অতঃপর তাহাকে চাবুক মারিয়া বলিলেন, পুনরায় কখনও এইরূপ করিও না।

ইমাম গায়যালী (রহঃ) বলেন, যদি সওয়াল করা হারাম না হইত, তবে হযরত ওমর (রাযিঃ) তাহাকে মারিতেন না এবং তাহার রুটিগুলি ছিনাইয়া লইতেন না। কেহ কেহ এই ব্যাপারে আপত্তি তুলিয়াছে যে, হযরত ওমর (রাযিঃ) এর মারা সতর্কতা ও শিক্ষা দেওয়ার জন্য তো হইতে পারে কিন্তু তাহার মাল ছিনাইয়া লওয়া জুলুম হইয়াছে ; শরীয়ত কাহারও মাল ছিনাইয়া লওয়ার শাস্তি—বিধান দেয় নাই। কিন্তু এই আপত্তি প্রকৃত বিষয় না জানার কারণে পয়দা হইয়াছে। হযরত ওমর (রাযিঃ) এর জ্ঞানের গভীরতা পর্যন্ত পৌছা অন্যদের জন্য কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে? হযরত ওমর (রাযিঃ) সম্পর্কে কি ধারণা হইতে পারে যে, তাহার

এই মাসআলা জানা ছিল না যে, অন্যের মাল ছিনাইয়া লওয়া জায়েয নাই? অথবা তাহার সম্পর্কে এই ধারণাও কি হইতে পারে যে, মাসআলা জানা সত্ত্বেও একটি হারাম কাজের উপর অর্থাৎ সওয়াল করার উপর গোস্বা হইয়া গিয়াছেন এবং নাউজুবিল্লাহ গোস্বার কারণে এইরূপ করিয়া বসিয়াছেন। কিংবা সওয়াল করা হইতে লোকটিকে ভবিষ্যতে বিরত রাখিবার উদ্দেশ্যে তিনি এমন পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, যাহা নাজায়েয ছিল? যদি এইরূপ হইয়া থাকে, তবে স্বয়ং এই কাজটি নাজায়েয ছিল। আসল ব্যাপার এই ছিল যে, যখন লোকটি বিনা প্রয়োজনে সওয়াল করিল এবং দাতাগণ তাহাকে দরিদ্র ও অভাবী মনে করিয়া দিল, তখন এইসব মাল ধোকা দিয়া হাসিল করার কারণে সে উহার মালিক হয় নাই। আর এখন আসল মালিকদের খোঁজ পাওয়া মুশকিল বিধায় ইহা লুকতা (হারানো বস্তু)—এর পর্যায়ে ছিল, যাহার মালিক পাওয়া যায় না। এই জন্য উহার খরচের খাত (বাইতুল-মালের) সাধারণ কল্যাণই হইতে পারে। সেইহেতু সদকার উটগুলিকে খাওয়াইয়া দিয়াছেন। এই ফকীরের সওয়াল করা এমন হইয়াছে, যেমন কোন গুনাহগার ব্যক্তি নিজেকে সুফী দরবেশ প্রকাশ করিয়া সদকার মাল গ্রহণ করে; যদি দাতা তাহার অবস্থা জানিতে পারে, তবে কখনও দিবে না। এইরূপ ব্যক্তির জন্য লওয়া জায়েয নয়। তাহার জন্য জরুরী হইল, উহা মালিকের নিকট ফেরত দিয়া দিবে।

যখন এই কথা সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছে যে, সওয়াল করা শুধু প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই জায়েয রহিয়াছে, কাজেই এখন ইহা বুঝিয়া লইতে হইবে যে, প্রয়োজনের চারটি স্তর রহিয়াছে। প্রথম—একেবারে অপারগতার স্তর। দ্বিতীয়—কঠিন প্রয়োজন; কিন্তু ইহা একেবারে অপারগতার স্তর হইতে কম। তৃতীয়—মামুলী প্রয়োজন। চতুর্থ—প্রয়োজন না থাকা। প্রথম স্তর—যেমন কোন ব্যক্তি এইরূপ যে, ক্ষুধার কারণে অথবা অসুস্থতার কারণে তাহার ধ্বংস হইবার বা মারা যাওয়ার আশংকা রহিয়াছে। অথবা এইরূপ বিবস্ত্র অবস্থায় আছে যে, তাহার নিকট শরীর ঢাকিবার কোন পোশাক নাই। তখন এইরূপ ব্যক্তির জন্য সওয়াল করা জায়েয।^১ তবে শর্ত এই যে, জায়েয হওয়ার আরও যে কয়েকটি শর্ত রহিয়াছে, উহা পাওয়া যাইতে হইবে। সেইগুলি এই—(ক) যে জিনিস চাহিবে, উহা যেন জায়েয জিনিস হয়। (খ) যাহার

১. বরং কোন কোন অবস্থায় ওয়াজিব। আর একেবারে নিরুপায় ব্যক্তির জন্য অনুমতি ব্যতিরেকে লওয়াও কোন কোন সময় জায়েয।—যাকারিয়া

নিকট চাহিবে, সে যেন সন্তুষ্টচিত্তে দিতে রাজি হয়। (গ) সওয়ালকারী যেন উপার্জন করিতে অক্ষম হয়। যদি সে উপার্জন করিতে সক্ষম হয়, তবে সে বেহুদা লোক ; উপার্জন না করিয়া সওয়াল করিতেছে। অবশ্য যদি কোন তালেবে এলেম হয়, যে নিজের সময়কে এলেম হাসিল করার মধ্যে মশগুল রাখে, তাহার জন্য সওয়াল করা দোষের কিছু নয়।

আর চতুর্থ স্তর হইল প্রথম স্তরের সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি এমন জিনিসের সওয়াল করে, যে জিনিস তাহার কাছে আছে। যেমন কাপড়ের সওয়াল করে ; অথচ প্রয়োজন পরিমাণ কাপড় তাহার কাছে আছে। এমন ব্যক্তির জন্য সওয়াল করা হারাম। এই দুই স্তর তো হইল একটি অপরটির বিপরীত। ইহার মাঝখানে দুইটি স্তর রহিয়াছে। তন্মধ্যে একটি কঠিন প্রয়োজনের স্তর। যেমন, কোন ব্যক্তি অসুস্থ এবং ঔষধের জন্য তাহার নিকট মূল্য নাই। কিন্তু রোগ এমন নয় যে, ধবংসের পর্যায়ে পৌঁছবার আশংকা রহিয়াছে। অথবা কাহারও নিকট কাপড় তো আছে ; কিন্তু উহা দ্বারা শীত হইতে পুরাপুরি রক্ষা হয় না। এই স্তরও এমন যে, এই অবস্থায় সওয়াল জায়েয হওয়ার অবকাশ আছে ; কিন্তু এই ক্ষেত্রেও সওয়াল না করাই উত্তম। এমন ব্যক্তি যদি সওয়াল করে, তবে উহাকে 'নাজায়েয' অথবা 'মাকরুহ' তো বলা যাইবে না, তবে 'উত্তম নয়' বলা যাইবে। এই ক্ষেত্রেও নিজের সওয়ালের ধরনটি প্রকাশ করিয়া দিতে হইবে। যেমন, এইরূপ বলিবে যে, আমার নিকট কাপড় তো আছে ; কিন্তু উহা শীতের জন্য যথেষ্ট নয়। প্রয়োজনের চাইতে বেশী যেন প্রকাশ না করে।

দ্বিতীয় স্তর হইল, কম প্রয়োজনের। যেমন, তাহার নিকট রুটির মূল্য তো আছে ; কিন্তু তরকারীর মূল্য নাই। অথবা পুরাতন বা ছেঁড়া কাপড় আছে ; তবু সে এমন দুই একটি জামা বানাইতে চায়, যাহা সে বাহিরে যাওয়ার সময় অন্যটির উপর পরিধান করিবে। যাহাতে মানুষের নিকট পুরাতন কাপড়টি প্রকাশ না পায়। এইরূপ ব্যক্তির জন্য সওয়াল করা জায়েয তো হইবে ; কিন্তু মকরুহ হইবে। তবে এই শর্তে যে, যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই সে প্রকাশ করে। আর যদি উপরে উল্লেখিত তিন বিষয়ের মধ্য হইতে কোন বিষয় পাওয়া না যায়, অর্থাৎ এক, আল্লাহ তায়ালার বিরুদ্ধে অভিযোগ না হয়। অর্থাৎ এমনভাবে সওয়াল করা যাহার মধ্যে অভিযোগ বুঝা যায় না। দ্বিতীয়, নিজের অপমান না হয়। তৃতীয়, যাহার নিকট সওয়াল করে, তাহার কষ্ট না হয়। যদি বলা হয় যে, এই তিন অবস্থা হইতে মুক্ত হওয়ার কি ব্যবস্থা আছে। ইহার উত্তর এই যে,

অভিযোগ হইতে খালি হওয়ার পছন্দ হইল, আল্লাহ তায়ালার শোকরও যেন সাথে প্রকাশ করা হয় এবং নিজের প্রয়োজন না থাকার কথাও যেন প্রকাশ করা হয়। ভিক্ষুকদের মত সওয়াল করিবে না। বরং এইরূপ বলিবে যে, প্রয়োজন তো নাই; আল্লাহর শোকর যে, প্রয়োজন পরিমাণ আমার আছে কিন্তু এই নফস একটি ভাল কাপড়ের খাহেশ করে। আর অপমান হইতে বাঁচিবার পছন্দ এই যে, নিজের পিতা ভাই অথবা কোন এইরূপ বন্ধুজনের নিকট সওয়াল করিবে, যাহার সম্পর্কে এই ধারণা হয় যে, এই সওয়ালের কারণে তার দৃষ্টিতে অপমানিত হইবে না। অথবা এমন ভদ্র দানশীল ব্যক্তির নিকট সওয়াল করিবে, যে প্রচুর দান-খয়রাত করিয়া থাকে এবং তাহার নিকট সওয়াল করিলে সে আনন্দিত হয়। আর কষ্ট দেওয়া হইতে বাঁচিবার পছন্দ হইল, যেমন বিশেষ কোন কিছু সওয়াল কাহারো নিকট করিবে না। বরং সাধারণভাবে সওয়াল করিবে। অথবা এমনভাবে সওয়াল করিবে যে, যদি ঐ ব্যক্তি না দিতে চাহে, তবে সহজেই না দিয়া পারে।

আর ইহা বুঝিয়া লওয়া চাই যে, যে জিনিস দাতা লজ্জার কারণে অথবা জবরদস্তির কারণে বাধ্য হইয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও দিয়াছে, উহা লওয়া সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। ইহা এমনি হইল, যেমন কোন ব্যক্তির সম্পদ তাহাকে মারধর করিয়া জোরপূর্বক ছিনাইয়া লওয়া হইল। কারণ, কোন ব্যক্তির বাহ্যিক দেহের উপর আঘাত করা আর অন্তরকে তিরস্কার ও লজ্জার চাবুক দ্বারা আঘাত করা সমান বিষয়। অবশ্য, চরম পর্যায়ের অপারগ ব্যক্তির জন্য এই হক রহিয়াছে যে, সন্তুষ্টিচিন্তে না দিলেও লইয়া লইবে। কিন্তু খেয়াল রাখিতে হইবে, বিষয়টি আহকামুল-হাকেমীনের সহিত সম্পর্কিত। সমস্ত অবস্থা তাহার সম্মুখে স্পষ্ট, তিনি সকলের অবস্থা খুব ভালো করিয়া জানেন। এমনিভাবে, ঐ সমস্ত বন্ধুদের নিকট সওয়াল করিবার মধ্যেও কোন দোষ নাই, যাহাদের সম্পর্কে এই অনুমান হয় যে, সওয়াল করার দ্বারা তাহারা আনন্দিত হইবে। (এহইয়া)

আল্লামা জুবাইদী (রহঃ) বলেন, উপরে বর্ণিত ধর্মক ও সতর্কবাণীসমূহের মধ্যে সওয়াল দ্বারা নিজের জন্য সওয়াল করাকে বুকানো হইয়াছে। যে সওয়াল অন্য কাহারও জন্য করা হয়, উহা এই ধর্মকি ও সতর্কবাণীর অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং উহা ঐ ব্যক্তির সহযোগিতা। এমনিভাবে, ইহাও সওয়ালের অন্তর্ভুক্ত নয়, যাহা নিজের জন্য হয় এবং নিজের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুজনের নিকট করা হয়। কারণ, তাহারা উহাতে আনন্দিত হয়। (এতহাফ)

কিন্তু শর্ত হইল, এই সওয়াল এইরূপ জায়গায় হইতে হইবে, যেখানে আত্মীয়-স্বজন সওয়াল করিলে আনন্দিত হয়। আর যেখানে এইরূপ না হয়, সেখানে তো আত্মীয়-স্বজনকে কষ্ট দেওয়া আরও বেশী কঠিন বিষয়। অবশ্য, যে সকল আত্মীয়-স্বজন দানশীল হয়, তাহারা এইসব সওয়ালে আনন্দিত হইয়া থাকে। এই বিষয়ে স্বয়ং আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা রহিয়াছে এবং বহু ঘটনা ইহার সাক্ষী রহিয়াছে। আমার মায়ের একজন আপন খালা আছেন, যিনি আজও জীবিত আছেন।^১ আমার শৈশব কাল হইতে তাহার নিয়ম ছিল— আমি যখনই কান্ধেলার সফরে যাইতাম, প্রতিবারে তিনি আমাকে দুই পয়সা করিয়া দিতেন। যখন আমি সন্তান-সন্ততির পিতা হইয়া গেলাম আর তিনি আমার সন্তানদেরকেও দুই দুই পয়সা দিতে শুরু করিলেন তখন আমি অনেক পীড়াপীড়ি করিয়া আমার জন্য দুই পয়সার স্থলে চার পয়সা নির্ধারণ করাইলাম এবং এই বলিয়া করাইলাম যে, তুমি আমাকে এবং আমার সন্তানদেরকে একই স্তরে রাখিতেছ? আমার সর্বদা স্মরণ থাকিবে যে, আমার এই চার পয়সা দাবী করা তাহার জন্য এতই আনন্দের কারণ হয় যে, তাহার এই আনন্দ দেখিয়া আমারও আনন্দ হয়। এমনকি, কখনও এমনও হইয়াছে যে, তাহার নিকট ঐ সময় কিছু নাই; তখন আমি নিজেই তাহাকে কিছু নজরানা দিয়াছি। যাহাতে উহা হইতে তিনি আমার পয়সা আমাকে প্রদান করেন। কারণ, আমার পয়সা হইতে দেওয়ার মধ্যেও তিনি তদ্রূপ আনন্দ বোধ করিতেন আর এইদিকে মোটেও ভ্রক্ষেপ করিতেন না যে, ইহা আমি তাহারই পয়সা হইতে দিতেছি।

এমনিভাবে, আমার পিতার একজন আপন মামু মাওলানা শামসুল হাসান সাহেব (রহঃ) ছিলেন। তাঁহার সবসময়ের অভ্যাস ছিল তিনি প্রত্যেক সফরে আমাকে এক টাকা করিয়া দান করিতেন। যখন আমার সন্তান-সন্ততি হইয়া গেল, তখন তিনি আমার স্থলে এই দান আমার সন্তানদেরকে দিতে লাগিলেন। আমি জ্বরদস্তি করিয়া আমার এই টাকা পুনরায় চালু করাইয়াছি। আমি তাহাকে বলিয়াছি, বাচ্চাদেরকে আপনি দেন বা না দেন আমি উহার জিম্মাদার নহি, আমার টাকা বন্ধ হইবে না। বিষয়টি আমার সর্বদা স্মরণ থাকিবে। যখনই তাহার কথা আমার স্মরণ হয়, তখনই আমি তাহার জন্য দোয়া করি, যেন আল্লাহ তায়ালা তাহাকে

১. (মূল কিতাবের) মুদ্রণের সময় ইতিকাল হইয়া গিয়াছে; আল্লাহ তায়ালা তাহাকে মাফ করুন। পাঠকদের নিকট তাহার মাগফেরাতের জন্য দোয়ার দরখাস্ত রহিল।

মাফ করিয়া উচ্চ মর্যাদা অনুযায়ী তাহাকে অপরিমিত বদলা দান করেন। আমার এই দাবীর কারণে তাহার কি যে আনন্দ হইত, অধিকাংশ সময় তিনি আওয়াজ করিয়া হাসিতেন এবং বারবার আমার ঐ বাক্যকে আওড়াইতেন—‘জ্বী হাঁ ; আমার টাকা বন্ধ হইবে না।’ আমি বলিতাম, কখনও বন্ধ হইবে না। আমার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের সহিত এই ধরনের আরও ঘটনা ঘটিয়াছে। ইহা আমি এইজন্য লিখিলাম যে, আজকাল পরস্পর সম্পর্ক বিশেষতঃ আবদারপূর্ণ সম্পর্ক সাধারণভাবে এমন খারাপ হইয়া যাইতেছে যে, এখন এই কথা চিন্তা করাও কঠিন হইয়া যাইবে যে, আত্মীয়-স্বজনদের নিকট কিছু চাওয়া আনন্দের কারণও হইতে পারে।

দ্বিতীয় বিষয় আল্লামা জুবাইদী (রহঃ) ইহা লিখিয়াছেন যে, যদি অন্যের জন্য কেহ সওয়াল করে, তবে উহা সওয়ালের অন্তর্ভুক্ত নয় ; ইহা সর্বজনবিদিত। প্রথম পরিচ্ছেদে যেই সমস্ত রেওয়ায়াত অন্য কাহারও সাহায্য-সহযোগিতার ব্যাপারে বর্ণিত হইয়াছে, উহা এই বিষয়ের জন্য প্রমাণস্বরূপ।

এমনিভাবে, এলেম তলব করার মধ্যে মগ্ন থাকার বিষয়টি সওয়ালের অপমান অপেক্ষা বেশী গুরুত্বপূর্ণ। মোল্লা আলী কারী (রহঃ) নকল করিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি উপার্জন করিবার ক্ষমতা রাখে এবং এলেমের মধ্যে মগ্নতার কারণে উপার্জন করে না, তবে তাহার জন্য যাকাত লওয়াও জায়েয এবং নফল দান-সদকা লওয়াও জায়েয। আর যদি ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নফল এবাদতসমূহে মগ্ন থাকা কারণে কেহ উপার্জন না করে, তবে তাহার জন্য যাকাতের মাল সওয়াল করা জায়েয নয় ; তবে নফল সদকা খয়রাতের ব্যাপারে সওয়াল করিতে দোষ নাই ; যদিও মাকরুহ হইবে। আর যদি কোন জামাআত নফসের এসলাহ ও আত্মার সংশোধনের জন্য সমবেত হয়, তবে উত্তম হইল, কোন এক ব্যক্তি তাহাদের সকলের জন্য রুটি কাপড়ের ব্যবস্থা করিবে। (মেরকাত)

এলেমের মধ্যে মগ্ন থাকা—চাই উহা জাহেরী এলেম হউক অথবা বাতেনী এলেম হউক, নিশ্চিতভাবে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং এইরূপ লোকদের জন্য অন্য কোন কাজে মগ্ন হওয়া কিছুতেই উচিত নয়। শুধু মূর্খ ও আহমক লোকদের সমালোচনার ভয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের সহিত কামাই-উপার্জন ইত্যাদির মধ্যে লাগিয়া যাওয়া প্রকৃতপক্ষে মূর্খদের সমালোচনার ভয়ে নিজের মূল্যবান সময়কে নষ্ট করার নামান্তর। মূর্খদের সমালোচনা হইতে না আলেমগণ কখনও রক্ষা পাইয়াছেন, আর

না নবীগণ রক্ষা পাইয়াছেন। আজকাল এই মহামারী অনেক ব্যাপক হইয়া যাইতেছে যে, আলেমদেরকে নিজেদের জীবিকা নির্বাহের জন্য কোন শিল্প বা কারিগরী কাজ শিক্ষা করা জরুরী। আলেমগণও দুনিয়াদারদের সমালোচনার কারণে অতীষ্ঠ হইয়া ইহার গুরুত্ব অনুভব করিতেছেন এবং দ্বীনী মাদ্রাসাসমূহে এই বিষয়সমূহও চালু হইতেছে। কিন্তু ইহা এলেমের জন্য অনেক বেশী ক্ষতিকর। ইহার পক্ষে অতীতের ঐ সমস্ত বুয়ুর্গগণের নমুনা পেশ করা হয়, যাঁহারা নিজেদের জীবিকার জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি কাজ অবলম্বন করিয়া দ্বীন ও এলেমের খেদমত করিয়াছেন। আর নিঃসন্দেহে যদি আল্লাহ তায়ালা তওফীক দান করেন, তবে ইহা অত্যন্ত উত্তম তরীকা। কিন্তু আমাদের অন্তর এবং আমাদের শারীরিক শক্তি ও আমাদের অবস্থা ইহার ক্ষমতা রাখে না যে, আমরা দুইটি কাজ এক সময়ে করিতে পারি। আর না আমাদের নফসের লোভ এবং দুনিয়ার মহব্বত ইহার সুযোগ দেয় যে, ধন-সম্পদ বাড়িয়া যাওয়ার উপায়-উপকরণ সামনে আসিয়া যাওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর কাজের জন্য দ্বীনের খাতিরে, এলেমের খাতিরে আমরা আমাদের সময়কে দুনিয়া কামাই করার ব্যস্ততা হইতে বেশী হইতে বেশী সময় বাহির করিতে পারি। অবস্থা শেষ পর্যন্ত এই হয় যে, প্রথম প্রথম উভয় কাজ শুরু করিল এবং শেষে এলেম চর্চায় মশগুল থাকার উপর দুনিয়ার কামাই ও লোভ প্রাধান্য লাভ করিল। বারবার ইহা পরীক্ষিত হইয়াছে।

ইমাম গাখযালী (রহঃ) এলেম তলব করার যে দশটি আদব লিখিয়াছেন, উহার মধ্যে লিখিতেছেন, চতুর্থ আদব হইল, দুনিয়ার মধ্যে মগ্ন হওয়াকে অনেকাংশে কামাইয়া দিতে হইবে এবং নিজের আত্মীয়-স্বজন ও দেশ হইতে দূরে চলিয়া যাইতে হইবে। কারণ, অধিক সম্পর্ক ব্যস্ততার কারণ হয় এবং ইহা উদ্দেশ্য হইতে সরাইয়া দেয়। আর আল্লাহ তায়ালা কোন মানুষের জন্য দুইটি দিল বানান না (যে, একটি দিল এলেমের মধ্যে মশগুল থাকিবে আর অপরটি দুনিয়া কামাইয়ের মধ্যে) ইহা দ্বারা কুরআন পাকের আয়াত (আহযাব : ৪) مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قُلُوبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ এর দিকে ইশারা করা হইয়াছে। যত বেশী নিজের চিন্তা-ফিকিরকে বিক্ষিপ্ত জিনিসের মধ্যে মগ্ন করিবে, ততই এলেমের প্রকৃত রহস্য হইতে দূরে থাকিবে। এইজন্যই বলা হইয়াছে—এলেম তোমাকে নিজের সামান্য অংশ ঐ সময় দিবে, যখন তুমি নিজেকে সম্পূর্ণ এলেমের জন্য উৎসর্গ করিয়া দিবে। যে চিন্তা-ফিকির বিক্ষিপ্ত বিষয়ের মধ্যে ছড়াইয়া থাকে, উহার উদাহরণ ঐ পানির নালার মত

যাহার বালতি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সুতরাং উহা হইতে পানি এদিক-সেদিকে পড়িয়া যাইবে এবং ক্ষেতের মধ্যে খুব কমই পৌছিবে। (এইইয়া) কিন্তু উহার সহিত ইহাও জরুরী যে, বাস্তবিকই এলেম হাসিল করা উদ্দেশ্য হইতে হইবে। কেবল রুটি খাওয়া এবং সদকার মাল যাহা মানুষের ময়লা স্বরূপ; উহা জমা করা উদ্দেশ্য না হয়।

ইমাম গাযযালী (রহঃ) ঐ সমস্ত ধর্মকির বিষয়—যাহা মন্দ আলেমদের সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে—উল্লেখ করিবার পর লিখেন যে, ইহা দ্বারা জানা গেল, দুনিয়াদার আলেম অবস্থা হিসাবে অনেক বেশী নিচু প্রকৃতির এবং আযাবের দিক দিয়া জাহেল অপেক্ষা অনেক বেশী শাস্তির উপযুক্ত। আর প্রকৃত কামিয়াব ও সফলকাম শুধু ঐ সমস্ত আলেমগণই যাহারা আখেরাতের আলেম। আখেরাতের আলেমের জন্য কিছু আলামত রহিয়াছে, যেগুলির মধ্য হইতে প্রথম এই যে, নিজের এলেম দ্বারা দুনিয়া কামাই করা উদ্দেশ্য না হয়। আলেমের সবচেয়ে নিম্ন স্তর হইল, দুনিয়ার তুচ্ছতা, দুনিয়ার নিচতা, দুনিয়ার অপবিত্রতা এবং উহার ক্ষণস্থায়ীত্ব আলেমের সম্মুখে সর্বদা উপস্থিত থাকে। সে আখেরাতের বড়ত্ব, উহার স্থায়িত্ব, উহার উৎকৃষ্টতা, আখেরাতের নেয়ামতসমূহের পবিত্রতা, উহার উচ্চ মর্যাদা অর্জনকারী হয় এবং এই কথা ভাল করিয়া বুঝে যে, দুনিয়া ও আখেরাত দুই সতীন—যখন সে একজনকে রাজি করিবে তখন দ্বিতীয়জন নারাজ হইবে। (যেমন হাদীসের মধ্যেও এই বিষয়টি বর্ণিত হইয়াছে) আর ইহা বুঝিবে যে, দুনিয়া ও আখেরাত নিজের দুই পাল্লার ন্যায়। যে কোন একটিকে ঝুকাইবে, দ্বিতীয়টি উপরে উঠিয়া যাইবে। যে ব্যক্তি দুনিয়ার তুচ্ছতা না বুঝে, তাহার জ্ঞানবুদ্ধি নষ্ট, সে আলেমগণের মধ্যে কিভাবে গণ্য হইতে পারে?

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, আলেমদের শাস্তি হইল, অন্তর মরিয়া যাওয়া। অন্তর মরিয়া যাওয়ার আলামত হইল, আখেরাতের আমল দ্বারা দুনিয়া তলব করা (অর্থাৎ দ্বীনের কাজ দুনিয়ার ধন-সম্পদ বা ইজ্জত-সম্মানের জন্য করা।)

এইইয়া ইবনে মুয়াজ্জ (রহঃ) বলেন, এলেম ও হেকমতের সৌন্দর্য ও শোভা চলিয়া যায়—যখন উহা দ্বারা দুনিয়া কামাই করা হয়।

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রহঃ) বলেন, যখন আলেমকে আমীর-উমারাদের দরবারে দেখিবে, তখন তাহাকে চোর মনে করিবে।

হযরত ওমর (রাযিঃ) বলেন, যখন কোন আলেমকে দুনিয়ার সহিত মহব্বত রাখিতে দেখ, তখন তাহাকে নিজের দ্বীনের ব্যাপারে দোষযুক্ত

منے کریدو۔ کارن، مانوہ یہ جنیسکے مہربت کرے، اہار مانوہ
دکریا تھے۔ (اھایا)

اتھ، اہا کروری یہ، آلمگن ین نیجہدہر نھسکے سبسم
دوہی منے کرت: کٹورہاے اہار اڑی دھڑی رانہن۔ سبسم اہ
فیکرے ابرہائی تھاکا اہی، ین کھنڈ دنیار مہربت، اہا سب
گونہہر مھل اڈاڈے شیکڈ گاڈیا نا بے۔ آہر دنیار اڑی
اناسکے برہن ھنا اڈتے ریرپک اہی یااوار ر نا سواال کرا
مڈھ کھتی آھے، نا دان-سدکا و یاکات لوار مڈھ کون کھتی
آھے۔ برہن سدکاکاریدہر ھوڈھن-دایر اہیل یہ، تھارا ین
ولامانگکے اڈاڈیکار دے۔ ینن اڑیپورے سدکا آدایکاریدہر
آدبسموہر ریرنہنہنہن اڑی اہی اہی۔ آلاہ تالالا اہی ناہک
دنیار کورکے و ین اہی ھنسااڑک رانہن اہی مڈھ دان کرہن
کھننا، دنیار موہ امان ھنسااڑک بیاڈی، اہا ہیرے ہیرے اڑی
کرتے تھے۔ آہر اہا ھوڈھ سبسم اڈال کرار مڈھ اہی نہن نہن
برہن سبسم اڈال کرار بیاڈے سبسمدہر اہی و ہشی کھتگتہ
بڈھ پاہتے تھے۔ آہر دینی ریربہشے اہی رانہن دنیار موہ
اڈاڈا و ہشی اڑی لاد کرے۔

عَلِيمٌ بِنِ جَزَامٍ فَرَاتِے مِے کِے مِے خُورِ
سے سوال کیا خُورِ نے عطا فرمایا۔ مِے نے
پھر مانگا، خُورِ نے پھر عطا فرمایا۔ اس کے
بعد ارشاد فرمایا کہ اے عليم۔ مال سرسبز مٹی
چیز ہے یعنی خوشنما ہے دیکھنے میں لذت ہے
دلوں میں۔ پس جو شخص اس کو نفس کی عطا
(یعنی استغناء) سے لیتا ہے اس کیلئے تو اس
میں برکت دی جاتی ہے، اور جو اس کو شرافت
نفس (یعنی حرص اور طمع جیسا کہ آئندہ حدیث
کے ذیل میں آئے گا) کے ساتھ لیتا ہے اس
کے لئے اس میں برکت نہیں ہوتی وہ ایسا
ہے جیسا کوئی (بھوکا کامیٹھ کر) کھاتا ہے

۲) عَنْ حَكِيمٍ بِنِ جَزَامٍ
قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِي ثُمَّ
سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ يَا حَكِيمُ
إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ مُخْلَوٌ
فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةٍ نَفْسٍ
بُورِكَ لَدَيْهِ وَمَنْ أَخَذَهُ
بِإِسْطِفَافِ نَفْسٍ لَمْ يَبَارِكْ لَهُ
فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ
وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ
مِّنَ الْيَدِ السُّفْلَى قَالَ حَكِيمٌ
فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي

بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرْنَا أَحَدًا
 بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أَفَارِقَ الدُّنْيَا
 اور پیٹ دمجہ۔ اور پرکا ماتہ نیچے
 ماتہ بہتر ہے (یعنی نہ مانگے والا ماتہ،
 مانگنے والے سے اچھا ہے) حکیم فرماتے ہیں
 میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! قسم ہے اس فات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے لب آپ
 کے بعد مرنے تک کسی کسی کو نہیں تکلیف دوں گا۔

③ হাকীম ইবনে ইবনে হেজাম (রাযিঃ) বলেন, আমি হুমুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে চাহিলাম। হুমুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দান করিলেন। আমি আবার চাহিলাম। হুমুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার দান করিলেন। অতঃপর এরশাদ করিলেন, হে হাকীম! এই মাল সবুজ, শ্যামল, মিষ্ট বস্তু। অর্থাৎ দেখিতে সুন্দর, অন্তরে সুস্বাদু, অতএব যে ব্যক্তি উহাকে নফসের উদারতা (অর্থাৎ অমুখাপেক্ষিতা) এর সহিত গ্রহণ করে, তাহার জন্য উহাতে বরকত দেওয়া হয়। আর যে ইহাকে নফসের এশরাফ (অর্থাৎ লোভ-লালসা, যেমন সামনের হাদীসের ব্যাখ্যায় আসিবে) এর সহিত গ্রহণ করে, তাহার জন্য ইহাতে বরকত হয় না। তাহার দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কোন ব্যক্তি (ক্ষুধার রোগী অর্থাৎ) বাইতে থাকে, পেট ভরে না। উপরের হাত নিচের হাত হইতে উত্তম (অর্থাৎ যে ব্যক্তি সওয়াল করে না তাহার হাত সওয়ালকারীর হাত হইতে উত্তম।) হাকীম (রাযিঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঐ সত্তার কসম, যাহার হাতে আমার জান, এখন হইতে আপনার পর মৃত্যু পর্যন্ত কখনও কাহাকেও কষ্ট দিব না।

(মিশকাত : বুখারী, মুসলিম)

ফায়দা : অর্থাৎ এখন হইতে সারাজীবন কখনও কাহারও নিকট সওয়াল করিব না। কোন কোন রেওয়ামাতে এই হাদীসের পর এই বিষয়ও বর্ণিত হইয়াছে যে, অতঃপর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) তাহার খেলাফতের জামানায় হযরত হাকীম (রাযিঃ)কে বাইতুল-মাল হইতে তাহার প্রাপ্য অংশ দেওয়ার জন্য ডাকিতেন। তিনি উহা লইতে অস্বীকার করিয়া দিতেন। অতঃপর হযরত ওমর (রাযিঃ) এর জামানায়ও একই নিয়ম বহাল রহিল যে, তিনি হাকীম (রাযিঃ)কে তাহার অংশ দেওয়ার জন্য ডাকিতেন। তিনি লইতে অস্বীকার করিয়া দিতেন। হযরত ওমর (রাযিঃ) লোকদেরকে এই ব্যাপারে সাক্ষী বানাইলেন যে, তিনি হাকীম

(রাযিঃ) এর অংশ দেওয়ার জন্য ডাকেন আর তিনি কবুল করেন না। এইভাবে হযরত হাকীম (রাযিঃ) মৃত্যু পর্যন্ত কাহারও নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করেন নাই। (তারগীব)

অন্য এক হাদীসে আছে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বাহরাইন হইতে মাল আসিল। প্রথমে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আব্বাস (রাযিঃ)কে উহা হইতে দান করিলেন। অতঃপর তিনি হাকীম (রাযিঃ)কে ডাকিলেন এবং মুষ্টি ভরিয়া দান করিলেন। তিনি আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইহা গ্রহণ করা আমার জন্য ভাল, না খারাপ। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, খারাপ। তিনি ফেরত দিলেন এবং কসম খাইলেন যে, আমি কাহারও দান কবুল করিব না। অতঃপর হাকীম (রাযিঃ) দরখাস্ত করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার জন্য দোয়া করুন, যেন আল্লাহ তায়ালা আমাকে বরকত দান করেন। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করিলেন, আল্লাহ তায়ালা যেন তাহার হাতের কামাইতে বরকত দান করেন। (তারগীব)

হযরত মুয়াবিয়া (রাযিঃ) হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন যে, কাহারও নিকট চাওয়ার ব্যাপারে পীড়াপীড়ি করিও না। আল্লাহর কসম, যে ব্যক্তি আমার নিকট কোন কিছু চায় এবং শুধু তাহার চাহিবার কারণে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি তাহাকে কোন কিছু দেই, তবে উহাতে বরকত হইবে না।

অন্য এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তিকে আমি সন্তুষ্ট মনে কোন জিনিস দেই, উহাতে তো বরকত হইবে আর যে ব্যক্তিকে তাহার লোভ এবং সওয়ালের কারণে অসন্তুষ্টচিত্তে দেই উহা এমন, যেমন মানুষ খাইতে থাকে আর পেট ভরে না।

হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন যে, চাওয়ার ব্যাপারে পীড়াপীড়ি করিও না। যে ব্যক্তি পীড়াপীড়ি করিয়া আমার নিকট হইতে কোন জিনিস লইবে, উহাতে বরকত হইবে না। (তারগীব)

কোরআন পাকেও এই বিষয়ে সতর্ক করা হইয়াছে। যেমন এরশাদ হইয়াছে : لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ الْعَفَاءَ অর্থাৎ, লোকদের নিকট পীড়াপীড়ি করিয়া চাহে না। (বাকারা : ২৭৩)

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন যে, এই মাল সবুজ, শ্যামল ও মিষ্ট জিনিস।

অতএব, যাহাকে আমি ইহা হইতে কোন জিনিস সস্ত্র মনে এমন অবস্থায় দান করি যে, গ্রহণকারীর অবস্থা দান গ্রহণের উপযোগী হয় (অর্থাৎ দান গ্রহণের উপযুক্ত হিসাবে উত্তম হয়, জায়েয সওয়াব হয় এবং পীড়াপীড়িও নাই) আর তাহার মধ্যে লোভও নাই, তবে এই মালে তাহার জন্য বরকত দেওয়া হয়। আর যাহাকে আমি কোন জিনিস এইরূপ অবস্থায় দেই যে, আমার সস্ত্র থাকে না এবং তাহার মধ্যে গ্রহণ করার উপযুক্ততা থাকে না, তদুপরি তাহার মধ্যে লোভও থাকে, তবে উহাতে বরকত হয় না।

(তারগীব)

বরকত এমন গুরুত্বপূর্ণ এবং মূল্যবান জিনিস যে, উহা দ্বারা সামান্য জিনিসে অনেক জরুরত পূরা হইয়া যায়। পূর্বে এই ধরনের ঘটনাবলী বর্ণিত হইয়াছে যে, এক পেয়লা দুধ সুফফার বহু সাহাবীরের যথেষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহা তো বরকতই ছিল। এই যমানাতেও অনেক সময় এই ধরনের বিষয় দেখা যায়। যদিও ঐ রকম হয় না, যেরকম হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য বরকতের নমুনা জাহের হইত। আর ঐরূপ হইতেও পারে না। কিন্তু এই যমানা ও অবস্থা হিসাবে বহুবার ইহার অভিজ্ঞতা হইয়াছে যে, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে এমন বরকত দিয়া দেন যে, প্রত্যক্ষদর্শীরা আশ্চর্যান্বিত হইয়া যায়। পক্ষান্তরে, বেবরকতি এমন অভিশপ্ত জিনিস যে, যতই কামাই করিতে থাকে, কখনও যথেষ্ট হয় না। যাহার উদাহরণ, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বাণীতে কিছু পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে, বাইতে থাকে অথচ পেট ভরে না। এই বেবরকতী প্রসঙ্গে আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা, যাহা আমার বোকামীও বটে প্রকাশ করিতেছি। ছোটবেলায় আমার কবিতা প্রতিযোগিতার সখ ছিল। যেহেতু পিতার পক্ষ হইতে অত্যন্ত কঠোরতা এবং তাহার কড়া কড়ি সত্বেও এই কাজে কোন রকম বাধা ছিল না। এইজন্য আমার এই ব্যাধি উন্নতি করিতেছিল। কোন রকম অতিরঞ্জন ছাড়া প্রত্যেক ভাবার হাজারও চরণ আমার মুখস্থ ছিল, যাহা এখন নাই। আমার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যস্ততা ইহা ছিল যে, আমার বিশিষ্ট বন্ধু-বান্ধব যখন কোথাও এক জায়গায় ঘটনাক্রমে একত্রিত হইয়া যাইত, তখন এই কবিতা প্রতিযোগিতা শুরু হইয়া যাইত।

আমার শিক্ষকতার গুরুভাগে একবার এক রাত্রে অন্য কিরানা যাওয়ার সুযোগ হইল। যেখানে আমার ফুফাত ভাই যিনি আইন ব্যবসা করিতেন, তিনিও এই বিষয়ে খুব সখ রাখিতেন অথবা তিনিও এই ব্যাধিগ্রস্ত ছিলেন। আমার কারণে আরও কিছুসংখ্যক বন্ধু-বান্ধব একত্রিত

হইয়া গেল। আর নিয়ম অনুযায়ী এশার নামাযের পর এই বেকার কাজ শুরু হইয়া গেল। শীতের সময় ছিল, তিনি তিন সের দুধ এই খেয়াল করিয়া আগেই আনাইয়া রাখিয়াছিলেন যে, রাত্রে দুই তিনবার তো চায়ের পালা অবশ্যই চলিবে। কিন্তু এই মনে করিয়া যে, আরো কিছু সময় অতিবাহিত হউক, তারপর চা পাকানো হইবে—চা পাকানো শুরুই হয় নাই। আমার ধারণা অনুযায়ী আধা ঘন্টা কি পৌনে ঘন্টা অতিবাহিত হইয়া থাকিবে, আমার প্রস্রাবের প্রয়োজন হইল এবং আমি এইজন্য বাহিরে আসিলাম। তখন আকাশের পূর্বদিকে এমন তীব্র উজ্জ্বলতা দৃষ্টিগোচর হইল যে, আমি আশ্চর্যান্বিত হইয়া গেলাম। কিছুই বুঝে আসিল না যে, এই উজ্জ্বলতা কিসের? তাহারা অনুমান করিয়া বিভিন্ন রকম মন্তব্য করিতে লাগিল। এমন সময় চতুর্দিক হইতে আযানের আওয়াজ আসিতে লাগিল। ইহাতে জানা গেল যে, উহা সুবহে সাদেকের আলো। ঐ দিনটিও আশ্চর্য ও বিস্ময়কর অবস্থায় অতিবাহিত হইল যে, রাত্রি কিভাবে কাটিয়া গেল। সেইদিন হইতে এখন পর্যন্ত যখনই স্মরণ হয়, তখনই এক রকম নিস্তব্ধতা ঘিরিয়া ধরে যে, ঐ রাত্রের মধ্যে এত বেবরকতী কেন হইল। আর এখন তো যখনই ঐ রাত্রের কথা মনে আসিয়া যায়, তখন আশ্চর্য হওয়া ছাড়াও শিক্ষা ও আফসোসও হয় যে, মৃত্যুর পর দুনিয়ার পুরা জীবনটাই ঐ রাত্রের মত হইবে।

সেদিনই আমার উল্লেখিত ভাই তাহার পিতা ও আমার ফুফা মাওলানা রাজ্জিউল হাসান সাহেব (রহঃ)কে স্বপ্নে দেখিলেন, তিনি একজন বুয়ুর্গ ব্যক্তি ছিলেন এবং হযরত কুতুবে আলম মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহঃ)এর হাদীসের শাগরেদ ছিলেন। স্বপ্নে দেখিলেন—তিনি বলিতেছেন, মিঞা যাকারিয়াও কেমন বুয়ুর্গ যে, এইভাবে রাত্রি বরবাদ করিয়া দেয়। কিছুটা তাহারই আধ্যাত্মিক মনোযোগের প্রভাবে উহার পর হইতে আর কখনও এইরূপ অহেতুক কাজের সুযোগ আসে নাই। তবে কিরানার এই রাত্রি আমাকে সারাজীবন বিস্মিত ও হতবাক করার জন্য যথেষ্ট। উক্ত ঘটনা দ্বারা দুইটি বিষয় এমনভাবে বুঝে আসিয়া গিয়াছে যে, উহাতে সামান্যতম সংশয়ও বাকী থাকে নাই। এক এই যে, বুয়ুর্গদের অবস্থা ও ঘটনাবলী প্রসঙ্গে ইতিহাসে এই ধরনের কথা উল্লেখ করা হইয়া থাকে যে, তাহারা সারারাত্রি নামাযে অতিবাহিত করিয়া দিয়াছেন। এশার ওয়ু দ্বারা ফজরের নামায পড়িয়া লইয়াছেন। রাতভর মুনাজাতে কাটাইয়া দিয়াছেন। এই ধরনের যত ঘটনা রহিয়াছে, সবই যুক্তিযুক্ত। স্বাদ ও মগ্নতা নিঃসন্দেহে এমন জিনিস, যাহা হাসিল হওয়ার পর না রাতের

ফায়দা : বিভিন্ন হাদীসে এই বিষয় বর্ণিত হইয়াছে যে, চাওয়া এবং লোভ-লালসা ব্যতীত যদি কোন হাদিয়া আসে, তবে উহা কবুল করা চাই। যেহেতু উহা ফেরত দেওয়ার মধ্যে আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতকে অস্বীকার করা হয়, সেহেতু অধিকাংশ বুয়ুর্গ অনিচ্ছা সত্ত্বেও হাদিয়া কবুল করেন।

হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) বলেন, ছযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দান হিসাবে কিছু দিতেন। আমি আরজ করিতাম, ছযূর ! কোন এমন ব্যক্তিকে দান করুন, যে আমার চাইতে বেশী অভাবী। ছযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, না, লইয়া লও। যখন কোন মাল এমনভাবে আসে যে, না উহার জন্য সওয়াল করা হয় আর না উহার প্রতি লোভ ও লালসা হয়, তখন উহা লইয়া লও। অতঃপর যদি মনে চায় উহাকে নিজের কাজে খরচ কর, আর মনে না চাহিলে সদকা করিয়া দাও। আর যে মাল আপনাআপনি না আসে, উহার প্রতি মনোযোগও দিও না।

হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) এর ছেলে হযরত সালেম (রাযিঃ) বলেন, উক্ত হাদীসের কারণে হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) এর অভ্যাস ছিল, কখনও কাহারও নিকট সওয়াল করিতেন না। আর কোথাও হইতে কিছু আসিলে উহা ফেরত দিতেন না।

এই ধরনের ঘটনা হযরত ওমর (রাযিঃ) এর সহিতও ঘটিয়াছে। ছযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে কিছু দিলেন। হযরত ওমর (রাযিঃ) ফেরত দিলেন, ছযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ফেরত কেন দিলে? হযরত ওমর (রাযিঃ) আরজ করিলেন, আপনিই তো ইহা এরশাদ করিয়াছিলেন যে, আমাদের জন্য ইহাই উত্তম যে, কাহারও নিকট হইতে কোন জিনিস লইব না। ছযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, উহা দ্বারা চাহিয়া না লওয়া উদ্দেশ্য ছিল। যখন চাওয়া ছাড়া কোন জিনিস আসে, তখন উহা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে রিযিক স্বরূপ, যাহা আল্লাহ তায়ালার দান করিয়াছেন। হযরত ওমর (রাযিঃ) আরজ করিলেন, তাহা হইলে ছযূর ! ঐ মহান সত্ত্বার কসম, যাহার হাতে আমার জ্ঞান, এখন হইতে কখনও কাহারো নিকট কোন জিনিস চাহিব না এবং চাওয়া ছাড়া কিছু আসিলে উহা কবুল করিব।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমের (রাযিঃ) হযরত আয়েশা (রাযিঃ) এর খেদমতে কিছু দেয়হাম ও কিছু কাপড় কোন বাহকের মাধ্যমে পাঠাইলেন। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) ইহা বলিয়া ফেরত দিয়া দিলেন যে, কাহারও নিকট হইতে কিছু লওয়ার আমার অভ্যাস তো নাই। যখন সেই বাহক

ফিরিয়া যাইতে লাগিল ; ঘর হইতে মাত্র বাহির হইয়াছিল, তখন হযরত আয়েশা (রাযিঃ) তাহাকে আবার ডাকিলেন এবং উক্ত হাদিয়া গ্রহণ করিলেন আর বলিলেন যে, আমার একটি কথা স্মরণ আসিয়া গিয়াছে। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ইহা বলিয়াছিলেন—হে আয়েশা ! চাওয়া ছাড়া কোন জিনিস পাইলে, উহা গ্রহণ করিও ; উহা আল্লাহ তায়ালা পক্ষ হইতে রিয়িক, যাহা তোমার প্রতি পাঠান হইয়াছে। সম্ভবতঃ ইহা প্রথম দিকের ঘটনা হইবে। ইহার পর হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হাদিয়া কবুল করিতে লাগিলেন। বেশ কিছু রেওয়াজাতে অনেক সাহাবায়ে কেরাম হইতে বড় বড় অংক হযরত আয়েশা (রাযিঃ) এর খেদমতে পেশ হওয়া এবং হযরত আয়েশা (রাযিঃ) কর্তৃক উহা গ্রহণ করতঃ তৎক্ষণাৎ বস্তুটি করিয়া দেওয়া বর্ণিত হইয়াছে।

ওয়াসেল ইবনে খাস্তাব (রাযিঃ) বলেন, আমি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি ইহা এরশাদ করিয়াছিলেন যে, কাহারও নিকট কিছু চাহিবে না। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ, চাওয়া সম্পর্কে আমি বলিয়াছি ; কিন্তু চাওয়া ছাড়া যদি আল্লাহ তায়ালা কোন জিনিস দান করেন, তবে উহা গ্রহণ করিবে। উহা আল্লাহ তায়ালা পক্ষ হইতে রিয়িক। যাহা আল্লাহ তায়ালা তোমাকে দিয়াছেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) ও হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদ বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা চাওয়া ছাড়া কোন জিনিস দেন, তাহার উহা কবুল করা চাই। উহা আল্লাহ তায়ালা পক্ষ হইতে তাহার রিয়িক স্বরূপ পাঠানো হইয়াছে।

আবেদ ইবনে ওমর (রাযিঃ) ও হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে ইহাই বর্ণনা করেন—যে ব্যক্তিকে কোন রিয়িক চাওয়া ছাড়া এবং অন্তরের লোভ-লালসা ছাড়া দেওয়া হইয়াছে, উহা দ্বারা নিজের খরচের মধ্যে প্রশস্ততা পয়দা করা চাই। আর যদি স্বয়ং তাহার প্রয়োজন না থাকে, তবে কোন এমন ব্যক্তিকে দিয়া দেওয়া চাই, যে তাহার চাইতে বেশী অভাবী।

হযরত ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) এর ছেলে আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন, আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এশরাফে নফস' কি জিনিস? তিনি বলিলেন, তুমি নিজের অন্তরে এইরূপ ধারণা পোষণ কর যে, অমুক ব্যক্তি আমাকে কিছু দিবে, অমুক ব্যক্তি আবার জন্য কিছু পাঠাইবে। (তারগীব)

‘এশরাফ’ শব্দের আসল অর্থ উকি দিয়া দেখা। এশরাফে নফস এই যে, নফস উহাকে উকি দিয়া দেখিতেছে এবং উহার তাকে রহিয়াছে। যেমন হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) বলিয়াছেন—অন্তরে এই ধারণা হয় যে, এই ব্যক্তি আমাকে কিছু দান করিবে। এই কারণেই অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম উহাকে লোভ-লালসার অর্থে ব্যবহার করেন। কেননা, ইহার মধ্যেও নফসের এই খায়েশ হয় যে, আমি পাইয়া যাই।

আল্লামা আইনী (রহঃ) বলেন, এশরাফে নফসের অর্থ কোন কোন আলেম অতি মাত্রায় লোভ করা বলিয়াছেন। কোন কোন আলেম এইরূপ বলিয়াছেন যে, এশরাফে নফস এই যে, দাতা অসন্তুষ্টির সহিত দান করে।

চাওয়া ছাড়া যে জিনিস কোথাও হইতে আসে, উহা কবুল করার আদব সম্পর্কে ইমাম গায়যালী (রহঃ) লিখেন, ইহাতে চিন্তা-ফিকির করিবার তিনটি বিষয় থাকে—প্রথম : মাল ; দ্বিতীয় : দাতার উদ্দেশ্য ; তৃতীয় : গ্রহিতার উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, প্রথমে তো মাল দেখা যে, উহা কিরূপ। যদি হারাম মাল হয় অথবা সন্দেহজনক হয়, তবে উহা হইতে বাঁচিয়া থাকা জরুরী।

দ্বিতীয় জিনিস দাতার উদ্দেশ্য দেখা, সে কি নিয়তে দিতেছে অর্থাৎ হাদিয়ার নিয়তে দিতেছে—যাহা দ্বারা অন্যের দিল খুশী করা এবং তাহার মহব্বত বৃদ্ধি করা উদ্দেশ্য, অথবা সদকার নিয়তে দিতেছে অথবা নিজের খ্যাতি ও লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে দিতেছে (অথবা অন্য কোন খারাপ উদ্দেশ্যে দিতেছে যাহার বিবরণ দ্বিতীয় হাদীসে আসিতেছে)।

সুতরাং যদি শুধু হাদিয়া হয়, তবে উহা কবুল করা সুন্নত (অনেক হাদীসে হাদিয়া দেওয়া ও কবুল করার উৎসাহ বর্ণিত হইয়াছে।) তবে শর্ত হইল, ইহাতে গ্রহিতার উপর মিন্নত (অর্থাৎ অনুগ্রহ ও বোঝা) না হয়। যদি অনুগ্রহ হয়, তবে ফেরত দেওয়ার মধ্যে দোষ নাই। আর যদি হাদিয়ার পরিমাণ বেশী হওয়ার কারণে অনুগ্রহ হয়, তবে উহা হইতে কিছু পরিমাণ গ্রহণ করা এবং কিছু পরিমাণ ফেরত দেওয়ার মধ্যে দোষ নাই।

এক ব্যক্তি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে ঘি ও পনির এবং একটি দুগ্ধা পেশ করিল। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘি ও পনির কবুল করিয়া লইলেন। দুগ্ধা ফেরত দিলেন। আর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই অভ্যাস ছিল যে, কাহারও হাদিয়া কবুল করিতেন এবং কাহারও ফেরত দিয়া দিতেন। একবার হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আমার এই ইচ্ছা হয় যে, কাহারো হাদিয়া কবুল করিব না। শুধুমাত্র ঐ সমস্ত

লোকের হাদিয়া কবুল করিব, যাহারা কুরাইশী অথবা আনসারী অথবা সক্ষী অথবা দাউসী গোত্রের হইবে। (এই এরশাদের মূল কারণ এই ছিল যে, একজন বেদুইন ব্যক্তি ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে একটি উটনী পেশ করিল। ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যেহেতু হাদিয়ার বিনিময় দান করার অভ্যাস ছিল, এইজন্য উহার বিনিময়ে ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছয়টি উট তাহাকে দিলেন। কিন্তু সে ইহাকে কম মনে করিল। কেননা, সে উহা হইতেও বেশীর আশা করিয়াছিল। অতএব, সে এই ব্যাপারে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিল। যখন ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহা জানিতে পারিলেন, তখন ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াযের মধ্যে এই ঘটনা উল্লেখ করিয়া উক্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আর যাহাদের কথা পৃথকভাবে উল্লেখ করিলেন, তাহাদের একলাসের উপর ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আস্থা ছিল। (বজল)

হযরত তাবায়ীগণেরও এই ধরনের অভ্যাস সম্পর্কে অধিক হারে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহারা কোন কোন হাদিয়া কবুল করিতেন, আবার কোন কোন হাদিয়া ফেরত দিতেন। ফাত্‌হ ইবনে শাখরাফ মাওসিলী (রহঃ) এর খেদমতে কেহ পঞ্চাশ দেরহামের একটি থলি পেশ করিল। তিনি বলিলেন, আমার নিকট ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদ পৌছিয়াছে, যে ব্যক্তির নিকট চাওয়া ছাড়া কোন রিযিক আসে এবং সে উহাকে ফেরত দেয়, সে যেন আল্লাহ তাযালার রিযিককে ফেরত দিল। অতঃপর তিনি সেই থলি লইলেন এবং উহা হইতে একটি দেরহাম কবুল করিয়া বাকিগুলি ফেরত দিলেন।

হাসান বসরী (রহঃ)ও এই হাদীস বর্ণনা করেন। কিন্তু তাহার নিকট এক ব্যক্তি দেরহামের একটি থলি এবং খোরাসানের পাতলা কাপড়ের একটি গাঠরী আনিল। তিনি উহা ফেরত দিলেন এবং বলিলেন, যে ব্যক্তি এই মর্যাদার স্থানে বসে যেখানে আমি বসিয়াছি (অর্থাৎ ওয়াজ নসীহত ও হেদায়াতের মর্যাদার উপর) অতঃপর লোকদের নিকট হইতে এই ধরনের জিনিসসমূহ কবুল করে, সে আল্লাহ তাযালার সহিত এইরূপ অবস্থায় মিলিত হইবে যে, তাহার কোন অংশ থাকিবে না। (অর্থাৎ আখেরাতে কিছুই পাইবে না) কারণ, ইহাতে ধীরে কাজ করিয়া বিনিময় গ্রহণ করার সন্দেহ রহিয়াছে।

হযরত ওবাদা (রাযিঃ) বলেন, আমি আসহাবে সুফফাকে কুরআন শরীফ পড়াইতাম। তাহাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি আমাকে একটি ধনুক

হাদিয়া দিল। আমি চিন্তা করিলাম যে, ইহা এমন কোন মূল্যবান বস্তুও নয় আবার আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে কাজে আসিবে ; তবুও আমার খেয়াল হইল যে, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লই। আমি হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যদি তোমার ইহা পছন্দ হয় যে, আগুনের একটি বেড়ি তোমার গলায় বাঁধিয়া দেওয়া হউক তবে লইতে পার। (মাবু দাউদ)

হাসান বসরী (রহঃ)এর উক্ত আমল (এবং হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ) দ্বারা জানা গেল যে, হাদিয়া কবুল করার ব্যাপারে আলেম ও ওয়ায়েজের বিষয়টি অত্যন্ত কঠিন। ইহা সত্ত্বেও হাসান বসরী (নিজের বিশিষ্ট) বন্ধু-বান্ধবদের নিকট হইতে হাদিয়া কবুল করিতেন। (যেখানে বিনিময় দেওয়া হইতেছে বলিয়া সন্দেহ হইত না।)

ইবরাহীম তাইমী (রহঃ) নিজের বন্ধু-বান্ধবদের নিকট হইতে এক দুই দেরহাম পরিমাণ গ্রহণ করিতেন। কোন কোন লোক শত শত দেরহাম পেশ করিত, উহা কবুল করিতেন না। কোন কোন ব্যুর্গের এই অভ্যাস ছিল যে, যখন তাহাদিগকে কেহ হাদিয়া দিত তখন তাহারা বলিতেন, এখন তুমি নিজের কাছেই রাখ এবং গভীরভাবে চিন্তা করিয়া আমাকে বল যে, যদি ইহা কবুল করিবার কারণে তোমার অন্তরে আমার প্রতি ভালবাসা হাদিয়া কবুল করার আগে যে পরিমাণ ছিল উহার চেয়ে বেশী বাড়িয়া যাইবে, তখন আমাকে জানাইও ; আমি গ্রহণ করিয়া লইব ; নতুবা নহে।

ইমাম গাযযালী (রহঃ) বলেন, ইহার আলামত এই যে, ফেরত দিয়া দিলে দাতার মনে কষ্ট হয় আর কবুল করিলে তাহার আনন্দ হয় এবং সে নিজের উপর অনুগ্রহ মনে করে।

বিশর (রহঃ) বলেন, আমি হযরত সার্বী সাকাতী (রহঃ)কে ছাড়া কখনও কাহারো নিকট সওয়াল করি নাই। অবশ্য তাহার নিকট এইজন্য সওয়াল করি যে, তাহার দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি সম্পর্কে আমার জানা আছে। ইহা আমি ভাল করিয়া জানি যে, তাহার মালিকানা হইতে কোন জিনিস বাহির হইয়া যাওয়া তাহার আনন্দের কারণ হয়। আর তাহার নিকট থাকিয়া যাওয়া তাহার কষ্টের কারণ হয়। এইজন্য আমি তাহার নিকট হইতে লইয়া তাহার আনন্দে সাহায্য করি।

খোরাসানের অধিবাসী এক ব্যক্তি হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ)এর নিকট অনেক মাল হাদিয়াস্বরূপ আনিла। তিনি বলিলেন, ভাল হইয়াছে আমি ইহা গরীবদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিব। লোকটি আরজ করিল,

আমি এইজন্য পেশ করিতেছি না, আমার দিল চায় যে, ইহাকে আপনি নিজের খাওয়া-দাওয়ার মধ্যে খরচ করুন। হযরত বলিলেন, এত মাল শেষ হওয়া পর্যন্ত আমি জীবিত থাকিব কি? (পরিমাণ অনেক বেশী, শেষ হইবার জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন।) সে আরজ করিল, আমি চাই না যে, আপনি ইহাকে সিরকা এবং সবজীর মধ্যে খরচ করিবেন। (ফলে শেষ হইতে অনেক বছর লাগিবে) বরং আমার দিল চায় যে, ইহা দ্বারা আপনি হালুয়া ইত্যাদি ভাল জিনিস আহার করিবেন। হযরত কবুল করিয়া লইলেন। খোরাসানী ব্যক্তি আরজ করিল, বাগদাদে কোন ব্যক্তিও এইরূপ নাই, যাহার অনুগ্রহ আমার উপর আপনার চাইতে বেশী হইবে; (যেহেতু আপনি আমার দরখাস্তের কারণে আমার হাদিয়া কবুল করিয়া লইয়াছেন)। হযরত বলিলেন, তোমার মত ব্যক্তির হাদিয়া অবশ্যই কবুল করা চাই। (এই সমস্ত আলোচনা হাদিয়া সম্পর্কিত ছিল।)

দ্বিতীয় প্রকার সদকা ও যাকাত। যদি যাকাত হয়, তবে গ্রহিতা ব্যক্তির উচিত যে, সে দেখিবে—সে যাকাতের যোগ্য কিনা। যদি যোগ্য হয়, তবে গ্রহণ করিবে। (যাকাত পরিচ্ছেদের শেষে ইহার কিছুটা ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে।) আর যদি যাকাত ছাড়া দান-সদকা হয়, তবে গ্রহিতাকে ইহা চিন্তা করিতে হইবে যে, দাতা কেন দান করিতেছে। যদি সে তাহাকে তাহার দীনদারীর কারণে দিতেছে, তবে নিজের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিবে যে, গোপনে সে এমন কোন গুনাহে লিপ্ত কিনা যাহা দাতা জানিতে পারিলে কখনও দিবে না; বরং দাতার মনে তাহার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হইয়া যাইবে। যদি এইরূপ হয়, তবে উহা লওয়া নাজায়েয। ইহার দৃষ্টান্ত এমনই, যেমন কোন ব্যক্তিকে আলেম মনে করিয়া কেহ দিল; অথচ সে একেবারে জাহেল। অথবা সৈয়দ মনে করিয়া দিল; অথচ সে সৈয়দ নয়। এমতাবস্থায় তাহার জন্য উহা লওয়া একেবারেই জায়েয নয়; নিঃসন্দেহে হারাম। আর যদি দাতার উদ্দেশ্য গর্ব, লোক দেখানো ও প্রসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে, তবে উহা কখনও গ্রহণ করা চাই না। কেননা, ইহা গুনাহ। আর গ্রহণকারী গুনাহের ব্যাপারে সাহায্যকারী হইবে। ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইরূপ লোকদের খানা খাইতে নিষেধ করিয়াছেন, যাহারা গর্ব করার উদ্দেশ্যে খাওয়াইয়া থাকে। (তারগীব)

হযরত সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) কোন কোন হাদিয়া এই বলিয়া ফেরত দিয়া দিতেন যে, যদি আমার এই বিশ্বাস হইয়া যায় যে, দাতা গর্ব হিসাবে ইহাকে উল্লেখ করিবে না, তবে আমি গ্রহণ করিব।

কোন কোন বুযুর্গের প্রতি যখন হাদিয়া ফেরত দেওয়ার কারণে প্রশ্ন

করা হইয়াছে, তখন তাহারা বলিয়াছেন যে, দাতাদের প্রতি দয়া করিয়া ফেরত দিয়া দেই, কেননা তাহারা মানুষের নিকট ইহার আলোচনা করে। ফলে, তাহাদের সওয়াব নষ্ট হইয়া যায়। আর সওয়াব ছাড়া তাহাদের মাল কেন ধ্বংস হইবে।

তৃতীয় জিনিস গ্রহণকারী ব্যক্তির উদ্দেশ্য। গ্রহণকারী যদি অভাবী হয় এবং মাল ঐ সমস্ত দোষ হইতে মুক্ত হয় যাহা প্রথম দুই নম্বরের মধ্যে উল্লেখ করা হইয়াছে, তবে তাহার জন্য লওয়া উত্তম। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, গ্রহণকারী যদি অভাবী হয়, তবে সদকা গ্রহণকারীর সওয়াব দাতার চাইতে কম নয়। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা কোন সম্পদ চাওয়া ছাড়া এবং এশরাফে নফস (অর্থাৎ লোভ-লালসা) ছাড়া দান করেন, উহা আল্লাহ তায়ালা রিযিক, যাহা তিনি দান করিয়াছেন। এই বিষয় সম্পর্কিত বিভিন্ন রেওয়ায়েত একটু পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। ওলামায়ে কেরাম বলেন, যে ব্যক্তি চাওয়া ছাড়া পাওয়াব পরও গ্রহণ করে না, সে চাহিয়াও পায় না।

হযরত সাররী সাকাতি (রহঃ) হযরত ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)এর নিকট হাদিয়া পাঠাইতেন। একবার তিনি উহা ফেরত দিলেন। তখন হযরত সাররী (রহঃ) বলিলেন, হে আহমদ! ফেরত দেওয়ার শাস্তি গ্রহণ কবার শাস্তি হইতেও কঠিন। হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) বলিলেন, এই কথাটি আবার বলুন। (যাহাতে আমি ইহার উপর চিন্তা করিতে পারি।) হযরত সাররী (রহঃ) পুনরায় এই কথাটিই বলিলেন—ফেরত দেওয়ার শাস্তি গ্রহণ কবার শাস্তি হইতে বেশী কঠিন। হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) বলিলেন, আমি এইজন্য ফেরত দিয়াছি যে, আমার নিকট এক মাস অতিবাহিত করার মত সামান্য মৌজুদ আছে। আপনি ইহাকে নিজের নিকট রাখিয়া দিন। একমাস পর আমাকে দিবেন।

কোন কোন আলেম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি অভাব থাকা সত্ত্বেও ফেরত দিয়া দেয়, সে কোন না কোন শাস্তির মধ্যে লিপ্ত হয়। যেমন, লোভ পয়দা হইয়া যায় অথবা সন্দেহজনক মাল লইতে হয় অথবা অন্য কোন আপদ এই ধরনেরই আসিয়া যায়। আর যদি তাহার অভাব না থাকে, তবে সে কি ইনফেরাদী অর্থাৎ একাকী জীবন যাপন করে, নাকি এজতেমায়ী অর্থাৎ অন্যান্যদের সহিত সম্মিলিতভাবে জীবনযাপন করে। যদি সে একাকী জীবন যাপন করে ; অন্যদের সহিত তাহার সম্পর্ক নাই, তবে এইরূপ

লোকের জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত লইয়া নিজের কাছে আটকাইয়া রাখা উচিত নয়। কেননা, ইহা কেবল খায়েশের অনুসরণমাত্র এবং তাহাকে ফেতনায় লিপ্ত করিয়া দেওয়ার কারণ। যদি কোন কারণবশতঃ গ্রহণ করে, তবে উহা অন্যদেরকে যেন বন্টন করিয়া দেয়।

হযরত ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) হযরত সাররী (রহঃ) এর দান এইজন্য কবুল করেন নাই যে, তাহার নিজের প্রয়োজন ছিল না। আর তিনি ইহাও পছন্দ করেন নাই যে, উহা লইয়া বিতরণ ও খরচ করার মধ্যে নিজের সময়কে মশগুল করিবেন। কেননা, ইহাতে অনেক আপদ ও অসুবিধা ছিল। আর আপদের স্থান হইতে দূরে থাকাই সাবধানতা। কেননা, শয়তানের ধোকা হইতে কখনও নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না।

মক্কার অধিবাসী এক ব্যক্তি বলেন, আমার নিকট কিছু দেরহাম ছিল। যাহা আমি আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিবার জন্য রাখিয়াছিলাম। আমি এক ফকিরের আওয়ায শুনিলাম, যে তওয়াফ হইতে অবসর হইয়া (কাবা শরীফের পর্দা ধরিয়া) খুব নিচু স্বরে বলিতেছিল, হে আল্লাহ! তোমার জানা আছে, আমি ক্ষুধার্ত। হে আল্লাহ! তোমার জানা আছে, আমি বস্ত্রহীন। হে ঐ পবিত্র সত্তা, যিনি অন্যদেরকে দেখেন এবং তাহাকে কেহ দেখে না। আমি যখন ঐ ফকীরের দিকে দেখিলাম, তখন তাহার পরনে দুইটি পুরাতন চাদর ছিল। যাহা দ্বারা তাহার শরীর ঢাকা যাইতেছিল না। আমি মনে মনে চিন্তা করিলাম যে, আমার দেরহামগুলি খরচ করার জন্য এই লোক অপেক্ষা উত্তম পাওয়া যাইবে না। আমি সমস্ত দেরহাম তাহার সামনে পেশ করিয়া দিলাম। সে ঐ দেরহামগুলি হইতে শুধু ৫টি দিরহাম লইয়া বাকীগুলি আমাকে ফেরত দিল আর বলিল, চার দেরহাম দুইটি লুঙ্গির দাম আর এক দেরহাম তিন দিনে খাওয়ার মধ্যে খরচ হইয়া যাইবে। (এক দেরহামে প্রায় সাড়ে তিন আনা পরিমাণ হয়।)

আমি দ্বিতীয় রাত্রে তাহাকে দেখিলাম, দুইটি নতুন লুঙ্গি তাহার শরীরে ছিল। আমার অন্তরে তাহার পক্ষ হইতে কিছু আশংকা হইল। সে আমাকে দেখিল এবং আমার হাত ধরিয়া নিজের সাথে তওয়াফ করাইল। তওয়াফের সাত চকরের প্রত্যেকটিতে আমার পায়ের নিচে খনিজ দ্রব্যসমূহ ভরপুর অবস্থায় পড়া ছিল এবং উহা পায়ের নিচে নড়াচড়া করিতেছিল। উহার মধ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য, ইয়াকুত, মতি এবং অন্যান্য মূল্যবান বস্তু ছিল। আমি উহা দেখিতেছিলাম; অথচ অন্যান্য লোকদের দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না। অতঃপর ঐ ব্যক্তি বলিল, আল্লাহ তায়ালা এই সবকিছু আমাকে দান করিয়া রাখিয়াছেন; কিন্তু আমি উহা হইতে লইতে

চাহি না। বরং মানুষের হাত হইতে লইয়া খরচ করি। কারণ, ইহাতে ঐ সমস্ত লোকের উপকার হয়, যাহাদের নিকট হইতে লই এবং তাহাদের উপর আল্লাহ তায়ালা রহমত হয়। এই সমস্ত ঘটনা দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, প্রয়োজনের অতিরিক্ত লওয়া ফেতনার কারণ হয়, যাহা আল্লাহ তায়ালা পক্ষ হইতে পরীক্ষা যে, ইহা কি কাজে খরচ করিয়াছে। আর প্রয়োজন পরিমাণ লওয়া আল্লাহ তায়ালা রহমত। অতএব, মানুষের উচিত—রহমত ও পরীক্ষার মধ্যে পার্থক্য করা। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন : **إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا** অর্থাৎ, যাহা কিছু জমিনের উপর আছে, আমি উহাকে জমিনের জন্য সৌন্দর্য বানাইয়া রাখিয়াছি। যাহাতে ঐ সমস্ত লোকদেরকে পরীক্ষা করি এবং দেখি যে, তাহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি বেশী ভাল আমল করে (আর কে করে না অর্থাৎ কোন ব্যক্তি এই সৌন্দর্যের মধ্যে পড়িয়া আল্লাহ তায়ালা হইতে গাফেল হইয়া যায়। আর কে এই সব হইতে মুখ ফিরাইয়া আল্লাহ তায়ালা র মধ্যে মশগুল থাকে)। (কাহফ : ৮)

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষের জন্য তিনটি জিনিসের অতিরিক্ত কোন হক বা অধিকার নাই। এক—এই পরিমাণ খানা, যাহার দ্বারা কোমর সোজা থাকে। দ্বিতীয়—এতটুকু কাপড়, যাহার দ্বারা শরীর ঢাকিয়া থাকে। তৃতীয়—একটি ঘর, যাহাতে মানুষ থাকিতে পারে। ইহা হইতে বেশী যাহা কিছু আছে, উহার হিসাব হইবে। এই তিন জিনিসের মধ্য হইতে শুধু প্রয়োজনের পরিমাণ তো সওয়াবের কারণ। ইহা হইতে অতিরিক্তের মধ্যে যদি আল্লাহ তায়ালা নাফরমানী নাও করে, তবু হিসাব তো আছেই। আর যদি নাফরমানীও করে, তবে আযাবও আছে। অতএব, প্রয়োজনের অতিরিক্ত যদি কিছু থাকেও, তবে উহা অভাবীদের মধ্যে খরচ করিয়া দিবে। এই সবকিছু যাহা বলা হইয়াছে। একাকী জীবনযাপনের সহিত সম্পর্কিত বিষয় ছিল। যদি কোন ব্যক্তি এমন হয় যে, তাহার এজতেমায়ী অর্থাৎ অন্যান্যদের লইয়া জীবন যাপন করিতে হয়, তাহার স্বভাবের মধ্যে দান-দক্ষিণার অভ্যাসও থাকে, ফকীর ও নেক লোকদের জামায়াত তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে, তাহাদের প্রয়োজনাদিও পূরণ করিতে হয়, তবে এইরূপ ব্যক্তির জন্য নিজের প্রয়োজন হইতে বেশী লওয়ার মধ্যে দোষ নাই। কিন্তু লইবার পর খুব জ্বলদি উহা খরচ করিয়া দেওয়া চাই ; অভাবী লোকদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া চাই। এক রাত্রিও উহাকে নিজের কাছে রাখা ফেতনার বিষয় এমন না হয় যে, দিলের মধ্যে উহার প্রতি আকর্ষণ পয়দা হইতে আরম্ভ

হয় এবং খরচ করার ব্যাপারে মন অস্বীকার করিতে আরম্ভ করে। বরং এইরূপ ব্যক্তির জন্য আল্লাহর উপর ভরসা করিয়া করজ লইয়া খরচ করিবার মধ্যেও কোন দোষ নাই। আল্লাহ তায়ালা তাহার করজ আদায় করিবেন। (এইইয়া)

⑤ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى إِلَيْهِ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلَا يَرْكَبُهُ وَلَا يَقْبَلُهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ -

خُصُّوا أَقْدَسَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا ارْتَدَّ

হে যে কব জম মিস স কুনি শুনস কুি কুরুস

দেস পিরুদ কুরুস দারাস ক কুনি দরিস

যা পনি সওয়ারি প সওয়ার কসে তুনিসে পিগিল

কসে মাস ক সওয়ারি প সওয়ার হুওবিস

আরাস কুরুস কেস মাসেস পিসেস এস কেস

বিসাও দুনিস মিস মাসা তুনিসােস নসিস -

(سواء ابن ماجة والبيهقي في الشعب كذا في المشكوة)

⑤ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন তোমাদের মধ্য হইতে কোন ব্যক্তি কাহাকেও করজ দেয়, অতঃপর উক্ত করজদার ব্যক্তি তাহাকে কোন হাদিয়া দেয় অথবা নিজের সওয়ারীর উপর সওয়ার করায়, তখন না তাহার হাদিয়া কবুল করিবে, না তাহার সওয়ারীর উপর সওয়ার হইবে। অবশ্য, যদি এই করজ আদান-প্রদানের পূর্বে এই ধরনের আচার-আচরণ উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান ছিল, তবে ক্ষতি নাই। (মিশকাত : ইবনে মাজাহ, বায়হাকী)

ফায়দা : অর্থাৎ যদি ইহার পূর্বেও উভয়ের মধ্যে এই ধরনের হাদিয়া ইত্যাদি অথবা তাহার কোন জিনিস ধার লওয়ার সম্পর্ক ছিল, তবে তো করজের অবস্থাতেও ঐ হাদিয়া কবুল করার মধ্যে দোষ নাই। আর যদি পূর্ব হইতে এইরূপ সম্পর্ক ছিল না ; বরং এখন করজদার হওয়ার কারণে করিতেছে, তবে উহা সুদ হইবে।

অন্য এক হাদীসে আছে, হযরত আবু বুরদাহ (রাযিঃ) বলেন, আমাকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাযিঃ) বলিয়াছেন, তুমি এমন জায়গায় থাক, যেখানে সুদের প্রচলন বেশী। সুতরাং কাহারও জিম্মায় যদি তোমার কোন হক থাকে, অতঃপর সে তোমার নিকট ভূমির কিংবা ঘাসের বোঝা দিয়া যায়, তবে উহা গ্রহণ করিবে না, কেননা উহা সুদ।

(মিশকাত)

অতএব, হাদিয়া কবুল করার বিষয়ে ইহা দেখাও জরুরী যে, দাতার কোন খারাপ উদ্দেশ্য আছে কিনা। যেমন করজ দিয়া হাদিয়া গ্রহণ করার মধ্যে সুদ হওয়া ছাড়াও যদি হাদিয়াদাতার উদ্দেশ্য ইহাও হয় যে, পাওনাদার যাহাতে তাগাদা না করে, তবে ইহা সুদের সহিত ঘুষও হইল। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনেক হাদীসে ঘুষদাতা, ঘুষগ্রহিতা উভয়ের উপর লানত আসিয়াছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বলেন, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুষ গ্রহণকারী ও ঘুষদাতার উপর লানত করিয়াছেন।

অন্য এক হাদীসে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঘুষদাতার উপর এবং ঘুষ গ্রহণকারীর উপর আল্লাহর লানত।

অপর এক হাদীসে আছে, ঘুষগ্রহণকারী এবং ঘুষদাতা উভয়েই জাহান্নামী।

অন্য এক হাদীসে আছে, যে জাতির মধ্যে ঘুষের প্রচলন হইবে তাহারা দুর্ভিক্ষে পতিত হইবে। আর যে জাতির মধ্যে ঘুষ প্রকাশ পাইবে, তাহারা ভিত-সন্ত্রস্ত থাকিবে।

বিভিন্ন হাদীসে আসিয়াছে, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুষ গ্রহণকারীকে, ঘুষ প্রদানকারীকে এবং ঐ ব্যক্তিকে যে ঘুষের ব্যাপারে মধ্যস্থতা করে লানত করিয়াছেন। (তারগীব)

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে সদকার মাল উসূল করিবার জন্য পাঠাইলেন। তিনি কাজ শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন, এই মাল তো সদকা হিসাবে পাওয়া গিয়াছে, আর ঐ মাল লোকেরা আমাকে হাদিয়া হিসাবে দিয়াছে। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াজের মধ্যে এই ব্যাপারে সতর্ক করিয়া বলিলেন যে, কোন কোন লোককে সদকার মাল উসূল করিবার জন্য পাঠানো হয়, সে আসিয়া বলে যে, ইহা সদকার মাল আর ইহা আমাকে হাদিয়া হিসাবে দেওয়া হইয়াছে। নিজের বাপের ঘরে অথবা নিজের মায়ের ঘরে বসিয়া থাকিয়া দেখুক—হাদিয়া দেওয়া হয় কিনা। (মিশকাত)

যেমন পূর্বের হাদীসগুলিতে করজের বর্ণনায় হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন যে, যদি করজের লেনদেন ছাড়া হাদিয়া দেওয়ার এই সম্পর্ক পূর্ব হইতেই থাকে তবে হাদিয়া গ্রহণ করিতে কোন দোষ নাই।

উপরোক্ত সতর্কবাণীর মধ্যে ঐ দিকেই ইশারা করা হইয়াছে, অর্থাৎ শাসক বা কর্মকর্তা না হওয়া অবস্থায় নিজের ঘরে বসিয়া যে ব্যক্তি হাদিয়া পায়, উহা হাদিয়া হিসাবে গণ্য হইবে। কিন্তু শুধু শাসক হওয়ার কারণে যে হাদিয়া দেওয়া হয়, উহা হাদিয়া নয়।

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কাহারও সুপারিশ করে এবং এই সুপারিশের কারণে হাদিয়া হিসাবে সে কিছু পায় এবং গ্রহণ করিয়া লয়, তবে সে সুদের দরজাসমূহের মধ্য হইতে অনেক বড় দরজায় প্রবেশ করিল। (মিশকাত)

হযরত মুআয (রাযিঃ) বলেন, যখন হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ইয়ামানের শাসনকর্তা বানাইয়া পাঠাইলেন, তখন আমার পিছনে একজন লোক পাঠাইলেন। সে আমাকে রাস্তা হইতে ফেরত ডাকিয়া আনিল। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার জানা আছে কি ; আমি তোমাকে কেন ডাকিয়াছি? কোনো জিনিস আমার অনুমতি ছাড়া লইবে না, কেননা, ইহা খেয়ানত হইবে : وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ অর্থাৎ, আর যে ব্যক্তি খেয়ানত করিবে, সে উহাকে কেয়ামতের দিন (নিজের উপর বহন করিয়া আদালতে) আনিবে।

(আলি-ইমরান : ১৬১) (মিশকাত)

হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন, হযরত রেফায়া (রাযিঃ) হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে একটি গোলাম হাদিয়া স্বরূপ পেশ করিলেন। সেই গোলাম হযরের সঙ্গে খায়বরের যুদ্ধে গেল। এক সময় সে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটের উপর সামান্য বসিতেছিল ; এমন সময় একটি তীর কোথাও হইতে আসিয়া তাহার শরীরে লাগিল, ইহাতে সে শহীদ হইয়া গেল। লোকেরা বলিল, শহীদী মৃত্যু তাহার জন্য মুবারক হউক, মুবারক হউক (কেননা, একে তো হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোলাম ; উপরন্তু শাহাদতের মর্যাদা—মুবারকবাদ দেওয়ার মত বিবর্যই)। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, না, সে একটি চাদর খেয়ানত করিয়া লইয়াছিল, যাহা এখন আগুনে পরিণত হইয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিতেছে।

হযরত জায়েদ ইবনে খালেদ (রাযিঃ) বলেন, হুনাইনের যুদ্ধে এক ব্যক্তির ইন্তেকাল হইয়া গেল। যখন জানাযা তৈয়ার হইল তখন হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে নামায পড়াইবার জন্য দরখাস্ত করা হইল। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়া দিলেন, তোমরাই তাহার নামায পড়িয়া লও। ইহা শুনিয়া (মনের ব্যথায়)

সাহাবায়ে কেরামের চেহারা মলিন হইয়া গেল। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাহাদের মলিন চেহারা দেখিয়া) বলিলেন, সে খেয়ানত করিয়াছে।

হযরত জায়েদ (রাযিঃ) বলেন, আমরা ঐ মরহুম ব্যক্তির সামান্য তালাশ করিয়া দেখিলাম, উহাতে ইহুদীদের মতিসমূহের মধ্য হইতে কিছু ছোট ছোট মতি (যাহাকে পুঁতি বলে) পাওয়া গেল। যাহা দুই দেহরহাম (অর্থাৎ প্রায় সাত আনা মূল্যের)ও হইবে না। (দুররে মানসুর)

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং পবিত্র। অতএব শুধু পবিত্র মালই কবুল করেন। আর আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে ঐ জিনিসেরই হুকুম করিয়াছেন, যাহার হুকুম রসূলদেরকে করিয়াছেন। যেমন এরশাদ হইতেছে : **يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا** অর্থাৎ, হে রাসূলগণ! উত্তম জিনিসসমূহ খাও (অর্থাৎ হালাল মাল) এবং নেক আমল কর। (মুমিনুন : ৫১) আর মুমিনদেরকে বলিয়াছেন : **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ** অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! পবিত্র জিনিসসমূহ খাও—ঐসমস্ত জিনিস হইতে যাহা আমি তোমাদিগকে দান করিয়াছি। (বাকারা : ১৭২) অতঃপর হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করিলেন, একজন লোক দীর্ঘ সফরে যাইতেছে (যাহা দোয়া কবুল হওয়ার বিশেষ স্থল), এলোমেলো চুলওয়ালা, ধুলায় ধূসরিত অবস্থা (যাহা দ্বারা তাহার দরিদ্রতা বুঝা যায়)। অতঃপর উভয় হাত আসমানের দিকে প্রসারিত করিয়া আয় আল্লাহ, আয় আল্লাহ, (বলিয়া দোয়া) করিতেছে। কিন্তু তাহার খানা হারাম (মাল দ্বারা), পান করা হারাম, লোবাস-পোশাক হারাম, হারাম মাল দ্বারাই তাহার লালন-পালন হইয়াছে। সুতরাং তাহার দোয়া কিভাবে কবুল হইতে পারে।

আর এক হাদীসে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে যে, শীঘ্র এমন এক জামানা আসিবে, যখন মানুষ ইহারও পরওয়া করিবে না যে, হালাল মাল হইতে পাইলাম নাকি হারাম মাল হইতে। (মিশকাত)

উল্লেখিত বিষয়াবলী ছাড়া আরও অনেক বিষয় সম্বলিত রেওয়ায়াতসমূহ হাদীসের কিতাবসমূহে প্রচুর পরিমাণে বর্ণিত হইয়াছে। যাহাতে এই ব্যাপারে অনেক বেশী সতর্ক করা হইয়াছে যে, মানুষের জন্য আমদানীর মাধ্যমসমূহের প্রতি কড়া দৃষ্টি রাখা উচিত। এমন যেন না হয় যে, পয়সার লোভে নাজায়েয আমদানী হইতে দৃষ্টি সরাইয়া নিল। এই

ব্যাপারে আলেমদের দায়িত্ব সাধারণ লোকদের চাইতে বেশী। কেননা, তাহারা জায়েয ও নাজায়েযকে স্বয়ং বুঝেন। বিশেষতঃ মাদ্রাসাওয়ালা এবং অন্যান্য এমন ব্যক্তিগণ, যাহাদের সম্পর্ক চাঁদার মালের সহিত রহিয়াছে; তাহাদের বেশী সাবধান থাকা প্রয়োজন।

আমাদের হযরত মাওলানা শাহ আবদুর রহীম সাহেব রায়পুরী (রহঃ) বলিতেন, আমি এই সকল মাদ্রাসার টাকা-পয়সাকে যেরূপ ভয় করি, ব্যক্তি মালিকানাধীন টাকা-পয়সাকে সেইরূপ ভয় করি না। যদি কাহারও ব্যক্তিগত সম্পদে কিছু অসতর্কতা হইয়া যায়, তবে তাহার নিকট হইতে অবশেষে ক্ষমা করাইয়া লইলে ক্ষমা হইয়া যায়। কিন্তু মাদ্রাসার টাকা-পয়সা হইল, সারা দুনিয়ার চাঁদা। আর মাদ্রাসার ব্যবস্থাপকগণ মাদ্রাসার আমানতদার। যদি উহাতে কোন খেয়ানত হয় অথবা হক নষ্ট করা হয়, তবে ব্যবস্থাপকগণ মাফ করিলেও মাফ তো হইবেই না, বরং মাফ করিয়া তাহারা নিজেরাও এই গুনাহের মধ্যে শরীক হইয়া যাইবেন। আল্লাহ তায়ালাই নিজ মেহেরবানীতে বান্দার হকের ব্যাপারে আমাদের হেফজত করুন। কেননা, ইহা বড় কঠিন বিষয়। ছয়র সাপ্লাপ্লাহ্ আল্লাইহি ওয়াসাপ্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা নিকট কিয়ামতের দিন তিনটি আদালত রহিয়াছে। এক আদালতে তো মাফ করিবার কোন প্রশ্নই থাকিবে না; ইহা তো শিরক ও তাওহীদের আদালত। আল্লাহ তায়ালা নিজে এরশাদ করিয়াছেন : اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهٖ الْاٰیةُ অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা শিরকে তো মাফ করিবেন না। ইহা ছাড়া যাহাকে চাহিবেন মাফ করিয়া দিবেন। (নিসা : ১১৬)

দ্বিতীয় আদালতে (হিসাব নিকাশ ব্যতীত) আল্লাহ তায়ালা ছাড়িবেন না—যতক্ষণ না উহার বদলা লইবেন। ইহা মানুষের একজনের উপর অপরজনের জুলুমের বদলা (চাই এই জুলুম জানের সহিত সম্পর্কিত হউক যেমন গালিগালাজ করা, ইজ্জত-সম্মান নষ্ট করা, দোষারোপ করা ইত্যাদি ইত্যাদি। অথবা মালের সহিত সম্পর্কিত হউক, যেমন কাহারও মাল অন্যায়ভাবে লইয়া লইয়াছে।

আর তৃতীয় আদালত—আল্লাহ তায়ালা নিজের হকের। ইহাতে তিনি ইচ্ছা হয় শাস্তি দিবেন অথবা মাফ করিয়া দিবেন। (মিশকাত)

এই সমস্ত হাদীস উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হইল, মানুষ যেন নিজের আমদানীর মাধ্যমসমূহের উপর অত্যন্ত গভীর দৃষ্টি রাখে। কেননা, আমদানী যদি হারাম হয়, তবে না তাহার দোয়া কবুল হয়, যেমন ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, না তাহার দান-সদকা কবুল হয়, যেমন

আমাদের জীবন কোন্ উদ্দেশ্যের জন্য, কোনো কাজের জন্য ; নাকি অহেতুক পয়দা করা হইয়াছে। আল্লাহ তায়ালা নিজে ইহার উপর সতর্ক করিয়াছেন।^১ এরশাদ করিয়াছেন : **أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا** ৷ অর্থাৎ, হাঁ তবে কি তোমরা এই ধারণা করিয়া রাখিয়াছিলে যে, আমি তোমাদিগকে এমনিতেই বেকার (অহেতুক) পয়দা করিয়াছি এবং তোমরা (এই ধারণা করিয়া রাখিয়াছিলে যে, তোমাদিগকে) আমার দিকে ফিরাইয়া আনা হইবে না (এবং তোমাদের নিজের জীবনের হিসাব দিতে হইবে না)। (মুমিনুন : ১১৫) শুধু এতটুকুই নয়, বরং অন্য জায়গায় আল্লাহ তায়ালা জীবনের উদ্দেশ্যও নিজে এরশাদ করিয়া দিয়াছেন : **وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ** ৷ অর্থাৎ, আমি জিন ও মানুষকে শুধু এইজন্য পয়দা করিয়াছি যে, তাহারা আমার এবাদত করিবে। (যারিআত : ৫৬) এইরূপ অবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, সে যেন নিজের জীবনের সম্পূর্ণ সময়ের হিসাব লয় যে, সে নিজের মূল্যবান সময়ের কি পরিমাণ নিজের ঐ উদ্দেশ্যের জন্য খরচ করিয়া থাকে, যাহার জন্য তাহাকে পয়দা করা হইয়াছে। আর কি পরিমাণ নিজের প্রয়োজন পূরণ, আমোদ-ফুর্তি এবং অপ্রাসঙ্গিক কাজ-কর্ম ও ব্যস্ততার মধ্যে খরচ করে। আপনি নির্মাণ কাজের জন্য একজন রাজমিস্ত্রী রাখেন। সে আপনার কাজের সময়ের মধ্যে কতটুকু সময় নির্মাণ কাজে খরচ করে, আর কতটুকু ধূমপান ও খানাপিনার মধ্যে খরচ করে—এই ব্যাপারে আপনি নিজেই অনুমান করিয়া লউন যে, কতটুকু সময় তাহার নিজস্ব প্রয়োজনে খরচ করা আপনি সহ্য করিতে পারেন। আর আপনি আপনার অধীনস্থদের ব্যাপারে যতটুকু ছাড় দিতে পারেন, ততটুকু ছাড় নিজের ব্যাপারেও সহ্য করুন। আপনি এক ব্যক্তিকে দোকানে থাকিবার জন্য কর্মচারী হিসাবে রাখিলেন। ঐ কাজের জন্যই তাহাকে বেতন দেন। সে সারাদিন নিজের পারিবারিক কাজে লাগিয়া থাকে। কয়েক মিনিটের জন্য এক চক্কর দোকানেও লাগাইয়া যায়। আপনি কি মানিয়া লইবেন যে, তাহাকে পুরা বেতন দিতে থাকিবেন? যদি মানিয়া না লন, তবে আপনার নিজের ব্যাপারে কি ওজর আছে যে,

১. উক্ত আয়াত শরীফ সম্পর্কে একটি আশ্চর্য বিষয় হাদীসে আসিয়াছে—এক সাহাবী (রাযিঃ) বলেন, আমাদিগকে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক জিহাদে পাঠাইয়াছেন এবং ইহা এরশাদ করিয়াছেন যে, সকাল-সন্ধ্যা এই আয়াত শরীফ পড়িতে থাকিবে। আমরা পড়িতে থাকিয়াছি। আমরা সেই জিহাদে গনীমতও লাভ করিয়াছি এবং সুস্থ ও নিরাপদও রহিয়াছি। (দুররে মানসুর)

আল্লাহ তায়ালা আপনাকে শুধু এবাদতের জন্য পয়দা করিয়াছেন। তিনি মালিক, তিনি সৃষ্টিকর্তা, সবসময় আপনাকে নিজের দান ও দয়া দ্বারা সম্মানিত করেন। আর আপনি নিজের অহেতুক কাজের মধ্যে জীবন কাটাইয়া দেন। সাথে সাথে নিজে নিজেকে সান্ত্বনা দেন যে, পাঁচ ওয়াস্ত নামাযের মধ্যে হাজিরা তো দিয়া দেই, আর বেশী কি হইতে পারে। চিন্তা করিয়া দেখুন, এই উত্তর আপনি আপনার কর্মচারীদের নিকট হইতেও কি বরদাশত করিয়া লইবেন? শুধু আল্লাহ তায়ালা দান ও অনুগ্রহ যে, তিনি জীবনের পুরা সময়ে এবাদত ফরজ করেন নাই বরং উহার সামান্য অংশে ফরজ করিয়াছেন। ইহাতেও যদি ত্রুটি হয়, তবে কতবড় জুলুম হইবে।

দ্বিতীয় বিষয় যাহা জিজ্ঞাসা করা হইবে—উপরোক্ত হাদীসে এরশাদ করা হইয়াছে যে, যৌবনের শক্তি কোন্ জিনিসের মধ্যে খরচ করা হইয়াছে; আল্লাহ তায়ালা রোজামন্দি ও সন্তুষ্টির কাজে? তাহার এবাদতে? মজলুমের সাহায্যে? দুর্বল ও পঙ্গুদের সাহায্যে? নাকি আল্লাহর নাফরমানী ও গুনাহের কাজে? আরাম-আয়েশ ও স্বৈচ্ছাচারিতায়? অসহায়দের উপর জুলুমের মধ্যে? অন্যায় কাজে সাহায্য করার মধ্যে? নাপাক দুনিয়ার কামাইয়ের মধ্যে? দীন ও দুনিয়া উভয় জাহানে কাজে আসে না এমন অহেতুক ব্যস্ততার মধ্যে? ইহার জওয়াব এমন আদালতে দিতে হইবে, যেখানে না কোন উকালতি চলিবে, না মিথ্যা, ধোকা ও বাকপটুতা কাজে আসিবে। যেখানকার গুলু পুলিশ সব সময় সর্ব মুহূর্তে মানুষের সাথে থাকে। আর শুধু এতটুকুই নহে, বরং মানুষের ঐ সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যাহা দ্বারা এই সকল কাজকর্ম করিয়াছে, স্বয়ং নিজের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে এবং অপরাধসমূহ স্বীকার করিবে। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন : **الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَ** অর্থঃ, আজ (কেয়ামতের দিন) আমি তাহাদের মুখের উপর মোহর লাগাইয়া দিব (যাহাতে অহেতুক ওজরসমূহ বানাইতে না পারে।) তাহাদের হাত আমার সহিত কথা বলিবে, তাহাদের পা সাক্ষ্য দিবে ঐ সমস্ত বিষয়ে, যাহা ইহারা করিত। (ইয়াসীন : ৬৫) অর্থঃ হাত স্বয়ং বলিয়া উঠিবে যে, আমার দ্বারা কাহার কাহার উপর জুলুম করা হইয়াছে। কি কি নাজায়েজ কাজ আমার দ্বারা করানো হইয়াছে। পা নিজে সাক্ষ্য দিবে যে, আমাকে কি ধরনের নাজায়েয মজলিসের মধ্যে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। অন্য এক আয়াতে এরশাদ হইয়াছে : **وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ النَّارِ إِلَى النَّارِ** অর্থঃ

যেইদিন আব্বাহর দুশমনদেরকে দোষখের দিকে একত্রিত করা হইবে, অতঃপর তাহাদিগকে (চলিতে চলিতে এক জায়গায়) ধামাইয়া দেওয়া হইবে (যাহাতে সবাই এক জায়গায় একত্রিত হইয়া যায়)। অবশেষে যখন সবাই দোষখের কাছাকাছি আসিয়া যাইবে (এবং হিসাব শুরু হইবে), তখন তাহাদের কান, চোখ ও চামড়া তাহাদের বিরুদ্ধে তাহাদের আমলসমূহের সাক্ষ্য দিবে। আর তাহারা নিজেদের এই অঙ্গগুলিকে বলিবে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য কেন দিলে? সেই অঙ্গসমূহ বলিবে, আমাদের ঐ (শক্তিমান) কথা বলিবার ক্ষমতা দিয়াছেন, যিনি সমস্ত জিনিসকে কথা বলিবার ক্ষমতা দান করিয়াছেন এবং তিনিই তোমাদিগকে প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং তাহারই নিকট এখন (দ্বিতীয়বার জীবিত করিয়া) আনা হইয়াছে। (সামনে আব্বাহ তায়ালা সতর্ক করিয়া বলিতেছেন) এবং তোমরা এই বিষয় হইতে তো নিজেদেরকে কিছুতেই লুকাইতে পারিতেছিলে না যে, তোমাদের উপর তোমাদের কান এবং চোখ ও চামড়া সাক্ষী দিবে। (ইহাও পরিষ্কার কথা যে, মানুষ যে যে কাজ করে তাহার চোখ কান ইত্যাদি তো উহাকে দেখিয়াই থাকে। এইগুলি হইতে গোপন করিয়া কোন ব্যক্তি কিভাবে কোন কাজ করিতে পারে?) কিন্তু তোমরা এই ধারণায় রহিয়াছ যে, আব্বাহ তায়ালা তোমাদের অনেক আমলের খবরও রাখেন না (যাহা মনে চায় করিতে থাক; কে জিজ্ঞাসা করিতে পারে) আর তোমাদের এই ধারণা যাহা তোমরা নিজেদের প্রতিপালক সম্পর্কে করিয়া রাখিয়াছিলে (যে, তাহার খবরও নাই) তোমাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। অতএব, তোমরা ক্ষতির মধ্যে পড়িয়া গিয়াছ। (হ-মীম সিদ্ধাহ : ১৯-২৫)

হাদীসের মধ্যে অনেক রেওয়ায়াত এই সমস্ত সাক্ষ্য সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে। এক হাদীসে আছে, হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, আমরা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির ছিলাম। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসিলেন। ইহাতে তাহার দাঁত মুবারক প্রকাশ হইয়া গেল। অতঃপর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা কি জান, আমি কেন হাসিয়াছি? সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের না জানার কথা ব্যক্ত করিলেন। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, বান্দা তাহার মাওলাকে কিয়ামতের দিন এইরূপ বলিবে, হে আব্বাহ! তুমি আমার উপর জুলুম হইতে নিরাপত্তা দিয়া রাখিয়াছ। এরশাদ হইবে, নিশ্চয়ই। তখন বান্দা বলিবে, হে আব্বাহ! আমি আমার বিরুদ্ধে অন্য কোন ব্যক্তির সাক্ষ্যকে নির্ভরযোগ্য মনে করি

না। এরশাদ হইবে, আচ্ছা, আমি তোমাকেই তোমার নিজের উপর সাক্ষী বানাইতেছি। তাহার মুখের উপর মোহর লাগাইয়া দেওয়া হইবে এবং তাহার শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে জিজ্ঞাসা করা হইবে। যখন উহারা নিজেদের সমস্ত আমল এক এক করিয়া বলিয়া দিবে তখন মুখের মোহর সরাইয়া দেওয়া হইবে। তখন সে নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বলিব, হে কমবখ্তেরা! তোদের ধ্বংস হউক, তোদের জন্যই আমি এইসব কাজকর্ম করিতাম (অর্থাৎ এইসব কাজের স্বাদ তোরাই তো পাইতে, তোরাই নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে আরম্ভ করিলে। কিন্তু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তো বাধ্য, কেননা সেইদিন কোন জিনিস সত্যের বিপরীত কথা বলিতে পারিবে না)।

অন্য এক হাদীসে আছে, মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে সর্বপ্রথম বাম উরু কথা বলিবে—উহা দ্বারা কি কি কাজ করা হইয়াছে। অতঃপর অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কথা বলিবে। মোটকথা, প্রত্যেকটি অঙ্গ নিজের কৃত নেক ও বদ আমলসমূহ বলিয়া দিবে। এই কারণেই অন্য এক হাদীসে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ রহিয়াছে যে, সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ ইত্যাদি বাক্যসমূহ অঙ্গুলি দ্বারা গণনা কর, কেননা কেয়ামতের দিন এই সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কথা বলার শক্তি দেওয়া হইবে এবং উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে। অর্থাৎ যেখানে এইসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিজেদের গুনাহসমূহ বলিয়া দিবে, সেখানে অনেক নেক কাজও তো বলিবে। যে রূপ হাত খারাপ কাজসমূহ, জুলুম, অত্যাচার এবং অন্যায় কাজকর্ম বলিয়া দিবে, তদ্রূপ উহা দ্বারা আল্লাহ তায়ালার পাক নাম গণনা করা, সদকা দেওয়া, হাতের দ্বারা নেক আমলসমূহ করাও তো বলিয়া দিবে। মোটকথা, এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিলে অনেক দীর্ঘ হইবে। অতএব সংক্ষিপ্ত কথা এই যে, এই সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে যৌবনের নেশায় মত্ত হইয়া জুলুম-অত্যাচার ও নাজায়েয কাজকর্ম হইতে বাঁচানো খুবই জরুরী। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন : **الشَّبَابُ شُعْبَةٌ مِنَ الْجُنُونِ وَالنِّسَاءُ جِبَالُ الشَّيْطَانِ** অর্থাৎ, যৌবন উন্মাদনার একটি শাখা এবং নারীরা শয়তানের জাল। (জামে সগীর) অর্থাৎ মানুষ যৌবনের উন্মাদনায় এই জালের মধ্যে আটকাইয়া যায়। প্রত্যেক জুমআর খোতবাতে এই শব্দগুলি শোনা হয়। তখন যৌবনের নেশায় সামান্য পরিমাণও আমাদের খেয়াল হয় না যে, ইহার জওয়াবদেহি করিতে হইবে। আমরা উহার শক্তিকে গুনাহের কাজে এবং দুনিয়া কামাইয়ের মধ্যে বরবাদ করিতেছি। অথচ যৌবন এইজন্য যে, উহার শক্তিকে এমন কাজে খরচ করা, যাহা মৃত্যুর পর কাজে আসে। ভাগ্যবান

ঐ সমস্ত নওজোয়ান, যাহারা আল্লাহর কাজে সবসময় মগ্ন থাকে এবং গুনাহ হইতে দূরে থাকে।

তৃতীয় বিষয় যাহা উপরোক্ত হাদীসে উল্লেখ করা হইয়াছে, যাহার উত্তর না দিয়া কিয়ামতের দিন হিসাবের জায়গা হইতে সরিতে পারিবে না, উহা এই যে, ধন-সম্পদ কিভাবে উপার্জন করিয়াছে, বৈধ পন্থায় নাকি অবৈধ পন্থায়? ইহার পূর্বের হাদীসে এই সম্পর্কে কিছু কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ছযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষ অবৈধ পন্থায় যে মাল উপার্জন করে, যদি উহা হইতে দান-খয়রাত করে তবে কবুল হইবে না। বরচ করিলে বরকত হইবে না। আর যে সম্পদ রাখিয়া যাইবে, উহা তাহার জন্য জাহান্নামের সঞ্চয় হইবে।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, যে গোশত (অর্থাৎ মানুষের শরীরের টুকরা) হারাম সম্পদ দ্বারা লালিত হয়, জাহান্নাম উহার জন্য উপযুক্ত।

এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি দশ দেরহাম দ্বারা কাপড় খরিদ করিল—উহার মধ্যে যদি এক দেরহাম পরিমাণ অবৈধ আয়দানীর হয়, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ কাপড় তাহার পরিধানে থাকিবে—তাহার নামায কবুল হইবে না। (মিশকাত)

ছযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বিভিন্ন হাদীসে আসিয়াছে যে, তোমরা রিযিককে দূরে মনে করিও না। কোন মানুষ ঐ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করিতেই পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার তকদীরে যে রিযিক লেখা হইয়াছে, উহা তাহাকে দেওয়া না হইবে। অতএব, রিযিক হাসিল করিবার জন্য উত্তম পন্থা অবলম্বন কর। হালাল রুযি কামাই কর, হারামকে ছাড়িয়া দাও। কয়েকটি হাদীসে আসিয়াছে যে, রিযিক মানুষকে এইভাবে তালাশ করে, যেভাবে মৃত্যু মানুষকে তালাশ করে অর্থাৎ যেভাবে মানুষের জন্য মৃত্যু হইতে বাঁচিবার কোন উপায় নাই, তদ্রূপ যে রিযিক তাহার তকদীরে লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে উহা অবশ্যই সে পাইবে।

এক হাদীসে আছে, মানুষ যদি নিজের রিযিক হইতে পলায়ন করিতেও চায়, তবে রিযিক তাহাকে পাইবেই—যেমন মৃত্যু তাহাকে অবশ্যই পাইবে।

এক হাদীসে আছে, মানুষের রিযিক নির্ধারিত রহিয়াছে, যদি সমস্ত দুনিয়ার জিন ও মানুষ একত্রিত হইয়া তাহাকে রিযিক হইতে সরাইতে চায়, তবেও সরাইতে পারিবে না। (তরগীব)

এক হাদীসে ছযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ

করিয়াছেন, যদি তোমার মধ্যে চারটি জিনিস থাকে, তবে দুনিয়ার কোন জিনিস না হওয়ার কারণে দুঃখ হইবে না। এক—আমানতের হেফাজত, দুই—কথার মধ্যে সত্যতা, তিন—উত্তম চরিত্র, চার—রুখির পবিত্রতা।

এক হাদীসে আছে, মোবারক ঐ ব্যক্তি যাহার কামাই উত্তম (অর্থাৎ পবিত্র) হয়, অন্তর নেক হয়, আচার-আচরণ উন্নত হয়, তাহার অনিষ্টতা হইতে মানুষ নিরাপদে থাকে। মোবারক ঐ ব্যক্তি, যে নিজের এলোমেল উপর আমল করে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল (আল্লাহর রাস্তায়) খরচ করিয়া দেয় এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বন্ধ করে অর্থাৎ অপ্রয়োজনীয় কথা বলে না।

হযরত সা'আদ (রাযিঃ) একবার ছয়ুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দরখাস্ত করিলেন যে, আমার জন্য এই দোয়া করিয়া দিন যে, আল্লাহ তায়ালা আমাকে ঐ সমস্ত লোকের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেন, যাহাদের দোয়া কবুল হয় (অর্থাৎ যে কোন দোয়া করে কবুল হইয়া যায়)। ছয়ুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি তোমার উপার্জনকে পবিত্র বানাইয়া লও (সন্দেহজনক মাল খাইও না) ; তবেই তুমি যাহাদের দোয়া কবুল হয় তাহাদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে। ঐ পবিত্র সম্ভার কসম, যাহার হাতে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর প্রাণ—মানুষ একটি হারাম লোকমা ভক্ষণ করে, যাহার কারণে তাহার চল্লিশ দিনের এবাদত কবুল হয় না। আর যাহার প্রতিপালন হারাম মাল দ্বারা হইয়াছে, জাহান্নাম তাহার জন্য বেশী উপযুক্ত। এই বিষয়ে আরো অনেক রেওয়ায়াত হাদীসে আসিয়াছে। (তারগীব)

এইজন্য নিজের আমদানীর পন্থাসমূহের ব্যাপারে বড় সতর্কতা অবলম্বন করা চাই। বাহ্যিক দৃষ্টিতে যদিও এই সতর্কতার মধ্যে কোন ক্ষতি দেখা যায় ; তবুও বরকত এবং পরিণামের দিক দিয়া এই ক্ষতি অনেক বেশী উপকারী এবং ক্ষতি হইতে রক্ষাকারী হইবে।

উপরোক্ত হাদীসে চতুর্থ প্রশ্ন এই যে, মাল কোথায় খরচ করিয়াছে? এই কিতাব সম্পূর্ণটাই এই বিষয়ে যে, মানুষের সম্পদের মধ্য হইতে তাহার কাজে আসে শুধু উহাই, যাহা সে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিয়া দেয়। উহা মওজুদ থাকিয়া যাওয়ার মধ্যে এক ক্ষতি তো এই যে, নিজের কোন কাজে আসিল না ; শুধু শুধুই অনর্থক রহিয়া গেল—ইহা ছাড়া আরো বিভিন্ন ক্ষতির বিষয়ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শেষাংশে উল্লেখ করা হইয়াছে। আর মাল যত বেশী হইবে, ততই হিসাবের মধ্যে দেবী লাগা তো একটি পরিষ্কার কথা। কিয়ামতের সেই কঠিন ভয়াবহ দিনে যাহাতে

প্রচণ্ড গরমের কারণে প্রত্যেক ব্যক্তিকে ঘর্মাক্ত হইতে থাকিবে, প্রত্যেক ব্যক্তি ভীষণ ভয়ের কারণে এইরূপ মনে হইবে, যেন নেশাগ্রস্ত ; অথচ প্রকৃতপক্ষে নেশাগ্রস্ত হইবে না। যেমন আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন—

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ۖ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ
يَوْمَ تَرَوْهَا تَذْهَبُ كُلُّ مَرْغَبَةٍ عَمَّا أَرْغَبَتْ وَتَنْفَعُ كُلُّ دَابَّةٍ
عَمَلُهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَهُمْ بِسُكْرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ
اللَّهِ شَدِيدٌ ۝

হে লোকসকল ! আপন প্রতিপালককে ভয় কর। নিঃসন্দেহে কিয়ামতের প্রকম্পন (যাহা শীঘ্রই আসিতেছে) অত্যন্ত ভয়ংকর ব্যাপার হইবে। যেদিন তোমরা উহা দেখিবে, সেদিন সমস্ত স্তন্যদায়িনী নারীগণ (ভয়ের কারণে) নিজেদের দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ভুলিয়া যাইবে। সমস্ত গর্ভবতী নারীরা (ভয়ের কারণে সময়ের পূর্বেই) গর্ভস্থ সন্তানকে (অপূর্ণ অবস্থায়) গর্ভপাত করিয়া দিবে এবং আপনি লোকদেরকে নেশাগ্রস্ত অবস্থার ন্যায় দেখিবেন ; অথচ তাহারা প্রকৃতপক্ষে নেশাগ্রস্ত হইবে না। বরং আল্লাহ তায়ালা আযাবই কঠিন (যাহার ভয়ে তাহাদের সকলের এই অবস্থা হইবে)। (হুজ্বা : ১-২)

অন্য এক আয়াতে এরশাদ হইয়াছে—

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ۝

মানুষের হিসাবের দিন তো নিকটে আসিয়া গিয়াছে (অর্থাৎ কিয়ামত দ্রুত নিকটে আসিতেছে)। অথচ ইহারা (এখনও পর্যন্ত) গাফলতির মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে (এবং উহার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হইতে) মুখ ফিরাইয়া রহিয়াছে। (আম্বিয়া : ১) কয়েক বাক্য পর এরশাদ হইয়াছে—

وَتَنْفَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْرَ لَيْلِي ۖ فَلَا تظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۚ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالُ
حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۚ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ ۝

আর আমি কিয়ামতের দিন ইনসাফের পাল্লা কায়ম করিব এবং কাহারও উপর কোন প্রকার জুলুম করা হইবে না। যদি সরিষার দানা পরিমাণও কাহারও কোন আমল (ভাল অথবা মন্দ) হয়, তবে আমি উহা সেইখানে সম্মুখে আনিব। আর আমি হিসাব লওয়ার জন্য যথেষ্ট।

অন্য এক আয়াতে এরশাদ হইয়াছে—

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْخَيْرِ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْجُدُوا لَهُ
لَوْ أَنَّ لَهُمْ ثَمَانِ مِائَةِ مِائَةِ مِائَةٍ مِثْلَهُ لَفَتَقَدُوا بِهَا أُولَئِكَ
لَهُمْ صُورُ الْحِسَابِ

যাহারা আপন প্রতিপালকের কথা মানিয়া লইয়াছে (এবং তাহার হুকুম-আহকাম মানিয়াছে), তাহাদের জন্য উত্তম বিনিময় রহিয়াছে (যাহা জান্নাতে তাহাদিগকে দেওয়া হইবে)। আর যাহারা কথা মানে নাই, তাহাদের নিকট (কিয়ামতের দিন) যদি সমস্ত দুনিয়ার জিনিসসমূহ থাকে বরং উহার সহিত সেই পরিমাণ আরও থাকে (অর্থাৎ সারা দুনিয়ার সমস্ত জিনিসের দ্বিগুণ হয়), তবে ঐ সমস্ত জিনিস নিজের (মুক্তির জন্য) ফিদইয়া হিসাবে দিয়া দিবে। এই সমস্ত লোকের কঠিন হিসাব হইবে।

(রাদ : ১৮)

আরও অনেক আয়াতে ঐ দিনের হিসাব উহার কঠোরতা ও গুরুত্বের উপর সতর্ক করা হইয়াছে। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার এরশাদ করিয়াছেন, কিয়ামতের দিন যে ব্যক্তির হিসাব লওয়া হইবে, সে ধ্বংস হইয়া যাইবে (কারণ, পুরাপুরি হিসাব দিতে পারা অত্যন্ত মুশকিল হইবে)।

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা তো (সূরায়ে ইয়াস সামাউন শাক্কাতের মধ্যে) এরশাদ করিয়াছেন যে, সহজ হিসাব হইবে। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই হিসাব (যাহা এই সূরাতে উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহা) তো শুধুমাত্র আমল পেশ হওয়ার কথা বলা হইয়াছে। যাহার হিসাব শুরু হইয়া যাইবে, সে ধ্বংস হইয়া যাইবে।

অন্য এক হাদীসে হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া করিতেন, হে আল্লাহ! আমার নিকট হইতে সহজ হিসাব লও। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সহজ হিসাব কি জিনিস? হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যাহার আমলনামা দেখিয়া এই বলিয়া দেওয়া হইবে যে, তাহাকে মাফ করিয়া দিলাম। কিন্তু যাহার হিসাব লইতে আরজ করা হইল, সে ধ্বংস হইয়া গেল।

হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করেন যে, তিনটি বিষয় এমন রহিয়াছে, যে ব্যক্তির মধ্যে

উহা থাকিবে, তাহার হিসাব সহজ হইবে এবং আল্লাহ তায়ালা তাহাকে নিজ রহমতে জাহান্নামে দাখেল করিবেন। ঐ তিনটি বিষয় হইল, যে ব্যক্তি তোমাকে তাহার অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত রাখে, তুমি তাহার উপর অনুগ্রহ কর। যে তোমার উপর জুলুম করে, তুমি তাহাকে ক্ষমা কর। যে তোমার সহিত আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে, তুমি তাহার সহিত আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখ। (দুররে মানসূর)

এক হাদীসে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের প্রত্যেকের সহিত আল্লাহ তায়ালা এইভাবে সরাসরি কথা বলিবেন যে, তাহার এবং আল্লাহ তায়ালা মাঝখানে না কোন পর্দা থাকিবে, না কোন মাধ্যম থাকিবে। সে নিজের ডানদিকে দৃষ্টি করিবে তো ঐ সমস্ত আমল দেখিবে, যাহা সে দুনিয়াতে করিয়াছে। বামদিকে দৃষ্টি করিবে তো ঐ সমস্ত আমল দেখিবে, যাহা সে করিয়াছিল (নেক আমল হউক অথবা খারাপ আমল হউক, জুলন্ত) দোষের চোখের সামনে হইবে। উহা হইতে (রক্ষা পাইবার) উত্তম জিনিস হইল, সদকা। (অতএর, সদকার দ্বারা উহা হইতে) আত্মরক্ষা কর—চাই অর্ধেক খেজুর সদকা করার দ্বারা হউক না কেন। (মিশকাত)

এক হাদীসে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমাকে জাহান্নাম দেখানো হইয়াছে। উহার উচ্চ স্তরসমূহে গরীব মোহাজিরগণ ছিলেন এবং সেখানে ধনীলোক ও স্ত্রীলোক অনেক কম পরিমাণে ছিল। আমাকে বলা হইয়াছে যে, ধনী লোকেরা তো এখন জাহান্নামের দরজায় হিসাবে লিপ্ত রহিয়াছে। আর স্ত্রীলোকদিগকে স্বর্ণ-রৌপ্যের মহাবত মশগুল করিয়া রাখিয়াছে।

অন্য এক হাদীসে আছে, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি জাহান্নামের দরজায় দাঁড়াইয়াছিলাম। অধিকাংশ গরীব-মিসকীন উহাতে প্রবেশ করিতেছিল। আর ধনীলোকগণ (হিসাবে) আটকা ছিল। আমি দোষের দরজায় দাঁড়াইয়া দেখিয়াছি যে, স্ত্রীলোকগণ উহাতে অধিক পরিমাণে প্রবেশ করিতেছিল।

আর এক হাদীসে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষ দুইটি জিনিস হইতে খাবড়ায় ; অথচ দুইটিই তাহার জন্য মঙ্গলজনক। এক—মৃত্যু হইতে খাবড়ায় ; অথচ মৃত্যু দ্বারা ফেতনা হইতে আত্মরক্ষা হয়। দ্বিতীয়—সম্পদের অভাব হইতে খাবড়ায় অথচ সম্পদ যত কম হইবে হিসাব ততই কম হইবে। (তরগীব)

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার সাহাবায়ে কেরাম

(রাযিঃ)এর এক জামাতে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে তিনি এরশাদ করিলেন, আমি আজ রাতে জামাত এবং উহাতে তোমাদের মর্তবাসমূহ দেখিয়াছি। অতঃপর তিনি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)এর দিকে ফিরিয়া এরশাদ করিলেন, আমি এক ব্যক্তিকে দেখিয়াছি, সে জামাতের যে দরজার সামনেই যাইতেছিল, উহা হইতে মারহাবা মারহাবা (আসুন আসুন)এর আওয়াজ আসিতেছিল। (প্রত্যেক নেক আমলের জন্য জামাতে একটি বিশেষ দরজা আছে। প্রত্যেক দরজা হইতে আবেদন জানাইবার অর্থ এই যে, প্রত্যেক নেক আমলের মধ্যে ঐ ব্যক্তির মর্তবা অনেক উর্ধ্বে)।

হযরত সালমান (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যে ব্যক্তির এই মর্তবা রহিয়াছে, সে তো অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের লোক হইবে। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সেই ব্যক্তি হইল আবু বকর (রাযিঃ)। অতঃপর হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওমর (রাযিঃ)এর দিকে ফিরিয়া এরশাদ করিলেন, আমি জামাতে সাদা মোতির একটি ঘর দেখিয়াছি, যাহাতে মূল্যবান ইয়াকুত পাথর খোদিত ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এই ঘর কাহার? আমাকে বলা হইল, ইহা কুরাইশের এক নওজওয়ানের। (সেই ঘরের অত্যন্ত উৎকৃষ্টতা, চাকচিক্য ও সৌন্দর্য দেখিয়া এবং নিজের সাইয়েদুল মুরসালিন হওয়ার কথা মনে করিয়া) আমার ধারণা হইল যে, এই ঘর আমারই হইবে। সুতরাং আমি উহাতে প্রবেশ করিতে লাগিলাম। তখন আমাকে বলা হইল, ইহা ওমর (রাযিঃ)এর জন্য। অতঃপর হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওসমান (রাযিঃ), হযরত আলী (রাযিঃ) আরও অন্যান্য কয়েকজনের মর্তবা বলিলেন। অতঃপর হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাযিঃ)এর দিকে ফিরিয়া এরশাদ করিলেন, আমার সাথীদের মধ্যে তুমি অনেক দেরীতে আমার নিকট পৌঁছিয়াছ। আমার তো তোমার সম্পর্কে এই ভয় হইয়া গিয়াছিল যে, নাজানি তুমি ধ্বংস হইয়া গেলে। তুমি ঘর্মাক্ত হইতেছিলে, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার আসিতে এত দেরী হইল কোথায়? তুমি জবাব দিলে যে, আমি আমার সম্পদের আধিক্যের কারণে হিসাবে লিপ্ত ছিলাম। আমাকে এই বিষয়ে হিসাব দিতে হইয়াছে যে, সম্পদ কোথা হইতে কামাই করিয়াছি এবং কোথায় খরচ করিয়াছি। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাযিঃ) নিজের সম্পর্কে ইহা শুনিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! রাত্রই আমার নিকট মিসরের ব্যবসা হইতে একশত উট আসিয়াছে। আমি

উহা মদীনা মুনাওওয়ারার গরীব, দরিদ্র ও এতীমদের উপর সদকা করিয়া দিলাম। হযরত আব্বাহ তায়্যাল্লা ইহার কারণে আমার উপর ঐ দিনের হিসাব হালকা করিয়া দিবেন। (তরগীব)

এক হাদীসে আছে, একবার হযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আবদুর রহমান! তুমি আমার উম্মতের ধনী লোকদের মধ্যে। আর জাম্মাতে হামাওড়ি দিয়া প্রবেশ করিবে (পায়ের উপর দাঁড়াইয়া প্রবেশ করিবে না)। তুমি আব্বাহ তায়্যাল্লাকে করজ দাও, যাহাতে তোমার পা খুলিয়া যায়। হযরত আবদুর রহমান (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, কি জিনিস করজ দিব। হযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার সমস্ত মাল। ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ নিজের সমস্ত মাল আনিয়া হাজির করিবার জন্য উঠিলেন। হযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার পিছনে দূত পাঠাইয়া তাহাকে ডাকিলেন এবং এই এরশাদ করিলেন যে, হযরত জিবরাঈল (আঃ) এই মুহূর্তে আসিয়াছেন এবং এই পয়গাম দিয়া গিয়াছেন যে, আবদুর রহমানকে বলিয়া দিন—সে যেন মেহমানদারী করে, গরীবদেরকে খানা খাওয়ায়, সওয়ালকারীদের সওয়াল পূরা করে এবং তাহার আত্মীয়-স্বজনদের হইতে সদকা-খয়রাত আরস্ত করে—এই জিনিসগুলি তাহার সংশোধনের জন্য যথেষ্ট। (হাকেম)

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাযিঃ) উচ্চ পর্যায়ের সাহাবী। অনেক সম্প্রদান ও গৌরবের অধিকারী। ঐ দশজন সাহাবীদের মধ্য হইতে একজন যাহাদের সম্পর্কে দুনিয়াতেই হযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাম্মাতের সুসংবাদ দিয়া গিয়াছেন। এমনভাবে, তিনি ঐ ছয়জনের একজন, যাহাদের উপর হযরত ওমর (রাযিঃ) তাঁহার শাহাদতের সময় পরবর্তী খলীফা বানাইবার দায়িত্ব দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, এই লোকগুলির প্রতি হযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তুষ্ট হইয়া দুনিয়া হইতে বিদায় নিয়াছেন। পরিশেষে এই ছয় ব্যক্তির বাকী পাঁচজন তাঁহারই রায়ের উপর খলীফা নির্বাচন সাব্যস্ত করিয়াছিলেন; তাঁহারই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হযরত ওসমান (রাযিঃ) তৃতীয় খলীফা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইসলাম গ্রহণে যাহারা প্রথম কাতারে ছিলেন, তিনি তাঁহাদের মধ্যে একজন। যাহাদের সম্পর্কে আব্বাহ পাক বলিয়াছেন : وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الْآيَةُ অর্থাৎ, আর যে সমস্ত মুহাজির ও আনসার ইমান আনার ব্যাপারে অন্যান্যদের হইতে অগ্রবর্তী আর যাহারা একলাসের সহিত তাহাদের

অনুসারী, আল্লাহ তায়ালা তাহাদের সকলের উপর রাজি হইয়াছেন এবং তাহারা সকলেই আল্লাহ তায়ালা প্রতি রাজি হইয়াছে। আল্লাহ তায়ালা তাহাদের জন্য এমন বাগান তৈরী করিয়া রাখিয়াছেন, যাহার তলদেশে স্বর্ণাসমূহ প্রবাহিত থাকিবে। উহাতে তাহারা চিরকাল অবস্থান করিবে।

(তওবা : ১০০)

ইহা ছাড়া হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাযিঃ) উত্তর হিজরতই করিয়াছেন। বদর যুদ্ধ এবং অন্যান্য যুদ্ধে শরীক হইয়াছেন। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জমানাতেই তাঁহাকে ওলামা ও মুফতীদের মধ্যে গণ্য করা হইত। শুধু তাঁহার অভিমতের উপর হযরত ওমর (রাযিঃ) কোন কোন বিষয় ফয়সালা করিয়াছেন। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার সফরে ফজরের নামায তাঁহার মুক্তাদি হইয়া আদায় করিয়াছেন—হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রয়োজনে বাহিরে গিয়াছিলেন, তখন সাহাবায়ে কেবাম সকলে একমত হইয়া তাঁহাকে ইমাম বানাইয়াছিলেন। যখন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরিয়া আসিলেন, তখন নামায হইতেছিল, এক রাকাত হইয়া গিয়াছিল। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার পিছনে নামায পড়িলেন। যখন হযরত ওমর (রাযিঃ) খলীফা হইলেন, তখন প্রথম বৎসর তাঁহাকে নিজের শ্বলাভিষিক্ত করিয়া আমীরুল-হজ্জ বানাইয়া পাঠাইয়াছেন। (এসাবাহ)

মোটকথা, অসংখ্য ফযীলত থাকা সত্ত্বেও এই সম্পদের প্রাচুর্য তাহাকে নিজের সমমর্যাদার লোকদের হইতে পিছনে করিয়া দিয়াছে। আর এই ধন-সম্পদও আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহ এবং তাঁহার দান ও নেয়ামত হিসাবে পাইয়াছিলেন। নচেৎ তিনি অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। হিজরতের শুরুতে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন করিয়াছিলেন, যাহাতে আনসারগণ বিশেষ সম্পর্কের কারণে মুহাজিরগণকে সাহায্য সহযোগিতা করেন। সেই সময় তাঁহাকে হযরত সাদ ইবনে রবী আনসারী (রাযিঃ) এর ভাই বানাইয়াছিলেন। হযরত সাদ (রাযিঃ) তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, মদীনার মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধন-সম্পদ আল্লাহ তায়ালা আমাকে দিয়া রাখিয়াছেন। আমি সমস্ত মাল হইতে অর্ধেক করিয়া তোমাকে দিতেছি। আর আমার দুই স্ত্রী আছে, তাহাদের মধ্য হইতে যাহাকে তোমার পছন্দ হয় আমি তাহাকে তালাক দিয়া দিব। ইদত পালনের পর তুমি তাহাকে বিবাহ করিয়া লইবে। তাঁহার অশ্রুতুষ্টি এই যে, তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহ তায়ালা

তোমার সম্পদে বরকত দান করুন। আমার ইহার প্রয়োজন নাই। আমাকে তুমি এখানকার বাজারের রাস্তা বলিয়া দাও। অতঃপর তিনি বাজারে গেলেন এবং বেচাকেনা শুরু করিলেন। সন্ধ্যার সময় লাভ হিসাবে সামান্য কিছু ঘি এবং পনির বাঁচাইয়া লইয়া আসিলেন। এইভাবে তিনি প্রতিদিন যাইতেন। অল্প কয়েক দিনেই তাঁহার এই পরিমাণ মাল জমা হইয়া গেল যে, তিনি বিবাহ করিয়া লইলেন। (বুখারী)

তারপর এমন সময়ও আসিল, যখন হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার সদকা করিবার উৎসাহ প্রদান করিলেন, তখন নিজের সমস্ত মালের অর্ধেক অংশ সদকা করিলেন। তাঁহার অগাধ সম্পদের অনুমান ইহা দ্বারা হইতে পারে, যাহা একটু আগে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, শুধু মিসরের ব্যবসা হইতে সামান্য বোঝাই একশত উট আসিয়াছিল যাহা সম্পূর্ণই তিনি সদকা করিয়া দিলেন। উহার পর একবার তিনি চল্লিশ হাজার দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) সদকা করিলেন। একবার তিনি পাঁচশত ঘোড়া, পাঁচশত উট জিহাদের জন্য দিয়াছেন এবং ত্রিশ হাজার গোলাম আজাদ করিয়াছেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে, ত্রিশ হাজার পরিবার আজাদ করিয়াছেন। (মুত্তাদরাক) প্রত্যেক পরিবারে নাজানি কত পুরুষ, নারী, বয়স্ক ও শিশু ছিল। একবার একটি জমিন চল্লিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে বিক্রয় করিলেন এবং সম্পূর্ণটাই গরীব মুহাজির, নিজের আত্মীয়-স্বজন ও হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিগণের মধ্যে বন্টন করিয়া দিলেন। (মুত্তাদরাক)

এষ্টেকালের সময় যে ওসীয়াত করিয়াছিলেন, উহাতে এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যিনি বদরের যুদ্ধে শরীক ছিলেন মাথাপিছু চারশত দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) এর ওসীয়াত ছিল। সেই সময় বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে হইতে একশতজন জীবিত ছিলেন। (এসাবা)

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিদের জন্য তিনি একটি বাগানের ওসীয়াত করিয়াছিলেন। যাহা চল্লিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে বিক্রয় হইয়াছে। (মুত্তাদরাক)

আর স্বয়ং তাহার অবস্থা এই ছিল যে, একবার যখন গোসল করিয়া খাওয়ার জন্য বসিলেন, তখন একটি পেয়ালাতে রুটি ও গোশত (সারীদ) সামনে রাখা হইল। উহা দেখিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ কাঁদিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এষ্টেকাল এমন অবস্থায় হইয়াছে যে, যবের রুটিও পেট ভরিয়া খাওয়ার জন্য পাইতেন না। আমাদের এই অবস্থা যাহা সামনে

দেখিতেছি, দ্বিজেদের জন্য তেমন মঙ্গলজনক মনে হইতেছে না।

(এসাবাহ)

অর্থাৎ যদি এই প্রশংসিতা কোন কল্যাণের জিনিস হইত, তবে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যও হইত। যখন হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য এইসব জিনিস ছিল না, তখন এইগুলি কোনো মঙ্গলজনক জিনিস মনে হইতেছে না। এতসব সম্মান ও গুণাবলীর অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ঐরূপ হিসাব লওয়া হইবে, যাহা উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে।

উপরোক্ত হাদীসে বর্ণিত ৫ম প্রশ্ন যাহা সম্পর্কে কিয়ামতের দিন জওয়াব দিতে হইবে, তাহা হইল—আল্লাহ তায়ালা তোমাকে যে এলেম দান করিয়াছিলেন, উহার উপর কি পরিমাণ আমল করিয়াছ? কোনো অপরাধ বা অন্যায় কাজ জানা না থাকা কোন ওজর নয়; আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা কোন আদালতেই গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, উহা জানিয়া লওয়া নিজের কর্তব্য। আর এই কথা যে, আল্লাহর হুকুম জানা ছিল না—স্বতন্ত্র একটি অপরাধ এবং স্বতন্ত্র একটি গুনাহ। এইজন্য হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, প্রত্যেক মুসলমানের উপর (দ্বীনের) এলেম শিক্ষা করা ফরজ। কিন্তু ইহাও স্পষ্ট যে, জানার পর কোন অন্যায় করা আরও কঠিন অন্যায়। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ রহিয়াছে যে, নিজের এলেম দ্বারা একজন অপরজনকে নসীহত করিতে থাক। এলেমের মধ্যে খেয়ানত করা সম্পদের মধ্যে খেয়ানত করা অপেক্ষাও কঠিন অপরাধ। আল্লাহ তায়ালা নিকট এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইবে। আর এই বিষয় তো অনেক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, যাহার নিকট এলেমের কোন কথা জিজ্ঞাসা করা হয়, আর সে উহাকে গোপন করে, কিয়ামতের দিন তাহার মুখে আগুনের লাগাম পরাইয়া দেওয়া হইবে।

একবার হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াজ করিলেন, উহাতে তিনি কোনো কোনো কওমের প্রশংসা করিলেন। অতঃপর এরশাদ করিলেন, ইহা কেমন কথা যে, কোনো কোনো কওম দ্বিজেদের প্রতিবেশী কওমকে এলেম শিক্ষা দেয় না। না তাহাদিগকে নসীহত করে, না তাহাদিগকে দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান দান করে, না তাহাদিগকে ভাল কাজের হুকুম করে আর না খারাপ কাজ হইতে বিরত রাখে। আর ইহাই বা কেমন কথা যে, কোন কোন কওম আপন প্রতিবেশীদের নিকট হইতে না এলেম শিখে, না দ্বীনের বুঝ হাসিল করে, না নসীহত শিখে। এই সমস্ত লোক

হয়ত আপন প্রতিবেশীদেরকে এলেম শিক্ষা দিবে, তাহাদিগকে নসীহত করিবে, তাহাদিগকে দ্বীনের বুঝ দিবে এবং অন্যরা এই সকল জ্ঞানীদের নিকট হইতে উক্ত বিষয়সমূহ হাসিল করিবে। যদি এইরূপ না হয়, তবে আল্লাহর কসম, আমি তাহাদের সকলকে দুনিয়াতেই কঠিন শাস্তি দিব (আখেরাতের বিষয় তো ভিন্ন রহিল)। অতঃপর হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিস্বর হইতে নামিয়া আসিলেন। লোকদের মধ্যে এই ব্যাপারে বলাবলি হইল যে, কোন্ কওম সম্পর্কে ইহা বলা হইয়াছে। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আশআরী কওমের লোকদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে। কেননা, তাহাদের নিকট এলেম আছে, ফেকাহ আছে ; অথচ তাহাদের আশপাশে বসবাসকারী কওমসমূহ দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ। এই খবর আশআরী লোকদের নিকট পৌঁছিল। তাহারা হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন এবং আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আপনি কোনো কোনো কওমের তো প্রশংসা করিয়াছেন এবং আমাদের সম্পর্কে এরূপ এরশাদ করিয়াছেন। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের সম্মুখে এরশাদ করিলেন, এই সমস্ত লোক হয়ত আপন প্রতিবেশীদেরকে এলেম শিক্ষা দিবে, তাহাদিগকে নসীহত করিবে, তাহাদিগকে দ্বীনের বুঝ দান করিবে, তাহাদিগকে ভাল কাজের হুকুম করিবে, খারাপ কাজ হইতে নিষেধ করিবে আর অন্যরা তাহাদের নিকট হইতে এইসব জিনিস শিক্ষা করিবে। যদি এইরূপ না হয়, তবে আমি দুনিয়াতেই কঠিন শাস্তি দিব। তাহারা আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমরা অন্যদেরকে কিভাবে জ্ঞানদান করিব? হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় ঐ হুকুম এরশাদ করিলেন। তাহারা তৃতীয়বারও একই আরজ করিলেন। আর হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবারও সেই হুকুমই এরশাদ করিলেন। তাহারা আরজ করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আচ্ছা, আমাদেরকে এক বৎসরের সময় দিন। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে নিজেদের প্রতিবেশীদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য এক বৎসরের সময় দিয়া দিলেন।

(তরগীব, মাজমাউয-যাওয়ায়েদ)

উক্ত হাদীস এবং হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কঠিন ধর্মিক দ্বারা ইহাও স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, যাহারা স্বয়ং এলেম রাখে, বুঝ রাখে—তাহাদের এই জিম্মাদারীও রহিয়াছে যে, নিজেদের আশেপাশে বসবাসকারী মুর্খ লোকদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করিবে। তাহাদের এই ধারণা যে, যাহার ইচ্ছা হইবে সে নিজেই শিখিবে, যথেষ্ট নয়। নিজেরা

না শিখিবার জবাবদিহি এবং উহার গুনাহ ভিন্নভাবে তাহাদের জিম্মায় রহিয়াছে। কিন্তু তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়ার জিম্মাদারী এই সমস্ত আলেমগণেরও রহিয়াছে যে, তাহারা নিজেরা চেষ্টা করিবে, ইহার অন্য ব্যবস্থা করিবে—যাহাতে তাহারা শিখিতে পারে; ইহাও নিজের এলেমের উপর আমল করার অন্তর্ভুক্ত। কেননা, এলেম অনুযায়ী আমলের মধ্যে উহা শিক্ষা দেওয়াও शामिल রহিয়াছে।

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে যে সমস্ত দোয়া অধিক পরিমাণে বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে এই দোয়াও অধিক পরিমাণে রহিয়াছে—হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এমন এলেম হইতে পানাহ চাহিতেছি, যাহা উপকার করে না। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে (অর্থাৎ এক শ্রেণীর লোকদেরকে—চাই ঐ শ্রেণীর যত লোকই হউক না কেন) উপস্থিত করা হইবে এবং তাহাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। ইহাতে তাহার নাড়িভূড়ি বাহির হইয়া পড়িবে আর সে উহার চতুর্দিকে এমনভাবে ঘুরিতে থাকিবে, যেমন গাধা জাঁতার চতুর্পার্শ্বে ঘোরে। (অর্থাৎ যেমন গাধা গরু ইত্যাদি আটা পিষার চাকির চতুর্দিকে ঘুরিতে থাকে) জাহান্নামের লোকেরা তাহার চতুর্দিকে জমা হইয়া যাইবে এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, তোমার কি হইল, তুমি তো আমাদেরকেও ভাল কাজের হুকুম করিতে, খারাপ কাজ হইতে বিরত রাখিতে। সে জবাব দিবে, আমি তোমাদিগকে উহার হুকুম করিতাম কিন্তু নিজে উহার উপর আমল করিতাম না।

অন্য এক হাদীসে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি মেরাজের রাত্রিতে একদল লোককে দেখিয়াছি, তাহাদের ঠোঁট জাহান্নামের আগুনের কেঁচি দ্বারা কাটা হইতেছে। আমি হযরত জিবরাঈল (আঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহারা কাহারা? তিনি বলিলেন, ইহারা আপনার উম্মতের ঐ সমস্ত ওয়ায়েজ ও বক্তা, যাহারা অন্যদেরকে নসীহত করিত এবং নিজেরা উহার উপর আমল করিত না।

অন্য এক হাদীসে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, গুনাহের কাজে লিপ্ত থাকিত এমন সমস্ত লেখাপড়া জানা লোকদেরকে 'যাবানিয়া' কাফেরদের পূর্বেই পাকড়াও করিবে। তাহারা বলিবে, একি আমাদের পাকড়াও কাফেরদেরও পূর্বে হইতেছে! তাহাদেরকে জওয়াব দেওয়া হইবে—আলেম ও জাহেল বরাবর হয় না।

(তরগীব)

(অর্থাৎ তোমরা জানা সত্ত্বেও এইসব অন্যায় করিয়াছ) 'যাবানিয়া'

হইল লোকদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবার কাজে নিয়োজিত ফেরেশতাদের অত্যন্ত কঠিন স্বভাব দল। সূরায়ে ইকরাতের তাহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে।

এক হাদীসে আছে, কিছুসংখ্যক জাহান্নামী লোক কিছুসংখ্যক জাহান্নামী লোকদের নিকট যাইয়া বলিবে, তোমাদের কি হইয়াছে, তোমরা এখানে পড়িয়া আছ, আমরা তো তোমাদেরই কারণে জাহান্নামে গিয়াছি? অর্থাৎ আমরা তোমাদের নিকট হইতেই এলেম শিখিয়াছিলাম। তাহারা জওয়াব দিবে, আমরা অন্যদেরকে তো বলিতাম ; কিন্তু নিজেরা উহার উপর আমল করিতাম না।

হযরত মালেক ইবনে দিনার (রহঃ) হযরত হাসান বসরী (রহঃ) হইতে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন, যে কোন ব্যক্তি ওয়াজ করে, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, তাহার উদ্দেশ্য কি ছিল। (অর্থাৎ উহা দ্বারা কোন দুনিয়াবী স্বার্থ, ধন-সম্পদ, মুনাফা অর্জন অথবা সম্মান ও খ্যাতি লাভ করা উদ্দেশ্য ছিল কিনা, নাকি খালেস আল্লাহর ওয়াস্তে ওয়াজ করিয়াছিল)।

হযরত মালেক (রহঃ) এর সাগরেদ বলেন, মালেক (রহঃ) যখন এই হাদীস বর্ণনা করিতেন, তখন এত কাঁদিতেন যে, আওয়াজ বন্ধ হইয়া যাইত। অতঃপর বলিতেন, তোমরা মনে কর ওয়াজের দ্বারা আমার চক্ষু শীতল হয় (অর্থাৎ আমার মন খুশী হয়) ; অথচ আমার জানা আছে যে, কিয়ামতের দিন আমাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, এই ওয়াজের উদ্দেশ্য কি ছিল। (তরগীব)

ইহা সত্ত্বেও যে কারণে ওয়াজ করিতে বাধ্য হইতে হয় উহা কিছু পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। অর্থাৎ লোকদেরকে এলেম শিক্ষা দেওয়ার জিম্মাদারীও রহিয়াছে। যেমন অনেক রেওয়াজাতে বর্ণিত হইয়াছে। আশআরী লোকদের ঘটনাও কিছু পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বলিতেন, আমার এই ব্যাপারে ভয় হয় যে, কিয়ামতের দিন সমস্ত মখলুকের সামনে আমাকে ডাকা হয়, আমি আরজ করি, লাকবাইকা রব্বী—আমার রব আমি হাজির আছি আর সেখান হইতে প্রশ্ন করা হয় যে, নিজের এলেম অনুযায়ী কি আমল করিয়াছিলে?

অন্য এক হাদীসে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কিয়ামতের দিন কঠিনতম শাস্তি ঐ আলেমের হইবে, যাহার এলেম দ্বারা তাহার কোন উপকার হয় না।

হযরত আশ্শার ইবনে ইয়াসির (রাযিঃ) বলেন, আমাকে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কায়েস গোত্রের তালীমের জন্য পাঠাইলেন। আমি যাইয়া দেখিলাম যে, তাহারা জংলী উটের মত। তাহাদের ধ্যান সর্বদা নিজদের উট ও বকরির মধ্যে লাগিয়া থাকে। ইহা ছাড়া অন্য কোন চিন্তাই তাহাদের নাই (সর্বদা কেবল দুনিয়ার ধাক্কার মধ্যে লাগিয়া থাকে)। আমি সেখান হইতে ফিরিয়া আসিলাম। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কি করিয়া আসিয়াছ? আমি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাহাদের অবস্থা বর্ণনা করিয়া দিলাম এবং (দ্বীনের ব্যাপারে) তাহাদের অবহেলার খবর শুনাইলাম। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, হে আশ্শার! ইহা হইতে অধিক আশ্চর্যের বিষয় ঐ সমস্ত লোকের অবস্থা, যাহারা আলেম হওয়া সত্ত্বেও (দ্বীনের ব্যাপারে) এইরূপ গাফেল, যেরূপ ইহারা গাফেল রহিয়াছে।

অন্য এক হাদীসে আছে, কোন কোন মানুষকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। যাহাদের দুর্গন্ধে অন্যান্য জাহান্নামী লোকেরাও পেরেশান হইয়া যাইবে। ঐ সমস্ত লোক তাহাদেরকে বলিবে, তোমাদের এমন কি আমল ছিল, যাহার এই দুর্গতি? আমরা যে মুসীবতে গ্রেফতার ছিলাম, উহাই তো আমাদের জন্য যথেষ্ট ছিল? তোমাদের এই দুর্গন্ধ আরো বেশী পেরেশান করিয়া দিয়াছে। তাহারা বলিবে, আমরা আমাদের এলেম দ্বারা ফায়দা উঠাইতাম না। (তরগীব)

হযরত ওমর (রাযিঃ) বলেন, এই উম্মতের উপর মুনাফেক আলেমদের ব্যাপারে আমার বেশী ভয় হয়। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, মুনাফেক আলেম কাহারা? তিনি বলিলেন, মুখে আলেম; দিল ও আমলের হিসাবে জাহেল। অর্থাৎ বক্তৃতা তো আকর্ষণীয় করে; কিন্তু আমলের দিক দিয়া শূন্য।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, তুমি এইরূপ হইও না যে, আলেমগণের এলেম জমা কর, জানীদের দুর্লভ বাণী বহন করিয়া চল; অথচ আমলের দিক দিয়া আহমক বেওকুফদের মত হও।

হযরত সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) বলেন, এলেম আমলের জন্য আহ্বান করে। যদি কেহ উহার উপর আমল করে, তবে এলেম বাকী থাকে। নচেৎ উহাও চলিয়া যায়। অর্থাৎ এলেম বরবাদ হইয়া যায়।

হযরত ফুজায়েল (রহঃ) বলেন, তিন ব্যক্তির প্রতি আমার বড় দয়া হয়। এক—সমাজের সর্দার, যে অপমানিত হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়—ঐ

ধনী যে ধনী হওয়ার পর দরিদ্র হইয়া গিয়াছে। তৃতীয় ঐ আলেম, যাহার সহিত দুনিয়া খেলা করে (অর্থাৎ সে দুনিয়া তলব করে; আর যে দুনিয়া তলব করে, দুনিয়া তাহার সহিত খেলা করে)।

হযরত হাসান (রহঃ) বলেন, আলেমের আযাব হইল, তাহার দিল মরিয়া যাওয়া। আর দিলের মৃত্যু হইল, আখেরাতের আমল দ্বারা দুনিয়া তলব করা। যেমন কোন কবি বলিয়াছেন—

عُجِبْتُ لِمَتَاعِ الْعَالَمَةِ بِالْعَدَى وَمَنْ يَشْتَرِي دُنْيَاهُ بِالَّذِينَ أُعْجِبَ
وَأُعْجِبُ مِنْ هَذَيْنِ مَنْ بَاعَ دِينَهُ بِدُنْيَا سَوَاءٍ فَهُوَ مِنْ ذَيْنِ أُعْجِبَ

অর্থাৎ, আমি আশ্চর্য হই ঐ ব্যক্তির উপর, যে হেদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহী খরিদ করে। আর তাহার চেয়েও বেশী আশ্চর্য হই ঐ ব্যক্তির উপর, যে দ্বীনের বিনিময়ে দুনিয়া খরিদ করে। আর এই উভয় ব্যক্তি হইতে বেশী আশ্চর্য হই ঐ ব্যক্তির উপর, যে নিজের দ্বীনকে অন্যদের দুনিয়ার বিনিময়ে বিক্রয় করিয়া দেয়। অর্থাৎ দুনিয়ার ফায়দা তো অন্যদের হয়, আর তাহার দ্বীন ধ্বংস ও বরবাদ হইয়া যায়।

ইমাম গাযযালী (রহঃ) বলেন, যে আলেম দুনিয়াদার হয়, সে অবস্থার দিক দিয়া জাহেল অপেক্ষা অধিক অপদার্থ। আর আজাবের দিক দিয়া সে অভ্যস্ত কঠিন আজাবে গ্রেফতার হইবে। প্রকৃত সফলকাম ও আল্লাহ তায়ালায় নৈকট্যপ্রাপ্ত হইলেন—আখেরাতমুখী উলামায়ে কেরাম, যাহাদের কয়েকটি আলামত রহিয়াছে—

① নিজে এলেম দ্বারা দুনিয়া কামায় করেন না। আলেমের সর্বনিম্ন স্তর হইল, তাহার মধ্যে দুনিয়ার তুচ্ছতা, উহার নিচতা, উহার অপবিত্রতা ও উহার ক্ষণস্থায়িত্বের অনুভূতি থাকে। আখেরাতের শ্রেষ্ঠত্ব, উহার স্থায়িত্ব এবং উহার নেয়ামতসমূহ উত্তম হওয়ার অনুভূতি থাকে। এই বিষয় ভাল করিয়া জানেন যে, দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টি একটি আরেকটির বিপরীত ; দুই সতীনের মত। যে কোন একটিকে রাজি করিবে অপরটি নারাজ হইয়া যাইবে। এই দুইটি নিজের দুই পাল্লার মত—যখনই একটি পাল্লা ঝুকিবে অপরটি হালকা হইয়া যাইবে। উভয়ের মধ্যে পূর্ব পশ্চিমের ন্যায় পার্থক্য রহিয়াছে—তুমি যে কোন একটির নিকটবর্তী হইবে অপরটি হইতে দূরে সরিয়া যাইবে। যে ব্যক্তি দুনিয়ার তুচ্ছতা, উহার অপবিত্রতা এবং এই বিষয়ের অনুভূতি রাখে না যে, দুনিয়ার স্বাদসমূহ উভয় জাহানের কষ্টের সহিত মিলিত রহিয়াছে, তাহার আকল নষ্ট হইয়া গিয়াছে, নিত্যদিনের দেখাশোনা ও অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, দুনিয়ার স্বাদ গ্রহণের

মধ্যে দুনিয়াতেও কষ্ট রহিয়াছে এবং আখেরাতের কষ্ট তো আছেই। সুতরাং যে ব্যক্তির আকল-বুদ্ধিই নাই, কিভাবে সে আলেম হইতে পারে? বরং যে ব্যক্তি আখেরাতের শ্রেষ্ঠত্ব এবং উহার স্থায়িত্বকেও জানেনা, সে তো কাফের। এইরূপ ব্যক্তি কিভাবে আলেম হইতে পারে, যাহার ঈমানও নসীব হয় নাই। আর যে ব্যক্তি দুনিয়া ও আখেরাতের একটি অপরটির বিপরীত হওয়া সম্পর্কে জানে না এবং উভয়ের মধ্যে একত্রিকরণের লালসায় রহিয়াছে, সে এইরূপ জিনিসের লালসা করিতেছে—যাহা লালসা করার বস্তু নহে। এইরূপ ব্যক্তি সমস্ত আশ্বিয়ায়ে কেরামের শরীয়ত সম্পর্কে অজ্ঞ। আর যে ব্যক্তি এইসব বিষয় জানা সত্ত্বেও দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়, সে শয়তানের কয়েদী। যাহাকে মনের বায়েশ ধ্বংস করিয়া রাখিয়াছে। দুর্ভাগ্য তাহার উপর চাপিয়া রহিয়াছে। যাহার এই অবস্থা হয়—সে কিভাবে উলামায়ে কেরামের মধ্যে গণ্য হইবে।

হযরত দাউদ (আঃ) আল্লাহ তায়ালায় এরশাদ নকল করিয়াছেন, যে আলেম দুনিয়ার খাহেশকে আমার মহব্বতের উপর প্রাধান্য দেয়, তাহার সহিত আমি একেবারে কমে পক্ষে আচরণ এই করি যে, আমার সহিত মুনাজাতের স্বাদ হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়া দেই (ফলে আমার স্মরণে, আমার নিকট দোয়া করার মধ্যে সে স্বাদ পায় না।) হে দাউদ! এইরূপ আলেমের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিও না, যাহার উপর দুনিয়ার নেশা সওয়ার হইয়া গিয়াছে। ইহা তোমাকে আমার মহব্বত হইতে দূরে সরাইয়া দিবে। এইসব লোক ডাকাত। হে দাউদ! যখন তুমি কাহাকেও আমার প্রতি আগ্রহী দেখ, তখন তাহার খাদেম হইয়া যাও। হে দাউদ! যে ব্যক্তি আমার দিকে দৌড়াইয়া আসে, আমি তাহাকে পরিপক্ক জ্ঞানী লিখিয়া দেই। আর যাহাকে আমি পরিপক্ক জ্ঞানী লিখিয়া দেই, তাহাকে শাস্তি দেই না।

ইয়াহুইয়া ইবনে মুআজ্জ (রহঃ) বলেন, এলেম ও হেকমত দ্বারা যখন দুনিয়া তলব করা হয়, তখন উহার সৌন্দর্য চলিয়া যায়।

সাদ্দ ইবনে মুসাইয়াব (রহঃ) বলেন, যখন কোন আলেমকে আমীর-ওমরাদের নিকট পড়িয়া থাকিতে দেখ, তখন তাহাকে চোর মনে করিও।

হযরত ওমর (রাযিঃ) বলেন, যে আলেমকে দুনিয়ার সহিত মহব্বত রাখিতে দেখ, তাহাকে আপন ধীনের ব্যাপারে ঋটিযুক্ত মনে কর। কেননা, যে ব্যক্তির কোন জিনিসের সহিত মহব্বত হয়, সে উহার মধ্যেই প্রবেশ করিয়া থাকে।

জনৈক বুয়ুর্গকে কেহ জিজ্ঞাসা করিল যে, যে ব্যক্তি গুনাহের মধ্যে

স্বাদ অনুভব করে, সে কি আল্লাহর মারেফাতপ্রাপ্ত হইতে পারে? তিনি বলিলেন, এই ব্যাপারে আমার সামান্যও সন্দেহ নাই—যে ব্যক্তি দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেয়, সে মারেফাতপ্রাপ্ত হইতে পারে না। আর গুনাহ করার ব্যাপার তো ইহা হইতে আরও অনেক বেশী জঘন্য। আর এই কথাও মনে রাখা উচিত যে, শুধু সম্পদের প্রতি মহব্বত না রাখিলেই আখেরাতের আলেম হওয়া যায় না। সম্মানের লিপ্সা এবং উহার ক্ষতি সম্পদ হইতেও বেশী। অর্থাৎ দুনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়া এবং দুনিয়া তলব করা সম্পর্কিত যতরকম ধর্মিক ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, সেইগুলির মধ্যে শুধু মাল কামাই করার বিষয়টিই অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং উহার মধ্যে সম্মানের লিপ্সা মাল তলব করা অপেক্ষা আরও বেশী অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। কেননা, সম্মানের লিপ্সার ক্ষতি মাল তলব করা হইতেও বেশী মারাত্মক।

② দ্বিতীয় আলামত এই যে, তাহার কথা ও কাজের মধ্যে বিরোধ না হয়; অন্যদেরকে ভাল কাজের হুকুম করে এবং নিজে উহার উপর আমল করে না—এমন যেন না হয়। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন—

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ

কি মারাত্মক ব্যাপার যে, অন্যদেরকে নেক কাজ করার জন্য বলিয়া থাক আর নিজের খবর লও না; অথচ তোমরা কিতাব তেলাওয়াত করিয়া থাক। (বাকারা : ৪৪)

অন্য এক আয়াতে এরশাদ হইয়াছে—

مَكْبَرٌ مَّقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

আল্লাহ তায়ালা নিকট ইহা অত্যন্ত অসঙ্গতির বিষয় যে, তোমরা এমন কথা বল, যাহা কর না। (ছফ : ৩)

হাতেম আছাম (রহঃ) বলেন, কিয়ামতের দিন ঐ আলেম অপেক্ষা বেশী আফসোসকারী আর কেহ হইবে না, যাহার কারণে অন্যরা এলেম শিখিয়াও উহার উপর আমল করিয়া সফলকাম হইয়া গিয়াছে। অথচ সে নিজে আমল না করার কারণে অকৃতকার্য রহিয়া গিয়াছে।

ইবনে সিমাক (রহঃ) বলেন, কত মানুষ এমন রহিয়াছে, যাহারা অন্যদেরকে আল্লাহ তায়ালা কথা স্মরণ করাইয়া দেয়; অথচ নিজেরা আল্লাহ তায়ালাকে ভুলিয়া থাকে। অন্যদেরকে আল্লাহ তায়ালা প্রতি ভয় প্রদর্শন করে; অথচ নিজেরা আল্লাহ তায়ালা উপর দুঃসাহস করে।

অন্যদেরকে আল্লাহ তায়ালা নিকটবর্তী করিয়া দেয় ; অথচ নিজেরা আল্লাহ তায়ালা হইতে দূরে। অন্যদেরকে আল্লাহ তায়ালা দিকে আহ্বান করে ; অথচ নিজেরা আল্লাহ তায়ালা নিকট হইতে পলায়ন করে।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে গানাম (রহঃ) বলেন, আমার নিকট দশজন সাহাবায়ে কেলাম (রাযিঃ) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমরা কোবার মসজিদে বসিয়া এলেম হাসিল করিতেছিলাম। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তশরীফ আনিলেন এবং বলিলেন, যত চাহ এলেম হাসিল করিয়া লও ; কিন্তু আল্লাহ তায়ালা নিকট হইতে আমল ছাড়া বিনিময় পাওয়া যায় না।

৩ তৃতীয় আলামত হইল—এমন এলেমসমূহের মধ্যে মশগুল হন, যাহা আখেরাতে কাজে আসিবে, নেক কাজে উৎসাহ সৃষ্টি করিবে। এমন এলেম হইতে বিরত থাকেন, যাহা দ্বারা আখেরাতে কোন উপকার নাই অথবা উপকার কম। আমরা আমাদের অজ্ঞতার কারণে ঐগুলিকেও এলেম বলিয়া থাকি, যাহা দ্বারা কেবল দুনিয়া কামাই করা উদ্দেশ্য হয়। অথচ সেগুলি চরম মূর্খতা। উহা শিখিয়া মানুষ নিজেকে শিক্ষিত বলিয়া মনে করিতে থাকে। অতঃপর তাহার মধ্যে দ্বীনের এলেমসমূহ শিখিবার প্রতি আগ্রহ থাকে না। যে ব্যক্তি একেবারেই পড়াশুনা করে নাই সে অন্ততপক্ষে নিজেকে মূর্খ তো মনে করে ; দ্বীনের বিষয়সমূহ জানিবার চেষ্টা তো করে। কিন্তু যে নিজের মূর্খতা সত্ত্বেও নিজেকে আলেম মনে করিতে থাকে, সে বড় ক্ষতির মধ্যে রহিয়াছে।

হাতেম আছাম (রহঃ) যিনি বিখ্যাত বুয়ুর্গ এবং হযরত শাকীক বলখী (রহঃ)এর খাস শাগরেদ ছিলেন। একবার তাহার উস্তাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে হাতেম ! কতদিন যাবত তুমি আমার সহিত রহিয়াছ ? তিনি আরজ করিলেন, তেরিশ বৎসর যাবৎ। জিজ্ঞাসা করিলেন, এতদিনের মধ্যে তুমি আমার নিকট হইতে কি শিখিয়াছ ? হাতেম (রহঃ) আরজ করিলেন, আটটি মাসআলা শিখিয়াছি। হযরত শাকীক (রহঃ) বলিলেন, ইম্মা লিল্লাহি ওয়া ইম্মা এলাইহি রাজ্জউন; এত দীর্ঘ সময়ের মধ্যে শুধু আটটি মাসআলা শিখিলে ? আমার গোটা জীবনই তো তোমার সহিত বরবাদ হইয়া গেল। হাতেম (রহঃ) আরজ করিলেন, হযুর ! শুধু আটটি মাসআলাই শিখিয়াছি ; মিথ্যা তো বলিতে পারি না। হযরত শাকীক (রহঃ) বলিলেন, আচ্ছা ; বল সেই আটটি মাসআলা কি কি।

হাতেম (রহঃ) আরজ করিলেন—

এক—আমি দেখিলাম যে, সমস্ত মাখলুকের মধ্যে প্রত্যেকেরই

কাহারও না কাহারও সহিত মহব্বত রহিয়াছে (শ্রীর সহিত, সম্ভান-সম্ভতির সহিত, সম্পদের সহিত, বন্ধু-বান্ধবের সহিত ইত্যাদি)। কিন্তু আমি দেখিলাম—যখন সে কবরে যায়, তখন তাহার প্রিয়জন তাহার নিকট হইতে পৃথক হইয়া যায়। এইজন্য আমি নেক আমলসমূহের সহিত মহব্বত করিয়া লইলাম। যাহাতে আমি যখন কবরে যাইব, তখন আমার প্রিয়জনও যেন আমার সাথে যায় এবং মৃত্যুর পরেও যেন সে আমার নিকট হইতে পৃথক না হয়।

হযরত শাকীক (রহঃ) বলিলেন, অনেক ভাল করিয়াছ।

দুই—আমি আল্লাহ তায়ালায় এরশাদ কুরআন পাকে দেখিয়াছি : **وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ الْآيَةَ** অর্থাৎ, যে ব্যক্তি (দুনিয়াতে) আপন রবের সম্মুখে (আখেরাতে) দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করিয়াছে এবং নফসকে (হারাম) খায়েশ হইতে বিরত রাখিয়াছে, তাহার ঠিকানা হইবে জান্নাত। (নাযিআত : ৪০) আমি বিশ্বাস করিয়া লইয়াছি যে, আল্লাহ তায়ালায় এরশাদ সত্য। আমি আমার নফসকে খাহেশাত হইতে অনবরত বিরত রাখিয়াছি। অবশেষে সে আল্লাহ তায়ালায় আনুগত্যের উপর স্থির হইয়া গিয়াছে।

তিন—আমি দুনিয়াকে দেখিয়াছি যে, প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট যে জিনিস বেশী মূল্যবান হয়, বেশী প্রিয় হয়, সে উহাকে বড় সাবধানতার সহিত উঠাইয়া রাখে ; উহার হেফাজত করে। অতঃপর আমি আল্লাহ তায়ালায় এরশাদ দেখিলাম : **مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ** অর্থাৎ, যাহা কিছু তোমাদের নিকট দুনিয়াতে আছে, উহা শেষ হইয়া যাইবে (চাই উহা এমনিই নিঃশেষ হইয়া যাক অথবা তোমরা মৃত্যুবরণ কর—সর্ব অবস্থায় উহা শেষ হইয়া যাইবে)। আর যাহা আল্লাহ তায়ালায় নিকট আছে, উহা সবসময় বাকী থাকিবে। (নাহল : ৯৬) এই আয়াত শরীফের কারণে যদি কোন জিনিস আমার নিকট কখনও গুরুত্বপূর্ণ মনে হইয়াছে এবং আমার বেশী পছন্দ হইয়াছে, উহা আমি আল্লাহ তায়ালায় নিকট পাঠাইয়া দিয়াছি। যাহাতে চিরদিনের জন্য উহা সংরক্ষিত হইয়া যায়।

চার—আমি সারা দুনিয়াকে দেখিয়াছি, (নিজের ইয়্যত ও বড়ত্বের জন্য) কেহ সম্পদের প্রতি আসক্ত হয়, কেহ বংশ মর্যাদার প্রতি। কেহ অন্য কোন গর্বের বিষয়ের প্রতি অর্থাৎ এইসব জিনিসের দ্বারা নিজের মধ্যে বড়ত্ব পয়দা করে এবং নিজের বড়ত্ব প্রকাশ করে। আমি আল্লাহ তায়ালায় এরশাদ দেখিয়াছি : **إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ** অর্থাৎ,

আল্লাহ তায়ালায় নিকট তোমাদের সকলের মধ্যে বড় সম্মানী এই ব্যক্তি। যে সর্বাপেক্ষা বেশী পরহেজগার। (হজুরাত : ১৩) এই ভিত্তিতে আমি তাকওয়া অবলম্বন করিয়াছি। যাহাতে আল্লাহ তায়ালায় নিকট সম্মানী হইয়া যাই।

পাঁচ—আমি লোকদেরকে দেখিয়াছি, তাহারা পরস্পর দোষারোপ করে, দোষ তালাশ করে, গালিগালাজ করে। আর এই সবকিছু হিংসার কারণে হয় বলিয়া একজনের প্রতি অপরজনের হিংসা হয়। আমি আল্লাহ তায়ালায় এরশাদ দেখিলাম : **لَا يَجْعَلُ اللَّهُ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ** অর্থাৎ, দুনিয়ার জীবনে তাহাদের রুজি আমিই বন্টন করিয়া রাখিয়াছি এবং (এই বন্টনের মধ্যে) আমি একজনকে অপরজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়া রাখিয়াছি। যাহাতে একজন অপরজন দ্বারা কাজ লইতে থাকে (যদি সকলে সমান, এক বরাবর, একই ধরনের হইয়া যায়, তবে একে অন্যের কাজ কেন করিবে, কেন চাকুরি করিবে—আর এইভাবে দুনিয়ার শৃংখলা নষ্ট হইয়া যাইবে)। (যুখরুফ : ৩২) আমি এই আয়াত শরীফের কারণে হিংসা করা ছাড়িয়া দিয়াছি। সমস্ত মখলুক হইতে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া লইয়াছি এবং আমি বিশ্বাস করিয়া লইয়াছি যে, রুজি বন্টন একমাত্র আল্লাহ তায়ালায়ই হাতে। তিনি যাহার অংশে যে পরিমাণ ইচ্ছা দান করিবেন—এইজন্য মানুষের প্রতি শত্রুতা ছাড়িয়া দিয়াছি। আর ইহা বুঝিয়া লইয়াছি যে, কাহারও নিকট সম্পদ বেশী অথবা কম হওয়ার ব্যাপারে তাহাদের কর্মের দখল নাই। ইহা তো আল্লাহ তায়ালায় পক্ষ হইতে বন্টন হইয়াছে। এইজন্য এখন কাহারো প্রতি গোস্বাই আসে না।

ছয়—আমি দুনিয়াতে দেখিয়াছি—প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তির কাহারও না কাহারও সহিত ঝগড়া রহিয়াছে, কাহারও না কাহারও সহিত শত্রুতা রহিয়াছে। আমি চিন্তা করিলাম, তখন দেখিলাম যে, আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন : **إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا** অর্থাৎ, শয়তান নিঃসন্দেহে তোমাদের দূশমন। অতএব, তাহার সহিত দূশমনী রাখ (তাহাকে দোস্ত বানাইও না)। (ফাতির : ৬) সুতরাং আমি শত্রুতা করিবার জন্য তাহাকে নির্বাচন করিয়াছি, আর তাহার নিকট হইতে দূরে থাকার আশ্রয় চেষ্টা করি। কারণ, আল্লাহ তায়ালা যখন শয়তানকে শত্রু বলিয়া দিয়াছেন, তখন আমি তাহাকে ছাড়া অন্যদের প্রতি শত্রুতা বর্জন করিয়াছি।

সাত—আমি দেখিয়াছি যে, সমস্ত মখলুক রুটি-রোজগারের তালাশে লাগিয়া রহিয়াছে। উহারই কারণে নিজেকে অন্যদের সম্মুখে অপমানিত

করে এবং নাজায়েয পথ অবলম্বন করে। অতঃপর আমি দেখিলাম যে, আল্লাহ তায়ালা এরশাদ রহিয়াছে : وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا অর্থাৎ, কোন প্রাণী জমিনের উপর বিচরণকারী এইরূপ নাই, যাহার রুজি আল্লাহ তায়ালা জিম্মায় না রহিয়াছে। (হুদ : ৬) আমি দেখিলাম যে, আমিও জমিনের উপর বিচরণকারীদের মধ্য হইতে একজন, যাহাদের রুজি আল্লাহ তায়ালা জিম্মায় রহিয়াছে। অতএব, আমি আমার সময়কে ঐ সমস্ত কাজে মশগুল করিয়া লইলাম, যাহা আল্লাহর পক্ষ হইতে আমার উপর জরুরী করা হইয়াছে। আর যে জিনিস আল্লাহর জিম্মায় ছিল, উহা হইতে আমি আমার সময়কে অবসর করিয়া লইলাম।

আট—আমি দেখিলাম যে, সমস্ত মখলুকের আস্থা ও ভরসা এমন কোন বিশেষ জিনিসের উপর রহিয়াছে, যাহা নিজেই মাখলুক। কেহ নিজের সম্পত্তির উপর ভরসা করে, কেহ নিজের ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর ভরসা করে, কেহ নিজের হাতের কাজের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছে, কেহ নিজের শরীরের স্বাস্থ্য এবং শক্তির উপর (অর্থাৎ যখন ইচ্ছা যেইভাবে ইচ্ছা কামাই করিয়া লইবে)। আমি দেখিলাম—আল্লাহ তায়ালা এরশাদ রহিয়াছে : وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা উপর তাওয়াক্কুল (এবং ভরসা) করে, আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য যথেষ্ট। (তালাক : ৩) এইজন্য আমি একমাত্র আল্লাহ তায়ালা উপর তাওয়াক্কুল ও ভরসা করিয়া লইয়াছি।

হযরত শাকীক (রহঃ) বলেন, হে হাতেম ! আল্লাহ তায়ালা তোমাকে তৌফিক দান করুন। আমি তৌরাত, ইঞ্জিল, যাবুর ও কুরআন শরীফের এলেমসমূহ দেখিয়াছি—সমস্ত ভাল ও কল্যাণের কাজ এই আটটি মাসআলার মধ্যেই পাইয়াছি। অতএব, যে ব্যক্তি এই আটটি বিষয়ের উপর আমল করিয়া লইবে, সে যেন আল্লাহ তায়ালা চারটি কিতাবের বিষয়সমূহের উপর আমল করিয়া লইল। এই ধরনের এলেম আখেরাতের উলামায়ে কেরামই পাইতে পারেন। দুনিয়াদার এলেম তো সম্পদ ও সম্মান হাসিল করিবার মধ্যেই লাগিয়া থাকে।

⑧ আখেরাতমুখী উলামায়ে কেরামের চতুর্থ আলামত এই যে, খানাপিনা এবং জেবাস-পোশাকের উন্নতি ও চাকচিক্যের প্রতি মনোযোগী হয় না। বরং এইসব জিনিসের মধ্যে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে এবং বুয়ুর্গানে দীনের পন্থা এখতিয়ার করে। এইসব জিনিস যতই কম করার প্রতি তাহার মনোযোগ বৃদ্ধি পাইবে, ততই আল্লাহ তায়ালা নৈকট্য বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। আর উলামায়ে আখেরাতের মধ্যে সেই পরিমাণে তাহার

মর্যাদা বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

উক্ত শায়েখ হাতেম (রহঃ)এর একটি আশ্চর্য ঘটনা তাহার শাগরেদ আবু আবদুল্লাহ খাওয়াস (রহঃ) বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি একবার হযরত শায়েখ হাতেম (রহঃ)এর সঙ্গে রাই নামক এক জায়গায় গেলাম। তিনশত বিশ জন লোক আমাদের সঙ্গে ছিল। আমরা হজ্জের উদ্দেশ্যে যাইতেছিলাম। সকলেই আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলকারী ছিল। আমাদের নিকট পথ-খরচ সামান-পত্র ইত্যাদি কিছুই ছিল না। আমরা রাই এলাকার একজন সাধারণ শুষ্ক মেজাজের ব্যবসায়ীর নিকট পৌঁছিলাম। সে কাফেলার সকলকে দাওয়াত করিল এবং আমাদের এক রাত্রের মেহমানদারী করিল। দ্বিতীয় দিন সকালে সেই মেজবান হযরত হাতেম (রহঃ)কে বলিতে লাগিল, এখানে একজন আলেম অসুস্থ অবস্থায় আছেন। আমি এখন তাহাকে দেখিতে যাইব। যদি আপনার আগ্রহ হয়, তবে আপনিও চলুন। হযরত হাতেম (রহঃ) বলিলেন, অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখা তো সওয়াবের কাজ, আর আলেমের যিয়ারত করাও এবাদত, আমি অবশ্যই তোমার সহিত যাইব। এই অসুস্থ আলেম সেই এলাকার কাজী শায়েখ মুহাম্মদ ইবনে মুকাতিলই ছিলেন। যখন তাহার বাড়ীতে পৌঁছিলেন, তখন হযরত হাতেম (রহঃ) চিন্তায় পড়িয়া গেলেন—আল্লাহ আকবার একজন আলেমের বাড়ী আর এইরূপ উঁচু মহল! যাহা হউক আমরা উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুমতি চাছিলাম। যখন ভিতরে প্রবেশ করিলাম, তখন উহার ভিতরেও অত্যন্ত সুদর্শন, অত্যন্ত প্রশস্ত, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, জায়গায় জায়গায় পর্দা ঝুলিতেছে। হযরত হাতেম (রহঃ) এইসব জিনিস দেখিতেছিলেন এবং চিন্তামগ্ন ছিলেন। ইতিমধ্যে আমরা কাজী সাহেবের নিকট পৌঁছিলাম। তিনি একটি অত্যন্ত নরম বিছানায় আরাম করিতেছিলেন। একজন গোলাম শিয়রে পাখা করিতেছিল। সেই ব্যবসায়ী লোকটি তো সালাম করিয়া তাহার নিকট বসিয়া গেল এবং তাহার শারীরিক অবস্থা জিজ্ঞাসা করিল। হাতেম (রহঃ) দাঁড়াইয়া রহিলেন। কাজী সাহেব তাহাকেও বসিবার ইশারা করিলেন। তিনি বসিতে অস্বীকার করিলেন। কাজী সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার কিছু বলিবার আছে কি? তিনি বলিলেন, হাঁ। একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করার আছে। কাজী সাহেব বলিলেন, বলুন। তিনি বলিলেন, আপনি বসুন (গোলামগণ কাজী সাহেবকে ধরিয়া উঠাইল। কেননা নিজে উঠা মুশকিল ছিল)। তিনি বসিয়া গেলেন।

হযরত হাতেম (রহঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি এলেম কাহার

নিকট হইতে হাসিল করিয়াছেন? তিনি বলিলেন—নির্ভরযোগ্য উলামায়ে
কেরামের নিকট হইতে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—সেই উলামায়ে কেরাম
কাহার নিকট হইতে শিখিয়াছিলেন? কাজী সাহেব বলিলেন, তাঁহারা
হযরত সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)এর নিকট হইতে। হযরত হাতেম (রহঃ)
জিজ্ঞাসা করিলেন, সাহাবায়ে কেরাম কাহার নিকট হইতে শিখিয়াছিলেন?
কাজী সাহেব—হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে।
হযরত হাতেম (রহঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম কাহার নিকট হইতে শিখিয়াছেন? কাজী সাহেব
বলিলেন—হযরত জিবরাঈল (আঃ)এর নিকট হইতে। হযরত হাতেম
(রহঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন—হযরত জিবরাঈল (আঃ) কাহার নিকট হইতে
শিখিয়াছেন? কাজী সাহেব বলিলেন—আল্লাহ তায়ালা নিকট হইতে।
হযরত হাতেম (রহঃ) বলিলেন, যে এলেম হযরত জিবরাঈল (আঃ)
আল্লাহ তায়ালা নিকট হইতে লইয়া হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌছাইয়াছেন। আর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে দান করিয়াছেন। সাহাবায়ে কেরাম
(রাযিঃ) নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কেরামকে দিয়াছেন এবং তাহাদের মাধ্যমে
আপনি পর্যন্ত পৌছিয়াছে; উহাতে কোথাও কি এই কথা বর্ণিত হইয়াছে,
যে ব্যক্তির বাড়ী যত উচু এবং বড় হইবে, তাহার মর্যাদা আল্লাহ তায়ালা
নিকট সেই পরিমাণ বেশী হইবে? কাজী সাহেব বলিলেন, না। ইহা ঐ
এলেমের মধ্যে আসে নাই। হযরত হাতেম (রহঃ) বলিলেন, যদি ইহা না
আসিয়া থাকে, তবে ঐ এলেমের মধ্যে কি আসিয়াছে? কাজী সাহেব
বলিলেন, উহাতে আসিয়াছে—যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত হয় এবং
আখেরাতের প্রতি আসক্তি ও উৎসাহ রাখে, গরীবদেরকে ভালবাসে,
নিজের আখেরাতের জন্য আল্লাহ তায়ালা নিকট নেকী পাঠাইতে থাকে,
সেই ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা নিকট মর্যাদাশীল। হযরত হাতেম (রহঃ)
বলিলেন, তবে আপনি কাহার অনুসরণ করিলেন? হযুর সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লামের, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা
(রাযিঃ)দের, মুত্তাকী পরহেজ্জগার উলামায়ে কেরামদের, নাকি ফেরাউন ও
নমরুদের? ওহে মন্দ আলেমের দল! তোমাদের মত লোকদেরকে দেখিয়া
জাহেল দুনিয়াদার লোকেরা যাহারা দুনিয়ার উপর উপড় হইয়া পড়িয়া
রহিয়াছে, বলে যে, যখন আলেমদের এই অবস্থা কাজেই আমরা তো
তাহাদের তুলনায় বেশী খারাপ হইবই। ইহা বলিয়া হযরত হাতেম (রহঃ)
তো চলিয়া গেলেন আর কাজী সাহেবের অসুস্থতা উক্ত কথাবার্তা ও

নসীহতের কারণে আরও বৃদ্ধি পাইয়া গেল। লোকদের মধ্যে এই ঘটনার আলোচনা হইল।

কেহ হযরত হাতেম (রহঃ)কে বলিল যে, তানাফেসী নামক একজন আলেম যিনি কাজভীন এলাকায় থাকেন (কাজভীন রাই হইতে সাতাইশ ফারসাখ অর্থাৎ ৮১ মাইল দূরে অবস্থিত), তিনি উপরোক্ত আলেম হইতেও বেশী জ্ঞানকর্মকপূর্ণ জীবনযাপন করেন। হযরত হাতেম (রহঃ) (তাহাকে নসীহত করিবার উদ্দেশ্যে চলিলেন) যখন তাহার নিকট পৌঁছিলেন, তখন বলিলেন, আমি একজন আজমী (অনারব) লোক। আপনার নিকট এইজন্য আসিয়াছি যে, আপনি আমাকে দ্বীনের একেবারে প্রাথমিক বিষয় হইতে অর্থাৎ নামাযের চাবি ওয়ু হইতে শিক্ষা দিবেন। তানাফেসী বলিলেন, অবশ্যই, পরম আগ্রহে শিক্ষা করুন। এই বলিয়া তানাফেসী ওয়ুর পানি আনাইলেন। অতঃপর তানাফেসী ওয়ু করিয়া বলিলেন, এইভাবে ওয়ু করা হয়। হযরত হাতেম (রহঃ) তাহার ওয়ু শেষ হওয়ার পর বলিলেন, আমি আপনার সম্মুখে ওয়ু করি যাহাতে ভালভাবে মনে থাকে। তানাফেসী ওয়ুর জায়গা হইতে উঠিয়া গেলেন এবং হযরত হাতেম (রহঃ) বসিয়া ওয়ু করিতে আরম্ভ করিলেন। উভয় হাতকে তিনি চারবার করিয়া ধৌত করিলেন। তানাফেসী বলিলেন, ইহা অপচয়, তিনবার করিয়া ধৌত করা উচিত। হযরত হাতেম (রহঃ) বলিলেন, সুবহানাল্লাহিল আযীম, আমার এক কোষ পানিতে অপচয় হইয়া গেল, আর এই সবকিছু সাজ-সরঞ্জাম যাহা আমি আপনার নিকট দেখিতেছি ইহার মধ্যে অপচয় হইল না। তখন তানাফেসীর খেয়াল হইল যে, এই ব্যক্তির উদ্দেশ্য শিক্ষা করা নয়; বরং উদ্দেশ্য আমার সংশোধন করা।

ইহার পর যখন হাতেম (রহঃ) বাগদাদ পৌঁছিলেন এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) তাঁহার সম্পর্কে জানিতে পারিলেন, তখন তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য আসিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দুনিয়া হইতে নিরাপদ থাকার পন্থা কি? হাতেম (রহঃ) বলিলেন, দুনিয়া হইতে ঐ সময় পর্যন্ত নিরাপদ থাকিতে পারিবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার মধ্যে চারটি জিনিস না হইবে। এক—মানুষের অন্যায় ও মূর্খতা মাফ করিতে থাক, দুই—তুমি নিজে তাহাদের সহিত কোন মূর্খতার আচরণ করিও না। তিন—তোমার নিকট যাহা কিছু আছে, তাহাদের জন্য খরচ করিয়া দাও। চার—তাহাদের নিকট যাহা কিছু আছে, উহার আশা রাখিও না।

অতঃপর হযরত হাতেম (রহঃ) যখন মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছিলেন,

তখন সেখানকার লোকেরা খবর পাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য সমবেত হইয়া গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কোন্ শহর? লোকেরা বলিল, ইহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শহর। তিনি বলিতে লাগিলেন, এখানে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহল কোন্টি ছিল? আমিও সেখানে যাইয়া দুই রাকাত নামায আদায় করিব। লোকেরা বলিল, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তো মহল ছিল না, অত্যন্ত ছোট ঘর ছিল, যাহা অনেক নীচু ছিল। তিনি বলিতে লাগিলেন, সাহাবায়ে কেরামের মহল কোথায় কোথায় রহিয়াছে, আমাকে সেইগুলিই দেখাইয়া দাও। লোকেরা বলিল, সাহাবায়ে কেরামেরও মহল ছিল না, তাঁহাদেরও ছোট ছোট জমিনের সহিত লাগা নীচু ঘর ছিল। হাতেম (রহঃ) বলিলেন, তবে তো এই শহর ফেরাউনের শহর। লোকেরা তাহাকে পাকড়াও করিল (কারণ তিনি মদীনা মুনাওয়ারার অপমান করিতেছে এবং হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শহরকে ফেরাউনের শহর বলিতেছেন)। ধরিয়া তাঁহাকে মদীনার গভর্নরের নিকট লইয়া গেল এবং বলিল, এই অনারব ব্যক্তি মদীনা তাইয়ে্যাকে ফেরাউনের শহর বলিতেছে। গভর্নর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কেন এইরূপ কথা বলিতেছেন? তিনি বলিলেন, আপনি আমাকে শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করিবেন না, সম্পূর্ণ কথা শুনিয়া লউন। আমি একজন অনারব ব্যক্তি, যখন আমি এই শহরে প্রবেশ করিলাম, তখন জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কাহার শহর? এইভাবে প্রশ্ন-উত্তরসহকারে নিজের সম্পূর্ণ ঘটনা শুনাইয়া বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা তো কুরআন শরীফে বলিয়াছেন : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ الْآيَةُ : তোমাদের জন্য অর্থাৎ এমন ব্যক্তিদের জন্য যাহারা আল্লাহকে এবং আখেরাতের দিনকে ভয় করে এবং বেশী পরিমাণে আল্লাহর যিকির করে, (অর্থাৎ যাহারা কামেল মুমেন হয়, মোটকথা, এমন ব্যক্তিদের জন্য) আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর একটি সুন্দর আদর্শ বিদ্যমান রহিয়াছে (প্রত্যেক কথা ও কাজে ইহা দেখা চাই যে, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল ও অভ্যাস কি ছিল এবং উহার অনুসরণ করা উচিত)। (আহযাব : ২১) এখন আপনি নিজেই বলুন, আপনারা হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন, নাকি ফেরাউনের অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন।

এই কথা শুনিয়া লোকেরা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল। এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, হালাল জিনিসকে উপভোগ করা, অথবা হালাল জিনিসের

মধ্যে সচ্ছলতা হারাম কিংবা নাজায়েয নয়। তবে এই সমস্ত জিনিস অধিক পরিমাণে হওয়ার কারণে উহার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হওয়া ও অন্তরে উহার ভালবাসা জন্মা স্বাভাবিক। ফলে, উহা পরিত্যাগ করা কষ্টকর হইয়া যায় ; আবার এই সমস্ত জিনিস জোগাড় করার পন্থা তালাশ করিতে হয়, উৎপাদন ও আমদানী বাড়াইবার ফিকির করিতে হয়। আর যে ব্যক্তি অর্থ-সম্পদ বাড়াইবার ফিকিরে লাগিয়া যায়, ধীনের ব্যাপারে তাহাকে শিথিলতা অবলম্বন করিতে হয়। ইহাতে অনেক সময় গুনাহে লিপ্ত হওয়ার পর্যায় পর্যন্ত আসিয়া পড়ে। যদি দুনিয়ার ভিতরে ঢুকিয়া যাওয়ার পর উহা হইতে নিরাপদ থাকা সহজ হইত, তবে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত গুরুত্বসহকারে দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ও উহার প্রতি আকৃষ্ট না হওয়ার জন্য সতর্ক করিতেন না এবং এত কঠোরভাবে উহা হইতে নিজেকে বাঁচিতেন না। এমনকি তিনি নকশীদার জামাও শরীর মুবারক হইতে খুলিয়া ফেলিয়াছেন।

ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াজিদ নওফলী (রহঃ) হযরত ইমাম মালেক (রহঃ)কে একটি চিঠি লিখিয়াছেন, উহাতে আল্লাহ তায়ালায় প্রশংসা ও হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদের পর তিনি লিখিয়াছেন—আমার নিকট এই খবর পৌছিয়াছে যে, আপনি পাতলা কাপড় পরিধান করেন ও পাতলা রুটি আহার করেন, নরম বিছানায় আরাম করেন এবং দারোয়ানও নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। অথচ আপনি উচ্চস্তরের উলামায়ে কেরামের মধ্যে গণ্য। লোকজন দূর দূর হইতে সফর করিয়া আপনার নিকট এলেম শিখিবার জন্য আসে। আপনি ইমাম, আপনি অনুসরণীয়। লোকেরা আপনাকে অনুসরণ করে। অনেক সতর্কতা অবলম্বন করা চাই। শুধু আল্লাহর ওয়াস্তে এই চিঠি লিখিতেছি। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহ এই চিঠি সম্পর্কে জানে না। ওয়াস-সালাম।

হযরত ইমাম মালেক (রহঃ) উক্ত চিঠির জবাব লিখিয়াছেন—তোমার চিঠি পৌছিয়াছে, যাহা আমার জন্য উপদেশ, ভালবাসা ও ঈশিয়ারী স্বরূপ ছিল। আল্লাহ তায়ালা তোমাকে তাকওয়া দ্বারা উপকৃত করুন এবং এই নসীহতের জন্য তোমাকে উত্তম বদলা দান করুন, আর আমাকে আল্লাহ তায়ালা আমলের তওফীক দান করুন। নেক কাজ করিতে পারা এবং খারাপ কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকা আল্লাহ তায়ালায় তওফীকেই হইতে পারে। তুমি যে সমস্ত বিষয় উল্লেখ করিয়াছ, উহা সঠিক ও যথার্থ। আল্লাহ তায়ালা আমাকে মাফ করুন (তবে এই সমস্ত জিনিস জায়েয আছে)। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন : قُلْ مَنْ

حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الْاِيَةِ অর্থাৎ, আপনি বলিয়া দিন, (বল দেখি,) আল্লাহ তায়ালার সৃষ্ট সৌন্দর্য (কাপড় ইত্যাদি)কে যাহা তিনি নিজের বান্দাদের জন্য পয়দা করিয়াছেন এবং খানাপিনার হালাল জিনিসগুলিকে—কে হারাম করিয়াছে? (আরাক ৪: ৩২)

অতঃপর লিখিলেন, ইহা আমি ভাল করিয়া জানি যে, এই সমস্ত বিষয় গ্রহণ করা হইতে গ্রহণ না করা উত্তম। ভবিষ্যতেও তুমি তোমার মূল্যবান নসীহতের দ্বারা আমাকে সম্মানিত করিবে, আমিও চিঠি লিখিতে থাকিব। ওয়াস-সালাম।

কত সূক্ষ্ম বিষয় ইমাম মালেক (রহঃ) অবলম্বন করিয়াছেন যে, তিনি জায়েয হওয়ার ফতওয়াও লিখিয়াছেন এবং ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে, বাস্তবিকই এই সমস্ত জিনিস ছাড়িয়া দেওয়াই বেশী উত্তম।

⑤ আবেরাতমুখী ওলামায়ে কেরামের পঞ্চম আলামত এই যে, বাদশা ও সরকারী কর্মকর্তাদের নিকট হইতে দূরে থাকিবে। (বিনা প্রয়োজনে) তাহাদের নিকট কখনও যাইবে না, বরং তাহারা নিজেরা আসিলেও মেলামেশা কম করিবে। কেননা, তাহাদের সহিত মেলামেশার কারণে তাহাদের সন্তুষ্টি অর্জনে কৃত্রিমতা অবলম্বন করিতে হয়। এই সমস্ত লোক অধিকাংশই জালেম এবং নাজায়েয কাজকর্মে লিপ্ত হইয়া থাকে। যাহার প্রতিবাদ করা জরুরী। তাহাদের জুলুমের বিষয় প্রকাশ করা, তাহাদের নাজায়েয কাজের উপর সতর্ক করা জরুরী। এইসব বিষয়ে নিশ্চূপ থাকা দ্বীনের ব্যাপারে শিথিলতা করার নামান্তর। আর যদি তাহাদের সন্তুষ্টির জন্য তাহাদের প্রশংসা করিতে হয়, তবে ইহা তো স্পষ্ট মিথ্যা। যদি তাহাদের সম্পদের দিকে মনের ভিতর লিপ্সা পয়দা হয় এবং লালসা আসে, তবে ইহা নাজায়েয। মোটকথা, তাহাদের সহিত মেলামেশা অনেক রকমের ফেতনা-ফাসাদের চাবি।

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি মাঠে-ময়দানে বাস করে সে কঠিন স্বভাবের হইয়া যায়। আর যে শিকারের পিছনে লাগে সে (সবকিছু হইতে) গাফেল হইয়া যায়, যে বাদশাহের নিকট আসা যাওয়া শুরু করিয়া দেয়, সে ফেতনায় পড়িয়া যায়।

হযরত হোযায়ফা (রাযিঃ) বলেন, তুমি নিজেকে ফেতনার জায়গায় অবস্থান করা হইতে বাঁচাও। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, ফেতনার জায়গা কোন্টি? বলিলেন, শাসকদের দরজা। কেননা, তাহাদের নিকট যাইয়া তাহাদের ভুল-ভ্রান্তি ও অন্যায় কার্যাবলীকে সমর্থন করিতে হয় এবং

(তাহাদের প্রশংসায়) এমন কথা বলিতে হয়, যাহা তাহাদের মধ্যে নাই।

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিকটতম আলেম তাহারা, যাহারা শাসকবর্গের নিকট হাজিরা দেয়। আর উত্তম শাসক তাহারা, যাহারা উলামায়ে কেরামের নিকট হাজির হয়।

হযরত সামনুন (রহঃ) (যিনি হযরত সাররী সাকতী (রহঃ) এর শাগরেদ) বলেন, আমি ইহা শুনিয়াছিলাম যে, যখন তুমি কোন আলেম সম্পর্কে শোন—সে দুনিয়ার প্রতি মহব্বত রাখে, তখন তাহাকে নিজের দ্বীন সম্পর্কে ত্রুটিযুক্ত মনে কর। আমি নিজে ইহা পরীক্ষা করিয়াছি। যখনই আমি বাদশাহর নিকট গিয়াছি, ফিরিয়া আসিবার পর আমি আমার অন্তরকে যাচাই করিয়া দেখিয়াছি অতঃপর আমি একরকম বোকা অনুভব করিয়াছি। অথচ তোমরা দেখিয়া থাক, আমি সেখানে কঠোর কথাবার্তা বলিয়া থাকি এবং কঠিনভাবে তাহাদের মতামতের বিরোধিতা করি। সেখানের কোন জিনিস ব্যবহার করি না। এমনকি সেখানের পানিও পান করি না। আমাদের আলেমগণ বনী ইসরাঈলের আলেমগণ অপেক্ষা খারাপ। কেননা, ইহারা শাসকবর্গের নিকট যাইয়া তাহাদিগকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বলিয়া দেয়। তাহাদের সন্তুষ্টি অর্জনের ফিকির করিয়া থাকে। যদি আলেমগণ তাহাদিগকে তাহাদের দায়িত্বসমূহ পরিষ্কার ভাষায় বলিয়া দেয়, তবে এই শাসকেরা তাহাদের যাওয়াকেই পছন্দ করিবে না। আর এই পরিষ্কারভাবে বলিয়া দেওয়া এইসব উলামাদের জন্য আল্লাহ তায়ালা নিকট নাজাতের কারণ হইয়া যাইবে। উলামায়ে কেরামের বাদশাহদের নিকট যাওয়া একটি বড় ক্ষেতনা এবং শয়তানের ধোকা দেওয়ার একটি বিরাট উপায়। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি সুবক্তা, তাহাকে শয়তান বুঝায় যে, তুমি গেলে তাহাদের সংশোধন হইবে। তাহারা তুমি যাওয়ার কারণে জুলুম করা হইতে বিরত থাকিবে এবং দ্বীনের বড় বড় নিদর্শনসমূহের হেফাজত হইবে। এমনিভাবে, মানুষ মনে করিতে আরম্ভ করে যে, তাহাদের নিকট যাওয়াও কোন দ্বীনের কাজ। অথচ তাহাদের নিকট গেলে, তাহাদের মনোতুষ্টির জন্য দ্বীনের ব্যাপারে শিথিল কথা বলিতে হয় এবং তাহাদের অহেতুক প্রশংসা করিতে হয় ; আর ইহার মধ্যে দ্বীনের ধ্বংস রহিয়াছে।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) হযরত হাসান বসরী (রহঃ) কে লিখিয়াছেন, আমাকে এইরূপ কিছু উপযুক্ত লোকের ঠিকানা বলিয়া দিন, যাহাদের দ্বারা আমি আমার এই (খেলাফতের) কাজে সাহায্য লইতে পারি। হযরত হাসান (রহঃ) (জবাবে) লিখিয়াছেন—

দীনদার লোকেরা তো আপনার নিকট আসিবে না। আর দুনিয়াদারদেরকে তো আপনি গ্রহণ করিবেন না (এবং গ্রহণ করা উচিতও নয়; কেননা, দুনিয়াদার অর্থাৎ লোভী ও স্বার্থবাদী লোকেরা তো নিজেদের লোভ-লালসার কারণে কাজ নষ্ট করিয়া দিবে), এইজন্য শরীফ বংশের লোকদের দ্বারা কাজ নিন। কেননা, তাহাদের বংশগত আভিজাত্য ও ভদ্রতা তাহাদিগকে এই বিষয়ে বিরত রাখিবে যে, তাহারা নিজেদের বংশগত আভিজাত্য ও ভদ্রতাকে খেয়ানতের দ্বারা কলুষিত করে। এই জওয়াব হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ)কে লিখিয়াছেন, যাহার দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি, তাকওয়া, ন্যায়পরায়ণতা, সর্বকালের জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ। এমনকি তাহাকে দ্বিতীয় ওমর বলা হয়। ইহা ইমাম গাযযালী (রহঃ)এর খেয়াল। কিন্তু আমি অধমের মতে যদি কেহ কোন দ্বীনী কারণে অপারগ হয়, তবে নিজের নফসের হেফাজতের সহিত যাওয়ার মধ্যে ক্ষতি নাই। বরং অনেক সময় দ্বীনী স্বার্থে ও প্রয়োজনের তাগিদে যাইতেই হয়; কিন্তু ইহা অবশ্য জরুরী যে, নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ, ব্যক্তিগত ফায়েদা, সম্পদ ও সম্মান কামাই করা উদ্দেশ্য না হয়। বরং শুধু মুসলমানদের জরুরতই উদ্দেশ্য হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন : وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُنْهَدِ مِنَ الْمُصْلِحِ অর্থাৎ, আর আল্লাহ তায়ালা মঙ্গলকামী ও অমঙ্গলকামীকে (পৃথক পৃথকরূপে) জানেন। (বাকারা : ২২০)

⑥ আবেরাতমুখী ওলামায়ে কেরামের ষষ্ঠ আলামত এই যে, তাহারা ফতওয়া দেওয়ার ব্যাপারে জলদি করেন না। মাসআলা বলিবার ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেন। অন্য কোন যোগ্য লোক থাকিলে যথাসম্ভব তাহার নিকট পাঠাইয়া দেন। আবু হাফস নিশাপুরী (রহঃ) বলেন, আলেম ঐ ব্যক্তি, যে মাসআলা দেওয়ার সময় এই বিষয়ে ভয় করে যে, কাল কিয়ামতের দিন এই জওয়াবদিহি করিতে হইবে যে, কোথা হইতে মাসআলা বলিয়াছিলে?

কোন কোন আলেম বলিয়াছেন, সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) চারটি জিনিস হইতে বেশী বাঁচিয়া থাকিতেন। এক—ইমামতি করা, দুই—ওসী হওয়া (অর্থাৎ কাহারও ওসিয়তকৃত সম্পদ হকদারদের মধ্যে বন্টন করিবার দায়িত্ব নেওয়া)। তিন—আমানত রাখা। চার—ফতওয়া দেওয়া। তাহারা বিশেষভাবে পাঁচটি কাজে মশগুল থাকিতেন। এক—কুরআন পাকের তেলাওয়াত। দুই—মসজিদসমূহ আবাদ করা। তিন—আল্লাহ তায়ালার যিকির করা। চার—ভাল কথা নসীহত করা। পাঁচ—খারাপ কাজ হইতে বিরত রাখা।

ইবনে হুসাইন (রহঃ) বলেন, কিছু লোক এত জলদি ফতওয়া দিয়া থাকে যে, ঐ মাসআলা যদি হযরত ওমর (রাযিঃ)এর সামনে পেশ করা হইত, তবে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সমস্ত সাহাবায়ে কেবামকে একত্রিত করিয়া পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। হযরত আনাস (রাযিঃ) এতবড় মর্যাদাশালী সাহাবী ছিলেন যে, দশ বৎসর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করিয়াছেন। যখন তাঁহার নিকট মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হইত, তখন তিনি বলিতেন, আমাদের সর্দার হাসান (রহঃ)এর নিকট জিজ্ঞাসা কর। (হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বিখ্যাত ফকীহ বিখ্যাত সুফী এবং তাবেয়ী ছিলেন, হযরত আনাস (রাযিঃ) সাহাবী হওয়া সত্ত্বেও এই তাবেয়ীর নাম বলিয়া দিতেন।)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)এর নিকট যখন মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হইত, (অথচ তিনি বিখ্যাত সাহাবী ও সমস্ত মুফাসসিরদের শিরোমনি ছিলেন,) তখন তিনি বলিতেন, জাবের ইবনে যায়েদ (রহঃ)এর নিকট জিজ্ঞাসা কর (তিনি ফতওয়া দানে অভিজ্ঞ তাবেয়ী ছিলেন)। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) যিনি নিজে বিখ্যাত ফকীহ সাহাবী ছিলেন, তিনি হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (তাবেয়ী রহঃ)এর নিকট পাঠাইয়া দিতেন।

৭) আখেরাতমুখী ওলামায়ে কেবামের সপ্তম আলামত এই যে, তাহারা বাতেনী এলেম অর্থাৎ সুলুক অর্থাৎ আধ্যাত্মিক বিষয়ের প্রতি অনেক বেশী যত্নবান হইবেন। নিজের বাতেনের সংশোধন ও আত্মশুদ্ধির জন্য অনেক বেশী চেষ্টা-সাধনা করিবেন। কেননা, ইহা জাহেরী এলেমের মধ্যেও উন্নতির কারণ হয়। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে নিজের এলেমের উপর আমল করে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে এমন জিনিসের এলেম দান করেন ; যাহা সে পড়ে নাই। পূর্বকার নবীদের কিতাবসমূহে আছে, হে বনী ইসরাঈল ! তোমরা একরূপ বলিও না যে, এলেম আসমানের উপর রহিয়াছে ; উহাকে কে নামাইবে? অথবা এলেম জমিনের তলদেশে রহিয়াছে ; উহাকে কে উপরে আনিবে? অথবা এলেম সমুদ্রের অপর পারে রহিয়াছে ; কে সেইখানে যাইবে, আর উহাকে লইয়া আসিবে? এলেম তো তোমাদের অন্তরের মধ্যে রহিয়াছে। তোমরা আমার সম্মুখে রূহানী ব্যক্তিদের ন্যায় আদবের সহিত থাক, সিদ্দীকিনদের আখলাক অবলম্বন কর—আমি তোমাদের দিলের ভিতর হইতে এলেমসমূহ প্রকাশ করিব। এমনকি সেই এলেম তোমাদিগকে ঘিরিয়া লইবে এবং তোমাদিগকে ঢাকিয়া লইবে। আর অভিজ্ঞতাও ইহার

সাক্ষী যে, আল্লাহ ওয়ালাদেরকে আল্লাহ তায়ালা ঐ এলেম ও মারেফাত দান করেন, যাহা কিতাবের মধ্যে তালাশ করিয়াও পাওয়া যায় না।

হযুর সালামুহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়ালা নিকট হইতে বর্ণনা করেন যে, বান্দার উপর আমি যেসমস্ত জিনিস ফরয করিয়াছি, উহা হইতে অধিক প্রিয় আর কোন জিনিস দ্বারা সে আমার নৈকট্য হাসিল করিতে পারে না। (যেমন নামায, যাকাত, রোযা, হজ্জ ইত্যাদি। অর্থাৎ ফরযসমূহ উত্তমরূপে আদায় করার দ্বারা যত নৈকট্য হাসিল হয়—এইরূপ নৈকট্য অন্যান্য জিনিস দ্বারা হাসিল হয় না।) বান্দা নফলসমূহের মাধ্যমে আমার নৈকট্য হাসিল করিতে থাকে—অবশেষে আমি তাহাকে প্রিয় বানাইয়া লই। যখন আমি তাহাকে প্রিয় বানাইয়া লই, তখন আমি তাহার কান হইয়া যাই, যাহা দ্বারা সে শোনে। তাহার চোখ হইয়া যাই, যাহা দ্বারা সে দেখে। তাহার হাত হইয়া যাই, যাহা দ্বারা সে কোন জিনিস ধরে। তাহার পা হইয়া যাই, যাহা দ্বারা সে চলে। যদি সে আমার নিকট সওয়াল করে, তবে আমি উহা পূরণ করি। যদি কোন জিনিস হইতে আশ্রয় চাহে, তবে তাহাকে আশ্রয় দান করি। (বুখারী শরীফ)

অর্থাৎ তাহার চলা-ফেরা দেখা-শোনা সব কাজ আমার সন্তুষ্টি অনুযায়ী হইয়া যায়। কোন কোন হাদীসে ইহার সহিত এই বিষয়ও আসিয়াছে যে, যে ব্যক্তি আমার কোন ওলীর সহিত শত্রুতা করে, সে আমার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করে। যেহেতু আল্লাহর ওলীগণের ধ্যান, চিন্তা সবকিছু আল্লাহ তায়ালা সহিত সম্পর্কিত হইয়া যায়, কাজেই কুরআন পাকের সূক্ত এলেমসমূহ তাহাদের অন্তরে খুলিয়া যায়; উহার রহস্যাবলী তাহাদের সম্মুখে স্পষ্ট হইয়া যায়। বিশেষতঃ এমন লোকদের সম্মুখে—যাহারা আল্লাহ তায়ালা যিকির ও ফিকিরে সব সময় মশগুল থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তি এই নেয়ামত হইতে তওফীক অনুযায়ী সেই পরিমাণ অংশ লাভ করিয়া থাকে, যে পরিমাণ আমলের মধ্যে তাহার এহতেমাম ও চেষ্টা হইয়া থাকে।

হযরত আলী (রাযিঃ) একটি দীর্ঘ হাদীসে আখেরাতমুখী ওলামায়ে কেরামের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। যাহা আল্লামা ইবনে কাইয়্যাম (রহঃ) 'মিফতাহ দারিস-সাআদাহ' নামক কিতাবে এবং আবু নুআইম (রহঃ) 'হিলইয়া' নামক কিতাবে উল্লেখ করিয়াছেন। উহাতে বলেন, অন্তরসমূহ পাত্রের মত। আর ঐ সমস্ত অন্তর সর্বোত্তম, যাহা ভাল ও কল্যাণের জিনিসকে অধিক হইতে অধিক সংরক্ষণ করিয়া থাকে। এলেম জমা করা সম্পদ জমা করা হইতে উত্তম। কেননা, এলেম তোমার হেফাজত করে,

আর সম্পদের হেফাজত তোমাকে করিতে হয়। এলেম খরচ করার দ্বারা বাড়িয়া যায়, আর সম্পদ খরচ করার দ্বারা কমিয়া যায়। সম্পদের উপকারিতা উহা শেষ হওয়ার (খরচ করার) কারণে খতম হইয়া যায়, কিন্তু এলেমের উপকারিতা সব সময় বাকি থাকে। (আলেমের ইন্তেকালের পরও এলেম খতম হয় না। কেননা, তাহার মূল্যবান কথাবার্তাগুলি বাকী থাকে।) অতঃপর হযরত আলী (রাযিঃ) একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আমার অন্তরে এলেম রহিয়াছে—হায়! যদি ইহার উপযুক্ত পাত্র পাইতাম। কিন্তু আমি এমন লোকদেরকে দেখি, যাহারা দ্বীনের বিষয়সমূহকে দুনিয়ার তলবে খরচ করে। অথবা এমন লোকদেরকে দেখি, যাহারা দুনিয়ার স্বাদ ও আমোদ-প্রমোদে মগ্ন রহিয়াছে ; দুনিয়ার বাহেশাত ও কামনা-বাসনার জিজিরে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, অথবা সম্পদ জমা করিবার পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে। মোটকথা, দীর্ঘ বর্ণনা হইতে এখানে কেবল কয়েকটি বাক্য নকল করা হইল।

৮) অষ্টম আলামত এই যে, আল্লাহ তায়ালা সহিত আখেরাতমুখী আলেমের ঈমান ও একীন অনেক বেশী হয় এবং এই বিষয়ে তিনি অনেক বেশী যত্নবান হন। একীনই হইল আসল পুঁজি। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, একীনই পূর্ণ ঈমান। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা একীন শিখ। এই এরশাদের অর্থ হইল, একীনওয়ালাদের নিকট এহতেমামের সহিত বস। তাহাদের অনুসরণ কর। যাহাতে ইহার বরকতে তোমাদের মধ্যে একীনের পরিপক্বতা পয়দা হয়। তাহার অন্তরে আল্লাহ তায়ালা পরিপূর্ণ কুদরতের এবং গুণাবলীর এমনই একীন থাকে, যেমন চন্দ্র-সূর্যের অস্তিত্বের একীন রহিয়াছে। তিনি এই বিষয়ে পূর্ণ একীন রাখেন যে, প্রত্যেক বিষয়ের কর্তা কেবল সেই একমাত্র পবিত্র সত্তা। আর এই দুনিয়ার যাবতীয় আসবাব তাহারই ইচ্ছার অধীন—যেমন প্রহারকারী ব্যক্তির হাতে লাঠি। এই ব্যাপারে লাঠির কোন দখল আছে বলিয়া কেহ মনে করে না। আর যখন এই একীন পরিপক্ব হইয়া যাইবে, তখন তাহার জন্য তাওয়াক্কুল, তকদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকা এবং নিজেকে আল্লাহ তায়ালা সোপর্দ করা সহজ হইয়া যাইবে। এমনভাবে তাহার এই বিষয়ে পরিপক্ব একীন থাকে যে, রুজি একমাত্র আল্লাহ তায়ালা জিম্মায়। তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির রুজির জিম্মা লইয়া রাখিয়াছেন। যাহা তাহার তকদীরে আছে, উহা সে অবশ্যই পাইবে। আর যাহা তাহার তকদীরে নাই, উহা কোন অবস্থাতেই সে পাইবে না। যখন তাহার একীন পাকা হইয়া যাইবে, তখন

রুজির অনুেষণে মধ্যপন্থা আসিয়া যাইবে। লোভ-লালসা দূর হইয়া যাইবে। কোন জিনিস না পাইলে উহার উপর দুঃখ হইবে না। তাহার এই একীনও থাকে যে, আল্লাহ তায়ালা সমস্ত ভাল ও মন্দকে সব সময় দেখিতেছেন। অণু পরিমাণ কোন নেকী বা খারাপ কাজ হইলেও উহা আল্লাহ তায়ালায় এলেমের মধ্যে আছে, আর উহার বদলা ভাল অথবা মন্দ অবশ্যই পাওয়া যাইবে। তিনি নেক কাজের সওয়াবের উপর এমনই একীন রাখেন, যেমন রুটি খাইলে পেট ভরার একীন হয়। আর অন্যায় কাজের উপর আযাবের এমনই একীন রাখেন, যেমন সাপে কাটিলে বিষক্রিয়ার একীন হয়। (তিনি নেক কাজের দিকে এমনই অগ্রসর হন, যেমন খানাপিনার দিকে অগ্রসর হন এবং গুনাহ হইতে এমনই ভয় পান, যেমন সাপ-বিচ্ছু হইতে ভয় পান।) যখন এই বিষয়গুলি পাকা হইয়া যাইবে, তখন প্রত্যেকটি নেকী কামাই করার প্রতি তাহার পূর্ণ আগ্রহ হইবে এবং প্রত্যেক মন্দ হইতে বাঁচিবার প্রতি পূর্ণ এহতেমাম হইবে।

৯ নবম আলামত এই যে, তাহার উঠাবসা, চলাফেরা প্রত্যেকটি বিষয় হইতে আল্লাহ তায়ালায় ভয় প্রতীয়মান হয়। আল্লাহ তায়ালায় আক্রমত ও বড়ত্ব এবং মহত্বের প্রভাব তাহার প্রত্যেকটি আচার-আচরণে প্রকাশ পায়। তাহার পোশাকে, আদত-অভ্যাসে, তাহার কথাবার্তায়, তাহার নিরবতায় ; এমনকি তাহার উঠাবসা ও চলাফেরায় উপরোক্ত বিষয়টি প্রকাশ পায়। তাহার চেহারা দেখিলে আল্লাহ তায়ালায় স্মরণ তাজা হয়। স্থিরতা, গাভীর্য, বিনয় ও নম্রতা, তাহার স্বভাবে পরিণত হইয়া যায়। অহেতুক আলাপ-আলোচনা, অনর্থক কথাবার্তা ও কৃত্রিমতার সহিত কথা বলা হইতে দূরে থাকেন। কেননা, এইগুলি গর্ব ও দণ্ডের আলামত ; আল্লাহ তায়ালা হইতে নির্ভীক হওয়ার প্রমাণ স্বরূপ।

হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিয়াছেন, এলেম শিখ এবং এলেমের জন্য ধীরস্থিরতা ও গাভীর্য শিখ। যাহার নিকট হইতে এলেম হাসিল কর, তাহার সম্মুখে অত্যন্ত বিনয়ের সহিত থাক। অহংকারী ওলামাদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

হযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ লোক তাহারা, যাহারা লোকসমাজে আল্লাহ তায়ালায় প্রশস্ত রহমতের কারণে আনন্দিত থাকে এবং নির্জনে আল্লাহ তায়ালায় আযাবের ভয়ে কাঁদিতে থাকে। তাহাদের শরীর জমিনের উপর থাকে, আর তাহাদের দিল আসমানের দিকে মনোযোগী থাকে। হযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেহ জিজ্ঞাসা করিল, সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ

আমল কোনটি? হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, নাজায়েয কাজ হইতে বাঁচা। আর ইহা এই যে, আল্লাহ তায়ালায় যিকিরে তোমার জবান যেন তরুতাজা থাকে। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, শ্রেষ্ঠ সাথী কে? হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ঐ ব্যক্তি, যে তোমাকে নেক কাজ করিতে ভুলিয়া গেলে সতর্ক করে। আর যদি তোমার স্মরণে থাকে, তবে সে তোমাকে নেক কাজে সাহায্য করে। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, মন্দ সাথী কে? হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ঐ ব্যক্তি, যে নেক কাজ করিতে ভুলিয়া গেলে তোমাকে সতর্ক করে না। আর তুমি নিজের করিতে চাহিলে সে উহাতে তোমার সাহায্য করে না। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, সবচেয়ে বড় আলেম কে? হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে সবচেয়ে বেশী ভয় করে। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, আমরা কোন্ লোকদের সহিত বেশী উঠাবসা করিব? হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যাহাদের চেহারা দেখিলে আল্লাহ তায়ালায় স্মরণ তাজা হয়।

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আখেরাতে ঐ ব্যক্তি বেশী চিন্তামুক্ত হইবে, যে দুনিয়াতে চিন্তামুক্ত থাকিয়াছে। আর আখেরাতে ঐ ব্যক্তি বেশী হাসিবে, যে দুনিয়াতে বেশী কাঁদিয়াছে।

(১০) দশম আলামত এই যে, আখেরাতমুখী আলেম ঐ সমস্ত মাসায়েলের প্রতি বেশী গুরুত্ব দিয়া থাকেন, যেগুলি আমলের সহিত সম্পর্ক রাখে, জায়েয-নাজায়েযের সহিত সম্পর্ক রাখে। অমুক আমল করা জরুরী, অমুক আমল হইতে বাঁচা জরুরী, এই জিনিসের কারণে অমুক আমল নষ্ট হইয়া যায় (যেমন অমুক কাজের দ্বারা নামায নষ্ট হইয়া যায়, মেসওয়াক করিলে এই ফযীলত হাসিল হয় ইত্যাদি ইত্যাদি)। এইরূপ এলেম সম্পর্কিত কোন চর্চা তিনি করেন না, যাহা শুধু দেমাগী আনন্দের জন্য হয় কিংবা দেমাগী হিসাব-নিকাশের বিষয় হয়। যাহাতে লোকেরা তাহাকে বড় চিন্তাবিদ, বড় জ্ঞানী ও দার্শনিক মনে করে।

(১১) একাদশ আলামত এই যে, নিজের এলেমের মধ্যে বিচক্ষণতার সহিত দৃষ্টিপাত করিতে পারেন; শুধুমাত্র লোকদের অঙ্ক অনুকরণ ও অনুসরণের কারণে তাহাদের ভক্ত না হইয়া যায়। আসল অনুসরণ হইল, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীসমূহের অনুসরণ। আর এই কারণেই সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)এর অনুসরণ করা। কেননা, তাহারা হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কার্যসমূহ দেখিয়াছেন। আর যেহেতু আসল অনুসরণ হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

অনুসরণই, এইজন্য আশেরাতমুখী আলেম হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা ও কাজ জমা করা এবং উহাতে চিন্তা-ফিকির করার ব্যাপারে অনেক বেশী এহতেমাম করিয়া থাকেন।

(১২) দ্বাদশ আলামত—বিদআত কাজ হইতে অত্যন্ত কঠোরভাবে ও গুরুত্ব সহকারে বাঁচিয়া থাকেন। কোন কাজের ব্যাপারে অধিক পরিমাণে লোকের একমত হইয়া যাওয়া নির্ভরযোগ্য বিষয় নহে। বরং আসল অনুসরণ হইল, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ। আর দেখা চাই যে, সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)এর আমল ও অভ্যাস কি ছিল এবং ইহার জন্য তাহাদের আমল, অভ্যাস ও অবস্থা গভীরভাবে তালিশ ও অনুসন্ধান করা এবং উহার মধ্যে মনোযোগ সহকারে মগ্ন থাকা জরুরী।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, দুই ব্যক্তি হইল বিদআতী ; যাহারা ইসলামের মধ্যে দুইটি বিদআত জারী করিয়াছে। এক—ঐ ব্যক্তি যে মনে করে যে, দ্বীন উহাই যাহা সে বুঝিয়াছে। আর যে তাহার অভিমতকে যে সমর্থন করে সেই মুক্তি পাইবে। দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি, যে দুনিয়ার পূজা করে, উহারই তালিশে লাগিয়া থাকে, দুনিয়া কামাইকারীদের প্রতি খুশী হয়। আর যে দুনিয়া কামাই করে না, তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়। এই দুই ব্যক্তিকে জাহান্নামের জন্য ছাড়িয়া দাও। আর যাহাকে আল্লাহ তায়াল্লা এই দুই ব্যক্তি হইতে হেফাজতে রাখিয়াছেন, সে পূর্ববর্তী বুয়ুর্গদের অনুসরণকারী এবং তাহাদের অবস্থা ও তরীকার অনুকরণকারী। এই ব্যক্তির জন্য ইনশাআল্লাহ অনেক বড় পুরস্কার রহিয়াছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, তোমরা এমন জামানায় আছ যে, এখন খাহেশাত এলেমের অধীন হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু অচিরেই এমন জামানা আসিবে, যখন এলেম খাহেশাতের অধীন হইবে। অর্থাৎ যেসব জিনিস মনে চাহিবে, ঐগুলিকেই এলেম দ্বারা প্রমাণ করা হইবে।

কোন কোন বুয়ুর্গ বলিয়াছেন, সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)এর যামানায় শয়তান তাহার সৈন্যদলকে চতুর্দিকে পাঠাইল। তাহারা সকলেই ঘুরিয়া ফিরিয়া অত্যন্ত পেরেশান ও পরিশ্রান্ত হইয়া আবার ফিরিয়া আসিল। শয়তান জিজ্ঞাসা করিল, কি অবস্থা? তাহারা বলিতে লাগিল, এই সমস্ত লোকেরা তো আমাদেরকে পেরেশান করিয়া দিয়াছে। আমাদের কোন প্রভাব তাহাদের উপর পড়ে না। আমরা তাহাদের কারণে বড় কষ্টে পড়িয়া গিয়াছি। শয়তান বলিল, ঘাবড়াইও না। এই সমস্ত লোক তাহাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর সঙ্গে পাইয়াছে ; তাহাদের উপর

তোমাদের প্রভাব ফেলা মুশকিল। অচিরেই এমন লোক আসিবে, যাহাদের দ্বারা তোমাদের সমস্ত উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবে। অতঃপর তাবেয়ীগণের যামানায় সে নিজের সৈন্যদলকে চতুর্দিকে ছড়াইয়া দিল। তাহারা সকলে তখনও পেরেশান অবস্থায় ফিরিয়া আসিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, কি অবস্থা? তাহারা বলিতে লাগিল, এই সমস্ত লোকেরা তো আমাদেরকে বিরক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। ইহারা আশ্চর্য ধরনের লোক। আমাদের উদ্দেশ্য তাহাদের দ্বারা কিছুটা পূরা হইয়া যায়; কিন্তু যখন সন্ধ্যা হয়, তখন তাহারা নিজেদের গুনাহ হইতে এমন তওবা করে যে, আমাদের সমস্ত চেষ্টা—মেহনত বরবাদ হইয়া যায়। শয়তান বলিল, ঘাবড়াইও না। অচিরেই এমন লোক আসিতেছে, যাহাদের দ্বারা তোমাদের চক্ষু শীতল হইবে। তাহারা দ্বীন মনে করিয়া নিজেদের খাহেশাতের মধ্যে এমনভাবে গ্রেফতার হইবে যে, তাহাদের তওবার তওফীকও হইবে না। তাহারা বদ-দ্বীনীকে দ্বীন মনে করিবে। সুতরাং এমনই হইল। পরবর্তীতে শয়তান তাহাদের জন্য এমন বিদআত বাহির করিয়া দিল, যেগুলিকে তাহারা দ্বীন মনে করিতে লাগিল। উহা হইতে কিভাবে তাহাদের তওবা নসীব হইবে!

উপরোক্ত বারটি আলামত সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হইল। ইমাম গায়যালী (রহঃ) এইগুলিকে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। এইজন্য উলামাদের নিজ্জেদের হিসাবের দিনকে বিশেষভাবে ভয় করার প্রয়োজন রহিয়াছে। কেননা, তাহাদের হিসাব-নিকাশও কঠিন, তাহাদের জিম্মাদারীও বেশী। কেয়ামতের যেইদিন এই হিসাব হইবে, উহা বড় কঠিন দিন হইবে। আল্লাহ তায়ালা কেবল নিজ্জের দয়া ও মেহেরবানীর দ্বারা ঐ দিনের কঠিন অবস্থা হইতে হেফাজতে রাখুন।

مُحَمَّدٍ أَقْدَسَ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ شانہ عَزَّوَجَلَّ تو ان کا فرمان ہے کہ اے آدم کی اولاد تو میری برہمائی کے لئے فاسد ہو جاؤ۔ میں تیرے سید کو پنا سے پُرکھوں گا اور تیرے فقر کو زائل کر دوں گا اور اگر تو ایسا نہیں کیا گا تو میں تجھے مشاغل میں پھانس دوں گا اور تیرا فقر زائل نہیں کروں گا۔

④ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ ابْنُ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَفَلَا صُنْدُكَ غِيًى وَأَسَدٌ فَقُرْ وَأَنْ لَا تَفْعَلَ مَلَأَتْ يَدَكَ سُفْلاً وَلَمْ أَسِدْ فَقُرْ -

(رواه احمد وابن ماجه كذا في المشكوة - وزاد في الترخيب الترمذی ابن
عبدان والمحاكم محمده وفي الباب عن عمران وغيره في الترخيب)

৭ ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, হে আদম সন্তান! তুমি আমার এবাদতের জন্য অবসর হইয়া যাও, আমি তোমার অন্তরকে সচ্ছলতা দ্বারা ভরিয়া দিব এবং তোমার অভাব দূর করিয়া দিব। আর যদি তুমি এইরূপ না কর, তবে আমি তোমাকে বিভিন্ন ব্যস্ততার মধ্যে জড়াইয়া দিব এবং তোমার অভাব দূর করিব না।

(মিশকাত : আহমদ, ইবনে মাজাহ, তারগীব : তিরমিযী, ইবনে হিব্বান)

ফায়দা : বিভিন্ন হাদীসে বিভিন্ন শব্দে উক্ত বিষয় বর্ণিত হইয়াছে—
হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযিঃ) ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি পূর্ণরূপে আল্লাহ তায়ালা প্রতি মনোযোগী হয় এবং তাহারই হইয়া যায়, আল্লাহ তায়ালা তাহার যাবতীয় প্রয়োজন নিজে পূরা করিয়া দেন এবং এমন জায়গা হইতে তাহাকে রুজি দান করেন যে, তাহার ধারণাও হয় না। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার পিছনে পড়িয়া যায় ; সবসময় উহারই ফিকিরে থাকে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে দুনিয়ার সোপর্দ করিয়া দেন যে, তুমি দুনিয়ার নিকট হইতেই বুঝিয়া লও।

হযরত আনাস (রাযিঃ) ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তির পূর্ণ মনোযোগ ও একমাত্র উদ্দেশ্য দুনিয়া কামাই করা হয়, উহারই জন্য সে সফর করে, উহারই খেয়াল তাহার অন্তরে থাকে, আল্লাহ তায়ালা অভাব-অনটনের (ভয়) তাহার চোখের সামনে করিয়া দেন, (সে সবসময় এই ভয় করিতে থাকে যে, আমদানী তো অনেক কম ; কি হইবে? কিভাবে চলিবে?) এবং তাহার সময়কে (এই চিন্তা ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে) পেরেশান করিয়া দেন, আর সে ততটুকুই পায়, যতটুকু তাহার তকদীরে থাকে। আর যে ব্যক্তির মনোযোগ ও একমাত্র উদ্দেশ্য আখেরাত হয়, উহারই জন্য সে সফর করে, উহারই খেয়াল তাহার অন্তরে থাকে, আল্লাহ তায়ালা (দুনিয়ার ব্যাপারে) অমুখাপেক্ষিতা ও নিশ্চিন্ততা তাহার সামনে করিয়া দেন এবং তাহার বিকল্প অবস্থাকে একত্রিত করিয়া দেন। আর দুনিয়া আপনা-আপনিই অপমানিত হইয়া তাহার নিকট আসে। (তারগীব)

আপনা-আপনিই অপমানিত হইয়া আসিবার অর্থ এই যে, যে জিনিস

তকদীরে আছে, উহা তো আসিবেই। কারণ, অনেক হাদীসে এই বিষয় বর্ণিত হইয়াছে যে, রুজি স্বয়ং মানুষকে এইরূপ তালাশ করে, যেমন মৃত্তা মানুষকে তালাশ করে। যখন উহা নিজে তাহার তালাশে রহিয়াছে, তাহার নিকট আসিতে বাধ্য। আর তাহার পক্ষ হইতে যদি অমুখাপেক্ষিতা থাকে, তবে সে অবশ্যই তাহার নিকট আসিবে। ইহা হইতে বেশী অপমান আর কি হইবে যে, সে নিজে তাহার কাছে আসে, আর এই ব্যক্তি বেপরওয়া আচরণ করে।

এক হাদীসে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি ঐ জিনিসের তালাশে লাগিয়া যায় যাহা আল্লাহ তায়ালা নিকট রহিয়াছে, আর আসমান তাহার ছায়া হয়, জমিন তাহার বিছানা হয়, দুনিয়ার কোন জিনিসের ফিকির তাহার থাকে না—এইরূপ ব্যক্তি ক্ষেত-ফসল না করিয়া রুটি খাইবে, বাগান না লাগাইয়া ফল খাইবে, আল্লাহর উপর তাহার তাওয়াক্কুল হয়, আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্টির তালাশে লাগিয়া থাকে—আল্লাহ তায়ালা সাত আসমান ও সাত জমিনকে তাহার রুজির জিম্মাদার বানাইয়া দেন। উহারা সকলে তাহার রুজি পৌছাইবার জন্য চেষ্টা করিতে থাকে। তাহাকে হালাল রুজি পৌছাইবার ব্যাপারে ত্রুটি করে না। ফলে, সে নিজের বে-হিসাব রুজি পূর্ণ করিয়া লয়। (দুররে মানসুর)

অন্য এক হাদীসে আছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে খাইফে (মিনার মসজিদে) ওয়াজ করিলেন। উহাতে আল্লাহ তায়ালা প্রশংসা করিবার পর এরশাদ করিলেন : দুনিয়া যে ব্যক্তির উদ্দেশ্যে পরিণত হয়, আল্লাহ তায়ালা তাহার যাবতীয় অবস্থাকে পেরেশান ও বিক্ষিপ্ত করিয়া দেন এবং দরিদ্রতা(র ভয়) সবসময় তাহার চোখের সামনে থাকে। আর দুনিয়া তো যে পরিমাণ তকদীরে আছে, উহা হইতে বেশী পাওয়া যায় না।

হযরত আবু যর (রাযিঃ) হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি দুনিয়ার পিছনে পড়িয়া যায়, আল্লাহ তায়ালা সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই। আর মুসলমানদের (কল্যাণ ও হিতকামনার) ফিকির তাহার না থাকে, তাহার মুসলমানদের সহিত কোন সম্পর্ক নাই। আর যে ব্যক্তি (দুনিয়াবী স্বার্থে) নিজেকে স্বেচ্ছায় লাক্ষিত করে, আমাদের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। (শুধু দুই চার পয়সার জন্য অথবা অন্য কোন দুনিয়াবী স্বার্থে নিজেকে অন্যের সামনে লাক্ষিত করা নিঃসন্দেহে নিজের মূল্য-মর্যাদা না বুঝা ও ঐ সমস্ত বুয়ুর্গের নামে

কলংক লাগানোর নামাস্তর, যাহাদের সহিত নিজেদের সম্পর্ক রহিয়াছে। আর সর্বোচ্চ সম্পর্ক হইল—ঈযুর সাম্রাজ্য আলাইহি ওয়াসাম্রামের উদ্ভব হওয়া।)

হযরত আনাস (রাযিঃ) হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন, চারটি জিনিস দুর্ভাগ্যের আলামত। এক—চক্ষু শুষ্ক হওয়া (অর্থাৎ আল্লাহর ভয়ে কখনও অশ্রু করে না)। দুই—অস্তর কঠিন হওয়া (অর্থাৎ নিজের আখেরাতের জন্য কিংবা অন্য কাহারও জন্য কখনও নরম হয় না)। তিন—আশা-আকাঙ্ক্ষা দীর্ঘ হওয়া। চার—দুনিয়ার লোভ। (তরগীব)

হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) একবার সতর্ক করিয়া বলিলেন, হে লোকসকল! তোমাদের কি হইতেছে? আমি দেখিতেছি যে, তোমাদের আলেমগণ দিন দিন (মৃত্যুর কারণে) করিয়া যাইতেছেন আর তোমাদের জাহেল লোকেরা এলেম শিখে না। ঐ সময় আসার পূর্বে এলেম শিখিয়া লও, যখন আলেমগণ ইন্তেকাল করিয়া যাইবেন এবং তাহাদের ইন্তেকালের কারণে এলেম চলিয়া যাইবে। (অতঃপর কোন শিক্ষাদানকারীও সঠিকভাবে পাওয়া যাইবে না।) আমি তোমাদিগকে দেখিতেছি যে, তোমরা ঐ জিনিস জমা করিবার ব্যাপারে তো বড় লোভ করিয়া থাক, যাহা আল্লাহ তায়ালা নিজ জিম্মায় লইয়া রাখিয়াছেন (অর্থাৎ রুজি)। আর ঐ জিনিসকে ধ্বংস করিতেছ, যাহার জিম্মাদার তোমরা নিজেরা অর্থাৎ এলেম ও আমল)। আমি তোমাদের নিকৃষ্টতম লোকদিগকে দেখিতেছি—যাহারা যাকাতকে জরিমানা মনে করে, নামাযকে সময় পার করিয়া পড়ে এবং কুরআন পাক পড়ার ব্যাপারেও অবহেলা করে। (তরগীস)

حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے
 کہ جو شخص دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی
 آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو اپنی آخرت
 سے محبت کرتا ہے وہ (صورت کے اعتبار
 سے) دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے۔ پس (جب
 یہ ضابطہ ہے تو) جو چیز ہمیشہ بہنے والی
 ہے (یعنی آخرت) اس کو ترجیح دو! اس چیز
 پر جو بہر حال فنا ہو جائے والی ہے۔

⑧ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَهْرَأَ
بِأَخْرَجِهِ وَمَنْ أَحَبَّ أَخْرَجَهُ
أَهْرَأَ بِدُنْيَاهُ كَاثُرُوا مَا يَبْقَى
عَلَى مَا يَفْنَى -
(رواه أحمد والبيهقي في شعب
الإيمان كذا في المشكاة)

৮) হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়ার সহিত মহক্বত রাখে, সে তাহার আখেরাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। আর যে নিজের আখেরাতের সহিত মহক্বত রাখে, সে (বাহ্যিক দৃষ্টিতে) দুনিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। সুতরাং (যেহেতু ইহাই নিয়ম, কাজেই) যে জিনিস সবসময় থাকিবে (অর্থাৎ আখেরাত) উহাকে প্রাধান্য দাও এ জিনিসের উপর, যাহা অবশ্যই ধ্বংস হইয়া যাইবে।

(মিশকাত : আহমদ, বায়হাকী)

ফায়দা : দুনিয়ার জীবন—চাই যতই বেশী হউক না কেন— একসময় শেষ হইবে এবং উহার সম্পদ ও আসবাব-পত্র—চাই যতই বেশী হউক না কেন—একদিন হাতছাড়া হইবেই ; মৃত্যুর কারণেই হউক অথবা নষ্ট হইয়া যাওয়ার কারণেই হউক। আর আখেরাতের জীবন কখনও শেষ হইবে না। উহার নেয়ামতসমূহ চিরকাল থাকিবে। এমনতাবস্থায় স্পষ্ট কথা যে, মানুষের মধ্যে যদি সামান্য পরিমাণও বিবেক-বুদ্ধি থাকে, তবে এমন জিনিস গ্রহণ করা উচিত, যাহা সবসময় নিজের কাছে থাকিবে। এমন জিনিসের পিছনে পড়া যাহা কোন অবস্থাতেই নিজের কাছে সর্বদা থাকিবে না ; চরম বোকামী। কিন্তু, আমাদের বিবেক-বুদ্ধির উপর গাফলতির পর্দা পড়িয়া রহিয়াছে। ঐ স্টেশনের ওয়েটিং রুমের সৌন্দর্য ও সাজসজ্জায় মন লাগাইয়া বসিয়া রহিয়াছি, অথচ সেখানের অবস্থান শুধু এতটুকু যে, রেলগাড়ি আসিয়া পড়িবে আর উহাতে সওয়ার হইয়া যাইতে হইবে। এই সামান্য সময়ের মধ্যে যদি মানুষ নিজের সফরের প্রস্তুতিতে মনগুলা থাকে, নিজের সফরের সামান তৈরী করিয়া লয়, যে সমস্ত জিনিস দেশে পৌঁছবার পর কাজে আসিবে সেইগুলি জোগাড় করিয়া লয়, তবে অবশ্যই ইহা তাহার জন্য কাজের জিনিস হইবে। আর যদি সে নিজের এই মূল্যবান সময় ও সামান্য সুযোগ সেখানে ঘোরাফেরার মধ্যে খরচ করিয়া দেয়, তাহার সামান বিক্রিও পড়িয়া থাকে আর নিজে ওয়েটিং রুমের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও উহার ফার্নিচার সাজানো-গুছানোর মধ্যে লাগিয়া যায় অথবা আরও বোকামী এই করে যে, সেই ঘরে ঝুলাইয়া রাখিবার জন্য আয়না ও বিভিন্ন নকশী জিনিস খরিদ করার মধ্যে লাগিয়া যায়, তবে সে নিজের সামানও হারাইবে এবং নিজের আসবাব-পত্রও বরবাদ করিবে।

এই পবিত্র হাদীসে দুনিয়াকে মহক্বত না করার প্রতি সতর্ক করা হইয়াছে। কেননা, মহক্বত এমন কঠিন জিনিস ; যাহাকেই পাইয়া বসে ধীরে ধীরে তাহাকে নিজের অধীন করিয়া ফেলে। এইজন্যই আখেরাতের

সহিত মহব্বত পয়দা করার উৎসাহ দিয়াছেন এবং দুনিয়ার মহব্বত ছাড়িয়া দিতে বলিয়াছেন। দুনিয়ার সহিত মহব্বতকারী ব্যক্তি যদিও এখন আখেরাতের আমল করিতেছে; কিন্তু এই অপবিত্র দুনিয়ার মহব্বত প্রভাব না ফেলিয়া থাকিবে না। ধীরে ধীরে আখেরাতের কাজে শিথিলতা, বাধা এবং লোকসান পয়দা করিয়া দিবে। বুয়ুর্গানে দ্বীন বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াকে মহব্বত করে সমস্ত পীর ও মুর্শিদ মিলিয়াও তাহাকে হেদায়াত করিতে পারে না। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াকে ছাড়িয়া দেয় (উহাকে ঘৃণা করে), তাহাকে সমস্ত ফাসাদকারী লোক মিলিয়াও গোমরাহ করিতে পারে না। (মাজাহেরে হক)

হযরত বারা (রাযিঃ) হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে নিজের খায়েশ পূরা করে, সে আখেরাতে তাহার খায়েশ পূরা করা হইতে বঞ্চিত হয়। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে ভোগ-বিলাসী (সম্পদশালী) লোকদের জাকজমকের দিকে (লালসার) দৃষ্টিতে তাকায়, সে আসমানের বাদশাহীতে অপমানিত সাব্যস্ত হয়। আর যে ব্যক্তি কম হইতে কম রুজির উপর সবার ও ধৈর্যধারণ করে, সে জান্নাতুল ফেরদাউসে সর্বোচ্চ ঠিকানা লাভ করে। (দুররে মানসূর)

হযরত লোকমান (আঃ) বিখ্যাত হাকীম ছিলেন। কুরআন পাকেও তাহার নসীহতসমূহ উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি একজন কালো হাবশী গোলাম ছিলেন। আল্লাহ তায়ালার দয়ায় তিনি হাকীম লোকমান হইয়া গেলেন। কোন কোন বর্ণনায় আছে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে এখতিয়ার দিয়াছিলেন যে, হেকমত এবং রাজত্ব এই দুইয়ের মধ্যে যে কোন একটি তোমার ইচ্ছা গ্রহণ করিয়া লও। তিনি হেকমতকে গ্রহণ করিয়া নিলেন।

এক হাদীসে আছে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে বলিয়াছেন, তুমি কি ইহা পছন্দ কর যে, তোমাকে বাদশাহ বানাইয়া দেওয়া হয় আর তুমি ইনসাফ অনুযায়ী বাদশাহী কর? তিনি আরজ করিলেন, যদি আমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে এই হুকুম হয়, তবে আমার আপত্তি নাই। কেননা, এই অবস্থায় আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে আমার সাহায্য হইবে। আর যদি আমাকে কবুল করা ও না করার মধ্যে এখতিয়ার দেওয়া হয়, তবে আমি ক্ষমা চাই। আমি আমার জিম্মায় মুসীবত রাখিতে চাই না। ফেরেশতারা জিজ্ঞাসা করিল, হে লোকমান! ইহা কেমন কথা! তিনি জওয়াব দিলেন, শাসনকর্তা বড় কঠিন জায়গায় অবস্থান করে, সমস্ত অপছন্দনীয় বিষয় ও জুলুম চতুর্দিক হইতে তাহাকে ঘিরিয়া লয়, এমতাবস্থায় তখন তাহার সাহায্য হইতেও পারে, নাও হইতে পারে। যদি

হক ও ন্যায়ের পক্ষে ফায়সালা করে, তবে তো নাজাত হইতে পারে, নতুবা জান্নাতের রাস্তা হইতে পথভ্রষ্ট হইয়া যাইবে। কোন ব্যক্তি দুনিয়াতে নিচভাবে জীবন কাটাইয়া দেয়—ইহা দুনিয়াতে সম্মানজনক জীবন কাটাইয়া (আখেরাতে হিসাবের সময়) ধ্বংস হওয়া অপেক্ষা উত্তম। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেয়, দুনিয়া তো তাহার নিকট হইতে ছুটিয়া যায়, আর অপরদিকে সে আখেরাতের কাজেরও উপযুক্ত থাকে না। হযরত লোকমানের এই জওয়াব শুনিয়া ফেরেশতাগণ আশ্চর্যান্বিত হইল। অতঃপর তিনি ঘুমাইয়া গেলেন। তখন আল্লাহ তায়ালা তাহাকে হেকমত দ্বারা ঢাকিয়া দিলেন। (দুররে মানসুর)

হযরত লোকমান হইতে যে সমস্ত হেকমতের কথা এবং নিজের পুত্রকে করা নসীহতসমূহ বর্ণনা করা হইয়াছে, উহা বড় আশ্চর্যজনক। অনেক বেশী পরিমাণে উহা বর্ণিত হইয়াছে। সেই সকল নসীহত হইতে ইহাও একটি যে, বেটা! উলামাদের মজলিসে বেশী বেশী বসিও এবং বিস্তর লোকদের কথা গুরুত্বসহকারে শুনিও। আল্লাহ তায়ালা হেকমতের নূর দ্বারা মুর্দা দিলকে এইরূপ জিন্দা করেন, যেমন শুষ্ক জমিন প্রবল বৃষ্টি দ্বারা জিন্দা হয়। এক ব্যক্তি তাহার নিকট দিয়া যাইতেছিল। সেই সময় তাহার নিকট অনেক লোকজন বসা ছিল। লোকটি বলিল, তুমি কি অমুক কওমের গোলাম নও? তিনি বলিলেন, হাঁ, আমি তাহাদের গোলাম ছিলাম। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি ঐ ব্যক্তি নও, যে অমুক পাহাড়ের নিকট বকরী চরাইত? তিনি বলিলেন, হাঁ, আমি ঐ ব্যক্তি। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, তবে তুমি এই মর্যাদা কিভাবে লাভ করিলে? তিনি বলিলেন, কয়েকটি জিনিসের পাবন্দী করার এবং সেইগুলির গুরুত্ব দেওয়ার কারণে। তাহা এই যে, আল্লাহ তায়ালায় ভয়, কথায় সত্যতা, আমানত পূরাপূরিভাবে আদায় করা, অহেতুক কথাবার্তা হইতে বাঁচিয়া থাকা।

তিনি বলেন, বেটা! আল্লাহ তায়ালায় প্রতি এইরূপ আশা রাখ যে, তাহার আজাব হইতে নিশ্চিত হইয়া না যাও, এমনভাবে তাহার আজাবকে ভয় কর যে, তাহার রহমত হইতে নিরাশ হইয়া না যাও। বেটা আরজ করিল, অন্তর তো একটি—উহার মধ্যে ভয় এবং আশা উভয় জিনিস কিভাবে জমা হইবে? তিনি বলিলেন, মুমিন এমনই হয় যে, তাহার যেন দুইটি অন্তর হয়; একটিতে পূর্ণ আশা, অপরটিতে পূর্ণ ভয় থাকে। তিনি ইহাও বলিয়াছেন, বেটা! ‘রকিবণ্ ফিরলী’ অধিক পরিমাণে পড়িতে থাক। আল্লাহ তায়ালায় দানের মধ্যে কোন কোন সময় এমনও

হয় যে, উহাতে মানুষ যাহাই চায় পাইয়া যায়।

তাহার উপদেশের মধ্যে আছে—বেটা! নেক আমল আল্লাহ তায়ালা সহিত একীন ব্যতীত হইতে পারে না। যাহার একীন দুর্বল হইবে, তাহার আমলও দুর্বল হইবে। বেটা! যখন শয়তান তোমাকে কোন সন্দেহের মধ্যে লিপ্ত করে, তখন তুমি একীনের দ্বারা তাহাকে পরাজিত কর। আর যখন তোমাকে আমলের মধ্যে গাফলতির দিকে লইয়া যায়, তখন কবর ও কিয়ামতের স্মরণ দ্বারা তাহার উপর বিজয় হাসিল কর। আর যখন দুনিয়ার আসক্তি অথবা (এখানকার কষ্টের) ভয়ের রাস্তা দিয়া সে তোমার কাছে আসে, তখন তাহাকে বলিয়া দাও যে, দুনিয়া সর্বাবস্থায় ছুটিয়া যাওয়ার জিনিস। (না এখানের আরাম সবসময় থাকিবে আর না এখানের কষ্টও সবসময় থাকিবে।)

তাহার উপদেশের মধ্যে আছে—বেটা! যে ব্যক্তি মিথ্যা বলে, তাহার চেহারার সৌন্দর্য চলিয়া যায়। যাহার অভ্যাস খারাপ হইবে, তাহার উপর দূর্চিন্তা সওয়ার হইবে। আর পাহাড়ের পাথরসমূহকে এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত করা আহমকদেরকে বুদ্ধান হইতে অনেক সহজ।

তিনি আরও বলিয়াছেন, বেটা! মিথ্যা হইতে নিজেকে অত্যন্ত হেফাজতে রাখ। মিথ্যা বলা পাখির গোশতের মত স্বাদ তো মনে হয়; কিন্তু অতি সত্ত্বর উহা মিথ্যাবাদী ব্যক্তির সহিত শত্রুতার কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

বেটা! গুরুত্ব সহকারে জানাযায় শরীক হইও এবং অহেতুক অনুষ্ঠানাদিতে শরীক হওয়া হইতে বাঁচিয়া থাকিও। কেননা, জানাযা আখেরাতের স্মরণকে তাজা করে এবং বিবাহ-শাদী ও অনুষ্ঠানাদি দুনিয়ার দিকে মনগুল করিয়া দেয়।

বেটা! যখন পেট ভরা থাকে, তখন খাইও না। পেট ভরা অবস্থায় খাওয়ার চাইতে কুকুরকে দিয়া দেওয়া ভাল।

বেটা! তুমি এত মিষ্ট হইও না যে, মানুষ তোমাকে গিলিয়া ফেলে। আর এত তিক্ত হইও না যে, মানুষ তোমাকে থুথুর মত ফেলিয়া দেয়।

বেটা! তুমি মোরগের চাইতে বেশী অক্ষম হইও না। সে তো শেষ রাত্রিতে জাগিয়া চিৎকার শুরু করিয়া দেয়, আর তুমি নিজের বিছানায় পড়িয়া ঘুমাইতে থাক।

বেটা! তওবা করিতে দেরী করিও না। কেননা, মৃত্যুর নির্ধারিত কোন সময় নাই। উহা হঠাৎ আসিয়া পড়ে।

বেটা ! মুখের সহিত বন্ধুত্ব করিও না। এমন না হয় যে, তাহার মুখতাসুলভ কথাবার্তা তোমার ভাল লাগিতে আরম্ভ করে। আর জ্ঞানী লোকের সহিত শত্রুতা করিও না ; এমন না হয় যে, সে তোমার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া রাখে (অতঃপর তুমি তাহার হেকমত ও জ্ঞানসুলভ কথাবার্তা হইতে বঞ্চিত হইয়া যাও)।

বেটা ! নিজের খানা খোদাভীরু লোকদের ব্যতীত কাহাকেও খাওয়াইও না। আর নিজের কাজে আলেমগণের নিকট হইতে পরামর্শ লইতে থাকিও।

কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, নিকট লোক কে? তিনি বলিলেন, যে ইহার পরওয়া করে না যে, কোন ব্যক্তি তাহাকে খারাপ কাজ করিতে দেখিয়া ফেলে।

তিনি আরও বলিয়াছেন, বেটা ! নেক লোকদের নিকট বেশী বেশী বসিও। কেননা, তাহাদের নিকট বসিলে নেকী হাসিল করিতে পারিবে। যদি তাহাদের উপর কোন সময় আল্লাহর খাস রহমত নাজিল হয়, তবে উহা হইতে কিছু না কিছু তুমিও পাইবে। (কেননা, যখন বৃষ্টি বর্ষিত হয়, তখন সেই স্থানের সমস্ত অংশে পৌঁছে।) নিজেকে খারাপ লোকদের সংশ্রব হইতে দূরে রাখিও। কেননা, তাহাদের নিকট বসিলে কোন ভাল বিষয়ের তো আশা নাই ; যদি তাহাদের উপর কখনও আজাব আসে, তবে উহার প্রভাব তোমার উপরেও পড়িবে।

তিনি আরও বলিয়াছেন, পিতার প্রহার সন্তানের জন্য এমন উপকারী, যেমন ক্ষেতের জন্য পানি।

তিনি আরও বলিয়াছেন, বেটা ! তুমি যেদিন হইতে দুনিয়াতে আসিয়াছ, প্রতিদিন আশ্বেরাতে নিকটবর্তী হইতেছ। (এবং দুনিয়া হইতে প্রতিদিন দূরে সরিয়া যাইতেছ, অতএব ঐ ঘর যাহার দিকে তুমি দৈনিক চলিতেছ উহা ঐ ঘরের তুলনায় অনেক নিকটে, যে ঘর হইতে প্রতিদিন দূরে সরিয়া যাইতেছ।)

বেটা ! করজ হইতে নিজেকে হেফাজতে রাখিও। কেননা, ইহা দিনের বেলায় অপমান এবং রাত্রিতে দূষিত্তা। (অর্থাৎ পাওনাদারের তাগাদায় দিনের বেলায় অপমান সহ্য করিতে হয় এবং সারারাত্র করজের চিন্তায় অতিবাহিত হয়।)

বেটা ! আল্লাহর রহমতের এই পরিমাণ আশা রাখ, যাহাতে গুনাহের উপর সাহস না হয়। আর তাহাকে এই পরিমাণ ভয় কর যে, তাহার রহমত হইতে নিরাশ না হইয়া যাও।

বেটা ! যদি তোমার নিকট কোন ব্যক্তি আসিয়া কাহারও সম্পর্কে অভিযোগ করে যে, অমুক ব্যক্তি আমার চোখ দুইটি বাহির করিয়া দিয়াছে এবং বাস্তবেও তাহার চোখ দুইটি বাহির হইয়া রহিয়াছে, তবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিও না, যতক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় ব্যক্তির কথা না শুনিয়া লও। হইতে পারে, সে প্রথমে শুরু করিয়াছে এবং সে ইহার পূর্বে চারটি চোখ বাহির করিয়াছে। (দূরে মানসুর)

ফকীহ আবুল লাইছ (রহঃ) বর্ণনা করেন, যখন হযরত লোকমান হাকীম (আঃ)এর ইন্তেকালের সময় হইল, তখন তিনি নিজের ছেলেকে বলিলেন, বেটা ! আমি তোমাকে আমার এই জীবনে অনেক নসীহত করিয়াছি, এখন (আমার শেষ সময়) ছয়টি নসীহত তোমাকে করিতেছি। ১—দুনিয়ার মধ্যে নিজেকে শুধু সেই পরিমাণ মশগুল রাখিও, যেই পরিমাণ জীবন বাকী আছে (অর্থাৎ আখেরাতের তুলনায় উহা কিছুই নয়)। ২—আল্লাহ তায়ালার প্রতি তোমার যেই পরিমাণ মুখাপেক্ষিতা রহিয়াছে, সেই পরিমাণই তাহার এবাদত করিও (আর জানা কথা যে, মানুষ প্রত্যেক বিষয়ে আল্লাহ তায়ালার মুখাপেক্ষী)। ৩—আখেরাতের জন্য ঐ পরিমাণ প্রস্তুতি গ্রহণ করিও, যেই পরিমাণ সেখানে অবস্থান করিবার এরাদা আছে (আর জানা কথা যে, মৃত্যুর পর তো সেইখানে ছাড়া অবস্থান করিবার আর কোন জায়গাই নাই)। ৪—যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার জাহান্নাম হইতে মুক্তির একীন না হইয়া যাইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত উহা হইতে মুক্তির জন্য চেষ্টা করিতে থাকিও (আর ইহা স্পষ্ট যে, যখন কেহ কোন কঠিন মোকদ্দমায় আটকা পড়ে, তখন যতক্ষণ না মোকদ্দমা খারেজ হওয়ার একীন হয়, চেষ্টায় লাগিয়া থাকে)। ৫—গুনাহের উপর ঐ পরিমাণ সাহস করিও, যেই পরিমাণ জাহান্নামের আগুনে জ্বলিবার সাহস ও মনোবল রহিয়াছে (কারণ, গুনাহের শাস্তি নিয়মগত জিনিস, শাহী ক্ষমা পাওয়া যাইবে কিনা; জানা নাই)। ৬—যখন কোন গুনাহ করিতে চাও, তখন এমন জায়গা তালাশ করিয়া লইও, যেখানে আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁহার ফেরেশতাগণ না দেখেন (কারণ, স্বয়ং হাকীমের সম্মুখে, সিআইডির লোকদের সম্মুখে, রাষ্ট্রদ্রোহিতার পরিণতি কি ; তাহা জানা আছে)। (তাম্বীহুল গাফেলীন)

হযরত লোকমান হাকীম (আঃ)এর এই কয়েকটি নসীহত প্রসঙ্গত উল্লেখ করা হইল। এই নসীহতসমূহ উল্লেখ করার উদ্দেশ্য যাহা পূর্ব হইতে আমি লিখিয়া আসিতেছি। অর্থাৎ যে ব্যক্তি দুনিয়ার সহিত মহব্বত রাখে, সে তাহার আখেরাতের ক্ষতি করে।

আরফাজা সাকাফী (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে

মাসউদ (রাযিঃ)এর নিকট 'সূরা ছাব্বি হিস্মা' পড়িবার দরখাস্ত করিলাম। তিনি পড়িতে আরম্ভ করিলেন। যখন **بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا** এই আয়াতের উপর পৌছিলেন, যাহার অর্থ হইল—তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিয়া থাক ; অথচ আখেরাত অতি উত্তম ও চিরস্থায়ী, (আলা : ১৬-১৭) তখন হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) তেলাওয়াত বন্ধ করিয়া বলিলেন, নিঃসন্দেহে আমরা দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দিয়াছি। উপস্থিত সকল লোক চুপ করিয়া ছিল। তিনি দ্বিতীয়বার বলিলেন, আমরা দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়াছি। কারণ, আমরা উহার সৌন্দর্যকে দেখিয়াছি, উহার নারীদেরকে দেখিয়াছি, উহার খানাপিনাকে দেখিয়াছি, আর আখেরাতের এই সব জিনিস আমাদের নিকট হইতে গোপন ছিল—এইজন্য দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়া বসিয়াছি আর আখেরাতকে ছাড়িয়া দিয়াছি।

হযরত আনাস (রাযিঃ) হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'এর কালেমা আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টি হইতে বান্দাদেরকে ততক্ষণ বাঁচাইয়া রাখে, যতক্ষণ তাহারা দুনিয়ার ব্যবসাকে আখেরাতের ব্যবসার উপর প্রাধান্য না দেয়। আর যখন দুনিয়ার ব্যবসাকে আখেরাতের ব্যবসার উপর প্রাধান্য দিতে আরম্ভ করে অতঃপর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে, তখন ঐ কালেমাকে তাহার প্রতি এই বলিয়া ফিরাইয়া দেওয়া হয় যে, তুমি মিথ্যা বলিতেছ (অর্থাৎ তোমার স্বীকারোক্তি মিথ্যা, মুখের জমা-খরচ মাত্র)।

এক হাদীসে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহ্ লা শারীকা লাহ্' এর সাক্ষ্য সহকারে আল্লাহ তায়ালার সহিত সাক্ষাত করে, সে (সোজা) জান্নাতে দাখেল হয়—যতক্ষণ পর্যন্ত উহার সহিত অন্য জিনিসকে না মিশ্রিত করে। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার এই কথা বলিলেন। উপস্থিত লোকদের মধ্য হইতে একজন আরজ করিল, আমার পিতামাতা আপনার উপর কোরবান হউন—অন্য জিনিস মিশ্রিত করার অর্থ কি? হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, দুনিয়ার মহব্বত এবং উহাকে প্রাধান্য দেওয়া, উহার জন্য ধন-সম্পদ জমা করা, দুনিয়ার জিনিসপত্রের দ্বারা আনন্দিত হওয়া, অহংকারী লোকদের মত কাজকর্ম করা।

এক হাদীসে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দুনিয়া ঐ ব্যক্তির ঘর, যাহার (আখেরাতে) ঘর নাই। দুনিয়া

ঐ ব্যক্তির সম্পদ, যাহার (আখেরাতে) সম্পদ নাই। দুনিয়ার জন্য ঐ ব্যক্তি সম্পদ জমা করে, যাহার একেবারে বিবেক নাই। (দুররে মানসূর)

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দুনিয়া নিজে অভিশপ্ত এবং যাহা কিছু উহাতে আছে সব অভিশপ্ত ; শুধুমাত্র উহা ছাড়া, যাহা আল্লাহ তায়ালার জন্য হয়। (জামে সগীর)

ইমাম গায়যালী (রহঃ) দুনিয়ার নিন্দা অধ্যায়ে লিখিয়াছেন, সমস্ত প্রশংসা ঐ পবিত্র সত্তার, যিনি আপন বন্ধুদেরকে দুনিয়ার ধ্বংসাত্মক বিষয়াবলী ও উহার আপদসমূহ সম্পর্কে জানাইয়া দিয়াছেন। আর দুনিয়ার দোষসমূহ ও উহার রহস্যাবলী আপন বন্ধুদের সম্মুখে স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন। ফলে, তাহারা দুনিয়ার অবস্থাসমূহ জানিয়া এবং উহার ভাল ও মন্দের তুলনা করিয়া ইহা জানিয়া লইয়াছেন যে, দুনিয়ার মন্দ উহার ভালর চেয়ে বেশী। আর যে সমস্ত আশা ও আকাঙ্ক্ষা দুনিয়ার সহিত সম্পর্কিত রহিয়াছে, তাহা ঐ সমস্ত আশংকাজনক জিনিসের মুকাবেলা করিতে পারিবে না, যাহা এই দুনিয়ার কারণে সৃষ্টি হইবে। দুনিয়া একটি চটপটে নারীর মত ; লোকদেরকে আপন রূপ-লাবণ্যের দ্বারা বন্দী করে এবং আপন কুকর্মের দ্বারা তাহার মিলনাঙ্ক্ষীদেরকে ধ্বংস করে। সে আপন প্রেমিকদের নিকট হইতে ভাগিয়া যায়। তাহাদের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার ব্যাপারে বড় কৃপণ। আর যদি মনোযোগ দেয়ও ; তবুও তাহার মনোযোগ দেওয়ার মধ্যেও বিপদ ও মুসীবত হইতে নিরাপত্তা নাই। যদি একবার অনুগ্রহ করে, তবে এক বৎসর পর্যন্ত দুর্ব্যবহার করিতে থাকে। যে তাহার ধোকায় পতিত হয়, তাহার পরিণতি হয় অপমান। আর যে উহার কারণে অহংকার করে, সে পরিশেষে আক্ষেপ ও আফসোস করিতে থাকে। তাহার অভ্যাস হইল, আপন প্রেমিকদের নিকট হইতে ভাগিয়া যাওয়া, আর যে তাহার নিকট হইতে ভাগিয়া যায়, তাহার পিছনে লাগিয়া যাওয়া। যে তাহার খেদমত করে, তাহার নিকট হইতে পৃথক থাকে। আর যে তাহার নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়, তাহার সহিত সাক্ষাতের চেষ্টা করে। তাহার পরিচ্ছন্নতার মধ্যেও ময়লা রহিয়াছে। তাহার আনন্দের মধ্যেও দুঃখ ও চিন্তা অবশ্যস্বাভাবী। তাহার নেয়ামতসমূহের পরিণতি আফসোস ও লজ্জা ছাড়া কিছু নহে। সে বড় ধোকাবাজ, ছলনাময়ী নারী, অত্যন্ত পলায়নকারিণী, মুহূর্তে উড়িয়া যায়। সে আপন প্রেমিকদের জন্য অত্যন্ত সাজ-সজ্জা অবলম্বন করে। যখন তাহারা উহাতে ভালভাবে জড়াইয়া পড়ে, তখন ভয় দেখাইতে আরম্ভ করে, তাহাদের গুহানো অবস্থাগুলিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয় এবং নিজের প্রতারণার বিচিত্র খেলা

তাহাদিগকে দেখায়। অতঃপর নিজের প্রাণঘাতী বিষ তাহাদিগকে পান করায়। এই দুনিয়া আল্লাহ তায়ালায় দূশমন। তাহার বন্ধুদের দূশমন। তাহার দূশমনদের দূশমন। আল্লাহ তায়ালায় দূশমন এইভাবে যে, যাহারা তাহার দিকে অগ্রসর হয়, তাহাদের উপর ডাকাতি করে। তাহার বন্ধুদের সহিত দূশমনি এইভাবে করে যে, তাহাদের মন ভুলানোর জন্য বিভিন্ন রকমের সাজ-সজ্জা গ্রহণ করে, যাহাতে তাহারা সেই দিকে মনোযোগী হইয়া আল্লাহ তায়ালায় সহিত সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যাওয়ার কারণে ধৈর্যের তিক্ত স্বাদ গ্রহণ করে। আল্লাহ তায়ালায় দূশমনদের সহিত দূশমনি এইভাবে করে যে, নিজের প্রতারণার মাধ্যমে তাহাদিগকে শিকার করে। যখন তাহারা তাহার বন্ধুত্বের উপর ভরসা করিতে আরম্ভ করে, তখন এমন সময় তাহাদিগকে একদম অসহায় অবস্থায় ছাড়িয়া দেয়, যখন তাহারা তাহার অত্যন্ত মুখাপেক্ষী হয়। যে কারণে তাহারা চিরস্থায়ী আফসোস ও চিরস্থায়ী আযাবের মধ্যে লিপ্ত হইয়া যায়। কুরআন পাকের বহু আয়াতে এবং হাদীস শরীফে অধিক পরিমাণে দুনিয়ার নিন্দা বর্ণিত হইয়াছে। বরং সমস্ত আশ্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ)কে এই বিষয়ে সতর্ক করার জন্যই পাঠান হইয়াছে যে, মানুষ যেন দুনিয়ার সহিত দিল না লাগায়।

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার একটি মৃত বকরীর পাশ দিয়া যাইতেছিলেন। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করিয়া এরশাদ করিলেন, তোমরা কি মন কর যে, এই মৃত বকরিটি ইহার মালিকের নিকট কোন মূল্য রাখে? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, ইহার মূল্যহীনতা ইহা দ্বারাই বুঝা যাইতেছে যে, ইহাকে ফেলিয়া দিয়াছে। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, এই বকরি তাহার মালিকের নিকট যেইরূপ মূল্যহীন, আল্লাহ তায়ালায় নিকট দুনিয়া উহা হইতেও অধিক নিকৃষ্ট ও মূল্যহীন। যদি আল্লাহ তায়ালায় নিকট দুনিয়ার মূল্য মশার একটি ডানার সমানও হইত, তবে কোন কাফের এই দুনিয়া হইতে এক ঢোক পানিও পাইত না।

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দুনিয়ার মহব্বত সমস্ত গুনাহের মূল ও ভিত্তি।

হযরত য়ায়েদ ইবনে সাবেত (রাযিঃ) বলেন, আমরা একবার হযরত আবু বকর (রাযিঃ)এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি পান করিবার জন্য কিছু চাহিলেন। মধুর শরবত পেশ করা হইল। উহা মুখের নিকট লইয়া হযরত আবু বকর (রাযিঃ) কাঁদিতে লাগিলেন এবং এত কাঁদিলেন

যে, নিকটে বসা লোকরাও প্রভাবিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। তিনি খুব কাঁদিলেন। অতঃপর পুনরায় মুখের নিকট লইয়া গেলেন। আবারও কাঁদিতে লাগিলেন। অতঃপর চোখের পানি মুছিলেন ও এরশাদ করিলেন, আমি একবার ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। আমি দেখিলাম যে, তিনি উভয় হাত দ্বারা কোন জিনিসকে দূর করিতেছেন। অথচ আমি ছয়রের সম্মুখে কোন জিনিস দেখিতে পাইলাম না। আমি ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ছয়! কোন জিনিসকে আপনার নিকট হইতে সরাইতেছেন? ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, দুনিয়া আমার সম্মুখে হাজির হইয়াছিল। আমি উহাকে আমার নিকট হইতে সরাইয়া দিয়াছি। অতঃপর আবার দুনিয়া আমার (অর্থাৎ ছয়রের) নিকট আসিল এবং বলিতে লাগিল যে, আপনি আমার নিকট হইতে বাঁচিয়া গেলেন (এইজন্য আমার কোন দুঃখ নাই, কেননা) আপনার পর যাহারা আসিবে, তাহারা আমার নিকট হইতে বাঁচিতে পারিবে না।

এক হাদীসে ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, অত্যন্ত আশ্চর্য হয় ঐ ব্যক্তির উপর, যে এই ব্যাপারে ঈমান রাখে যে, আখেরাত চিরস্থায়ী, সবসময় থাকিবে—তারপরও সে এই ধোকার ঘর দুনিয়ার জন্য চেষ্টা করে।

একবার ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি আবর্জনার স্তুপের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। যেখানে কিছু পুরাতন হাড়ি, পায়খানা এবং পুরাতন ছেঁড়া কাপড়ের টুকরা ইত্যাদি পড়িয়াছিল। ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে দাঁড়াইয়া গেলেন এবং এরশাদ করিলেন, আস, তোমরা দেখ—এই হইল, দুনিয়ার পরিণতি এবং উহার সমস্ত জ্বাকজ্বমক।

অন্য এক হাদীসে এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনার বিস্তারিত আলোচনাও আসিয়াছে; কিন্তু আল্লামা ইরাকী (রহঃ) ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ বলেন যে, উক্ত রেওয়াজটি কোথায় আছে, তাহা আমরা পাই নাই। তবুও ইমাম গায়যালী (রহঃ) উহা বর্ণনা করিয়াছেন এবং 'কূত' কিতাবের লেখক উহাকে হাসান বসরী (রহঃ) হইতে মুরসাল হাদীস হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা এই যে, হযরত আবু ছরায়রা (রাযিঃ) বলেন, একবার আমাকে ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি কি তোমাকে দুনিয়ার প্রকৃত অবস্থা দেখাইব? আমি আরজ করিলাম, অবশ্যই। ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সঙ্গে লইয়া

মদীনা মুনাওয়ারার বাহিরে একটি আবর্জনা নিক্ষেপের স্থানে তশরীফ লইয়া গেলেন। যেখানে মানুষের মাথার খুলি, পায়খানা, পুরানা ছেঁড়া কাপড়ের টুকরা এবং হাড়ি ইত্যাদি পড়িয়াছিল। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, হে আবু হুরায়রা! এইগুলি মানুষের মাথার খুলি, এই মাথাগুলি এমনভাবে দুনিয়ার প্রতি লোভ-লালসা করিত, যেমন তোমরা জীবিতরা আজকাল করিতেছ। ইহারাও এইরূপভাবেই আশা-আকাঙ্ক্ষা করিত, যেমন তোমরা আশা-আকাঙ্ক্ষায় লাগিয়া আছ। আজকে এইগুলি চামড়া ছাড়াই পড়িয়া রহিয়াছে। আর কিছুদিন চলিয়া যাওয়ার পর মাটি হইয়া যাইবে। এই পায়খানাগুলি সেই খাবার, যাহা অত্যন্ত মেহনত করিয়া কামাই করিয়াছে, উপার্জন করিয়াছে। অতঃপর সেইগুলিকে প্রস্তুত করিয়াছে এবং খাইয়াছে। এখন তাহা এইভাবে পড়িয়া রহিয়াছে যে, মানুষ উহা হইতে (ঘৃণা করিয়া) সরিয়া যায় (ঐ সুস্বাদু খাবার যাহার খুশবু দূর হইতে মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করিত, আজ উহার শেষ পরিণতি এই যে, উহার দুর্গন্ধ দূর হইতে মানুষের মনে ঘৃণা সৃষ্টি করিতেছে)। এই ছেঁড়া কাপড়ের টুকরাগুলি ঐ সমস্ত সাজ-সজ্জার পোশাক (ছিল যাহা পরিধান করিয়া মানুষ দস্তভরে চলিত, আজ উহার অবস্থা এই) যে, বাতাস উহাকে এদিক সেদিক উড়াইয়া ফেলিতেছে। এই হাড়িসমূহ এসব জানোয়ারের হাড়ি, যাহার উপর লোকেরা আরোহণ করিত (ঘোড়ার উপর বসিয়া অহংকার করিত) এবং দুনিয়াতে ভ্রমণ করিত। অতএব, যে ব্যক্তি এই সমস্ত অবস্থার উপর (এবং উহাদের শিক্ষণীয় পরিণতির উপর) কাঁদিতে চায়, সে যেন এইগুলিকে দেখিয়া কাঁদে। হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন, আমরা সকলেই অনেক কাঁদিলাম।

অন্য এক হাদীসে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দুনিয়া (বাহ্যিক দৃষ্টিতে) মিষ্ট ও সবুজ-শ্যামল। আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে এই দুনিয়াতে তোমাদের পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত এইজন্য বানাইয়াছেন যে, তিনি দেখিবেন—তোমরা দুনিয়াতে কি আমল কর। বনী ইসরাইলের উপর যখন দুনিয়ার প্রাচুর্য আসিতে লাগিল, তখন তাহারা উহার চাকচিক্য, নারী এবং অলংকারের চক্রে পড়িয়া গেল।

হযরত ঈসা (আঃ) বলিয়াছেন, দুনিয়াকে নিজের সর্দার বানাইও না; সে তোমাদিগকে নিজের গোলাম বানাইয়া ফেলিবে। নিজের সম্পদ এমন পবিত্র সত্তার নিকট সংরক্ষিত রাখ—যেখানে ধ্বংস হইবার আশংকা নাই। দুনিয়ার খাজানাসমূহের মধ্যে সর্বদা ধ্বংসের আশংকা রহিয়াছে, আর

আল্লাহ তায়ালার খাজানায় কোন আপদ নাই।

হযরত ঈসা (আঃ) বলিয়াছেন, দুনিয়ার অপবিত্রতার আলামতসমূহের মধ্যে ইহাও একটি যে, ইহাতে আল্লাহ তায়ালার নাফরমানী করা হয়। উহার অপবিত্রতার আলামতসমূহের মধ্যে ইহাও একটি যে, ইহাকে ছাড়িয়া দেওয়া ব্যতীত আখেরাত পাওয়া যায় না। এই কথা ভাল করিয়া বুঝিয় লও যে, দুনিয়ার মহব্বত সমস্ত গুনাহের মূল এবং সামান্য সময়ের খাহেশ অনেক দীর্ঘ সময়ের দুঃখ-কষ্ট ও শাস্তির কারণ হইয়া যায়।

তিনি আরও এরশাদ করিয়াছেন, দুনিয়া নিজেই অনেককে তালাশ করে, আবার অনেকেই উহাকে তালাশ করিয়া ফিরে। যাহারা আখেরাতকে তালাশ করে তাহাদিগকে তো দুনিয়া নিজেই তালাশ করে ; নিজেই আগে বাড়িয়া তাহাদের রুজি তাহাদিগকে পৌছাইয়া দেয়। আর যাহারা দুনিয়ার তালাশে লাগিয়া যায়, আখেরাত তাহাদিগকে তালাশ করে না ; অবশেষে মৃত্যু আসিয়া তাহাদের ঘাড় চাপিয়া ধরে।

হযরত সুলাইমান (আঃ) একবার নিজের সৈন্য সহকারে যাইতেছিলেন। পাখিরা তাহার উপর ছায়া করিয়াছিল। জিন ও মানুষ ডানে বামে ছিল। একজন আবেদ ব্যক্তির নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন। সেই আবেদ আরজ করিল, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে অনেক বড় বাদশাহী দান করিয়া রাখিয়াছেন (ফলে জিন, মানুষ, পশুপাখী সবকিছুর উপর আপনার রাজত্ব রহিয়াছে)। হযরত সুলাইমান (আঃ) বলিলেন, মুসলমানের আমলনামায় একবার 'সুবহানাল্লাহ' সুলাইমানের সমস্ত রাজত্ব হইতে উত্তম। কারণ, এই সমস্ত বাদশাহী ও রাজত্ব অতিসত্ত্বর শেষ হইয়া যাইবে, আর সুবহানাল্লাহর সওয়াব সব সময় বাকী থাকিবে।

হযরত সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তির একমাত্র উদ্দেশ্য দুনিয়া হইয়া যায়, আল্লাহ তায়ালার সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। আর আল্লাহ তায়ালা তাহাকে চারটি জিনিসের মধ্যে লিপ্ত করিয়া দেন। ১—এমন দুশ্চিন্তা যাহা কখনও শেষ হইবে না (সবসময় আমদানী বাড়াইবার ফিকিরে লাগিয়া থাকিবে)। ২—এমন ব্যস্ততা যাহার কারণে কখনও অবসর হইবে না। ৩—এমন দরিদ্রতা যাহা কখনও দূর হইবে না। (যত আমদানী বাড়িতে থাকিবে, ততই খরচ বাড়িয়া আমদানী কম মনে হইবে)। ৪—এমন দীর্ঘ আশা যাহা কখনও পূর্ণ হইবে না।

হযরত ইবরাহীম (আঃ)এর সহীফার মধ্যে আছে, হে দুনিয়া ! তুই কতই না অপদস্থ ঐ সমস্ত নেক বান্দাদের দৃষ্টিতে, যাহাদের জন্য তুই নিজেকে সজ্জিত করিস। আমি তাহাদের দিলের মধ্যে তোর প্রতি শত্রুতা

ঢালিয়া দিয়াছি এবং তোর প্রতি তাহাদের মধ্যে বিমুখতা পয়দা করিয়া দিয়াছি। আমি তোর চেয়ে অধিক অপদস্থ কোন মাখলুক পয়দা করি নাই। তোর সমস্ত উন্নতি একেবারে নগণ্য এবং অচিরেই শেষ হইয়া যাইবে। আমি তোর জন্মের দিন তোর ব্যাপারে এই ফায়সালা করিয়া দিয়াছিলাম যে, না তুই সর্বদা কাহারও নিকট থাকিবি আর না তোর সাথে সর্বদা কেহ থাকিবে—চাই তোর মালিক তোকে লইয়া যতই কৃপণতা করুক না কেন। ঐ সমস্ত নেক বান্দারা বরকতময়, যাহারা অন্তর দ্বারা তকদীরের উপর তাহাদের সন্তুষ্ট থাকা আমাকে জানাইয়া দেয় এবং নিজেদের অন্তরের সততা ও মজবুতী আমাকে বলিয়া দেয়। তাহাদের জন্য সজীবতা রহিয়াছে। যখন তাহারা নিজেদের কবর হইতে উঠিয়া আমার নিকট আসিবে, আমার নিকট তাহাদের জন্য একটি নূর রহিয়াছে, যাহা ঐ সময় তাহাদের সামনে থাকিবে এবং ফেরেশতাগণ ডানে বামে থাকিবে। অবশেষে, আমি তাহাদের ঐ সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিয়া দিব, যাহা তাহারা আমার প্রতি রাখিয়াছিল।

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কিছু লোক কিয়ামতের দিন এত বেশী আমল লইয়া আসিবে, যেমন আরব দেশের পাহাড়সমূহ। কিন্তু তাহাদিগকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। কেহ প্রশ্ন করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই সমস্ত লোক কি নামাযী হইবে? হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, নামাযীও হইবে, রোযাদারও হইবে, এমনকি তাহাজ্জুদ গুয়ারও হইবে। কিন্তু যখন দুনিয়ার কোন জিনিস (সম্পদ, সম্মান ইত্যাদি) তাহাদের সম্মুখে আসিয়া যায়, তখন মুহূর্তে উহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে। (জায়েয-নাজায়েযের কোন পরওয়া করে না।)

হযরত ঈসা (আঃ) বলিয়াছেন, দুনিয়া ও আখেরাতের মহব্বত এক অন্তরে জমা হইতে পারে না। যেমন আগুন ও পানি এক পাত্রে জমা হইতে পারে না।

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দুনিয়া হইতে বাঁচিতে থাক। ইহা হারুত ও মারুত হইতেও বড় যাদুকর। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার সাহাবায়ে কেরামের নিকট তশরীফ আনিলেন এবং এরশাদ করিলেন, তোমাদের মধ্যে কে এমন আছে, যে চায় আল্লাহ তায়ালা তাহার (অন্তরের) অকৃত্রকে দূর করিয়া দেন এবং তাহার (শিক্ষা গ্রহণ করার) চক্ষু খুলিয়া দেন। (যে ইহা চায় সে যেন মনোযোগ সহকারে শুনিয়া লয়,) যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি যত আগ্রহ

রাখে এবং যত বেশী লম্বা লম্বা আশা পোষণ করে, আল্লাহ তায়ালা সেই পরিমাণে তাহার অন্তরকে অন্ধ করিয়া দেন। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার ব্যাপারে অনাগ্রহ পোষণ করে, আর নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সংক্ষিপ্ত করে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে শিক্ষা ব্যতীত এলেম দান করেন, আর কাহারো পঞ্চপ্রদর্শন ছাড়াই রাস্তা বলিয়া দেন।

শীঘ্রই এমন লোক আসিবে যাহাদের রাজত্ব হত্যা ও জুলুমের দ্বারা কায়েম হইবে। কৃপণতা ও অহংকারের মাধ্যমে তাহারা বিত্তশালী হইবে। স্বাহেশের অনুসরণ দ্বারা মানুষের অন্তরে তাহাদের মহব্বত হইবে। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এইরূপ জমানা পাইবে এবং সেই সময় দরিদ্রতার উপর সবার করিবে ; অথচ সে ধনী হইতে পারে, সে মানুষের শত্রুতাকে সহ্য করিবে ; অথচ সে (তাহাদের স্বাহেশের অনুসরণ করিয়া) তাহাদের অন্তরে মহব্বত পয়দা করিতে পারে, সে অপমানের উপর তুষ্ট থাকে ; অথচ সে (মানুষের চাহিদা অনুযায়ী চলিয়া) ইজ্জত লাভ করিতে পারে, কিন্তু সেই ব্যক্তি এইসব জিনিসকে শুধু আল্লাহ তায়ালায় জন্য বরদাশত করে—তাহাকে পঞ্চাশ জন সিদ্দীকিনের সওয়াব দেওয়া হইবে।

একবার হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে বাহরাইনের অনেক মাল আসিল। (অভাবগ্রস্ত) আনসারী সাহাবায়ে কেরাম এই খবর শুনিয়া অনেক সংখ্যায় ফজরের নামাযে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের পর লোকজনের জমায়েত দেখিয়া মুচকি হাসিলেন এবং এই এরশাদ করিলেন, আমার মনে হয়, এই মালের খবর শুনিয়া তোমরা আসিয়াছ। তাহারা আরজ করিলেন, নিঃসন্দেহে ইয়া রাসূলুল্লাহ ! এইজন্যই হাজির হইয়াছি। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি তোমাদিগকে (প্রচুর সম্পদের) সুসংবাদ দিতেছি। অতি শীঘ্রই সম্পদ অনেক বৃদ্ধি পাইবে। আর যে জিনিসের দ্বারা তোমরা আনন্দিত হও (অর্থাৎ সম্পদ) তোমরা উহার আশা রাখ। কেননা, উহা তোমাদের নিকট অনেক বেশী আসিবে। আমি তোমাদের দরিদ্রতার জন্য ভয় করি না, কিন্তু আমার এই ভয় হয় যে, তোমাদের উপর দুনিয়া প্রসারিত হইয়া পড়ে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর উহা প্রসারিত হইয়াছিল। অতঃপর তোমরা উহাতে মন লাগাইয়া বস। ফলে, উহা তোমাদিগকে এমনভাবে ধ্বংস করিয়া দেয়, যেমনভাবে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে।

অন্য এক হাদীসে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ

করিয়াছেন, তোমাদের উপর আমার এই বিষয়ে বেশী ভয় হয় যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য জমিনের বরকতসমূহ বাহির করিয়া দেন। কেহ আরজ করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! জমিনের বরকতসমূহ কি জিনিস? হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, দুনিয়ার চাকচিক্য।

হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, যাহাকিছু আমার জানা আছে, যদি তাহা তোমাদের জানা হইয়া যায়, তবে তোমরা হাসি কমাইয়া দিবে এবং অধিক পরিমাণে কাঁদিতে আরম্ভ করিবে। আর দুনিয়া তোমাদের নিকট নিকট হইয়া যাইবে এবং আখেরাতকে উহার উপর প্রাধান্য দিতে আরম্ভ করিবে। অতঃপর আবু দারদা (রাযিঃ) নিজের পক্ষ হইতে বলিলেন, যাহাকিছু আমার জানা আছে, যদি তাহা তোমাদের জানা হইয়া যায়, তবে তোমরা কাঁদিতে কাঁদিতে এবং চিৎকার করিতে করিতে জঙ্গলের দিকে বাহির হইয়া যাইবে এবং নিজেদের ধন-সম্পদকে কোন পাহারাদার ছাড়াই ছাড়িয়া যাইবে। কিন্তু তোমাদের অন্তর হইতে আখেরাতের স্মরণ গায়েব হইয়া গিয়াছে এবং দুনিয়ার আশা-আকাঙ্ক্ষা তোমাদের সামনে রহিয়াছে। অতএব, দুনিয়া তোমাদের আমলসমূহের মালিক হইয়া যাইতেছে এবং তোমরা এমন হইয়া গিয়াছ; যেন কিছুই জান না। ফলে, তোমাদের অনেকেই ঐ সকল পশুর চাইতেও নিকট হইয়া গিয়াছে, যাহারা পরিণতির ভয়ে নিজেদের খাহেশকে ছাড়ে না। তোমাদের কি হইয়া গেল যে, তোমরা পরস্পর একে অপরকে মহব্বত কর না। একজন অপরজনকে নসীহত কর না। অথচ তোমরা পরস্পর দ্বীনী ভাই। একমাত্র তোমাদের ভিতরগত খারাবী তোমাদের মনের খাহেশাতের মধ্যে পার্থক্য করিয়া রাখিয়াছে। যদি তোমরা সকলেই দ্বীনের উপর এবং দ্বীনের কাজসমূহের উপর একত্র হইয়া যাও, তবে তোমাদের পরস্পর সম্পর্কও বাড়িয়া যাইবে। তোমাদের কি হইয়া গেল যে, দুনিয়ার কাজে তো একজন অপরজনকে নসীহত করিয়া থাক; কিন্তু আখেরাতের কাজে একজন অপরজনকে নসীহত কর না। তোমরা যাহাকে মহব্বত কর, তাহাকে আখেরাতের বিষয়ে নসীহত করিবার ক্ষমতা তোমাদের নাই; আখেরাতের বিষয়ে তাহাকে তোমরা নসীহত করিতে পার না। ইহা শুধু এই কারণে যে, তোমাদের অন্তরে ঈমানের দুর্বলতা রহিয়াছে। যদি তোমরা আখেরাতের ভাল ও মন্দের উপর এমন একীণ রাখিতে, যেমন দুনিয়ার ভাল ও মন্দের উপর একীণ রাখিয়া থাক, তবে অবশ্যই আখেরাতকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দিতে। কেননা, তোমাদের কাজের ব্যাপারে আখেরাত দুনিয়া

অপেক্ষা বেশী অধিকার রাখে। যদি তোমরা বল যে, দুনিয়ার প্রয়োজন তো তাৎক্ষণিক, এই মুহূর্তে সামনে আসিয়া রহিয়াছে, আখেরাতের প্রয়োজন পরে হইবে, তবে তোমরা নিজেরাই চিন্তা কর যে, দুনিয়াতে যে সমস্ত কাজ পরে আসিবে এবং পরে লাভ হইবে, ঐ সমস্ত কাজের জন্য তোমরা কি পরিমাণ কষ্ট উঠাইয়া থাক (চাষাবাদে কষ্ট সহ্য কর ; অথচ উহার ফসল পরে উৎপাদন হইবে, বাগান লাগানোর মধ্যে কত কষ্ট কর ; অথচ কয়েক বৎসর পর ফল আসিবে ইত্যাদি ইত্যাদি।) তোমরা কি পরিমাণ খারাপ লোক যে, নিজদের ঈমানের যাচাই ঐ সমস্ত জিনিসের দ্বারা কর না, যাহাতে তোমাদের ঈমানের পরিমাণ তোমাদেরই জানা হইয়া যায় যে, তোমাদের মধ্যে কোন্ স্তরের ঈমান বিদ্যমান রহিয়াছে। যদি তোমাদের এই বিষয়ে সন্দেহ থাকে যাহা ছয়ূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লইয়া আসিয়াছেন, তবে আস, আমাদের নিকট আস, আমরা তোমাদেরকে স্পষ্টরূপে বলিয়া দেই এবং ঐ নূর দেখাইয়া দেই, যাহা দ্বারা তোমরা নিশ্চিত হইয়া যাইবে যে, ছয়ূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য। তোমরা কম বুদ্ধিমান বা নির্বোধ নও যে, আমরা তোমাদিগকে অক্ষম বা অপারগ মনে করিব। দুনিয়ার কাজে তো তোমরা বড় ভাল বুদ্ধি রাখ এবং উহাতে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত কাজ কর। (কিন্তু কি মুসীবত যে, আখেরাতের কাজে তোমরা না বুদ্ধিমত্তার সহিত কাজ কর, আর না সতর্কতার উপর আমল কর।) ইহা কেমন কথা! তোমাদের কি হইয়া গেল যে, দুনিয়ার সামান্য লাভে তোমরা আনন্দিত হও, সামান্য ক্ষতিতে দুঃখিত হইয়া যাও। যাহার প্রভাব তোমাদের চেহারায় পর্যন্ত ফুটিয়া উঠে। (অর্থাৎ আনন্দে ফুলিয়া যায়। সামান্য দুঃখে চেহারা বিষন্ন হইয়া যায়।) মুসীবতের কথা মুখের উপর আসিতে আরম্ভ করে, সামান্য বিষয়কে মুসীবত বলিতে আরম্ভ কর। শোক-মাতমের মজলিস কায়েম কর। কিন্তু দ্বীনের বড় হইতে বড় বিষয়ও ছুটিয়া গেলে, না উহার জন্য দুঃখ ও চিন্তা হয়, না চেহারায় কোন পরিবর্তন আসে। আমি তোমাদের বদ-দ্বীনের অবস্থা দেখিয়া এই ধারণা করি যে, আল্লাহ তায়ালাই তোমাদের উপর নারাজ হইয়া গিয়াছেন। তোমরা পরস্পর একজন অন্যজনের সহিত আনন্দে মিলিত হও এবং তোমাদের প্রত্যেকেই চায় যে, সে অন্যের সম্মুখে এইরূপ কোন (হক) কথা না বলে, যাহা তাহার নিকট অপছন্দনীয় হয়। যাহাতে সেও তাহার সম্পর্কে কোন অপছন্দনীয় কথা না বলিয়া বসে। সুতরাং এই সকল কথা অন্তরের ভিতরে পোষণ করিয়াই একে অপরের সহিত কালাতিপাত

করিতেছ, ভিতরগত পঙ্কিলতার উপর তোমাদের বাহিরের বাগান পরিস্ফুটিত হইতেছে এবং মৃত্যুর স্মরণকে ছাড়িয়া দেওয়ার উপর সকলেই একমত হইয়া গিয়াছে। হায়! যদি আল্লাহ তায়ালা আমাকে মৃত্যু দিয়া তোমাদের হইতে আমাকে আরাম দিতেন এবং আমাকে সেই সমস্ত হযরতগণ (অর্থাৎ ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কেরাম)এর সহিত মিলাইয়া দিতেন, তবে কতই না ভাল হইত। যাহাদেরকে দেখিবার জন্য আমি উদগ্রীব হইয়া রহিয়াছি। যদি ঐ সমস্ত হযরতগণ জীবিত থাকিতেন, তবে তোমাদের সহিত থাকা মোটেও পছন্দ করিতেন না। অতএব, যদি তোমাদের মধ্যে মঙ্গলের সামান্যতম অংশ বাকী থাকে, তবে আমি তোমাদিগকে পরিষ্কার বলিয়া দিয়াছি এবং হক কথা শুনাইয়া দিয়াছি। যদি তোমরা ঐ বিষয়কে (অর্থাৎ আখেরাতকে) যাহা আল্লাহ তায়ালা নিকট রহিয়াছে তালাশ করিতে চাও, তবে উহা অনেক সহজ। আর আমি তোমাদের ব্যাপারেও এবং আমার ব্যাপারেও শুধু আল্লাহ তায়ালা নিকটেই সাহায্য চাহিতেছি। (হযরত আবু দারদা (রাযিঃ)এর নসীহত এখানে শেষ হইল।)

হযরত আবু দারদা (রাযিঃ)এর এই ধমক অত্যন্ত গভীর চিন্তা করিয়া পড়ার বিষয়। তিনি ঐ সমস্ত হযরতগণের উপর রাগান্বিত হইতেছেন, যাহাদের সম্পর্কে আমাদের ধারণা এই যে, তাহাদের মত দীনদার আমরা কখনও হইতে পারিব না। তাহাদের অবস্থা ও কৃতিত্বসমূহ আমাদের সামনে রহিয়াছে। অতএব, যদি হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) আমাদিগকে দেখিতেন, তবে নিশ্চয়ই ক্ষোভে, দুঃখে মারা যাইতেন। নিশ্চয় তাহারা আমাদের অবস্থা দেখিতেও পারিতেন না এবং কোনভাবেই তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালা ঐ সমস্ত লোকের উপর রহম করুন, যাহাদের নিকট দুনিয়া আমানতস্বরূপ ছিল। তাহারা এই আমানতকে অন্যদের নিকট ছাড়িয়া গিয়াছেন এবং নিজেরা নিশ্চিন্ত মনে চলিয়া গিয়াছেন।

তিনি আরও বলেন, যে ব্যক্তি দ্বীনের ব্যাপারে তোমার সহিত ঝগড়া করে, তুমি তাহার সহিত ঝগড়া কর। আর যে দুনিয়ার ব্যাপারে তোমার সহিত ঝগড়া করে, এই দুনিয়া তাহার মুখের উপর মারিয়া দাও এবং চিন্তামুক্ত হইয়া যাও।

হযরত আবু হাযেম (রহঃ) বলেন, দুনিয়া হইতে বাঁচিতে থাক। কেয়ামতের দিন মানুষকে হাশরের ময়দানে দাঁড় করাইয়া বলা হইবে, এই

সেই ব্যক্তি, যে এমন জিনিসকে বড় মনে করিয়াছে, যাহাকে আল্লাহ তায়ালা তুচ্ছ বলিয়াছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ঘরে কয়েক দিনের মেহমান এবং তাহার মাল-সামান ধার করা জিনিস। মেহমানকে অবশ্যই কিছুদিনের মধ্যে নিজের বাড়ী (অর্থাৎ আখেরাতে) চলিয়া যাইতে হইবে এবং ধার করা জিনিসও অবশ্যই ফেরত চলিয়া যাইবে।

হযরত রাবেয়া বসরিয়া (রহঃ) এক মজলিসে বসিয়াছিলেন। লোকেরা দুনিয়ার কিছু নিন্দা করিতেছিল। তিনি বলিতে লাগিলেন, দুনিয়ার নিন্দার আলোচনাও করিও না। উহার আলোচনার দ্বারা বুঝা যায় যে, তোমাদের অন্তরে উহার গুরুত্ব রহিয়াছে। যদি এমন না হইত, তবে বারবার উহার আলোচনাও মুখে আসিত না। (পায়খানার নাপাকী ও খারাবী সম্পর্কে বারবার কে আলোচনা করে।)

হযরত লুকমান (আঃ) পুত্রকে উপদেশ দিয়াছেন, তুমি তোমার দুনিয়াকে দ্বীনের বদলায় বিক্রয় করিয়া দাও, উভয় জাহানে লাভবান হইবে। আর দ্বীনকে দুনিয়ার বদলায় বিক্রি করিও না ; উভয় জাহানে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

হযরত মুতাররিফ ইবনে শিখখীর (রহঃ) বলেন, বাদশাদের আরাম-আয়েশ এবং তাহাদের উত্তম লেবাস-পোশাকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিও না। বরং ইহা চিন্তা কর যে, তাহাদের শেষ পরিণতি কি হইবে।

হযরত আবু উমামা (রাযিঃ) বলেন, যখন হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হইলেন, তখন শয়তান নিজের সৈন্য-সামন্তকে অবস্থা অনুসন্ধান করিবার জন্য পাঠাইল। তাহারা আসিয়া বলিল, একজন নবী প্রেরিত হইয়াছেন এবং তাহার অনেক বড় উম্মত রহিয়াছে। শয়তান জিজ্ঞাসা করিল, তাহাদের মধ্যে দুনিয়ার প্রতি মহব্বত আছে কি না? তাহারা বলিল, হাঁ হাঁ, আছে। শয়তান বলিল, তবে তো তাহারা মূর্তিপূজা না করিলেও আমার কোন দুঃখ নাই। আমি তিনটি জিনিস তাহাদের উপর প্রবল করিয়া দিব। এক—অবৈধ পন্থায় কামাই করা। দুই—অবৈধ পন্থায় খরচ করা। তিন—প্রকৃত স্থানে খরচ না করা।

হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, দুনিয়ার হালাল মালের হিসাব হইবে, আর উহার হারাম মালের মধ্যে শাস্তি রহিয়াছে।

হযরত মালেক ইবনে দীনার (রহঃ) বলেন, এই জাদুকর (দুনিয়া) হইতে বাঁচিয়া চল, ইহা আলেমগণের দিলের মধ্যেও জাদু করিয়া ফেলে।

হযরত আবু সুলাইমান দারানী (রহঃ) বলেন, যে দিলে আখেরাত থাকে, দুনিয়া উহার সহিত ঝগড়া করিতে থাকে এবং ঐ দিলের উপর কব্জা করিতে চেষ্টা করিতে থাকে। আর যে দিলে দুনিয়া থাকে, আখেরাত উহার সহিত ঝগড়া করে না। কারণ, আখেরাত হইল ভদ্র ; সে অন্যের ঘর দখল করিতে চাহে না। আর দুনিয়া হইল অভদ্র ; সে প্রত্যেকের ঘর জোরপূর্বক দখল করিতে চায়।

মালেক ইবনে দীনার (রহঃ) বলেন, তুমি যত বেশী দুনিয়ার চিন্তা করিবে, ততই আখেরাতের চিন্তা তোমার অন্তর হইতে বাহির হইয়া যাইবে। আর যত বেশী আখেরাতের চিন্তা করিবে, ততই দুনিয়ার চিন্তা তোমার অন্তর হইতে বাহির হইয়া যাইবে।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, আমি এমন লোকদেরকে পাইয়াছি, যাহাদের নিকট দুনিয়া ঐ মাটি হইতেও অধিক নিকট ছিল, যাহার উপর তোমরা চলিতেছ। তাহাদের এই পরওয়া ছিল না যে, দুনিয়া আছে, না চলিয়া গিয়াছে। অমুকের কাছে গিয়াছে, না তমুকের কাছে গিয়াছে।

এক ব্যক্তি হযরত হাসান বসরী (রহঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলেন, যাহাকে আল্লাহ তায়ালা ধন-সম্পদ দিয়াছেন—সে উহা হইতে দান খয়রাতও করে, আত্মীয়তার হকও আদায় করে—তাহার জন্য কি ইহা সমীচীন হইবে যে, নিজের ও ভাল ভাল খানা যাইবে এবং প্রাচুর্যের মধ্যে জীবন যাপন করিবে? তিনি উত্তরে বলিলেন না, যদি সমগ্র দুনিয়াও তাহার লাভ হইয়া যায়, তবু তাহার নিজের উপর প্রয়োজন পরিমাণ খরচ করা চাই। উহার অতিরিক্ত অংশ ঐ দিন (অর্থাৎ আখেরাতের দিন)এর জন্য পাঠাইয়া দেওয়া চাই, যেদিন তাহার অত্যন্ত কঠিন প্রয়োজনের দিন আসিবে।

হযরত ফুজাইল (রহঃ) বলেন, যদি আমি সমগ্র দুনিয়া পাইয়া যাই এবং আমার নিকট হইতে হিসাবও লওয়া না হয়, তবুও আমি উহাকে এমন ঘৃণা ও অপছন্দ করিব—যেমন তোমরা মৃত জন্তকে করিয়া থাক ; যেন উহা কাপড়ে লাগিয়া না যায়।

হযরত হাসান (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালা বন্দেগী করা সত্ত্বেও শুধু দুনিয়ার মহব্বত বনী ইসরাইলকে মূর্তিপূজা পর্যন্ত পৌছাইয়া দিয়াছিল। তিনি আরও বলেন যে, মানুষ নিজের সম্পদকে তো সর্বদা কম মনে করে ; কিন্তু নিজের আমলকে কখনও কম মনে করে না। দ্বীনের উপর কোন মুসীবত আসিয়া গেলে তো রাজী থাকে ; কিন্তু দুনিয়ার বিষয়ে

কোন মুসীবত আসিলে ঘাবড়াইয়া যায়।

হযরত ফুজাইল (রহঃ) বলেন, দুনিয়ার ভিতরে প্রবেশ করা তো খুবই সহজ ; কিন্তু উহা হইতে বাহির হইয়া আসা খুবই কঠিন।

এক বুয়ুর্গ বলেন, আশ্চর্য ঐ ব্যক্তির উপর, যে মৃত্যুকে বিশ্বাস করে যে, উহা অবশ্যই আসিবে ; জানা নাই কবে আসিয়া যায়, তা সত্ত্বেও সে কোন বিষয়ে কিভাবে আনন্দিত হয় ! আশ্চর্য ঐ ব্যক্তির উপর, যাহার এই বিষয়ে একীন রহিয়াছে যে, জাহান্নাম সত্য (এবং নিজের কি অবস্থা হইবে জানা নাই), তবুও কিভাবে সে কোন বিষয়ে হাসি-তামাশা করে ! আশ্চর্য ঐ ব্যক্তির উপর, যে দুনিয়ার সর্বকালীন উত্থান-পতন দেখিতেছে, তবুও কিভাবে সে দুনিয়ার কোন বিষয়ের উপর নিশ্চিত হয় ! আশ্চর্য ঐ ব্যক্তির উপর, যাহার একীন আছে যে, তকদীর সত্য (যাহা তকদীরে আছে, উহা অবশ্যই পাওয়া যাইবে), তবু কেন কষ্ট সহ্য করে !

হযরত আমীরে মুআবিয়া (রাযিঃ)এর নিকট নাজরান শহরের একজন বুয়ুর্গ আসিলেন। যাহার বয়স দুইশত বৎসর ছিল। মুআবিয়া (রাযিঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দুনিয়াকে আপনি অনেক দেখিয়াছেন, কেমন পাইলেন ? তিনি বলিলেন, কিছুকাল আরামের, কিছুকাল কষ্টের। প্রত্যেক দিন ও রাত্রে কেহ না কেহ জন্মগ্রহণ করিতেছে, কেহ না কেহ মারা যাইতেছে। যদি জন্মগ্রহণ বন্ধ হইয়া যায়, তবে দুনিয়া একদিন খতম হইয়া যাইবে (কেননা মৃত্যু জারি রহিয়াছে)। যদি মারা যাওয়া বন্ধ হইয়া যায়, তবে দুনিয়ায় থাকিবার জায়গা পাওয়া যাইবে না। (এইজন্য মধ্যম পন্থা হইল, জন্মও হইতে থাকিবে, মৃত্যুও চলিতে থাকিবে)

হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) বলিলেন, আমার নিকট কোন জিনিস চাহিবার অথবা আমার উপযুক্ত কোন খেদমত থাকিলে বলুন, আমি উহা পূরণ করিয়া দিব। তিনি বলিতে লাগিলেন, যে জীবন আমার শেষ হইয়া গিয়াছে, উহা যেন ফিরিয়া পাই, অথবা ভবিষ্যতে যেন মৃত্যু না আসে। হযরত আমীরে মুআবিয়া (রাযিঃ) বলিলেন, ইহা তো আমি করিতে পারিব না। বুয়ুর্গ বলিতে লাগিলেন, তবে আপনার নিকট আমার চাওয়ার কিছুই নাই।

আবু সুলাইমান (রহঃ) বলেন, দুনিয়ার খাহেশাতের ব্যাপারে ঐ ব্যক্তিই ছবর করিতে পারে, যাহার অন্তর আখেরাতের বিষয়সমূহ লইয়া ব্যস্ত থাকে।

মালেক ইবনে দীনার (রহঃ) বলেন, আমরা সকলেই দুনিয়ার সহিত মহব্বত করার ব্যাপারে সন্ধি করিয়া লইয়াছি। যে কারণে কোন ব্যক্তি

কাহাকেও ভাল কাজের চুকুম করে না, খারাপ কাজ হইতে বিরত রাখে না। আল্লাহ তায়ালা এই অবস্থার উপর কি আমাদেরকে সবসময় ছাড়িয়া রাখিবেন? ইহা কখনও হইতে পারে না। জানা নাই—কখন কি আজ্ঞাব আমাদের উপর নাজিল হইয়া যায়।

হযরত হাসান (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালা যে বান্দার সহিত মঙ্গলের ইচ্ছা করেন, তাহাকে সামান্য দুনিয়া দান করিয়া বন্ধ করিয়া দেন। যখন ঐ সম্পদ তাহার নিকট শেষ হইয়া যায়, তখন পুনরায় আরো কিছু পরিমাণ দেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার নিকট নিকৃষ্ট হয়, তাহার জন্য দুনিয়াকে প্রসারিত করিয়া দেন।

এক বুযুর্গ একরূপ দোয়া করিতেন, হে পবিত্র ঐ সত্তা, যিনি আসমানকে জমিনের উপর পড়িতে বাধা দানের ক্ষমতা রাখেন—দুনিয়াকে আমার নিকট আসিতে বাধা দিন।

মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির (রহঃ) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি সবসময় রোযা রাখে ; কখনও ইফতার করে না, রাতভর তাহাজ্জুদ পড়ে ; একবারেই ঘুমায় না, নিজের ধন-সম্পদ খুব দান-খয়রাত করে, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে এবং গুনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকে, এতদসত্ত্বেও কিয়ামতের দিন তাহাকে দাঁড় করাইয়া এই কথা জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, তোমার দৃষ্টিতে কি ঐ জিনিস মর্যাদাপূর্ণ ছিল, যাহাকে আল্লাহ তায়ালা তুচ্ছ বলিয়াছেন (অর্থাৎ দুনিয়া) এবং ঐ জিনিস কি তোমার দৃষ্টিতে মর্যাদাহীন ছিল, যাহাকে আল্লাহ তায়ালা মর্যাদাপূর্ণ বলিয়াছেন (অর্থাৎ আখেরাত)? তোমরাই বল ঐ ব্যক্তির অবস্থা কি হইবে। তারপর আমাদের কি অবস্থা হইবে, যাহারা এই রোগে অর্থাৎ দুনিয়াকে মর্যাদাদানে লিপ্ত রহিয়াছি আর সঙ্গে সঙ্গে গুনাহের মধ্যেও লিপ্ত রহিয়াছি।

আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) বলেন, দুনিয়ার মহব্বত এবং গুনাহসমূহ অন্তরকে অবাধ্য বানাইয়া রাখিয়াছে। এইজন্য ভাল কথা অন্তর পর্যন্ত পৌছে না, অর্থাৎ আছর করে না।

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বহ (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি দুনিয়ার কোন জিনিস দ্বারা আনন্দিত হয়, সে জ্ঞানবিরোধী কাজ করে। আর যে ব্যক্তি খাহেশকে নিজের পায়ের নিচে চাপিয়া ধরে যে, উহাকে মাথাও উঠাইতে দেয় না—শয়তান এইরূপ ব্যক্তির ছায়াকেও ভয় করে।

হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) তাহার এক দ্বীনী ভাইকে নসীহত করিলেন যে, দুনিয়া এমন কাদা, যাহার মধ্যে পা পিছলাইয়া যায়। (কাজেই সাবধনতার সহিত কদম রাখা চাই এবং পা পিছলাইয়া যাওয়ার

ব্যাপারে সবসময় সতর্ক থাকা চাই।) দুনিয়া অপমানের ঘর। দুনিয়া আবাদের শেষ হইল ধ্বংস। এখানে বসবাসকারীদেরকে একা কবরে যাইতে হইবে। উহার একত্রিত হওয়া আলাদা হওয়ার জন্য। উহার সচ্ছলতাকে অভাব-অনটনের দিকে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। উহার প্রাচুর্যের অর্থ কষ্টে লিপ্ত হওয়া। উহার অসুবিধার অর্থ সুবিধায় উপনীত হওয়া। সুতরাং পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর দিকে মনোযোগী থাক। আর আল্লাহ তায়ালা যে পরিমাণ রিযিক দিয়াছেন, উহার উপর রাজি থাক। নিজের আখেরাত হইতে দুনিয়ার জন্য করজ লইও না। (অর্থাৎ এমন বিষয় অবলম্বন করিও না, যাহার বদলা আখেরাতে আদায় করিতে হয় এবং সেখানে প্রয়োজনের সময় অভাব দেখা দেয়।) কারণ, এখানকার জিন্দেগী একটি ছায়ার সমতুল্য, যাহা অতি শীঘ্র শেষ হইয়া যাইবে। একটি দেওয়ালের মত, যাহা ঝুকিয়া গিয়াছে; শীঘ্রই পড়িয়া যাইবে। সুতরাং নেক আমল বেশী বেশী করিতে থাক এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা খুব কম কর।

হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহঃ) এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাকে যদি স্বপ্নের মধ্যে কেহ একটি দেরহাম (সাড়ে তিন আনা) দেয়, তুমি উহা বেশী পছন্দ করিবে, না জাগ্রত অবস্থায় কেহ তোমাকে একটি দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) দান করিলে বেশী পছন্দ করিবে? সে আরজ করিল (ইহা তো স্পষ্ট কথা) যে, জাগ্রত অবস্থায় প্রাপ্ত দিনারকে বেশী পছন্দ করিব। হযরত ইবরাহীম (রহঃ) বলিলেন, তুমি মিথ্যা বলিতেছ। কারণ, যে জিনিসকে তুমি দুনিয়াতে পছন্দ করিতেছ, উহাকে যেন তুমি স্বপ্নে পছন্দ করিতেছ। আর আখেরাতের যে জিনিসকে তুমি অপছন্দ করিতেছ, তুমি যেন জাগ্রত অবস্থায় উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া রাখিতেছ।

ইয়াহইয়া ইবনে মুআয (রহঃ) বলেন, তিন ব্যক্তি বুদ্ধিমান। এক—ঐ ব্যক্তি, যাহাকে দুনিয়া ছাড়িবার আগে সে নিজে দুনিয়াকে ছাড়িয়া দেয়। দুই—যে ব্যক্তি কবরে প্রবেশ করিবার আগেই কবরের তৈরী করিয়া লয়। তৃতীয়—ঐ ব্যক্তি, যে তাহার মনিবের সহিত সাক্ষাতের পূর্বেই তাহাকে রাজি করিয়া লয়। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, দুনিয়ার বদ-বখতি এই পরিমাণ যে, উহার আশা আকাঙ্ক্ষা তোমাকে আল্লাহ তায়ালায় আনুগত্য হইতে ফিরাইয়া নিজের মধ্যে মশগুল করিয়া দেয়। যখন উহার আশা-আকাঙ্ক্ষার এই পরিণতি—তখন তুমি যদি দুনিয়াতে জড়িত হইয়া যাও, তবে তোমার কি অবস্থা হইবে।

বকর ইবনে আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি দুনিয়া অর্জন করিয়া

উহা হইতে চিন্তামুক্ত হইতে চায়, সে এমন, যেমন কোন ব্যক্তি আগুন নিভাইবার জন্য উহার উপর শুকনা ঘাস নিক্ষেপ করে।

বুন্দার (রহঃ) বলেন, দুনিয়াদার ব্যক্তি যখন দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তির কথাবার্তা বলে, তখন বুঝিয়া লও যে, শয়তান তাহার সহিত ঠাট্টা করিতেছে।

এক বুয়ুর্গ বলেন, হে লোকেরা! অবসরের এই দিনগুলিতে নেক আমল করিয়া লও এবং আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করিতে থাক—আর দীর্ঘ আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মৃত্যুকে ভুলিয়া ধোকার মধ্যে পড়িও না। দুনিয়ার প্রতি সামান্য পরিমাণও কুঁকিও না। এই হতভাগা দুনিয়া বড় ওয়াদা ভঙ্গকারী, বড় ধোকাবাজ। আপন ধোকাবাজীর দ্বারা তোমাদের জন্য সজ্জিত হয়, আর তাহার নিজের প্রতি আশা-আকাঙ্ক্ষা দিয়া তোমাদিগকে ফেতনায় ফেলিয়া দেয়। সে এমন নারী যে, তাহার স্বামীদের জন্য সে এরূপ সাজ-সজ্জা গ্রহণ করে যে, বিবাহের দিনের ন্যায় একেবারে নববধূ সাজিয়া যায়, তাহার উপর দৃষ্টি বসিয়া যায় এবং মন আকৃষ্ট হইয়া যায়। মানুষ তাহার প্রেমে পাগল হইয়া যায়। কিন্তু এই কমবখত দুনিয়া কত যে তাহার প্রেমিককে খুন করিয়াছে। আর যাহারা তাহার উপর ভরসা করিয়া বসিয়াছিল, এরূপ কত মানুষকে যে সে নিঃসঙ্গ ও অসহায় অবস্থায় ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। এই দুনিয়াকে প্রকৃত দৃষ্টিতে গভীরভাবে দেখ, ইহা এমন ঘর, যাহাতে ধ্বংসাত্মক জিনিস অনেক বেশী রহিয়াছে এবং স্বয়ং উহার সৃষ্টিকর্তা উহার দোষ বর্ণনা করিয়াছেন। (কোন চিকিৎসক কোন ঔষধ তৈয়ার করিয়া নিজে বলিল যে, ইহার মধ্যে বিষ রহিয়াছে, শুধু প্রয়োজনের সময় এক রত্তি পরিমাণ ব্যবহার করা যাইতে পারে। যদি কোন নির্বোধ লোক উহা হইতে এক তোলা, দুই তোলা পরিমাণ খাইয়া লয়, তবে নিঃসন্দেহে সে মরিবে। ঔষধ তৈয়ারকারী চিকিৎসকের বলিয়া দেওয়ার পর এইরূপ করা চরম পর্যায়ের বোকামী।) এই দুনিয়ার প্রতিটি নূতন জিনিস পুরানা হইয়া যাইবে। উহার রাজত্ব নিজেই ধ্বংস হইয়া যাইবে। উহার সম্মানী লোক অবশেষে অপদস্থ হইবে। উহার আধিকা পরিশেষে স্বল্পতায় পরিণত হয়। উহার বন্ধুত্ব ধ্বংস হইয়া যাইবে। উহার কল্যাণ শেষ হইয়া যাইবে। তোমাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা রহম করুন। তোমরা নিজেদের গাফলতির ব্যাপারে সতর্ক হও। এমন সময় আসিবার পূর্বেই নিদ্রা হইতে জাগ্রত হও, যখন ইহা রটিয়া যাইবে যে, অমুক ব্যক্তি অসুস্থ হইয়া গিয়াছে, নিরাশার অবস্থা, কোন ভাল হাকীম অথবা ডাক্তার ডাকিয়া আন। অতঃপর তোমার জন্য বারবার হাকীম, ডাক্তার ডাকিয়া

আনা হইবে এবং কেহই বাঁচিবার আশা দিবে না। অতঃপর বলাবলি শুরু হইল যে, সে তো ওসীয়াত শুরু করিয়া দিয়াছে। আর তাহার তো কথাও অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন তো আওয়াজও ভাল করিয়া বাহির হইতেছে না। এখন তো সে কাহাকেও চিনিতেছেও না। লম্বা লম্বা শ্বাসও লইতে আরম্ভ করিয়াছে। অস্থিরতাও বাড়িয়া গিয়াছে। চোখের পলকও ঝুকিয়া যাইতেছে। এইসময় তোমার নিকট আখেরাতের অবস্থাসমূহ অনুভব হইতে শুরু হইবে ; কিন্তু জিহ্বা জড়াইয়া গিয়াছে। এখন তো কোন কথা বলিতেও পারিতেছ না। ভাই-বন্ধু আত্মীয়স্বজন দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে। কখনও বেটা সম্মুখে আসিতেছে, কখনও ভাই সম্মুখে আসিতেছে, কখনও বিবি সম্মুখে আসিতেছে। কিন্তু জবান কিছুই বলিতে পারিতেছে না। ইতিমধ্যে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে রূহ বাহির হইতে আরম্ভ হয়। অবশেষে রূহ বাহির হইয়া আসমানে চলিয়া যায়। প্রিয়জন ও আত্মীয়-স্বজন তাড়াতাড়ি দাফনের প্রস্তুতি আরম্ভ করিয়া দেয়। সেবা-শুশ্রূষাকারীরা কাঁদিয়া কাটিয়া চূপ হইয়া যায়। শত্রুরা আনন্দ প্রকাশ করে। আত্মীয়-স্বজন মাল বন্টনের কাজে লাগিয়া যায়। আর মৃত ব্যক্তি নিজের আমলের মধ্যে ফাঁসিয়া যায়। (ইহাই হইল, দুনিয়াবী জিন্দেগীর হাকীকত।)

হাসান বসরী (রহঃ) আমীরুল মুমিনীন ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ)এর নিকট একটি চিঠি লিখিলেন। আল্লাহর প্রশংসা ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদের পর উহাতে লিখিলেন যে, দুনিয়া ছাড়িয়া যাইবার ঘর। ইহা থাকিবার ঘর নহে। হযরত আদম (আঃ)কে এখানে শাস্তি^১ হিসাবে পাঠান হইয়াছিল। কেননা, জান্নাতে তাহার দ্বারা একটি ভুল হইয়া গিয়াছিল। (অতএব, জেলখানা হিসাবে এখানে পাঠান হইয়াছিল) এইজন্য দুনিয়াকে ভয় করিতে থাকুন। ইহার পাথেয় হইল, ইহাকে পরিত্যাগ করা। এখানকার অভাবই এখানকার সচ্ছলতা। (অর্থাৎ এখানে ধনী ঐ ব্যক্তি যে বাহ্যতঃ ফকির হয়।) এই দুনিয়া সবসময় কাহাকেও না কাহাকেও ধ্বংস করিতে থাকে। যে ইহাকে সম্মান করে, সে তাহাকে অপদস্থ করে। যে ইহাকে জমা করিবার ইচ্ছা করে, তাহাকে সে (অন্যের) মুখাপেক্ষী বানাইয়া দেয়। ইহা বিষ। অজ্ঞ লোকেরা ইহাকে আহার করে। অতঃপর তাহারা মারা যায়। ইহার মধ্যে

১. প্রাধান্যশীল অভিমত অনুযায়ী স্থলন তো তওবা দ্বারা মাফ হইয়া গিয়াছিল।
অতঃপর খেলাফত-এর জন্য দুনিয়াতে পাঠানো হইয়াছে।

এমনভাবে জীবন অতিবাহিত করুন, যেমন কোন আহত রোগী প্রত্যেক জিনিস হইতে সতর্কতা অবলম্বন করে, যাহাতে সে সুস্থ হইয়া যায়। তিস্ত ঔষধ এইজন্য ব্যবহার করে, যাহাতে রোগ দীর্ঘ না হয়। আপনি এই ধোকাবাজ, দাগাবাজ প্রভারক হইতে সাবধানতা অবলম্বন করুন। সে শুধু ধোকা দেওয়ার জন্য সাজ-গোজ করে, ধোকা দিয়া মানুষকে মুসীবতে ফেলে, নিজের বিভিন্ন আশা-আকাঙ্ক্ষা লইয়া মানুষের নিকট আসে এবং তাহার সহিত বিবাহ-আগ্রহীদেরকে আজ নয় ; কাল বলিয়া বাহানা করিতে থাকে। অতঃপর সে তাহাদের জন্য এমন সাজ-গোজ করিয়া নববধূর রূপ ধারণ করে যে, তাহার উপর দৃষ্টি স্থির হইয়া যায়, অন্তর আসক্ত হইয়া যায়। লোকেরা তাহার জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইয়া যায়। কিন্তু এই কমবখত সকলের সহিত দুশমনী করে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, না দুনিয়াতে জীবিতরা দুনিয়া হইতে বিদায় গ্রহণকারীদের নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করে, আর না যাহারা দুনিয়াতে পরে আসে, তাহারা পূর্ববর্তীদের অবস্থা শুনিয়া উহা হইতে বাঁচিয়া চলে, আর না আল্লাহ তায়ালার হুকুম-আহকামকে যাহারা জানে, তাহারা উহা হইতে উপদেশ গ্রহণ করে। দুনিয়ার প্রেমিকগণ তাহাদের প্রয়োজন পূরণ হইতে দেখিয়া ধোকায় পড়িয়া যায় এবং অবাধ্যতায় লিপ্ত হইয়া আখেরাতকে ভুলিয়া যায়। এমনকি তাহাদের অন্তর উহাতে মগ্ন হইয়া যায় এবং আখেরাতের পথ হইতে পিছলাইয়া যায়। পরিশেষে লজ্জা ও আফসোস ছাড়া কিছুই থাকে না। কেননা, মৃত্যু-যন্ত্রণা ও উহার অস্থিরতা তাহাকে ঘিরিয়া লয় এবং এই সবকিছু ছুটিয়া যাওয়ার আফসোস তাহার উপর সওয়ার হইয়া যায়। দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট ব্যক্তি নিজের উদ্দেশ্যকে কখনও পূরণ করিতে পারে না। দুঃখ-কষ্ট হইতে কখনও আরাম পাইতে পারে না। অবশেষে, পাথেয় না লইয়াই এই জগত হইতে চলিয়া যায় ; কোনরূপ প্রস্তুতি ছাড়াই আখেরাতে পৌঁছিয়া যায়।

হে আমীরুল মুমিনীন ! আপনি এই দুনিয়া হইতে খুব বাঁচিতে থাকুন এবং ইহার পরম আনন্দের মুহূর্তগুলিতেও অনেক বেশী ভয় করিতে থাকুন। ইহার উপর আস্থা পোষণকারী যখনই কিছুটা আনন্দিত হয়, তখনই সে তাহাকে কোন না কোন মুসীবতে লিপ্ত করিয়া দেয়। ইহাতে আনন্দ অনুভবকারী ধোকার মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে। আর এই দুনিয়াতে (প্রয়োজনের অধিক) মুনাফা অর্জনকারী ক্ষতির মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে। উহার আরাম কষ্টের সহিত জড়াইয়া রহিয়াছে। এখানে অবস্থান করার শেষ পরিণতি ধ্বংস। ইহার আনন্দ কষ্টের সহিত মিশ্রিত। যাহা অতীত

হইয়া গিয়াছে, তাহা ফিরিয়া আসিবার নহে এবং যাহা আসিতেছে উহার অবস্থা জানা নাই যে, কি হয়। দুনিয়ার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা মিথ্যা, ইহার সমস্ত কামনা-বাসনা বাতিল। ইহার পরিচ্ছন্নতার মধ্যে ময়লা রহিয়াছে। ইহার ভোগের মধ্যে কষ্ট রহিয়াছে। আর মানুষ ইহাতে প্রতি মুহূর্ত আশংকার মধ্যে রহিয়াছে। যদি মানুষের বুদ্ধি থাকে এবং সে চিন্তা করে, তবে দেখিবে দুনিয়ার নেয়ামতসমূহ বড় ভয়ানক। সব সময় বালা-মুসীবতের ভয় রহিয়াছে।

যদি এই দুনিয়ার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালা ইহার খারাবী সম্পর্কে না জানাইতেন, তবুও এই ধোকাবাজের নিজস্ব অবস্থাই এইরূপ যে, ঘুমন্তদেরকে জাগ্রত করিবার জন্য এবং গাফেলদেরকে সতর্ক করিবার জন্য যথেষ্ট ছিল। তদুপরি আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং এই ব্যাপারে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন এবং নসীহত করিয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালা নিকট ইহার কোন মূল্য নাই। আর ইহাকে সৃষ্টি করিয়া কখনও ইহার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই।

এই দুনিয়া তাহার সমস্ত খাজানা ও ভাণ্ডার সহকারে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়াছে। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহাকে গ্রহণ করেন নাই; স্পর্শ পর্যন্ত করেন নাই। কারণ, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়ালা মজ্জির খেলাফ জিনিসকে পছন্দ করেন নাই। আর যে জিনিসের প্রতি উহার সৃষ্টিকর্তা শত্রুতা পোষণ করিয়াছেন, উহার সহিত হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহব্বত করেন নাই। যে জিনিসকে আল্লাহ তায়ালা মূল্যহীন করিয়া দিয়াছেন, তিনি উহা পছন্দ করিয়া উহার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন নাই। এইজন্যই আল্লাহ তায়ালা আপন নেক বান্দাদের হইতে উহাকে ইচ্ছাকৃতভাবে দূরে সরাইয়া দিয়াছেন এবং দুশমনদের জন্য উহাকে প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন। ধোকায় পতিত অনেক লোক যাহারা ইহাকে গুরুত্বের দৃষ্টিতে দেখে, তাহারা উহার প্রাচুর্য দেখিয়া মনে করিতে থাকে যে, আল্লাহ তায়ালা তাহাদেরকে সম্মান করিয়াছেন। তাহারা এই কথা ভুলিয়া যায় যে, (সমস্ত নবী-রসূলদের সর্দার পূর্বাপর সকলের গৌরব) আমাদের সর্দার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আল্লাহ তায়ালা এই ব্যাপারে এমন আচরণ করিয়াছেন যে, তাঁহাকে পেটে পাথর বাঁধিতে হইয়াছে।

এক হাদীসে আল্লাহ তায়ালা হযরত মুসা (আঃ)কে এরশাদ করিয়াছেন, যখন তুমি সচ্ছলতাকে আসিতে দেখ, তখন বুঝিয়া লও যে,

ইহা কোন গুনাহের শাস্তি হিসাবে আসিতেছে। আর যখন অভাব ও ক্ষুধার অবস্থাকে আসিতে দেখ, তখন বলিও যে, ইহা নেক লোকদের নিদর্শন আসিতেছে।

আর যদি কেহ হযরত ঈসা (আঃ)এর অনুসরণ করিতে চাহে, তবে তাহার এরশাদ এই যে, আমার তরকারী হইল ক্ষুধা, (অর্থাৎ ক্ষুধার্ত অবস্থায় শুধু রুটিই এমন সুস্বাদু মনে হয়, যেমন তরকারী দ্বারা সুস্বাদু মনে হয়)। আর আমার বিশেষ নিশান হইল, আল্লাহ তায়ালার ভয়। আর আমার পোশাক হইল, পশম (অর্থাৎ ভেড়া বকরির পশম)। আর আমার শীতে তাপ গ্রহণের জিনিস হইল, রৌদ্র, আমার বাতি হইল, চাঁদের আলো, আমার সওয়ারী হইল আমার পা, আমার খাদ্য ও ফল হইল, জমিনের ঘাস। আমি এমন অবস্থায় সকাল করি যে, আমার নিকট কিছু থাকে না। সন্ধ্যা এমন অবস্থায় করি যে, আমার নিকট কিছু থাকে না। সমস্ত দুনিয়াতে আমার চেয়ে বেশী ধনী (বেপরওয়া—যে কাহারও মুখাপেক্ষী নয় এমন) কেহই নাই।

এই ধরনের উক্তিসমূহ হযরত আশ্বিয়ায়ে কেরাম ও সাহাবায়ে কেরাম ও আওলিয়া কেরাম হইতে কিতাবসমূহে প্রচুর পরিমাণে বর্ণিত রহিয়াছে। এখানে একটি বিষয় ভালভাবে বুঝিয়া লইতে হইবে যে, আসল জিন্দেগী, প্রশংসিত ও পছন্দনীয় জিন্দেগী উহাই, যাহা এই সকল বুয়ুর্গদের উক্তি ও অবস্থাসমূহ দ্বারা জানা যায়। কিন্তু উহার সাথে সাথে নিজের শারীরিক শক্তি ও সামর্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখাও জরুরী। নিজের শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী অনুসরণ করিবার চেষ্টা হইতে হইবে। যেখানে শারীরিক দুর্বলতার কারণে সম্ভবপর হয় না, সেখানে অপারগতাবশতঃ দুর্বলতার প্রতি খেয়াল করা জরুরী। এই সমস্ত অবস্থার বর্ণনা দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, কমপক্ষে এতটুকু যেন অন্তরে বসিয়া যায় যে, দুনিয়ার আসল জিন্দেগী ইহাই। অবশ্য যেখানে আমরা আমাদের রোগ-শোক ও বিভিন্ন ওজরের কারণে অপারগ হইয়া যাই, সেখানে অপারগ হিসাবে নিজের দুর্বলতা ও ওজরের প্রতি খেয়াল রাখাও জরুরী। ইহার উদাহরণ—যেমন অসুস্থ ব্যক্তির রোযা ভঙ্গ করা। রমজানের মোবারক মাসে রোজা রাখাই হইল আসল। কিন্তু কেহ যদি অসুস্থতার কারণে রোযা রাখিতে না পারে, অথবা চিকিৎসক রোযা রাখাকে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হইবে বলে, তবে বাধ্য হইয়া রোযা ভঙ্গ করিতে হইবে। কিন্তু জানা কথা যে, রমজানের মোবারক মাসে রোযা রাখাই ছিল, আসল উদ্দেশ্য ও পছন্দনীয়। কিন্তু অসুস্থ বেচারী অক্ষমতার কারণে রোযা রাখিতে পারে না, তবে রোযা রাখার আগ্রহ ও

চেষ্টা প্রত্যেক খাটি মুসলমানই করে। অনুরূপভাবে, আমরা আমাদের হিম্মত ও শারীরিক দুর্বলতার কারণে বুয়ুর্গদের বর্ণিত জীবন পদ্ধতির উপর চলার ক্ষমতা রাখি না বিধায় অপারগতার পর্যায়ে প্রয়োজন অনুসারে দুনিয়ার সহিত জড়িত হওয়া জরুরী। কিন্তু সাথে সাথে নিজের দুর্বলতার কারণে অপারগতার অনুভূতিও যেন থাকে। আসল জিন্দেগী বলিতে আন্তরিকভাবে উহাকেই মনে করিতে থাকিবে, যাহা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অন্যান্য আশ্বিয়ায়ে কেরাম ও আওলিয়ায়ে কেরামের ছিল। যাহাদের মধ্য হইতে কিছুসংখ্যকের উক্তি উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই সঙ্গে দুনিয়ার মর্যাদাহীন হওয়া, ভালবাসার উপযুক্ত না হওয়া, ধ্বংসশীল ও শুধু ধোকার বস্তু হওয়া—এইসব বিষয়কে নিজের দুর্বলতা ও অপারগতার অবস্থাতেও যথাসম্ভব বেশী হইতে বেশী অন্তরে জমাইতে চেষ্টা করিবে, শুধু মুখেই নয় ; বরং অন্তর দ্বারা প্রকৃতই দুনিয়াকে এরূপ মনে করিবে ; আর এরূপ মনে করিতে কোন বাধা নাই ; আমাদের নিকট কোন ওজর এমন নাই যে, কোন অবস্থায়ই এই কমবখতকে অন্তরে স্থান দেই।

ইমাম গায়যালী (রহঃ) বলেন, দুনিয়া অতি শীঘ্র ধ্বংস হইয়া যাইবে। অতি শীঘ্র খতম হইয়া যাইবে। সে নিজের বাকি থাকিবার ওয়াদা তো করে, কিন্তু এইসব ওয়াদা পূরা করে না। তুমি যখন উহাকে দেখ, তখন সে এক জায়গায় স্থির হইয়া রহিয়াছে বলিয়া মনে হইবে, কিন্তু আসলে সে অনেক দ্রুত চলিতেছে। কিন্তু দর্শকদের দৃষ্টিতে তাহার গতি অনুভব হয় না। দর্শক তখনই বুদ্ধিতে পারে, যখন সে ধ্বংস হইয়া যায়। উহার উদাহরণ ছায়ার মত, যাহা সবসময় চলিতে থাকে ; কিন্তু উহার গতি বুঝা যায় না।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ)এর সম্মুখে একবার দুনিয়ার আলোচনা হইল। তিনি বলিলেন—

لَعَلَّامُ نَوْمٍ أَوْ كَظَلِّي سَائِلٍ
إِنَّ اللَّيْلَ بِمِثْلِمَا لَا يَفْغَدُ

অর্থাৎ, উহার উদাহরণ হইল, ঘুমন্ত ব্যক্তিদের স্বপ্নের মত অথবা চলন্ত ছায়ার মত। বুদ্ধিমান লোকদিগকে এইরূপ জিনিসের দ্বারা ধোকা দেওয়া যায় না।

হযরত হাসান (রাযিঃ) অধিকাংশ সময় এই কবিতা পড়িতেন—

يَا أَهْلَ لَدَا دُنْيَا لَبَقْتُمْ لَهَا إِنَّ اغْتِرَارًا بِظِلِّ زَائِلٍ حُمُومٍ

অর্থাৎ, হে দুনিয়ার স্বাদ উপভোগকারীগণ! ইহার কোন স্থায়িত্বই নাই। এমন একটি ছায়ার দ্বারা প্রতারিত হওয়া যাহা চলন্ত রহিয়াছে একেবারেই বোকামী।

ইউনুস ইবনে ওবায়দ (রহঃ) বলেন, আমি আমার অন্তরকে দুনিয়ার এই উদাহরণ বুঝাইয়াছি যে, যেমন এক ব্যক্তি ঘুমাইতেছে, সে স্বপ্নে অনেক ধরনের ভাল ও মন্দ বিষয় দেখে। হঠাৎ তাহার চোখ খুলিয়া গেল এবং সাথে সাথে সমস্ত স্বপ্ন শেষ হইয়া গেল। অনুরূপভাবে, সকল মানুষই ঘুমন্ত অবস্থায় রহিয়াছে এবং এই সবকিছু স্বপ্নের মধ্যে দেখিতেছে। যখন মউতের কারণে হঠাৎ চোখ খুলিয়া যাইবে, তখন না এখানের আনন্দ থাকিবে, না এখানকার দুঃখ থাকিবে।

বর্ণিত আছে, একবার হযরত ঈসা (আঃ) এর সম্মুখে দুনিয়ার বাস্তব অবস্থা প্রকাশিত হইল। তিনি দেখিলেন—দুনিয়া অত্যন্ত বৃদ্ধা একটি নারী। বার্ধক্যের কারণে তাহার দাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং অত্যন্ত জাঁক-জমকপূর্ণ মূল্যবান পোশাকে সজ্জিত রহিয়াছে। সব ধরনের সৌন্দর্যের উপকরণ সহ যেন নববধূ সাজিয়াছে। হযরত ঈসা (আঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুই এ যাবত কত বিবাহ করিয়াছিস (যে, এখন আবার বিবাহের আগ্রহে দুলহান সাজিতেছিস)? সে উত্তর করিল, উহার কোন হিসাব নাই। হযরত ঈসা (আঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা সকলেই কি মারা গিয়াছে, নাকি তাহারা তোকে তালাক দিয়াছে? সে জবাব দিল, আমি তাহাদের সকলকে খুন করিয়া ফেলিয়াছি। হযরত ঈসা (আঃ) বলিলেন, তোর বাকি স্বামীদের সর্বনাশ হউক। তাহারা তোর পূর্বের স্বামীদের হইতে শিক্ষা গ্রহণ করে না যে, তুই কিভাবে একেকজন করিয়া সকলকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছিস।

প্রকৃতপক্ষে, এই দুনিয়া অত্যন্ত বয়োবৃদ্ধা এক মহিলা, যে চাকচিক্যময় পোশাক পরিধান করিয়া রহিয়াছে। মানুষ তাহার বাহ্যিক রূপ দেখিয়া ধোকা খাইয়া যায়। যখন তাহার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে জানিতে পারে এবং তাহার চেহারার উপর হইতে পর্দা সরাইয়া লয়, তখন তাহার আসল রূপ প্রকাশিত হয়।

আলা ইবনে যিয়াদ (রহঃ) বলেন, আমি স্বপ্নে অত্যন্ত বৃদ্ধা এক মহিলাকে দেখিলাম। সে বহু মূল্যবান পোশাক, অলংকার ইত্যাদি পরিধান

করিয়া রহিয়াছে। দুনিয়ার সব ধরনের সাজ-সজ্জা তাহার শরীরে রহিয়াছে। আর বহু লোকজন তাহার আশেপাশে সমবেত হইয়া রহিয়াছে। অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে তাহাকে দেখিতেছে। আমি তাহার নিকটে গেলাম এবং তাহাকে দেখিয়া ঐসব দর্শকের প্রতি বড় আশ্চর্যান্বিত হইলাম। আমি স্বপ্নে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তুই কে? সে বলিতে লাগিল, তুমি আমাকে চেন না? আমি বলিলাম, না; আমি তো চিনি না। সে বলিল, আমি দুনিয়া। আমি বলিলাম, আল্লাহ তায়ালা তোর হাত হইতে আমাকে আপন আশ্রয়ে রাখুন। সে বলিতে লাগিল, যদি তুমি আমার হাত হইতে হেফাজতে থাকিতে পছন্দ কর, তবে টাকা-পয়সার প্রতি শত্রুতা পোষণ কর।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, কিয়ামতের দিন দুনিয়াকে একজন কুৎসিত চেহারা ও নীলচক্ষুবিশিষ্ট অত্যন্ত বৃদ্ধা মহিলার আকৃতিতে উপস্থিত করা হইবে। যাহার দাঁত সামনের দিকে বাহির হইয়া রহিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় তাহাকে মানুষের সামনে আনিয়া দাঁড় করান হইবে এবং জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, তোমরা কি ইহাকে চিন? তাহারা বলিবে, আল্লাহর পানাহ! ইহা আবার কোন্ আপদ! তাহাদিগকে বলা হইবে, ইহা সেই দুনিয়া, যাহার কারণে একে অপরকে কতল করিয়াছে। পরস্পর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে। ইহারই কারণে তোমরা পরস্পর একে অপরকে হিংসা করিতে। পরস্পর শত্রুতা রাখিতে এবং ইহারই ধোকায়ে পড়িয়াছিলে। অতঃপর সেই বৃদ্ধাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। সে চিৎকার করিয়া বলিবে, আমার সহিত ঐ সমস্ত লোকদেরকেও আনিয়া দাও, যাহারা আমার পিছনে লাগিয়াছিল। তাহাদেরকেও তো আমার সাথী করিয়া দাও। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিবেন, যাহারা তাহার পিছনে চলিয়াছে, তাহাদিগকেও তাহার সাথী করিয়া দাও।

প্রকৃতপক্ষে মানুষের জন্য গভীরভাবে চিন্তা করিবার বিষয় হইল যে, তাহার তিনটি সময় বা কাল রহিয়াছে। একটি বিশ্বজগতের শুরু হইতে তাহার ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত সময়। দ্বিতীয়, মানুষের মৃত্যুর পর হইতে অনন্তকাল সময়। এই দুইয়ের মাঝখানে তৃতীয়টি হইল, তাহার ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হইতে তাহার মৃত্যু পর্যন্ত সময়। এই সময়কে যদি শুরু এবং শেষ উভয়ের সমষ্টির সহিত তুলনা করা হয় তবে জানা যাইবে যে, ইহা কত সামান্য সময়। এইজন্যই ঐযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দুনিয়ার সহিত আমার কি সম্পর্ক, আমার দৃষ্টান্ত তো ঐ আরোহী ব্যক্তির মত, যে প্রচণ্ড গরমের মধ্যে সফর করিতেছে। গরমের

প্রচণ্ডতার কারণে কোন ছায়াদার বৃক্ষ দেখিতে পাইয়া উহার ছায়াতে আরাম করিবার জন্য দ্বিপ্রহরে সামান্য সময় অবস্থান করে। অতঃপর সেই বৃক্ষকে ছাড়িয়া সম্মুখে অগ্রসর হইয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি দুনিয়াকে ঐ দৃষ্টিতে দেখে, যাহা ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তবে উহার দিকে কখনও সে জ্রঞ্জেপ করিবে না এবং সে মোটেও ইহার পরওয়া করিবে না যে, এই সামান্য সময় আরামে ও আনন্দে কাটিল, নাকি দুঃখ-কষ্টে কাটিল।

ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সাহাবীকে দেখিলেন, চুনা, পাথর দ্বারা ঘর নির্মাণ করিতেছেন। ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, মৃত্যু উহা হইতেও বেশী নিকটবর্তী।

এক হাদীসে ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দুনিয়াদার লোকের দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে পানির উপর চলিতেছে। কোন ব্যক্তি কি এই ক্ষমতা রাখে যে, পানির উপর চলিবে অথচ তাহার পা ভিজিবে না? ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদ দ্বারা ঐ সমস্ত লোকের মূর্খতা তোমরা আন্দাজ করিতে পার, যাহারা মনে করে যে, আমাদের শরীর তো দুনিয়াবী লজ্জত ও স্বাদের দ্বারা উপকৃত হইতেছে; কিন্তু আমাদের অন্তর দুনিয়া হইতে পবিত্র, দুনিয়ার সহিত আমাদের অন্তরের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন রহিয়াছে—এই ধারণা তাহাদের সহিত শয়তানের একটি বড় প্রতারণা। বরং ঐ সমস্ত লোকের নিকট হইতে যদি দুনিয়াকে ছিনাইয়া লওয়া হয়, তবে উহার বিচ্ছেদে তাহারা মুহূর্তে অস্থির হইয়া যাইবে। অতএব, পানিতে চলিবার কারণে যেরূপ পা অবশ্যই ভিজিয়া যায়, অনুরূপভাবে, দুনিয়ার সহিত সম্পর্ক ও মেলামেশা অন্তরে অবশ্যই অন্ধকার পয়দা করে।

হযরত ইসা (আঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আমি তোমাদিগকে একটি বাস্তব কথা বলিতেছি—যেমন অসুস্থ ব্যক্তির রোগের তাড়নায় ঝাওয়ার স্বাদ থাকে না, তেমনিভাবে দুনিয়াদারদেরও এবাদতে স্বাদ লাগে না। যেমনিভাবে জানোয়ারের উপর আরোহন করার কাজ ছাড়িয়া দিলে, উহার স্বভাব কঠিন হইয়া যায় এবং উহার বহনেরও অভ্যাস থাকে না, তেমনিভাবে যদি মৃত্যুর স্মরণ ও এবাদতের কষ্ট দ্বারা অন্তরকে নরম না করা হয়, তবে উহা শক্ত হইয়া যায়; উহাতে কাঠিন্য পয়দা হইয়া যায়। আরেকটি হক কথা বলিতেছি যে, মশক যতক্ষণ পর্যন্ত ফাটিয়া না যায়, উহা মধু (পানি ইত্যাদি রাখার) পাত্র হইতে পারে। কিন্তু যখন উহা ফাটিয়া যায়, তখন উহাতে আর মধু রাখা যায় না। এমনিভাবে অন্তরকে যতক্ষণ

পর্যন্ত খাহেশাত দ্বারা ফাড়িয়া না ফেলা হয়, অথবা লোভ-লালসা দ্বারা উহাকে নষ্ট না করা হয়, অথবা দুনিয়ার নাজ-নেয়ামত দ্বারা উহাকে কঠিন না করা হয়, ততক্ষণ উহা হেকমতের পাত্র হইয়া থাকে। তদুপরি ইহাও লক্ষ্যণীয় যে, দুনিয়ার খাহেশাত এখন যতই সুস্বাদু অনুভূত হউক না কেন, পরিণাম হিসাবে মৃত্যুর সময় ততই অপছন্দনীয় ও বিপদ হইবে।

উলামায়ে কেরাম লিখিয়াছেন, এই সমস্ত সুস্বাদু বস্তুর সহিত দুনিয়ার জীবনে যত বেশী মগ্নতা ও মহব্বত হইবে, মৃত্যুর সময় এই সমস্ত জিনিস ততবেশী অপছন্দনীয় হইবে। উহার দৃষ্টান্ত খাদ্যের সহিত দেওয়া হয় যে, যেই খানা যত বেশী স্বাদযুক্ত এবং বেশী চর্বি ও ঘি যুক্ত হয়, উহার পায়খানাও ততবেশী দুর্গন্ধময় হয়। আর যত বেশী সাদাসিধা খানা হয়, ততই উহার পায়খানায় দুর্গন্ধও কম হয়।

এই সমস্ত কথার পর অবশ্যই ইহা উপলব্ধি করার জিনিস যে, দুনিয়া কি জিনিস, যাহার এত নিন্দা কুরআন পাক ও হাদীস ইত্যাদিতে বর্ণিত হইয়াছে? গভীর চিন্তা করিয়া ইহা বুঝিয়া লইতে হইবে যে, মানুষ মৃত্যুর পূর্বে অর্থাৎ এই জীবনে যে সমস্ত অবস্থা ও বিষয়ের সম্মুখীন হয়, এইগুলিকেই দুনিয়া বলা হয়, আর মৃত্যুর পর যাহা কিছু ঘটিবে, সেইগুলিকে আখেরাত বলা হয়। মৃত্যুর পূর্বের বিষয়গুলি তিন প্রকার—

প্রথম প্রকার—এই সমস্ত জিনিস যাহা মানুষের সহিত পরজগতে যায় তাহা হইল, দ্বীনী এলেম ও নেক আমল, যাহা শুধু আল্লাহ তায়ালার জন্য করা হইয়াছে। এই দুইটি জিনিস খালেস আখেরাত এবং দ্বীন হিসাবে গণ্য। ইহা দুনিয়া নহে; যদিও মানুষ ইহার মধ্যে মজা ও স্বাদ অনুভব করিয়া থাকে। এই কারণেই যাহাদের এইগুলির মধ্যে মজা হাসিল হইয়া যায়, তাহারা উহার কারণে খানাপিনা ঘুম শাদী-বিবাহ ইত্যাদি পর্যন্ত ছাড়িয়া দেয়। একরূপ মজা ও স্বাদ পাওয়া সত্ত্বেও এই দুই জিনিস আখেরাতের জিনিস হিসাবে গণ্য হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় প্রকার—প্রথম প্রকারের সম্পূর্ণ বিপরীত। ওনাহের স্বাদ উপভোগ এবং জায়েয জিনিসসমূহের মধ্যেও ঐ পরিমাণ, যাহা কেবল অপচয় ও অতিরিক্ত। যেমন স্বর্ণ রৌপ্যের স্তূপ এবং জাক-জমকপূর্ণ পোশাক-পরিচ্ছদ, সুদৃশ্য জীবজন্তুর সখ, অটালিকা, রকমারী মজাদার খানা, এই সবই দুনিয়া। যাহার নিন্দা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

তৃতীয় প্রকার—পূর্বোক্ত দুই প্রকারের মাঝামাঝি ঐ সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিস যাহা আখেরাতের কাজের জন্য সাহায্যকারী ও সহায়ক হয়। যেমন—প্রয়োজন পরিমাণ খাদ্য, নিদ্রা, প্রয়োজন পরিমাণ শীত ও

গরমের সাধারণ পোশাক এবং ঐ সমস্ত জিনিস যাহা মানুষের স্বাস্থ্য ও বাঁচিয়া থাকার জন্য প্রয়োজন হইয়া থাকে এবং যাহা দ্বারা প্রথম প্রকারের জন্য সাহায্য হাসিল হয়। এই সমস্ত জিনিসও দুনিয়া নহে। বরং এইগুলিও আখেরাত এবং দ্বীনেরই অন্তর্ভুক্ত। তবে শর্ত এই যে, বাস্তবিকই যেন প্রয়োজনের পর্যায়েই হয় এবং এইগুলির দ্বারা দ্বীনী কাজে শক্তি অর্জন করা উদ্দেশ্য হয়। তবে যদি এইগুলির দ্বারা শুধু নফস ও প্রবৃত্তির স্বাদ আশ্বাদন বা মজা হাসিল করা অথবা মনের খাহেশ পূরা করা উদ্দেশ্য হয়, তখন এই সমস্ত জিনিসই দুনিয়া হিসাবে গণ্য হইয়া যাইবে।

আমি আমার পিতা মরহুমের নিকট অনেক সময় একটি ঘটনা শুনিয়াছি। তিনি বলিতেন, এক ব্যক্তির কোন প্রয়োজনে পানিপথ নামক স্থানে যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল। পথে যমুনা নদী পড়িত। ঘটনাক্রমে তখন নদীতে খুব স্রোত ছিল। নৌকাও চলিতে পারিতেছিল না। লোকটি অত্যন্ত পেরেশান ছিল। লোকেরা তাহাকে বলিল, অমুক জঙ্গলে একজন বুযুর্গ থাকেন। তাহার নিকট তোমার প্রয়োজন ব্যক্ত কর। যদি তিনি কোন পন্থা বলিয়া দেন, তবে হয়ত তোমার কাজ হইয়া যাইবে। এমনিতে তো কোন উপায় দেখা যাইতেছে না। কিন্তু মনে রাখিবে—সেই বুযুর্গ প্রথম প্রথম রাগান্বিত হইবেন, অস্বীকার করিবেন, উহাতে তুমি নিরাশ হইও না। লোকটি সেই বুযুর্গের নিকট গেল। জঙ্গলে একটি ঝুপড়ির মত ছিল। উহার মধ্যে বুযুর্গের পরিবার-পরিজনও থাকিত। লোকটি অনেক কাল্লাকাটি করিয়া নিজের প্রয়োজনের কথা ব্যক্ত করিল যে, আগামীকাল আমার মামলার তারিখ, সেখানে পৌঁছার কোন উপায় নাই।

বুযুর্গ প্রথমে অভ্যাস অনুযায়ী খুব ধমকাইলেন যে, আমি কি করিতে পারি, আমার হাতে কি আছে? অতঃপর যখন লোকটি তাহাকে খুবই অনুনয়-বিনয় করিল, তখন তিনি বলিলেন, যমুনাকে যাইয়া বলিয়া দাও যে, এমন ব্যক্তি আমাকে পাঠাইয়াছে, যে সারা জীবন না কখনও কিছু খাইয়াছে, না স্ত্রীর সহিত সহবাস করিয়াছে।

এই ব্যক্তি ফিরিয়া গেল এবং বুযুর্গের কথা অনুযায়ী আমল করিল। যমুনার পানি একেবারে থামিয়া গেল এবং এই ব্যক্তি পার হইয়া গেল। অতঃপর যমুনা পূর্বের মত চলিতে লাগিল। কিন্তু সেই ব্যক্তি চলিয়া যাওয়ার পর বুযুর্গের স্ত্রী কাঁদিতে আরম্ভ করিল যে, তুমি আমাকে অপদস্থ ও লাঞ্চিত করিলে। খাওয়া-দাওয়া না করিয়া তুমি আপনা-আপনি ফুলিয়া হাতির মত হইয়া গিয়াছ, নিজের ব্যাপারে তোমার স্বাধীনতা রহিয়াছে—যাহা চাও মিথ্যা বলিতে পার। কিন্তু এই

কথা যে, তুমি কখনও স্ত্রীর নিকট যাও নাই, ইহা তো আমাকে অপদস্থ করিয়া দিয়াছে। কেননা, ইহার অর্থ তো এই হইল যে, এই সমস্ত সন্তান যাহারা ঘুরাফেরা করিতেছে সব অবৈধভাবে হইয়াছে।

বুযুর্গ প্রথমে তো স্ত্রীকে বলিলেন যে, তোমার সহিত এই কথার কোন সম্পর্ক নাই। যখন এই সমস্ত সন্তানকে আমি আমার সন্তান বলিতেছি, তখন আর অভিযোগ কিসের? তারপরও স্ত্রী এই বলিয়া কাঁদিতে থাকিল যে, তুমি আমাকে ব্যভিচারিণী বানাইয়া দিয়াছ। অতঃপর সেই বুযুর্গ বলিলেন, মনোযোগ দিয়া শোন, যখন হইতে আমার জ্ঞান-বুদ্ধি হইয়াছে, তখন হইতে কখনও আমি নিজের নফসের খাহেশের জন্য কোন জিনিস খাই নাই, যখনই যাহা খাইয়াছি, শুধু এই নিয়তে ও এরাদায় খাইয়াছি যে, ইহা দ্বারা যেন আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য ও এবাদতে শারীরিক শক্তি লাভ হয়। আর যখনই তোমার নিকট গিয়াছি, সবসময়ই তোমার হক আদায় করিবার ইচ্ছা করিয়াছি। কখনও নিজের খাহেশের তাড়নায় সহবাস করি নাই।

ঘটনা তো এখানেই শেষ। এখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি পবিত্র এরশাদের মধ্যে গভীরভাবে চিন্তা করিলে উক্ত বিষয়ের প্রতি সমর্থন পাওয়া যায়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ এই যে, মানুষের শরীরে তিনশত বাটটি জোড়া রহিয়াছে। সুতরাং তাহার জিম্মায় জরুরী যে, প্রত্যেক জোড়ার পক্ষে (উহা সুস্থ থাকার শোকরানা স্বরূপ) প্রতিদিন যেন একটি করিয়া সদকা করে। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! প্রতিদিন এত সদকা (অর্থাৎ ৩৬০টি করিয়া) আদায় করার শক্তি কাহার আছে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, মসজিদে ধুধু ইত্যাদি পড়িয়া থাকে, উহার উপর মাটি দিয়া দেওয়াও সদকার সওয়াব রাখে। মানুষের চলার পথ হইতে কোন কষ্টদায়ক জিনিস সরাইয়া দেওয়াও সদকা। আর চাশতের নামায এই সবগুলি সদকার সমান হইতে পারে। (মিশকাত)

যেহেতু নামাযের মধ্যে শরীরের প্রতিটা জোড়া এবাদতে মগ্ন থাকে, সেহেতু প্রত্যেক জোড়ার পক্ষ হইতে যেন সদকা হইয়া গেল।

অন্য হাদীসে এই সমস্ত জিনিসের আরও দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন এরশাদ হইয়াছে যে, কাহাকেও সালাম করাও সদকা। সৎকাজের হুকুম করা, অসৎ কাজ হইতে নিষেধ করাও সদকা। স্ত্রীর সহিত সহবাস করাও সদকা। আর এই সবকিছুর বরাবর হইল, চাশতের দুই রাকাত

নামায। কেননা, উহা দ্বারা সমস্ত জোড়ার পক্ষ হইতে সদকা হইয়া যায়। সাহাবায়ে কেলাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোন ব্যক্তি নিজের খাহেশ পূরা করে, ইহাও কি সদকা হইবে? হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যদি সে উহাকে অবৈধ স্থানে পূর্ণ করিত, তবে গুনাহ হইত কি না? (আবু দাউদ)

অর্থাৎ, যেহেতু হারাম কাজ করা গুনাহ, কাজেই উহা হইতে বাঁচিবার নিয়তে স্ত্রীর সহিত সহবাস করা অবশ্যই সওয়াবের কাজ। এমনিভাবে—খানাপিনা, ঘুমানো, পোশাক পরিধান করা, এই সবই এবাদত। তবে শর্ত এই যে, আসলেই যেন আল্লাহ তায়ালার এতায়াত ও আনুগত্যের নিয়তে হয়।

ইমাম গায়যালী (রহঃ) এক জায়গায় লিখিয়াছেন, দুনিয়া মূলতঃ নিষিদ্ধ ও নাজায়েয নহে। বরং এই কারণে নিষিদ্ধ যে, উহা আল্লাহ তায়ালা পর্যন্ত পৌছিবার পথে বাধা হইয়া থাকে। এমনিভাবে, দরিদ্রতাও মূলতঃ উদ্দেশ্য ও তলব করিবার জিনিস নহে। বরং উহা এইজন্য তলব করিবার মত জিনিস যে, উহাতে আল্লাহ তায়ালা হইতে সরাইয়া দিবার কোন জিনিস নাই (বরং উহা আল্লাহ তায়ালা পর্যন্ত পৌছাইয়া দেওয়ার ব্যাপারে সাহায্যকারী)। কিন্তু অনেক ধনী এমন আছে যে, ধন-সম্পদের আধিক্য তাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালা পর্যন্ত পৌছিতে প্রতিবন্ধক হয় নাই। যেমন হযরত সুলাইমান (আঃ), হযরত উসমান (রাযিঃ), হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাযিঃ) প্রমুখ হযরতগণ।

পক্ষান্তরে, অনেক দরিদ্র এমন আছে যে, তাহাদের দরিদ্রতাও আল্লাহ তায়ালা পর্যন্ত পৌছিবার ব্যাপারে প্রতিবন্ধক হইয়া যায়। দরিদ্রতার সহিত সম্পদের মহব্বত তাহাদিগকে আসল পথ হইতে সরাইয়া দেয়। কাজেই আসল নিষিদ্ধ ও নাজায়েয হইল, সম্পদের প্রতি মহব্বত। চাই সম্পদ পাওয়ার পর মহব্বত হউক—যেমন ধনী লোক, অথবা সম্পদ না পাওয়ার কারণে হউক—যেমন দুনিয়াদার দরিদ্র। দুনিয়া আসলে আল্লাহ তায়ালা হইতে গাফেল লোকদের প্রেমাস্পদ। তাহার প্রেমিক অর্থাৎ দুনিয়াদার দরিদ্র উহাকে পাওয়া হইতে বঞ্চিত। সে উহার তালাশে মরিতেছে। আর যে প্রেমিক তাহাকে পাইয়াছে, যেমন ধনী ব্যক্তি, সে উহার হেফাজত এবং উহা দ্বারা স্বাদ হাসিল করিতে যাইয়া আল্লাহ তায়ালা হইতে গাফেল রহিয়াছে। কিন্তু সাধারণ নিয়ম হইল, যে উহা হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে, সে উহার ফেতনা ও পরীক্ষা হইতে অনেক বেশী বাঁচিয়া রহিয়াছে। আর যে উহার মধ্যে ফাঁসিয়া রহিয়াছে, সে ফেতনার মধ্যে লিপ্ত রহিয়াছে।

এইজন্যই সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) বলিয়াছেন, আমাদিগকে অভাবের ফেতনায় (পরীক্ষায়) লিপ্ত করা হইয়াছিল, তখন আমরা ছবর করিয়াছি (অর্থাৎ সফলকাম হইয়াছি)। অতঃপর যখন আমরা ধন-দৌলত ও প্রাচুর্যের ফেতনায় (ও পরীক্ষার মধ্যে) লিপ্ত হইলাম, তখন আমরা ছবর করিতে পারি নাই (অর্থাৎ এই অবস্থায়ও এই সম্পদ পৃথক থাকা সম্ভব হয় নাই)। অধিকাংশ লোকদের এই একই অবস্থা। সম্পদ পাওয়ার পর উহার ক্ষতি হইতে নিরাপদ থাকিতে পারিয়াছে—এরূপ ব্যক্তি বহু বৎসরে হয়ত এক-আধজন পাওয়া যায়। এই কারণেই কুরআন পাক ও হাদীসসমূহে ইহা হইতে বাঁচিবার জন্য অনেক বেশী উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে এবং উহার মধ্যে আটকাইয়া যাওয়ার ক্ষতিসমূহের উপর সতর্ক করা হইয়াছে। কারণ, ইহা হইতে বাঁচা তো প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই উপকারী। এই জন্য উলামায়ে কেরাম বলিয়াছেন যে, (হাতের দ্বারা টাকা-পয়সা ইত্যাদি) সম্পদ নাড়াচাড়া করাও ঈমানের স্বাদকে চুষিয়া লয়।

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, প্রত্যেক উম্মতের জন্য কোন বাছুর (গোমাতা ইত্যাদি) রহিয়াছে, যাহাকে তাহারা পূজা করে। আমার উম্মতের বাছুর হইল, টাকা-পয়সা ও স্বর্ণমুদ্রা (কেননা, এইগুলির সাথেও তাহারা পূজার মতই আচরণ করে)। হযরত মুসা (আঃ)এর কওমের বাছুরও তো স্বর্ণ চান্দ্রির অলংকারই ছিল।(এহইয়া)

আর ইহা কেবল আশ্বিয়ায়ে কেরাম ও আওলিয়ায়ে কেরামগণেরই বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তাহাদের দৃষ্টিতে সোনা-রূপা, পানি, পাথর একই বরাবর ছিল। তদুপরি অধিক পরিমাণে মুজাহাদা ও সাধনা এই বৈশিষ্ট্যকে তাহাদের মধ্যে আরও বেশী পরিপূর্ণ করিয়া দিত। এই কারণে যখন দুনিয়া নিজের সাজ-সজ্জা সহকারে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাজির হইল, তখন হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, তুই আমা হইতে দূরে থাক।

হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, হে হলুদ ও সাদা (অর্থাৎ স্বর্ণ, চাঁদি) ! আমাকে ছাড়া অন্য কাহাকেও ধোকা দে (আমি তোমার ধোকায় পড়িব না)। আর ইহাই আসল ধনী হওয়া যে, উহার সহিত অন্তরের সম্পর্ক না থাকে। এই জন্যই হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, মাল বেশী হওয়ার নাম ধনী হওয়া নয়। বরং আসল ধনী হওয়া তো অন্তর ধনী হওয়ার নাম। আর ইহা প্রত্যেকের জন্য হাসিল হওয়া কঠিন ব্যাপার। এইজন্য মাল হইতে দূরে থাকাই নিরাপদ তরীকা। কারণ, মালের উপর ক্ষমতা ও অধিকার থাকা অবস্থায় দান-খয়রাত করা সত্ত্বেও দিলের মধ্যে

উহার প্রতি আকর্ষণ ও মহব্বত পয়দা হইয়াই যায়। আর ইহাই ধ্বংসাত্মক জিনিস। কারণ, যেই পরিমাণ মালের সহিত মহব্বত হইবে, সেই পরিমাণ আল্লাহ তায়ালা হইতে দূরত্ব ও অপরিচিতি পয়দা হইবে। আর যখন অভাবের কারণে উহার সহিত মহব্বত কম হইবে, তখন মুসলমান হওয়ার কারণে অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সহিত তাহার সম্পর্ক হইবে। কেননা, অন্তর খালি থাকে না; কাহারও না কাহারও সহিত উহার সম্পর্ক অবশ্যই হয়। যখন আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যদের হইতে অন্তর বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে, তখন আল্লাহ তায়ালা সহিতই সম্পর্কযুক্ত হইয়া যাইবে।

মালদার ব্যক্তিদের সাধারণতঃ এই ধোকা হয় যে, সে নিজের ব্যাপারে ধারণা করিতে থাকে যে, মালের সহিত আমার মহব্বত নাই। কিন্তু ইহা বড় ভুল এবং কেবল ধোকা। প্রকৃতপক্ষে তাহার দিলের মধ্যে মালের মহব্বত বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। যাহা সে অনুভব করিতেছে না। সে ইহা তখন অনুভব করে, যখন তাহার মাল ধ্বংস হইয়া যায় অথবা চুরি হইয়া যায়। যে ব্যক্তি ইহা পরীক্ষা করিতে চায়, সে যেন নিজের সম্পদ বন্টন করিয়া দিয়া পরীক্ষা করিয়া লয়।

যদি মাল দূর হইয়া যাওয়ার কারণে অন্তরে উহার প্রতি আকর্ষণ অনুভব হয়, তবে বুঝা যাইবে যে, মালের সহিত মহব্বত ছিল। আর যদি অন্তরে উহার খেয়ালও না আসে, তবে বুঝা যাইবে যে, মহব্বত ছিল না। আর যতই দুনিয়ার সহিত মহব্বত কম হইবে, ততই সেই ব্যক্তির এবাদতের মধ্যে সওয়াব বেশী হইবে। কারণ, এবাদত ও তসবীহাতের মধ্যে শুধু জ্বান নাড়াচাড়া করা আসল উদ্দেশ্য নয়। বরং এইগুলির উদ্দেশ্য হইল, অন্তরে প্রতিক্রিয়া হওয়া। আর দিল যত খালি হইবে, ততই উহার উপর এইগুলির প্রভাব শক্তিশালী হইবে।

যাহ্যাক (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি বাজারে যায় এবং কোন জিনিস দেখিয়া উহা খরিদ করিবার আগ্রহ হয়; আর অভাবের কারণে উহার উপর সবর করে, ইহা এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা হইতে উত্তম।

এক ব্যক্তি বিশর ইবনে হারেস (রহঃ)কে বলিল, আমার জন্য দোয়া করুন। সন্তান-সন্ততি বেশী, যে কারণে খরচের অভাব। তিনি বলিলেন, যখন তোমার পরিবারের লোকেরা বলে, ঘরে আটা নাই (এবং তুমি উহাতে পেরেশান হও), তখন তুমি আল্লাহ তায়ালা নিকট দোয়া কর, তোমার এই সময়ের দোয়া আমার দোয়া হইতে অধিক উত্তম হইবে।

ইহা ছাড়া মাল অধিক হওয়ার কারণে কিয়ামতের দিন হিসাব দীর্ঘ

হওয়া তো সর্বাবস্থায় আছেই। এই কারণেই হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাযিঃ)এর জালাতে প্রবেশ করিতে দেবী হইয়াছে। যেমন ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

আর এই কারণেই হযরত আবু দারদা (রাযিঃ)এর এরশাদ রহিয়াছে—আমি ইহা পছন্দ করি না যে, মসজিদের দরজায় আমার একটি দোকান হউক, যাহাতে প্রত্যেক ওয়াক্তে আমি নামাযের জামাত পাইতে থাকি এবং যিকির-ফিকিরে মগ্ন থাকিতে পারি এবং দোকান হইতে প্রতিদিন পঞ্চাশটি স্বর্ণমুদ্রা কামাই করিতে থাকি ও সদকা করিতে থাকি। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, ইহার মধ্যে দোষের কি হইল? তিনি বলিলেন, হিসাব তো দীর্ঘ হইয়াই যাইবে।

হযরত সুফিয়ান (রহঃ) বলেন, আল্লাহ ওয়ালাগণ তিনটি জিনিস পছন্দ করিয়াছেন এবং সম্পদশালী লোকেরা তিনটি জিনিস পছন্দ করিয়াছে। আল্লাহ ওয়ালাগণ তো নফসের আরাম, অন্তর খালি হওয়া এবং হিসাব সহজ হওয়াকে পছন্দ করিয়াছেন। আর সম্পদশালীগণ নফসের কষ্ট অন্তরের ব্যস্ততা এবং হিসাব দীর্ঘ হওয়াকে পছন্দ করিয়াছে। (এহইয়া)

ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রসিদ্ধ এরশাদ রহিয়াছে যে, মানুষ তাহার সহিত (কিয়ামতের দিন) থাকিবে যাহার সহিত তাহার মহব্বত হইবে। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) মুসলমান হওয়ার পর অন্য কোন জিনিস দ্বারা এত আনন্দিত হন নাই, যত আনন্দিত এই হাদীস দ্বারা হইয়াছেন। কারণ, আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত তাহাদের মহব্বত প্রবাদ বাক্যের মত এবং সূর্যের চেয়েও বেশী প্রসিদ্ধ ছিল। কাজেই তাহাদের আনন্দ কেন হইবে না।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) বলেন, যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা আপন মহব্বতের সামান্যতম স্বাদ আশ্বাদন করান, সে দুনিয়ার তালাশ হইতে অবসর হইয়া যায় এবং সে লোক-সংশ্রব হইতে দূরে সরিতে আরম্ভ করে।

আবু সুলাইমান দারানী (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালা এমনিও বান্দা রহিয়াছে, যাহাদিগকে জালাত নিজের সমস্ত নেয়ামত ও চিরস্থায়ী আরাম-আয়েশ সম্বন্ধেও নিজের দিকে আকর্ষণ করিতে পারে না। তাহারা শুধু আল্লাহ তায়ালাই সহিত সম্পর্কিত থাকেন। এইসব লোককে দুনিয়া নিজের দিকে কিভাবে আকর্ষণ করিতে পারে।

হযরত ঈসা (আঃ) একটি জামাতের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। যাহাদের শরীর হালকা-পাতলা ও চেহারা ফ্যাকাসে ছিল। হযরত ঈসা (আঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের কি হইয়াছে? তাহারা বলিল, জাহান্নামের ভয় এই অবস্থা করিয়া দিয়াছে। হযরত ঈসা (আঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালার (আপন মেহেরবানীর কারণে তাহার) জিম্মায় হইল, যে ব্যক্তির মধ্যে জাহান্নামের ভয় থাকিবে, তাহাকে জাহান্নাম হইতে হেফাজতে রাখিবেন।

হযরত ঈসা (আঃ) সামনের দিকে অগ্রসর হইয়া আরও কিছু লোক দেখিলেন। তাহাদের অবস্থা পূর্বের লোকদের চেয়েও বেশী কঠিন ছিল। অত্যন্ত দুর্বল, হালকা-পাতলা, চেহারায়ে অনেক বেশী পেরেশানীর ছাপ রহিয়াছে। হযরত ঈসা (আঃ) তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের কি হইয়াছে? তাহারা আরজ করিল, জাম্মাতের আগ্রহ (ও আকর্ষণ) এই অবস্থা করিয়া দিয়াছে। হযরত ঈসা (আঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা জিম্মায় রহিয়াছে যে, তোমরা যে জিনিসের আশা আল্লাহ তায়ালা সহিত করিয়া রাখিয়াছ, উহা তোমাদিগকে দান করিবেন। তিনি আরও অগ্রসর হইলেন, তখন আরও একটি জাম্মাতের সহিত দেখা হইল। যাহারা উক্ত দ্বিতীয় জাম্মাতটির চেয়েও বেশী দুর্বল ও হালকা-পাতলা ছিল। কিন্তু তাহাদের চেহারা নূরের কারণে আয়নার মত চমকাইতেছিল। তাহাদিগকেও হযরত ঈসা (আঃ) একই প্রশ্ন করিলেন। তাহারা আরজ করিল, আল্লাহ তায়ালা প্রেম ও মহব্বত আমাদের এই অবস্থা করিয়া দিয়াছে। হযরত ঈসা (আঃ) বলিলেন, তোমরাই আসল নৈকট্যপ্রাপ্ত, তোমরাই আসল নৈকট্যপ্রাপ্ত, তোমরাই আসল নৈকট্যপ্রাপ্ত। এই কথা তিনি তিনবার বলিলেন।

ইয়াহইয়া ইবনে মুআয (রহঃ) বলেন, সরিষার দানা পরিমাণ আল্লাহ তায়ালার মহব্বত আমার নিকট মহব্বতবিহীন সত্ত্বর বছরের এবাদত হইতেও অধিক প্রিয়। (এহইয়া)

حُضُورِ اَقْدَسِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا ارشاد ہے کہ بوڑھے آدمی کا دل ہمیشہ وہ چیزوں میں جوان رہتا ہے۔ ایک دنیا کی محبت میں، دوسرے آنسوؤں اور اُمیدوں کے طویل ہونے میں۔

⑨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيرِ شَاتًا فِي اثْنَيْنِ فِي حُبِّ الدُّنْيَا وَطَوْلِ الْأَمَلِ (متفق عليه كذا في المشكوة)

৯) ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বৃদ্ধ মানুষের অন্তর সবসময় দুইটি জিনিসের ব্যাপারে জওয়ান থাকে। এক—দুনিয়ার মহব্বতে, দুই—আশা-আকাঙ্ক্ষা দীর্ঘ হওয়ার ব্যাপারে।

(মিশকাত : বুখারী, মুসলিম)

ফায়দা : প্রথম হাদীসের আলোচনায় এই বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, প্রকৃত দুনিয়া যাহার নিন্দা কুরআন পাক ও হাদীস ইত্যাদির মধ্যে অধিক পরিমাণে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা হইল— মালের মহব্বত। এই হাদীসে ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই প্রসঙ্গের আর একটি বিশেষ জিনিসের উপর সতর্ক করিয়াছেন। যাহা অভিজ্ঞতার দিক দিয়াও সঠিক প্রমাণিত হইয়াছে। অর্থাৎ বৃদ্ধ বয়সে দুনিয়ার মহব্বত ও দীর্ঘ আশা-আকাঙ্ক্ষা অনেক বাড়িয়া যায়। আর যতই মৃত্যুর সময় বার্ধক্যের কারণে নিকটে আসিতে থাকে, ততই ছেলেমেয়েদের বিবাহশাদী, ভাল ভাল ঘর-বাড়ী তৈয়ার করা, জায়গা জমি বাড়ানো ইত্যাদির প্রবল আগ্রহ বাড়িয়া যাইতে থাকে। এইজন্য এইরূপ অবস্থায় মানুষের নিজের নফসের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

অন্য এক হাদীসে ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষ বৃদ্ধ হইতে থাকে এবং দুইটি জিনিস তাহার মধ্যে জওয়ান হইতে থাকে। এক—সম্পদের লোভ, দ্বিতীয়—দীর্ঘদিন বাঁচিয়া থাকার লোভ। (মিশকাত)

বেশীদিন বাঁচিয়া থাকার লোভ দীর্ঘ আশা-আকাঙ্ক্ষার নামান্তর। কেননা, সে মৃত্যুর নিকটবর্তী হইতে যাইতেছে ; অথচ মৃত্যুর প্রস্তুতির স্থলে দুনিয়াতে সবসময় থাকিবার প্রস্তুতির মধ্যে লাগিয়া গিয়াছে।

একবার ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদাহরণ দিয়া বুঝাইবার জন্য একটি চতুর্ভুজ (চার রেখা বিশিষ্ট) নকশা অংকন করিলেন এবং উহার মাঝখানে আরেকটি রেখা টানিলেন। যাহা ঐ চতুর্ভুজ নকশা হইতে বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। অতঃপর ঐ চতুর্ভুজ নকশার ভিতরে ছোট ছোট রেখা বানাইলেন। উলামায়ে কেরাম এই নকশাকে বিভিন্নভাবে দেখাইয়াছেন। তন্মধ্যে এই নকশাটি স্পষ্ট :



তারপর ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই মাঝের রেখাটি হইল মানুষ, আর যে রেখা (চতুর্ভুজ) ইহাকে চতুর্দিক হইতে বেঁটন করিয়া রহিয়াছে, উহা হইল মানুষের মৃত্যু। অর্থাৎ মানুষ ইহা হইতে বাহির হইতেই পারে না। আর যে রেখা বাহিরের দিকে অতিক্রম করিয়া

গিয়াছে, উহা তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষা। অর্থাৎ নিজের জীবনের চেয়েও আগে বাড়িয়া আশা-আকাঙ্ক্ষা করিয়া বসিয়াছে। এই ছোট ছোট রেখা যাহা উহার দুই পার্শ্বে রহিয়াছে, উহা তাহার রোগ-শোক, দুর্ঘটনা ইত্যাদি, যাহা তাহার দিকে ফিরিয়া রহিয়াছে। প্রত্যেক ছোট রেখা একেকটি বিপদ, যদি একটি হইতে বাঁচিয়া যায়, তবে দ্বিতীয়টি রহিয়াছে। আর মৃত্যুর মাঝখানে তো সে বেষ্টিত রহিয়াছেই। কেননা, মৃত্যু চতুর্দিক হইতে তাহাকে বেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু আশা-আকাঙ্ক্ষার রেখা মৃত্যুকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে।

অন্য এক হাদীসে ছযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার মাথা মুবারকের পিছনের অংশের উপর নিজের হাত মুবারক রাখিয়া বলিলেন, ইহা তো মানুষের মৃত্যু, যাহা তাহার মাথার উপর সবসময় চাপিয়া রহিয়াছে। অতঃপর দ্বিতীয় হাতটি দূর পর্যন্ত প্রসারিত করিয়া এরশাদ করিলেন—ঐ দূর পর্যন্ত তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষা যাইতেছে।

এক হাদীসে ছযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, এই উম্মতের কল্যাণের সূচনা আখেরাতের প্রতি একীন এবং দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তির দ্বারা হইয়াছে। আর উহার ধ্বংসের সূচনা সম্পদের ব্যাপারে কৃপণতা ও দীর্ঘ আশা-আকাঙ্ক্ষার দ্বারা হইবে। (মিশকাত)

অন্য এক হাদীসে ছযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এই উম্মতের প্রথম অংশ আল্লাহ তায়ালায় প্রতি একীন এবং দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তির দ্বারা নাজাত পাইয়াছে এবং উহার শেষ অংশের ধ্বংস কার্পণ্য ও আশা-আকাঙ্ক্ষার কারণে হইবে।

এক হাদীসে ছযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে যে, অতি শীঘ্র এমন জমানা আসিবে ; মানুষ তোমাদের (অর্থাৎ মুসলমানদের)কে খাইয়া ফেলিবার জন্য একে অপরকে এমনভাবে দাওয়াত দিবে, যেমন খাওয়ার দস্তুরখানে বসিয়া একে অপরকে আপ্যায়ন করে (অর্থাৎ প্রত্যেক সম্প্রদায় অন্যদেরকে এই বিষয়ে উৎসাহিত করিবে এবং আহবান জানাইবে যে, এই মুসলমানদেরকে কোন রকমে আগে ধ্বংস করিয়া দাও)।

সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! তখন কি আমাদের সংখ্যা অনেক কম থাকিবে? (যাহার কারণে কাফেরদের এই দুঃসাহস হইবে।) ছযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, না, তোমাদের সংখ্যা ঐ জমানায় অনেক বেশী হইবে ; কিন্তু তোমরা ঐ জমানায় বন্যার পানিতে ভাসমান ফেনার মত (একেবারে নিস্প্রাণ) হইবে,

তোমাদের দুশমনের অন্তর হইতে তোমাদের ভয় দূর হইয়া যাইবে এবং তোমাদের নিজেদের অন্তরে 'ওয়াহান' পয়দা হইয়া যাইবে। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! 'ওয়াহান' কি জিনিস? হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, দুনিয়ার মহব্বত ও মৃত্যুর ভয়। (মিশকাত)

হযরত ওমর (রাযিঃ) এর মেয়ে উম্মে ওলীদ (রাযিঃ) বলেন, একবার হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সজ্জার সময় বাহিরে তশরীফ আনিলেন এবং এরশাদ করিলেন, তোমাদের কি লজ্জা হয় না। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কি হইয়াছে। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তোমরা এত পরিমাণ জমা কর, যত পরিমাণ খাও না। তোমরা এত ঘরবাড়ী বানাও, যাহাতে তোমরা অবস্থানও কর না এবং এমন আশা আকাঙ্ক্ষা কর, যাহা পূরণও করিতে পার না—এই সমস্ত ব্যাপারে তোমাদের কি লজ্জা হয় না?

(তারগীব)

অর্থাৎ, প্রয়োজনের অতিরিক্ত বাড়ি-ঘর বানাও, অথচ বাড়ী-ঘর প্রয়োজন অনুযায়ী বানানো উচিত। এমনভাবে তোমরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ জমা করিতে থাক, অথচ উহা জমা করিবার জন্য নহে; বরং আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় খরচ করিবার জন্য।

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার মিস্বরে বসিয়াছিলেন এবং লোকজন সম্মুখে গোলাকার হইয়া বসিয়াছিল। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে লোকসকল! আল্লাহ তায়ালাকে তোমরা এইরূপ লজ্জা কর, যেইরূপ তাহাকে লজ্জা করার হক রহিয়াছে। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ তায়ালাকে তো আমরা লজ্জা করিয়াই থাকি। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে আল্লাহ তায়ালাকে লজ্জা করে, তাহার জন্য জরুরী হইল, কোন একটি রাত্রও যেন তাহার এইরূপ অতিবাহিত না হয় যে, মৃত্যু তাহার চোখের সামনে না থাকে। তাহার জন্য আরও জরুরী হইল যে, সে যেন হেফাজত করে নিজের পেটকে এবং ঐ জিনিসকে, যাহাকে তাহার পেট বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। আর সে যেন হেফাজত করে তাহার মাথাকে এবং ঐ জিনিসকে, যাহাকে তাহার মাথা বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। তাহার জন্য জরুরী হইল, মৃত্যুকে যেন স্মরণ রাখে এবং ইহাও স্মরণ রাখে যে, সে পঁচিয়া গলিয়া যাইবে (অর্থাৎ মৃত্যুর পর এই শরীর সম্পূর্ণ বিগলিত

হইয়া মাটি হইয়া যাইবে)। তাহার জন্য জরুরী হইল যে, দুনিয়ার চাকচিক্যকে যেন সে ছাড়িয়া দেয়। (তরগীব)

উলামায়ে কিরাম লিখিয়াছেন, মাথার হেফাজতের অর্থ এই যে, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কাহারও সম্মুখে ঝুঁকিবে না ; এবাদতের জন্যও নয় এবং কাহারও সম্মান প্রদর্শনের জন্যও নয়। এমনকি ঝুকিয়া সালামও করিবে না। আর যে সমস্ত জিনিসকে মাথা বেঁটন করিয়া রাখিয়াছে—ইহার অর্থ এই যে, চক্ষু, কান, জিহ্বা এই সমস্ত জিনিস মাথার অধীনে রহিয়াছে—এই সবগুলির হেফাজত করিবে। তেমনিভাবে, পেটকে হেফাজত করার অর্থ এই যে, সন্দেহযুক্ত মাল হইতে হেফাজত করিবে। আর যে জিনিসকে পেট বেঁটন করিয়া রাখিয়াছে—ইহার অর্থ ঐ সমস্ত জিনিস, যাহা পেটের কাছাকাছি রহিয়াছে, যেমন লজ্জাস্থান, হাত, পা এবং দিল। এই সবকিছুর হেফাজত করিবে।

ইমাম নবভী (রহঃ) বলেন, এই হাদীসকে অধিক পরিমাণে পড়া মুস্তাহাব। (মাজাহেরে হক)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার বলিয়াছেন, হে লোকসকল ! আল্লাহ তায়ালাকে এইরূপ লজ্জা কর, যে রূপ তাহার হক রহিয়াছে। আমরা আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আল্লাহ তায়ালা শোকর যে, আমরা সকলেই আল্লাহ তায়ালাকে লজ্জা করি। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, না, এইরূপ সাধারণ লজ্জা নয় ; বরং আল্লাহ তায়ালাকে লজ্জা করার হক হইল, মানুষ তাহার মাথার হেফাজত করিবে এবং ঐ জিনিসের হেফাজত করিবে, যাহাকে তাহার মাথা বেঁটন করিয়া রাখিয়াছে। আর পেটের হেফাজত করিবে এবং ঐ সমস্ত জিনিসের হেফাজত করিবে, যাহাকে পেট বেঁটন করিয়া আছে (অর্থাৎ লজ্জাস্থান ইত্যাদি)। আর জরুরী হইল, মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ করিবে এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাওয়া (অর্থাৎ মৃত্যুর পর সবকিছু চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া মাটি হইয়া যাওয়া)কে স্মরণ রাখিবে। যে ব্যক্তি আখেরাতের আগ্রহ রাখে, সে দুনিয়ার সাজ-সজ্জাকে ছাড়িয়া দেয়। (তরগীব)

যেহেতু অধিক পরিমাণে মৃত্যুর স্মরণ দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি সৃষ্টি করে এবং আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সংক্ষিপ্ত করে, সেহেতু হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ করিবার হুকুম করিয়াছেন।

এক ব্যক্তি হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির

হইল এবং আরজ করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সবচেয়ে বড় যাহেদ অর্থাৎ দুনিয়াত্যাগী কে? হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুকে এবং আপন মৃত্যুর পর গলিয়া পঁচিয়া যাওয়াকে না ভুলে। দুনিয়ার চাকচিক্যকে ছাড়িয়া দেয়, আখেরাতকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দেয়। আগামীকালের জীবনকে নিশ্চিত মনে না করে এবং নিজেকে মৃতদের মধ্যে গণ্য করে। (তরগীব) অর্থাৎ শীঘ্রই মৃত্যুবরণ করিয়া তাহাদের মধ্যে शामिल হইয়া যাইব—এই কথা মনে করে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন, এই সমস্ত স্বাদকে বিনষ্টকারী জিনিস অর্থাৎ মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ কর। যে ব্যক্তি অভাবের অবস্থায় উহাকে স্মরণ করে, ইহা তাহার জন্য সচ্ছলতা ও প্রশস্ততার কারণ হয় (অর্থাৎ এই নিশ্চিত্ত অবস্থা লাভ হয় যে, মৃত্যু সর্বাবস্থায় আসিবেই, উহার দ্বারা সমস্ত দুঃখ-কষ্ট শেষ হইয়া যাইবে)। আর যে ব্যক্তি সচ্ছল অবস্থায় মৃত্যুকে স্মরণ করে, উহা তাহার জন্য খরচাদি কম হইবার কারণ হয় (অর্থাৎ মৃত্যুর চিন্তায় বেশী আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসিতার ইচ্ছা হয় না)।

হযরত ওমর (রাযিঃ) হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করেন, দুনিয়ার যাবতীয় স্বাদ ও মজা বিনষ্টকারী জিনিস অর্থাৎ মৃত্যুর আলোচনা বেশী পরিমাণে করিতে থাক।

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, একবার হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তশরীফ আনিলেন, দেখিলেন—সাহাবায়ে কেরাম হাসিতেছেন। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যাবতীয় স্বাদ ধ্বংসকারী বস্তুকে বেশী বেশী স্মরণ রাখ। উহাকে যে ব্যক্তি সচ্ছলতার সময় স্মরণ করে, উহা তাহার জন্য সংকীর্ণতা আনয়ন করে। আর যে ব্যক্তি অভাব-অনটনের সময় উহাকে স্মরণ করে, তাহার জন্য সচ্ছলতা আনিয়া দেয়।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বলেন, একবার হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে আসিলেন। কিছুসংখ্যক লোকের হাসির কারণে দাঁত দেখা যাইতেছিল। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যদি তোমরা ভোগ-বিলাস ধ্বংসকারী মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ করিতে, তবে তাহা এইসব বিষয়ে মগ্ন হওয়া হইতে বিরত রাখিত, যাহার কারণে তোমাদের হাসি আসিয়াছে। প্রত্যেক ব্যক্তির কবর প্রতিদিন ঘোষণা করে যে, আমি একেবারে একাকীত্বের ঘর। আমি সকলের নিকট হইতে ভিন্ন থাকিবার ঘর। আমি পোকা-মাকড়ের ঘর, কীট-পতঙ্গের ঘর। যখন

নেককার মোমিন ব্যক্তিকে দাফন করা হয়, তখন কবর তাহাকে বলে, তোমার আগমন বড় বরকতময়। তোমার আগমানে বড় আনন্দ হইল। যত মানুষ আমার পিঠের উপর চলাফেরা করিত, তাহাদের মধ্যে তুমি আমার নিকট অনেক পছন্দনীয় ছিলে। আজ তুমি আমার অধীনে আসিয়াছ, আমি তোমার সহিত আমার আচরণ দেখাইব। অতঃপর সে এত প্রশস্ত হইয়া যায় যে, যতদূর মৃত ব্যক্তির দৃষ্টিসীমা ততদূর পর্যন্ত জমিন খুলিয়া যায় এবং একটি জানালা জান্নাতের দিক হইতে খুলিয়া যায়। (ফলে সেইখান হইতে জান্নাতের খুবু, জান্নাতের বাতাস ইত্যাদি আসিতে থাকে।) আর যখন কোন বদকার অথবা কাফেরকে দাফন করা হয়, তখন জমিন তাহাকে বলে, তোমার আগমন বড় অকল্যাণময় হইয়াছে, তোমার আসিবার কারণে মন খুবই খারাপ হইয়াছে, যত মানুষ আমার পিঠের উপর চলাফেরা করিত, তুই তাহাদের মধ্যে আমার নিকট খুবই অপছন্দনীয় ছিলি। আজ তুই আমার অধীনে আসিয়াছিস, এখন আমি আমার আচরণ তোকে দেখাইব। এই বলিয়া সে এমনভাবে মিলিয়া যায় অর্থাৎ তাহাকে চাপ দেয় যে, মৃত ব্যক্তির হাড় ও পাজরসমূহ একটি অপরটির মধ্যে ঢুকিয়া যায়। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাতের আঙ্গুলসমূহ অপর হাতের মধ্যে ঢুকাইয়া বলিলেন যে, এইভাবে একদিকের হাড় ও পাজর অপরদিকে ঢুকিয়া যায় এবং সম্ভবতঃ অঙ্গগত সাপ তাহাকে দংশন করিতে আরম্ভ করে। উহারা এত বিবাস্ত যে, যদি তন্মধ্যে একটিও জমিনের উপর শ্বাস ফেলে, তবে কিয়ামত পর্যন্ত জমিনে ঘাস উৎপন্ন হওয়া বন্ধ হইয়া যাইবে। উহারা সকলে তাহাকে কিয়ামত পর্যন্ত দংশন করিতে থাকিবে। অতঃপর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কবর হয়ত জান্নাতের বাগানসমূহ হইতে একটি বাগান অথবা দোযখের গর্তসমূহের একটি গর্ত।

হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সবচেয়ে বেশী বুद्धিমান এবং সবচেয়ে বেশী ইশিয়ার ব্যক্তি কে? হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ রাখে এবং মৃত্যুর জন্য সবসময় প্রস্তুতি গ্রহণে মনগুল থাকে। ইহারাই ঐ সমস্ত লোক, যাহারা দুনিয়ার ইচ্ছাত ও আখেরাতের সম্মান হাসিল করিল।

(জারগীব)

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) একবার একটি জানাযার সহিত গেলেন। কবরস্থানে পৌছিয়া আলাদা একটি জায়গায় বসিয়া কিছু

চিন্তা করিতে লাগিলেন। কেহ আরজ করিল, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি এই জানাযার ওলী বা অভিভাবক; আর আপনিই ভিন্ন বসিয়া গেলেন। ইহার কারণ কি? তিনি বলিলেন, হাঁ, আমাকে একটি কবর আওয়াজ দিয়াছে এবং বলিয়াছে, হে ওমর ইবনে আবদুল আযীয! তুমি আমাকে ইহা জিজ্ঞাসা কর না যে, আমি এই সমস্ত আগন্তুক লোকগুলির সহিত কি কি আচরণ করি? আমি বলিলাম, অবশ্যই বল। সে বলিল, তাহাদের কাফন ছিড়িয়া ফেলি, শরীর টুকরা টুকরা করিয়া দেই, সমস্ত রক্ত চুষিয়া লই, গোশত খাইয়া ফেলি। আরও বলিব কি আমি মানুষের শরীরের জোড়াগুলির সহিত কি আচরণ করি? কাঁধকে বাহু হইতে পৃথক করিয়া দেই, আর বাহুকে কনুই হইতে পৃথক করিয়া দেই। আর উরুকে শরীর হইতে পৃথক করিয়া দেই, আর নিতম্ব (পাছা)কে উরু হইতে পৃথক করিয়া দেই, রানকে হাঁটু হইতে এবং হাঁটুকে পায়ের গোড়া হইতে এবং পায়ের গোড়াকে পা হইতে পৃথক পৃথক করিয়া দেই। এই বলিয়া ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) কাঁদিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, দুনিয়ার স্থায়িত্ব অনেক সামান্য, উহার ধোকা অনেক বেশী। এইখানে যে প্রিয়, সে আখেরাতে অপদস্থ, এখানে যে ধনী, সে আখেরাতে দরিদ্র। এখানকার যুবক অতি শীঘ্র বৃদ্ধ হইয়া যাইবে, এখানকার জীবিত অনেক জলদি মরিয়া যাইবে। তোমাদের দিকে দুনিয়ার ঝুঁকিয়া পড়া যেন তোমাদিগকে বোকায় ফেলিয়া না দেয়। অথচ তোমরা দেখিতেছ যে, ইহা কত জলদি মুখ ফিরাইয়া লয়। বোকা ঐ ব্যক্তি, যে উহার ধোকায় ফাঁসিয়া যায়। কোথায় গিয়াছে তাহার ঐ সমস্ত প্রেমিকরা, যাহারা বড় বড় শহর আবাদ করিয়াছে, দীর্ঘ নহর খনন করিয়াছে, বড় বড় বাগান লাগাইয়াছে এবং সামান্য কিছুদিন থাকিয়া তাহারা সব ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। তাহারা নিজেদের স্বাস্থ্য ও সুস্থতার কারণে ধোকায় পড়িয়াছে। সুস্থাস্থ্যের কারণে আনন্দের উদ্রেক হইয়াছে; ফলে গুনাহের মধ্যে লিপ্ত হইয়াছে। আল্লাহর কসম! এইসব লোক দুনিয়াতে সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে ঈর্ষাযোগ্য ছিল। সম্পদ কামাই করার ব্যাপারে তাহারা বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও খুব সম্পদ কামাই করিত। তাহাদিগকে লোকেরা হিংসা করিত; কিন্তু তাহারা নিশ্চিন্ত মনে সম্পদ জমা করিতে থাকিত এবং ইহা জমা করিতে তাহারা সর্বপ্রকার কষ্ট আনন্দচিন্তে সহ্য করিত। কিন্তু এখন দেখিয়া লও যে, মাটি তাহাদের শরীরের কি অবস্থা করিয়া দিয়াছে। মাটি তাহাদের দেহকে কোথায় পৌছাইয়াছে, কীট-পতঙ্গ তাহাদের জোড়া এবং হাড়গুলির কি অবস্থা করিয়াছে। তাহারা দুনিয়াতে উচু উচু পালকে, উচু

উচু বিছানায় এবং নরম নরম গদির উপর চাকর-নওকর পরিবেষ্টিত অবস্থায় আরাম করিত। প্রিয়জন, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী সবসময় তাহাদের মনোরঞ্জনের জন্য প্রস্তুত থাকিত। কিন্তু এখন কি হইতেছে? ডাকিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তাহাদের উপর দিয়া কি অবস্থা অতিক্রম করিতেছে। ধনী-গরীব সবাই এক ময়দানে পড়িয়া রহিয়াছে। তাহাদের সম্পদশালীদেরকে জিজ্ঞাসা কর, তাহাদের সম্পদ কি কাজে আসিয়াছে। তাহাদের দরিদ্র লোকদেরকে জিজ্ঞাসা কর, তাহাদের দরিদ্রতা কি ক্ষতি করিয়াছে, তাহাদের জিহ্বার অবস্থা জিজ্ঞাসা কর, যাহা অনেক স্বাদ গ্রহণ করিত। তাহাদের চোখগুলিকে দেখ, যাহা সর্বদিকে দৃষ্টি করিত, তাহাদের তুলতুলে শরীরের চামড়ার অবস্থা জিজ্ঞাসা কর, তাহাদের সুশ্রী এবং মনোহারী চেহারার অবস্থা জিজ্ঞাসা কর—কি হইয়াছে। তাহাদের নাজুক শরীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর—কোথায় গেল এবং কীট-পতঙ্গ ঐগুলির কি অবস্থা করিয়াছে। তাহাদের রং কালো করিয়া দিয়াছে। তাহাদের গোশত খাইয়া ফেলিয়াছে, তাহাদের মুখে মাটি ঢালিয়া দিয়াছে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে। শরীরের জোড়াসমূহকে ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। হায়! কোথায় তাহাদের ঐ সমস্ত খাদেমের দল, যাহারা সবসময় 'জ্বি হুয়ুর; হাজির আছি' বলিত। কোথায় তাহাদের ঐ সমস্ত তাঁবু এবং কামরা, যাহার মধ্যে তাহারা আরাম করিত, কোথায় আছে তাহাদের ঐ সমস্ত মাল ও সঞ্চিত ধন, যেইগুলিকে জমাইয়া জমাইয়া রাখিত। তাহাদের খাদেমগণ তাহাদিগকে কবরে খাওয়ার জন্য কোন দানা-পানিও দেয় নাই এবং তাহাদের কবরে কোন বিছানাও বিছাইয়া দেয় নাই। কোন বালিশও রাখে নাই, জমিনের উপরেই শোয়াইয়া দিয়াছে। কোন বৃক্ষ, ফুল ও ফুলের বাগান লাগাইয়া দেয় নাই। হায়! এখন তাহারা একেবারে একাকী পড়িয়া রহিয়াছে। অন্ধকারে পড়িয়া আছে। তাহাদের জন্য এখন রাত্রদিন বরাবর। বন্ধুদের সহিত সাক্ষাত করিতে পারে না, কাহাকেও নিজের নিকট ডাকিতে পারে না। কত নাজুক দেহের অধিকারী পুরুষ, নাজুক শরীরের অধিকারী নারী—আজ তাহাদের শরীর পচিয়া গিয়াছে। তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একটি হইতে অপরটি পৃথক হইয়া গিয়াছে। চক্ষু বাহির হইয়া মুখের উপর পড়িয়া গিয়াছে, ঘাড় বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। মুখের ভিতর পানি, পুঁজ ইত্যাদি ভরিয়া রহিয়াছে। সমস্ত শরীরে পোকা-মাকড় চলিতেছে, তাহারা এই অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে এবং তাহাদের স্ত্রীগণ অন্য বিবাহ করিয়া লইয়াছে। তাহারা মজা উড়াইতেছে, সন্তানগণ বাড়ী-ঘর দখল করিয়া লইয়াছে।

উত্তরাধিকারীগণ মাল বন্টন করিয়া লইয়াছে।

পক্ষান্তরে, কিছু ভাগ্যবান এমনও আছে, যাহারা নিজেদের কবরে আনন্দ-উল্লাস করিতেছে। তরুতাজা চেহারার সহিত আরাম-আয়েশে রহিয়াছে (কিন্তু ইহারা ঐ সমস্ত লোক যাহারা এই ধোকার ঘরে থাকিয়াও আখেরাতের ঘরকে স্মরণ রাখিয়াছে। এখানকার আশা-আকাঙ্ক্ষার উপরে আখেরাতের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রাধান্য দিয়াছে এবং নিজেদের জন্য পাথেয় জমা করিয়াছে। নিজেদের পৌছার পূর্বেই সামান-পত্র সেখানে পাঠাইয়া দিয়াছে)।

হে ঐ ব্যক্তি! যে আগামীকাল কবরে অবশ্যই যাইবে। তোমাকে এই দুনিয়ার ব্যাপারে কোন্ জিনিস ধোকায় ফেলিয়া রাখিয়াছে। তুমি কি এই আশা কর যে, এই হতভাগা দুনিয়া তোমার সহিত থাকিবে। তুমি কি আশা কর যে, তুমি এই বিদায়ের কালে ঘরে সবসময় থাকিবে। তোমার এই প্রশস্ত বাড়ী তোমার বাগানসমূহের পাকা পাকা ফল, তোমার নরম বিছানা, তোমার শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন পোশাক-আশাক—এই সবকিছু এক মুহূর্তে ছাড়িয়া যাইতে হইবে। যখন মৃত্যুর ফেরেশতা আসিয়া চাপিয়া বসিবে, কোন জিনিস তাহাকে সরাইতে পারিবে না। ঘামের পর ঘাম আসিতে শুরু হইবে, পিপাসা কঠিন হইতে কঠিন হইবে। মৃত্যু যাতনায় এপাশ-ওপাশ করিতে থাকিবে। আফসোস, শত আফসোস হে ঐ ব্যক্তি! যে আজকে মৃত্যুর সময় আপন ভাইয়ের চক্ষু বন্ধ করিতেছ। নিজের পুত্রের চক্ষু বন্ধ করিতেছ, আপন সন্তানের চক্ষু বন্ধ করিতেছ, তাহাদের মধ্য হইতে কাহাকেও গোসল করাইতেছ, কাহাকেও কাফন পরাইতেছ, কাহারও জানাযার সহিত যাইতেছ, কাহাকেও কবরের গর্তে রাখিতেছ—কাল এইসব অবস্থা তোমারও দেখা দিবে।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) এই ধরনের আরও অনেক কথা বলিয়াছেন। অতঃপর তিনি দুইটি কবিতা পড়িলেন, যাহার অর্থ এই—মানুষ এমন জিনিস লইয়া খুশী হয়, যাহা অতি শীঘ্রই ধ্বংস হইয়া যাইবে এবং দুনিয়ার দীর্ঘ আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে মশগুল থাকে। হে নির্বোধ! স্বপ্নে দেখা স্বাদ-আহলাদের ধোকায় পড়িতে নাই, তোমার সমস্ত দিন গাফলতির মধ্যে কাটিয়া যায়, সমস্ত রাত ঘুমের মধ্যে কাটিয়া যায়, মৃত্যু তোমার উপর সওয়ার হইয়া রহিয়াছে। আজ তুমি এমন কাজ করিতেছ, যাহার কারণে কাল তুমি আফসোস করিবে। দুনিয়াতে চতুর্দশ জন্তরা এইরূপ জীবন যাপন করে, যেমন তুমি জীবন যাপন করিতেছ।

বর্ণিত আছে যে, এই ঘটনার পর এক সপ্তাহও অতিবাহিত হয় নাই;

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রাযিঃ) মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হউন এবং তাঁহাকে সন্তুষ্ট করুন। (মুসামারাত)

হযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, চারটি জিনিস দুর্ভাগ্যের আলামত। এক—চক্ষু শুষ্ক হওয়া (অর্থাৎ নিজের গুনাহ এবং আখেরাতের কোন বিষয়ের উপর মোটেই কান্না না আসা)। দুই—অন্তর শক্ত হওয়া। তিন—আশা-আকাঙ্ক্ষা দীর্ঘ হওয়া। চার—দুনিয়ার লোভ।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বলেন, হযরত উসামা (রাযিঃ) একটি বাঁদী বাকীতে খরিদ করিলেন এবং একমাস পর মূল্য আদায় করিবেন বলিয়া ওয়াদা করিলেন। হযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জানিতে পারিলেন, তখন এরশাদ করিলেন, কত আশ্চর্যের কথা যে, উসামা এক মাসের ওয়াদার উপর বাকী খরিদ করিয়াছে। উসামারও (নিজের জিন্দেগীর ব্যাপারে) বড় লম্বা আশা রহিয়াছে (যেন তাহার এই বিশ্বাস হইয়া গিয়াছে যে, সে এক মাস তো জিন্দা থাকিবেই)। ঐ মহান সন্তার কসম! যাহার হাতে আমার জান, আমার চোখের পলক পরিমাণ সময়ও বাঁচিবার একীন হয় না। আমি যখন পানি পান করিবার জন্য পাত্র উঠাই, তখন উহা রাখা পর্যন্তও আমার বাঁচিবার একীন হয় না। যখন কোন লোকমা খাই, তখন মৃত্যুর আগে আগে উহা গিলিতে পারিব বলিয়া একীন হয় না। ঐ পবিত্র সন্তার কসম! যাহার কঙ্জায় আমার জান। তোমাদের সহিত যে সমস্ত জিনিসের ওয়াদা করা হইয়াছে (মৃত্যু, কিয়ামত, হিসাব ইত্যাদি), সব জিনিস অবশ্যই আসিবে। আর তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে অপারগও করিতে পারিবে না (যে, তিনি কোন কাজ করিতে ইচ্ছা করিবেন; আর অন্য কেহ উহাতে বাধা সৃষ্টি করিবে)।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বলেন, একবার হযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাঁধ ধরিয়া এরশাদ করিলেন, দুনিয়াতে এইভাবে জীবনযাপন কর—যেমন কোন মুসাফির, কোন পথিক। আর সবসময় নিজেকে কবরবাসীদের মধ্যে মনে কর। অতঃপর হযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, হে ইবনে ওমর! (কোন কোন বর্ণনায় রহিয়াছে যে, সামনের কথাটি হযরত ইবনে ওমর নিজে বলিয়াছেন) যখন সকাল হইয়া যায়, তখন সন্ধ্যা পর্যন্ত বাঁচিবার একীন করিও না। যখন সন্ধ্যা হইয়া যায়, তখন সকাল পর্যন্ত বাঁচিবার আশা করিও না। নিজের সুস্থ অবস্থায় অসুস্থ সময়ের জন্য নেক আমল করিয়া রাখ (যাহাতে অসুস্থতার সময়ে যে ক্রটি বিচ্যুতি হইবে, উহার

ক্ষতিপূরণ আগে হইতেই হইয়া যায়। অথবা সুস্থ অবস্থায় যেসব আমলের অভ্যাস থাকিবে, অসুস্থ অবস্থায় সেইগুলি করিতে না পারিলেও উহার সওয়াব লাভ হইবে।) মৃত্যুর জন্য জীবন থাকিতেই প্রস্তুতি গ্রহণ কর। জানা নাই, কাল তোমার নাম কি হইবে (তুমি কাহাদের মধ্যে গণ্য হইবে, নেক লোকদের মধ্যে নাকি বদ লোকদের মধ্যে **فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ**)।

হযরত মুআয (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে কিছু নসীহত করিয়া দিন। ছযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আল্লাহ তায়ালা এবাদত এমনভাবে কর—যেন তুমি তাহাকে দেখিতেছ; তিনি তোমার সম্মুখে আছেন। নিজেকে সবসময় মৃতদের তালিকায় গণ্য করিতে থাক। প্রতিটি পাথর ও বৃক্ষের নিকট আল্লাহ তায়ালা যিকির করিতে থাক। (যাহাতে কিয়ামতের দিন উহার সাক্ষ্য প্রদানকারী অনেক বেশী হইয়া যায়।) আর যখন কোন অন্যায় কিছু হইয়া যায়, তখন উহার ক্ষতিপূরণের জন্য কোন নেক আমল করিয়া লও। যদি অন্যায় গোপনে করিয়া থাক, তবে উহার ক্ষতিপূরণ নেক আমলের মাধ্যমে গোপনেই কর। আর যদি অন্যায় প্রকাশ্যে হইয়া থাকে, তবে উহার তওবা ও ক্ষতিপূরণও প্রকাশ্যে যেন করা হয়।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) ছযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন যে, কিয়ামত তো নিকটে আসিয়া যাইতেছে আর মানুষ দুনিয়ার মোহে এবং আল্লাহ তায়ালা হইতে দূরে সরিয়া যাওয়ার মধ্যে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। (তারগীব)

ছযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার বাহিরে আসিলেন এবং এরশাদ করিলেন, তোমাদের মধ্য হইতে কোন ব্যক্তি কি ইহা চাহে যে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে শিক্ষা ব্যতীত এলেম দান করেন এবং কাহারও পথ দেখান ব্যতীত হেদায়াত দান করেন? তোমাদের মধ্যে কেহ এমন আছে কি, যে ইহা চায় যে, আল্লাহ তায়ালা তাহার অন্ধত্ব দূর করিয়া তাহার (অন্তরের) দৃষ্টি খুলিয়া দেন? যদি এইরূপ চাও, তবে বুঝিয়া লও, যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত হয় এবং নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা সংক্ষিপ্ত রাখে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে শিক্ষা ছাড়া এলেম দান করেন এবং কাহারও পথ দেখান ছাড়া নিজেই হেদায়াত দান করেন।

(দুররে মানসুর)

এই হাদীস পূর্বেও বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। হযরত জাবের (রাযিঃ) ছযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন যে, আমার আপন উম্মতের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী এই ভয় হয় যে, তাহাদের

খাহেশাত অধিক হইবে ও আশা-আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাইবে। খাহেশাত আল্লাহ তায়ালা হইতে হটাইয়া দেয় এবং লম্বা লম্বা আশা আখেরাতকে ভুলাইয়া দেয়। এই দুনিয়াও চলন্ত অবস্থায় রহিয়াছে এবং প্রতিদিন দূরে সরিতেছে। পক্ষান্তরে, আখেরাতও চলন্ত রহিয়াছে এবং প্রতিদিন নিকটতর হইতেছে। (অর্থাৎ প্রতি মুহূর্তে জীবন কমিয়া আসিতেছে এবং মৃত্যু নিকটবর্তী হইতেছে। কবি বলেন—

غافل تجھے گمراہی دیتا ہے منادی
گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گمناوی

অর্থাৎ, হে গাফেল, ঘড়ি-ঘন্টা তোমাকে আওয়াজ দিয়া বলিতেছে— সময়ের ঘূর্ণন তোমার জীবনের আর একটি মুহূর্ত কমাইয়া দিল। ঘন্টার আওয়াজ যদি মনোযোগ সহকারে শোনা হয়, তবে বাস্তবিকই মনে হয়—যেন সে বলিতেছে, ‘ঘটা দি, ঘটা দি’ অর্থাৎ কমাইয়া দিয়াছি, কমাইয়া দিয়াছি।

অতঃপর হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দুনিয়া ও আখেরাত প্রত্যেকটির এই দুনিয়াতে কিছু সুপুত্র (অর্থাৎ বাধ্যগত লোক) রহিয়াছে। তোমরা দুনিয়ার সুপুত্র না হইতে চেষ্টা করিও (বরং আখেরাতের সুপুত্র হইও)। আজ আমলের (এবং ফসল বপন করিবার) দিন ; আজ হিসাব নাই, কাল তোমরা আখেরাতের ঘরে থাকিবে। যেখানে আমল নাই, (বরং ফসল কাটিবার এবং বিনিময় নেওয়ার দিন) (মিশকাত)

হযরত সালমান ফারসী (রাযিঃ) বলেন, তিন ব্যক্তি এমন, যখন তাহাদের কথা আমার মনে পড়ে, তখন এত আশ্চর্য লাগে যে, আমার হাসি আসিতে থাকে। এক—ঐ ব্যক্তি, যে দুনিয়াতে আশা-আকাঙ্ক্ষা করিয়া বসিয়া রহিয়াছে ; অথচ মৃত্যু তাহার ফিকিরে রহিয়াছে। দ্বিতীয়—ঐ ব্যক্তি, যে (আল্লাহ তায়ালা হইতে গাফেল ; অথচ আল্লাহ তায়ালা সেই ব্যক্তি হইতে গাফেল নহেন। তৃতীয়—ঐ ব্যক্তি, যে মুখ ভরিয়া (খিলখিল করিয়া) হাসে ; অথচ তাহার খবর নাই যে, আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি সন্তুষ্ট না অসন্তুষ্ট। (কারণ, ইহা এমন একটি চিন্তার বিষয় যে, কখনও হাসি আসা উচিত নয়।)

আরও তিনটি জিনিস এমন রহিয়াছে, যাহা আমাকে সবসময় চিন্তাযুক্ত করিয়া রাখে। এমনকি আমি কাঁদিতে আরম্ভ করি। এক—বন্ধুদের বিচ্ছেদ (অর্থাৎ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং

সাহাবায়ে কেবামের বিচ্ছেদ)। দুই—মৃত্যুর চিন্তা। তিন—হাশরের ময়দানে আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে দাঁড়াইতে হইবে। জানা নাই—আমার জন্য জাহান্নামের ভুকুম হইবে, না জাহান্নামের ভুকুম হইবে।

এক ব্যক্তি বলেন, আমি যুরারাহ ইবনে আওফা (রাযিঃ)কে তাহার ইন্তেকালের পর স্বপ্নে দেখিলাম। তাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সবচেয়ে বড় আমল কোনটি? তিনি বলিলেন, তাওয়াক্কুল এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা সংক্ষিপ্ত করা।

হযরত সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) বলেন, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সংক্ষিপ্ত করার নামই হইল, যুহুদ বা দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি। মোটা খাবার ও জুব্বা পরিধান করার নাম নয়।

হযরত দাউদ তায়ী (রহঃ) বলেন, আমি যদি এই আশা রাখি যে, এক মাস বাঁচিয়া থাকিব, তবে আমি আমাকে বড় অপরাধী মনে করি। আর এই আশা কিভাবে করিতে পারি ; অথচ আমি দেখিতেছি যে, নিত্যদিন ; কখনও রাত্রে কখনও দিনে দুঘটনা লোকদেরকে পাকড়াও করিয়া লইতেছে।

হযরত শাকীক বলখী (রহঃ) তাহার উস্তাদ আবু হাশেম রুম্মানী (রহঃ)এর খেদমতে হাজির হইলেন। তিনি দেখিলেন, তাহার চাদরের এক কোণায় কিছু বাঁবা রহিয়াছে। আবু হাশেম জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি? তিনি আরজ করিলেন, আমার এক বন্ধু কয়েকটি বাদাম দিয়াছিল। আমার মন চাহিতেছে যে, আজকে সন্ধ্যায় আপনি ইহা দ্বারা ইফতার করিয়া লইবেন। আবু হাশেম বলিলেন, হে শাকীক ! তোমার কি এই আশা আছে যে, তুমি রাত্র পর্যন্ত জিন্দা থাকিবে? (আমি তোমাকে এইরূপ মনে করিতাম না, এখন) আমি তোমার সহিত কখনও কথা বলিব না। এই বলিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন এবং দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

কা'কা' ইবনে হাকীম (রহঃ) বলেন, আমি ত্রিশ বৎসর যাবত সবসময় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত রহিয়াছি। যদি আসিয়া যায়, তখন যেন সামান্য সময়ও আমার দেবী করার خواهশ না হয়।

সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) বলেন, আমি কুফার মসজিদে একজন বুয়ুর্গ লোক দেখিয়াছি। তিনি বলিতেন, আমি ত্রিশ বৎসর যাবত এই মসজিদে সবসময় মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছি। যদি মৃত্যু আসিয়া যায়, তবে আমার না কাহাকেও কিছু বলিবার আছে, আর না কাহারও কিছু শুনিবার আছে। না আমার কাহারও নিকট কিছু চাহিবার আছে, না কাহারও আমার নিকট কিছু চাহিবার আছে।

আবু মুহাম্মদ যাহেদ (রহঃ) বলেন, আমি একটি জানাযার সহিত যাইতেছিলাম। হযরত দাউদ তায়ী (রহঃ)ও সাথে ছিলেন। কবরস্থানে পৌঁছিয়া তিনি একটি নিরিবিলি জায়গায় বসিয়া গেলেন। আমিও তাহার নিকট বসিয়া গেলাম। তিনি বলিতে লাগিলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালায় ধমকি ও সতর্কবাণীকে ভয় করে, তাহার জন্য দূরের সফর (অর্থাৎ আখেরাতের সফর) সহজ হয়। আর যে ব্যক্তির লম্বা আশা থাকে, তাহার আমল নিস্তেজ হইয়া যায়। আর যে জিনিস অবশ্যই আসিবে (অর্থাৎ মৃত্যু) উহা নিকটবর্তী। ভাই একটি কথা বুঝিয়া লও, যে কোন জিনিস তোমাকে তোমার প্রতিপালক হইতে ফিরাইয়া নিজের মধ্যে মশগুল করিয়া লয়, উহা অমঙ্গলজনক। একটি কথা শোন, যত মানুষ দুনিয়াতে রহিয়াছে, সকলেরই কবরে যাইতে হইবে। তখন তাহাদের ঐ জিনিসের জন্য আফাসোস হইবে, যাহা এখানে ছাড়িয়া গিয়াছে এবং ঐ জিনিসের জন্য আনন্দ হইবে, যাহা সম্মুখে পাঠাইয়া দিয়াছে। আর যে জিনিসের উপর মৃত্যুবরণকারী লজ্জিত হয়, উহা লইয়া ওয়ারিসগণ ঝগড়া-ফাসাদ ও মামলা-মোকদ্দমা করে। (এহইয়া)

ফকীহ আবুল লাইস সমরকন্দী (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আশা আকাঙ্ক্ষাকে সংক্ষিপ্ত রাখে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে চার প্রকার সম্মানে ভূষিত করেন। এক—এবাদত-বন্দেগীর উপর তাহাকে শক্তি দান করেন। আর যখন তাহার মৃত্যু নিকটবর্তী হওয়ার একীন হয়, তখন আমলের প্রতি তাহার চেষ্টা বাড়িয়া যায় এবং অপছন্দনীয় বিষয়সমূহ দ্বারা প্রভাবিত হয় না। দুই—তাহার দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী কমিয়া যায়। তিন—সামান্য রুজি-রোজগারের উপর সন্তুষ্ট হইয়া যায়। চার—তাহার অন্তরকে আলোকিত করিয়া দেওয়া হয়।

ওলামায়ে কেরাম বলিয়াছেন, চারটি জিনিসের দ্বারা দিলে নূর পয়দা হয়। এক—খালি পেট থাকার দ্বারা। দুই—নেক মানুষের নিকট থাকার দ্বারা। তিন—অতীতের গুনাহগুলিকে স্মরণ করা (এবং উহার জন্য লজ্জা অনুভব করা) দ্বারা। চার—আশা-আকাঙ্ক্ষা সংক্ষিপ্ত করার দ্বারা।

আর যে ব্যক্তির আশা-আকাঙ্ক্ষা দীর্ঘ হয়, তাহাকে আল্লাহ তায়ালা চার প্রকারের আজাবে লিপ্ত করিয়া দেন। এক—এবাদতের মধ্যে অলসতা পয়দা হইয়া যায়। দুই—দুনিয়ার চিন্তা বেশী হইয়া যায়। তিন—সম্পদ জমা করার এবং বৃদ্ধি করার চিন্তা সবসময় চাপিয়া থাকে। চার—অন্তর শক্ত হইয়া যায়।

ওলামায়ে কেরাম লিখিয়াছেন, চারটি জিনিসের কারণে অন্তর শক্ত

হইয়া যায়। এক—বেশী পেট ভরিয়া খাওয়ার দ্বারা। দুই—খারাপ সঙ্গ দ্বারা। তিন—গুনাহসমূহকে স্মরণ না করার দ্বারা। চার—আশা-আকাঙ্ক্ষা দীর্ঘ করার দ্বারা। এইজন্য জরুরী যে, মানুষ যেন লম্বা লম্বা আশা কখনও না বাঁধে। সবসময় এই চিন্তা থাকা উচিত যে, নাজানি কোন নিঃশ্বাসটি জীবনের শেষ নিঃশ্বাস হইয়া যায় (অর্থাৎ নাজানি কোন মুহূর্তে হৃদয়ের নড়াচড়া বন্ধ হইয়া যায়)।

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা (রাযিঃ)কে এরশাদ করিয়াছেন, যদি তুমি (কিয়ামতের দিন) আমার সঙ্গে থাকিতে চাও, তবে দুনিয়াতে এইভাবে জীবন কাটাইয়া দাও—যেমন মুসাফির সওয়ারীর পিঠে আরোহণ করিয়া চলিবার পথে কোথাও সামান্য সময় বিরতি গ্রহণ করিল। আর মালদারদের সহিত উঠাবসা হইতে বাঁচিয়া থাক। পোশাককে ঐ পর্যন্ত পরিত্যাগ করিও না, যতক্ষণ পর্যন্ত উহাতে তালি না লাগিয়া যায়।

আবু উসমান নাহদী (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর (রাযিঃ)কে মিম্বরের উপর খোতবা পাঠ করিতে দেখিয়াছি। তখন তাঁহার পরিহিত জামায় বারটি তালি লাগান ছিল। (তাম্বীহুল গাফেলীন)

① عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَ وَجُلٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دُلْنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتَهُ أَحْبَبَنِي اللَّهُ وَأَحْبَبَنِي النَّاسُ قَالَ انْهَدُ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللَّهُ وَأَزْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ. (رواه الترمذی وابن ماجه هكذا في المشکوٰۃ)	ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس سے اللہ جل شہ بھی مجھ سے محبت فرمادیں اور آدمی بھی مجھ سے محبت کرنے لگیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ دنیا سے بے رغبتی پیدا کر جو حق تعالیٰ شہ تم کو محبوب رکھیں گے اور لوگوں کو تم سے جو چیزیں ہیں (مال وغیرہ) ان سے بے رغبتی پیدا کر لو، وہ بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے۔

① এক সাহাবী আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে এমন কোন আমল বলিয়া দিন, যাহার দ্বারা আল্লাহ তায়ালাও আমাকে মহব্বত করেন এবং মানুষও আমাকে মহব্বত করিতে আরম্ভ করে। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, দুনিয়ার ব্যাপারে

অনাসক্তি পয়দা করিয়া লও। আল্লাহ তায়ালা তোমাকে মহব্বত করিবেন, আর মানুষের নিকট যাহাকিছু আছে (সম্পদ ইত্যাদি) উহার প্রতি অনাগ্রহ পয়দা করিয়া লও ; তাহারাও তোমাকে মহব্বত করিতে আরম্ভ করিবে।

(মিশকাত : তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

ফায়দা : দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তির কারণে আল্লাহ তায়ালা মহব্বত, আখেরাতের সম্মান ও পুরস্কার ইত্যাদির বিষয় তো প্রথমে উল্লেখিত রেওয়াযাতসমূহের মধ্যে অনেক বেশী পরিমাণে বর্ণিত হইয়াছে। আর দ্বিতীয় বিষয়টি অর্থাৎ মানুষের সম্পদের প্রতি দৃষ্টি না রাখা—ইহার দ্বারা মানুষের অন্তরেও মহব্বত পয়দা হয়। ইহা অত্যন্ত অভিজ্ঞতার বিষয়। প্রত্যেক ব্যক্তি সবসময় এই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া থাকে যে, পরস্পর যতই ভাল সম্পর্ক থাকুক না কেন, যখনই কোন জিনিস চাওয়া হয়, তখনই সমস্ত সম্পর্ক এবং ভালবাসা খতম হইয়া যায়।

হযরত জিবরাঈল (আঃ) একবার ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন এবং বলিলেন, হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ! আপনি যতদিনই জীবিত থাকুন না কেন ; মৃত্যু অবশ্যই একদিন আসিবে। আর যে আমলই আপনি করিবেন (ভাল অথবা মন্দ), উহার বদলা অবশ্যই পাইবেন। আর যাহার সহিতই আপনি (দুনিয়াতে) সম্পর্ক গড়িয়া তুলুন, তাহার নিকট হইতে একদিন পৃথক হইতে হইবে (তাহার মৃত্যুর কারণে হউক বা নিজের মৃত্যুর কারণে হউক)। ইহা উত্তমরূপে বুঝিয়া লউন যে, মানুষের বুয়ুর্গী তাহাজ্জুদ নামাযে, মানুষের ইজ্জত লোকদের প্রতি মুখাপেক্ষী না হওয়ার মধ্যে রহিয়াছে। (তরগীব)

অর্থাৎ, মানুষের ইজ্জত ঐ সময় পর্যন্ত রহিয়াছে, যতক্ষণ অন্য লোকদের জিনিস-পত্রের প্রতি দৃষ্টি না যাইবে। আর যখনই অন্যের মালের প্রতি দৃষ্টি পড়িল, তখনই সমস্ত ইজ্জত মাটির সঙ্গে মিশিয়া গেল।

হযরত উরওয়া (রাযিঃ) বলেন, যখন তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি দুনিয়ার সৌন্দর্য ও চাকচিক্যের প্রতি দেখে (এবং উহা ভাল লাগে), তখন তাহার উচিত—সে যেন নিজের ঘরে যাইয়া পরিবারের লোকদিগকে নামাযে মশগুল করিয়া দেয়। কারণ, আল্লাহ তায়ালা আপন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে এরশাদ করিয়াছেন : لَا تَمْدَنَّ عَنْ يَمِينِكَ الْإِبْرَاهِيمَ অর্থাৎ, কখনও নিজের চক্ষু উঠাইয়াও দেখিবেন না ঐ সমস্ত জিনিসের প্রতি, যাহা আমি এই দুনিয়াদারদেরকে দিয়া রাখিয়াছি। উদ্দেশ্য হইল, আমি তাহাদিগকে এই সমস্ত জিনিস দ্বারা পরীক্ষা করিব।

ইহা কেবল পার্থিব জীবনের চাকচিক্য মাত্র। আর আপনার প্রতিপালকের দান যাহা আশ্বেরাতে পাওয়া যাইবে, উহা ইহা হইতে অনেক গুণে উত্তম এবং চিরস্থায়ী হইবে। আর নিজের অধীনস্থদেরকে আপনি নামাযের হুকুম করুন। নিজেও নিয়মিত উহার পাবন্দী করুন। (ত্বা-হা : ১৩১) (দুররে মানসুর)

অন্য আয়াতে এরশাদ হইয়াছে : لَا تَمُدَّنْ عَيْنَكَ إِلَىٰ ۙ অর্থাৎ, আপনি চক্ষু উঠাইয়াও দেখিবেন না, ঐ (চাকচিক্যময়) জিনিসের প্রতি যাহা আমি বিভিন্ন লোকদেরকে দিয়া রাখিয়াছি। (হিজ্র : ৮৮)

এই আয়াতের তফসীরে হযরত সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা কুরআন পাকের নেয়ামত দ্বারা ভূষিত করিয়াছেন, তারপরও যদি সে দুনিয়ার কোন জিনিসের প্রতি দৃষ্টি উঠাইয়া দেখে, তবে সে কুরআন পাককে অনেক কম মনে করিল (অর্থাৎ উহার কদর করিল না)।

ইমাম গায়যালী (রহঃ) বলেন, দারিদ্র অনেক প্রশংসিত জিনিস ; কিন্তু শর্ত হইল, দরিদ্র ব্যক্তি যেন অল্পে তুষ্ট হয়। মানুষের নিকট যে সমস্ত ধন-সম্পদ আছে, উহার প্রতি যেন লোভ-লালসা না রাখে, উহার প্রতি যেন সামান্যতম ক্রক্ষেপও না করে, মাল কামাই করিবার লালসাও যেন না থাকে। আর এই সমস্ত জিনিস তখনই হইতে পারে, যখন মানুষ নিজের খরচ অনেক পরিমাণে কমাইয়া ফেলে। খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘর-বাড়িতে সবচেয়ে কম খরচ করে এবং একেবারে না হইলেই নয়—এই পর্যায়ে উপর যথেষ্ট করে এবং খুবই সাধারণ ও নিম্নমানের জিনিসের উপর তুষ্ট থাকে। যদি কোন জিনিসের প্রয়োজন হয়, তবে এক মাসের ভিতর যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুর যেন খেয়াল রাখে। উহার পরবর্তী কোন জিনিসের দিকে নিজের খেয়াল ও ধ্যান যেন না লাগায়। যদি উহার পরবর্তী চিন্তার মধ্যে পড়িয়া যায়, তবে অল্পেতুষ্টির ইচ্ছা ও পুরস্কার হইতে বঞ্চিত হইয়া লোভ-লালসার অপমানের মধ্যে গ্রেফতার হইয়া যাইবে। তদুপরি ইহার কারণে বিভিন্ন ধরনের খারাপ অভ্যাস পয়দা হইয়া যাইবে। অপছন্দনীয় জিনিসসমূহ গ্রহণ করিয়া লইতে বাধ্য হইবে। কেননা, মানুষ স্বভাবগতভাবে লোভী হইয়া থাকে।

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যদি মানুষের জন্য স্বর্গের দুইটি ময়দানও হইয়া যায়, তবুও সে তৃতীয় আর একটির ফিকিরে লাগিয়া যাইবে।

হযরত আবু মূসা আশআরী (রাযিঃ) বলেন, সুরায়ে বারাতের মত

একটি বড় সুরা নাযিল হইয়াছিল। অতঃপর উহা রহিত হইয়া গিয়াছে। উহার মধ্য হইতে এই বিষয়টি স্মরণ আছে যে, আল্লাহ তায়ালা এই দ্বীনের সাহায্য এমন (ফাসেক ও কাফের) লোকদের দ্বারাও করেন, যাহাদের জন্য দ্বীনের মধ্যে কোন অংশ নাই। আর যদি মানুষের জন্য সম্পদের দুইটি ময়দান হইয়া যায়, তবু সে তৃতীয় আর একটির আকাঙ্ক্ষা করে। মানুষের পেট (কবরের) মাটিই কেবল ভরিতে পারে। অবশ্য যদি কোন ব্যক্তি তওবা করিয়া লয় তবে আল্লাহ তায়ালা তওবা কবুল করেন।

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দুই লোভী ব্যক্তির পেট কখনও ভরে না। এক—ঐ ব্যক্তি যে এলেমের লোভী হয় (তাহার এলেমের স্বাদ লাগিয়া গিয়াছে। এইজন্য তাহার মন কখনও ভরে না)। দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি, যে সম্পদের লোভী। আর যেহেতু মানুষের স্বভাবের মধ্যে এই ধ্বংসাত্মক জিনিস রহিয়াছে, সেহেতু আল্লাহ তায়ালা এবং হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অস্পেতুষ্টির অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন।

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, ঐ ব্যক্তি বড় বরকতময় যাহাকে আল্লাহ তায়ালা ইসলামের দৌলত দ্বারা সম্মানিত করিয়াছেন এবং শুধু প্রয়োজন পরিমাণ রুজি তাহাকে দিয়াছেন, আর সে উহার উপর তুষ্ট রহিয়াছে।

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাও এরশাদ করিয়াছেন, কিয়ামতের দিন গরীব, ধনী, প্রত্যেক ব্যক্তি এই আকাঙ্ক্ষা করিবে যে, হায়! দুনিয়াতে যদি শুধু প্রয়োজন পরিমাণ রুজি মিলিত; উহার চেয়ে বেশী না পাইতাম। এই কারণেই হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোভ-লালসা হইতে এবং ধন-সম্পদ কামাই করিবার জন্য বেশী চেষ্টা মেহনত করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হে লোকসকল! মাল হাসিল করিবার ব্যাপারে সৎপথ অবলম্বন কর। (অসৎ পন্থায় মাল কামাই করিও না।) কেননা, তকদীরে যাহা আছে, মানুষ উহার বেশী পায় না। আর যাহা তকদীরে আছে, তাহা অবশ্যই পাওয়া যাইবে। মানুষ ঐ সময় পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করিতে পারে না, যে পর্যন্ত তাহার তকদীরের নির্ধারিত অংশ অপমানিত ও বাধ্য হইয়া তাহার নিকট না পৌছিয়া যায়।

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তুমি মুত্তাকি হইয়া যাও, সবচেয়ে বড় এবাদতকারী হইয়া যাইবে এবং (সামান্য

পরিমাণের উপর) তুষ্ট থাক, সবচেয়ে বেশী শোকরগোয়ার বান্দা হইয়া যাইবে। নিজের ভাইয়ের জন্যও ঐ জিনিসকে পছন্দ কর যাহা নিজের জন্য পছন্দ কর, কামেল মুমিন হইয়া যাইবে।

হযরত আবু আইয়ুব (রাযিঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইল এবং আরজ করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে সংক্ষিপ্ত নসীহত করিয়া দিন। (যাহাতে আমি উহার উপর মজবুতভাবে আমল করিতে পারি।) হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যখন নামায পড়, তখন এইভাবে পড়—যেন জীবনের শেষ নামায পড়িতেছ (আর জানা কথা—মানুষ যখন এই ধ্যান করিবে যে, ইহা আমার জীবনের শেষ নামায, তখন অত্যন্ত এহতেমাম এবং ধীরস্থিরভাবে ও মনোযোগ সহকারে পড়িবে)। আর কোন এমন কথা জবান হইতে বাহির করিও না, যাহার জন্য ওজর পেশ করিতে (ও ক্ষমা চাহিতে) হয়। তোমার অন্তরকে খাঁটিভাবে ঐ জিনিস হইতে নিরাশ করিয়া লও, যাহা অন্যের নিকট রহিয়াছে। (যাহাতে উহার দিকে সামান্যতমও তোমার দৃষ্টি না যায়।)

হযরত ওমর (রাযিঃ) বলেন, লোভ হইল দরিদ্রতা (ও পরমুখাপেক্ষিতা)। আর অন্যের সম্পদের প্রতি আশা না থাকার নামই ধনী হওয়া। যে ব্যক্তি এইসব জিনিস হইতে নিরাশ হইয়া যায়, যাহা অন্যদের দখলে রহিয়াছে, সে উহা হইতে অমুখাপেক্ষী থাকে।

জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তিকে কেহ জিজ্ঞাসা করিল, ধনী হওয়া কি জিনিস? তিনি বলিলেন, আশা আকাঙ্ক্ষা কম করা এবং নিজের জন্য যাহা যথেষ্ট, উহার উপর রাজি থাকা।

মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে' (রহঃ) শুকনা রুটি পানিতে ভিজাইয়া খাইয়া লইতেন এবং বলিতেন, যে উহার উপর তুষ্ট থাকে সে কাহারও মুখাপেক্ষী হইবে না।

জনৈক জ্ঞানীকে কেহ জিজ্ঞাসা করিল, আপনার ধন-সম্পদ কি? তিনি বলিলেন, বাহ্যিক দৃষ্টিতে ভাল অবস্থায় থাকা। আর অভ্যন্তরীণভাবে সংক্ষিপ্ত জীবন ও মধ্যপন্থা অবলম্বন করা এবং অন্যের নিকট যাহাকিছু আছে উহা হইতে কোন আশা না রাখা।

আল্লাহ তায়ালা (হাদীসে কুদসীতে) এরশাদ করিয়াছেন, হে আদম সন্তান! যদি সমস্ত দুনিয়া তুমি পাইয়া যাও, তবু তো তুমি উহা হইতে নিজের প্রয়োজন পরিমাণই খাইবে। যদি আমি তোমাকে সেই পরিমাণ দিয়া দেই এবং উহা হইতে বেশী না দেই—যাহার হিসাব তোমার দিতে

হইবে, তবে তো আমি তোমার উপর অনুগ্রহ করিলাম।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, যখন তুমি কাহারও নিকট নিজের কোন প্রয়োজন চাও, তখন সাধারণভাবে চাহিও। এমন বলিও না যে, আপনি এমন, আপনি তেমন। কেননা, এইরূপ বলার দ্বারা তুমি তাহার কোমর ভাজিয়া দিবে। (কারণ, সে আত্মগরিমা ও অহংকারে ধ্বংস হইয়া যাইবে।) আর তুমি তকদীরের চেয়ে বেশী পাইবে না।

বনু উমাইয়া বংশের এক বাদশাহ সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিক হযরত আবু হাযেম (রহঃ)কে অনেক অনুরোধ করিয়া লিখিয়াছেন, আপনার কোন জিনিসের প্রয়োজন হইলে, আমার নিকট হইতে চাহিয়া লইবেন। তিনি জওয়াবে লিখিলেন, আমি আমার প্রয়োজনসমূহ আমার মনিবের খেদমতে পেশ করিয়া দিয়াছি। তিনি আমাকে যাহা কিছু দান করিয়াছেন, উহার উপর আমি সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছি।

জনৈক জ্ঞানী বলেন, আমি সবচেয়ে বেশী চিন্তিত ও পেরেশান ব্যক্তি হিসাবে হিংসুককে পাইয়াছি। সবচেয়ে উন্নত জীবনযাপনকারী হিসাবে অল্পেতুষ্ট ব্যক্তিকে পাইয়াছি। আর সবচেয়ে বেশী ধৈর্যশীল হিসাবে লোভী ব্যক্তিকে পাইয়াছি (কেননা, প্রত্যেক জিনিসের প্রতি সে লোভ করে অতঃপর উহা না পাওয়ার কারণে সে ধৈর্য ধরে)। সবচেয়ে বেশী আরাম দায়ক জীবনযাপনকারী হিসাবে দুনিয়া ত্যাগকারী ব্যক্তিকে পাইয়াছি এবং সবচেয়ে বেশী অনুতপ্ত ঐ আলেমকে পাইয়াছি, যে সীমা লংঘন করিয়াছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাযিঃ) হযরত কা'ব আহবার (রহঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আলেমগণের অন্তর হইতে কোন্ জিনিস আলেমকে ধ্বংস করিয়া দেয়। অথচ পড়িবার সময় তাহারা বুঝিয়া পড়িয়াছিল, উহাকে স্মরণ রাখিয়াছিল। হযরত কা'ব (রহঃ) বলিলেন, লোভ-লালসা এবং মানুষের নিকট নিজের প্রয়োজন চাওয়া।

এক ব্যক্তি হযরত ফুজায়েল ইবনে ইয়াজ (রহঃ)কে হযরত কা'ব (রহঃ)এর উক্ত নসীহতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, যখন আলেম কোন জিনিসের লোভ করে, তখন সে উহার তালাশে লাগিয়া যায়। যে কারণে তাহার দীন বরবাদ হইয়া যায়। (কেননা, উহার তালাশে মশগুল হওয়ার কারণে তাহার দীনের মগ্নতা শেষ হইয়া যায়।) আর লোভ তাহাকে প্রতিটি জিনিসের দিকে টানিতে থাকে। এমনকি প্রত্যেকটি জিনিস সম্পর্কে তাহার মন চাহিতে থাকে যে, ইহাও যেন আমি পাইয়া যাই; উহাও যেন আমি পাইয়া যাই। অতঃপর মানুষের নিকট হইতে উহা পূরণ করার প্রত্যাশী হয়। যে ব্যক্তি তাহার চাহিদা পূরণ করিয়া দেয়,

তাহার সম্মুখে তাহাকে বুকিতে হয় এবং তাহার অনুগত হইতে হয়। যেদিকে ইচ্ছা সে টানিয়া লইয়া যায়। তোমাকে—অন্যায় হইলেও—তাহার কথা মানিতে হয়। যখন সে নিকট দিয়া যায়, তাহাকে সালাম করিতে হয়। সে অসুস্থ হইলে তাহাকে দেখিতে যাইতে হয়। অথচ এই সালাম ও শুশ্রূষা আল্লাহর জন্য হয় না, বরং দুনিয়ার মহব্বতের কারণে হয়। (দুনিয়ার মহব্বত হওয়ার কারণে কোন সওয়াব হয় না।) অতঃপর হযরত ফুজাইল (রহঃ) বলিলেন, এই হাদীস (আমল ও ফায়েদার দিক দিয়া) একশত হাদীস হইতে উত্তম। (এহইয়া)

হযরত সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাযিঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হুম্বুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইল এবং আরজ করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে সংক্ষিপ্ত উপদেশ দান করুন। (যাহাতে আমি উহার উপর মজবুতভাবে আমল করিতে পারি।) হুম্বুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যে জিনিস অন্যের নিকট রহিয়াছে, উহা হইতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ করিয়া লও (সেই দিকে সামান্যতমও দৃষ্টিপাত করিও না) এবং লোভ-লালসা হইতে নিজেকে পুরাপুরিভাবে হেফাজত কর। কারণ, লোভ হইল তাৎক্ষণিক দরিদ্রতা। (অর্থাৎ লোভনীয় জিনিসের প্রয়োজন তো যখন হইবে তখন হইবে; কিন্তু উহার দিকে মুখাপেক্ষিতা তো এখন হইতে শুরু হইয়া গিয়াছে।) আর নিজেকে এমন বিষয় হইতে বাঁচাও, যাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হয়। (তরগীব)

হযরত আবু আইয়ুব (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত এই ধরনের একটি প্রশ্ন ও উত্তর কিছু পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই উভয় হাদীসের মধ্যে অন্যান্য নসীহত একই রকম রহিয়াছে। বিভিন্ন রকমের নসীহত বিভিন্ন ধরনের মানুষের অবস্থা হিসাবে প্রযোজ্য।

কোন কোন বর্ণনায় হযরত সাদ (রাযিঃ)এর হাদীসে চারটি কথা উল্লেখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে তিনটি—যাহা হযরত আবু আইয়ুব (রাযিঃ)এর রেওয়াযাতে বর্ণিত আছে। আর লোভ সংক্রান্ত চতুর্থ বিষয়টি উহাতে অতিরিক্ত বর্ণিত হইয়াছে। (তরগীব)

অন্যের নিকট যে জিনিস রহিয়াছে, উহা হইতে নিজেকে একেবারে নিরাশ করিয়া রাখ। এই কথাটি উভয় হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা, ইহার উপর আমল করিলে কোন রকম দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী থাকে না এবং অন্য কাহারও সম্মুখে বুকাইতে হয় না।

হযূর সালাম্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি নিজের ঘরে নিরাপদে রহিয়াছে এবং আল্লাহ তায়ালা তাহাকে শরীরের সুস্থতা দান করিয়া রাখিয়াছেন এবং একদিনের খাদ্য তাহার নিকট মওজুদ রহিয়াছে, সে এমন, যেন সমস্ত দুনিয়া তাহার নিকট মওজুদ রহিয়াছে। (তরগীব) কাজেই তাহার অন্য কাহারও কোন জিনিসের প্রতি দৃষ্টিপাত করার প্রশ্নই আসে না।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতেও এই ধরনের ঘটনা বর্ণনা করা হইয়াছে যে, এক ব্যক্তি হযূর সালাম্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমাকে কোন সংক্ষিপ্ত কথা বলিয়া দিন। হযূর সালাম্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, নামায এমনভাবে পড় যেন ইহা সর্বশেষ নামায (এবং তুমি আল্লাহ তায়ালায় সম্মুখে উপস্থিত রহিয়াছ)। কারণ, তুমি যদি তাহাকে দেখিতে না পার, তবে তিনি তো তোমাকে অবশ্যই দেখিতেছেন। আর যে জিনিস অন্যদের হাতে রহিয়াছে উহা হইতে নিরাশ হইয়া থাক। তাহা হইলে তুমি সর্বাপেক্ষা ধনী হইবে। আর নিজেকে এমন বিষয় (কথা অথবা কাজ) হইতে বাঁচাও, পরবর্তীতে যাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হয়।

(তরগীব)

হযরত সাদ (রাযিঃ)এর নিকটও এক ব্যক্তি এই দরখাস্ত করিল যে, আপনি আমাকে কোন নসীহত করুন। তিনি বলিলেন, যখন নামায পড়, তখন অনেক ভাল করিয়া ওজু কর। কেননা, ওজু ছাড়া নামায হয় না এবং নামায ছাড়া ঈমান থাকে না। অতঃপর যখন নামায শুরু কর, তখন এমনভাবে পড় ; যেন ইহা সর্বশেষ নামায। আর অনেক বেশী প্রয়োজন চাহিও না। কেননা, ইহাও তাৎক্ষণিক দরিদ্রতা এবং যে জিনিস অন্যদের হাতে রহিয়াছে, উহা হইতে নিজেকে একেবারে নিরাশ রাখ ; ইহাই আসল ধনী হওয়া। কোন কথা বা কোন কাজ এমন করিও না, যাহার কারণে পরে ক্ষমা চাহিতে হয়। (এতহাফ)

ইমাম গায়যালী (রহঃ) বলেন, কোন কোন মানুষ মনে করে যে, সম্পদ পরিত্যাগকারী ব্যক্তি দুনিয়াত্যাগী ; ইহা সঠিক নয়। কারণ, সম্পদ পরিত্যাগ করা এবং মোটা কাপড় পরিধান করা এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সহজ, যে মানুষের মধ্যে নিজের মর্যাদা চায়, মানুষের নিকট নিজের প্রশংসা চায়। দুনিয়ার সহিত সম্পর্কহীনতার কথা প্রকাশকারী অনেকেই এমন রহিয়াছে, যাহারা অল্প খাবারের উপর তুষ্ট থাকে, নিজেদের দরজা সবসময় বন্ধ রাখে, বরং এমন বন্ধ কামরায় অবস্থান

করে, যাহার কোন দরজাই নাই, তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য, লোকদের মধ্যে খ্যাতিলাভ করা। এমনভাবে, উৎকৃষ্ট পোশাক পরিধানকারী কত লোক এমন রহিয়াছে, যাহারা দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তির দাবী করে এবং বলে যে, তাহারা ভাল পোশাক সুলভের অনুসরণের জন্য পরিধান করে, এইসব পোশাক ইত্যাদির দিকে খাহেশের দৃষ্টিতে দেখে না। বরং মানুষের পীড়াপীড়ি ও অনুরোধের কারণে পরিধান করিয়া থাকে। অথচ উদ্দেশ্য এই যে, লোকেরা যেন এই ধরনের পোশাক হাদিয়া হিসাবে পেশ করে। এই উভয় শ্রেণীর লোক দ্বীনের দ্বারা দুনিয়া হাসিল করিতেছে। কেননা, দুনিয়া শুধু মালেরই নাম নয়। সম্মান ও যশলিপ্সার নামও দুনিয়া।

যাহেদ বা দুনিয়াত্যাগীর তিনটি আলামত রহিয়াছে। এইগুলিকে নিজের মধ্যে পয়দা করিবার জন্য চেষ্টা করা চাই। এক—যাহা তাহার নিকট রহিয়াছে, উহাতে আনন্দিত না হওয়া এবং যে জিনিস নাই, সেইজন্য দুঃখিত না হওয়া। বরং উত্তম তো এই যে, যাহা আছে উহার কারণে দুঃখিত হওয়া, আর যাহা নাই উহার কারণে আনন্দিত হওয়া।

দুই—প্রশংসাকারী ও নিন্দাকারীকে এক সমান দৃষ্টিতে দেখা। ইহা সম্মানত্যাগের লক্ষণ। আর প্রথম জিনিসটি সম্পদত্যাগের লক্ষণ।

তিন—আল্লাহ তায়ালার সহিত মহব্বত হয় এবং এবাদতের মধ্যে স্বাদ পায়। (এহইয়া)

এখানে আমাদের বড়দের দুইটি ঘটনা নমুনাস্বরূপ লিখিতে দিল চাহিতেছে। তন্মধ্যে একটি হইল, ঐ চিঠি যাহা শায়খুল মাশায়েখ কুতবুল এরশাদ হযরত গাঙ্গুহী (রহঃ) আপন মুর্শিদ শায়খুল আরব ওয়াল আজম হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ ছাহেব (রহঃ)এর খেদমতে লিখিয়াছেন। ইহা ‘মাকাতীবে রশীদিয়া’ কিতাবের মধ্যেও মুদ্রিত রহিয়াছে। চিঠির শব্দগুলি এই—

“অধম বান্দার অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞানিতে চাহিয়াছেন। (উহার জবাবে আরজ এই যে,) হে আমার দোজাহানের আশ্রয়! আমি অধমের এমনকি অবস্থা ও এমন কিইবা গুণ রহিয়াছে, যাহা গুণাবলীর জগতে সূর্যের ন্যায় হযরতের সম্মুখে আরজ করিব। আল্লাহর কসম! আমি অত্যন্ত লজ্জিত, কিছুই নই; কিন্তু হযরতের হুকুম হইয়াছে বলিয়া বাধ্য হইয়াই কিছু লিখিতে হইতেছে।

হে আমার মুর্শিদ! যাহেরী এলেমের তো এই অবস্থা যে, খুব সম্ভব সাত বৎসর হইতে কিছু বেশী হইবে, আপনার খেদমত হইতে দূরে চলিয়া আসিয়াছি। এই বৎসর পর্যন্ত দুইশত হইতে কিছুসংখ্যক বেশী লোক

হাদীসের সনদ হাসিল করিয়া গিয়াছে। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ এলামে দ্বীনের পাঠদান জারি করিয়াছে, সুন্নত জিন্দা করার কাজে তৎপর হইয়াছে এবং তাহাদের দ্বারা দ্বীনের প্রচার হইয়াছে। এই সম্মান ও মর্যাদা হইতে বড় আর কোন সম্মান ও মর্যাদা নাই; যদি কবুল হইয়া যায়। হযরতের জুতা ও পদতলে থাকিয়া যে ফায়দা ও ফল হইয়াছে, উহার সারমর্ম এই যে, অন্তরের অন্তঃস্থলে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাহারও হইতে উপকার বা ক্ষতির দিকে দৃষ্টি নাই।

আল্লাহর কসম! কোন কোন সময় নিজের মাশায়েখদের দিক হইতেও পৃথক হইয়া যাওয়া হয়। এইজন্য কাহারও প্রশংসা ও নিন্দাবাদের পরওয়া অবশিষ্ট থাকে নাই। নিন্দাকারী ও প্রশংসাকারীকে দূরে মনে করি। ওনাহের প্রতি স্বভাবগতভাবে ঘৃণা ও আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি স্বভাবগতভাবে আকর্ষণ পয়দা হইয়া গিয়াছে। ইহা সেই রংবিহীন ইয়াদ-দাশ্ত (সার্বক্ষণিক) নিসবতেরই প্রতিক্রিয়া, যাহা হযরতের নূরোজ্জ্বল প্রদীপ হইতে পৌছিয়াছে। অতিরিক্ত আরজ করা বেয়াদবী ও ধৃষ্টতা। হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করুন। হযরতের হুকুমে লিখিতে হইয়াছে, মিথ্যুক আমি, কিছুই নই, সব তোমারই ছায়া, তোমারই অস্তিত্ব, আমি কি, কিছুই নই এবং আমি যাহা রহিয়াছি উহাও তুমি। আমি এবং তুমি স্বয়ং শিরকের ভিতরে শিরক। আস্তাগ্‌ফিরুল্লাহ, আস্তাগ্‌ফিরুল্লাহ, আস্তাগ্‌ফিরুল্লাহ, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

আর বেশী আরজ করিতে অপারগ মনে করিয়া কবুল করিবেন। ওয়াস সালাম।”

১৩০৬ হিজরী।

এই মূল্যবান চিঠি ইন্তেকালের ১৭ বছর পূর্বের। এই ১৭ বছরে প্রশংসা ও নিন্দা উভয়টি বরাবর হওয়ার বিষয়ে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা লাভ ও ক্ষতির দিকে ভ্রক্ষেপ না করার বিষয়ে যে উন্নতি ও অগ্রগতি হইয়া থাকিবে, উহা কে উপলব্ধি করিতে পারে।

দ্বিতীয় ঘটনা, যাহা আমীর শাহ খান সাহেব ‘আমীরুর রেওয়াযাত’ কিতাবে লিখিয়াছেন। তিনি লিখেন—

“সেকান্দারাবাদ তহসীলে হাছানপুর নামক একটি গ্রাম রহিয়াছে। আমিও দেখিয়াছি। অনেক বড় গ্রাম। এই গ্রাম এক সময় মৌলভী মুহাম্মদ ইসহাক সাহেব (দেহলভী যিনি হাদীসের বিখ্যাত উস্তাদগণের মধ্যে গণ্য ছিলেন) ও মৌলভী মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেবের ছিল। মৌলভী মুহাম্মদ

মুজাফফর হুসাইন সাহেব কাকুলভী) বলেন, মৌলভী মুহাম্মদ ইসহাক সাহেব ও মৌলভী মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। অধিকাংশ সময় অভাবের কারণে চিন্তিত থাকিতেন। কিন্তু একদিন আমি দেখিলাম, দুই ভাই অত্যন্ত আনন্দিত ও হাসিখুশী অবস্থায় আছেন। খুশীতে তাহারা এদিক সেদিক আসা যাওয়া করিতেছেন এবং কিতাবাদি এখান হইতে ওখানে এবং ওখান হইতে এখানে রাখিতেছেন। আনন্দের সহিত পরস্পর কথাবার্তা বলিতেছেন। আমি এই অবস্থা দেখিয়া মনে করিলাম যে, আজ হয়ত কোন মোটা অংকের টাকা হিন্দুস্থান হইতে আসিয়াছে। (উভয় বুয়ুর্গ তখন মক্কা মুকাররমায় অবস্থান করিতেছিলেন।) যেই কারণে তাহারা এত বেশী আনন্দিত। ইহা মনে করিয়া আমি ইচ্ছা করিলাম যে, ঘটনা কি তাহা জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু বড় মিয়াকে তো জিজ্ঞাসা করিবার সাহস হয় নাই। ছোট মিয়াকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হযরত! আপনাকে আজ খুবই আনন্দিত দেখা যাইতেছে, ইহার কারণ কি? তিনি আশ্চর্যের সুরে বলিলেন, তুমি কি শোন নাই? আমি বলিলাম, না। তিনি বলিলেন, আমাদের গ্রাম হাসানপুর বাজেয়াপ্ত হইয়া গিয়াছে। এইজন্য আনন্দিত হইয়াছি। কেননা, যতদিন উহা আমাদের ছিল আল্লাহ তায়ালা উপর আমাদের পুরাপুরি তাওয়াক্কুল ছিল না। আর এখন শুধু আল্লাহর উপর ভরসা রহিয়া গিয়াছে। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী ছাহেব থানবী (রহঃ) এই ঘটনার উপর লিখেন যে, আমার হযরত গওসে পাক (রহঃ) এর আনন্দের কথা স্মরণ হইয়া গেল। যখন খাদেম একটি মূল্যবান আয়না ভাঙ্গিয়া যাওয়ার ঘটনা ভয়ে ভয়ে এই পংক্তির মাধ্যমে জানাইলেন :

از قضا آئینه چینی شکست

অর্থাৎ, আল্লাহর হুকুম ও মর্জিতে চীন দেশে প্রস্তুতকৃত আয়নাটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তখন হযরত গওসে পাক (রহঃ) সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন :

خوب شد اسباب خود بینی شکست

(আমীরের রেওয়াযাত)

অর্থাৎ, খুব ভাল হইয়াছে যে, আত্মগর্বের সামগ্রী শেষ হইয়া গিয়াছে।

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور
اُمّس صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر

عَنْ عَائِشَةَ ۖ قَالَتْ مَا سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

میں اپنی وفات تک کبھی جوگی روٹی
بھی دودلی لگاتا ریٹ بھر کر نوش
نہیں فرمائی۔

مِنْ خُبْرِ شَعْرِ يَوْمَيْنِ مَتَابَعِي
حَتَّى قُبُضَ (رواه الترمذی)
فی السَّمائل

১১) হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, ছযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারাজীবন তাহার মৃত্যু পর্যন্ত কখনও যবের রুটিও দুই দিন একাধারে পেট ভরিয়া খান নাই। (তিরমিযী : শামায়েল)

ফায়দা : ইহাই ছযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন ছিল। দুই চারটি হাদীসে নহে, শত শত হাদীসে ছযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের এই নকশাই পাওয়া যায়। আজ মুসলমানদের দরিদ্রতা ও ক্ষুধা সম্পর্কে এত বেশী হৈচৈ যে, উহার সীমা নাই। কিন্তু কতজন মানুষ এইরূপ হইবে, যাহাদের জীবনে দুইদিনও পেট ভরিয়া খাওয়ার জন্য সামান্য রুটিও মিলে নাই। 'শামায়েল' কিতাবেরই আরেক হাদীসে হযরত আয়েশা (রাযিঃ) ছযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমস্ত পরিবারের এই আমলটি বর্ণনা করেন যে, ছযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার-পরিজন তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত কখনও দুইদিন একাধারে যবের রুটির দ্বারা পেট ভরেন নাই।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, ছযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর পরপর কয়েক রাত্র এমনভাবে কাটিয়া যাইত যে, ছযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাহার পরিবার পরিজনের জন্য সন্ধ্যার খানার ব্যবস্থা থাকিত না। রাতভর সকলেই ক্ষুধা লইয়াই কাটাইয়া দিতেন আর যবের রুটির উপরই ছযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবন অতিবাহিত করিতেন।

হযরত সাহল (রাযিঃ)কে কেহ জিজ্ঞাসা করিল, ছযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কি চালা আটার রুটি খাওয়ার অভ্যাস ছিল? হযরত সাহল (রাযিঃ) বলিলেন, ছযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যু পর্যন্ত চালা আটা দেখেনই নাই। অতঃপর সে জিজ্ঞাসা করিল, ছযূরের জমানায় আপনাদের নিকট কি চালনী ছিল না? হযরত সাহল (রাযিঃ) বলিলেন, চালনীর প্রচলন ছিল না। লোকটি (আশ্চর্য হইয়া) জিজ্ঞাসা করিল, না চালিয়া যবের আটা কি করিয়া খাইতেন? হযরত সাহল (রাযিঃ) বলিলেন, আমরা আটা (নাড়াচাড়া দিয়া উহাতে) ফুঁক দিতাম। ফলে (বড় বড়) ছিলকা উড়িয়া যাইত। বাকীগুলিকে পাকাইয়া লইতাম। (শামায়েলে তিরমিযী)

ফায়দা : বর্তমানে গমের রুটির আটাও না চালিয়া খাওয়া মুশকিল মনে করা হয়। এই সকল হযরতগণ যবের আটার রুটি না চালিয়া খাইতেন। উহাও তাহারা পেট ভরিয়া পাইতেন না। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, যখন আমি পেট ভরিয়া খানা খাই, তখন আমার (বে-একতিয়ার) কাঁদিতে ইচ্ছা করে। এইভাবে আমি কাঁদিতে আরম্ভ করি। কেহ আরজ করিল, ইহার কারণ কি? তিনি বলিলেন, তখন আমার ছ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জমানার কথা মনে পড়িয়া যায় যে, ছ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল পর্যন্ত দিনে দুইবার গোশত অথবা রুটি দ্বারা কখনও পেট ভরিয়া খানা খাওয়ার সুযোগ পান নাই।

(শামায়েল)

সাইদ মাকবুরী (রহঃ) বলেন, হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) একদল লোকের পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিলেন। তাহারা খানা খাইতেছিল এবং তাহাদের সামনে ভূনা মুরগী ছিল। তাহারা হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ)কে খাইতে বলিলেন। হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) অস্বীকার করিলেন এবং বলিলেন যে, ছ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই অবস্থায় দুনিয়া হইতে বিদায় লইয়া গিয়াছেন যে, যবের রুটি দ্বারা পেট ভরিয়া খাওয়ারও সুযোগ হয় নাই। (মিশকাত) আমার কিভাবে মন চাহিবে যে, মোরগ খাইব? হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ)এর এই এরশাদ সাধারণ অবস্থা হিসাবে হইয়াছে। নতুবা মুরগী খাওয়ার বিষয়টি ছ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে প্রমাণিত রহিয়াছে।

এক হাদীসে আছে, ছ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় ক্ষুধার্ত থাকিতেন ; কোনরূপ অভাব ছাড়াই। অর্থাৎ এমনও হইত যে, খানা মওজুদ রহিয়াছে, তবুও তিনি কম খাইতেন। কারণ, ক্ষুধার্ত থাকার কারণে নূরের আধিক্য হয়।

এক হাদীসে আসিয়াছে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে খানাপিনার পরিমাণ কম রাখে, আল্লাহ তায়ালা তাহার সম্পর্কে ফেরেশতাদের সামনে গর্ব করিয়া এরশাদ করেন, দেখ, আমি তাহাকে খানাপিনার কমির মধ্যে লিপ্ত করিয়াছি, সে ছবর করিয়াছে, তোমরা সাক্ষী থাক, যে লোকমা সে কম খাইয়াছে, উহার বিনিময়ে তাহার জন্য জান্নাতের মর্যাদা সাব্যস্ত করিলাম।

(এহইয়া)

সর্বক্ষেত্রে এই বিষয়ে খেয়াল রাখা উচিত যে, ইচ্ছাকৃতভাবে এত কম খাইবে না, যাহা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হইয়া অন্যান্য দ্বীনী কাজের মধ্যে অসুবিধার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। এই কারণেই রোযার মধ্যে সেহরী

খাওয়াকে সুমত করা হইয়াছে, যাহাতে রোযার মধ্যে দুর্বলতা পয়দা না হয়। এই কারণেই দুপুরের সময় ঘুমানো সুমত করা হইয়াছে, যাহাতে রাত্রি জাগরণে সাহায্য হয়।

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, উদর পূর্ণ করা অপেক্ষা আর কোন পাত্র পূর্ণ করা অধিক নিন্দনীয় নাই। (অর্থাৎ পেট পূর্ণ করা যতটুকু খারাপ, অন্য কোন পাত্র পূর্ণ করা ততটুকু খারাপ নয়।) আর যেহেতু অপারগতা রহিয়াছে, খানা খাইতেই হয়, এইজন্য পেটের এক-তৃতীয়াংশ খানার জন্য, আর এক-তৃতীয়াংশ পান করার জন্য, আর এক-তৃতীয়াংশ শ্বাস লওয়ার জন্য রাখা চাই।

একবার ফাতেমা (রাযিঃ) একটি রুটির টুকরা হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে লইয়া হাজির হইলেন। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইহা কি জিনিস? হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আজকে রুটি পাকাইয়া ছিলাম। আপনাকে না খাওয়াইয়া আমার খাইতে মন চাহিল না। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তিনদিনের মধ্যে এই প্রথম জিনিস, যাহা তোমার পিতার মুখে খাইতেছে (অর্থাৎ তিনদিন যাবৎ কোন জিনিস খাওয়ার সুযোগ হয় নাই)।

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দুনিয়াতে যে সমস্ত লোক ক্ষুধার্ত থাকে, আখেরাতে ঐ সমস্ত লোকই পেট ভরিবে। আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তিকে অত্যন্ত অপছন্দ করেন, যে এই পরিমাণ খায় যে, বদহজম হইয়া যায়। যে ব্যক্তি এমন জিনিস খাওয়া হইতে বিরত থাকে, যাহা খাইতে মনে চায়, তাহার জন্য জান্নাতে মর্যাদাসমূহ রহিয়াছে।

হযরত ওমর (রাযিঃ) বলেন, পেট ভরিয়া খানা খাওয়া হইতে সতর্ক থাক। ইহাতে এই জীবনে শরীর ভারী হইয়া যায় এবং মৃত্যুর সময় অপবিত্রতা ও দুর্গন্ধের কারণ হয়।

হযরত শাকীক বলখী (রহঃ) বলেন, এবাদত একটি ব্যবসা। উহার দোকান হইল নির্জনতা এবং উহার মাল হইল, (যাহা দ্বারা ব্যবসা করা হয়) ক্ষুধার্ত থাকা।

হযরত ফুজায়েল (রহঃ) নিজের অন্তরকে বলিতেন, তুমি ক্ষুধার্ত থাকিতে ভয় পাও। ইহা ভয়ের জিনিস নয়। তোমার কি মূল্য আছে, যখন হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেলাম (রাযিঃ) ক্ষুধার্ত থাকিয়াছেন।

হযরত ফুজায়েল (রহঃ) ইহাও বলিতেন, ইয়া আল্লাহ! আপনি

আমাকে এবং আমার পরিবার-পরিজনকে ক্ষুধার্ত রাখিয়াছেন। অন্ধকার রাত্রিতে বাতি ছাড়া রাখিয়াছেন। এই ব্যবহার তো আপনি আপনার নেক বান্দাদের সহিত করিয়া থাকেন। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে এই দৌলত আমার কোন্ আমলের উপর দান করিয়াছেন! অর্থাৎ ইহার উপর তিনি আশ্চর্য হইতেন যে, আমি (আমার নিজের ধারণা অনুযায়ী) নেক বান্দা তো নই; তথাপি আল্লাহ তায়ালা আমার সহিত নেক বান্দাদের মত যে আচরণ করিতেছেন, উহা কোন্ আমলের পুরস্কার স্বরূপ!

হযরত কাহমাস (রহঃ) বলেন, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষুধার্ত রাখিয়াছেন, বস্ত্রহীন রাখিয়াছেন, অন্ধকার রাত্রিতে বাতি ছাড়া রাখিয়াছেন (আমি তো আপনার এই সমস্ত অনুগ্রহের উপযুক্ত ছিলাম না, এই মর্যাদা) আমাকে কিসের কারণে দান করিলেন!

হযরত ফাতাহ মাওছেলী (রহঃ) যখন কোন কঠিন রোগে আক্রান্ত হইতেন কিংবা কঠিন ক্ষুধায় পড়িতেন, তখন বলিতেন, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষুধা এবং রোগে আক্রান্ত করিয়াছেন; অথচ আপনি ইহা আপনার নেকবান্দাদেরকে দিয়া থাকেন। আমি কোন্ নেক আমল দ্বারা আপনার এই অনুগ্রহের শুকরিয়া আদায় করিব।

মালেক ইবনে দীনার (রহঃ) মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে' (রহঃ)কে বলেন, বড় ভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি যাহার নিকট সামান্য উৎপাদিত ফসল এইরূপ রহিয়াছে, যাহা দ্বারা সে জীবন ধারণ করিতে পারে এবং লোকদের নিকট মুখাপেক্ষী হয় না। মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে' (রহঃ) বলিলেন, বড় ভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি, যে সকালে ক্ষুধার্ত থাকে, সন্ধ্যায়ও ক্ষুধার্ত থাকে এবং ইহা সত্ত্বেও সে আপন প্রতিপালকের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে।

তওরাত কিতাবে আছে, যখন তুমি পেট ভরিয়া খানা খাও, তখন ক্ষুধার্ত লোকদের কথাও অন্তরে স্মরণ কর।

আবু সুলাইমান (রহঃ) বলেন, রাত্রের খানা হইতে এক লোকমা কম খাওয়া আমার নিকট সারারাত্র জাগিয়া এবাদত করা হইতেও বেশী পছন্দনীয়।

তিনি আরও বলিয়াছেন, ক্ষুধা আল্লাহ তায়ালাকে এমন এক ধনভাণ্ডার, যাহা তিনি আপন বন্ধুদেরকেই দিয়া থাকেন।

হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ (রহঃ) একাধারে বিশ দিন হইতেও বেশী অনাহারে কাটাইয়া দিতেন। তিনি পুরা বৎসরে এক দেহহাম পরিমাণ খাদ্য খাইতেন। তিনি ক্ষুধার্ত থাকার জন্য অত্যন্ত উৎসাহ দান করিতেন। এমনকি তিনি বলিতেন যে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত খানা ছাড়িয়া দেওয়ার

সমতুল্য কোন নেক আমল নাই। কেননা, ইহাই হৃদয় সাপ্লাস্লাহ আল্লাইহি ওয়াসাপ্লামের অনুসরণ। তিনি আরও বলিয়াছেন, হেকমত ও এলেম ক্ষুধার্ত থাকার মধ্যে রহিয়াছে, মুখতা ও গুনাহ পেট ভরিয়া খাওয়ার মধ্যে রহিয়াছে। তিনি আরও বলেন, মানুষ ঐ পর্যন্ত আবদাল হইতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত ক্ষুধার্ত থাকা, চুপ থাকা এবং রাত্রি জাগরণে অভ্যস্ত না হয় এবং নির্জনতাকে পছন্দ না করে। তিনি আরও বলেন, যে ব্যক্তি ক্ষুধার্ত থাকে, তাহার মনে ওয়াসওয়াসা বা কুমন্ত্রণা কম আসে।

আবদুল ওয়াহেদ ইবনে যায়েদ কসম খাইয়া বলিতেন, আল্লাহ তায়ালা কাহাকেও ক্ষুধা ব্যতীত অন্তরের সাফাই দান করেন না। আর ইহারই বরকতে বুয়ুর্গ লোকেরা পানির উপর দিয়া চলেন। ইহারই বরকতে তাহাদের 'তাইয়ুল-আরদ' হাসিল হয়। (এহইয়া)

'তাইয়ুল-আরদ' বুয়ুর্গগণের একটি বিশেষ গতির নাম। যাহার কারণে হাজার হাজার মাইল কয়েক কদমে অতিক্রম করিয়া ফেলেন।

ইমাম গাযযালী (রহঃ) বলেন, ক্ষুধার্ত থাকার মধ্যে দশটি উপকার রহিয়াছে।

এক— অন্তরের সাফাই হাসিল হয়। জ্ঞান-বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়, সূক্ষ্ম জ্ঞান বাড়িয়া যায়। কারণ, পেট ভরিয়া খাওয়ার দ্বারা স্বভাবের মধ্যে স্থলতা আসিয়া যায়। অন্তরের নূর চলিয়া যায়। পাকস্থলীতে গ্যাস পয়দা হইয়া মস্তিষ্ক ঘিরিয়া লয়। ফলে, অন্তরের উপর উহার প্রভাব পড়ে। যে কারণে মস্তিষ্ক চিন্তা-গবেষণার ব্যাপারে অক্ষম হইয়া যায়। এমনকি কম বয়সের বাচ্চারাও যদি বেশী খাইতে আরম্ভ করে, তবে তাহাদের স্মরণশক্তি নষ্ট হইয়া যায়। মেধাশক্তিও দুর্বল হইয়া যায়।

আবু সুলাইমান দারানী (রহঃ) বলেন, ক্ষুধার্ত থাকার অভ্যাস পয়দা কর, ইহা নফসকে অনুগত করে। অন্তর নরম করে। ইহা দ্বারা আসমানী এলেম হাসিল হয়।

হযরত শিবলী (রহঃ) বলেন, আমি আল্লাহর জন্য যেইদিন ক্ষুধার্ত রহিয়াছি, সেইদিন আমি আমার ভিতর জ্ঞান ও হেকমতের একটি দরজা খোলা পাইয়াছি। এই কারণেই হযরত লোকমান (আঃ) স্বীয় পুত্রকে নসহীত করিয়াছেন, বেটা! যখন পেট ভরিয়া যায়, তখন চিন্তা-ফিকির ঘুমাইয়া যায়, হেকমত বোবা হইয়া যায় এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবাদত-বন্দেগীর ব্যাপারে অলস হইয়া যায়।

আবু ইয়াযীদ বোস্তামী (রহঃ) বলেন, ক্ষুধা একটি মেঘ স্বরূপ। মানুষ যখন ক্ষুধার্ত থাকে, তখন ঐ মেঘ অন্তরে হেকমতের বৃষ্টি বর্ষণ করে।

দুই—দ্বিতীয় ফায়দা, দিল নরম হয়। ফলে, যিকির ইত্যাদির প্রভাব দিলের উপর পড়ে। অনেক সময় মানুষ অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে যিকির করে। কিন্তু অন্তর উহাতে স্বাদ পায় না এবং উহা দ্বারা প্রভাবিত হয় না। যখন দিল নরম হয়, তখন দিলে যিকিরের স্বাদ হাসিল হয়, দোয়া ও মুনাজাতেও স্বাদ পাওয়া যায়।

আবু সুলাইমান দারানী (রহঃ) বলেন, আমি এবাদতের মধ্যে সবচেয়ে বেশী স্বাদ তখন লাভ করি, যখন ক্ষুধার কারণে আমার পেট কোমরের সহিত লাগিয়া যায়।

হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ) বলেন, মানুষ আল্লাহ তায়ালা ও তাহার সিনার মাঝখানে খাদ্যের একটি থলি ঝুলাইয়া লয়। অতঃপর সে এই আশাও করে যে, আল্লাহ তায়ালা সহিত মুনাজাতের স্বাদ যেন নসীব হয় (পেট পূর্ণ করাকে ফকিরের ঝুলি ভরার সহিত তুলনা করা হইয়াছে)।

তিন—তৃতীয় ফায়দা, মানুষের মধ্যে বিনয় ও নম্রতা পয়দা হয় এবং অহংকার ও দণ্ড দূর হইয়া যায়। যাহা অব্যাহতা ও আল্লাহ তায়ালা হইতে গাফলতির মূল উৎস। নফস কোন জিনিস দ্বারা এত পরাভূত হয় না, যত ক্ষুধার্ত থাকার দ্বারা হয়। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের নফসের অপমান ও বিনয় না দেখে, ততক্ষণ পর্যন্ত আপন মাওলার ইজ্জত ও তাহার বড়ত্ব দেখিতে পায় না। মানুষের উচিত— অধিক পরিমাণে যেন ক্ষুধার্ত থাকে। যাহাতে আনন্দচিত্তে আপন মাওলার প্রতি মনোযোগী থাকিতে পারে। এই কারণেই যখন আল্লাহ তায়ালা হযূর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ইহা পেশ করিলেন যে, মক্কা মুকাররমার সমগ্র জমিন আপনার জন্য স্বর্ণে পরিণত করিয়া দেওয়া হউক, তখন হযূর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরজ করিলেন, হে আল্লাহ! ইহা নয়, বরং আমি তো চাই যে, একদিন ক্ষুধার্ত থাকিব আর একদিন খাইব। যেইদিন ক্ষুধার্ত থাকিব, ছবর করিব এবং আপনার সম্মুখে বিনয় প্রকাশ করিব (আপনার নিকট চাহিব)। আর যেদিন খাইব, সেইদিন আপনার শোকর আদায় করিব।

চার—চতুর্থ ফায়দা, বিপদগ্রস্ত এবং ক্ষুধার্ত লোকদের ব্যাপারে গাফলতি পয়দা হয় না। পেট ভরা মানুষ অনুমান করিতে পারে না যে, ক্ষুধার্ত এবং অভাবী লোকদের উপর কি অবস্থা অতিবাহিত হইতেছে।

হযরত ইউসুফ (আঃ)এর নিকট কেহ আরজ করিল, জমিনের ভাণ্ডার তো আপনার হাতে রহিয়াছে, তবুও আপনি ক্ষুধার্ত থাকেন কেন? তিনি বলিলেন, আমার এই ভয় হয় যে, নিজে পেট ভরিয়া ফেলিলে, হয়ত ক্ষুধার্ত লোকদিগকে ভুলিয়া যাইব। আর ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকিলে

কিয়ামতের দিনের ক্ষুধা ও পিপাসার স্মরণ তাজা হয়। আল্লাহ তায়ালা আজাবের ভয়ও পয়দা হয়। ইহাও স্মরণ হয় যে, প্রচণ্ড ক্ষুধা ও পিপাসার অবস্থায় জাহান্নামে কিরূপ খানা মিলিবে—যাহা হলকের মধ্যে আটকাইয়া যাইবে এবং পান করিবার জন্য কি মিলিবে—জাহান্নামবাসীদের জ্বরের রক্ত ও পুঁজ মিলিবে।

পাঁচ—পঞ্চম ফায়দা, যাহা আসল এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। উহা হইল, গুনাহ হইতে বাঁচা। কেননা, পেট ভরা থাকাই সমস্ত খাহেশাতের মূল। আর ক্ষুধার্ত থাকা সব ধরণের খাহেশাতকে ধ্বংস করিয়া দেয়। মানুষের জন্য বড় সৌভাগ্য হইল, সে নিজের নফসের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখে। আর বড় দুর্ভাগ্য হইল, নফস তাহাকে নিয়ন্ত্রণে লইয়া লয়। যেমন, অবাধ্য ঘোড়াকে ক্ষুধার্ত রাখিলে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। আর যখন সে খুব খাইতে থাকে, তখন অবাধ্য হইয়া যায়। নফসের অবস্থাও তদ্রূপ।

জনৈক ব্যুর্গকে কেহ জিজ্ঞাসা করিল, আপনি এই বার্ধক্য অবস্থাতেও নিজের শরীরের যত্ন লইতেছেন না কেন? (অর্থাৎ শক্তিবর্ধক কিছু খাওয়া প্রয়োজন।) তিনি বলিতে লাগিলেন, নফস আমোদ-প্রমোদের দিকে অত্যন্ত তীব্রগতিতে চলে। আমার ভয় হয় যে, আমাকে কোনো গুনাহের মুসীবেতে লিপ্ত করিয়া দেয়। ইহা অপেক্ষা আমার নিকট অধিক পছন্দনীয় যে, আমি উহাকে কষ্টের মধ্যে ফেলিয়া রাখি।

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, সর্বপ্রথম বিদআত যাহা হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর পয়দা হইয়াছে, উহা হইল, পেট ভরিয়া খাওয়া। যখন মানুষের পেট ভরিয়া যায়, তখন তাহাদের নফস দুনিয়ার দিকে ঝুকিতে শুরু করে। আর এই উপকারিতাটি যাহা উল্লেখ করা হইল, উহা শুধু একটি উপকারিতাই নহে, বরং ইহা অনেকগুলি উপকারিতার ভাণ্ডার। কমপক্ষে যে উপকার ইহার দ্বারা হয়, তাহা হইল, লজ্জাস্থানের খাহেশ এবং অনর্থক কথাবার্তা বলার খাহেশ ছুটিয়া যায়। কেননা, ক্ষুধার্ত মানুষের মন অনর্থক কথাবার্তা বলিতে চায় না। আর এই একটি বিষয়েব কারণেই মানুষ গীবত, মিথ্যা, অশ্লীল কথাবার্তা, চুগোলখোরী ইত্যাদি অনেক অনিষ্টকর জিনিস হইতে হেফাজতে থাকে। পেট ভরা থাকিলে, মানুষের মন আনন্দ-উল্লাসমূলক বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সাধারণভাবে আমাদের আনন্দ-উল্লাস মানুষের ইজ্জত-আবরু লইয়াই হইয়া থাকে।

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জ্বানের অহেতুক কথাবার্তাই মানুষকে অধিকতর জাহান্নামে নিক্ষেপ করে। আর

লজ্জাস্থানের খাহেশ যে মানুষকে ধ্বংস করে, উহা কাহারও নিকট অস্পষ্ট নহে। মানুষের পেট যখন ভরা থাকে, তখন লজ্জাস্থানের উপর নিয়ন্ত্রণ কঠিন হইয়া যায়। যদি আল্লাহর ভয়ে মানুষ ইহার উপর নিয়ন্ত্রণ পাইয়াও যায়, তবু চোখের গুনাহ (অবৈধভাবে কোন স্ত্রী লোক বা পুরুষকে দেখা) তো হইয়াই যায়।

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষের চক্ষুও জেনা করে ; যেমন লজ্জাস্থান জেনা করে। যদি মানুষ চক্ষু বন্ধ করিয়া ইহার উপরও নিয়ন্ত্রণ পাইয়া যায়, তবুও যাহাকে পূর্বে দেখিয়াছে তাহার খেয়াল তো অন্তরে আসিতেই থাকিবে। আর কাম-উত্তেজনা সৃষ্টি হয়—এরূপ কু-খেয়ালও আল্লাহ তায়ালার সহিত মুনাজাতের স্বাদ নষ্ট করিয়া দেয়। তদুপরি অনেক সময় এই খারাপ খেয়ালসমূহ নামাযের মধ্যেও আসিয়া যায়। জবান ও লজ্জাস্থানের কথা উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা হইল। নতুবা শরীরের সপ্তাঙ্গের সমস্ত গুনাহ এই একই শক্তি হইতে পয়দা হয়। যাহা পেট ভরার কারণে হাসিল হইয়া থাকে।

ছয়—ষষ্ঠ ফায়দা, কম খাইলে ঘুম কম আসে। বেশী বেশী রাত্রি জাগরণের দৌলত নসীব হয়। কেননা, পেট ভরিয়া খাওয়ার কারণে পিপাসা বেশী লাগে। আর পানি পান করিলে ঘুম বেশী আসে। মাশায়েখগণের উক্তি রহিয়াছে যে, অধিক খাওয়া-দাওয়া করিও না। তাহা হইলে বেশী পানি পান করিতে হইবে। আবার বেশী ঘুমাইতে হইবে। ফলে, বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া যাইবে। সত্তরজন হাকীম এই কথার উপর একমত যে, বেশী পানি পান করিলে বেশী ঘুম আসে। আর বেশী ঘুমাইলে জীবনের অনেক বড় অংশ বরবাদ হইয়া যায়। তাহাজ্জুদ নামায ছুটিয়া যাওয়া তো ভিন্ন রহিল। এমনিভাবে, বেশী ঘুমাইলে স্বভাবের মধ্যে স্থলতা আসে এবং দিল শক্ত হইয়া যায়। স্ত্রী কাছে না থাকিলে স্বপ্নদোষ হওয়ার কারণ হয়। অতঃপর গোসলের ব্যবস্থা না থাকার কারণে তাহাজ্জুদও ছুটিয়া যায়।

সাত—সপ্তম ফায়দা, সহজেই এবাদত-বন্দেগী করা যায়। কেননা, পেট ভরিয়া খাইলে সাধারণতঃ অলসতা পয়দা হয়। যাহা এবাদতে বাধা সৃষ্টি করে। আর শুধু খাওয়া-দাওয়ার মধ্যেই অনেক সময় নষ্ট হইয়া যায়। আর যদি খানা তৈয়ার করিতে হয়, তবে আরও বেশী সময় নষ্ট হয়। খাওয়া-দাওয়ার পর হাত ধোয়া, খেলাল করা, বারবার উঠিয়া পানি পান করা এই সবকিছুর সময় যদি হিসাব করা হয়, তবে কত বেশী সময় হইয়া যায়। যদি এইসব সময় আল্লাহ তায়ালার যিকিরে ও অন্যান্য এবাদতে খরচ করা হইত, তবে কত বেশী উপকার হাসিল হইত।

হযরত সার্বী সাকাতি (রহঃ) বলেন, আমি আলী জুরজানী (রহঃ)এর নিকট ছাত্তু দেখিলাম। তিনি উহা মুখে পুরিয়া খাইতেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ছাত্তু খাওয়ার অভ্যাস কিভাবে হইল? তিনি বলিলেন, আমি হিসাব করিয়া দেখিয়াছি, লোকমা মুখে রাখিয়া উহা গিলিয়া খাওয়া পর্যন্ত সময়ে সত্তরবার সুবহানাল্লাহ বলিবার সুযোগ পাওয়া যায়। এইজন্য আমি চল্লিশ বৎসর যাবৎ রুটি খাই নাই। কেননা, উহা চিবাইতে অনেক সময় লাগে। আসল কথা এই যে, মানুষের প্রত্যেকটি নিঃশ্বাস অনেক বেশী মূল্যবান সম্পদ, যাহাকে আখেরাতের ভাণ্ডারে সঞ্চয় করিয়া রাখার অত্যন্ত প্রয়োজন। যাহাতে উহা নষ্ট না হয়। আর উহার উপায় একমাত্র এই যে, এই নিঃশ্বাসকে আল্লাহ তায়ালার যিকির অথবা অন্য কোন এবাদতে খরচ করিয়া দেওয়া। ইহা ছাড়া খানা বেশী খাইলে বেশী সময় ওয়ু রাখা যায় না। অল্প সময়ে ওয়ু নষ্ট হইয়া যায়। এন্তেঞ্জার প্রয়োজন বেশী হয়। এইসব কারণে সময় নষ্ট হওয়া ছাড়া এই ক্ষতিও হয় যে, মসজিদে বেশী সময় কাটানো যায় না। বারবার এই সমস্ত প্রয়োজনে বাহির হইতে হয়। কম খাওয়ার দ্বারা রোযাও সহজে রাখা যায়। কেননা, ক্ষুধার্ত থাকার অভ্যাস হইয়া যায়। মোটকথা, রোযা, এতেকাফ, দীর্ঘ সময় ওয়ু অবস্থায় থাকা এবং খানাপিনার সময়গুলিকে এবাদতে খরচ করা ইত্যাদিতে এত বেশী ফায়দা রহিয়াছে যে, উহা গণনা করিয়া শেষ করা যায় না। ইহার মূল্য ঐ সমস্ত গাফেল লোক কি জানিবে, যাহাদের নিকট দ্বীনের কোনই মূল্য নাই। তাহারা দুনিয়ার কয়েক দিনের জীবনের উপর তুষ্ট হইয়া নিশ্চিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং তাহারা কেবল দুনিয়ার অবস্থাই জানে। তাহাদের আখেরাত সম্পর্কে খবরই নাই যে, উহা কি জিনিস।

আট—কম খাওয়ার অষ্টম ফায়দা হইল, শরীর সুস্থ থাকা। কারণ, অতিরিক্ত খাওয়ার কারণেই অনেক রোগের উৎপত্তি হয়। উহা দ্বারা পাকস্থলী ও রগের মধ্যে বিষাক্ত জীবাণু জমা হইয়া বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি হয়। আর রোগব্যাদি স্বাস্থ্যের জন্য তো ক্ষতিকর আছেই। এবাদত-বন্দেগী হইতেও বাধার কারণ হয়। অন্তরকে পেরেশান করে, যিকির ও ফিকিরে বাধা সৃষ্টি করে। এছাড়া ঔষধ সেবন, কুপথ্য বর্জন, ডাক্তার, কবিরাজ, শিদ্দা লাগানেওয়ালার, ব্যায়ামকারী—মোটকথা, লম্বা চওড়া ঝামেলা আরম্ভ হইয়া যায়। উপরন্তু, এই সবকিছুর মধ্যে অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং অতিরিক্ত খরচও রহিয়াছে। অল্প ভোজনে এইসব আপদ হইতে মুক্তি পাওয়া যায়।

খলীফা হারুন রশীদ (রহঃ) একবার চারজন অভিজ্ঞ হাকীমকে

একত্রিত করিলেন। একজন হিন্দুস্তানী, দ্বিতীয় জন রুমী (ইংরেজী), তৃতীয়জন ইরাকী, চতুর্থজন সাওয়াদী (সাওয়াদের অধিবাসী)। তিনি চারজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন এমন ঔষধের নাম বলুন, যাহার কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নাই। হিন্দুস্তানী বলিলেন, আমার মতে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াবিহীন ঔষধ হইল 'আহলীলাজে আসওয়াদ' (হালীলায়ে সিয়াহ)। ইরাকী বলিলেন, আমার মতে এইরূপ ঔষধ হইল 'হাব্বুর রাশাদিল আব্বাজ' (যাহাকে ফারসী ভাষায় তুখমে সিপান্দান এবং হিন্দি ভাষায় হালুন বলে)। রুমী বলিলেন, আমার মতে এইরূপ ঔষধ গরম পানি, অর্থাৎ ইহা কোন দিক দিয়া ক্ষতিকর নয়। সাওয়াদী বলিলেন, এইসব ধারণা ভুল। হালীলা পাকস্থলীকে দলিত করে। আর ইহা একটি স্বতন্ত্র ব্যাধি (এছাড়া ইহা কলিজার জন্যও ক্ষতিকর।— যাকারিয়া) আর হাব্বুর রাশাদ পাকস্থলীর মধ্যে পিচ্ছিল অবস্থা আনয়ন করে। আর গরম পানি পাকস্থলীকে টিলা করিয়া দেয়। সকল চিকিৎসকগণ বলিলেন, তবে আপনিই বলুন, এইরূপ ঔষধ কোনটি, যাহা কোনরূপ ক্ষতি করে না। সাওয়াদী বলিলেন, খানা ঐ সময় পর্যন্ত না খাওয়া, যতক্ষণ পর্যন্ত খাওয়ার প্রতি খুব আগ্রহ পয়দা না হয় এবং খাওয়া-দাওয়া এমন অবস্থায় শেষ করিয়া ফেলা, যখন আরও বেশী খাওয়ার আগ্রহ বাকী থাকে। উপস্থিত চিকিৎসক তিনজনই তাহার এই অভিমতের সহিত একমত প্রকাশ করিলেন।

জনৈক দার্শনিক চিকিৎসকের সম্মুখে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করা হইল যে, পেটের এক-তৃতীয়াংশ খাওয়ার জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানির জন্য আর এক-তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য। সে এই কথা শুনিয়া বড় আশ্চর্য হইল এবং বলিল, কম খাওয়া সম্পর্কে আমি ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ ও মজবুত কথা আজ পর্যন্ত শুনি নাই। নিঃসন্দেহে ইহা কোন হাকীমের কথা।

নয়—নবম ফায়দা, খরচাদি কমিয়া যায়। যে ব্যক্তি কম খাওয়ায় অভ্যস্ত, তাহার খরচও কম হইবে। আর বেশী খাওয়ার মধ্যে খরচাদিও বেশী হইবে এবং উপার্জন করিবার জন্য নাজায়েয পন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইবে। অথবা মানুষের নিকট সওয়াল করিবার অপমান সহ্য করিতে হইবে। (হযরত সাহল তুশতারী (রহঃ)এর অবস্থা কিছু পূর্বে গিয়াছে যে, পুরা বৎসরে তাহার খানার খরচের পরিমাণ ছিল এক দেহহাম।

জনৈক হাকীম বলেন, আমি আমার অনেক প্রয়োজন ; বর্জন করার দ্বারাই পূরণ করিয়া থাকি। ফলে, আমার অত্যন্ত একাগ্রতা ও শান্তি লাভ

হয়।

অন্য একজন হাকীম বলেন, যখন আমার কোন প্রয়োজন মিটাইবার জন্য কাহারও নিকট হইতে কর্জ লওয়ার প্রয়োজন হয়, তখন আমি আমার নফসের নিকট হইতেই কর্জ চাহিয়া লই। তাহাকে বুঝাইয়া দেই যে, এই প্রয়োজন অন্য কোন সময় আদায় করিয়া দিব। অর্থাৎ তোর খাহেশ এখন আমার জিম্মায় কর্জ রহিল। উহাকে অন্য কোন সময় পূরা করিয়া দিব।

হযরত ইবরাহীম আদহাম (রহঃ) যখন কোন জিনিসের মূল্য অনেক বেশী দেখিতেন, তখন তিনি আপন বন্ধুদেরকে বলিতেন, ইহাকে খরিদ না করিয়া সস্তা করিয়া দাও। (অর্থাৎ, মানুষ যে জিনিস খরিদ করা পরিত্যাগ করিল, তাহার পক্ষ হইতে তো উহার কোন দামই রহিল না ; অন্যের কাছে চাই যত দামেই বিক্রয় হউক। মানুষের ধ্বংসের বড় কারণ দুনিয়ার লোভ, আর এই লোভ পেট ও লজ্জাস্থানের কারণেই পয়দা হয়। লজ্জাস্থানের শক্তিও পেটের শক্তির দ্বারা সৃষ্টি হয়। কম খাওয়া এইসব মুসীবত হইতে বাঁচার উপায়। আল্লাহ তায়ালা যাহাকে চাহেন ইহা দান করেন।

দশ—কম খাওয়ার দশম ফায়দা এই যে, ইহা অন্যের প্রতি সহানুভূতি, অন্যকে নিজের উপর প্রাধান্য দেওয়া এবং অধিক পরিমাণে দান-খয়রাত করার কারণ হয়। কম খাওয়ার কারণে যে পরিমাণ খানা বাঁচিয়া যাইবে, উহা এতীম, মিসকীন, গরীবদের উপর খরচ করার কারণে কেয়ামতের দিন ছায়াস্বরূপ হইবে। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, মানুষ কেয়ামতের দিন আপন সদকার ছায়াতলে থাকিবে। আর যত বেশী ভোজন করিবে, উহা পায়খানা হইয়া ময়লায় পরিণত হইবে। আল্লাহ তায়ালা ভাঙারে যাহা জমা হইয়াছে, উহা চিরস্থায়ী কাজে আসিতে থাকিবে। আর যাহা পায়খানায় পরিণত হইয়াছে, উহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই জন্য হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ যাহা পূর্বেও বর্ণিত হইয়াছে যে, মানুষ বলে আমার মাল, আমার মাল, অথচ তাহার মাল হইতে তিনটি জিনিস ব্যতীত কিছুই তাহার নয়। এক—যাহা সে সদকা করিয়া চিরস্থায়ী রূপে হেফাজত করিয়াছে। দ্বিতীয়—যাহা খাইয়া শেষ করিয়াছে। তৃতীয়—যাহা পরিধান করিয়া পুরাতন করিয়া ফেলিয়াছে। ইহা ছাড়া বাকী সব অন্যের মাল এবং উত্তরাধিকারীদের অংশ। উহাতে তাহার কোন অংশ নাই। ইহা ছাড়াও সদকা করার ফযীলতসমূহ অধিকহারে পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। কম খাওয়ার এই দশটি উপকারিতা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করা হইল।

প্রত্যেকটি উপকারিতা অসংখ্য উপকারিতার সমষ্টি। (এইইয়া)

এখানে একটি কথা লক্ষ্যণীয়, যাহা পূর্বেও কয়েকবার লিখা হইয়াছে যে, এই সমস্ত ফযীলতের মধ্যে কোন সন্দেহ নাই। নিঃসন্দেহে এই সকল গুণাবলী আল্লাহ তায়ালা যে সকল ভাগ্যবানকে আপন অনুগ্রহে দান করেন, তাহাদের জন্য ইহা দীন ও দুনিয়া উভয় ক্ষেত্রে আরাম এবং আখেরাতের জন্য অসংখ্য মর্যাদার স্তর ও উন্নতির সিঁড়ি। কিন্তু নিজের সহ্য ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এমন যেন না হয় যে, কাকের মত ময়ূরের নাচ নাচিতে গিয়া নিজের চালও ভুলিয়া যায়। বেশীর লোভ করিতে যাইয়া মানুষ আসলও হারাইয়া ফেলে। এইজন্য এইসব জিনিসের প্রতি অন্তরকে উৎসাহিত করা এবং বর্ণিত গুণাবলী ও জীবন পদ্ধতিকে নিজের ভিতর পয়দা করিবার চেষ্টা করিতে করিতে এইসব বিষয়কে অত্যন্ত গুরুত্ব ও ভক্তির দৃষ্টিতে দেখা চাই। তবে আমল ততটুকুই করিবে, যতটুকু নিজের মধ্যে সহ্য করার ক্ষমতা থাকে। অসুস্থ ব্যক্তি যদি শক্তির বাহিরে বোঝা উঠায়, তবে তাড়াতাড়ি মারা যাইবে। আমরা নফসের রোগে আক্রান্ত, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও শারীরিকভাবে দুর্বল। এইজন্য স্বাস্থ্যের আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা এবং উহার আগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে এমন কোন জিনিস কার্যতঃ অবলম্বন না করা চাই, যাহা ঐ অবস্থা হইতে আরও নিচে নামাইয়া দেয়—যে অবস্থায় বর্তমানে রহিয়াছি।

ইমাম গায়খালী (রহঃ) বলেন, কম খাওয়ার অভ্যাস ক্রমান্বয়ে ধীরে ধীরে পয়দা করা চাই। যে ব্যক্তি বেশী খাওয়ায় অভ্যস্ত, সে হঠাৎ খানা কমানিয়া দিলে সহ্য করিতে পারিবে না। দুর্বল হইয়া যাইবে এবং কষ্টও বাড়িয়া যাইবে। এইজন্য খুবই ধীরস্থিরে এবং সহজভাবে উহা অবলম্বন করা চাই। যেমন, যদি কোন ব্যক্তি দুই রুটি খাওয়ায় অভ্যস্ত থাকে, তবে তাহার এক রুটির আটাইশ ভাগের একভাগ প্রতিদিন কমানো চাই। এইভাবে একমাসের ভিতর অর্ধেক কমিয়া যাইবে। (যদি ইহাও সহ্য করিতে কঠিন হয়, তবে চল্লিশ ভাগের একভাগ কম করিবে।)

হযরত সাহল তুশতারী (রহঃ)কে কেহ জিজ্ঞাসা করিল, আপনার সাধনার সূচনা কিভাবে হইয়াছিল? তিনি বলিলেন, আমার বাৎসরিক খরচ শুরুতে তিন দেরহাম ছিল। শুরুতে উহার ব্যবস্থা এইরূপ ছিল যে, আমি এক দেরহামের দ্বারা শুধু (আঙ্গুর অথবা খেজুরের রস) খরিদ করিয়া লইতাম। আর এক দেরহাম দ্বারা চাউলের আটা, আর এক দেরহাম দ্বারা ঘি খরিদ করিতাম। এই তিন জিনিসকে মিলাইয়া তিনশ' ঘাটটি লাড্ডু বানাইয়া লইতাম। প্রতিদিন রোযা ইফতার করিবার সময় একটি করিয়া

খাইয়া লইতাম। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, এখন আপনার অভ্যাস কি? তিনি বলিলেন, এখন তো নির্ধারিত কোন জিনিস নাই। যখন সুযোগ হয়, কিছু খাইয়া লই (কিছু পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বিশ দিন একাধারে না খাইয়া কাটাইয়া দিতেন)।

হযরত আবু যর গিফারী (রাযিঃ) বলেন, আমার খোরাকী হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জমানায় এক ছা' যব (প্রায় সাড়ে তিনসের) প্রতি সপ্তাহে ছিল। আল্লাহর কসম! আমি মৃত্যু পর্যন্ত কখনও ইহা হইতে বেশী করিব না। কারণ, আমি হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনিয়াছিলাম, তোমাদের মধ্য হইতে আমার নিকট অধিক প্রিয় এবং কেয়ামতের দিন আমার অধিক নিকটবর্তী ঐ ব্যক্তি হইবে, যে মৃত্যু পর্যন্ত ঐ অবস্থার উপর থাকে, যে অবস্থায় এখন আছে। এই কারণেই তিনি কোন কোন সাহাবায়ে কেরামের উপর অভিযোগ করিতেন যে, তোমরা ঐ নিয়ম ছাড়িয়া দিয়াছ, যাহা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জমানায় ছিল। তোমরা যবের আটা চালিতে আরস্ত করিয়াছ; অথচ ঐ যমানায় চালা হইত না। তোমরা পাতলা রুটি খাইতে আরস্ত করিয়াছ। কয়েক পদের সালন দস্তুরখানের উপর আসিতে আরস্ত করিয়াছে। তোমরা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জমানায় এমন ছিলে না।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, মুসলমানের উদাহরণ হইল, বকরির বাচ্চার মত, যাহার জন্য এক মুষ্টি পুরাতন খেজুর, এক মুষ্টি ছাতু এবং এক ঢোক পানিই যথেষ্ট। আর মুনাফেকের উদাহরণ হইল, হিংস্র জন্তুর মত। গপাগপ করিয়া, গট গট করিয়া যাহা পাইল সবই খাইয়া, পান করিয়া লইল। না নিজের প্রতিবেশীর খেয়াল করিল, না অন্যকে নিজের উপর প্রাধান্য দিল। প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস (দান-খয়রাত করিয়া) ভবিষ্যতের জন্য পাঠাইয়া দাও (তোমাদের কাজে আসিবে)।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) একাধারে ছয়দিন না খাইয়া থাকিতেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাযিঃ) সাতদিন পর্যন্ত না খাইয়া থাকিতেন।

এক বুযুর্গের এক খুঁটান সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি তাহার সহিত কথাবার্তা বলিতেছিলেন। ইত্যবসরে তিনি তাহাকে ইসলামের প্রতি দাওয়াতও দিলেন। সে কথা প্রসঙ্গে বলিল, হযরত ঈসা (আঃ) চল্লিশ দিন পর্যন্ত না খাইয়া থাকিতেন। ইহা তো মুজ্জেযা হিসাবেই হইতে পারে। নবী

ছাড়া কাহারও দ্বারা ইহা হইতে পারে না। উক্ত বুয়ুর্গ বলিলেন, আমি যদি পঞ্চাশ দিন না খাইয়া থাকি, তবে কি তুমি মুসলমান হইয়া যাইবে? সন্ন্যাসী বলিল, অবশ্যই। বুয়ুর্গ সেখানেই তাহার নিকট অবস্থান করিলেন। তাহারই নিকট থাকিতেন। যখন পঞ্চাশ দিন পূরা হইয়া গেল, তখন বলিতে লাগিলেন, ইহা তো ওয়াদার পঞ্চাশ দিন, দশ আরও অতিরিক্ত লও। ইহা বলিয়া আরও দশ দিন না খাইয়া রহিলেন। পূরা ষাট দিন পর খাইলেন। সেই সন্ন্যাসী অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইল এবং মুসলমান হইয়া গেল।

এক হাদীসে আসিয়াছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সকালে খানা খাইতেন, সন্ধ্যায় খাইতেন না। আর যখন সন্ধ্যায় খানা খাইতেন, সকালে খানা খাইতেন না। (জামে সগীর) (অর্থাৎ কখনও কখনও এই অভ্যাস ছিল)

পূর্ববর্তী বুয়ুর্গদের এক ওয়াক্ত খানা খাইবার অভ্যাস বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম রায়ী (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি এক ওয়াক্ত খানা খাইতে অভ্যস্ত হয় তাহার জন্য উত্তম হইল, সে যেন সেহরীর সময় খায়। যাহাতে দিনে রোযা রাখার ফযীলত হাসিল হয় এবং রাত্রের নফল ও যিকির ইত্যাদির সময় পাকস্থলী খালি থাকে।

হযরত মালেক ইবনে দিনার (রহঃ)এর চল্লিশ বছর পর্যন্ত দুধ পান করিতে ইচ্ছা হইতেছিল। কিন্তু তিনি পান করেন নাই। একবার কোথাও হইতে তাহার খেদমতে তাজা খেজুর আসিল। তিনি বন্ধুদেরকে বলিলেন, এইসব তোমরা খাইয়া লও। আমি চল্লিশ বৎসর যাবত ইহার স্বাদ গ্রহণ করি নাই। (এহইয়া)

ইমাম গায়যালী (রহঃ) বুয়ুর্গদের এই ধরনের অনেক ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন। এই সমস্ত সাধনার বরকতেই তাহাদের নিকট হইতে কারামতসমূহ প্রকাশিত হইত। এখন তাহাদের মত কারামতসমূহ তো প্রত্যেকেই চাহিয়া থাকে; কিন্তু ইহার জন্য তাহাদের মত সাধনাও তো করিতে হইবে। আমাদের তো খাদ্য উত্তম হইতে উত্তম ও উন্নত হইতে উন্নত হওয়া চাই। এমতাবস্থায় এইরূপ মুজাহাদা কিভাবে হইবে।

এক বুয়ুর্গ তাহার এক আপন লোককে দাওয়াত করিলেন। তাহার জন্য দস্তুরখানে রুটি রাখিলেন। মেহমান ওলট-পালট করিয়া উহা হইতে ভাল রুটি তালাশ করিতে লাগিল। মেজবান বুয়ুর্গ বলিলেন, কি করিতেছ? যেই রুটিকে তুমি খারাপ মনে করিয়া বাদ দিতেছ, উহাতে এত এত উপকারিতা রহিয়াছে এবং উহার মধ্যে মেহনতকারীদের এত এত কষ্ট

ও পরিশ্রম রহিয়াছে যে, বহু মেহনতকারীর মেহনতের পর মেঘের ভিতর পানি আসিয়াছে। অতঃপর উহা বর্ষিত হইয়াছে। অতঃপর বাতাস, জমিন, চতুষ্পদ জন্তু ও মানুষের মেহনত লাগিয়াছে। এত পরিশ্রমের পর এই রুটি তোমার সম্মুখে আসিয়াছে। এত কিছুর পরও তুমি উহার মধ্যে ভাল-মন্দ বাছাই করিতে লাগিয়া গিয়াছ। বলেন, একটি রুটি প্রস্তুত হইয়া তোমার সম্মুখে ঐ সময় পর্যন্ত আসে না ; যতক্ষণ পর্যন্ত উহাতে তিনশত ষাট জন কর্মীর কাজ না হয়। সর্বপ্রথম হযরত মিকাসিল (আঃ) যিনি আল্লাহ তায়ালা রহমতের ভাণ্ডার হইতে নির্দিষ্ট পরিমাণ জিনিস বাহির করেন। তারপর ঐ সমস্ত ফেরেশতা যাহারা মেঘের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন এবং মেঘগুলিকে চালাইতেছেন—তাহাদের মেহনত। অতঃপর চাঁদ, সূর্য, আসমান তারপর ঐ সমস্ত ফেরেশতা, যাহারা বাতাসের কাজে আদিষ্ট আছেন। তারপর চতুষ্পদ জন্তু। সর্বশেষে রুটি পাকানেওয়ালা। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র এরশাদ একেবারে সত্য। তিনি এরশাদ করেন : **وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا** অর্থাৎ, যদি তোমরা আল্লাহ তায়ালা একটি নেয়ামত (এবং উহার বিস্তারিত অবস্থা)কে গণনা করিতে থাক, তবে কখনও পরিপূর্ণভাবে গণিতে পারিবে না। (ইবরাহীম : ৩৪) ইহার পর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও লক্ষ্যণীয় বিষয় ইহাও যে, কম খাওয়ার নিয়ম যদি অবলম্বন কর, তবে ইহাতে লোক দেখানো ও নাম-যশের লিপ্সা হইতে বাঁচিবার বিষয়েও খুব এহতেমাম করিবে। এমন যেন না হয় যে, একদিকে না খাইয়া মরিলে অপরদিকে নফস নেক না হইয়া আরও বেশী খারাপ হইয়া গেল। ওলামায়ে কেরাম লিখিয়াছেন, যে ব্যক্তি খাওয়ার খাহেশ হইতে ছুটিয়া রিয়া বা লোক দেখানোর খাহেশে গ্রেফতার হইয়া যায়, সে এইরূপ হইল—যেমন বিচ্ছু হইতে পলায়ন করিয়া সাপের মুখে পড়িল। (এহইয়া)

মোটকথা, কম খাওয়া প্রশংসিত জিনিস। উহাতে দীন-দুনিয়ার প্রচুর ফায়দা রহিয়াছে। তবে শর্ত এই যে, শারীরিক দুর্বলতা অথবা লোক দেখানো ইত্যাদি অন্য কোন আশংকার মধ্যে যেন পড়িয়া না যায়। তবে ইহা জরুরী যে, হযূর সালামু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন ও জীবিকা, বসবাস এবং তাহার অভাব-অনটনকে মনে রাখিবে। অন্তর দ্বারা উহাকে পছন্দ করিতে থাকিবে। কেননা, আসল উহাই।

হযূর সালামু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে তরীকা এখতিয়ার করিয়াছিলেন, উহা অভাব ও অপারগতার জন্য ছিল না। এই কারণে ছিল না যে, তিনি উহা পাইতেন না। বরং ইচ্ছাকৃত ও সন্তুষ্টচিত্তে তিনি

এইরূপ জীবন-পদ্ধতি এখতিয়ার করিয়াছিলেন।

একবার আয়েশা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আল্লাহ তায়ালার নিকট রুজির প্রশস্ততা কেন চাহিয়া লন না? হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, আমি ইহা বলিয়া এবং ছ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষুধার কষ্ট দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। ছ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, হে আয়েশা! ঐ মহান সত্তার কসম! যাহার হাতে আমার জান। যদি আমি আমার প্রতিপালকের নিকট ইহা চাই যে, স্বর্গের পাহাড় আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে থাকুক, তবে আল্লাহ তায়ালা উহাকে আমার সহিত চালাইয়া দিবেন। কিন্তু আমি দুনিয়াতে ক্ষুধার্ত থাকাকে পেট ভর্তি করার উপর প্রাধান্য দিয়াছি। আমি দুনিয়ার দরিদ্রতাকে ধন-দৌলতের উপর প্রাধান্য দিয়াছি। আমি দুনিয়ার দুঃখ-চিন্তাকে আনন্দ-খুশীর উপর প্রাধান্য দিয়াছি। হে আয়েশা! দুনিয়া মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাহার পরিবারের জন্য উপযুক্ত নয়। আল্লাহ তায়ালা উলুল-আযম (অর্থাৎ হিম্মতওয়ালা ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন) পয়গম্বরগণের জন্য ইহাকেই পছন্দ করিয়াছেন যে, তাহারা দুনিয়ার দুঃখ-কষ্টের উপর ছবর করিবেন। দুনিয়ার আরাম-আয়েশ হইতে বাঁচিয়া চলিবেন। আর যে জিনিস আল্লাহ তায়ালা তাহাদের জন্য পছন্দ করিয়াছিলেন, আমাকেও উহারই হুকুম করিয়াছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন : فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعِزْمِ مِنَ الرُّسُلِ অর্থাৎ, আপনিও ঐরকম ছবর করুন—যেই রকম উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন পয়গম্বরগণ ছবর করিয়াছেন। (আহকাফ : ৩৫) আমার জন্য আল্লাহর হুকুম পালন করা ছাড়া উপায় নাই। আল্লাহর কসম! আমি আমার শক্তি অনুযায়ী তেমনই ছবর করিব, যেমন তাহারা করিয়াছেন। আর শক্তি-সামর্থ্য তো আল্লাহ তায়ালার তৌফিকের দ্বারাই হয়।

হাদীস শরীফে আসিয়াছে, হযরত ওমর (রাযিঃ)এর খেলাফতকালে যখন চতুর্দিকে ব্যাপক হারে ইসলামের বিজয় হইতেছিল, তখন তাহার কন্যা উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, এখন তো আপনার নিকট অন্যান্য দেশের দূতগণ আসে। কাজেই আপনি পাতলা কাপড় পরিধান করুন এবং কাহাকেও খানা পাকাইবার হুকুম করিয়া দিন। যাহাতে আপনি তাহাদের মেহমানদারী করিতে পারেন এবং তাহাদের সহিত আপনিও খানায় শরীক হইতে পারেন। হযরত ওমর (রাযিঃ) এরশাদ করিলেন, ইহা তো তোমারও জানা আছে যে, মানুষের অবস্থা

সম্পর্কে তাহার ঘরের লোকেরাই ভালভাবে জানে। হযরত হাফসা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, অবশ্যই। হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, আমি তোমাকে কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, তোমার কি জানা নাই যে, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়তের পর এত বৎসর জীবিত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার পরিবারের লোকেরা যদি রাতে খানা খাইতেন, তবে দিনে ভুখা থাকিতেন। আর যদি দিনে খানা খাইতেন, তবে রাতে ভুখা থাকিতেন। তোমার কি জানা নাই যে, নবুওয়তের পর এত বৎসর পর্যন্ত হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত ছিলেন। কিন্তু হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও পরিবারের লোকেরা খায়বর বিজয় হওয়া পর্যন্ত কখনও পেট ভরিয়া খেজুরও খান নাই। আমি তোমাকে কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, তোমার কি জানা নাই যে, একবার তুমি (টেবিলের মত) উচা খাঞ্চার উপর খানা রাখিয়াছিলে। তখন হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরানী চেহারার রং পরিবর্তন হইয়া গিয়াছিল। অবশেষে উহাকে সরাইয়া জমিনের উপর খানা রাখা হইয়াছিল। (অতঃপর হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খানা খাইয়াছেন।) আমি তোমাকে কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, তোমার কি জানা নাই যে, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জুব্বা (চাদর জাতীয় এক প্রকার পোশাক)কে দুই ভাজ করিয়া উহার উপর আরাম করিতেন। তুমি একবার উহাকে চার ভাজ করিয়া বিছাইয়া দিয়াছিলে। তখন হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি আমাকে রাতে উঠা হইতে বিরত রাখিয়াছ। (চার ভাজ হওয়ার কারণে বিছানা নরম হইয়াছিল, ফলে ঘুম গাঢ় হইয়াছিল।) উহাকে প্রতিদিনের মত দুই ভাজই করিয়া দাও। আমি তোমাকে কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, তোমার কি জানা নাই যে, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের কাপড় ধৌত করার জন্য শরীর মুবারক হইতে খুলিতেন এবং উহাকে ধৌত করিতেন। এমন অবস্থায় যদি বেলাল (রাযিঃ) নামাযের জন্য ডাকিতে আসিতেন, তখন হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দ্বিতীয় কোন কাপড় থাকিত না, যাহা পরিধান করিয়া নামায পড়াইবেন। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ কাপড়ই শুকাইয়া পরিধান করিয়া নামায পড়াইতেন। আমি তোমাকে কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, তোমার কি জানা নাই যে, বনী জাহর গোত্রের একজন মেয়েলোক হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য দুইটি কাপড় তৈরী করিল। একটি লুঙ্গি আর একটি চাদর। তন্মধ্যে সে

একটি আগে পাঠাইয়া দিল, দ্বিতীয়টি পাঠাইতে দেবী হইল। তখন ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহাকেই শরীরের উপর এমনভাবে পেচাইয়া ঘাড়ের উপর দুই কোণে গিরা লাগাইয়াছিলেন (যাহাতে শরীর খুলিয়া না যায়)। উহা পরিধান করিয়া তিনি নামাযের জন্য গিয়াছেন। ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অন্য কাপড় ছিল না, যাহা পরিধান করিয়া নামাযের জন্য যাইতে পারেন। এইভাবে হযরত ওমর (রাযিঃ) আরও অনেক ঘটনা বলিতে থাকিলেন। অবশেষে এই সমস্ত ঘটনা স্মরণ করাইয়া তিনি হযরত হাফসা (রাযিঃ)কেও কাঁদাইলেন এবং নিজেও চিৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আমাদের আশংকা হইতেছিল যে, এই কষ্টের কারণে তাহার প্রাণ বাহির হইয়া না যায়।

অন্য এক হাদীসে আছে, হযরত ওমর (রাযিঃ) বলেন, আমার দুইজন সাথী ছিলেন (ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর (রাযিঃ)) তাহারা দুইজন একই পথে চলিয়াছেন। আমি যদি তাহাদের পথ ছাড়িয়া অন্য পথ অবলম্বন করি, তবে আমার সহিত ঐ আচরণ করা হইবে না, যাহা তাহাদের সহিত করা হইয়াছে। আল্লাহর কসম! আমি তাহাদের মত (দুনিয়ার) কঠিন জীবন যাপনের ব্যাপারে নিজেকে বাধ্য করিব। যাহাতে (আখেরাতে) তাহাদের ন্যায় আনন্দময় জীবন লাভ করিতে পারি। (এহইয়া)

‘ফতওয়া আলমগীরী’ কিতাবে লিখিয়াছে, খাওয়ার কয়েকটি স্তর আছে। প্রথম স্তর ফরজ—উহা এই পরিমাণ, যাহা দ্বারা মানুষ ধ্বংস হইতে বাঁচিতে পারে। যদি কোন ব্যক্তি এত কম খায় অথবা খানাপিনা ছাড়িয়া দেয় তাহার কারণে সে ধ্বংস হইয়া যায়, তবে গোনাহগার হইবে। দ্বিতীয় স্তর সওয়াবের। অর্থাৎ এই পরিমাণ খাইবে, যাহা দ্বারা দাঁড়াইয়া নামায পড়া যায় এবং সহজে রোযা রাখা যায়। তৃতীয় স্তর জায়েয। আর উহা দুই নম্বরে বর্ণিত পরিমাণের চেয়ে বেশী ; পেট ভরা পরিমাণ বৃদ্ধি করা। যাহাতে শরীরে শক্তি পয়দা হয়। এই স্তরে না কোন সওয়াব আছে, না গুনাহ। ইহাতে সাধারণ হিসাব হইবে, তবে শর্ত হইল—মাল হালাল তরীকায় হাসিল হইতে হইবে। চতুর্থ স্তর হারাম। উহা পেট ভরিয়া খাওয়ার পর অতিরিক্ত পরিমাণ। অবশ্য, এই স্তরে যদি রোযার জন্য শক্তি অর্জন করা উদ্দেশ্য হয়, অর্থাৎ আগামীকাল রোযা রাখিতে হইবে অথবা যদি এই উদ্দেশ্য হয় যে, মেহমান যেন ভুখা না থাকে, তবে এই পরিমাণের মধ্যেও দোষ নাই। আর কম খাওয়ার এমন মোজাহাদা তাহার কারণে ফরজ এবাদতে ক্ষতি হয় ; জায়েয নয়। হাঁ যদি এবাদতে ক্ষতি না

হয়, তবে কম খাওয়ার মুজাহাদা করার মধ্যে দোষ নাই। কেননা, ইহাতে নফসের সংশোধনও রহিয়াছে এবং আগ্রহ সহকারে খানাও খাওয়া যায়। এমনভাবে, কোন যুবকের জন্য কম খাওয়ার মুজাহাদা করা যাহাতে তাহার কামভাব কম হইয়া যায় ; ইহা জায়েয আছে। (আলমগীরী)

উক্ত তিন প্রকারের মধ্যে দ্বিতীয় প্রকারটি সম্পর্কে 'দুররুল মুখতার' কিতাবের লেখক ও অন্যান্য ফকীহগণ আলোচনা করিয়াছেন। তাহারা ঐ পরিমাণকে ফরজের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন, যে পরিমাণ দ্বারা দাঁড়াইয়া নামায পড়া যায়। আলমগীরী কিতাবের শেষোক্ত বাক্য দ্বারাও ইহার জোর সমর্থন হয়।

⑫ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَضِيَ مِنَ اللَّهِ بِالْيَسِيرِ مِنَ الرِّزْقِ رَضِيَ اللَّهُ مِنْهُ بِالْقَلِيلِ مِنَ الْعَمَلِ -

حُضُورِ اَللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ
 ارشاد ہے کہ جو شخص حق تعالیٰ شائے
 سے تنہا روزی پر راضی رہے حق
 تعالیٰ شائے بھی اس کی طرف سے تمکو
 عمل پر راضی ہو جاتے ہیں۔

(رواہ الیہقی فی الشعب کذا فی مشکوٰۃ)

⑬ ছুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা প্রতি সামান্য রুজির উপর রাজি থাকে, আল্লাহ তায়ালাও তাহার পক্ষ হইতে সামান্য আমলের উপর রাজি হইয়া যান।

(মিশকাত : বায়হাকী)

ফায়দা : এই হাদীসে আমদানী কম হওয়া অবস্থায় আল্লাহ তায়ালা একটি বিশেষ অনুগ্রহের কথা বলা হইয়াছে। বর্ণিত অবস্থায় মানুষের পক্ষ হইতে যদি নেক আমলের কমি হয়, তবে সমগ্র জগতের বাদশাহ আল্লাহ তায়ালাও এই কমিকে খুশীর সহিত কবুল করিয়া লন। পক্ষান্তরে, যখন আল্লাহ তায়ালা পক্ষ হইতে দান অধিক হয় এবং সে-ও কোন জিনিসের কম হওয়াকে সহ্য না করে, তখন মালিকের পক্ষ হইতেও দাবী এই যে, তাহার হকসমূহ আদায় করার ব্যাপারেও যেন তোমাদের পক্ষ হইতে অধিক পরিমাণে হয়। আর জানা কথা যে, যে কর্মচারীকে তাহার দাবী অনুযায়ী বেতন দেওয়া হয় অতঃপর সে আপন দায়িত্বের ব্যাপারে ত্রুটি করে, তবে তাহার নিমকহারামীর মধ্যে সংশয়ের কি আছে। কিন্তু আমাদের অবস্থা উহার বিপরীত। অর্থাৎ গরীব লোকদের তো আল্লাহর

দিকে রুজু হওয়ার তওফীক হইয়া যায় ; তাহারা যিকির ও নফলের জন্য সময়ও পায়। কিন্তু যখনই চার পয়সা হাতে আসিল অথবা উহা আসিবার ব্যবস্থা হইল, তখন ফরজ নামাযের জন্যও সময় পাওয়া যায় না। অল্প রুজির উপর তুষ্ট থাকা তখন হাসিল হইতে পারে, যখন মানুষ পাঁচটি বিষয়ের এহতেমাম করে।

এক—নিজের যাবতীয় খরচাদি কমাইবে। প্রয়োজন পরিমাণ হইতে অধিক খরচ যেন না করে। ওলামাগণ লিখিয়াছেন, একা মানুষের জন্য একজোড়া পোশাক যথেষ্ট। কয়েক জোড়া বানাইবার প্রয়োজন নাই। এমনিভাবে সামান্য রুটি ও সালনের উপর দিন কাটান যাইতে পারে। হযূর সাব্বান্নাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি খরচের মধ্যে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে, সে দরিদ্র হয় না।

দুই—যদি প্রয়োজন পরিমাণ পাইয়া যায়, তবে আগামীর চিন্তায় পড়িবে না। আব্বাহ তায়ালার ওয়াদার উপর ভরসা করিবে, আব্বাহ তায়ালার রুজির জিম্মা লইয়া রাখিয়াছেন। শয়তান সবসময় মানুষকে ভবিষ্যতের চিন্তায় ফেলিয়া রাখে যে, ভবিষ্যতের প্রয়োজনে কিছু সম্পদ জমা করিয়া রাখা দরকার ; মানুষের সহিত অসুবিধাও লাগিয়া আছে ; রোগ-শোকও লাগিয়া আছে ; খরচের প্রয়োজনও দেখা দিতে থাকে, তখন তোমার কষ্ট হইবে। এইসব ধারণার বশীভূত করিয়া তাহাকে কষ্ট ও ভবিষ্যতের চিন্তা-ফিকিরে পেরেশান করিয়া রাখে। আবার অন্যদিকে মানুষকে বিদ্রপও করে যে, এই বেয়াকুব লোকটি ভবিষ্যতের অনিশ্চিত কষ্টের ভয়ে উপস্থিত নিশ্চিত কষ্ট-মেহনত উঠাইতেছে।

হযূর সাব্বান্নাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ)কে বলিয়াছেন, অত্যধিক চিন্তা করিও না। যাহা তকদীরে আছে, উহা হইয়াই থাকিবে। আর যে পরিমাণ রিযিক তোমার জন্য বরাদ্দ রহিয়াছে, উহা আসিয়াই থাকিবে।

হযূর সাব্বান্নাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আব্বাহ তায়ালার আপন মুমিন বান্দাকে এমন জায়গা হইতে রুজি দান করেন, যেখান হইতে তাহার ধারণাও হয় না। আর কুরআন পাকেও এই বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

তিন—এই বিষয়ে গভীর চিন্তা করিবে যে, অল্পে তুষ্ট থাকিলে মানুষের নিকট হইতে অমুখাপেক্ষীতার কত বড় ইজ্জত হাসিল হয়। অথচ লোভ-লালসার কারণে মানুষের সম্মুখে কত অপমানিত হইতে হয়। এই বিষয় অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে চিন্তা করিতে হইবে যে, তাহাকে একটি কষ্ট

তো অবশ্যই সহ্য করিতে হইবে—মানুষের সম্মুখে হাত পাতার অপমান অথবা নিজের নফসকে মজাদার জিনিস হইতে বিরত রাখা। আর এই দ্বিতীয় কষ্টের উপর আল্লাহ তায়ালার নিকট সওয়াবের ওয়াদাও রহিয়াছে। আর প্রথমটির মধ্যে আখেরাতের ধ্বংস রহিয়াছে। ইহা ছাড়াও মানুষের সম্মুখে হাত পাতার কারণে সে তাহাদিগকে হক কথা বলিতে পারে না ; অধিকাংশ সময় দ্বীনের ব্যাপারে শিথিলতা অবলম্বন করিতে হয়।

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, প্রত্যেক ব্যক্তির সম্মান লোকদের নিকট হাত না পাতার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। এই কারণেই প্রসিদ্ধ আছে যে, যাহার নিকট তুমি কিছু চাহিবে না, তুমি তাহার সমকক্ষ (অর্থাৎ তাহার সম্মুখে তুমি ছোট হইতে বাধ্য নও)। আর যাহার নিকট তুমি কিছু চাহিবে, তুমি তাহার কয়েদী। আর যাহার উপর তুমি অনুগ্রহ করিবে, তুমি তাহার শাসক।

চার—দুনিয়াদার সম্পদশালী ব্যক্তিদের পরিণতি চিন্তা করিবে। ইহুদী, নাসারা ও বেদ্বীন মালদারদের পরিণতি চিন্তা করিবে। আশ্বিয়ায়ে কেরাম ও আউলিয়ায়ে কেরামের পরিণাম চিন্তা করিবে। তাহাদের অবস্থা গভীর মর্মেযোগ সহকারে পড়িবে এবং অনুসন্ধান করিবে। অতঃপর নিজের নফসকে জিজ্ঞাসা করিবে যে, আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের জমাতের সহিত শরীক হওয়া পছন্দ করে, না আহম্মক ও বেদ্বীন লোকদের মত হওয়া পছন্দ করে।

পাঁচ—মাল বেশী হওয়ার মধ্যে যে সমস্ত আশংকার কথা পূর্বে বলা হইয়াছে উহা চিন্তা করিবে যে, কত শত মুসীবত উহার সহিত রহিয়াছে। যখন মানুষ এই পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করিতে থাকিবে, তখন তাহার জন্য অল্পে তুষ্টির গুণ হাসিল করা সহজ হইয়া যাইবে। (এহইয়া)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন যে, ঐ ব্যক্তি সফলতা লাভ করিয়াছে, যে মুসলমান হইয়াছে এবং তাহাকে সামান্য রুজি দেওয়া হইয়াছে, আর আল্লাহ তায়ালা তাহাকে সামান্য রুজির উপর সন্তুষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন।

হযরত ফাজালা ইবনে ওবায়দ (রাযিঃ) হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন যে, মুবারক ঐ ব্যক্তি, যাহাকে ইসলাম গ্রহণ করার তৌফীক দেওয়া হইয়াছে, তাহার আমদানী প্রয়োজন পরিমাণ হয় আর সে উহার উপর সন্তুষ্ট থাকে। (তারগীব)

হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

এরশাদ বর্ণনা করেন যে, যখনই সূর্য উদয় হয় উহার দুই পার্শ্ব দুইজন ফেরেশতা প্রতিদিন এই ঘোষণা করে—হে লোকসকল! আপন পরওয়ারদিগারের প্রতি মনোযোগী হও। যে মাল অল্প এবং যথেষ্ট হয়, উহা ঐ প্রচুর মাল হইতে উত্তম, যাহা আল্লাহ ছাড়া অন্য দিকে মশগুল করে।

حضرت معاویہ بن جبَل فرماتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو میں (کا حاکم بنام) بمیجا تو یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو ناز و نعمت میں پرورش کرنے سے بچاتے رہنا اسلئے کہ اللہ کے نیک بندے ناز و نعمت میں لگنے والے نہیں ہوتے۔	۱۳ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ بِهِ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ إِيَّاكَ وَالتَّكْثُفَ فَإِنَّ عِبَادَ اللَّهِ لَيُسَوُّوْا بِالْمُسْتَقِيمِينَ (رواه أحمد كذا في المشکوٰۃ)

১৩) হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাযিঃ) বলেন, যখন ভূয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে ইয়ামান (এর শাসনকর্তা বানাইয়া) পাঠাইলেন, তখন এরশাদ করিলেন, ভোগ-বিলাসিতা হইতে নিজেকে বাঁচাইতে থাকিও। কারণ, আল্লাহ তায়ালার নেক বান্দাগণ ভোগ-বিলাসিতায় লিপ্ত হন না। (মিশকাত : আহমদ)

ফায়দা : শাসনকর্তা ও গভর্নর হইয়া যাওয়ার পর আরাম-আয়েশের আসবাব-উপকরণ অধিক পরিমাণে লাভ হইয়াই থাকে। সবধরনের নিয়ামতসমূহও সহজে হাসিল হইয়া যায়। এইজন্য ভূয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাযিঃ)কে শাসনকর্তা বানাইয়া পাঠাইতেছিলেন, তখন এই সব বিষয় হইতে বাঁচিয়া চলিবার জন্য বিশেষভাবে সতর্ক করিয়াছেন। ভূয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীয়তসমূহের মধ্যে, এমনিভাবে খোলাফায়ে রাশেদীন (রাযিঃ)এর ওসীয়ত ও ফরমানসমূহের মধ্যে এই বিষয়ে বিশেষভাবে অনেক বেশী পরিমাণে সতর্ক করা হইয়াছে।

হযরত ফাজালা ইবনে ওবায়দ (রাযিঃ) আমীর মুয়াবিয়া (রাযিঃ)এর পক্ষ হইতে মিশরের কাযী (বিচারক) ছিলেন। তাহার খেদমতে একজন সাহাবী কোন হাদীস সম্পর্কে জানিবার জন্য গেলেন। তিনি যাইয়া দেখিলেন, কাযী সাহেবের চুল এলোমেলো হইয়া রহিয়াছে। পা খালি রহিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি এই এলাকার শাসনকর্তা ;

অথচ আমি আপনার চুল এলোমেলো দেখিতেছি। হযরত ফাজলা (রাযিঃ) বলিলেন, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে অধিক পরিমাণে সাজসজ্জা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি আপনাকে খালি পা দেখিতেছি। হযরত ফাজলা বলিলেন, আমাদিগকে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাও এরশাদ করিয়াছেন যে, কখনও খালি পায়েও চলাফেরা করিও।

আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রাযিঃ) বলেন, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিদিন মাথা আঁচড়াইতে নিষেধ করিয়াছেন।

(আবু দাউদ)

عَنْ جَبْرِ بْنِ نُفَيْرٍ مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أُوحِيَ إِلَيَّ أَنْ لَجَعَ الْمَالُ وَأَكُونَ مِنَ التَّاجِرِينَ وَلَكِنْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنْ سَبِّحَ مُحَمَّدٌ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے حق تعالیٰ شانہ نے یہ وحی نہیں بھیجی کہ میں تاجر بنوں اور مال جمع کروں بلکہ وحی یہ بھیجی ہے کہ (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) تم اپنے پروردگار کی تسبیح اور تحمید کرتے رہو اور نمازیں پڑھنے والوں میں رہو، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، یہاں تک کہ (اُسی حالت میں) تم کو موت آجائے۔

(رداء فی شرح السنة وابونعیم فی الحلیة عن ابی مسلم کذا فی مشکوٰۃ)

১৪) হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার নিকট আল্লাহ তায়ালা এই ওহী পাঠান নাই যে, আমি ব্যবসায়ী হই এবং মাল জমা করি। বরং এই ওহী পাঠাইয়াছেন যে, (হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম!) তুমি আপন পরওয়ারদিগারের পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করিতে থাক এবং নামায পাঠকারীদের মধ্যে शामिल থাক এবং আপন রবের এবাদত করিতে থাক—যতক্ষণ না (এই অবস্থায়ই) তোমার মৃত্যু আসিয়া যায়। (মিশকাত : শরহুস-সুন্নাহ, আবু নুআইম)

ফায়দা : এই ওহীর মধ্যে সূরা হিজ্রের শেষ আয়াতের দিকে ইশারা করা হইয়াছে। হাদীসে পাকের এই বিষয় বেশ কয়েকজন সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। আল্লামা সুযুতী (রহঃ) ‘দুররে মানসূর’ কিতাবে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবু মুসলিম খাওলানী, আবু

দারদা (রাযিঃ) হইতে ছযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদ বর্ণনা করিয়াছেন।

অন্য এক হাদীসে ছযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করা হইয়াছে যে, উত্তম মানুষ দুই ব্যক্তি। এক—ঐ ব্যক্তি যে নিজের ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া আল্লাহর রাস্তায় জ্ঞান দেওয়ার সুযোগ তালাশ করিয়া বেড়ায়। দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি, যাহার নিকট কয়েকটি বকরি রহিয়াছে এবং কোন ময়দান অথবা পাহাড়ী অঞ্চলে (অর্থাৎ অপরিচিত স্থানে যেখানে একাগ্রতা হাসিল হয়) নামায পড়ে, যাকাত দেয় এবং আপন মাওলার ইবাদতে মশগুল থাকে। অবশেষে, ঐ অবস্থাতে তাহার মৃত্যু আসিয়া যায়। তাহার দ্বারা মানুষের উপকার ছাড়া কোন ক্ষতি হয় না। (দুররে মানসূর)

আল্লাহ তায়ালার এই পবিত্র এরশাদের উপর ছযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে নিজের ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত আমল করিয়া দেখাইয়াছেন, উহা ছযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী পাঠকারীদের সামনে গোপন নয়। অতঃপর যতই আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে নেয়ামতের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইত ততই ছযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদতের মধ্যে মগ্নতা বাড়িয়া যাইত।

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, যখন সূরায়ে ফাতাহ নাযিল হয়, তখন ছযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবাদতের মধ্যে আরও বেশী চেষ্টা শুরু করিয়া দিলেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই আয়াতের মধ্যে তো আপনার অতীত, ভবিষ্যতের সমস্ত গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে; তবুও আপনি এত কষ্ট বরদাশত করিতেছেন? ছযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি কি শোকরগুজার বান্দা হইব না? -

হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন, যখন সূরায়ে ফাতাহ নাযিল হইল, তখন ছযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত দীর্ঘ নামায পড়িতে শুরু করিলেন যে, পা ফুলিয়া গেল। আর ইবাদতের পরিমাণ এত বাড়িয়া দিলেন যে, শুকাইয়া পুরাতন মোশকের মত হইয়া গেলেন। আর যখন উপরোক্ত বিষয়ে আরজ করা হইল, তখন একই জওয়াব দিলেন যে, আমি কি শোকরগুজার বান্দা হইব না?

হযরত হাসান (রাযিঃ) বলেন, ছযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবাদতের মধ্যে এত বেশী চেষ্টা করিতেন যে, পুরাতন মোশকের মত একেবারে শুকাইয়া গিয়াছিলেন। অতঃপর আবার সেই প্রশ্নোত্তর উল্লেখ

করিয়াছেন।

হযরত আবু জুহাইফা (রাযিঃ) বলেন, ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত দীর্ঘ নামায পড়িতেন যে, পা মুবারক ফাটিয়া গিয়াছিল।

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত নামাযে দাঁড়াইয়া থাকিতেন যে, পা মুবারক ফুলিয়া গিয়াছিল।

এই সমস্ত হাদীস ছাড়া আরও অনেক হাদীসে অনেক পরিমাণে এই ধরনের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। সেইগুলির অধিকাংশের মধ্যে লোকদের পক্ষ হইতে একই জিজ্ঞাসা ছিল যে, ছয়রের জন্য তো ক্ষমার অকাটি এরশাদ কুরআন পাকে বর্ণিত হইয়াছে। উত্তরে ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একই জওয়াব উল্লেখিত হইয়াছে যে, আমি কি শোকরগুজার বান্দা হইব না? (দুররে মানসুর)

আমরাও কি কখনও এই বিষয় চিন্তা করিয়া থাকি যে, আল্লাহ তাআলার কোন বিশেষ নেয়ামত লাভ হওয়ার কারণে উহার শোকরানাস্বরূপ সংক্ষিপ্তভাবে হইলেও দুই রাকাত নামায পড়িয়া লই।

বিভিন্ন হাদীসে আসিয়াছে, যখন ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কোথাও হইতে বিজয়ের খবর আসিত অথবা কোন খুশীর সংবাদ শুনিতেন, তখন ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শোকর আদায়ের জন্য সেজদায় পড়িয়া যাইতেন। এইসব অবস্থা সত্ত্বেও আল্লাহর ভয় এত বেশী ছিল যে, বুখারী শরীফে ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করা হইয়াছে—তিনি বলিয়াছেন, আল্লাহর কসম! আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহর রাসূল হওয়া সত্ত্বেও আমার জ্ঞান নাই যে, কিয়ামতের দিন আমার সহিত এবং তোমাদের সহিত কি আচরণ করা হইবে। (মিশকাত) 'জানা নাই'—এই কথার অর্থ হইল, বিস্তারিত অবস্থার জ্ঞান আমার নাই। কারণ, ক্ষমতাবান বাদশাহের এখতিয়ার রহিয়াছে, তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন।

হযরত উম্মে দারদা (রাযিঃ) আপন স্বামী হযরত আবু দারদা (রাযিঃ)এর নিকট আরজ করিলেন, আপনি এরূপভাবে কেন ধন-সম্পদ তালাশ করেন না, যেহেতু অমুক ব্যক্তি করিয়া থাকে? (সেও তো মাল কামাই করে; অথচ আপনার কোন ফিকিরই নাই)। হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বলিলেন, আমি ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনিয়াছি, তোমাদের সম্মুখে একটি বড় কঠিন ঘাঁটি (হাশর ময়দান) আসিতেছে। উহাতে ভারী বোঝাওয়ালাগণ (যাহাদের জিম্মায়

হিসাব-কিতাবের বোঝা থাকিবে সহজে) অতিক্রম করিতে পারিবে না। এইজন্য আমার মন চায় যে, আমি ঐ ঘাঁটি অতিক্রম করিবার সময় হালকা থাকি। (মিশকাত) অর্থাৎ, আমার জিম্মায় যেন হিসাবের অধিক বোঝা না থাকে। যাহাতে হালকা অবস্থায় আমি উহা অতিক্রম করিতে পারি।

এই সকল হযরতগণ এই ব্যাপারে বড় ভয় করিতেন যে, কিয়ামতের দিন কি অবস্থা হইবে? এইজন্য সবসময় সেখানকার ফিকির ও প্রস্তুতির মধ্যে মগ্ন থাকিতেন। আর আমাদের উপর সবসময় দুনিয়ার ফিকির সওয়াব হইয়া থাকে বলিয়া সেই ঘাঁটির খেয়ালই আসে না।

হাসসান ইবনে সিনান (রহঃ) এক জায়গায় যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে একটি বাড়ী দেখিতে পাইলেন। যাহা পূর্বে সেখানে ছিল না। বলিতে লাগিলেন, এই বাড়ীটি কবে তৈয়ার হইয়াছে? অতঃপর নিজের নফসকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, তুই অনর্থক কথা কেন জিজ্ঞাসা করিয়াছিস? 'ইহা কবে তৈরী হইয়াছে' দ্বারা তোর কি উদ্দেশ্য? তোকে এক বৎসর রোযা রাখিবার শাস্তি দিব। এই অহেতুক কথা বলার কারণে তিনি এক বৎসর রোযা রাখিলেন।

মালেক ইবনে দায়গাম (রাযিঃ) বলেন, হযরত রাবাহ কায়ছী (রহঃ) আসরের পর আমাদের ঘরে আসিলেন এবং আমার পিতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কোথায়? আমি বলিলাম, ঘুমাইতেছেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, ইহা কি ঘুমাইবার সময়? এই বলিয়া তিনি ফিরিয়া গেলেন। আমি তাহার পিছনে লোক পাঠাইলাম যে, আপনি যদি বলেন, তবে জাগাইয়া দিব। লোকটি তাহার পিছনে গেল। ইতিমধ্যে তিনি একটি কবরস্থানে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং সেখানে তিনি নিজেকে তিরস্কার করিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন যে, হাঁ, 'এখন কি ঘুমাইবার সময়?' এই কথার দ্বারা তোর কি উদ্দেশ্য ছিল? মানুষ যখন ইচ্ছা ঘুমাইবে, তুই কি জানিস—এখন ঘুমাইবার সময় কিনা। আমিও আত্মাহুর কসম করিয়া বলিতেছি যে, তোকেও সারা বৎসর জমিনের উপর ঘুমাইবার জন্য শুইতে দিব না। অবশ্য যদি অসুস্থ হইয়া পড়িস অথবা অজ্ঞান হইয়া যাস, তবে অপারগতার কারণে তখনকার কথা আলাদা। তোর ধ্বংস হউক, তুই কত দিন মানুষকে তিরস্কার করিতে থাকিবি। তুই কি নিজের অন্যায় আচরণ হইতে ফিরিয়া আসিবি না? তিনি এরূপ বলিতেছিলেন এবং কাঁদিতেছিলেন। আমার প্রেরিত লোকটি ইহা দেখিয়া ফিরিয়া আসিল। তাহার সহিত কোন কথা বলিতে সাহস হইল না।

হযরত তালহা (রাযিঃ) বলেন, এক সাহাবী একদিন নিজের গায়ের কাপড় খুলিয়া অত্যন্ত গরম বালির উপর গড়াইতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন—“স্বাদ গ্রহণ কর, জাহান্নামের গরম ইহা হইতে অনেক বেশী কঠিন হইবে। রাত্রে মরার মত (ঘুমাইয়া) থাকিস, দিনে বেকার ঘুরাফেরা করিস।” হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে এই অবস্থায় দেখিয়া তাহার নিকট গেলেন। তিনি আরজ করিতে লাগিলেন, হযূর! আমার মনে এইরূপ করিবার এমন অদম্য ইচ্ছা চাপিয়া বসিয়াছে যে, কি বলিব! হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার এইরূপ করার প্রয়োজন ছিল না। তোমার জন্য আসমানের সমস্ত দরজা খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তোমার বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা নিজ ফেরেশতাগণের সহিত গর্ব করিতেছেন। অতঃপর হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন সঙ্গীদেরকে বলিলেন, তোমরা নিজেদের জন্য তাহার নিকট হইতে পাথর লও। সকলেই তাহার নিকট দোয়ার দরখাস্ত করিলেন। অতঃপর হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সকলের জন্য দোয়া কর।

হযায়ফা ইবনে কাতাদা (রাযিঃ) বলেন, এক ব্যক্তি জনৈক বুয়ুর্গকে জিজ্ঞাসা করিল, যখন আপনার নফস কোন জিনিস চায়, তখন আপনি উহার ব্যাপারে কি পস্থা অবলম্বন করেন? তিনি বলিতে লাগিলেন, আমার আপন নফসের সহিত যেই পরিমাণ দূশমনি রহিয়াছে, ঐ পরিমাণ দুনিয়ার আর কাহারও সহিত নাই। কাজেই আমি উহার স্বাহেশ কিভাবে পূরা করিতে পারি, যাহার প্রতি আমার এই পরিমাণ ঘৃণা রহিয়াছে।

হযরত মুজাম্মে (রাযিঃ) একবার একটি ঘরের দিকে মাথা উঠাইয়া দেখিলেন। একজন বেগানা-মহিলার প্রতি দৃষ্টি পড়িয়া গেল। তিনি অঙ্গীকার করিলেন যে, যতদিন বাঁচিয়া থাকিব, কখনও মাথা উপরের দিকে উঠাইব না।

এইসব ঘটনা ছাড়া আরও অনেক ঘটনা ইমাম গায়যালী (রহঃ) বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে বর্ণিত আছে যে, সামান্য কোন ব্যতিক্রম হইলেই তাহারা নিজেদের নফসকে কঠিন শাস্তি দিতেন। এই সবকিছু কেন ছিল, শুধু ঐ ঘাঁটির ভয়ে যাহার সম্পর্কে আবু দারদা (রাযিঃ) তাহার স্ত্রীর সহিত আলোচনা করিয়াছেন। আর আমরা উহা হইতে এমনই নিশ্চিত রহিয়াছি যে, যেন উহা কেবল সাহাবায়ে কেরামগণের পথেই পড়িবে; আর আমরা উড়োজাহাজে সওয়ার হইয়া উহার উপর দিয়া পার হইয়া যাইব। আমরা আমাদের নিজেদের উপর কত বেশী জুলুম করিতেছি যে, ভুলেও

আমাদের ঐ ঘাঁটির কথা খেয়াল হয় না।

অতঃপর ইমাম গায়যালী (রহঃ) লিখিয়াছেন, বড় আশ্চর্যের কথা যে, তুমি নিজের গোলামকে, (নিজের চাকরকে,) নিজের সন্তানাদিকে যখন তাহাদের দ্বারা কোন ভুলত্রুটি হইয়া যায়, শাস্তি দিয়া থাক এবং বলিয়া থাক যে, যদি সাবধান করা না হয়, তবে তাহারা নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলিয়া যাইবে, অবাধ্য হইয়া যাইবে। কিন্তু নিজের নফসের কোন পরওয়া কর না যে, সে অবাধ্য হইয়া যাইতেছে। অন্যদের অবাধ্যতার দ্বারা তোমার এত ক্ষতি হয় না, যত ক্ষতি তোমার নফসের অবাধ্যতার দ্বারা তোমার হয়। কারণ, অন্যদের অবাধ্যতার দ্বারা যদি ক্ষতি হয়, তবে উহা তোমার দুনিয়ার ক্ষতি। আর তোমার নফসের অবাধ্যতার দ্বারা তোমার আখেরাতের ক্ষতি হইতেছে। যাহা কখনও শেষ হইবে না। যাহার নেয়ামতসমূহ কখনও খতম হইবে না। উহার ক্ষতি কত মারাত্মক ক্ষতি! এই কারণেই পূর্বেকার বুয়ুর্গদের মধ্য হইতে যদি কাহারও দ্বারা আখেরাতের আমলসমূহে কোন ত্রুটি হইয়া যাইত, তবে উহা পূরণের জন্য তাহারা যারপর নাই চেষ্টা করিতেন।

একবার হযরত ওমর (রাযিঃ)এর আসরের নামাযের জামাত ছুটিয়া গেল। তিনি উহার ক্ষতিপূরণের জন্য একটি বাগান সদকা করিয়া দিলেন, যাহার মূল্য দুই লক্ষ দেবহাম ছিল।

হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ)এর যেইদিন কোন নামাযের জামাত ছুটিয়া যাইত, সেইদিন তিনি সারারাত্র জাগরণ করিতেন। একদিন মাগরিবের নামায পড়িতে দেবী হইয়া গিয়াছিল—এইজন্য উহার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তিনি দুইটি গোলাম আজাদ করিয়া দিলেন।

যদি কাহারও এবাদত-বন্দেগীতে অলসতা দেখা দেয়, তবে তাহার উচিত—সে যেন আব্বাহ তায়ালার এমন কোন বান্দার সাহচর্য অবলম্বন করে, যিনি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে এবাদতে মশগুল থাকেন। আর যদি এইরূপ কোন বুয়ুর্গের সঙ্গ পাওয়া না যায়, তবে যেন ঐ সমস্ত বুয়ুর্গানে দ্বীনের জীবনী শিক্ষার উদ্দেশ্যে গভীর মনোযোগসহকারে পাঠ করে। (তন্মধ্যে অনেক ঘটনা 'রাওজুর রাইয়াহীন' কিতাবে লিখিত আছে। উহার সংক্ষিপ্ত উর্দু তরজমা 'নুজহাতুল বাসাতীন' নামক কিতাবে করা হইয়াছে।)

এক বুয়ুর্গ বলেন, আমার যখন এবাদতে অলসতা দেখা দেয়, তখন আমি হযরত মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসে' (রহঃ)এর জীবনী পাঠ করি এবং এক সপ্তাহ পর্যন্ত একাধারে ইহা চালু রাখি। (এমনিভাবে আরও অন্যান্য

আল্লাহর ওলীগণের জীবনী রহিয়াছে, তবে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের লেখা হইতে হইবে।) এই সমস্ত বুয়ুর্গদের অবস্থা ও জীবনী পাঠ করা এবাদত-বন্দেগীর আগ্রহ বৃদ্ধি করিতে অনেক বেশী উপকারী। আর ইহাও চিন্তা করার বিষয় যে, তাহাদের সমস্ত কষ্ট ও মেহনত শেষ পর্যন্ত খতম হইয়া গিয়াছে। এখন চিরকালের জন্য তাহাদের নিয়ামতসমূহ ও আরাম-আয়েশ বাকি রহিয়া গিয়াছে। যাহা কখনও খতম হইবে না। আমাদের ন্যায় লোকদের জন্য কত বড় আক্ষেপের বিষয়—এই সমস্ত অবস্থা জানা এবং দেখা সত্ত্বেও দুনিয়া কামাই ও উহার স্বাদ গ্রহণের মধ্যে মশগুল থাকি এবং চিরস্থায়ী স্বাদ আশ্বাদনকারী বুয়ুর্গদের অবস্থা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করি না।

হযরত আলী (রাযিঃ) এরশাদ করেন, কেহ কেহ ইহাকে ভুয়ূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বলিয়াছেন—আল্লাহ তায়ালা এমন লোকদের উপর দয়া করুন, যাহাদিগকে লোকেরা অসুস্থ মনে করে ; অথচ তাহারা অসুস্থ নহেন।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, অধিক পরিমাণে এবাদত তাহাদিগকে কষ্টের মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়াছে বিধায় লোকেরা তাহাদিগকে অসুস্থ মনে করে। তিনি আরও বলিয়াছেন, আমি এমন বুয়ুর্গদেরকে দেখিয়াছি এবং তাহাদের সঙ্গে থাকিয়াছি, যাহাদের নিকট দুনিয়ার কোন জিনিস আসিলে আনন্দিত হইতেন না আর চলিয়া গেলে দুঃখিতও হইতেন না। তাহাদের দৃষ্টিতে দুনিয়ার ধন-সম্পদ ঐ মাটি হইতে অধিক মূল্যহীন ছিল, যাহা জুতার সহিত লাগিয়া থাকে। আমি এমন লোকদেরকে দেখিয়াছি—না জীবনে কখনও তাহাদের কোন কাপড় ভাজ করিয়া রাখা হইয়াছে, আর না কখনও তাহারা খাওয়ার কোন জিনিস পাকাইবার ফরমায়েশ করিয়াছেন, না কখনও ঘুমাইবার জন্য তাহাদের বিছানার প্রয়োজন হইয়াছে ; মাটির উপরেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন ; মাটি ও তাহাদের শরীরের মাঝখানে কোন জিনিস থাকিত না। তাহারা আল্লাহর কিতাবের উপর আমলকারী ছিলেন। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণকারী ছিলেন। যখন রাত্র হইয়া যাইত, তখন সারারাত্র পায়ের উপর ভর করিয়া (নামায়ে) দাঁড়াইয়া থাকিতেন অথবা জমিনের উপর নিজের মুখমণ্ডলকে (সেজদায়) বিছাইয়া দিতেন। তাহাদের চক্ষু হইতে তাহাদের মুখমণ্ডলের উপর অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে থাকিত। রাতভর আপন প্রতিপালকের সহিত কথাবার্তা বলিতে থাকিতেন। (সহীহ হাদীসে আসিয়াছে, নামাযী ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা

সহিত কথাবার্তা বলে।) আপন মাওলার নিকট আজাব হইতে মুক্তি চাহিতে থাকিতেন। যখন তাহাদের দ্বারা কোন নেক কাজ হইয়া যাইত, তখন তাহারা আল্লাহ তায়ালার বড় শোকর আদায় করিতেন। উহার কারণে আনন্দিত হইতেন এবং উহা কবুল হওয়ার জন্য দোয়া করিতেন। যখন কোন অন্যায় কাজ হইয়া যাইত, অত্যন্ত দুঃখিত হইতেন। আল্লাহ তায়ালার নিকট তওবা করিতেন। ক্ষমার জন্য দোয়া ও এস্তেগফার করিতেন। এইভাবেই তাহারা তাহাদের জীবন কাটাইয়া দিয়াছেন।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) যখন অসুস্থ হইলেন, তখন একদল লোক তাহাকে দেখিবার জন্য গেল। তাহাদের মধ্যে অত্যন্ত দুর্বল, ফ্যাকাশে, হালকা-পাতলা একজন যুবকও ছিল। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার এই অবস্থা কেন? সে বলিতে লাগিল, বিভিন্ন রকমের অসুবিধা এবং রোগ-শোক লাগিয়া রহিয়াছে। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, না; সঠিক কথা বল। সে বলিতে লাগিল, আমি দুনিয়ার স্বাদ চাখিয়াছি। উহাকে অত্যন্ত তিক্ত পাইয়াছি। উহার চাকচিক্য, উহার স্বাদ, উহার আনন্দ, উহার আরাম-আয়েশ আমার দৃষ্টিতে অত্যন্ত তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। উহার স্বর্ণ ও মাটি আমার দৃষ্টিতে এক বরাবর। আল্লাহ তায়ালার আরশ যেন সর্বদা আমার সম্মুখে রহিয়াছে। হাশরের ময়দানে এক দল জান্নাতের দিকে যাওয়া, অপর দল জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়া আমি দেখিতেছি। এই কারণে আমি আমাকে সমস্ত দিন (রোযার দ্বারা) পিপাসার্ত রাখি এবং সমস্ত রাত্রি (আল্লাহর স্মরণে) জাগ্রত থাকি। আর এই দুই জিনিসও আল্লাহ তায়ালার প্রতিদান ও আযাবের মুকাবেলায় কোন মূল্য রাখে না।

হযরত দাউদ তায়ী (রহঃ) রুটির টুকরা পানিতে ভিজাইয়া পান করিয়া লইতেন, রুটি খাইতেন না। কেহ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, এইভাবে ভিজাইয়া পান করার মধ্যে এবং রুটি চিবাইয়া খাওয়ার মধ্যে কোরআন পাকের পঞ্চাশটি আয়াতের তেলাওয়াত ছুটিয়া যায়। একদিন তাহার ঘরে কুন্নৈক ব্যক্তি আসিল। সে বলিতে লাগিল, আপনার হুজুরার কড়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তিনি বলিতে লাগিলেন, আমি বিশ বৎসর যাবৎ এই ঘরের ছাদের দিকে দেখি নাই। এই সমস্ত ব্যক্তিগণ যেমন অহেতুক কথা বলা হইতে বাঁচিয়া থাকিতেন, তেমনি এদিক-সেদিক অহেতুক দেখা হইতেও বাঁচিয়া থাকিতেন।

মুহাম্মদ ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) বলেন, আমি আহমদ ইবনে

রাজীন (রহঃ)এর নিকট সকাল হইতে আছর পর্যন্ত ছিলাম। আমি তাহাকে এদিক-সেদিক তাকাইতে দেখি নাই। কেহ তাহাকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা এই চক্ষুসমূহ এইজন্য দিয়াছেন যে, উহা দ্বারা তাহার শ্রেষ্ঠত্ব ও বড়ত্বের বিষয়সমূহকে শিক্ষা গ্রহণের দৃষ্টিতে দেখিবে। যদি এই উদ্দেশ্য না হয়, তবে সেই দেখা অন্যায।

হযরত মাসরুক (রহঃ)এর স্ত্রী বলেন, মাসরুক (রহঃ)এর পায়ের গোছাগুলি রাত্রভর নামাযে দাঁড়াইয়া থাকার কারণে ফুলিয়া যাইত। যখন তিনি নামাযে মগ্ন হইতেন, তখন আমি তাহার পিছনে বসিয়া তাহার অবস্থার উপর সহানুভূতির কারণে কাঁদিতে থাকিতাম।

হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বলেন, দুনিয়াতে যদি তিনটি স্বাদের বস্তু না থাকিত, তবে আমার জন্য এই দুনিয়াতে একদিন জীবিত থাকাও সহ্য হইত না। এক—প্রচণ্ড গরমের দিনে দুপুরের সময় (রোযা অবস্থায়) পিপাসার্ত থাকার স্বাদ। দ্বিতীয়—শেষ রাত্রে সেজদা করার মধ্যে যে আনন্দ উদ্বেক হয়, উহার স্বাদ। তৃতীয়—এমন বুয়ুর্গদের সঙ্গলাভ করা, যাহাদের কথা হইতে এমনভাবে উৎকৃষ্ট ফল বাছাই করা হয়, যেমন বাগানের মধ্য হইতে ভাল ভাল ফল বাছিয়া লওয়া হয়।

আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ (রহঃ) এবাদতের মধ্যে এত কষ্ট করিতেন এবং প্রচণ্ড গরমের মধ্যে রোযা রাখিতেন যে, তাহার শরীর কালো হইয়া গিয়াছিল। আলকামা ইবনে কায়েস (রহঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি আপনার শরীরকে এত বেশী শাস্তি দেন কেন? তিনি বলিতে লাগিলেন, (কিয়ামতের দিন) তাহার সম্মানের জন্য। অর্থাৎ কষ্ট এইজন্য করিতেছি যে, কিয়ামতের দিন এই শরীরের সম্মান নসীব হয়।

এক বুয়ুর্গের ঘটনা বর্ণিত আছে, তিনি প্রতিদিন এক হাজার রাকাত নামায দাঁড়াইয়া পড়িতেন। যখন দাঁড়াইয়া থাকার কারণে পা অবশ হইয়া যাইত, তখন এক হাজার রাকাত বসিয়া পড়িতেন এবং আছরের পর বসিয়া অনুনয় বিনয়ের সহিত বলিতেন, হে আল্লাহ! এই সৃষ্টির উপর বড় আশ্চর্য লাগে—কিভাবে তাহারা অন্য জিনিসকে তোমার সমতুল্য বানাইয়া লইয়াছে! কেমন আশ্চর্যের কথা—তাহাদের মন তোমাকে ছাড়া অন্য জিনিসের সহিত কিভাবে আপন হয়! আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তোমার যিকির ছাড়া অন্য কোন জিনিস তাহাদের অন্তরে কিভাবে সুন্দর লাগে!

হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ) বলেন, আমি হযরত সাররী সাকাতি (রহঃ) হইতে বেশী এবাদতকারী কাহাকেও দেখি নাই। ৯৮ বৎসর পর্যন্ত কেহ তাহাকে মৃত্যুর রোগে আক্রান্ত হওয়ার সময় ছাড়া আর কখনও শুইতে দেখে নাই।

হযরত আবু মুহাম্মদ জারীরী (রহঃ) মক্কা মুকাররমায় একবৎসর এতেকাফ করিয়াছেন। এই সময়ের মধ্যে না তিনি ঘুমাইয়াছেন, না কথা বলিয়াছেন, না কোন কাঠ অথবা দেওয়ালের সাথে হেলান দিয়াছেন। হযরত আবু বকর কাতানী (রহঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিসের বদৌলতে আপনি এইরূপ সাধনা করিতে সমর্থ হইয়াছেন? তিনি বলিতে লাগিলেন, আল্লাহ তায়ালা আমার অন্তরের মজবুতীকে দেখিয়াছেন। অতঃপর আমার শরীরকে উহার উপর শক্তি দান করিয়াছেন। হযরত আবু বকর কাতানী (রহঃ) ইহা শুনিয়া মাথা ঝুকাইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। এইভাবে কিছু সময় অতিবাহিত করিয়া চিন্তিত অবস্থায় ফিরিয়া চলিয়া গেলেন।

এক ব্যক্তি বলেন, আমি হযরত ফাতাহ ইবনে সাঈদ মাওসেলী (রহঃ)এর নিকট দিয়া যাইতেছিলাম। তিনি উভয় হাত প্রসারিত করিয়া কাঁদিতেছিলেন এবং তাহার অশ্রু আঙ্গুলের ফাঁক দিয়া দিয়া নিচে পড়িতেছিল। আর এই অশ্রু হলুদ বর্ণের ছিল (অর্থাৎ অশ্রু রক্ত মিশ্রিত ছিল)। আমি তাহাকে কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এই রক্তমাখা অশ্রু কোন্ কষ্টের কারণে ফেলিতেছেন? (খবর ভালো তো, না কোন বিপদ হইল?) তিনি বলিতে লাগিলেন, যদি তুমি কসম না দিতে, তবে আমি বলিতাম না। হাঁ আমি এইজন্য কাঁদিতেছি যে, আমার উপর আল্লাহ তায়ালা যে হুক ছিল আমি উহা আদায় করি নাই। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, রক্তমাখা অশ্রু কেন? বলিতে লাগিলেন, এই ভয়ে যে, আমার এই কান্না অগ্রাহ্য ও মিথ্যা (মুনাফেকী) না হইয়া যায়। বর্ণনাকারী বলেন, যখন তাহার ইন্তেকাল হইল, আমি তাহাকে স্বপ্নে দেখিলাম। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে? তিনি বলিলেন, আমাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার চোখের পানির কি হইয়াছে? তিনি বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে তাহার নিকট ডাকিয়া বলিলেন, তোমার চোখের এই পানি কি জন্য ছিল? আমি আরজ করিলাম, আমার এই বিষয়ে দুঃখ ছিল যে, আপনার হুক যাহা আমার উপর করণীয় ছিল, আমি উহা আদায় করিতে পারি নাই। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিলেন, রক্ত কেন?

আমি আরজ করিলাম, এই ভয়ে যে, আমার এই কান্না যেন মিথ্যা ও অগ্রাহ্য না হইয়া যায়। এরশাদ হইল, শেষ পর্যন্ত তুমি এই সবকিছুর দ্বারা কি চাহিতেছিলে? আমার ইয্যতের কসম, তোমার কেলামান কাতেবীন ফেরেশতাগণ চল্লিশ বৎসর যাবৎ তোমার এমন আমলনামা আনিতেছে যে, উহাতে কোন গুনাহ লিখিত থাকে না।

আবদুল ওহায়েদ ইবনে যায়েদ (রহঃ) বলেন, আমি একটি গির্জার নিকট দিয়া যাইতেছিলাম। সেখানে একজন রাহেব (দুনিয়াত্যাগী বুয়ুর্গ) থাকিতেন। আমি তাহাকে রাহেব বলিয়া ডাকিলাম। তিনি কোন উত্তর দিলেন না। দ্বিতীয়বার ডাকিলাম। এবারও উত্তর দিলেন না। অতঃপর তৃতীয়বার যখন তাহাকে ডাকিলাম, তখন তিনি আমার দিকে ফিরিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, আমি রাহেব নই। রাহেব ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে। তাঁহার মহত্ত্বের কারণে তাহাকে সম্মান করে। তাঁহার দেওয়া বালা-মুসীবতের উপর ছবর করে। অতঃপর তাহার তকদীরের ফায়সালার উপর রাজী থাকে। তাহার নেয়ামতসমূহের শোকর আদায় করে। তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের সামনে বিনয়ের সহিত থাকে। তাঁহার ইয্যতের মুকাবেলায় নিজেকে অপদস্থ রাখে। তাঁহার পরিপূর্ণ কুদরতের অনুগত হইয়া চলে। তাঁহার প্রভাবের কারণে অনুনয় প্রকাশ করে। সবসময় তাঁহার হিসাব ও তাঁহার আযাবের চিন্তায় চিন্তিত থাকে। দিনে রোযা রাখে, রাত্রে জাগ্রত থাকে। জাহান্নামের ভয় এবং হাশর-ময়দানের জিজ্ঞাসাবাদের চিন্তা তাহার নিদ্রা উড়াইয়া দিয়াছে, যাহার মধ্যে এই বিষয়গুলি রহিয়াছে, সে রাহেব। আমি তো একটি পাগলা কুকুর। এইজন্য এখানে বসিয়া গিয়াছি, যাহাতে কাহাকেও কামড় না দেই। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহার কারণ কি যে, লোকেরা আল্লাহ তায়ালাকে বড় ভয় জানা সত্ত্বেও তাঁহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। তিনি বলিলেন, শুধু দুনিয়ার মহব্বত এবং উহার চাকচিক্য তাহাদের সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। দুনিয়া গুনাহের ঘর। বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী ঐ ব্যক্তি, যে ইহাকে নিজের অন্তর হইতে দূরে নিক্ষেপ করে, আল্লাহ তায়ালাকে দিকে মনোযোগী হইয়া যায় এবং এমন কাজ অবলম্বন করে যাহা আল্লাহ তায়ালাকে নিকটবর্তী করিয়া দেয়।

হযরত ওয়ায়েস করনী (রহঃ) বিখ্যাত বুয়ুর্গ ছিলেন। কোন দিন বলিতেন, আজকের রাত্র রুকু করিবার জন্য, অতঃপর সারারাত্র রুকুর মধ্যে কাটাইয়া দিতেন। কখনও বলিতেন, আজকের রাত্র সেজদা করিবার জন্য, অতঃপর সারারাত্র এক সেজদার মধ্যে কাটাইয়া দিতেন।

ওতবা নামক গোলাম যখন তওবা করিলেন, তখন খানাপিনার কোনই পরওয়া করিতেন না। তাহার মা একবার তাহাকে বলিলেন, নিজের নফসের উপর দয়া কর। কিছু আরামও করিয়া লও। তিনি বলিতে লাগিলেন, নফসের উপর দয়া করার জন্যই তো এই সবকিছু করিতেছি। অল্প কিছুদিনের কষ্ট তারপর চিরস্থায়ী আরাম করিব।

আবদুল্লাহ ইবনে দাউদ (রহঃ) বলেন, এই সকল বুয়ুর্গ ব্যক্তিদের মধ্যে যখন কাহারও বয়স চল্লিশ পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায়, তখন তাহারা বিছানা উঠাইয়া ভাজ করিয়া রাখিয়া দেন। অর্থাৎ, অতঃপর নিদ্রা যাওয়ার বিষয়টি শেষ হইয়া যায়।

হযরত কাহমাস ইবনে হাসান (রহঃ) প্রত্যেক রাত্রে এক হাজার রাকাত নামায পড়িতেন এবং নিজের নফসকে সম্বোধন করিয়া বলিতেন, হে সমস্ত অনিষ্টের মূল! (নামাযের জন্য) দাঁড়াইয়া যা। যখন অনেক বেশী দুর্বল হইয়া গেলেন, তখন প্রতিদিন পাঁচশত রাকাত করিয়া পড়িতেন এবং এই বলিয়া কাঁদিতেন যে, আমার অর্ধেক আমল চলিয়া গেল।

হযরত রবী (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ওয়ায়েস করনী (রহঃ)এর নিকট আসিলাম। তিনি ফজরের নামায পড়িয়া তসবীহ পড়িতে মশগুল হইয়া গিয়াছিলেন। আমার খেয়াল হইল, এখন তাহার অসুবিধা হইবে। আমি তাহার অবসর হওয়ার অপেক্ষায় বসিয়া গেলাম। তিনি এই অবস্থায় বসিয়া যোহর পর্যন্ত তসবীহ পড়িতে থাকিলেন। অতঃপর তিনি যোহরের নামায পড়িবার জন্য দাঁড়াইয়া গেলেন এবং আসর পর্যন্ত নামায পড়িতে থাকিলেন। অতঃপর আছরের নামায হইতে ফারেগ হইয়া একই স্থানে মাগরিব পর্যন্ত বসিয়া থাকিলেন। অতঃপর মাগরিবের নামায পড়িলেন। এশার নামায পড়িলেন। তারপর ফজর পর্যন্ত ঐখানেই বসিয়া রহিলেন। দ্বিতীয় দিন ফজরের নামাযের পর বসিয়া ছিলেন—এমতাবস্থায় তাহার একটু তন্দ্রা আসিল। চমকিয়া উঠিয়া বলিতে লাগিলেন, হে আল্লাহ! এমন চক্ষু হইতে আপনার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি, যাহা বারবার ঘুমাইয়া পড়ে এবং এমন পেট হইতে আশ্রয় চাহিতেছি, যাহা কখনও পূর্ণ হয় না। আমি এই সমস্ত অবস্থা দেখিয়া সেখান হইতে এই বলিয়া চলিয়া আসিলাম যে, আমার শিক্ষা গ্রহণের জন্য তো ইহাই যথেষ্ট, যাহা আমি দেখিলাম।

আহমদ ইবনে হারব (রহঃ) বলেন, আশ্চর্য লাগে ঐ ব্যক্তির উপর, যে ইহা জানে যে, আসমানের উপর তাহার জন্য জামাতকে সুসজ্জিত করা

হইতেছে এবং উহার নীচে জাহান্নামকে প্রজ্জ্বলিত করা হইতেছে—এই দুইয়ের মাঝখানে তাহার কিভাবে ঘুম আসে।

এক ব্যক্তি বলেন, আমি হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহঃ)এর নিকট গেলাম। তিনি এশার নামাযের পর নিজের জুব্বা জড়াইয়া এক কাত হইয়া শুইয়া পড়িলেন এবং সকাল পর্যন্ত এইভাবে শুইয়া থাকিলেন। কোন নড়াচড়াও করিলেন না এবং পার্শ্ব পরিবর্তনও করিলেন না। সকালে উঠিয়া ওযু না করিয়াই নামায পড়িয়া লইলেন। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আল্লাহ তায়ালা আপনার অবস্থার উপর দয়া করুন—সারারাত্র শুইয়া ঘুমাইয়া থাকিলেন আর বিনা ওযুতেই নামায পড়িয়া লইলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, আমি সারারাত্র কখনও জ্ঞানাতের বাগানসমূহে দৌড়াইতেছিলাম, কখনও জাহান্নামের ঘাঁটিসমূহে দৌড়াইতেছিলাম— এমন অবস্থায় ঘুম কিভাবে আসিতে পারে !

বর্ণিত আছে, আবু বকর ইবনে আইয়াশ (রহঃ) চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত বিছানায় শয়ন করেন নাই এবং নিজ পুত্রকে নসীহত করিলেন যে, ঐ জানালার পার্শ্বে গুনাহ করিও না। আমি এখানে বার হাজার বার কুরআন শরীফ খতম করিয়াছি। যখন তাঁহার এন্তেকালের সময় হইল, তখন ঘরের এক কোণের দিকে ইশারা করিয়া বলিলেন, এই কোণে আমি চব্বিশ হাজার বার কুরআন শরীফ খতম করিয়াছি।

হযরত সামনুন (রহঃ) প্রতিদিন পাঁচশত রাকাত নফল নামায পড়িতেন। তাহারই একটি ঘটনা আল্লামা জুবাইদী (রহঃ) লিখিয়াছেন যে, বাগদাদে এক ব্যক্তি চল্লিশ হাজার দেরহাম ফকীরদের মধ্যে বন্টন করিল। সামনুন (রহঃ) বলিতে লাগিলেন, দেরহাম তো আমার নিকট নাই। তবে আমি প্রত্যেক দেরহামের বদলে এক রাকাত নামায পড়িয়া লইব। এই বলিয়া তিনি মাদায়েন গেলেন এবং সেখানে চল্লিশ হাজার রাকাত নামায পড়িলেন।

আবু বকর মাতুয়ী (রহঃ) বলেন, যৌবনকালে প্রতিদিন আমি একত্রিশ হাজার অথবা চল্লিশ হাজার বার কুলহ ওয়াল্লাহ শরীফ পড়িতাম। বর্ণনাকারী সন্দেহবশতঃ দুই রকম বলিয়াছেন।

এক ব্যক্তি বলেন, আমি আমের ইবনে আবদুল কায়েস (রহঃ)এর সঙ্গে চার মাস ছিলাম। তাহাকে দিনে অথবা রাত্রে কখনও ঘুমাইতে দেখি নাই।

হযরত আলী (রাযিঃ)এর একজন শাগরেদ বলেন, একবার হযরত আলী (রাযিঃ) ফজরের নামায পড়াইয়া ডান দিকে ফিরিয়া বসিলেন।

তিনি অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন, সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত তিনি বসিয়া থাকিলেন। তারপর আক্ষেপের সহিত হাত উল্টাইয়া বলিলেন, খোদার কসম! আমি হযরত সালাহুদ্দীন আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহায্যে কেরাম (রাযিঃ)কে দেখিয়াছি। আজ কোন বিষয়ই তাহাদের মত দেখি না। তাহারা এমন অবস্থায় সকাল করিতেন যে, তাহাদের চুল এলোমেলো থাকিত, চেহারা ধুলি ধূসরিত এবং ফ্যাকাশে থাকিত। তাহারা সারারাত্র আল্লাহ তায়ালা সামনে সেজদায় পড়িয়া থাকিতেন। অথবা তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কুরআন পাক পড়িতে থাকিতেন। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কখনও এক পায়ের উপর কখনও অপর পায়ের উপর ভর করিতেন। যখন তাহারা আল্লাহ তায়ালা যিকির করিতেন, তখন এইরূপ (তৃপ্তি সহকারে) দুলিতেন, যেমন বাতাসে বৃক্ষ নড়াচড়া করে। (আল্লাহ তায়ালা মহব্বত ও ভয়ে) তাহাদের চক্ষু হইতে এত অশ্রু প্রবাহিত হইত যে, তাহাদের কাপড় ভিজিয়া যাইত। এখন লোকেরা একেবারেই অলসতার মধ্যে রাত কাটাইয়া দেয়।

হযরত আবু মুসলিম খাওলানী (রহঃ) নিজ ঘরে নামায পড়ার জায়গায় একটি চাবুক লটকাইয়া রাখিয়াছিলেন। নিজের নফসকে সম্বোধন করিয়া বলিতেন, উঠ, দাঁড়াইয়া যা, আমি তোকে (এবাদতের মধ্যে) ভাল করিয়া এমনভাবে হেঁচড়াইব যে, তুই ক্লান্ত হইয়া যাইবি ; কিন্তু আমি ক্লান্ত হইব না। যখন তাহার মধ্যে একটু অলসতা দেখা দিত, তখন তিনি ঐ চাবুক দ্বারা নিজের পায়ের গোছার উপর মারিতেন এবং বলিতেন, মার খাওয়ার জন্য এই গোছাগুলি আমার ঘোড়া হইতে বেশী উপযুক্ত। তিনি ইহাও বলিতেন, সাহায্যে কেরাম (রাযিঃ) এইরূপ মনে করেন (যে, জান্নাতের সমস্ত মর্যাদা) তাঁহারাই দখল করিয়া লইবেন, না ; আমরা তাহাদের সহিত (এইসব মর্যাদার ব্যাপারে) ভালভাবে মোকাবেলা করিব। যেন তাঁহারাও বুঝিতে পারেন যে, তাঁহারা তাঁহাদের পর যোগ্য লোকদেরকেই রাখিয়া আসিয়াছেন।

হযরত কাসেম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর (রাযিঃ) বলেন, আমি একদিন সকালে আমার ফুফু হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর খেদমতে সালাম করার জন্য হাজির হইলাম। তিনি চাশতের নামায পড়িতেছিলেন এবং এই আয়াত শরীফ পড়িতেছিলেন : **فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقْنَا عَذَابَ السُّمُومِ** অর্থাৎ, অতঃপর আল্লাহ তায়ালা আমাদের উপর অনুগ্রহ করিলেন এবং আমাদের জাহান্নামের আজাব হইতে রক্ষা করিলেন। (তুরঃ ২৭) হযরত আয়েশা (রাযিঃ) এই আয়াতকে বারবার পড়িতে

থাকিলেন এবং কাঁদিতে থাকিলেন। কাসেম (রাযিঃ) বলেন, আমি অনেক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে থাকিলাম। পরে আমার খেয়াল হইল যে, ততক্ষণে আমি বাজার হইতে ফিরিয়া আসি। প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করিয়া ফিরিয়া যাইবার সময় সালাম করিয়া যাইব। সুতরাং আমি বাজারে চলিয়া গেলাম। সেইখান হইতে কাজ শেষ করিয়া যখন আমি ফিরিয়া আসিলাম, তখন তিনি ঐভাবেই দাঁড়াইয়া একই আয়াত পড়িতেছিলেন এবং কাঁদিতেছিলেন।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেন, আবদুর রহমান ইবনে আসওয়াদ যখন হজ্জের জন্য আসিলেন তখন তাহার এক পায়ে ব্যথা ছিল। তিনি এশার পর শুধু এক পায়ের উপর ভর করিয়া দাঁড়াইলেন এবং সকাল পর্যন্ত এক পায়ের উপরেই ভর করিয়া দাঁড়াইয়া নফল পড়িতে থাকিলেন এবং সেই অজুর দ্বারাই ফজরের নামায পড়িলেন।

এক বুয়ুর্গ বলেন, আমি মৃত্যুকে শুধু এইজন্য ভয় করি যে, উহার কারণে তাহাজ্জুদ নামায বন্ধ হইয়া যাইবে। (এবং ঐ তপ্তি, যাহা উক্ত নামাযের মধ্যে লাভ হইত, তাহা শেষ হইয়া যাইবে)

হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, নেক লোকদের আলামত হইল, রাত্রি জাগরণের কারণে চেহারা হরিদ্রা বর্ণ হইয়া যায়। রাত্রে কান্নাকাটির কারণে দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া যায়। অধিক রোযা রাখার কারণে ঠোঁট শুষ্ক হইয়া যায়। আর তাহাদের চেহারা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ)কে কেহ জিজ্ঞাসা করিল, অধিক এবাদতকারীদের চেহারা কিভাবে এত উজ্জ্বল হইয়া যায়? তিনি বলিলেন, যখন তাহারা নির্জনে রহমানের ধ্যানে মগ্ন হন, তখন রহমতের মালিক আপন নূরের ছায়া তাহাদের উপর ঢালিয়া দেন।

হযরত কাসেম ইবনে রাশেদ (রহঃ) বলেন, যামআ (রহঃ) আমাদের কাছাকাছি মুহাস্সাব নামক স্থানে (মক্কা মুকাররমার নিকটস্থ একটি জায়গা) অবস্থান করিতেছিলেন। তাহার সহিত তাহার স্ত্রী ও কন্যাগণও ছিলেন। তিনি রাত্রে অনেক দীর্ঘ নামায পড়িতে থাকেন, যখন শেষ রাত্র হইয়া যাইত, তখন তিনি উচ্চস্বরে বলিতেন, হে মুসাফিরগণ! তোমরা কি সারারাত্র ঘুমাইতেই থাকিবে? উঠ, চল। এই ডাকে সকলেই জাগ্রত হইয়া যাইত। কেহ ওযু করিতেছে, কেহ নামায পড়িতেছে, কেহ নির্জনে বসিয়া কান্নাকাটি করিতেছে। কেহ কুরআন পাক তেলাওয়াত করিতেছে। যখন সকাল হইয়া যাইত, তখন তিনি বলিতেন, রাত্রে পথিকরা সকালে থামিয়া যায়।

এক বুয়ুর্গ বলেন, আমি বাইতুল মুকাদ্দাসের পাহাড়সমূহের ভিতর দিয়া যাইতেছিলাম। এক জায়গায় পৌঁছিয়া আমি একটি আওয়াজ শুনিলাম। আমি ঐ আওয়াজের দিকে চলিলাম। দেখিলাম যে, একটি বাগান। সেখানে একটি বৃক্ষ রহিয়াছে। উহার নিচে এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া নামায পড়িতেছে এবং বারবার এই আয়াত পড়িতেছে : **يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ** অর্থাৎ,

যেইদিন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ সংকর্মকে (যাহা সে দুনিয়াতে করিয়াছে,) সামনে উপস্থিত পাইবে এবং নিজের খারাপ কাজসমূহকে(ও সামনে উপস্থিত পাইবে) এবং এই আকাঙ্ক্ষা করিতে থাকিবে, হায়! এই দিন ও ঐ ব্যক্তির (অর্থাৎ আমার) মাঝে বিরাট কোন দূরত্ব আড়াল হইয়া যাইত, (যাহাতে এই খারাপ আমলগুলি তাহার সামনে আসিত না।) আর তোমাদিগকে আল্লাহ তায়ালা তাঁহার ব্যাপারে ভয় প্রদর্শন করেন। (তাহার জিজ্ঞাসা এবং হিসাব ও আযাব হইতে অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে ভয় করিতে থাক।) (আলি-ইমরান : ৩০)

উক্ত বুয়ুর্গ বলেন, আমি চুপচাপ তাহার পিছনে বসিয়া গেলাম। তিনি বারবার ঐ আয়াতই পড়িতেছিলেন এবং কাঁদিতেন। এমন সময় হঠাৎ তিনি সজ্ঞারে একটি চিৎকার দিলেন এবং বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া গেলেন। আমার অত্যন্ত দুঃখ হইল যে, আমার দুর্ভাগ্যের কারণে বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া গেলেন। দীর্ঘ সময় পর তাহার হুঁশ আসিল। তখন তিনি বলিতে লাগিলেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট মিথ্যাবাদীর মত দাঁড়াইয়া কান্নাকাটিকারীদের হইতে আশ্রয় চাহিতেছি (তিনি যেন নিজের এই তেলাওয়াত ও কান্নাকাটিকে মুনাক্কীর কান্নাকাটি সাব্যস্ত করিলেন)। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি—বেহুদা লোকদের আমল হইতে (কেননা, আমার এই পড়া ও কান্নাকাটি করা বেহুদা লোকদের পড়ার মতই, কারণ, আমার মত বেহুদা আর কে হইবে।) হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট গাফেল লোকদের অমনোযোগিতা হইতে আশ্রয় চাহিতেছি। (কেননা, আমার এই কাজটিও গাফলতির সহিত হইতেছে।) অতঃপর বলিতে লাগিলেন, হে আল্লাহ! যাহারা ভয় করে, তাহাদের অন্তর তোমারই নিকট বিনয় প্রকাশ করে। আর যাহারা নেক আমলে ক্রটি করে, তাহারা তোমারই রহমতের আশা করিয়া থাকে। তোমার প্রেমিকদের অন্তর তোমারই বড়ত্বের সম্মুখে অবনত হয়। অতঃপর

তিনি নিজের উভয় হাত ঝাড়িলেন (যেমন মাটি ইত্যাদি হাতে লাগিয়া গেলে ঝাড়া হয়) এবং বলিলেন, দুনিয়ার সঙ্গে আমার এবং আমার সঙ্গে দুনিয়ার কোন সম্পর্ক নাই। হে দুনিয়া! তুমি তোমার পুত্রদের নিকট চলিয়া যাও। যাহারা তোমার নেয়ামতের মূল্য দেয়, তুমি তাহাদের নিকট চলিয়া যাও। তুমি তোমার প্রেমিকদের নিকট চলিয়া যাও। তাহাদিগকেই ধোকায় ফেল (আমাকে বিরক্ত করিও না)। অতঃপর বলিতে লাগিলেন, পূর্বকার লোকেরা কোথায় চলিয়া গিয়াছে? সকলেই মাটির সহিত মিশিয়া গিয়াছে। পুরানা হইয়া মাটিতে পরিণত হইয়া গিয়াছে। যতই সময় অতিবাহিত হইতেছে মানুষ ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। আমি সেই বুয়ুর্গকে বলিলাম, দীর্ঘ সময় হইতে আমি আপনার অবসর হওয়ার অপেক্ষায় বসিয়া আছি। বলিতে লাগিলেন, এমন ব্যক্তির অবসর কোথায়, যাহার সময় শেষ হইয়া যাওয়ার চিন্তা হইতেছে। আর সে তাড়াহুড়া করিতেছে—যেন সময় শেষ হওয়ার আগে আগে কিছু করিয়া লইতে পারে। অপরদিকে যে কোন উপায়ে সময় তাড়াতাড়ি শেষ হইয়া যাওয়ার জন্য দ্রুত চলিয়া যাইতেছে। ঐ ব্যক্তি কিভাবে অবসর হইতে পারে, যে সময় চলিয়া যাওয়ার পর জলদি মৃত্যু আসিয়া যাওয়ার চিন্তায় চিন্তাযুক্ত রহিয়াছে। ঐ ব্যক্তি কিভাবে অবসর হইতে পারে, যাহার সময় তো চলিয়া যাইতেছে আর এই অতিক্রান্ত সময়ে সে যেসকল গুনাহ করিয়াছে, উহা তাহার হিসাবের খাতায় জমা হইয়া রহিয়াছে। অতঃপর তিনি আল্লাহর দিকে মনোযোগী হইয়া বলিতে লাগিলেন, তুমিই আমার আগত বিপদে আশ্রয়ের স্থল। (তোমারই রহমতে আমি পার হইতে পারিব।) কিছুক্ষণ এইভাবে মশগুল থাকিলেন অতঃপর কুরআন পাকের আরেকটি আয়াত পড়িলেন : وَبَدَّالَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে তাহাদের সহিত এমন আচরণ করা হইবে, যাহার ধারণাও তাহাদের ছিল না। (যুমার : ৪৭) ইহা একটি আয়াতের অংশ মাত্র। সম্পূর্ণ আয়াত এই : وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَبَدَّالَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ অর্থাৎ, যে সমস্ত লোক (দুনিয়াতে) জুলুম করিয়াছিল (অর্থাৎ কুফর ও শিরক ইত্যাদি করিয়াছিল, যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হইয়াছে, শিরক করা বিরাট জুলুম) যদি তাহাদের নিকট সমগ্র দুনিয়ার সমস্ত জিনিস থাকে এবং উহার সহিত ঐ পরিমাণ জিনিস আরও অতিরিক্ত থাকে, তবে তাহারা কিয়ামতের দিন কঠিন আজাব

হইতে মুক্তিলাভের জন্য (নির্দিধায়) এই সমস্ত জিনিসকে ফেদিয়া হিসাবে দিয়া দিবে (কিন্তু ফেদিয়া সেইদিন কবুল করা হইবে না, যেমন সূরা বাকারার কয়েক জায়গায় এবং সূরা মায়েদায় উল্লেখ করা হইয়াছে) এবং (ঐ সকল লোকদের সহিত) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে এমন আচরণ করা হইবে, যাহার ধারণাও তাহাদের ছিল না। (যে এত কঠিন অবস্থাও হইতে পারে! এই জায়গায় এই বিষয়ের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ বেশ কয়েকটি আয়াত রহিয়াছে।)

মোটকথা, ঐ বুযুর্গ এই আয়াত শরীফ পড়িলেন এবং পূর্বাপেক্ষা উচ্চ আওয়াজে চিৎকার করিলেন। অতঃপর বেইশ হইয়া এমনভাবে পড়িয়া গেলেন যে, আমি মনে করিলাম—তাহার জান বাহির হইয়া গিয়াছে। আমি তাহার নিকটে যাইয়া দেখিলাম, তিনি ছটফট করিতেছেন। অনেকক্ষণ পর যখন ইঁশ ফিরিয়া আসিল, তখন তিনি বলিতেছিলেন, হে আল্লাহ! আমি যখন কিয়ামতের দিন তোমার সম্মুখে দাঁড়াইব, তখন তুমি নিজ অনুগ্রহে আমার গুনাহগুলি মাফ করিয়া দিও এবং তোমার সান্ত্বারীর (অর্থাৎ গোপন রাখার অনন্ত গুণের) পর্দা দ্বারা আমাকে ঢাকিয়া লইও। শুধু তোমার মেহেরবানী দ্বারা আমার গুনাহ মাফ করিয়া দিও। আমি তাহাকে বলিলাম, আপনি যেই পাক জাতের রহমতের আশা করিতেছেন, তাহারই দোহাই দিয়া অনুরোধ করিতেছি যে, আপনি আমার সহিত একটু কথা বলুন। তিনি বলিতে লাগিলেন, তোমার এইরূপ লোকের সহিত কথা বলা উচিত, যাহার কথা দ্বারা তোমার উপকার হইবে। যে ব্যক্তিকে তাহার গুনাহ ধ্বংস করিয়া দিয়াছে, (অর্থাৎ আমি) এমন ব্যক্তির সহিত কথা বলা ছাড়িয়া দাও। অতঃপর বলিলেন, আল্লাহ পাক জানেন—এই স্থানে কত কাল যাবৎ আমি শয়তানের সহিত লড়াই করিতেছি। আমি তাহার সহিত লড়াই করিতেছি আর সে আমার সহিত লড়িতেছে। (অর্থাৎ সে আমাকে সর্বদা আল্লাহ তায়ালা হইতে অমনোযোগী করার চেষ্টায় লাগিয়া রহিয়াছে।) কিন্তু আজ পর্যন্ত আমি যাহাতে মশগুল আছি, উহা (অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা) হইতে সে আমাকে সরাইবার তোমাকে ছাড়া আর কোন পন্থা খুঁজিয়া পায় নাই। অতএব, তুমি আমার নিকট হইতে দূর হইয়া যাও। তুমি (শয়তানের) ধোকার মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছ। তুমি আমার জিহ্বাকে মুনায্বাত হইতে থামাইয়া দিয়াছ। আমার দিলকে (আল্লাহ তায়ালা হইতে সরাইয়া) তোমার কথার দিকে মনোযোগী করিয়াছ। আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট তোমার অনিষ্ট হইতে আশ্রয় চাহিতেছি। আর পবিত্র সন্তার নিকট ইহাও আশা রাখিতেছি যে, তিনি

আপন গোশ্বা হইতে আমাকে আশ্রয় দান করিবেন। উক্ত ব্যক্তি যিনি কথা বলিতে চাহিতেছিলেন, তিনি বলেন, আমার এই ভয় হইল যে, আমি আল্লাহ তায়ালার দিক হইতে তাহার মনোযোগ সরাইয়া দিয়াছি। এমন না হয় যে, এই কারণে আমার উপর কোন আজাব নাযিল হইয়া যায়। কাজেই আমি তাহাকে সেই স্থানে রাখিয়া চলিয়া আসিলাম।

হযরত কুরয ইবনে ওয়াব্রাহ (রহঃ) প্রতিদিন কুরআন শরীফ তিন খতম করিতেন। ইহা ছাড়াও বিভিন্ন এবাদতে সবসময় মগ্ন থাকিতেন। কেহ আরজ করিল, আপনি আপনার নফসকে বড় মেহনতের মধ্যে ফেলিয়াছেন। বলিতে লাগিলেন, সমস্ত দুনিয়ার বয়স কত? সে আরজ করিল, সাত হাজার বৎসর। বলিলেন, কিয়ামতের দিন কতটুকু? আরজ করিল, পঞ্চাশ হাজার বৎসর। বলিতে লাগিলেন, তোমাদের মধ্য হইতে কোন ব্যক্তি এই ব্যাপারে কি করিয়া অক্ষম হইতে পারে যে, দিনের সাত ভাগের একভাগ পরিশ্রম করিয়া বাকি দিন আরামে কাটাইবে (অর্থাৎ কেহ যদি শুধু সাড়ে তিন ঘণ্টা মেহনত করিয়া পুরা দিন আরাম করিতে পারে, তবে ইহা কে ছাড়িবে)। সুতরাং যদি কেহ কিয়ামতের দিনের আরামের জন্য দুনিয়ার পুরা জীবন অর্থাৎ সাত হাজার বৎসর মেহনত করিয়া লয়, তবুও ইহা বড় লাভজনক ব্যবসা হইবে। অথচ মানুষের বয়স দুনিয়ার পুরা বয়সের মধ্য হইতে একেবারে সামান্য একটা অংশ এবং আশ্বেরাতের জীবন কিয়ামতের দিনের পরেও সীমাহীন রহিয়াছে। এই কয়েকটি ঘটনা নমুনাস্বরূপ উল্লেখ করা হইল।

ইমাম গায্বালী (রহঃ) বলেন, এই ছিল প্রথম যুগের বুযুর্গদের অভ্যাস ও গুণাবলী। যদি তোমার অবাধ্য নফস স্বয়ং এবাদত করিতে না পারে, তবে এইসব নিবেদিতপ্রাণ আল্লাহ ওয়ালাদের অবস্থা গভীরভাবে দেখ এবং চিন্তা কর যে, এই সমস্ত বুযুর্গ যাহারা দ্বীনী বিষয়ে পারদর্শী ও আশ্বেরাতের ব্যাপারে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ও বিচক্ষণ ছিলেন, তাহাদের অনুসরণ করা ও তাহাদের জামাতে शामिल হওয়া উত্তম হইবে, নাকি নিজেদের জ্ঞানার ঐ সমস্ত জাহেলদের অনুসরণ উত্তম হইবে, যাহারা দ্বীন সম্পর্কে গাফেল? বুদ্ধিমান লোকদের অনুসরণ ছাড়িয়া আহমকদের অনুসরণ কখনও করিও না। যদি তোমার ধারণা হয় যে, তাহারা শক্তিশালী লোক ছিলেন, তাহাদের অনুসরণ করা কঠিন, তবে কিছুসংখ্যক মহিলাদের অবস্থাও শুনিয়া লও। তুমি পুরুষ হইয়া অন্ততঃপক্ষে মহিলাদের সমকক্ষ হইতে তো অক্ষম হইও না। তুমিই চিন্তা করিয়া দেখ, ঐ পুরুষ কত নিকৃষ্ট, যে দ্বীনের কাজে মহিলাদেরও সমকক্ষ

হইতে পারে না !

এখন মনোযোগ দিয়া শোন, হযরত হাবীবা আদাবিয়া (রহঃ) যখন এশার নামায হইতে অবসর হইয়া যাইতেন, তখন নিজের শরীরে ভালভাবে কাপড়ে জড়াইয়া ছাদের উপর দাঁড়াইয়া যাইতেন এবং দোয়ায় মশগুল হইয়া যাইতেন। আর বলিতেন, হে আল্লাহ ! তারকারাজি ছড়াইয়া গিয়াছে, লোকজন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, বাদশাহগণ তাহাদের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছে, প্রত্যেকে আপন আপন প্রিয়তমের সহিত নির্জনে চলিয়া গিয়াছে, আর আমি তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছি। এই বলিয়া নামায শুরু করিয়া দিতেন এবং সারারাত্র নামায পড়িতেন। যখন সকাল হইয়া যাইত, তখন বলিতেন, হে আল্লাহ ! রাত্র শেষ হইয়া গিয়াছে, দিনের আলো ভাসিয়া উঠিয়াছে। হায়, যদি আমি ইহা জানিতে পারিতাম যে, তুমি আমার এই রাত্র কবুল করিয়াছ, তবে আমি আমাকে মুবারকবাদ দিতাম। অথবা তুমি ফেরত দিয়াছ, তবে আমি আমার জন্য মাতম করিতাম। তোমার ইচ্ছার কসম, আমি তো সবসময় এইরূপই করিতে থাকিব। তোমার ইচ্ছার কসম, তুমি যদি আমাকে তোমার দরজা হইতে ধাক্কা দিয়া দাও, তবুও তোমার দয়া ও অনুগ্রহের যে অবস্থা আমার জানা আছে, উহার কারণে আমি তোমার দরজা হইতে কখনও সরিব না।

হযরত উজরা (রহঃ) অন্ধ ছিলেন। সারারাত্র জাগরণ করিতেন। যখন ভোর হইত, তখন অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত আওয়াজে বলিতেন, হে আল্লাহ ! আবেদগণ তোমার দিকে অগ্রসর হইয়া রাতের অন্ধকার পার করিয়াছে, তাহারা তোমার রহমত ও মাগফেরাতের দিকে একে অপর হইতে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করিয়াছে। হে আল্লাহ ! আমি শুধু তোমারই নিকট চাহিতেছি, তুমি ছাড়া আর কাহারও নিকট আমি চাহি না। তুমি আমাকে অগ্রগামীদের দলভুক্ত করিয়া দাও এবং সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত পৌছাইয়া দাও এবং তোমার নৈকট্যপ্রাপ্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দাও। তোমার নেক বান্দাদের মধ্যে শামিল করিয়া দাও। তুমি অতিশয় দয়ালু। তুমি সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী, সমস্ত দাতাদের চেয়ে বড় দাতা। হে দয়ালু ! আমার উপর দয়া কর। এই বলিয়া সেজদায় পড়িয়া যাইতেন। তাহার কান্নাকাটির আওয়াজ শুনা যাইত এবং সকাল পর্যন্ত কাঁদিতে থাকিতেন, দোয়া করিতে থাকিতেন।

ইয়াহইয়া ইবনে বুস্তাম (রহঃ) বলেন, আমরা হযরত শাওয়ানাহ (রহঃ)এর মজলিসে হাজির হইতাম। তাহার কান্নাকাটি ও চিৎকার শুনিতাম। আমি আমার এক সাথীকে বলিলাম, এক সময় নির্জনে তাহার

নিকট গিয়া বুঝানো দরকার যে, তিনি যেন কান্নাকাটি কিছু কম করিয়া দেন। আমার সাথী বলিল, ঠিক আছে আপনি যেমন বলেন। সুতরাং আমি তাহার নিকট নির্জনে পৌছিয়া তাহাকে বলিলাম, আপনি যদি আপনার কান্নাকাটি একটু কমাইয়া দিন এবং নিজের জানের উপর দয়া করেন, তবে বেশী ভাল হয়। কেননা, ইহাতে শরীরে কিছুটা শক্তি থাকিবে, দীর্ঘদিন উহা দ্বারা উপকৃত হইতে পারিবেন। ইহা শুনিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, আমার তো আকাঙ্ক্ষা এই যে, আমি এত কাঁদিব যে, চোখের অশ্রু শেষ হইয়া যায়। অতঃপর রক্তের অশ্রু কাঁদিতে আরম্ভ করিব। অবশেষে, আমার শরীরের সমস্ত রক্ত চক্ষু দিয়া বাহির হইয়া যাইবে। রক্তের এক ফোটাও আমার শরীরে অবশিষ্ট থাকিবে না। আরও বলিতে লাগিলেন, আমার দ্বারা কান্নাকাটি কোথায় হয়? বারবার ইহা বলিতে থাকিলেন। বলিতে বলিতে তিনি বেহীশ হইয়া গেলেন।

মুহাম্মদ ইবনে মুয়ায (রহঃ) বলেন, আমার নিকট একজন এবাদতকারিণী মহিলা বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমি স্বপ্নে দেখিলাম, জান্নাতে প্রবেশ করিতে যাইতেছি। সেখানে দেখিলাম, সমস্ত মানুষ জান্নাতের দরজার উপর দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, কি ব্যাপার? সকলেই দরজার উপর কেন জড় হইয়া রহিয়াছে? কেহ বলিল, একজন মহিলা আসিতেছেন, যাহার আগমনে জান্নাতকে সাজান হইয়াছে। ইহারা সকলে তাহার অভ্যর্থনার জন্য বাহিরে আসিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, সেই মহিলা কে? তাহারা বলিতে লাগিল, আইকাহ নামক স্থানের অধিবাসী একজন কালো বাঁদী, যাহার নাম শা'ওয়ানাহ। আমি বলিলাম, খোদার কসম! সে তো আমার বোন। এমন সময় দেখিলাম, শা'ওয়ানাহ একটি উৎকৃষ্ট, সুদর্শন, উন্নত উটনীর উপর বসিয়া হাওয়ায় উড়িয়া আসিতেছে। আমি তাহাকে ডাকিয়া বলিলাম, হে আমার বোন! আমার এবং তোমার সম্পর্ক কি—তাহা তে মার জানা আছে। তোমার প্রতিপালকের নিকট দোয়া করিয়া দাও, যেন তিনি আমাকেও তোমার সঙ্গী করিয়া দেন। ইহা শুনিয়া সে হাসিল এবং বলিতে লাগিল, এখনও তোমার আসিবার সময় হয় নাই। তবে আমার দুইটি কথা স্মরণ রাখিবে—(আখেরাতের) চিন্তা—ফিকিরকে নিজের সঙ্গে জড়াইয়া লও, আর আল্লাহ তায়ালার মহব্বতকে তোমার সমস্ত খাহেশের উপর প্রাধান্য দাও এবং ইহার অপেক্ষা করিও না যে, মৃত্যু কবে আসিবে। অর্থাৎ সবসময় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাক।

এক বুযুর্গ বলেন, আমি একদিন বাজারে যাইতেছিলাম। আমার সঙ্গে আমার হাবশী বাঁদি ছিল। আমি তাহাকে এক জায়গায় বসাইয়া সামনে চলিয়া গেলাম এবং তাহাকে বলিয়া গেলাম যে, এখানেই বসিয়া থাক, আমি এখনই আসিতেছি। যখন আমি ফিরিয়া আসিলাম, তখন সেখানে তাহাকে পাইলাম না। আমার অত্যন্ত রাগ হইল। রাগান্বিত অবস্থায় ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। যখন সে আমাকে দেখিল, তখন আমাকে রাগান্বিত দেখিয়া বলিতে লাগিল, হে আমার মনিব! শাস্তি দেওয়ার বিষয়ে জলদি করিবেন না। আমার একটু কথা শুনিয়া লউন। আপনি আমাকে এমন জায়গায় বসাইয়া গিয়াছেন, যেখানে আল্লাহর নাম লওয়ার কেহ ছিল না, আমার ভয় হইল, নাজানি এই জায়গা জমিনের মধ্যে ধসিয়া যায়। (যে জায়গায় আল্লাহর যিকির হয় না, সেখানে হঠাৎ করিয়া আঘাত আসিয়া যাওয়া কোন অযৌক্তিক কিছু নয়।) তাহার এই কথায় আমি আশ্চর্যবোধ করিলাম। আমি তাহাকে বলিলাম, তোমাকে আশ্রয় করিয়া দিলাম। সে বলিতে লাগিল, হে আমার মনিব! আপনি আমার সহিত ভাল ব্যবহার করেন নাই। আমি বলিলাম, কেন? সে বলিতে লাগিল, আমি যখন বাঁদি ছিলাম, তখন আমার দ্বিগুণ সওয়াব হইত। (যেমন হাদীস শরীফে আসিয়াছে, যে গোলাম আল্লাহর আনুগত্য করে এবং আপন মনিবের খেদমত করে, তাহার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব রহিয়াছে।) এখন আপনি আজাদ করিয়া আমার একটি সওয়াব নষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

বিখ্যাত বুযুর্গ হযরত খাওয়াস (রহঃ) বলেন, আমরা হযরত রাহলা আবেদার নিকট গেলাম। তিনি রোযা রাখিতে রাখিতে কালো বর্ণ হইয়া গিয়াছিলেন এবং নামায পড়িতে পড়িতে (পা অবশ হইয়া গিয়াছিল, যে কারণে) পঙ্গু হইয়া গিয়াছিলেন। বসিয়া নামায পড়িতেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে অঙ্গ হইয়া গিয়াছিলেন। আমরা যাইয়া আল্লাহ তায়ালার রহমত ও ক্ষমার আলোচনা করিলাম। হযরত ইহাতে তাহার কঠিন পরিশ্রম ও মোজাহেদা কিছুটা কমিয়া যাইবে। তিনি আমার কথা শুনিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া একটি টিৎকার দিলেন। অতঃপর বলিতে লাগিলেন, আমার নিজের অবস্থা যাহা জানা আছে, উহা আমার অন্তরকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিয়াছে এবং আমার কলিজাকে ছলিয়া দিয়াছে। হায়! আমি যদি পয়দাই না হইতাম, এই বলিয়া তিনি নামাযের নিয়ত বাঁধিলেন।

নমুনাস্বরূপ দুই একটি ঘটনা উল্লেখ করা হইল। ইমাম গাযফালী (রহঃ) মহিলাদের এই ধরনের আরও বহু ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর বলিয়াছেন, যদি তুমি তোমার নফসের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে

চাও, তবে তোমার জন্য জরুরী হইল, এই সকল সাধনা ও মেহনত, পুরুষ ও মহিলাদের জীবনী ও ঘটনাবলী গভীর চিন্তা-ভাবনার দৃষ্টিতে দেখিবে। যাহাতে তোমার স্বভাবের মধ্যে আনন্দ বৃদ্ধি পায় এবং পরিশ্রমের প্রতি তোমার মধ্যে আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। নিজের সমসাময়িক লোকদের অবস্থার প্রতি দেখিও না। কেননা, তাহাদের অধিকাংশকে এমন পাইবে যে, যদি তুমি তাহাদের অনুসরণ কর, তবে তাহারা তোমাকে আল্লাহর রাস্তা হইতে পথভ্রষ্ট করিয়া দিবে। এই সকল মেহনতকারীদের অসংখ্য ঘটনাবলী রহিয়াছে। নমুনাস্বরূপ আমি মাত্র কয়েকটি লিখিয়াছি। যাহা শিক্ষা গ্রহণের জন্য যথেষ্ট। তুমি যদি আরও অধিক জানিতে চাও, তবে 'হিলয়াতুল আওলিয়া' কিতাব পাঠ কর। উহাতে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন এবং পরবর্তী বুয়ুর্গদের অবস্থা বিস্তারিতভাবে লেখা হইয়াছে। (আরও কিছু ঘটনা 'এহইয়া' কিতাবের ব্যাখ্যাকারী নিজ্জেও উল্লেখ করিয়াছেন।) তাহাদের অবস্থা পড়িলে জানিতে পারিবে যে, তুমি এবং তোমার সমসাময়িক লোকেরা দীন হইতে কত দূরে রহিয়াছ। যদি তোমার অন্তরে নিজের সমসাময়িক লোকদের দেখিয়া এই খেয়াল আসে যে, প্রথম যুগে যেহেতু কল্যাণ বেশী ছিল, এইজন্য সে যুগে এই সবকিছু সহজ ছিল, বর্তমানে যদি ঐ সমস্ত অবস্থার উপর আমল করা হয়, তবে লোকেরা পাগল বলিবে। কাজেই এই যুগে সকলের যে পরিণতি হইবে, আমারও তাহাই হইবে। মুসীবত যখন ব্যাপকভাবে আসে, তখন উহার মধ্যে সকলকেই শামিল হইতে হয়। ইহা তোমার নফসের ধোকামাত্র। তুমিই বল, যদি এমন হয় যে, বন্যার পানিতে সকলেই ভাসিয়া যাইতেছে আর যে ব্যক্তি সাঁতার জানে অথবা অন্য কোন উপায়ে বাঁচিতে পারে, তবে সে কি এই চিন্তা করিয়া চুপ করিয়া থাকিবে যে, এই মুসীবতে তো সকলেই লিপ্ত হইয়াছে। অথচ বন্যার মুসীবত তো সামান্য সময়ের ব্যাপার। বেশীর চেয়ে বেশী মৃত্যু ঘটিবে। ইহার চেয়ে বেশী তো কিছু হইবে না। কিন্তু আখেরাতের আযাব অত্যন্ত কঠিন, কখনও শেষ হইবে না। এই বিষয়টিকে উত্তমরূপে বুঝিয়া লওয়া চাই এবং সবসময় চিন্তা করা চাই।

(এহইয়া)

হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহঃ)এর নিকট কেহ আরজ করিল, আপনি যদি কোন সময় অবসর হইতেন, তবে আমরা আপনার খেদমতে হাজির হইতাম এবং আপনার কিছু নসীহত শুনিতাম। তিনি বলিলেন, আমার সম্মুখে এখন চারটি কাজ রহিয়াছে, যাহাতে আমি মশগুল আছি। উহা হইতে অবসর হওয়ার পর হইতে পারে।

এক—যখন রূহ-জগতে অঙ্গীকার লওয়া হইয়াছিল, তখন আল্লাহ তায়ালা একদল সম্পর্কে বলিয়াছিলেন, ইহারা জ্ঞানাতী। অপরদল সম্পর্কে বলিয়াছিলেন, ইহারা দোষখী। আমি সবসময় এই বিষয়ে চিন্তাযুক্ত থাকি যে, জানিনা আমি কোন দলে রহিয়াছি।

দুই—মাযের পেটে যখন বাচ্চার সৃষ্টি শুরু হয়, তখন যে ফেরেশতা সেই বীর্যের উপর নিযুক্ত থাকে, সে আল্লাহ তায়ালাকে জিজ্ঞাসা করে, ইহাকে ভাগ্যবান লিখিব নাকি দুর্ভাগা লিখিব? আমি সবসময় এই বিষয়ে চিন্তিত থাকি যে, জানিনা; আমার সম্পর্কে কি লেখা হইয়াছে।

তিন—যখন ফেরেশতা মানুষের রূহ কবজ করে, তখন ইহা জিজ্ঞাসা করে যে, এই রূহকে মুসলমানদের রূহের সঙ্গে রাখিব, নাকি কাফেরদের রূহের সঙ্গে? জানিনা; আমার সম্পর্কে ঐ ফেরেশতাকে কি জওয়াব দেওয়া হইবে।

চার—কিয়ামতের দিন হুকুম হইবে : **وَأَمَّا زُورًا الْيَوْمَ أَبْهًا** অর্থাৎ, আজ অপরাধীরা অনুগত বান্দাদের হইতে পৃথক হইয়া যাও। আমি এই বিষয়ে চিন্তিত থাকি যে, জানিনা; আমি কোন দলের অন্তর্ভুক্ত হইব (ইয়াসীন : ৫৯)। (তাস্বীহুল গাফেলীন) অর্থাৎ, যখন এই চার প্রকার চিন্তা হইতে নিরূপদ হইয়া যাইব, তখন বন্ধুদের সহিত নিশ্চিন্ত মনে কথা বলিবার সময় হইতে পারে। এখন তো আমি সবসময় এইসব চিন্তায় চিন্তিত থাকি। কিভাবে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিতে পারি।

①৫ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْغَنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغَنَى غِنَى النَّفْسِ (مَتَّفِقٌ عَلَيْهِ كَذَا فِي الْمَشْكُوتَةِ)

حُضْرَةُ صَلَّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْشَادِے کہ آدمی کا غنی ہونا مال کی کثرت سے نہیں ہوتا۔ بلکہ حقیقی غنا تو دل کا غنی ہونا ہے۔

①৫ হযূর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, মাল বেশী হওয়ার দ্বারা মানুষ ধনী হয় না, বরং প্রকৃত ধনী হওয়া তো অন্তরের ধনী হওয়া। (মিশকাত : বুখারী, মুসলিম)

হাদীসের অর্থ একেবারে স্পষ্ট যে, যদি মানুষের অন্তর ধনী না হয়, তবে তাহার নিকট যত বেশী সম্পদই হউক না কেন, সে সম্পদ খরচ করার ব্যাপারে ফকীরদের চেয়েও কম খরচকারী হইবে। আর যতই সম্পদ তাহার নিকট হউক না কেন, সে সবসময় উহা বৃদ্ধি করিবার চিন্তায় অভাবী লোকদের চাইতেও বেশী পেরেশান হইবে। আর যদি তাহার অন্তর

ধনী হয়, তবে সামান্য সম্পদও তাহাকে নিশ্চিত রাখিবে। আর যে পরিমাণ সম্পদ তাহার নিকট থাকিবে, সর্বদা উহাকে বৃদ্ধি করার চিন্তা হইতে মুক্ত থাকিবে।

ইমাম রাগেব (রহঃ) বলেন, ‘গেনা’ শব্দটি কয়েক অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রথমতঃ গেনা অর্থ কোন রকমের মুখাপেক্ষিতা না হওয়া, এই হিসাবে তো শুধু আল্লাহ তায়ালাই গনী (ধনী)। কেননা, তিনি কোন জিনিসের মুখাপেক্ষী নহেন। এই অর্থেই আল্লাহ তায়ালা এরশাদ রহিয়াছে : **أَنْتُمْ أَفْقَرُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ مُرُ الْغَنِيِّ الْحَمِيدُ** (অর্থাৎ, তোমরা সকলেই আল্লাহ তায়ালায় মুখাপেক্ষী আর আল্লাহ তায়ালা অমুখাপেক্ষী। সর্বপ্রকার প্রশংসার অধিকারী।) (ফাতির : ১৫)

দ্বিতীয় অর্থ—প্রয়োজন কম হওয়া। এই অর্থ হিসাবে আল্লাহ তায়ালা হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে সূরা ‘ওয়াদুহা’য় এরশাদ করিয়াছেন : **وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى** (অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে দরিদ্র পাইয়াছেন, অতঃপর আপনাকে গনী (ধনী) বানাইয়া দিয়াছেন।) এই অর্থেই হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র এরশাদ উপরোক্ত হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। অর্থাৎ, প্রকৃত ধনী হওয়া অন্তরের ধনী হওয়া।

তৃতীয় অর্থ—সম্পদের প্রাচুর্য ও সামানের আধিক্য। যাহাকে কুরআন পাকে **يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ** এর মধ্যে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই আয়াতের অর্থ এই যে, দান-খয়রাত ও সদকাসমূহ পাইবার আসল হকদার ঐসব লোক, যাহারা আল্লাহর রাস্তায় বিপদগ্রস্ত হইয়া গিয়াছে অথচ মূর্থ লোকেরা তাহাদিগকে মানুষের নিকট সওয়াব না করিবার কারণে ধনী মনে করে। (বাকারা : ২৭৩)

হযরত আবু যর গিফারী (রাযিঃ) বলেন, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিয়াছেন, হে আবু যর! তুমি কি মনে কর যে, মালের প্রাচুর্যের নাম ধনী হওয়া? আমি আরজ করিলাম, অবশ্যই। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি কি মনে কর যে, মাল কম হওয়ার নাম দরিদ্রতা? আমি আরজ করিলাম, অবশ্যই। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, অন্তরের ধনীই প্রকৃত ধনী, আর অন্তরের দরিদ্রই প্রকৃত দরিদ্র। (তারগীব)

বাস্তব ইহাই যে, প্রকৃত ধনী হইল, অন্তরের ধনী। ভাগ্যবান—যাকে আল্লাহ পাক এই দৌলত নসীব করিয়া দেন। প্রকৃতপক্ষে ইহাই হইল দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি। যেই অন্তরে মালের মহব্বত একেবারেই নাই,

সে-ই ধনী, সে-ই দুনিয়াত্যাগী ; যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাহার নিকট মাল না থাকে। আর যে দিলে দুনিয়ার মহব্বত থাকে, সে দরিদ্র, সে দুনিয়াদার, চাই তাহার নিকট যতই মাল থাকুক।

ফকীহ আবুল লাইছ (রহঃ) জনৈক জ্ঞানী লোকের উক্তি বর্ণনা করেন যে, আমরা চারটি জিনিস তালাশ করিয়াছি এবং উহার তালাশে ভুল পথ অবলম্বন করিয়াছি। আমরা ধনী হওয়াকে মালের মধ্যে তালাশ করিয়াছি, অথচ উহা মালের মধ্যে ছিল না, বরং অল্পে তুষ্টির মধ্যে ছিল (আমরা অনবরত উহাকে মালের মধ্যে তালাশ করিয়াছি, যখন উহা মালের মধ্যে নাই, তখন উহাকে কিভাবে পাইতে পারি)। আমরা আরামকে (জ্ঞান ও মালের) প্রাচুর্যের মধ্যে তালাশ করিয়াছি ; অথচ আরাম এই সমস্ত জিনিস কম হওয়ার মধ্যে ছিল। আমরা ইয্যত-সম্মান মবলুকের মধ্যে তালাশ করিয়াছি। (সুতরাং তাহাদিগকে রাজি-খুশী করার উপায় অবলম্বন করি। যাহাতে তাহাদের নিকট আমাদের ইয্যত-সম্মান হয়।) কিন্তু উহা তাকওয়ার মধ্যে পাইয়াছি (ইহা একেবারে সত্য কথা যে, মানুষের মধ্যে যত বেশী তাকওয়া হইবে, ততই তাহার ইয্যত-সম্মান বেশী হইবে)। আমরা আল্লাহ তায়ালায় নেয়ামতকে খানাপিনা ও পোশাক-পরিচ্ছদের মধ্যে তালাশ করিয়াছি (এবং মনে করিয়াছি যে, এই সবকিছু আল্লাহ তায়ালায় বড় নেয়ামত)। অথচ আল্লাহ তায়ালায় বড় নেয়ামত হইল, ইসলামের দৌলত এবং গুনাহসমূহকে ঢাকিয়া রাখা। (এই দুই নেয়ামত যাহার লাভ হইয়াছে, তাহার উপর আল্লাহ তায়ালায় বড় নেয়ামত হইয়াছে।)

হযুর সাব্বান্নাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করা হইয়াছে যে, দুনিয়া যেই ব্যক্তির উদ্দেশ্যে পরিণত হয়, আল্লাহ তায়ালা তাহার অন্তরের উপর তিনটি জিনিস চাপাইয়া দেন। এক—এমন দুঃশিঙা, যাহা কখনও শেষ হয় না। দুই—এমন ব্যস্ততা, যাহা হইতে সে কখনও অবসর পায় না। তিন—এমন অভাব, যাহা কখনও শেষ হয় না।

(তাম্বীহুল গাফেলীন)

হযুর সাব্বান্নাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যখন তুমি এমন কোন ব্যক্তিকে দেখ—যাহাকে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি এবং কথা কম বলার গুণ দান করিয়াছেন, তখন তুমি তাহার সাহচর্যে থাকিও। কেননা, তাহাকে বিশেষ জ্ঞান দান করা হইয়াছে।

(মিশকাত)

①৭ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا
 نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فَضَّلَ عَلَيْهِ
 فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى
 مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ.
 حضور! অর্ধশ্রী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
 পাক! ইরশাদ কেরিব আদমী কসী ইয়ে শখস
 কী طرفে কী জরাল মী য়াসবত মী ইয়ে
 অলী বরতর ইয়ে শখস কী طرفে কী খুদ
 জরান জিরেদ মী ইয়ে কেম জর-

(متفق عليه كذا في المشكاة)

①৬ হযুর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষ
 যখন কোন এমন ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি করে, যে সম্পদ অথবা সৌন্দর্যের দিক
 দিয়া তাহার অপেক্ষা উচ্চস্তরে রহিয়াছে, তখন সে যেন এমন ব্যক্তিকে
 দেখিয়া চিন্তা করে, যে এই সমস্ত বিষয়ে তাহার অপেক্ষা নিম্নস্তরে
 রহিয়াছে। (মিশকাত : বুখারী, মুসলিম)

ফায়দা : অর্থাৎ, মানুষ যখন কোন ধনীকে দেখে এবং তাহাকে দেখিয়া
 লালসা করে ও আফসোস করে যে, এই ব্যক্তি এত মালদার, আমি তো
 এমন নহি, তখন এমন কোন মানুষকে দেখিয়াও যেন সে চিন্তা করে, যে
 অভাবের কারণে ক্ষুধার্ত রহিয়াছে। যাহাতে প্রথম আফসোসের সহিত এই
 বিষয়ে আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় হইতে পারে যে, তিনি তো
 আমাকে এইরূপ করিয়া রাখেন নাই।

অন্য এক হাদীসে আছে, নিজের চাইতে বেশী মালদারদের দিকে
 দৃষ্টিপাত করিও না। নিজের অপেক্ষা নিম্ন স্তরের লোকদেরকে দেখিয়া
 চিন্তা কর। ইহাতে তোমাদের অন্তরে ঐ নেয়ামতের প্রতি তুচ্ছভাব পয়দা
 হইবে না, যাহা আল্লাহ তায়ালার তোমাকে দিয়া রাখিয়াছেন। (মিশকাত)

হযরত আবু যর গিফারী (রাযিঃ) বলেন, আমাকে আমার মাহবুব
 (সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাতটি নসীহত করিয়াছেন।
 এক—আমাকে হুকুম করিয়াছেন, যেন মিসকীনদেরকে মহব্বত করি এবং
 তাহাদের নিকটে থাকি। দুই—আমাকে হুকুম করিয়াছেন, আমি যেন
 আমার চাইতে উচ্চ স্তরের লোকদের (অর্থাৎ বেশী মালদারদের) উপর
 দৃষ্টিপাত না করি, বরং আমার চাইতে কম স্তরের লোকদের উপর দৃষ্টি
 রাখি (তাহাদের সম্পর্কে চিন্তা করি)। তিন—আমাকে হুকুম করিয়াছেন,
 আমি যেন আত্মীয়-স্বজনের সহিত সদ্যবহার করি, যদিও তাহারা আমার
 দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লয় (অর্থাৎ, যাহার সহিত সদ্যবহার করিব, সে

অনুপস্থিত, আমার নিকট হইতে দূরে থাকে অথবা সে আমার সহিত
সদ্যবহার করে না, বরং আমাকে দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া লয়। 'তারগীব' ও
'তারহীব' নামক কিতাবে এইভাবে বলা হইয়াছে—যদিও সে আমার উপর
জুলুম করে। ইহা দ্বারা দ্বিতীয় অর্থটি জোরদার হয়)। চার—আমাকে হুকুম
করিয়াছেন, আমি যেন কাহারও নিকট কোন জিনিস না চাই।
পাঁচ—আমাকে হুকুম করিয়াছেন, আমি যেন হক কথা বলি; যদিও উহা
কাহারও নিকট তিক্ত লাগে। ছয়—আমাকে হুকুম করিয়াছেন, আমি যেন
আল্লাহ তায়ালায় সন্তুষ্টির মুকাবেলায় কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারের
পরওয়া না করি (অর্থাৎ, যাহা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা রাজী হন, উহা যেন
অবলম্বন করি, ইহাতে মূর্খ লোকেরা তিরস্কার করিলে করুক)। সাত—
আমাকে হুকুম করিয়াছেন, আমি যেন লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা
বিল্লাহ বেশী বেশী পড়ি। কারণ, এই কালেমাগুলি আরশের নীচে অবস্থিত
বিশেষ ভাণ্ডার হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে। (মিশকাত)

অধিক পরিমাণে লা হাওলা পড়ার প্রতি অনেক রেওয়াযাতে উৎসাহ
প্রদান করা হইয়াছে।

অন্য এক হাদীসে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ
বর্ণিত হইয়াছে যে, দুইটি অভ্যাস এমন, যে ব্যক্তির মধ্যে ইহা থাকিবে,
আল্লাহ তায়ালা তাহাকে ছবরকারী ও শোকরকারী জামাতের অন্তর্ভুক্ত
করিবেন—যে ব্যক্তি দীনের ব্যাপারে নিজ হইতে উচ্চ স্তরের লোকদের
অবস্থা দেখে এবং তাহাদের অনুসরণ করার চেষ্টা করে। আর দুনিয়ার
ব্যাপারে নিজ হইতে নিম্নস্তরের লোকদেরকে দেখে এবং এই ব্যাপারে
আল্লাহ তায়ালায় শোকর আদায় করে যে, আল্লাহ তায়ালা (একমাত্র নিজ
দয়া ও মেহেরবানীতে) আমাকে তাহার চাইতে ভাল অবস্থায় রাখিয়াছেন।
আল্লাহ তায়ালা এইরূপ ব্যক্তিকে ছবরকারী ও শোকরকারীদের মধ্যে গণ্য
করিবেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি দীনের ব্যাপারে তাহার চাইতে নিম্নস্তরের
লোকদেরকে দেখে (যে, অমুক তো এতটুকুও করে না, যতটুকু আমি করি)
এবং দুনিয়ার ব্যাপারে নিজ হইতে উচ্চস্তরের লোকদিগকে দেখে এবং
আফসোস করে যে, আমার নিকট এই পরিমাণ নাই, যেই পরিমাণ
অমুকের নিকট আছে। এইরূপ ব্যক্তি না-ছবরকারীদের মধ্যে গণ্য হইবে
আর না-শোকরকারীদের মধ্যে গণ্য হইবে। (মিশকাত)

আউন ইবনে আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন, আমি অধিকাংশ সময় ধনী
লোকদের সহিত উঠাবসা করিতাম। তখন আমি সর্বদা চিন্তিত থাকিতাম।
কাহারও কাপড় আমার কাপড় হইতে ভাল দেখিতাম (তখন নিজের কাপড়

নিম্ন মানের হওয়ার কারণে অপমান বোধ করিতাম ; ইহাতে মনে দুঃখ হইত) : কাহারও ঘোড়া আমার ঘোড়া হইতে উৎকৃষ্ট দেখিতাম। তারপর আমি গরীবদের সহিত উঠাবসা শুরু করিলাম, তখন এই কষ্ট হইতে মুক্তি পাইলাম। (কারণ, এই সকল লোকদের তুলনায় আমার জিনিসগুলিকে উত্তম দেখিতেছি।) (এইইয়া)

ওলামায়ে কেরাম লিখিয়াছেন, বিবাহ কোন গরীব মহিলাকে করিবে ; ধনী মহিলাকে বিবাহ করিবে না। কারণ, যে ব্যক্তি ধনী মহিলাকে বিবাহ করিবে, সে পাঁচটি আপদে গ্রেফতার হইবে। এক—মোহর বেশী দিতে হইবে। দুই—রুখসতী বিলম্বে হইবে এবং টালবাহানা হইতে থাকিবে (কেননা, তাহার যৌতুক ও সামান-পত্রের তৈরী শেষ হইবে না।) তিন—তাহার দ্বারা খেদমত লওয়া মুশকিল হইবে। চার—খরচ-পত্র বেশী চাহিবে। পাঁচ—তালাক দিতে চাহিলেও মালের লোভ তালাক দিতে দিবে না।

আর চার বিষয়ে স্ত্রীকে স্বামী হইতে নিম্ন স্তরে হইতে হইবে। না হইলে স্বামী তাহার দৃষ্টিতে হেয় হইবে। এক—বয়স। দুই—শারীরিক দৈর্ঘ্য। তিন—সম্পদ। চার—বংশ মর্যাদা। আর চার বিষয়ে স্ত্রী স্বামী হইতে উন্নত হইতে হইবে। এক—সৌন্দর্য। দুই—আদব-আখলাক। তিন—তাকওয়া। চার—চরিত্র। (এইইয়া) আর ধন-সম্পদের চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হইল, গঠন ও স্বাস্থ্যের দিক দিয়া নিজের চেয়ে নিম্ন স্তরের লোকদিগকে দেখা।

জনৈক বুযুর্গের খেদমতে এক ব্যক্তি হাজির হইয়া নিজের দরিদ্রতা ও অভাবের অভিযোগ করিল এবং অত্যন্ত পেরেশানী প্রকাশ করিল। এমনকি এই কষ্টে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষাও ব্যক্ত করিল। বুযুর্গ জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি ইহার উপর রাজী আছ যে, তোমার দুইটি চক্ষু সবসময়ের জন্য অন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে ; আর ইহার বিনিময়ে তোমাকে দশ হাজার দেরহাম দেওয়া হইবে। লোকটি ইহার উপর রাজী হইল না। বুযুর্গ জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা তুমি কি ইহার উপর রাজী আছ যে, দশ হাজার দেরহামের বিনিময়ে তোমার জিহ্বাটি কাটিয়া লওয়া হইবে। সে ইহাতেও রাজী হইল না। বুযুর্গ জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি ইহার উপর রাজী আছ যে, তোমার চারটি হাত পা কাটিয়া দেওয়া হইবে এবং বিনিময়ে তোমাকে বিশ হাজার দেরহাম দেওয়া হইবে। সে ইহাতেও রাজী হইল না। বুযুর্গ বলিলেন, আচ্ছা তুমি কি ইহাতে রাজী আছ যে, তোমাকে পাগল বানাইয়া দেওয়া হইবে এবং বিনিময়ে দশ হাজার দেরহাম দেওয়া হইবে।

সে ইহাতেও রাজী হইল না। বুয়ুর্গ বলিতে লাগিলেন, তোমার কি লজ্জা হয় না যে, তোমার স্বীকারকৃতি অনুযায়ীই পঞ্চাশ হাজারের চেয়ে অধিক মূল্যের সম্পদ তো আব্বাহ তায়ালার তোমাকে দিয়া রাখিয়াছেন (এই কয়েকটি জিনিস শুধু উদাহরণস্বরূপ দেখান হইয়াছে)। তারপরও তুমি অভিযোগ করিতেছ!

ইবনে সিমাক (রহঃ) এক বাদশাহর নিকট গেলেন। বাদশাহর হাতে পানির গ্লাস ছিল। বাদশাহ তাহার নিকট আবেদন করিল যে, আমাকে কোন নসীহত করুন। ইবনে সিমাক বলিলেন, যদি ইহা বলা হয় যে, এই এক গ্লাস পানি তোমার রাজত্বের বিনিময়ে পাওয়া যাইতে পারে, অন্যথায় পিপাসিতই থাকিতে হইবে; পানি পাওয়ার অন্য কোন ব্যবস্থা নাই, তবে কি তুমি সমগ্র রাজত্বের বিনিময়ে পানি খরিদ করিতে রাজী হইবে, না পিপাসায় মৃত্যুবরণ করিবে? বাদশাহ বলিল, অবশ্যই রাজী হইয়া যাইব। ইবনে সিমাক (রহঃ) বলিলেন, এই রকম রাজত্বের উপর আনন্দের কি আছে, যাহার সম্পূর্ণতার মূল্য মাত্র এক গ্লাস পানি।

এইসব দৃষ্টান্ত দ্বারা অনুমান করা যায় যে, প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট আব্বাহ তায়ালার এক একটি নেয়ামত এমন রহিয়াছে যে, লক্ষ কোটি উহার মূল্য হইতে পারে না। এইগুলি তো সাধারণ নেয়ামত, যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তি শরীক রহিয়াছে। যদি গভীর দৃষ্টিতে দেখা যায়, তবে প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে আব্বাহ তায়ালার এমন এমন বিশেষ নেয়ামত রহিয়াছে, যাহার মধ্যে অন্য কেহ শরীক নাই। তিনটি জিনিস তো এমন রহিয়াছে, যাহার ব্যাপারে প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বীকার করে যে, এই নেয়ামতের মধ্যে সে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; অন্য কেহ তাহার সমপর্যায়ের নাই। উহার মধ্যে একটি হইল-বুদ্ধিমত্তা। প্রত্যেক ব্যক্তি যতই বোকা হউক না কেন, সে মনে করে যে, আমি সবচেয়ে বেশী বুদ্ধিমান। আমি যে কথা বুঝি অন্য কেহ তাহা বুঝে না; বাস্তবে সঠিক হউক বা না হউক। কিন্তু নিজের বিশ্বাস ও স্বীকৃতি অনুযায়ী ইহা তাহার উপর আব্বাহ তায়ালার এমন নেয়ামত, যাহা অন্যের মধ্যে নাই। এইরূপ অবস্থায় কি জরুরী নয় যে, এই নেয়ামতের জন্য সে আব্বাহ তায়ালার সবচেয়ে বেশী শোকরগুয়ারী করিবে। (আর যদি সাধারণ জিনিস টাকা-পয়সা ইত্যাদির দিক দিয়া অন্য কাহারও হইতে নিম্ন পর্যায়ের হয়, তবে চিন্তা করিবে যে, সবচেয়ে উন্নত জিনিস বিবেক-বুদ্ধির দিক দিয়া আমি সকলের চাইতে উন্নত রহিয়াছি।)

দ্বিতীয় জিনিস হইল, অভ্যাস। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেকে ছাড়া অন্য প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে কোন না কোন এমন অভ্যাস আছে বলিয়া মনে

করে এবং দেখিতে পায়, যাহা তাহার দৃষ্টিতে দোষনীয়। যেন তাহার দৃষ্টিতে সে ছাড়া প্রত্যেকের ভিতর কোন না কোন চারিত্রিক দোষ অবশ্যই আছে। নিজের কোন অভ্যাসকেই (যদিও মৌখিকভাবে স্বীকার করে ; কিন্তু অন্তরে) দোষনীয় মনে করে না এবং উহাকে ছাড়িবার চেষ্টাও করে না। এইরূপ অবস্থায় মানুষের জন্য চিন্তা করা কি জরুরী নয় যে, আল্লাহ তায়ালা এক-আধ বিষয়ে যদিও অন্যের তুলনায় তাহাকে কম দিয়াছেন ; কিন্তু অভ্যাসের নেয়ামতের মধ্যে তাহাকে বিশেষভাবে সকলের চেয়ে বেশী দিয়া রাখিয়াছেন।

তৃতীয় জিনিস—এলেম। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ব্যক্তিগত অবস্থা ও ভিতরগত অবস্থা সম্পর্কে এতবেশী জানে যে, অন্য কোন ব্যক্তি তাহার অবস্থা সম্পর্কে এত জানে না। তাহার মধ্যে এইরূপ অনেক বিষয় থাকে যে, সে কখনও পছন্দ করে না—তাহার ঐ সকল দোষের ব্যাপারে অন্য কেহ জানুক। ইহা আল্লাহ তায়ালায় অনুগ্রহ যে, তিনি তাহাকে নিজের সমস্ত অবস্থার জ্ঞান দান করা সত্ত্বেও অন্যান্যদের হইতে উহাকে গোপন রাখিয়াছেন। আর তাহার এই আকাঙ্ক্ষাও পূরণ করিয়াছেন যে, আমার এইসব বিষয় যেন অন্য কেহ না জানে। সুতরাং উহাতে অন্য কেহ তাহার সঙ্গে শরীক নাই। ইহা কি এমন বিষয় নহে—যাহাতে সে একক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এবং উহার জন্য তাহার শুকরিয়া আদায় করা উচিত?

ইহা ছাড়াও প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে হাজারো এমন জিনিস রহিয়াছে, যেইগুলি সম্পর্কে সে কখনও ইহা পছন্দ করিতে পারে না যে, ঐ জিনিস তাহার নিকট হইতে লইয়া উহার পরিবর্তে বিপরীত জিনিস অথবা অন্য কোন জিনিস তাহাকে দেওয়া হউক। যেমন, মানুষ হওয়া। কেহ পছন্দ করিবে না যে, তাহাকে মানুষ হইতে বানর বানাইয়া দেওয়া হউক। যেমন, পুরুষ হওয়া। কেহ পছন্দ করিবে না যে, তাহাকে পুরুষ হইতে নারী বানাইয়া দেওয়া হউক। এমনভাবে মুমিন হওয়া, কুরআনের হাফেজ হওয়া, আলেম হওয়া, সুন্দর হওয়া, সম্ভানাদির পিতা হওয়া। মোটকথা, আখলাক-চরিত্রে, চেহারা-সুরতে, আচার-ব্যবহারে, আত্মীয়-স্বজনের দিক দিয়া, পরিবার-পরিজনের দিক দিয়া, ইয্যত-সম্মানের দিক দিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট এমন এমন বিশেষ নেয়ামত পাওয়া যাইবে, যাহা বদল করার ব্যাপারে সে কখনও রাজী হইবে না। তবে কি এই কথা সঠিক নয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তির উপর আল্লাহ তায়ালায় হাজারো এমন বিশেষ নেয়ামত রহিয়াছে, যাহা অন্যদের নসীব হয় নাই? এমতাবস্থায়, এই সবকিছু হইতে চক্ষু বন্ধ করিয়া যদি কেহ তাহার নিকট নাই কিন্তু অন্যের

نیکٹ رہیگا، এমন দুই একটি জিনিসের ব্যাপারে লোভ করে এবং না-শুকরী করে، তবে ইহা চরম পর্যায়ের নিচতা নয় কি?

আর যদি কাহারও নিকট প্রচুর সম্পদই দেখে، তবে যেন ঐ সমস্ত বিষয়ে গভীর চিন্তা করে، যাহা উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, উহার মধ্যে কত বিষয় এমন রহিয়াছে, যাহাতে সে ঐ ব্যক্তির তুলনায় অগ্রগামী রহিয়াছে : যাহার প্রতি সে হিংসা অথবা ঈর্ষা করিতেছে। অথচ সমষ্টিগতভাবে আল্লাহর নেয়ামতের মধ্যে সে ঐ ব্যক্তির তুলনায় উন্নত রহিয়াছে। (এই ইয়া)

আর এই সবকিছুর পর যে সম্পদ অন্যের নিকট রহিয়াছে, উহার পরিণতি জানা নাই—কি হইবে? উহা তাহার জন্য আরামের উপকরণ হইবে, নাকি ধ্বংসের কারণ হইবে? এইজন্যই হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র এরশাদ রহিয়াছে—কোন বদকার লোকের নিকট কোন নেয়ামত দেখিয়া ঈর্ষা করিও না। কেননা, তোমার জানা নাই, মৃত্যুর পর সে কোন্ মুসীবতে গ্রেফতার হইবে। কেননা, বদকার লোকের জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট এমন ধ্বংস রহিয়াছে অর্থাৎ জাহান্নাম, যাহা কখনও শেষ হইবে না। (মিশকাত) পরবর্তী হাদীসে এই বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আসিতেছে।

حُضْرُ كَارِ شَابَعٍ كَبَّرَ فِي رَأْيِهِ
مَنْ تَعَالَى شَأْنُ كَيْسٍ كُنَّ كَارِ بِرِاسِ كُنَّ
كَيْسٍ كَبَّرَ فِي رَأْيِهِ كَبَّرَ فِي رَأْيِهِ
تَوَرَّكَ تَعَالَى شَأْنُ كَيْسٍ كُنَّ كَارِ بِرِاسِ كُنَّ
بِهِ بِرِاسِ كُنَّ كَارِ بِرِاسِ كُنَّ
نَسُوَاتٍ مَبْلِسُونَ تَكْتَلَوَاتٍ فَرَاتٍ
جَسَدٍ كَارِ بِرِاسِ كُنَّ كَارِ بِرِاسِ كُنَّ
أَنْ جَسَدٍ كَارِ بِرِاسِ كُنَّ كَارِ بِرِاسِ كُنَّ
نَصِيحَةٍ كَارِ بِرِاسِ كُنَّ كَارِ بِرِاسِ كُنَّ
كَيْسٍ كَبَّرَ فِي رَأْيِهِ كَبَّرَ فِي رَأْيِهِ
كَبَّرَ فِي رَأْيِهِ كَبَّرَ فِي رَأْيِهِ
كَبَّرَ فِي رَأْيِهِ كَبَّرَ فِي رَأْيِهِ

١٤ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ إِذَا رَأَيْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ
جَلَّ يُعْطِي الْعَبْدَ مِنَ الدُّنْيَا
عَلَى مَعَاصِيهِ مَا يُحِبُّ فَإِنَّمَا
هُوَ اسْتِدْرَاجٌ ثُمَّ تَلَا رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا
عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى
إِذَا فَرَّخُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ
بَغْتَةً فَاذْهَبُوا مَبْلِسُونَ ○

(رواه احمد كذا في المشكاة) اَرَانِي لَئِي تَدْعُمْنِي اَنْ كُوْدَفَتْ بِكَ رِيَا،
پھر تو وہ حیرت میں رہ گئے۔

১৭) হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন তুমি দেখ যে, আল্লাহ তায়ালা কোন গুনাহগারকে তাহার গুনাহ সত্ত্বেও দুনিয়ার প্রাচুর্য দান করিতেছেন, তখন ইহা আল্লাহ তায়ালা পক্ষ হইতে টিল (অবকাশ বা সুযোগ) দেওয়া হইতেছে। অতঃপর হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত শরীফ **مَبْلِسُونَ فَلَمَّا نَسُوا** হইতে পর্যন্ত তেলাওয়াত করিলেন। যাহার অর্থ এই যে, অতঃপর যখন ঐ সমস্ত লোক ঐ বিষয়গুলিকে ভুলিয়া রহিল, যাহা সম্পর্কে তাহাদিগকে নসীহত করা হইত, ফলে আমি তাহাদের জন্য সকল প্রকার আরাম-আয়েশের দরজা খুলিয়া দিলাম। অবশেষে, যখন তাহারা ঐ সমস্ত জিনিসের উপর যাহা তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল অহংকার করিতে লাগিল, তখন আমি তাহাদিগকে অকস্মাৎ পাকড়াও করিলাম। তখন তাহারা হতভম্ব হইয়া গেল। (মিশকাত : আহমদ)

ফায়দা : এই আয়াত সূরা আনআমের পঞ্চম রুকুতে রহিয়াছে। ইহার উপরের আয়াতসমূহে আল্লাহ তায়ালা পূর্বকার উম্মতের সহিত যেই ব্যবহার করিয়াছেন সংক্ষেপে উহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। উহার সংক্ষিপ্ত তরজমা এই—আমি অন্যান্য উম্মতের প্রতিও যাহারা আপনার পূর্ব (যুগে) ছিল, পয়গাম্বর পাঠাইয়াছিলাম (কিন্তু তাহারা ঐ সকল পয়গাম্বরদিগকে মানে নাই)। অতএব আমি তাহাদিগকে অভাব-অনটন ও রোগ-ব্যাদি (ইত্যাদি বিভিন্ন বিপদে লিপ্ত করিয়াছি এবং এই সমস্ত কঠিন অবস্থা দ্বারা) এইজন্য পাকড়াও করিয়াছি, যাহাতে তাহারা অনুনয় বিনয় করে (কেনা, বিপদে-আপদে আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করা হয়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তাহারা তাহাদের কর্ম হইতে ফিরিয়া আসে নাই)। সুতরাং তাহাদের উপর যখন আমার পক্ষ হইতে আজাব আসিয়াছিল, তখন তাহারা কেন বিনীত হইল না? (যাহাতে তাহাদের আহাজারী, বিনয় ও তওবার কারণে তাহাদের অন্যায় ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইত।) বরং তাহাদের অন্তরগুলি কঠিনই রহিল। আর শয়তান তাহাদের বদ আমলসমূহকে (যাহাতে তাহারা লিপ্ত ছিল এবং তাহাদের কর্মগুলিকে) তাহাদের দৃষ্টিতে সুসজ্জিত করিয়া দেখাইতেছিল। অতঃপর যখন তাহারা এইসব বিষয়কে ভুলিয়া রহিল, যাহা সম্পর্কে তাহাদিগকে (পয়গাম্বরগণের পক্ষ হইতে) উপদেশ দেওয়া হইত, তখন আমি তাহাদের

জন্য (আরাম-আয়েশ ও নাজ-নেয়ামত) প্রত্যেক জিনিসের দরজ্ঞা খুলিয়া দিলাম। (ফলে তাহারা ভোগ-বিলাসে খুব মত্ত হইয়া গেল) এমনকি যখন তাহারা এই সমস্ত বিষয়ের সহিত যাহা তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল, খুব বেশী অহংকার ও দস্ত করিতে লাগিল, তখন আমি তাহাদিগকে অকস্মাৎ পাকড়াও করিলাম (এবং এমন তাৎক্ষণিক আঘাত হঠাৎ করিয়া তাহাদের উপর চাপাইয়া দিলাম যে, এই ব্যাপারে তাহাদের কোন কল্পনাও ছিল না। তাহারা হতভম্ব হইয়া রহিয়া গেল। (যে, ইহা কি হইয়া গেল, এই মুসীবত কোথা হইতে আসিল। অতঃপর (আমার তাৎক্ষণিক আঘাতের কারণে) জালেমদের শিকড় সম্পূর্ণরূপে কাটিয়া গেল। আর আল্লাহ তায়ালার শোকর, যিনি সারা জাহানের প্রতিপালক (যে, এইরূপ জালেমদের শিকড় কাটিয়া গিয়াছে)।

হযূর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত আয়াতের দ্বারা আল্লাহ তায়ালার চিরচরিত নিয়মের দিকে ইশারা করিয়া সতর্ক করিয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালার নাফরমানী এবং গুনাহ সত্ত্বেও আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের উপকরণ লাভ হওয়া অনেক সময় আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে টল দেওয়ার কারণে হয়, যাহাকে 'এস্তেদরাজ' বলা হয়। কুরআন পাকের উক্ত আয়াতে এই এস্তেদরাজের কথাই বলা হইয়াছে। ইহা ছাড়াও বিভিন্ন আয়াতে এই বিষয়ে সতর্ক করা হইয়াছে। ইহা অত্যন্ত আশংকার বিষয়। কারণ, ইহাতে অধিকাংশ সময় মানুষের উপর এমনভাবে হঠাৎ আঘাত আসিয়া পড়ে যে, সে হতভম্ব হইয়া যায়; উক্ত বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়ার কোন পথ খুঁজিয়া পায় না। অতএব, এই ব্যাপারে অনেক বেশী ভয় করা উচিত।

হযরত উবাদা (রাযিঃ) হযূর সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন যে, যখন আল্লাহ তায়ালার কোন জাতিকে উন্নত করিতে চাহেন, তখন তাহাদের মধ্যে মধ্যপন্থা ও পবিত্রতা সৃষ্টি করেন। আর যখন কোন জাতিকে ধ্বংস করিতে চাহেন, তখন তাহাদের মধ্যে খিয়ানতের দরজ্ঞা খুলিয়া যায়। অতঃপর যখন তাহারা নিজেদের এইরূপ কর্মের উপর খুব আনন্দিত হইতে শুরু করে, তখন হঠাৎ তাহাদের উপর আঘাত আসিয়া পড়ে। অতঃপর উক্ত আয়াত তেওয়াত করিলেন।

হযরত হাসান (রাযিঃ) বলেন, যাহাকে সচ্ছলতা দেওয়া হয়, আর সে বুঝে না যে, এই সচ্ছলতা আমার ধ্বংসের পূর্বলক্ষণ—সে ব্যক্তি বুদ্ধিমান নয়। আর যাহার উপর অভাব আসে, আর সে বুঝে না যে, ইহা আমার জন্য আল্লাহ তায়ালার দিকে রুজু হইবার একটি সুযোগ—সেও বুদ্ধিমান

নয়। (দুররে মানসুর)

এক হাদীসে আছে, জ্বুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেকে এই দোয়া করিয়াছেন, হে আল্লাহ! যে আমার উপর ঈমান আনিয়াছে এবং যে সমস্ত হুকুম-আহকাম আমি লইয়া আসিয়াছি, উহাকে সত্য জানিয়াছে, আপনি তাহাকে সম্পদ কম দান করুন, সন্তানাদি কম দান করুন এবং আপনার সাক্ষাতের আগ্রহ তাহার মধ্যে বাড়াইয়া দিন। আর যে আমার উপর ঈমান আনে না এবং এই সমস্ত হুকুম-আহকামকে সত্য বলিয়া মানে না, তাহার সম্পদ বৃদ্ধি করিয়া দিন, সন্তানাদিও বেশী করিয়া দিন এবং তাহার বয়সও বাড়াইয়া দিন। (কানয)

মোটকথা, অধিক গুনাহের সহিত নেয়ামতসমূহ হাশিল হওয়া, অধিক আশংকার জিনিস। এমতাবস্থায় অনেক বেশী তওবা-এস্তেগফার ও আল্লাহ তায়ালার দিকে রুজু হওয়া দরকার। এই কারণেই হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐ এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে, যাহা একটু আগেই পূর্বের হাদীসের শেষাংশে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বদকারের নিকট কোন নেয়ামত দেখিয়া স্তব্ধ করিও না। কেননা, তোমার জানা নাই যে, সে মৃত্যুর পর কোন মুসীবতে গ্রেফতার হইবে।

۱۸) عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَيْتُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِنَا بَعْدَ الْمَوْتِ الْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ (رواه الترمذی وابن ماجہ کذا فی مشکوٰۃ وزاد

السيوطي في الجامع الصغير احمد والحاكم ورقمه بالصحة)

(১৮) ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বুদ্ধিমান ব্যক্তি সে, যে নিজের নফসকে (আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির কাজে) অনুগত বানায় এবং মৃত্যুর পর কাজে আসে, এমন আমল করে। আর অক্ষম (বোকা) হইল ঐ ব্যক্তি, যে নফসের খাহেশের অনুসরণ করে আর আল্লাহ তায়ালার নিকট হইতে আশা করে।

(মিশকাত : তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

ফায়দা : অর্থাৎ, আমাদের অবস্থা তো হইল, নফসের খাহেশাতের মুকাবেলায় হালাল-হারামেরও পরওয়া করি না ; কিন্তু আল্লাহ তায়ালার নিকট বড় বড় আশা করিয়া রাখি যে, তিনি দয়ালু মেহেরবান। আর এই সমস্ত আশার কারণে গুনাহেরও পরওয়া করি না।

অন্য এক হাদীসে আছে, বুদ্ধিমান সে, যে মৃত্যুর পরের জন্য আমল করে এবং উলঙ্গ সে, যে দীন হইতে শূন্য। হে আল্লাহ! যিন্দেগী কেবল আখেরাতেরই যিন্দেগী। (জামে সগীর) অর্থাৎ, উহাই চিরস্থায়ী যিন্দেগী। যে সেখানে খালি হাতে গেল, সে জীবনও হারাইল। এখানে বুদ্ধিয়া লওয়া চাই যে, আল্লাহ তায়ালার রহমত ও মাগফেরাতের আশাবাদী হওয়া, উহার আকাঙ্ক্ষা করা এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট চাওয়া এক জিনিস, আর আল্লাহ তায়ালার রহমত ও মাগফেরাতের আশায় অহংকার করা এবং এই ধারণা করা যে, আমি যাহা ইচ্ছা করিতে থাকিব, আমার ক্ষমা তো হইয়াই যাইবে—ইহা ভিন্ন জিনিস।

ইমাম রাযী (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালার এই এরশাদ (লুকমান : ৩৩) **فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ الْغُرُورُ** এবং এই এরশাদ (হাদীদ : ১৪) **وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ** এই উভয় আয়াত অহংকারের নিন্দার জন্য অনেক যথেষ্ট। (এহইয়া)

প্রথম আয়াত সূরা লুকমানের শেষে রহিয়াছে, যাহার তরজমা এই—তোমাদিগকে যেন দুনিয়ার যিন্দেগী ধোকার মধ্যে ফেলিয়া না দেয় (যে, তোমরা ইহাতে মত্ত হইয়া আখেরাতকে ভুলিয়া যাও) এবং তোমাদিগকে ধোকাবাজ (শয়তান) যেন ধোকার মধ্যে ফেলিয়া না দেয়। এই আয়াতের তফসীরে হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে ধোকার মধ্যে ফেলিয়া দেওয়ার অর্থ এই যে, তুমি গুনাহও করিতে থাক এবং ক্ষমার আশাও করিতে থাক।

দ্বিতীয় আয়াত সূরা হাদীদে দ্বিতীয় রুকুতে আছে। যাহার পূর্ব হইতে কিয়ামতের দিনের একটি দৃশ্যের আলোচনা চলিয়া আসিতেছে যে, ঐ দিন মুসলমানদের সম্মুখে একটি নূর দৌড়াইতে থাকিবে। যাহা তাহাদের আগে আগে চলিতে থাকিবে। (ইহা পুলসেরাত পার হওয়ার জন্য হইবে) অতঃপর এরশাদ হইয়াছে :

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ اسْ وَاوْدُ مَنَاقِبُ مُحَمَّدٍ

সত্যতা সম্পর্কে) তোমরা সন্দেহ পোষণ করিতে। আর তোমাদিগকে তোমাদের (অহেতুক) আশা-আকাঙ্ক্ষা ধোকার মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়াছিল। অবশেষে আল্লাহর হুকুম (মৃত্যু) আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং তোমাদিগকে ধোকাবাজ (শয়তান) আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে ধোকার মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়াছিল। (হাদীদ : ১৩-১৪)

আবু সুফিয়ান (রাযিঃ) হইতে এই আয়াতের তফসীরে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, **فَتَنُّمُ أَنْفُسَكُمْ** অর্থাৎ, তোমরা গুনাহের দ্বারা নিজদেরকে গুমরাহির মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়াছিলে এবং তোমাদিগকে তোমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ধোকার মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়াছিল। কেননা, তোমরা ইহা বলিতে যে, আমরাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে।

(দূররে মানসূর)

‘মাজাহের’ কিতাবের গ্রন্থকার লিখেন, শায়েখ ইবনে আব্বাদ শায়েলী (রহঃ) ‘শরহে হেকাম’ কিতাবে বলেন, আল্লাহর যথার্থ পরিচয়প্রাপ্ত উলামাগণ বলিয়াছেন, মিথ্যা আশা হইল, আশাবাদী ব্যক্তি তাহার আশার কারণে অহংকার করে, আমল হইতে বিরত থাকে আর তাহার আশা তাহাকে গুনাহের উপর দুঃসাহসী করিয়া তোলে। প্রকৃতপক্ষে ইহা আশা নহে; বরং ইহা দুরাশা ও শয়তানের ধোকামাত্র।

হযরত মারুফ কারখী (রহঃ) বলেন, আমল ছাড়’ বেহেশত তলব করা গুনাহসমূহের মধ্য হইতে একটি গুনাহ। কোনরূপ সম্পর্ক ও ওসীলা ছাড়া সুপারিশের আশা রাখা এক প্রকার ধোকা। আর যাহার আনুগত্য করে না তাহার নিকট হইতে রহমতের আশা রাখা বোকামী ও মুর্থতা।

হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, ক্ষমা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা এক কওমকে আমল হইতে বিরত রাখিয়াছে। অবশেষে তাহারা দুনিয়া হইতে এমন অবস্থায় বিদায় লইয়াছে যে, তাহাদের নিকট কোন নেকী নাই। তাহাদের মধ্য হইতে একজন বলে যে, আমি আমার প্রতিপালকের প্রতি ভাল ধারণা রাখি যে, তিনি ক্ষমাকারী; তাহার এই কথা মিথ্যা। কেননা, যদি তাহার পরওয়ারদিগারের প্রতি ধারণা ভাল হইত, তবে সে ভাল আমল করিত।

হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, হে আল্লাহর বান্দারা! এই সমস্ত মিথ্যা আকাঙ্ক্ষা হইতে দূরে থাক। কেননা, ইহা বোকা লোকদের ময়দান, যেখানে তাহারা পড়িয়া রহিয়াছে। আল্লাহর কসম! আল্লাহ তায়ালার কোন বান্দাকে শুধু তাহার আকাঙ্ক্ষার কারণে দুনিয়া ও আখেরাতের কোন মঙ্গল দান করেন নাই। (মাজাহেরে হক)

ইমাম গাযযালী (রহঃ) বলেন, যাবতীয় সৌভাগ্যের চাবিকাঠি হইল, সদা সতর্ক থাকা এবং বুদ্ধিমত্তার সহিত কাজ করা। আর যাবতীয় দুর্ভাগ্যের উৎস হইল, অহংকার করা ও অসতর্ক থাকা। ঈমান ও মারফাত হইতে বড় আল্লাহ তায়ালায় কোন অনুগ্রহ নাই। আর এই নেয়ামত হাসিল করিবার জন্য আল্লাহ তায়ালায় পক্ষ হইতে অন্তর্দৃষ্টির নূর দ্বারা দিলকে উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া ছাড়া আর কোন পথ নাই। এমনিভাবে কুফর ও গুনাহ হইতে বড় আল্লাহ তায়ালায় কোন আযাব নাই। এই গুনাহ ও কুফরের একমাত্র উৎস—মূর্খতার অন্ধকারে অন্তর্দৃষ্টি অন্ধ হইয়া যাওয়া। সুতরাং বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী লোকদের অন্তর এইরূপ, যেমন কোন তাকের মধ্যে অত্যন্ত আলোকোজ্জ্বল প্রদীপ (বিজলী বাতি) রাখা থাকে, যাহার উদাহরণ কুরআন পাকের এই আয়াতে রহিয়াছে **كَمْ شُكِرُوا** (নূর : ৩৫) আর অহংকারের অন্ধকারে নিপতিত লোকদের অন্তর এইরূপ, যেমন অনেক অন্ধকারের মধ্যে কোন ব্যক্তি, যে কিছুই দেখিতে পায় না **كَظَلَمَاتٍ فِي بَحْرٍ لَّجِّيٍّ يَغْشَاهُ** (নূর : ৪০)

আর যখন ইহা জানা হইয়া গেল যে, অহংকারই সকল ধ্বংসের একমাত্র উৎস, কাজেই এই ব্যাপারে কিছু বিস্তারিত জানা আবশ্যিক। যাহাতে উহা হইতে গুরুত্বসহকারে বাঁচা যায়। অহংকারের নিন্দা কুরআন ও হাদীসে অধিক পরিমাণে বর্ণিত হইয়াছে। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ রহিয়াছে যে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি সে, যে নিজের নফসকে আয়ত্বে রাখে এবং মৃত্যুর পরের জন্য আমল করিতে থাকে। আর মূর্খ ঐ ব্যক্তি, যে নিজের নফসের খাহেশের অনুসরণ করে এবং আল্লাহ তায়ালায় নিকট আশা করে। বিভিন্ন হাদীসে মূর্খতা সম্পর্কে যত নিন্দা ও সতর্কবাণী বর্ণিত হইয়াছে, উহা অহংকারের ব্যাপারেও প্রযোজ্য। কেননা, অহংকার মূর্খতা হইতে পয়দা হয় ; বরং মূর্খতারই একটি অংশ। যদিও প্রত্যেক মূর্খতা অহংকার নয় ; কিন্তু প্রত্যেক অহংকার অবশ্যই মূর্খতা। আর উহাদের মধ্যে কাফের এবং বদকার লোকদের মূর্খতা ও অহংকার সবচেয়ে বড়। কারণ, তাহারা বলিয়া থাকে, দুনিয়া নগদ ও বর্তমান আর আখেরাত বাকী ও পরে আসিবে ; বাকীর আশায় নগদকে ছাড়িয়া দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এই ধারণা চরম পর্যায়ের বোকামি ও মূর্খতা। এই নিয়ম ঐখানেই চলে, যেখানে নগদ ও বাকী এক বরাবর। কিন্তু যেখানে কোন জিনিস নগদ এক টাকায় বিক্রয় হয় এবং বাকীতে এক শ' টাকায় বিক্রয় হয়, সেখানে কোন বোকা লোকও এই কথা বলিবে না যে, নগদকে বাকীর জন্য ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নয়। অথচ

আখেরাতের মুকাবেলায় দুনিয়ার নগদ ভোগ-বিলাসের কোন তুলনাই হয় না। দুনিয়ার যিন্দেগী কোন ব্যক্তির বেশীর চেয়ে বেশী এক-দেড়শত বৎসর হইতে পারে। আখেরাতের অনন্ত কালের জীবনের সহিত ইহার কি তুলনা হইতে পারে! এমনিভাবে চিকিৎসক যদি কোন অসুস্থ ব্যক্তিকে কোন ফল খাইতে নিষেধ করে এবং ক্ষতিকর বলে, তবে অসুস্থ ব্যক্তি কখনও ইহা বলিতে পারে না যে, এই ফল খাওয়ার স্বাদ নগদ এবং সুস্থতা বাকী। এইজন্য নগদকে বাকীর জন্য ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নয়। এমনিভাবে কোন মূর্খ লোক যদি বলে, দুনিয়ার ক্ষতি ও কষ্ট নিশ্চিত এবং আখেরাতের ব্যাপারে সন্দেহ রহিয়াছে। সন্দেহযুক্ত জিনিসের জন্য নিশ্চিত জিনিসকে ছাড়িয়া দেওয়া যায় না। ইহাও মূর্খতার কথা। মানুষ ব্যবসার মধ্যে নিশ্চিত কষ্ট সহ্য করে শুধুমাত্র ঐ লাভের আশায়, যাহাতে সন্দেহ রহিয়াছে যে, ব্যবসায় লাভ হইবে, কি হইবে না। অসুস্থ ব্যক্তি অত্যন্ত তিক্ত ঔষধ পান করে, শিক্ষা লাগায়, জোক লাগায়, কাটে, চিরে, যাহার কষ্ট নিশ্চিত। এই সবকিছু সুস্থতার আশায় করিয়া থাকে, যাহা নিশ্চিত নয়। অনুরূপভাবে এই ধারণাও ধোকা যে, আখেরাতকে আমরা দেখি নাই, অভিজ্ঞতা নাই, জানা নাই ইহার বাস্তবতা কি; এই ধারণা চরম মূর্খতাও। অস্ত্র ব্যক্তির জন্য যদি কোন বিষয়ে তাহার জ্ঞান না থাকে, তবে ঐ বিষয়ে অভিজ্ঞ জ্ঞানীলোকদের কথাই নির্ভরযোগ্য হয়। কোন অসুস্থ ব্যক্তি কখনও ইহা বলিতে পারে না যে, অমুক ঔষধের মধ্যে এই গুণ আছে বলিয়া আমার জানা নাই; বরং সে সবসময় চিকিৎসার ব্যাপারে অভিজ্ঞ চিকিৎসক ও ডাক্তারের কথার উপর ভরসা করে। কখনও কোন ডাক্তারকে এই কথা জিজ্ঞাসা করে না যে, এই ঔষধের গুণ সম্পর্কে আমাকে প্রমাণ দ্বারা বুঝাইয়া দিন। যদি কেহ এইরূপ বলে, তবে তাহাকে বোকা মনে করা হইবে। অনুরূপভাবে আখেরাত সম্পর্কে আশ্বিয়ায়ে কেরাম, আওলিয়াগণ, জ্ঞানী-গুণী উলামায়ে কেরামদের কথা যাহার উপর সারা দুনিয়া সর্বযুগে আস্থা স্থাপন করিয়াছে—নির্ভরযোগ্য হইবে। কিছুসংখ্যক মূর্খ লোকদের এই কথা বলিয়া দেওয়ার কারণে যে, আমাদের জানা নাই অথবা আমাদের বিশ্বাস হয় না—কিছু যায় আসে না। আখেরাত সম্পর্কে এই ধরনের সন্দেহ কাফেরদের মধ্যে পয়দা হইয়া থাকে। আর মুসলমানগণ মৌখিকভাবে মুসলমান হওয়ার স্বীকৃতি দেওয়ার কারণে মুখে তো এইরূপ কথা বলে না, কিন্তু আল্লাহ তায়ালায় হুকুম-আহকামকে নষ্ট করিয়া, তাহার নাফরমানীর মধ্যে লিপ্ত হইয়া, খাহেশাত ও দুনিয়ার মোহে মগ্ন হইয়া কাজে-কর্মে এবং চালচলনে যেন তাহারাও ইহাই বলে। নতুবা

কোন কারণ নাই যে, তাহারা দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দিবে। এইসব লোক মৌখিকভাবে আরেকটি ধোকায় পড়িয়া রহিয়াছে। তাহারা বলে যে, আল্লাহ তায়ালা দয়ালু, মেহেরবান, ক্ষমাশীল। আমরা তাহার ক্ষমার আশা রাখি, তাহার ক্ষমার উপর আমাদের ভরসা রহিয়াছে। তাহার ক্ষমার আশা রাখা জরুরী এবং প্রশংসনীয় এবং পছন্দনীয়। তাহার রহমত অত্যন্ত প্রশস্ত। তাহার ক্ষমার সমুদ্রের মুকাবেলায় আমাদের গুনাহ কিছুই নয়। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, যাহা হাদীসে কুদসীতে আসিয়াছে যে, আমি বান্দার সহিত তাহার ধারণা অনুযায়ী আচরণ করিয়া থাকি। তাহার উচিত—সে যেন আমার সহিত ভাল ধারণা রাখে। এই এরশাদ নিশ্চিতভাবে সঠিক এবং ইহাই আল্লাহ তায়ালা পবিত্র বাণী। কিন্তু উহার সাথে সাথে এই কথাও বুঝিয়া লইতে হইবে যে, শয়তান মানুষকে কোন সঠিক কথার ভুল অর্থ দ্বারা গোমরাহ করিতে পারে। যদি এইরূপ না হইত, তবে শয়তানের ধোকা দেওয়া কঠিন হইত। এই বিষয়টিকেই হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার এই এরশাদে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি, যে নিজের নফসকে অনুগত করে এবং মৃত্যুর পরের জন্য আমল করে, আর আহমক ঐ ব্যক্তি, যে নফসের খাহশের অনুসরণ করে এবং আল্লাহ তায়ালা নিকট হইতে অনেক কিছু পাওয়ার আশা করে। ইহাই ঐ সমস্ত আশা, যেগুলিকে শয়তান আল্লাহ তায়ালা সহিত ভাল আশার আবরণ পরাইয়াছে। আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি আশা রাখিবার স্বয়ং ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন, যেমন এরশাদ করিয়াছেন—

تَحْقِيقَتِمْ فِي جَوْگِ اِيْمَانِ لَاسْتُمْ فِي

اور جن لوگوں نے اللہ کے واسطے اپنا وطن

چھوڑ دیا ہے اور جن لوگوں نے اللہ کے

راستہ میں جہاد کیا ہے (جس میں دین کے

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ

هَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ

اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ

اللّٰهِ (بقرة- ۲۱۷)

یعنی ہر کوشش داخل ہے) یہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ شانہ کی رحمت کے لیے ایمان

অর্থাৎ, প্রকৃতপক্ষে যে সমস্ত লোক দীর্ঘমান আনিয়াছে, আর যাহারা আল্লাহর জন্য নিজদের মাতৃভূমি ত্যাগ করিয়াছে এবং যাহারা আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করিয়াছে (যাহার মধ্যে দ্বীনের জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে), তাহারাই ঐ সমস্ত লোক, যাহারা আল্লাহ তায়ালা রহমতের আশা রাখে। (বাকারা : ২১৮) কুরআন পাকে বিভিন্ন জায়গায় জাহ্নাত এবং উহার নেয়ামতসমূহকে আমলের বদলা বলা হইয়াছে।

এমতাবস্থায় চিন্তা করার বিষয় হইল, যদি কোন ব্যক্তি কাহাকেও বাসন-পত্র বানাইবার জন্য শ্রমিক হিসাবে রাখে এবং অনেক বড় পারিশ্রমিক তাহার জন্য ধার্য করিয়া দেয় যাহার কোন সীমা নাই এবং মালিক অত্যন্ত দয়ালু, পারিশ্রমিক দেওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত উদার এবং নির্ধারিত পারিশ্রমিকের চাইতে অনেক বেশী পুরস্কার দেয়, যে সমস্ত বাসন-পত্র খারাপ তৈয়ার হইয়া যায় উহার জন্যও পারিশ্রমিক দেয়, যাহার মধ্যে মামুলী ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকিয়া যায়, উহার ব্যাপারেও ক্ষমাসুলভ আচরণ করে—এমতাবস্থায় শ্রমিক লোকটি বাসন-পত্র বানানোর পরিবর্তে যেই সমস্ত যত্নপাতি দ্বারা বাসন-পত্র বানানো হয় সেইগুলিকেও ভাঙ্গিয়া ফেলে আর বলে যে, মালিক বড় দয়ালু, পারিশ্রমিক অনেক বেশী দেন। এইজন্য এই সবকিছুকে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া অনেক বেশী পারিশ্রমিক পাওয়ার অপেক্ষায় বসিয়া থাকে। এইরূপ ব্যক্তিকে কোন মূর্খ লোকও কি বুদ্ধিমান বলিবে? আর এই বোকামী আশা এবং আকাঙ্ক্ষার মধ্যে পার্থক্য না বুঝার কারণে হইয়া থাকে।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ)কে কেহ জিজ্ঞাসা করিল, কিছু লোক নেক কাজ তো করে না বরং তাহারা বলে যে, আমরা আল্লাহ তায়ালায় প্রতি ভাল আশা রাখি। তিনি বলিতে লাগিলেন, (আশা তোমাদের হইতে) অনেক দূরে, অনেক দূরে, এইগুলি তাহাদের আকাঙ্ক্ষা, যাহার প্রতি তাহারা আকৃষ্ট হইতেছে। যেই ব্যক্তি কোন জিনিসের আশা রাখে, সে উহাকে তালাশ করে। আর যে ব্যক্তি কোন জিনিসকে (যেমন আল্লাহর আযাবকে) ভয় করে, সে উহা হইতে পলায়ন করে। (উহা হইতে বাঁচিবার চেষ্টা করে।)

মুসলিম ইবনে ইয়াসার (রহঃ) একদিন এত দীর্ঘ সেজদা করিলেন যে, (তাহার দাঁতে রক্ত আসিয়া গেল এবং) দুইটি দাঁত পড়িয়া গেল। এক ব্যক্তি বলিতে লাগিল (যে, আমার দ্বারা আমল করা তো সম্ভব হয় না, কিন্তু) আল্লাহ তায়ালায় নিকট ক্ষমা পাওয়ার আশা অবশ্যই রাখি। মুসলিম (রহঃ) বলিতে লাগিলেন, অনেক দূর, অনেক দূর। যে ব্যক্তি কোন জিনিসের আশা করে, সে উহাকে তালাশ করে। আর যে ব্যক্তি কোন জিনিসকে ভয় করে, উহা হইতে পলায়ন করে। সুতরাং কোন ব্যক্তি যখন সন্তানের আশা করে অথচ বিবাহ করে না, কিংবা বিবাহ করে স্ত্রীর কাছে যায় না আর সন্তান হওয়ার আশা করিতে থাকে, তাহাকে বোকা বলা হইবে। এমনিভাবে যেই ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালায় রহমতের আশা করে কিন্তু ঈমান আনে না, অথবা ঈমান আনে কিন্তু নেক আমল করে না এবং

الْغُفُورُ الرَّحِيمُ ۝ وَاسْتَبِقُوا
 إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ
 قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ
 ثُمَّ لَا تُنصِرُونَ ۝ وَاتَّبِعُوا
 أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ
 رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ
 الْعَذَابُ بَغْثَةً وَأَنْتُمْ
 لَا تَشْعُرُونَ ۝ أَنْ تَقُولَ
 نَفْسٌ يَحْسَرُنِي عَلَى مَا
 كُنْتُ لِمَنِ السَّاخِرِينَ ۝
 أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي
 لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ۝ أَوْ
 تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ
 لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ
 الْمُحْسِنِينَ ۝ (زمر- ১৮)
 (মیں) پھر جانا ہو جائے تو میں نیک بندوں میں سے ہو جاؤں :
 اللہ تعالیٰ شانہ تمام گناہوں کو معاف
 کر دے گا۔ واقعی وہ بڑا بخشنے والا ہے
 بڑی رحمت کرنے والا ہے۔ تم اپنے رب
 کی طرف رجوع کرو اور اس کی فرمانبرداری
 کرو قبل اس کے کہ تم پر عذاب پہنچ
 سکے۔ پھر اس وقت تمہاری کوئی مدد
 نہ کی جائے گی۔ اور تم اپنے رب کے
 پاس سے آئے ہوئے اچھے اچھے حکموں
 پر چلو قبل اس کے کہ تم پر ایسا عذاب
 آئے اور تم کو خیال بھی نہ ہو کہ اور
 تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا
 حکم اس لیے دیا جاتا ہے کہ کل کو قیامت
 کے (دن) کبھی کوئی شخص کہنے لگے افسوس
 میری اس کوتاہی پر جو میں نے خدا تعالیٰ
 کی جناب میں کی (یعنی اس کی اطاعت
 میں مجھ سے کوتاہی ہوئی) اور میں خدا تعالیٰ
 کے احکام پر ہنستا ہی رہا۔ یا کوئی یوں کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو ہدایت کرتا تو
 میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا۔ یا کوئی عذاب کو دیکھ کر یوں کہنے لگے کہ کاش میرا (دنیا
 میں) پھر جانا ہو جائے تو میں نیک بندوں میں سے ہو جاؤں :

অর্থাৎ, আপনি বলিয়া দিন, হে আমার বান্দারা! যাহারা নিজেদের
 উপর (কুফর, শিরক ও গুনাহের) জুলুম করিয়াছ, তোমরা আল্লাহ
 তায়ালা রহমত হইতে নিরাশ হইও না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা
 সমস্ত গুনাহ মাফ করিয়া দিবেন। বাস্তবিকই তিনি বড় ক্ষমাশীল ও
 দয়ালবান। তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি রুজু কর, তাহার
 আনুগত্য কর, তোমাদের উপর আজ্ঞাব অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে; তখন
 তোমাদের কোন সাহায্য করা হইবে না। তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের

নিকট হইতে আগত ভাল ভাল হুকুমসমূহের উপর চল, ইহার পূর্বে যে, তোমাদের উপর হঠাৎ আজ্রাব আসিয়া পড়ে, আর তোমরা ধারণাও করিতে পার না। (এবং তোমাদিগকে আল্লাহ তায়ালা দিকে রুজু করিবার হুকুম এইজন্য দেওয়া হয়, যাহাতে কাল কিয়ামতের দিন) আবার কোন ব্যক্তি বলিতে আরম্ভ করিবে, আফসোস! আমার ঐ ভুলের উপর, যাহা আমি আল্লাহ তায়ালা দরবারে করিয়াছি (অর্থাৎ তাহাকে মানার ব্যাপারে আমার ভুল-ত্রুটি হইয়াছে)। আমি (আল্লাহ তায়ালা হুকুমের উপর) ঠা-বিদ্রূপই করিতে থাকিয়াছি। অথবা কেহ এইরূপ বলিতে আরম্ভ করিবে যে, আল্লাহ তায়ালা যদি আমাকে হেদায়েত করিতেন, তবে আমিও পরহেজগার লোকদের মধ্যে হইতাম। অথবা কেহ আজ্রাব দেখিয়া এইরূপ বলিতে আরম্ভ করিবে, হায় আফসোস! (দুনিয়াতে) যদি আবার যাইতে পারিতাম, তবে আমি নেক বান্দাদের মধ্যে শামিল হইয়া যাইতাম।

(যুমার : ৫৪-৫৮)

উপরোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ তায়ালা সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করার ওয়াদার সঙ্গে তাহার দিকে রুজু করিবার হুকুমও করিয়াছেন। অন্য এক আয়াতে এরশাদ করিয়াছেন : **وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ** অর্থাৎ, আমি বড় ক্ষমাশীল ঐ ব্যক্তির জন্য, যে তওবা করে, ঈমান আনে এবং ভাল আমল করে। অতঃপর উহারই উপর কায়েম থাকে।

এই আয়াতে ক্ষমার বিষয়কে এই সমস্ত কাজের সহিত যুক্ত করিয়াছেন। অতএব, যে ব্যক্তি তওবার সহিত ক্ষমা পাইবার আশা করে, সেই তো প্রকৃত আশাবাদী। আর যে ব্যক্তি বারবার গুনাহ করিতে থাকে আর ক্ষমার আশা করিয়া রাখে, সে বোকা, ধোকাই পড়িয়া রহিয়াছে।

পূর্বেকার লোকগণ এবাদতের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। যাবতীয় গুনাহ হইতে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বাঁচিয়া থাকিতেন। অতি মাত্রায় তাকওয়া অবলম্বন করিতেন। সন্দেহযুক্ত জিনিস হইতেও দূরে থাকিতেন। রাত্রদিন এবাদতের মধ্যে মশগুল থাকিয়া সবসময় আল্লাহর ভয়ে কাঁদিতেন। আর এই জমানেয় প্রত্যেক ব্যক্তি আনন্দিত, আল্লাহর আযাব হইতে সবসময় নিশ্চিন্ত। তাহাদের কোন সময় আল্লাহর আযাবের ভয় নাই। দিনরাত্র খাহেশ ও দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের মধ্যে মত্ত, সবসময় দুনিয়া কামাই করার ফিকির ; আল্লাহ তায়ালা প্রতি সামান্যতম মনোযোগও নাই। অথচ ধারণা এই যে, আল্লাহ তায়ালা মেহেরবানীর উপর আমাদের ভরসা আছে। তাহার ক্ষমার আশা আছে। তিনি মাফ

করিবেন—এই একীণ আছে। যেন আশ্বিনায়ে কেবাম, সাহাবা ও আওলিয়াগণ যাহারা এত কষ্ট-ক্লেশ বরদাশত করিতে থাকিলেন, তাহাদের কাহারও আল্লাহর রহমতের আশাই ছিল না।

①৯ عَنْ أَبِي عَمْرٍو قَالَ أَتَيْتُ
التَّيْبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَاشِرَ عَشْرَةٍ فَقَامَ سَرُجُلٌ
مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ
مَنْ أَكَيْسُ النَّاسِ وَأَخْزَمُ
النَّاسِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ ذِكْرًا
لِلْمَوْتِ وَأَكْثَرُهُمْ اسْتِعْدَادًا
لِلْمَوْتِ أُولَئِكَ أَكْيَاسُ
ذَهَبُوا بِشَرِّ الدُّنْيَا وَ
كَرَاهَةِ الْآخِرَةِ - (رواه ابن
أبي الدنيا والطبرانی في الصغير

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ہم دمشق
آمدی جن میں ایک میں بھی تھا حضورؐ
کی خدمت میں حاضر ہوئے ایک انصاری
نے حضورؐ سے سوال کیا کہ سب سے زیادہ
سمجھ دار اور سب سے زیادہ محتاط آدمی
کون ہے؟ حضورؐ نے ارشاد فرمایا۔ جو
لوگ موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے
والے ہوں اور موت کے لیے سب سے
زیادہ تیاری کرنے والے ہوں۔ یہی لوگ
ہیں جو دنیا کی شرافت اور آخرت کا انحراف
لے اڑے۔

باسناد حسن و رواہ ابن ماجہ مختصراً باسناد جيد - كذا في
الترغيب وذكر له الزبيدي طرقاً عديدة)

①৯ হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমরা দশজন লোক ;
তন্মধ্যে আমিও একজন ছিলাম— হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলাম। একজন আনসারী হযূর
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, সবচেয়ে
বেশী বুদ্ধিমান এবং সবচেয়ে বেশী সতর্ক ব্যক্তি কে? হযূর সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যাহারা মৃত্যুকে সবচেয়ে বেশী
স্মরণ করে এবং মৃত্যুর জন্য সবচেয়ে বেশী প্রস্তুতি গ্রহণ করে। তাহারাই
ঐ সমস্ত লোক যাহারা দুনিয়ার বুয়ুর্গী ও আখেরাতের সম্মান লইয়া
গিয়াছে। (তারগীব : ইবনু আবিদুনইয়া, তাবারানী হগীর)

ফায়দা : মৃত্যুকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করা এবং স্মরণ রাখা
সম্পর্কে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বিভিন্ন শিরোনামে

অনেক হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে হইতে কিছু রেওয়াযাত এই কিতাবে কিছু পূর্বেই আশা-আকাঙ্ক্ষা সংক্ষিপ্ত করার হাদীস প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে। উহাতে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই আদেশও বিভিন্ন রেওয়াযাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, সাধ-আহলাদ ধ্বংসকারী বস্তু অর্থাৎ মৃত্যুকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এইরূপ গুরুত্ব আরোপের কারণে উক্ত বিষয়টিকে আলাদাভাবেও উল্লেখ করিতেছি। কেননা, মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ রাখা আশা-আকাঙ্ক্ষা সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণ, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের উপায় এবং দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি পয়দা হইবারও ওসীলা, যাহা আসল উদ্দেশ্য। ইহা ধন-সম্পদকে জমা করিয়া অনর্থক ছাড়িয়া যাওয়া হইতেও বিরত রাখে। আখেরাতের জন্য নেকী জমা করার ব্যাপারেও সাহায্যকারী। যাবতীয় গুনাহ হইতে তওবা করিতে থাকার প্রতিও উৎসাহ প্রদানকারী। অন্যের উপর জুলুম-অত্যাচার ও অন্যের হক নষ্ট করা হইতেও বিরত রাখে। মোটকথা, এই আমলের মধ্যে অনেক উপকারিতা নিহিত রহিয়াছে। এই কারণেই সুফী-সাধকগণেরও নিয়ম রহিয়াছে যে, নিজেদের মুরীদানের মধ্য হইতে অবস্থা হিসাবে যাহাদের জন্য সমীচীন মনে করিতেন; এরূপ অধিকাংশকে বিশেষভাবে মউতের মুরাকাবা করার উপদেশ দিতেন।

এক হাদীসে আছে, এক যুবক মজলিসে দাঁড়াইয়া আরজ করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! মুমেনদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী বুদ্ধিমান কে? হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, মৃত্যুকে অধিক পরিমাণে স্মরণকারী এবং উহা আসিবার পূর্বে উহার জন্য উত্তম প্রস্তুতি গ্রহণকারী। (ইতহাক)

একবার হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন পাকের এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন : **فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ تَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ** ২৮। যাহার অর্থ এই যে, আল্লাহ তায়ালা যাহাকে হেদায়াত করিবার ইচ্ছা করেন, ইসলামের জন্য তাহার বক্ষ খুলিয়া দেন (অর্থাৎ, ইসলাম সম্পর্কে তাহার অন্তর উন্মুক্ত হইয়া যায়)। (আনআম : ১২৫)

অতঃপর হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, (ইসলামের) নূর যখন অন্তরে প্রবেশ করে, তখন অন্তর উহার জন্য খুলিয়া যায়। কেহ আরজ করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইহার (অর্থাৎ ইসলামের নূর অন্তরে প্রবেশ করিবার) কোন আলামত আছে কি? হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ধোকার ঘর (দুনিয়া হইতে) দূরত্ব পয়দা হওয়া, চিরস্থায়ী ঘর (আখেরাত)এর দিকে রুজু হওয়া এবং মৃত্যু আসিবার পূর্বে

উহার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা। (মিশকাত)

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি আমার মায়ের কবর যিয়ারত করিবার অনুমতি চাহিয়াছিলাম। আমাকে যিয়ারতের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। তোমরা কবরস্থানে গমন করিও। কারণ, ইহা মৃত্যুকে স্মরণ করাইয়া দেয়। অন্য এক হাদীসে আছে, ইহা দ্বারা শিক্ষা হাসিল হয়। আর এক হাদীসে আছে, কবরস্থানে গমন করিলে দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি পয়দা হয় এবং আখেরাত স্মরণ হয়।

হযরত আবু যর (রাযিঃ) বলেন, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এরশাদ করিয়াছেন, কবরস্থানে গমন করিও। ইহাতে তোমার আখেরাত স্মরণ হইবে। মূর্দাদিগকে গোসল দিও। কেননা, ইহা (নেকীসমূহ হইতে) শূন্য দেহের চিকিৎসা এবং ইহা দ্বারা অনেক বড় নসীহত হাসিল হয়। জানাযার নামাযে শরীক হইও ; হযরত ইহা দ্বারা কিছু চিন্তা-ফিকির তোমার মধ্যে পয়দা হইয়া যাইবে। কেননা, চিন্তাযুক্ত মানুষ (যাহার মধ্যে আখেরাতের চিন্তা থাকে) আল্লাহ তায়ালার ছায়াতলে থাকে এবং প্রত্যেক ভাল জিনিসের তালাশে থাকে। (তারগীব)

এক হাদীসে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত আছে, অসুস্থদের সেবা কর, জানাযার সহিত চল, ইহা আখেরাতকে স্মরণ করায়।

একজন স্ত্রানী ব্যক্তি কোন জানাযার সহিত যাইতেছিলেন। পথে লোকেরা মৃত ব্যক্তির জন্য আফসোস ও দুঃখ প্রকাশ করিতেছিল। তিনি বলিতে লাগিলেন, তোমরা নিজেদের প্রতি আফসোস ও দুঃখ প্রকাশ কর ; ইহা বেশী উপকারী হইবে। সে তো চলিয়া গিয়াছে এবং তিনটি বিপদ হইতে মুক্তি পাইয়া গিয়াছে। এক—ভবিষ্যতে মৃত্যুর ফেরেশতাকে দেখিবার ভয় তাহার নাই। দুই—দ্বিতীয়বার মৃত্যুর কষ্ট সহ্য করিতে হইবে না। তিন—খারাপ পরিণতির ভয় শেষ হইয়া গিয়াছে। (নিজেদের ফিকির কর। কেননা, এই তিনটি অবস্থা তোমাদের জন্য রহিয়াছে।)

হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) একটি জানাযার সঙ্গে যাইতেছিলেন। কোন পথচারী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, ইহা কাহার জানাযা? তিনি বলিতে লাগিলেন, তোমার জানাযা। আর যদি এই কথা তোমার খারাপ লাগে, তবে ইহা আমার জানাযা। (অর্থ এই যে, এখন নিজের মৃত্যুকে স্মরণ করিবার সময়, এই সময় অহেতুক কথা বলিবার মধ্যে মশগুল হওয়া একেবারেই সমীচীন নয়।)

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, আশ্চর্য হই এবং অনেক বেশী

আশ্চর্য হই এই সমস্ত লোকের উপর, যাহাদিগকে (আখেরাতের) সফরের জন্য সামান প্রস্তুত করিয়া লওয়ার হুকুম করা হইয়াছে এবং রওয়ানা হওয়ার সময় অতি নিকটবর্তী বলিয়া ঘোষণা হইয়া গিয়াছে, তবুও তাহারা (দুনিয়ার) খেল-তামাশায় মশগুল রহিয়াছে।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) সম্পর্কে প্রসিদ্ধ আছে, যখন তিনি কোন জানাযা দেখিতেন, তখন দুঃখ-চিন্তায় এমন অবস্থা হইত, যেন এইমাত্র তিনি নিজের মা'কে দাফন করিয়া আসিয়াছেন। (তাস্বীহুল গাফেলীন)

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, একজন ইহুদী মহিলা তাহার নিকট আসিল এবং (কোন দানের বদলায়) বলিতে লাগিল, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে কবরের আযাব হইতে রক্ষা করুন। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কবরেও কি আযাব হয়? হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, নিঃসন্দেহে, কবরেও আযাব হয়। ইহার পর হইতে (লোকদের শিক্ষার জন্য) হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা প্রত্যেক নামাযের পর কবরের আযাব হইতে পানাহ চাহিতেন।

এক হাদীসে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মূর্দাদের উপর কবরে এমন কঠিন আযাব হয় যে, উহার আওয়াজ চতুস্তম্ভ পর্যন্ত শুনিতে পায়।

এক হাদীসে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করা হইয়াছে যে, আমার আশংকা হয় যে, তোমরা (ভয়ে) মূর্দাদেরকে দাফন করা ছাড়িয়া দিবে। নচেৎ আমি আল্লাহ তায়ালা নিকট এই দোয়া করিতাম, যেন আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে কবরের আওয়াজ শুনাইয়া দেন।

হযরত ওসমান (রাযিঃ) যখন কোন কবরের নিকট দাঁড়াইতেন, তখন এত বেশী কাঁদিতেন যে, দাড়ি মুবারক ভিজিয়া যাইত। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, আপনি জামাত, জাহান্নামের আলোচনাতেও এত বেশী কাঁদেন না, যত বেশী কবরের আলোচনাতে কাঁদেন। তিনি বলিলেন, আমি হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনিয়াছি, কবর আখেরাতের মঞ্জিলসমূহের মধ্য হইতে সর্বপ্রথম মঞ্জিল। যে ব্যক্তি এই মঞ্জিল হইতে সহজভাবে মুক্তি পাইল, তাহার জন্য পরবর্তী মঞ্জিলসমূহ সহজ হইবে। আর যে ব্যক্তি ইহার মধ্যে (আযাবে) গ্রেফতার হইয়া গেল, তাহার জন্য পরবর্তী মঞ্জিলসমূহ আরও বেশী কঠিন হইবে। আমি হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ইহাও শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন,

আমি কবরের দৃশ্য হইতে বেশী কঠিন কোন দৃশ্য দেখি নাই।

অন্য এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করা হইয়াছে যে, কবরের মধ্যে প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় দুইবার মূর্দাকে তাহার ঐ ঘর দেখানো হয়, যেখানে সে কিয়ামতের পর যাইবে। যদি সে জাহান্নামী লোকদের মধ্যে হয়, তবে জাহান্নামের ঘর দেখানো হয় (যে কারণে সে কবরের মধ্যেই আনন্দ উপভোগ করিতে থাকে)। আর যদি সে জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে জাহান্নামের ঘর তাহাকে দেখানো হয়। (যে কারণে তাহার দুঃখ-কষ্ট, চিন্তা ও ভয় বৃদ্ধি পাইতে থাকে)

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, একবার একজন ইহুদী মেয়েলোক আমার দরজায় আসিল এবং ভিক্ষা চাহিতে লাগিল যে, আমাকে খাওয়ার কিছু দিয়া দাও, আল্লাহ তায়ালা তোমাকে দাজ্জালের ফেতনা হইতে এবং কবরের আযাব হইতে বাঁচাইয়া রাখুন। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, আমি সেই মেয়েলোকটিকে বসাইয়া রাখিলাম। ইতিমধ্যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তশরীফ আনিলেন। আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিলাম, এই ইহুদী মেয়েলোকটি এই দুইটি কথা বলিয়াছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, দাজ্জালের ফেতনা এমন যে, পূর্বকার নবীগণের মধ্য হইতে এমন কোন নবী অতিবাহিত হন নাই, যিনি তাহার উম্মতকে দাজ্জালের ফেতনা হইতে ভয় না দেখাইয়াছেন। কিন্তু আমি তাহার সম্পর্কে এমন একটি কথা বলিয়া দেই যাহা আজ পর্যন্ত কোন নবী বলেন নাই। উহা এই যে, সে কানা হইবে এবং তাহার কপালের উপর 'কাফের' শব্দ লিখিত থাকিবে, যাহা প্রত্যেক মুমিন পড়িতে পারিবে। আর কবরের ফেতনা এই যে, যখন কোন নেক বান্দা মৃত্যু বরণ করে, তখন ফেরেশতা তাহাকে কবরে বসায়। সে এমন অবস্থায় বসে যে, তাহার কোন পেরেশানী থাকে না এবং তাহার কোন দুশ্চিন্তা থাকে না। অতঃপর তাহাকে প্রথমে ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় যে, তুমি ইসলাম সম্পর্কে কি বলিতে? অতঃপর পুনরায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তুমি এই ব্যক্তি (অর্থাৎ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে কি বল? সে বলে, ইনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যিনি আল্লাহ তায়ালা পক্ষ হইতে আমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণসমূহ লইয়া আসিয়াছেন। আমরা সেই সবকিছুকে সত্য মানিয়াছি, যাহা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লইয়া আসিয়াছিলেন। অতঃপর তাহাকে প্রথমে দোযখের একটি জায়গা দেখান হয়। যেখানে সে দেখে যে, মানুষ একজন অপর জনের উপর ভাসিয়া

পড়িতেছে। অতঃপর তাহাকে বলা হয়, এই জায়গাটিকে দেখ, আল্লাহ তায়ালা তোমাকে এই আপদ হইতে মুক্তি দান করিয়াছেন। তারপর তাহাকে জান্নাতের একটি স্থান দেখান হয়। যেখানে সে অত্যন্ত সাজসজ্জা ও চাকচিক্য দেখে এবং জান্নাতের আকর্ষণীয় দৃশ্যাবলী দেখে। অতঃপর তাহাকে বলা হয়, ইহা তোমার অবস্থানের জায়গা (কিয়ামতের পর তোমাকে এইখানে আনা হইবে)। তুমি দুনিয়াতে আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসী ছিলে, উহার উপরই তোমার মৃত্যু হইয়াছে এবং উহার উপরই কিয়ামতের দিন তোমাকে কবর হইতে উঠানো হইবে। আর যখন কোন খারাপ মানুষ মারা যায়, তখন তাহাকে কবরে বসানো হয়। সে অত্যন্ত পেরেশান ও ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া বসে। তাহাকেও ঐ প্রশ্ন করা হয় (যাহা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে)। সে জওয়াব দেয়, আমার তো কিছুই জানা নাই। লোকদেরকে আমি যাহা বলিতে শুনিয়াছিলাম, আমিও উহাই বলিতাম। তাহার জন্য প্রথমে জান্নাতের দরজা খুলিয়া তাহাকে সেইখানের সাজসজ্জা ও নিয়ামতসমূহ দেখানো হয়। অতঃপর তাহাকে বলা হয়, এখানে তোমার আসল জায়গা ছিল ; কিন্তু তোমাকে এইখান হইতে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর তাহাকে জাহান্নাম দেখানো হয়। যেখানে একজনের উপর আরেকজন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। তাহাকে বলা হয়, এখন ইহা তোমার ঠিকানা। তুমি দুনিয়াতে সন্দেহের মধ্যেই ছিলে, ঐ অবস্থাতেই মরিয়াছ এবং কিয়ামতের দিন উহার উপরই তোমাকে উঠানো হইবে। (তরগীব)

হযরত আবু কাতাদা (রাযিঃ) বলেন, হযূর সাপ্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দিয়া একটি জানাযা অতিক্রম করিল। হযূর সাপ্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহা দেখিয়া বলিলেন, হযরত এই ব্যক্তি আরাম পাইয়াছে অথবা এই ব্যক্তি হইতে অন্যদের আরাম হইয়াছে। ইহার পর এরশাদ করিলেন, মুমেন বান্দা তো মৃত্যুর পর দুনিয়ার যাবতীয় কষ্ট-ক্লেশ হইতে আরাম পাইয়া যায় এবং আল্লাহ তায়ালা রহমতের মধ্যে চলিয়া যায় (এই ব্যক্তি আরাম পাইল)। আর গুনাহগার ব্যক্তি যখন মারা যায়, তখন অন্যান্য লোক, জনপদ, গাছপালা ও জীব-জন্তু সবকিছু তাহার মৃত্যুর কারণে আরাম পায়। (মিশকাত) কারণ, তাহার গুনাহের কারণে দুনিয়াতে আপদ-বিপদ নাযিল হয়, বৃষ্টি বন্ধ হইয়া যায়। ফলে, বিভিন্ন জনপদে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়, গাছপালা শুকাইতে আরম্ভ করে এবং জীব-জন্তুর খাদ্য পাওয়া মুশকিল হইয়া যায়। এই কারণে তাহার মৃত্যুর দ্বারা সকলে আরাম পায়। কেননা, তাহার অমঙ্গলের কারণে সকলেরই

কষ্ট পৌছিতেছিল।

হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) বলেন, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আমার কাঁধে হাত রাখিয়া বলিলেন, দুনিয়াতে এমনভাবে থাক, যেমন কোন অপরিচিত ব্যক্তি বরং পথচারী মুসাফির। হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) বলেন, যখন তুমি সকাল কর, তখন সন্ধ্যার অপেক্ষা করিও না। যখন সন্ধ্যা কর, তখন সকালের অপেক্ষা করিও না। নিজের সুস্থতার সময়ের মধ্যে অসুস্থতার সময়ের জন্য পাথের সংগ্রহ করিয়া লও। (কেননা, যে সমস্ত আমল সুস্থ অবস্থায় করিবে, অসুস্থ অবস্থায় উহার সওয়াব পাইতে থাকিবে।) নিজের জীবন থাকিতে মৃত্যুর জন্য পাথের সংগ্রহ করিয়া লও। (মিশকাত)

হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন, আমরা একবার হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে একটি জানাযার সহিত চলিলাম। কবরস্থানে পৌছিয়া হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কবরের নিকট তশরীফ রাখিলেন এবং এরশাদ করিলেন, কবরের উপর এমন কোন দিন অতিক্রান্ত হয় না, যেদিন সে অত্যন্ত পরিষ্কার ও স্পষ্ট আওয়াজে এই ঘোষণা করে না যে, হে আদমসন্তান! তুমি আমাকে ভুলিয়া গিয়াছ, আমি একাকীত্বের ঘর, অপরিচিতের ঘর, আমি নির্জনতার ঘর, আমি কীট-পতঙ্গের ঘর, আমি অত্যন্ত সংকীর্ণতার ঘর ; তবে যাহার উপর আল্লাহ তায়ালা আমাকে প্রশস্ত করিয়া দেন তাহার জন্য এইরূপ নই। অতঃপর হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, কবর জান্নাতের বাগানসমূহের মধ্য হইতে একটি বাগান অথবা দোযখের গর্তসমূহের মধ্য হইতে একটি গর্ত।

হযরত সাহল (রাযিঃ) বলেন, একজন সাহাবী (রাযিঃ) এর এন্তেকাল হইল। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং তাহার অধিক এবাদত-বন্দেগীর অবস্থা বর্ণনা করিতে লাগিলেন। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ করিয়া শুনিতে থাকিলেন। যখন তাহারা চুপ করিলেন, তখন হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কি কখনও মৃত্যুকে স্মরণ করিত? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, না, ইহার আলোচনা তো করিত না। অতঃপর হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, নিজের মনচাহি জিনিসসমূহ ত্যাগ করিত? (যেমন, কোন জিনিস খাইতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু উহা খাইল না।) সাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, এইরূপ তো হইত না। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই সাহাবী ঐ

মর্যাদায় পৌঁছাবে না, যে মর্যাদায় তোমরা (যাহারা এই দুইটি কাজ করিয়া থাক) পৌঁছিয়া যাইবে।

অন্য এক হাদীসে আছে, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে এক সাহাবীর অধিক এবাদত ও মোজাহাদা সম্পর্কে আলোচনা হইল। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সে মৃত্যুকে কি পরিমাণ স্মরণ করিত? সাহাবায়ে কেয়াম আরজ করিলেন, উহার আলোচনা তো আমরা শুনি নাই। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহা হইলে সে ঐ মর্যাদার নয় (যেমন তোমরা মনে করিতেছ)।

হযরত বারা (রাযিঃ) বলেন, আমরা হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে একটি জানাযার দাফনে শরীক হইলাম। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেইখানে যাইয়া একটি কবরের নিকট তশরীফ রাখিলেন এবং এত বেশী কাঁদিলেন যে, জমিন ভিজিয়া গেল। অতঃপর এরশাদ করিলেন, ভাইসকল! ইহার জন্য (অর্থাৎ কবরে যাওয়ার জন্য) প্রস্তুতি গ্রহণ কর। (তারগীব)

হযরত শাকীক ইবনে ইবরাহীম (রহঃ) বলেন, মানুষ চারটি বিষয়ে মৌখিকভাবে আমার সমর্থন করে; কিন্তু আমলের দ্বারা বিরোধিতা করে। এক—সে বলে, আমরা আল্লাহ তায়ালায় বান্দা (ও গোলাম); কিন্তু কাজকর্ম করে স্বাধীন লোকদের মত। দুই—তাহারা বলে যে, আল্লাহ তায়ালা আমাদের রুজির জিম্মাদার, কিন্তু তাহাদের অন্তর (আল্লাহর জিম্মাদারীর উপর) ঐ পর্যন্ত নিশ্চিত হয় না, যেই পর্যন্ত দুনিয়ার কোন জিনিস তাহাদের নিকট না হয়। তিন—তাহারা বলে যে, আখেরাত দুনিয়া হইতে উত্তম। কিন্তু দুনিয়ার জন্য মাল জমা করার মধ্যে সবসময় লাগিয়া থাকে (আখেরাতের কোন চিন্তা নাই)। চার—তাহারা বলে যে, মৃত্যু নিশ্চিত জিনিস; উহা অবশ্যই আসিবে। কিন্তু আমল করে ঐ সমস্ত লোকের মত, তাহাদের কখনও মরিতে হইবে না।

আবু হামেদ লাফ্ফাফ (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে, তাহাকে তিনটি জিনিস দ্বারা সন্মান করা হয়—এক, জলদি তওবা নসীব হয়। দুই, মালের মধ্যে অশ্লেষত্বটি হাসিল হয়। তিন, এবাদতের মধ্যে আনন্দ ও মনোযোগ পয়দা হয়। আর যে ব্যক্তি মৃত্যু হইতে গাফেল থাকে, তাহাকে তিনটি আযাবে গ্রেফতার করা হয়। এক—গুনাহ হইতে তওবা করার ব্যাপারে বিলম্ব হইতে থাকে। আমদানীর উপর সন্দেহ হয় না (আমদানী যত বেশীই হউক না কেন,

উহাকে কম মনে করিতে থাকে)। তিন—এবাদত—বন্দেগীতে অলসতা পয়দা হয়। (তাম্বীহুল গাফেলীন)

ইমাম গায়যালী (রহঃ) বলেন, সমস্ত প্রশংসা ঐ সত্তার, যিনি মৃত্যু দ্বারা বড় বড় জালেম, অত্যাচারী লোকদের ঘাড় মটকাইয়া দিয়াছেন, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বড় বড় বাদশাহদের কোমর ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন, বড় বড় ধনভাণ্ডারের মালিকদের আশা-আকাঙ্ক্ষা খতম করিয়া দিয়াছেন। এই সমস্ত লোক এমন ছিল, যাহারা মৃত্যুর আলোচনাকেই ঘৃণা করিত। কিন্তু যখন আব্বাহ তাযালার ওয়াদা (মৃত্যুর সময়) আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন তাহাদিগকে গর্তের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছে। আকাশচুম্বী অট্টালিকা হইতে জমিনের নীচে পৌছাইয়া দিয়াছে। বিজলী বাতির আলোতে নরম বিছানা হইতে কবরের অন্ধকারে পৌছাইয়া দিয়াছে। গোলাম-বান্দীদের সহিত খেল-তামাশার স্থলে জমিনের কীট-পতঙ্গের মধ্যে ফাসিয়া গিয়াছে। ভাল ভাল খানা-পিনার মধ্যে আনন্দ-উপভোগের স্থলে মাটিতে গড়াগড়ি খাইতেছে। দোস্ত-বন্ধুদের আসর-মজলিসের স্থলে নির্জনতার ভয়-ভীতিতে গ্রেফতার হইয়া গিয়াছে। এইসব লোক কি নিজেদেরকে কোন মজবুত দুর্গের মাধ্যমে মৃত্যুর কবল হইতে বাঁচাইতে পারিয়াছে? অথবা উহা হইতে বাঁচিবার জন্য অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করিতে পারিয়াছে? অতএব, ঐ মহান যাত পবিত্র, যাহার পরাক্রমশীলতা ও মহানত্বের মধ্যে অন্য কেহ শরীক নাই। তিনি চিরগুণ। কেহ তাঁহার সমতুল্য নাই। কাজেই প্রত্যেক ব্যক্তিকে যখন মৃত্যুবরণ করিতেই হইবে, মাটিতে মিশিয়া যাইতেই হইবে, কবরের কীট-পতঙ্গের সাথী হইতেই হইবে, মুনকার নকীরের সম্মুখীন হইতেই হইবে, জমিনের নীচে দীর্ঘ সময় থাকিতেই হইবে, উহাই অনেক দীর্ঘ সময়ের জন্য ঠিকানা হইবে, অতঃপর কিয়ামতের কঠিন দৃশ্য দেখিতেই হইবে; উহার পর জানা নাই—জান্নাতে যাওয়া হইবে নাকি দোযখ ঠিকানা হইবে, কাজেই অত্যন্ত জরুরী যে, মানুষ সবসময় মৃত্যুর চিন্তায় চিন্তিত থাকে। উহার আলোচনায় লাগিয়া থাকে। উহার প্রস্তুতির মধ্যেই সবসময় মশগুল থাকে। উহাকে প্রত্যেক জিনিসের উপর গুরুত্ব দিতে থাকে এবং সবসময় উহার আগমনের অপেক্ষায় থাকে। কেননা, উহার আগমনের কোন সময় নির্ধারিত নাই। জানা নাই, কখন আসিয়া যায়। এইজন্যই হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বুদ্ধিমান ব্যক্তি সে, যে নিজের নফসকে আয়ত্বে রাখে আর এমন জিনিসের মধ্যে মশগুল থাকে, যাহা মৃত্যুর পর কাজে আসিবে। আর কোন কাজের জন্য প্রস্তুতি এইভাবে না হইলে হয় না যে, সবসময়

উহার প্রতি গুরুত্ব দিতে থাকিবে এবং উহার আলোচনা করিতে থাকিবে। কারণ, যে ব্যক্তি দুনিয়ার মধ্যে মত্ত হইয়া উহার ধোকার বস্ত্রসমূহের মধ্যে ফাসিয়া রহিয়াছে এবং উহার খাহেশাতের আসক্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহার অন্তর মৃত্যু হইতে একেবারে গাফেল হইয়া থাকে। তদুপরি যদি মৃত্যুর আলোচনা করাও হয়, তবে উহা তাহার নিকট খারাপ ও অপ্রিয় মনে হয়। ইহাই আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন—

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي
تَفْرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ
ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (جمعه ۱)

آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جس موت سے
تم بھاگتے ہو وہ تم کو آپکے ہی پیر
تم اس پاک ذات کی طرف سے جلتے
جاؤ گے جو برپوشیدہ اور ظاہریات کو
جاننے والی ہے۔ پھر وہ تم کو تمباہے
سب کچھ بتائے گا (اور ان کا بدلہ دے گی)۔

আপনি তাহাদিগকে বলিয়া দিন—যে মৃত্যু হইতে তোমরা পলায়ন করিতেছ, উহা আসিয়া তোমাদিগকে পাকড়াও করিবে। অতঃপর তোমাদিগকে ঐ পবিত্র সত্তার সম্মুখে উপস্থিত করিবে, যিনি গোপন ও প্রকাশ্য সকল বিষয় জানেন। অতঃপর তিনি তোমাদিগকে তোমাদের কৃতকর্মসমূহ বলিয়া দিবেন (এবং সেইগুলির প্রতিদান দিবেন)।

(জুম্মা ৪ ৮)

ওলামায়ে কেরাম লিখিয়াছেন, মৃত্যুর ব্যাপারে মানুষ চার প্রকার। প্রথম ঐ সমস্ত লোক, যাহারা দুনিয়াতে মগ্ন রহিয়াছে ; তাহাদের নিকট মৃত্যুর আলোচনা এই কারণে ভাল লাগে না যে, উহাতে দুনিয়ার স্বাদ ও লজ্জত ছুটিয়া যাইবে। এইরূপ ব্যক্তি মৃত্যুকে কখনও স্মরণ করে না। আর যদি কখনও করে, তবে মন্দভাবে করে। কেননা, দুনিয়া ছুটিয়া যাওয়ার কারণে তাহার কষ্ট ও আফসোস হয়।

দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহর দিকে রুজু তো করে ; কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় রহিয়াছে। মৃত্যুর আলোচনা দ্বারা তাহার মধ্যে আল্লাহর ভয়ও পয়দা হয় এবং ইহাতে তওবার মধ্যে মজবুতিও পয়দা হয়। এই ব্যক্তিও মৃত্যুকে ভয় করে ; কিন্তু এইজন্য নয় যে, দুনিয়া ছুটিয়া যাইবে বরং এইজন্য যে, তাহার তওবা পরিপূর্ণ নয়। এই ব্যক্তিও এখনই মরিতে চায় না, কারণ, সে তাহার অবস্থার সংশোধন করিয়া লইতে চায় এবং সে উহার ফিকিরে লাগিয়া রহিয়াছে। এই ব্যক্তি মৃত্যুকে অপছন্দ করার

ব্যাপারে অপারগ। আর এই ব্যক্তি ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐ এরশাদের অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যাহাতে ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সহিত সাক্ষাৎ করাকে অপছন্দ করে, আল্লাহ তায়ালার সহিত সাক্ষাতকে অপছন্দ করেন। কারণ, সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালার সাক্ষাতকে অপছন্দ করে না, বরং নিজের ক্রটি ও অপরাধের কারণে ভয় পায়। তাহার দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির মত, যে প্রিয়জনের সহিত সাক্ষাতের পূর্বে কিছু প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে চায়, যাহাতে প্রিয়জনের মন খুশি হয়। তবে ইহা জরুরী যে, এই ব্যক্তি উক্ত প্রস্তুতির মধ্যে সবসময় যেন মশগুল থাকে; উহা ছাড়া তাহার অন্য কোন ব্যস্ততা যেন না থাকে। যদি এইরূপ না হয়, তবে এই ব্যক্তি প্রথম শ্রেণীর লোকদের মতই হইবে এবং এই ব্যক্তিও দুনিয়াতে মগ্ন লোকদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

তৃতীয় ব্যক্তি হইল, আরেফ বা ওলী। তাহার তওবা পূর্ণ। এই সমস্ত লোক মৃত্যুকে ভালবাসে। উহার আকাঙ্ক্ষা করে। কেননা, প্রেমিকের জন্য প্রিয়জনের সাক্ষাত হইতে বেশী শ্রেষ্ঠ সময় আর কোনটি হইবে? মৃত্যুর সময় হইল, সাক্ষাতের সময়। প্রেমিকের মনে প্রিয়জনের পক্ষ হইতে ওয়াদাকৃত মিলনের সময় সর্বদা স্মরণ থাকে, উহা সে কখনও ভুলে না। ইহারাই ঐ সমস্ত লোক, যাহাদের অন্তরে শীঘ্র আগমনের মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা থাকে। তাহাদের মনের কষ্ট ইহাই যে, মৃত্যু কেন আসে না; যাহাতে এই গুনাহের ঘর হইতে তাড়াতাড়ি মুক্তি লাভ করিতাম!

এক রেওয়াজাতে আছে, হযরত ছুযাইফা (রাযিঃ)এর এন্তেকালের সময় যখন নিকটবর্তী হইল, তখন বলিতে লাগিলেন, প্রিয় (মৃত্যু) অভাবের সময় আসিয়াছে। যে মৃত্যুর সময় লঙ্ঘিত হয়, সে কামিয়াব হয় না। হে আল্লাহ! তোমার জানা আছে, দরিদ্রতা সবসময় আমার নিকট সচ্ছলতা হইতে বেশী প্রিয় ছিল। অসুস্থতা সুস্থতা হইতে বেশী পছন্দনীয় ছিল। মৃত্যু জীবন হইতে বেশী প্রিয় ছিল। আমাকে শীঘ্র মৃত্যু দান কর, যাহাতে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি।

চতুর্থ প্রকার, যাহারা সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। ইহারাই ঐ সমস্ত লোক, যাহারা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির মোকাবেলায় মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষাও রাখে না। তাহারা নিজ ইচ্ছায় নিজদের জন্য না মৃত্যুকে পছন্দ করেন, না জিন্দেগীকে। তাহারা প্রেমের সর্বোচ্চ স্তর—সন্তুষ্টি ও সমর্পণের স্তরে পৌঁছিয়া গিয়াছেন। মোটকথা, মৃত্যুর আলোচনা সর্বাবস্থায় নেকী ও সওয়াবের বিষয়। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মশগুল রহিয়াছে, মৃত্যুর আলোচনা

দ্বারা দুনিয়ার স্বাদ কমিয়া আসিবে এবং কিছু না কিছু তো দুনিয়া হইতে দূরত্ব পয়দা হইবেই।

এইজন্য ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, স্বাদ বিনষ্টকারী বস্তু (মৃত্যু)কে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর। অর্থাৎ উহার আলোচনা দ্বারা দুনিয়ার প্রতি তোমার খায়েশ কমাইয়া ফেল। যাহাতে আল্লাহ তাযালার দিকে মনোযোগী হইতে পার।

এক হাদীসে ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যদি জীবজন্তুদের মৃত্যু সম্পর্কে এতটুকুও জ্ঞান থাকিত, যতটুকু তোমাদের রহিয়াছে, তবে তোমরা খাওয়ার জন্য মোটাতাজা কোন জানোয়ার পাইতে না। (মৃত্যুর ভয়ে সমস্ত জীবজন্তু শুকাইয়া যাইত।)

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন ব্যক্তি (শহীদী মৃত্যু ছাড়াও কি) শহীদগণের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে? ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যে ব্যক্তি দিনরাতে বিশ বার মৃত্যুকে স্মরণ করে, সে এইরূপ হইতে পারে। (এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি পঁচিশ বার এই দোয়া পড়ে **اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي الْمَوْتِ وَفِي مَا بَعْدَ الْمَوْتِ** সে শহীদগণের মর্তবায় পৌছিতে পারে।) এইসব ফযীলতের কারণ ইহাই যে, মৃত্যুকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করা এই ধোকার ঘরের প্রতি অনাসক্তি পয়দা করে এবং আশ্বেরাভের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণে উৎসাহিত করে। আর মৃত্যুর ব্যাপারে গাফলতি দুনিয়ার খাহেশাত ও ভোগ-বিলাসে মগ্নতা পয়দা করে।

আতা খোরাসানী (রহঃ) বলেন, একবার ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মজলিসের নিকট দিয়া গেলেন। সেখানে লোকেরা উচ্চ আওয়াজে হাসিতেছিল। ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, নিজেদের মজলিসে স্বাদ বিনষ্টকারী বস্তুর আলোচনা শামিল করিয়া লও। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! স্বাদ বিনষ্টকারী বস্তু কি? ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, মৃত্যু।

এক হাদীসে ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মৃত্যুকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর। ইহা ওনাহসমূহকে দূর করিয়া দেয় এবং দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি পয়দা করে। (এইহিয়া)

এক হাদীসে ছয়র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যদি তোমরা জানিতে যে, মৃত্যুর পর তোমাদের কি অবস্থা হইবে, তবে না কখনও আগ্রহ সহকারে খানা খাইতে, না কখনও তৃপ্তি

সহকারে পানি পান করিতে। ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সাহাবীকে ওসিয়ত করিলেন, মৃত্যুর আলোচনা বেশী বেশী কর ; ইহা তোমাকে অন্যান্য জিনিসের প্রতি আগ্রহ করা হইতে দূরে রাখিবে।

এক হাদীসে আছে, মৃত্যুকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর ; যে ব্যক্তি মৃত্যুকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে, তাহার অন্তর জিন্দা হইয়া যায় এবং মৃত্যু তাহার জন্য সহজ হইয়া যায়।

এক সাহাবী আরজ করিলেন, ইয়া রাসুল্লাহ! আমি মৃত্যুকে ভালবাসি না ; ইহার কি চিকিৎসা করিব? ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার কাছে কিছু মাল আছে কি? তিনি আরজ করিলেন, আছে। ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, উহাকে সম্মুখে পাঠাইয়া দাও। মানুষের অন্তর মালের সহিত লাগিয়া থাকে। যখন উহাকে সম্মুখে পাঠাইয়া দেয়, তখন তাহার নিজেরও উহার নিকট চলিয়া যাইতে ইচ্ছা হয়। আর যখন পিছনে রাখিয়া যায়, তখন তাহার নিজেরও উহার নিকট থাকিয়া যাইতে মন চায়। (এতহাক)

এক হাদীসে আছে, যখন রাত্রের দুই-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হইয়া যাইত তখন ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিতেন, হে লোকসকল! আল্লাহকে স্মরণ কর, আল্লাহকে স্মরণ কর। অতি শীঘ্র কিয়ামতের ভূকম্পন অতঃপর শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়ার সময় আসিতেছে এবং (প্রত্যেকের জন্য) মৃত্যু আপন সকল কঠিন অবস্থা সহকারে আসিতেছে।

(মিশকাত)

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ)এর অভ্যাস ছিল—প্রতিদিন রাত্রে উলামায়ে কেরামদেরকে ডাকিয়া একত্রিত করিতেন। তাহার মৃত্যু, কিয়ামত এবং আখেরাত সম্পর্কে আলোচনা করিতেন। তিনি এত কাঁদিতেন, যেন সম্মুখে জানাযা রাখা হইয়াছে।

ইবরাহীম তাইমী (রহঃ) বলেন, দুইটি জিনিস আমার নিকট হইতে দুনিয়ার সবরকম স্বাদকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে। এক, মৃত্যু। দ্বিতীয়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার চিন্তা।

হযরত কাব (রাযিঃ) বলেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুকে চিনিয়া লয়, তাহার উপর দুনিয়ার সমস্ত মুসীবত সহজ হইয়া যায়।

আশআছ (রহঃ) বলেন, আমরা হযরত হাসান বসরী (রহঃ)এর নিকট যখনই হাজির হইতাম, জাহান্নাম ও আখেরাতের আলোচনা হইত।

একজন মহিলা হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর নিকট নিজের অন্তর কঠিন হওয়ার কথা আরজ করিল। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলিলেন,

মৃত্যুর আলোচনা বেশী বেশী কর ; দিল নরম হইয়া যাইবে। সে এইরূপই করিল। অতঃপর হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর নিকট আসিয়া তাহার অনেক শুকরিয়া আদায় করিল। (এহইয়া)

ইমাম গাযযালী (রহঃ) বলেন, মৃত্যুর ব্যাপার অত্যন্ত ভয়ানক অথচ মানুষ উহা হইতে অনেক গাফেল। প্রথমতঃ নিজেদের ব্যস্ততার কারণে উহার আলোচনাই করে না। আর যদি করেও ; তারপর যেহেতু অন্তর অন্যদিকে মগ্ন থাকে, সেহেতু মৌখিক আলোচনা উপকারী হয় না। বরং জরুরী হইল, অন্তরকে সর্বদিক হইতে একেবারে খালি করিয়া মৃত্যুর ধ্যান এইভাবে করিবে, যেন উহা একেবারে সম্মুখে রহিয়াছে। আর উহা এইভাবে করিবে—নিজের প্রিয়জন, আত্মীয়-স্বজন এবং দুনিয়া হইতে বিদায় গ্রহণকারী বন্ধু-বান্ধবের অবস্থা ধ্যান করিবে যে, কিভাবে তাহাদিগকে খাটিয়ার উপর লইয়া যাইয়া মাটিচাপা দিয়াছে। তাহাদের সুন্দর চেহারা ও তাহাদের উচ্চ পদমর্যাদার কথা মনে করিবে এবং চিন্তা করিবে যে, এখন মাটি কিভাবে তাহাদের সুন্দর চেহারাকে পাণ্টাইয়া দিয়াছে। তাহাদের শরীর টুকরা টুকরা হইয়া আলাদা হইয়া গিয়াছে। কিভাবে সন্তানদেরকে এতীম, স্ত্রীকে বিধবা এবং প্রিয়জন ও আত্মীয়-স্বজনকে কান্নাকাটির মধ্যে রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে। তাহাদের সামান, তাহাদের মাল, তাহাদের কাপড়-চোপড় পড়িয়া রহিয়াছে। এই অবস্থা একদিন আমারও হইবে। কিভাবে তাহারা মজলিসে বসিয়া অ হাসি করিত ; আজ চুপ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। কিভাবে দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে মত্ত ছিল ; আজ মাটির সঙ্গে মিশিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। মৃত্যুকে কিরূপ ভুলিয়াছিল ; আজ উহার শিকার হইয়া গিয়াছে। কিরূপ যৌবনের নেশায় পড়িয়াছিল ; আজ কেহ জিজ্ঞাসা করারও নাই। দুনিয়ার ব্যস্ততা ও ধাক্কার মধ্যে কিরূপ মশগুল থাকিত ; আজ হাত ভিন্ন পড়িয়া রহিয়াছে, পা ভিন্ন পড়িয়া রহিয়াছে, জিহ্বার উপর কীট-পতঙ্গ জড়াইয়া রহিয়াছে, শরীরের উপর পোকা-মাকড় কিলবিল করিতেছে। কেমনভাবে খিলখিল করিয়া হাসিত ; আজ দাঁত পড়িয়া রহিয়াছে। বিভিন্ন প্রকার পরিকল্পনার কথা চিন্তা করিত, বহু বৎসরের ব্যবস্থার কথা চিন্তা করিত ; অথচ মৃত্যু মাথার উপর ছিল। মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী ছিল ; কিন্তু তাহাদের জানা ছিল না যে, আজ রাতে আমি থাকিব না। আমারও একই অবস্থা। আজ আমি এত কিছু ব্যবস্থা করিতেছি, কালকের খবর জানা নাই যে, কি হইবে। (এহইয়া)

আগে अपनी موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برکت کی خبر نہیں

অর্থাৎ, নিজের মৃত্যু সম্পর্কে কোন মানুষ অবগত নয়। শত বৎসরের জামান জমা রহিয়াছে অথচ কালকের খবর জানা নাই যে, কি হইবে।

আসমানে যে সমস্ত ফেরেশতা বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত রহিয়াছে, তাহাদিগকে সারা বৎসরের নির্দেশাবলী এক রাত্রে দিয়া দেওয়া হয়। যেমন, এই বৎসর অমুক অমুক কাজ করিতে হইবে এবং অমুক অমুক ব্যক্তি সম্পর্কে এই কাজ করিতে হইবে। এই ব্যাপারে বিভিন্ন রকম রেওয়ায়াত রহিয়াছে যে, এই নির্দেশাবলী শবে কদরে দেওয়া হয়, নাকি শবে বরাতে? যে রাত্রেই হউক না কেন, অনেক রেওয়ায়াতে এই বিষয় বর্ণিত হইয়াছে যে, উক্ত রাত্রিতে ঐ সমস্ত লোকের তালিকা ফেরেশতাদের হাওয়ালা করিয়া দেওয়া হয়, যাহারা সেই বৎসর মারা যাইবে। দুনিয়াতে মানুষ চরম গাফলতির সহিত খেল-তামাশায় মগ্নগল থাকে; অথচ আসমানে তাহার গ্রেফতারীর ওয়ারেন্ট জারি হইয়া গিয়াছে; তাহার মৃত্যুর নির্দেশ জারি হইয়া গিয়াছে, যাহাতে না কোন সুপারিশের অবকাশ আছে, না এই হুকুমের কোন আপিল চলিবে, না তাহার মৃত্যুর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এক মিনিট বিলম্ব হওয়া সম্ভব।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) সূরা দুখানের তফসীরে এরশাদ করেন, শবে কদরে লওহে মাহফুজ হইতে ঐ সমস্ত বিষয়কে নকল করা হয়, যাহা এই বৎসর ঘটিবে। যেমন, কত পরিমাণ রিষিক দেওয়া হইবে, কাহার মারা যাইবে, কাহার পয়দা হইবে, কত পরিমাণ বৃষ্টি হইবে। এমনকি ইহাও নকল করা হয় যে, এই বৎসর কোন্ কোন্ ব্যক্তি হজে যাইবে।

এক হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, তুমি মানুষকে দেখিতে পাইবে যে, তাহার বাজারে চলাফেরা করিতেছে; কিন্তু তাহার নাম এই বৎসরের মৃতদের মধ্যে লেখা হইয়া গিয়াছে।

আবু নায়রা (রহঃ) বলেন, এই রাত্রে সারা বৎসরের সমস্ত কাজ (ফেরেশতাদের মধ্যে) বন্টন করিয়া দেওয়া হয়। সারা বৎসরের ভাল-মন্দ, রুজি, মৃত্যু, কষ্ট, জিনিসপত্র সস্তা হওয়া বা দাম বাড়িয়া যাওয়া এই সবকিছু দিয়া দেওয়া হয়।

হযরত ইকরিমা (রাযিঃ) বলেন, শবে বরাতে সারা বৎসরের হুকুম-আহকাম চূড়ান্ত করিয়া হাওয়ালা করিয়া দেওয়া হয়। এই বৎসরের মৃতদের তালিকা এবং হজে গমনকারীদের তালিকা দিয়া দেওয়া হয়।

ইহাতে কম বেশী হইতে পারে না। এক হাদীসে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত আছে যে, এক শাবান হইতে অপর শাবান পর্যন্ত যতজন মারা যাইবে, তাহাদের সকলের মৃত্যুর সময় লিখিয়া দিয়া দেওয়া হয়। এমনকি মানুষ দুনিয়াতে বিবাহ করে, তাহার সন্তান পয়দা হয় ; কিন্তু আসমানে তাহার নাম মূর্দাদের তালিকায় আসিয়া গিয়াছে।

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাবান মাসে অনেক বেশী রোযা রাখিতেন। এইজন্য যে, এই মাসে সারা বৎসরের মৃত্যুবরণকারীদের তালিকা তৈরী করা হয়। এমনকি এক ব্যক্তি বিবাহ করিতে মশগুল ; অথচ অপরদিকে তাহার নাম মূর্দাদের মধ্যে লেখা হইয়াছে। এক ব্যক্তি হজ্জে যাইতেছে ; অথচ তাহার নাম মূর্দাদের মধ্যে রহিয়াছে।

অন্য এক হাদীসে আছে, হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শাবান মাসে বেশী বেশী রোযা রাখার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই মাসে সারা বৎসরের মূর্দাদের তালিকা তৈরী হয় ; আমার ইচ্ছা হয় যে, আমার নাম যখন মূর্দাদের তালিকায় আসে, তখন আমি যেন রোযা অবস্থায় থাকি।

এক হাদীসে আছে, ১৫ই শাবানের রাত্রিতে আল্লাহ তায়ালা মালাকুল-মউতকে এই বৎসর মৃত্যুবরণকারীদের সম্পর্কে জানাইয়া দেন।

এক হাদীসে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, প্রতিদিন যখন সূর্য উদিত হয়, তখন সে ঘোষণা করে যে, যাহা কিছু নেক কাজ করার করিয়া লও। আজকের দিন তোমার জীবনে আর কখনও ফিরিয়া আসিবে না। (এইজন্য এই দিনে তুমি যত নেকী লেখাইয়া লইতে পার, লেখাইয়া লও।) আর দুইজন ফেরেশতা আসমান হইতে ঘোষণা করেন, তন্মধ্যে একজন বলেন, হে নেক কাজে আগ্রহী ! সুসংবাদ গ্রহণ কর (এবং অগ্রসর হও)। আর দ্বিতীয়জন বলেন, হে মন্দ কাজকারী ! থাম ; বিরত হইয়া যাও (নিজের ধ্বংসের ছামান জমা করিও না)। আরও দুইজন ফেরেশতা ঘোষণা করেন, তন্মধ্যে একজন বলেন, হে আল্লাহ ! যাহারা খরচ করে, তাহাদেরকে উহার বদলা দান করুন। দ্বিতীয়জন বলেন, হে আল্লাহ ! যাহারা সম্পদ জমা করিয়া রাখে, তাহাদের সম্পদ ধ্বংস করিয়া দিন।

আতা ইবনে ইয়াসার (রহঃ) বলেন, যখন ১৫ই শাবানের রাত্র হয়, তখন মৃত্যুর ফেরেশতাকে একটি তালিকা দিয়া দেওয়া হয়। উহাতে

যাহাদের নাম রহিয়াছে, তাহাদের সকলের যেন এই বৎসর রুহ কবজ করিয়া লওয়া হয়। এখানে একজন লোক সাজ-সজ্জায় লাগিয়া রহিয়াছে, বিবাহ করার মধ্যে মশগুল রহিয়াছে, বাড়ী নির্মাণ করাইতেছে, অথচ সেইখানে মূর্দাদের তালিকায় নাম আসিয়া গিয়াছে। (দুররে মানসুর)

ইমাম গায়যালী (রহঃ) বলেন, এই অসহায় মানুষের উপর যদি কোন আপদ, কোন মুসীবত, কোন দুর্ঘটনা, কোন দুঃখ, কোন কষ্ট, কোন ক্লেশ, কোন ভয় কখনও নাও আসে, তবুও মৃত্যুর কঠিন অবস্থা, মৃত্যু যন্ত্রণা ও উহার আশংকা এমন বিষয়, যাহা তাহার সমস্ত স্বাদ মাটি করিয়া দিবার জন্য যথেষ্ট, তাহার সমস্ত আরাম-আয়েশকে শেষ করিয়া দিবার জন্য যথেষ্ট, উহার চিন্তা তাহার গাফলতিকে দূর করার জন্য অনেক যথেষ্ট। মৃত্যু স্বয়ং এত কঠিন যে, উহার চিন্তা ও উহার প্রস্তুতির মধ্যে সবসময় মানুষের মশগুল থাকা উচিত। বিশেষ করিয়া এইরূপ অবস্থায়—যখন জানা নাই যে, কখন আসিয়া চাপিয়া বসিবে।

জনৈক প্রজ্ঞাবান লোক বলেন, রশি অন্যের হাতে রহিয়াছে, জানা নাই কখন টানিয়া বসে।

হযরত লুকমান (আঃ) আপন পুত্রকে বলিয়াছেন, মৃত্যু এমন জিনিস, যাহার অবস্থা জানা নাই যে, কখন আসিয়া পড়ে। হঠাৎ আসিয়া যাওয়ার পূর্বেই উহার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়া লও। আর বাস্তবিকই বড় আশ্চর্যের কথা যে, মানুষ যদি চরম আনন্দের মধ্যে মশগুল থাকে, খেল-তামাশার উচ্চ মজলিসে শরীক থাকে আর এমনতাবস্থায় জানিতে পারে যে, একজন সিপাহী তাহাকে তালাশ করিতেছে ; (কোন অপরাধের শাস্তি হিসাবে) সে তাহাকে পাঁচটি বেত্রাঘাত করিবে, তখন সমস্ত আনন্দ উপভোগ আরাম-আয়েশ মাটি হইয়া যাইবে। (বরং যদি শুধু এতটুকুই জানিতে পারে যে, তাহার নিকট গ্রেফতারীর ওয়ারেন্ট রহিয়াছে ; আজকালের মধ্যেই সে তাহাকে গ্রেফতার করিয়া ফেলিবে, তবুও সমস্ত আনন্দ-উপভোগ খতম হইয়া যাইবে, রাত্রে ঘুম উড়িয়া যাইবে।) অথচ তাহার জানা আছে যে, মৃত্যুর ফেরেশতা সবসময় তাহার উপর নিযুক্ত রহিয়াছে। মৃত্যুর কঠোরতা (যাহা হাজার হাজার বেত্রাঘাত হইতে বেশী) তাহার উপর প্রয়োগ করিবে। তবুও সবসময় উহা হইতে গাফেল থাকে। ইহা মূর্খতা ও চরম ধোকা নয় তো আর কি? প্রকৃতপক্ষে, মৃত্যুর কঠোরতা সেই জানে, যাহার উপর উহা অতিবাহিত হইয়াছে।

অন্য কেহ উহার কঠোরতা বুঝিতে পারে না, শুধু অনুমান করিতে পারে। অথবা মৃত্যুমুখে পতিত লোকদের অবস্থা দেখিয়া কিছুটা আন্দাজ

করিতে পারে। আন্দাজ-অনুমান এইভাবেও হইতে পারে যেমন, ইহা সকলেই জানে যে, শরীরের যে অংশে রূহ থাকে না, উহাকে কাটিলে কষ্ট হয় না। (শরীরের যে চামড়া মরিয়া যায়, উহা কাটিলে কষ্ট হয় না ;) কিন্তু যেই অঙ্গে এবং যেই অংশে প্রাণ থাকে, উহাতে সুই ঢুকাইলে অথবা উহাকে কাটিলে ভীষণ কষ্ট হয়। কাজেই শরীরের কোন অংশ জখম হইলে অথবা কাটিয়া গেলে অথবা পুড়িয়া গেলে, উহাতে এই কারণে কষ্ট হয় যে, শরীরের এই অংশের সহিত রূহ ও জীবনের সম্পর্ক রহিয়াছে। উক্ত সম্পর্কের কারণে এই অঙ্গের মাধ্যমে রূহের উপর উহার প্রভাব পড়ে। আর যেহেতু রূহ সমস্ত শরীরে ছড়াইয়া রহিয়াছে, সেহেতু প্রত্যেক অঙ্গের সহিত উহার অনেক কম অংশের সম্পর্ক রহিয়াছে। কাজেই যে পরিমাণ সম্পর্ক ঐ অঙ্গের সহিত রহিয়াছে, সেই পরিমাণই রূহের কষ্ট হয়—যাহা অতি সামান্য। পক্ষান্তরে, যে কষ্ট সরাসরি সম্পূর্ণ রূহের মধ্যে পৌঁছে, যাহা মৃত্যুর সময় হয়—উক্ত বর্ণনার দ্বারাই উহার অনুমান হইয়া যায় যে, কি পরিমাণ কষ্ট হইবে ! কেননা, মৃত্যু সরাসরি সমস্ত রূহকে টানিয়া বাহির করে, যাহা শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে ছড়ানো রহিয়াছে। এইজন্যই শরীরের কোন অংশও এমন হয় না ; যাহার এতটুকু কষ্ট না হয়, যতটুকু উহাকে কাটিলে হয়। কারণ, কোন অঙ্গকে কাটিলে এই কারণে কষ্ট হয় যে, রূহ উহা হইতে পৃথক হইয়া যায়। আর যদি উহার মধ্যে রূহ না থাকে, তবে উহাকে কাটিলে বিন্দুমাত্রও কষ্ট হয় না। অতএব, যখন রূহের সামান্য অংশ ভিন্ন হওয়ার দ্বারা এত কষ্ট হয়, তখন সমস্ত রূহকে শরীরের সমস্ত অংশ হইতে যখন টানিয়া বাহির করা হইবে, তখন কি পরিমাণ কষ্ট হইবে—তাহা স্পষ্ট। কিন্তু শরীরের যদি একটি অংশ কাটা হয়, তবে রূহের অবশিষ্ট অংশ সমস্ত শরীরে বিদ্যমান থাকে ; উহা তখন শক্তিশালী থাকে। এইজন্য মানুষ চিৎকার করে, ছটফট করে। কিন্তু যখন সমস্ত রূহ টানিয়া বাহির করা হয়, তখন উহার মধ্যে দুর্বলতার কারণে এতটুকু শক্তি থাকে না যে, সে চিৎকার করিয়া কিছুটা আরাম লাভ করিবে। অবশ্য যদি শরীর শক্তিশালী হয়, তখন ঐ পরিমাণে শ্বাস উঠিবার সময় উহার মধ্যে আওয়াজ পয়দা হয়, যাহা শোনা যায়। শক্তি না থাকিলে উহাও হয় না। রূহ বাহির হইবার পর প্রত্যেক অঙ্গ আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হইতে শুরু করে। সর্বপ্রথম পা ঠাণ্ডা হয়, এইজন্য যে, রূহকে পায়ের দিক হইতে সর্বপ্রথম টানিয়া বাহির করা হয় এবং সেইখান হইতে বাহির হইয়া পরে মুখ দিয়া বাহির হয়। অতঃপর পায়ের গোছা ঠাণ্ডা হয়, অতঃপর বান, এমনভাবে এক একটা অঙ্গ ঠাণ্ডা হইতে থাকে এবং

প্রত্যেক অঙ্গের এই পরিমাণই কষ্ট হয়, যেই পরিমাণ উহাকে কটিলে হয়। অবশেষে যখন রুহ হলক (গলা) পর্যন্ত পৌঁছে, তখন চোখের আলো চালিয়া যাইতে থাকে। এই কারণেই হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়াসমূহের মধ্যে এই দোয়া রহিয়াছে যে, হে আল্লাহ! আমার উপর মৃত্যুর এবং মৃত্যু যাতনার কষ্ট আছান করিয়া দাও। লোকেরাও হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণে এই দোয়া করিয়া থাকে। কিন্তু উহার কষ্ট হইতে অজ্ঞ হওয়ার কারণে মামুলীভাবে দোয়া করিয়া লয়, এই কারণেই আশ্বিয়ায়ে কেরাম ও আল্লাহর ওলীগণ মৃত্যু সম্পর্কে অনেক বেশী ভয় করিতেন।

হযরত ঈসা (আঃ) আপন হাওয়ায়ীগণকে এরশাদ করিয়াছেন, আমার জন্য আল্লাহ তায়ালা নিকট এই দোয়া কর, যেন মৃত্যু যাতনা আমার উপর আছান হইয়া যায়। কেননা, মৃত্যুর ভয় আমাকে মৃত্যুর নিকটবর্তী করিয়া দিয়াছে।

বর্ণিত আছে, বনী ইসরাইলের আবেদ লোকদের একটি জামাত এক কবরস্থানে পৌঁছিল। তাহারা পরস্পর পরামর্শ করিল, আল্লাহ তায়ালা নিকট এই বিষয় দোয়া করা হউক যে, কবরবাসীদের মধ্য হইতে কোন মুর্দা বাহির হয়, যাহাকে আমরা জিজ্ঞাসা করিব যে, তোমাদের কি অবস্থা হইয়াছে? তাহারা দোয়া করিলেন। একজন মুর্দা তাহাদের সম্মুখে বাহির হইয়া আসিল। যাহার কপালে অধিক সেজদা করার দাগও পড়িয়াছিল। সে বলিতে লাগিল, তোমরা আমার নিকট কি জিজ্ঞাসা করিতে চাও? আমি মারা গিয়াছি ৫০ বৎসর হইয়া গিয়াছে কিন্তু মৃত্যুর সময়ের কষ্ট এখনও পর্যন্ত আমার শরীর হইতে যায় নাই।

এক হাদীসে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ রহিয়াছে, হে আল্লাহ! আপনি রুহকে রুগসমূহ হইতে, হাড়িসমূহ হইতে এবং অঙ্গুলীসমূহ হইতে বাহির করেন। আমার উপর মৃত্যুর কষ্ট সহজ করিয়া দিন।

হযরত হাসান (রাযিঃ) বলেন, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার মৃত্যুর কঠোরতা সম্পর্কে আলোচনা করিলেন এবং এরশাদ করিলেন, তিন শত জায়গায় তরবারির আঘাতে যে পরিমাণ কষ্ট হয়, সেই পরিমাণ কষ্ট হয়।

হযরত আলী (রাযিঃ) যখন জিহাদের জন্য উৎসাহিত করিতেন তখন বলিতেন, যদি তোমরা শহীদ না হও, তবে বিছানায় মরিবে। ঐ সত্তার কসম, যাহার হাতে আমার প্রাণ, হাজার জায়গায় তলোয়ারের আঘাত

অপেক্ষা মৃত্যুর কষ্ট বেশী কঠিন।

আওয়ামী (রহঃ) বলেন, আমাদের নিকট এই কথা পৌঁছিয়াছে যে, কিয়ামতের ময়দানে উঠা পর্যন্ত মৃত ব্যক্তিদের মৃত্যুর কষ্ট অনুভব হইতে থাকে।

হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস (রহঃ) বলেন, মউত দুনিয়া ও আখেরাতের সমস্ত কষ্ট হইতে বেশী কঠিন। উহা কবাত দ্বারা চিরিয়া ফেলা অপেক্ষা অধিক কঠিন। উহা কাঁচি দ্বারা চামড়া কাটিয়া দেওয়া অপেক্ষা অধিক কঠিন। উহা ডেকচির মধ্যে পাকাইয়া দেওয়া হইতে বেশী কঠিন। যদি মূর্দা কবর হইতে উঠিয়া মউতের কষ্ট বর্ণনা করে, তবে কোন ব্যক্তিই দুনিয়াতে সুখময় জীবন যাপন করিতে পারিবে না। আরামে ঘুমাইতে পারিবে না।

বর্ণিত আছে যে, হযরত মূসা (আঃ) এর যখন ইন্তেকাল হইল, তখন আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞাসা করিলেন, মৃত্যুকে কেমন পাইয়াছ? তিনি আরজ করিলেন, আমি আমার প্রাণকে এমন দেখিতেছিলাম, যেমন জীবন্ত পাখিকে এমনভাবে আগুনে ভুনা করা হইতেছে যে, না উহার প্রাণ বাহির হইতেছে, না উহার উড়িয়া বাইবার কোন সুযোগ আছে। অন্য এক রেওয়াযাতে আছে, এমন অবস্থা ছিল, যেন জীবন্ত বকরীর চামড়া ছিলা হইতেছে।

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, যখন হযরত সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল হইতেছিল, তখন পানি ভর্তি পিয়ালার হযরত সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট রাখা ছিল। হযরত সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারবার আপন মুবারক হাত পেয়ালার মধ্যে রাখিতেছিলেন এবং মুখের উপর মলিতেছিলেন আর বলিতেছিলেন, ইয়া আল্লাহ! মৃত্যুর কষ্টে আমার সাহায্য করুন।

হযরত ওমর (রাযিঃ) হযরত কা'ব (রহঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, মৃত্যুর অবস্থা বর্ণনা কর। তিনি আরজ করিলেন, হে আমীরুল মুমেনীন! যেমন একটি কাঁটায়ুক্ত ডালকে এমনভাবে মানুষের ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়; যাহাতে শরীরের প্রত্যেকটা অংশ উহার সহিত জড়াইয়া যায়, অতঃপর হঠাৎ উহাকে টানিয়া বাহির করা হয়। তদ্রূপ রূহকে টানিয়া বাহির করা হয়।

এই সমস্ত হইল, মৃত্যু কষ্টের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। ইহা ছাড়াও মৃত্যুর ফেরেশতা এবং তাহার সাহায্যকারী ফেরেশতাগণের ভয়ানক আকৃতি একটি স্বতন্ত্র ব্যাপার। যেইরূপ ভয়ানক আকৃতি লইয়া গুনাহগারদের জ্ঞান

বাহির করে; অত্যন্ত শক্তিশালী মানুষও উহা দেখিবার ক্ষমতা রাখে না।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) মালাকুল মউতকে বলিলেন, তুমি যে আকৃতি লইয়া গুনাহগারদের জান বাহির কর উহা আমাকে দেখাও। তিনি আরজ করিলেন, আপনি উহা সহ্য করিতে পারিবেন না। হযরত ইবরাহীম (আঃ) বলিলেন, না, আমি সহ্য করিয়া লইব। হযরত আজরাঈল (আঃ) আরজ করিলেন, আচ্ছা অন্য দিকে মুখ করুন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) ফিরিলেন। অতঃপর হযরত আজরাঈল (আঃ) আরজ করিলেন, এখন দেখুন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) যখন উপরের দিকে তাকাইলেন, তখন দেখিলেন (দানব আকৃতির) একজন অত্যন্ত কালো মানুষ, চুলগুলি অনেক লম্বা ও খাড়া, ভীষণ দুর্গন্ধ, কালো পোশাক পরিহিত, তাহার মুখ ও নাক হইতে আগুনের শিখা বাহির হইতেছে। হযরত ইবরাহীম (আঃ) এই অবস্থা দেখিয়া বেঁহঁশ হইয়া গেলেন। দীর্ঘ সময় পর হুঁশ হইল। তখন মালাকুল-মউত পূর্বের আকৃতি ধারণ করিয়াছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) বলিলেন, যদি গুনাহগার ব্যক্তির জন্য অন্য কোন মুসীবত না থাকে, তবুও এই আকৃতিই তাহার মুসীবতের জন্য যথেষ্ট। ইহা হইল, গুনাহগারদের অবস্থা। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার অনুগত বান্দাদের রূহ বাহির করিবার সময় তিনি অত্যন্ত ভাল আকৃতি ধারণ করিয়া থাকেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) হইতেই বর্ণিত আছে যে, তিনি মালাকুল-মউতকে বলিলেন, আমাকে ঐ আকৃতিও দেখাও। তখন তিনি দেখিলেন, একজন অত্যন্ত সুশ্রী যুবক অত্যন্ত উৎকৃষ্ট পোশাক পরিহিত খুশবু ছড়াইয়া সামনে উপস্থিত রহিয়াছে। হযরত ইবরাহীম (আঃ) বলিলেন, যদি মুমিনের জন্য মৃত্যুর সময় এই আকৃতি ছাড়া আর কোন আনন্দের জিনিস না থাকে, তবে ইহাই যথেষ্ট।

এক হাদীসে আছে, আল্লাহ তায়ালা যখন কোন বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন, তখন মালাকুল-মউতকে বলেন, অমুক বান্দার রূহ লইয়া আস, আমি তাহাকে আরাম পৌঁছাইব। তাহার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। আমি যেমন চাহিতাম, সে তেমনই সফলকাম হইয়াছে। মালাকুল-মউত তাহার নিকট আসেন এবং তাহার সহিত পাঁচশত ফেরেশতা থাকে। তাহাদের মধ্য হইতে প্রত্যেক ফেরেশতা সেই ব্যক্তিকে এমন একটি সুসংবাদ ও আনন্দের খবর দেয়, যাহা অন্যরা দেয় নাই। তাহাদের নিকট রামহান ফুলের ডাল এবং জাফরানের শিকড় থাকে। ঐ সকল ফেরেশতা দুই কাতারে সারিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া যায়। যখন ইবলীস এই দৃশ্য দেখে, তখন নিজের মাথা ধরিয়া কান্নাকাটি ও চিৎকার শুরু করিয়া দেয়। তাহার

সাজ-পাজরা দৌড়াইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করে, মনিব! কি হইয়াছে? সে বলে, ওহে কমবখতরা! দেখিতেছিস না, ইহা কি হইতেছে? তোরা কোথায় মরিয়া গিয়াছিলি? তাহারা বলে, হে আমাদের সর্দার! আমরা তো অনেক চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু এই ব্যক্তি গুনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকিয়াছে।

হযরত জাবের ইবনে যিয়াদ (রাযিঃ)এর যখন ইন্তেকালের সময় নিকটবর্তী হইল, তখন কেহ জিজ্ঞাসা করিল, কোন জিনিসের প্রতি আগ্রহ আছে কি? বলিলেন, হযরত হাসানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চাই। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) তশরীফ আনিলেন। লোকেরা বলিল, হাসান আসিয়া গিয়াছেন। তখন হযরত জাবের (রাযিঃ) বলিতে লাগিলেন, ভাই! ইহা বিদায়ের সময়, এখন যাইতেছি। জানা নাই, জান্নাতের দিকে যাইব, না জাহান্নামের দিকে। (এহইয়া)

হযরত তামীম দারী (রাযিঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালা মালাকুল-মউতকে বলেন, আমার অমুক ওলীর নিকট যাও এবং তাহার রূহ লইয়া আস। আমি তাহাকে আনন্দ ও দুঃখ—উভয় অবস্থাতেই পরীক্ষা লইয়াছি। সে সেইরূপ সফলকাম হইয়াছে, যে রূপ আমি চাহিতাম। তাহাকে লইয়া আস যাহাতে দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট হইতে তাহার আরাম হইয়া যায়। মালাকুল-মউত পাঁচশত ফেরেশতার জামাআত লইয়া তাহার নিকট আসেন। তাহাদের সকলের নিকট জান্নাতের কাফন থাকে। তাহাদের হাতে রায়হানের ফুলের তোড়া থাকে। প্রত্যেকটি তোড়ার মধ্যে বিশটি রং থাকে, প্রত্যেক রংয়ে ভিন্ন সুগন্ধি থাকে এবং একটি সাদা রেশমী রুম্মালে মেশকের সুগন্ধি থাকে। মালাকুল-মউত তাহার শিয়রে বসেন। অন্যান্য ফেরেশতারা তাহাকে চতুর্দিক হইতে ঘিরিয়া লয়। তাহার প্রত্যেক অঙ্গের উপর নিজেদের হাত রাখে। আর মেশকযুক্ত রুম্মালটি তাহার খুতনির নিচে রাখে। জান্নাতের দরজা তাহার দৃষ্টির সম্মুখে খুলিয়া দেয়। জান্নাতের নতুন নতুন জিনিস দ্বারা তাহার মন ভুলানো হয়, যেমন বাচ্চাকে কান্নাকাটি করার সময় ঘরের লোকেরা বিভিন্ন জিনিস দ্বারা তাহার মন ভুলাইয়া থাকে। কখনও জান্নাতের হুরদিগকে সম্মুখে আনা হয়, কখনও সেখানকার ফল, কখনও সুন্দর সুন্দর পোশাক-পরিচ্ছদ, মোটকথা বিভিন্ন জিনিস তাহার সম্মুখে আনা হয়। তাহার হুরগণ (স্ত্রীগণ) আনন্দে লাফাইতে শুরু করে। এইসব দৃশ্য দেখিয়া তাহার রূহ শরীরের মধ্যে ছটফট করিতে আরম্ভ করে (যেমন পিঞ্জরায় বন্দী প্রাণী বাহির হওয়ার জন্য ছটফট করে)। মালাকুল-মউত তাহাকে বলেন, হে মুবারক রূহ! চল এমন কুলবৃক্ষের দিকে; যাহার মধ্যে কাঁটা নাই, এমন কলাসমূহের দিকে,

যাহা স্তরে স্তরে লাগিয়া রহিয়াছে এবং এমন ছায়ার দিকে ; যাহা অত্যন্ত ঘন সুবিস্তৃত এবং পানি প্রবাহিত হইতেছে। (এই কয়েকটি দৃশ্য কুরআন পাকের সূরা 'ওয়াকেরা'র এই আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে : **فِي سِدْرٍ مِّنْ دُونِ مَّحْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ** আর মলাকুল মউত এমন নম্রভাবে কথা বলেন, যেমন মা তাহার সন্তানের সহিত বলে। কারণ, সে জানে যে,, তাহার এই বিষয় জানা আছে যে, এই রূহ আল্লাহ তায়ালায় নৈকট্যপ্রাপ্ত। সে এই রূহের সহিত নম্র আচরণ করে, যাহাতে আল্লাহ তায়ালা উক্ত ফেরেশতার প্রতি সন্তুষ্ট হন। ঐ রূহ শরীর হইতে এমন সহজে বাহির হয়, যেমন আটার ভিতর হইতে চুল বাহির হইয়া যায়। যখন রূহ বাহির হয়, তখন ফেরেশতারা তাহাকে সালাম করে এবং জাম্মাতে দাখেল হওয়ার সুসংবাদ দান করে। যাহা কুরআন পাকের এই আয়াতে (নাহল : ৩২) উল্লেখ করা হইয়াছে : **الَّذِينَ تَتَوَفَّيهِمُ الْمَلَائِكَةُ** আর যদি সে নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের মধ্যে হয়, তবে সূরা 'ওয়াকেরা'তে তাহার সম্পর্কে এরশাদ হইয়াছে : **فَرُوحٌ وَرُيْحَانٌ** সুতরাং রূহ যখন শরীর হইতে পৃথক হয়, তখন সে শরীরকে বলে, আল্লাহ তায়ালা তোমাকে উত্তম বদলা দান করুন। তুমি আল্লাহ তায়ালায় বন্দেগী এবং আনুগত্যের ব্যাপারে দ্রুত চলিতে ছিলে, তাহার নাফরমানীর ব্যাপারে শিথিলতা করিতে, তোমার জন্য আজকের দিন মুবারক হউক। তুমি নিজেও আযাব হইতে নাজাত পাইয়াছ এবং আমাকেও নাজাত দিয়াছ। এই একই কথা বিদায় কালে শরীর রূহকে বলিয়া থাকে। তাহার বিচ্ছেদের কারণে জমিনের ঐ অংশ কাঁদিতে থাকে, যাহার উপর সে অধিকাংশ সময় এবাদত করিত। আসমানের ঐ দরজাসমূহ কাঁদে, যাহার মাধ্যমে তাহার আমলসমূহ উপরে গমন করিত এবং তাহার রিযিক অবতরণ করিত। অতঃপর সেই পাঁচশত ফেরেশতা মৃত ব্যক্তির নিকট জমা হইয়া যায়। যখন গোসলদাতাগণ তাহাকে কাত করায়, তখন ফেরেশতাও সাথে সাথে তাহাকে কাত করাইয়া দেয়। যখন তাহারা কাফন পরিধান করায়, তখন ফেরেশতারা উহার পূর্বেই তাহাদের আনীত কাফন পরাইয়া দেয়। যখন তাহারা খুশবু মাখে, তখন ফেরেশতারা উহার পূর্বেই তাহাদের আনীত খুশবু মাখাইয়া দেয়। অতঃপর তাহারা মৃত ব্যক্তির দরজা হইতে কবর পর্যন্ত দুইদিকে সারিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া যায় এবং তাহার জানাযাকে দোয়া ও এস্তেগফারের সহিত অভ্যর্থনা জানায়। এইসব দৃশ্য দেখিয়া শয়তান এত জোরে কাঁদিতে থাকে যে, তাহার হাড়গুলি ভাঙ্গিয়া যাওয়ার উপক্রম হয় এবং নিজের দল-বলকে বলে,

তোদের সর্বনাশ হউক। এই লোকটি তোদের হাত হইতে কিভাবে ছুটিয়া গেল। তাহারা বলে, এই ব্যক্তি নিষ্পাপ ছিল। অতঃপর হযরত মালাকুল-মউত তাহার রূহ লইয়া উপরে চলিয়া যান। তখন হযরত জিবরাসীল (আঃ) সত্তর হাজার ফেরেশতা সহকারে তাহার অভ্যর্থনা করেন। ফেরেশতাগণ তাহাকে আল্লাহ তায়ালা পক্ষ হইতে সুসংবাদ দেন। ইহার পর যখন মালাকুল-মউত (আঃ) উহাকে আরশ পর্যন্ত লইয়া যান, তখন সেখানে পৌঁছিয়া রূহ সেজদায় পড়িয়া যায়। আল্লাহ তায়ালা তখন এরশাদ করেন, আমার বান্দার রূহকে **سِدْرٌ مَّخْضُودٌ وَطَلْعٌ مَّنْضُودٌ** এর মধ্যে পৌঁছাইয়া দাও। যখন তাহার লাশ কবরে রাখা হয়, তখন তাহার নামায তাহার ডান দিকে আসিয়া দাঁড়াইয়া যায়। রোযা বামদিকে দাঁড়াইয়া যায়। কুরআন পাকের তেলাওয়াত ও আল্লাহর যিকির মাথার দিকে দাঁড়াইয়া যায়। আর জামাতে নামায পড়ার জন্য যে কদম চলিয়াছে, উহা পায়ের দিকে দাঁড়াইয়া যায় এবং (মুসীবতের উপর ও গুনাহের ব্যাপারে) ছবর কবরের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া যায়। অতঃপর আযাব উক্ত কবরের মধ্যে নিজের ঘাড় বাহির করে এবং মূর্দা পর্যন্ত পৌঁছিতে চেষ্টা করে ; কিন্তু সে যদি ডানদিক হইতে আসে, তবে নামায তাহাকে বলে, সরিয়া যাও, আল্লাহর কসম এই ব্যক্তি দুনিয়াতে অনবরত কষ্ট করিয়াছে, এখন একটু আরামে ঘুমাইয়াছে। অতঃপর সে বামদিক হইতে আসে। তখন রোযা ঐভাবেই তাহাকে সরাইয়া দেয়। অতঃপর সে মাথার দিক হইতে আসে। তখন তেলাওয়াত ও যিকির তাহাকে বাধা দেয় এবং বলে, এইদিকে তোমার রাস্তা নাই। মোটকথা, আযাব যেইদিক হইতেই আসিতে চায়, সে রাস্তা পায় না। কারণ, আল্লাহর ওলীকে প্রত্যেক দিক হইতে এবাদতসমূহ ঘিরিয়া রাখিয়াছে। অতএব, আযাব অপারগ হইয়া ফিরিয়া চলিয়া যায়। অতঃপর ছবর ; যাহা এক কোণে দাঁড়াইয়া ছিল ; এই এবাদতসমূহকে বলে, আমি এই অপেক্ষায় ছিলাম যে, যদি কোন একদিকে (এবাদতের কোন প্রকার) দুর্বলতা থাকে, তবে আমি ঐ দিক হইতে মুকাবিলা করিব। কিন্তু আল-হামদুলিল্লাহ তোমরা সকলে মিলিয়া উহাকে বাধা দিয়াছ। এখন আমি (আমল) ওজন করিবার সময় তাহার কাজে আসিব। অতঃপর দুইজন ফেরেশতা সেই মূর্দার নিকট আসে, যাহাদের চক্ষুগুলি বিজলীর ন্যায় চমকিতে থাকে এবং আওয়াজ মেঘের প্রচণ্ড গর্জনের ন্যায়, তাহাদের দাঁতের অগ্রভাগ গরুর শিংয়ের ন্যায়। তাহাদের মুখ হইতে নিঃশ্বাসের সহিত আগুনের শিখা বাহির হইতে থাকে। চুল এত লম্বা যে, পা পর্যন্ত ঝুলিয়া থাকে। তাহাদের এক কাঁধ

হইতে অপর কাঁধ পর্যন্ত এই পরিমাণ দূরত্ব যে, কয়েক দিন চলিলে উহা শেষ হইবে। দয়া ও নম্রতা যেন তাহাদের নিকট দিয়াও ঘেঁষে নাই (তবে মুমেনদের সহিত কঠোর ব্যবহার করে না ; কিন্তু ভয়ানক আকৃতিই বা কম কি!)। তাহাদিগকে মুনকার-নকীর বলা হয়। তাহাদের প্রত্যেকের হাতে একটি করিয়া এত বড় ও ভারী মুগুর থাকে, যদি সমস্ত দুনিয়ার মানুষ ও জ্বিন একত্র হইয়া উঠাইতে চায়, তবুও তাহারা উঠাইতে পারিবে না। তাহারা আসিয়া মূর্দাকে বলে, বসিয়া যাও। মূর্দা তৎক্ষণাৎ বসিয়া যায় এবং কাফন তাহার মাথা হইতে নীচে পাহা পর্যন্ত আসিয়া যায়। তাহারা প্রশ্ন করে, তোমার পালনকর্তা কে? তোমার ধর্ম কি? তোমার নবীর নাম কি? মূর্দা বলে, আমার পালনকর্তা আল্লাহ জাঙ্গা শানুহ, যিনি ওয়াদাহ্ লা শারীকালাহ্ (তিনি একচ্ছত্র মালিক, কেহ তাহার শরীক নাই), আমার ধর্ম ইসলাম। আমার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যিনি সর্বশেষ নবী। তাহারা দুইজন বলেন, তুমি ঠিক বলিয়াছ। অতঃপর তাহারা কবরের দেওয়ালগুলিকে চতুর্দিক হইতে সরাইয়া দেয়। যদ্রুণ উহা উপর দিক হইতে এবং চতুর্দিক অর্থাৎ ডান, বাম, শিয়র এবং পায়ের দিক হইতে অনেক বেশী প্রশস্ত হইয়া যায়। তারপর তাহারা বলেন, উপরের দিকে মাথা উঠাও। মূর্দা যখন মাথা উঠায়, তখন একটি দরজা দেখিতে পায়। যাহার ভিতর দিয়া জান্নাত দৃষ্টিগোচর হয়। তাহারা বলে, হে আল্লাহর ওলী! ঐ জায়গা তোমার বাসস্থান। কারণ, তুমি আল্লাহ তায়ালাকে মানিয়া চলিয়াছ। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ঐ পাক ঘাতের কসম! যাহার হাতে আমার জ্ঞান, তখন ঐ ব্যক্তির এমন আনন্দ হয় ; যাহা কখনও শেষ হইবে না। অতঃপর এই ফেরেশতাগণ বলেন, তোমার পায়ের দিকে দেখ। সে দেখে, সেদিকে জাহান্নামের একটি দরজা দৃষ্টিগোচর হয়। (যাহার মাধ্যমে জাহান্নামের অবস্থা দেখা যায়)। ফেরেশতাগণ বলেন, হে আল্লাহর ওলী, তুমি এই দরজা হইতে নাজাত পাইয়াছ। এই সময়ও মূর্দার এত বেশী আনন্দ হয়, যাহা কখনও শেষ হইবে না। অতঃপর কবরের মধ্যে সাতাত্তরটি দরজা জান্নাতের দিকে খুলিয়া যায়। উহার মাধ্যমে জান্নাতের ঠাণ্ডা হাওয়া এবং খুশবু আসিতে থাকে, আর কিয়ামত পর্যন্ত এই দৃশ্য বাকী থাকিবে।

(এখন অপরজনের অবস্থা শোন) আল্লাহ তায়ালা মালাকুল-মউতকে বলেন, আমার দূশমনের নিকট যাও এবং তাহার জ্ঞান বাহির করিয়া আন। আমি তাহাকে সব রকমের সচ্ছলতা দিয়াছি। আমি (দুনিয়াতে চতুর্দিক হইতে) আমার নেয়ামতসমূহ তাহার উপর ঢালিয়া দিয়াছি। কিন্তু

সে আমার নাফরমানী হইতে বিরত হয় নাই। লইয়া আস ; আজ তাহাকে শাস্তি দিব। মালাকুল-মউত অত্যন্ত ভয়ানক আকৃতি লইয়া তাহার নিকট আসেন। তাহার বারটি চক্ষু হয়, তাহার নিকট জাহান্নামের আগুনের তৈরী কাঁটায়ুক্ত একটি (লোহার মোটা) গুর্জ থাকে। সঙ্গে পাঁচশত ফেরেশতা থাকে, তাহাদের নিকট আমার একটি টুকরা থাকে এবং হাতে জাহান্নামের আগুনের বড় বড় অঙ্গার ও আগুনের জ্বলন্ত চাবুক থাকে। মালাকুল-মউত আসিয়া ঐ গুর্জটি তাহার উপর মারেন। যদকুন উহার কাঁটাগুলি তাহার শিরা-উপশিরার ভিতরে ঢুকিয়া যায়। অতঃপর মালাকুল-মউত উহাকে টানিতে থাকেন। অন্যান্য ফেরেশতারা চাবুক দ্বারা তাহার মুখে এবং পাছায় মারিতে আরম্ভ করে। ইহাতে মূর্দা বেহঁশ হইতে থাকে। মালাকুল-মউত তাহার রূহকে পায়ের আগুলগুলি হইতে বাহির করিয়া গোড়ালীর মধ্যে আটকাইয়া দেন এবং মারিতে থাকেন। আবার গোড়ালী হইতে বাহির করিয়া হাঁটুর মধ্যে আটকাইয়া দেন। আবার সেইখান হইতে বাহির করিয়া (স্থানে স্থানে আটকাইয়া দীর্ঘসময় পর্যন্ত কষ্ট দেওয়া হয়) পেটের মধ্যে আটকাইয়া দেন। অতঃপর সেইখান হইতে টানিয়া সিনার মধ্যে আটকাইয়া দেন। তারপর ফেরেশতাগণ সেই আমার টুকরা ও জাহান্নামের অঙ্গারগুলি তাহার খুত্নীর নিচে রাখিয়া দেন। আর মালাকুল-মউত (আঃ) বলেন, হে অভিশপ্ত রূহ! বাহির হও এবং ঐ জাহান্নামের দিকে চল। যাহার বর্ণনা (কুরআন পাকের সূরা ওয়াকেয়ার দ্বিতীয় রুকুর) এই আয়াতে **فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ** দেওয়া হইয়াছে। যাহার তরজমা এই যে, তাহারা আগুন ও ফুটন্ত পানির মধ্যে থাকিবে আর কালো ধোঁয়ার ছায়ার মধ্যে থাকিবে ; যাহা না শীতল হইবে, না আরামদায়ক হইবে (বরং অত্যন্ত কষ্টদায়ক হইবে)। অতঃপর যখন তাহার রূহ শরীর হইতে বিদায় হয়, তখন সে শরীরকে বলে, আল্লাহ তায়ালা তোমাকে মন্দ বদলা দান করুন, তুমি আমাকে আল্লাহর নাফরমানীর দিকে দ্রুত লইয়া যাইতে এবং তাহার আনুগত্যের প্রতি শিথিলতা করিতে। তুমি নিজেও ধ্বংস হইয়াছ এবং আমাকেও ধ্বংস করিয়াছ। এমনিভাবে শরীরও রূহকে বলে। আর জমিনের ঐ সমস্ত অংশ ; যাহার উপর সে আল্লাহর নাফরমানী করিত, তাহাকে অভিশাপ দেয়। আর শয়তানের দল-বল দৌড়াইয়া তাহাদের সর্দার ইবলিসের নিকট যাইয়া সুসংবাদ শোনায় যে, একজন মানুষকে জাহান্নাম পর্যন্ত পৌছাইয়া দিয়াছি। অতঃপর যখন তাহাকে কবরে রাখা হয়, তখন জমিন তাহার উপর এত সংকীর্ণ হইয়া যায় যে, তাহার পাঁজরের হাড়গুলি একটি অন্যটির মধ্যে

চুকিয়া যায়। অতঃপর তাহার উপর কালো সাপ নিযুক্ত হইয়া যায়। সে তাহার নাক ও পায়ের বৃদ্ধাস্থলি হইতে দংশন করিতে আরম্ভ করে। এইভাবে উভয় দিকের সাপ মাঝখানে আসিয়া মিলিত হয়। অতঃপর তাহার নিকট দুইজন ফেরেশতা (মুনকার নকীর) যাহাদের অবস্থা কিছু পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।) আসেন এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার রব কে? তোমার দ্বীন কি? তোমার নবী কে? সে প্রত্যেক প্রশ্নের জবাবে অজ্ঞতা প্রকাশ করে। উত্তর শুনিয়া তাহাকে গুর্জ দ্বারা এত জোরে আঘাত করেন যে, ঐ গুর্জের স্ফুলিঙ্গসমূহ কবরের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। অতঃপর তাহাকে বলেন, উপরের দিকে দেখ। সে উপরের দিকে জাহান্নামের খোলা দরজা দেখিতে পায়। (সেখানের বাগ-বাগিচা দেখিতে পায়) ফেরেশতাগণ তাহাকে বলেন, হে আল্লাহর দূশমন! যদি তুই আল্লাহর হুকুম মানিয়া চলিতি, তবে এই তোরা ঠিকানা হইত। হযূর সাব্বান্নাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ঐ যাতের কসম! যাহার হাতে আমার জ্ঞান। তখন তাহার এত আফসোস হয় যে, এইরূপ আফসোস কখনও হইবে না। অতঃপর দোষখের দরজা খোলা হয় এবং ফেরেশতাগণ বলেন, ওহে আল্লাহর দূশমন! এখন এইখানে তোরা ঠিকানা। কারণ, তুই আল্লাহ তায়ালার নাফরমানী করিয়াছিস। অতঃপর জাহান্নামের সাতাস্তরটি দরজা তাহার কবরের মধ্যে খুলিয়া দেওয়া হয়। উহার মধ্য দিয়া কিয়ামত পর্যন্ত গরম বাতাস এবং ধোয়া ইত্যাদি আসিতে থাকে।

মুহাদ্দিসগণ এই হাদীসের উপর সনদের দিক দিয়া কিছু মতবিরোধ রাখেন ; কিন্তু উক্ত হাদীসের বিষয়বস্তুর পক্ষে সমর্থন পাওয়া যায়। (এতহাফ) বিশেষ করিয়া হযরত বারা ইবনে আযেব ও হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ)এর রেওয়ায়াতসমূহ দ্বারা ; যাহা মিশকাত শরীফের 'জানাযা' অধ্যায়ে এবং 'কবর আযাবের প্রমাণ' অধ্যায়ে রহিয়াছে। যদি কেহ সেইগুলির তরজমা দেখিতে চায়, তবে 'মাজাহেরে হক' কিতাবে দেখা যাইতে পারে।

কবরের অবস্থা সম্পর্কে উল্লেখিত দৃশ্যটি অধিক পরিমাণে দৃষ্টির সামনে রাখা উচিত। কেননা, অত্যন্ত ভয়ানক দৃশ্য। হাদীস শরীফে এই সমস্ত ঘটনাবলী অনেক বেশী পরিমাণে উল্লেখ করা হইয়াছে। সংক্ষেপ করার জন্য শুধু একটি হাদীসেরই তরজমা লেখা হইল।

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, কবরবাসীদের মধ্য হইতে গুনাহগারদের জন্য কবরে ধ্বংস রহিয়াছে। কেননা, তাহাদের উপর কালো সাপ নিযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। একটি পায়ের দিক হইতে আর একটি

মাথার দিক হইতে দংশন করিতে করিতে মাঝখানে আসিয়া উভয়ে মিলিত হয়। ইহাই ঐ বরযাখের আযাব ; যাহা কুরআন পাকে (মুহিনুন : ১০০) وَمِنْ وَّرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ এই কারণেই হযরত উসমান (রাযিঃ) যখন কবরের আলোচনা করিতেন, তখন এত কাঁদিতেন যে, দাড়ি মোবারক ভিজিয়া যাইত। যেমন উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই জন্যই হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়াসমূহের মধ্যে অনেক বেশী পরিমাণে কবর-আযাব হইতে পানাহ চাওয়া হইয়াছে। যাহাতে মানুষ বেশী বেশী এই দোয়া করে। নতুবা হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো নিজে নিষ্পাপ ছিলেন। আর এই কারণেই হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ রহিয়াছে, যাহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, তোমরা ভয়ের কারণে মূর্দাদিগকে দাফন করা ছাড়িয়া দিবে ; নতুবা আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করিতাম ; যেন তোমাদিগকে কবরের আযাব শুনাইয়া দেন।

আর এই সমস্ত কিছু যাহা বর্ণনা করা হইয়াছে, উহা ইনসাফেরও দাবী। কারণ, মানুষকে এই জগতে শুধু আল্লাহ তায়ালার ইবাদতের জন্য পাঠান হইয়াছিল। আল্লাহ তায়ালার কুরআন পাকে জান ও মাল সংক্রান্ত তাহার সর্বপ্রকার অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করিয়া ইহা বলিয়াও দিয়াছিলেন যে, তোমাদিগকে এই জগতে শুধু ইবাদতের জন্য পাঠান হইতেছে। যেমন এরশাদ হইয়াছে : وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (যারিয়াত : ৫৬) আর এই ব্যাপারেও সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন যে, জিন্দেগী শুধু পরীক্ষা করিবার জন্য দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ, আমার এই সকল অনুগ্রহের মোকাবিলায় তোমরা কি করিয়াছ?

আর মৃত্যু হইল, ঐ পরীক্ষার ফলাফল শুনাইবার জন্য। এরশাদ হইতেছে : تَبَرَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي : অর্থাৎ, তিনি (আল্লাহ তায়ালার) উচ্চ মর্যাদাশালী যাহার আয়ত্তে রহিয়াছে সমস্ত রাজত্ব, তিনি সর্ব বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান, যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করিয়াছেন। যেন তোমাদিগকে পরীক্ষা করেন যে, তোমাদের মধ্যে কে বেশী ভাল আমল করে। (মূলক : ১-২) আর যেহেতু এই দুনিয়া পরীক্ষার জায়গা, জিন ও মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য শুধু এবাদত, আর দুনিয়ার যত স্বাদ, আরাম-আয়েশ ও আসবাব দেওয়া হইয়াছে উহা শুধু এইজন্য দেওয়া হইয়াছে যে, নিজের প্রয়োজন পরিমাণ উহা দ্বারা উপকৃত হইবে

এবং ন্যূনতম পর্যায়ে প্রয়োজন মিটাইবার পর যাহা কিছু বাঁচিবে উহা নিজের উপকারার্থে এবং ভবিষ্যতে নিজের কাজে আসিবার লক্ষ্যে আল্লাহ তায়ালাব খাজানায় জমা করিয়া দিবে, সেহেতু ইহা কি পরিমাণ গাফলতি, আফসোস ও লোকসানের বিষয় যে, আমরা দুনিয়ার এই সবকিছুর মধ্যে লাগিয়া আল্লাহ তায়ালাব হুকুমসমূহকেও ভুলিয়া যাই এবং এই বিষয় হইতেও চক্ষু বন্ধ করিয়া লই যে, আমরা কেন আসিয়াছিলাম, এই সবকিছু আমাদেরকে কেন দেওয়া হইয়াছিল আর আমরা কিসের মধ্যে লাগিয়া গেলাম? আর প্রকৃত আফসোস তো ঐ সময় হয়, যখন অত্যন্ত মেহনত ও পরিশ্রম করিয়া কামাই করা এবং নিজের উপর খরচ কামাইয়া জমা করা এই অগণিত সম্পদ অন্যদের জন্য ছাড়িয়া নিজে খালি হাতে এই জগত হইতে হঠাৎ করিয়া চলিয়া যাইতে হয়। যদি আমাদের মধ্যে সামান্যতম বিবেক-বুদ্ধিও থাকে, তবে কিছু সময় একেবারে একান্ত নির্জন ঘরে বসিয়া এই কথা গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত যে, যদি এই মুহূর্তে মলাকুল-মউত আসিয়া যায়, তবে আমার কি অবস্থা হইবে এবং আমার এই ধন-সম্পদেরই বা কি হইবে। যাহা আমি বহু বৎসরের মেহনতে কামাই করিয়াছি ও সংগ্রহ করিয়াছি।

হযরত ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বহ (রহঃ) বলেন, এক বাদশাহ ছিল। একবার তাহার নিজের রাজত্ব ভ্রমণ করার এবং অবস্থা জানার ইচ্ছা হইল। অতএব সে শাহী পোশাক চাহিয়া পাঠাইল। এক জোড়া আনা হইল, উহা তাহার পছন্দ হইল না। দ্বিতীয় জোড়া আনা হইল। এইভাবে বারবার বদলাইয়া আনার পর অত্যন্ত পছন্দনীয় জোড়া পরিধান করিয়া আরোহণের জন্য সওয়ারী চাহিয়া পাঠাইল। একটি উৎকৃষ্ট ঘোড়া আনা হইল, উহা পছন্দ হইল না। উহা ফেরত দিয়া দ্বিতীয়টি, তৃতীয়টি আনা হইল। যখন উহাও পছন্দ হইল না, তখন সমস্ত ঘোড়া সামনে আনা হইল। উহার মধ্য হইতে শ্রেষ্ঠ ঘোড়াটি পছন্দ করিয়া উহার উপর সওয়ার হইল। বিতাড়িত শয়তান তখন তাহার ভিতর আরও বেশী অহংকার ভরিয়া দিল। অত্যন্ত অহংকারভরে সে ঘোড়ায় সওয়ার হইল। চাকর-নকর, পাইক-পেয়াদা সঙ্গে চলিল। কিন্তু অহংকারের কারণে বাদশাহ তাহাদের প্রতি তাকাইতেও পছন্দ করিতেছিল না। পথ চলিতে চলিতে অত্যন্ত জীর্ণ-শীর্ণ পুরাতন পোশাক পরিহিত একজন লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। লোকটি সালাম করিল। বাদশাহ অক্ষিপই করিল না। লোকটি ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া ফেলিল। বাদশাহ তাহাকে ধমক দিল,—লাগাম ছাড়, এত বড় স্পর্ধা তোমার? লোকটি বলিল, তোমার

সহিত আমার একটি কাজ আছে। বাদশাহ বলিল, আচ্ছা ধৈর্য ধর, যখন আমি সওয়ারী হইতে নামিব তখন বলিও। সে বলিল, না, এখনই বলিতে হইবে। এই কথা বলিয়া জোরপূর্বক লাগাম তাহার হাত হইতে ছিনাইয়া লইল। বাদশাহ বলিল, বল। সে বলিল, অত্যন্ত গোপনীয় কথা, কানে কানে বলিতে হইবে। বাদশাহ কান তাহার নিকটবর্তী করিয়া দিল। সে বলিল, আমি মালাকুল-মউত। তোমার জ্ঞান কবজ করিতে আসিয়াছি।

ইহা শুনিয়া বাদশাহর চেহারা ফ্যাকাশে হইয়া গেল। জিহ্বা আড়ষ্ট হইয়া গেল। অতঃপর বলিতে লাগিল, আচ্ছা আমাকে এতটুকু সুযোগ দাও যে, আমি ঘরে যাইয়া আমার আসবাব-পত্রের একটা ব্যবস্থা করিয়া দেই। পরিবারস্থ লোকদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া লই। ফেরেশতা বলিল, কোন সুযোগ নাই। তুমি তোমার বাড়ীঘর ও আসবাব-পত্র আর কখনও দেখিতে পারিবে না। এই বলিয়া তাহার রূহ কবজ করিয়া লইল। সে ঘোড়ার উপর হইতে কাঠের মত নিচে পড়িয়া গেল।

অতঃপর সেই ফেরেশতা—মালাকুল-মউত একজন নেক মুসলমানের নিকট গেল। সেই (নেক) বান্দাও কোথাও সফরে যাইতেছিল। ফেরেশতা তাহার নিকট গিয়া সালাম করিল। সে ওয়া আলাইকুমুস সালাম বলিল। ফেরেশতা বলিল, তোমার কানে কানে আমার একটি কথা বলিবার আছে। সে বলিল, বল। ফেরেশতা কানে কানে এই বলিল যে, আমি মালাকুল-মউত। সে বলিল, অনেক ভাল করিয়াছেন, আপনি আসিয়াছেন। এমন ব্যক্তির আগমন বড় মুবারক, যাহার বিচ্ছেদ অনেক দীর্ঘ হইয়া গিয়াছিল। দূরবর্তী লোকদের মধ্য হইতে কাহারো সহিত আমার সাক্ষাতের এত আগ্রহ ছিল না, যত আপনার সহিত তাড়াতাড়ি সাক্ষাতের আগ্রহ ছিল। ফেরেশতা বলিল, তুমি যেই কাজের জন্য ঘর হইতে বাহির হইয়াছ উহা তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া লও। সে বলিল, আল্লাহ তায়ালার সহিত সাক্ষাৎ করা অপেক্ষ বেশী প্রিয় আমার নিকট আর কোন কাজ নাই। ফেরেশতা বলিল, তুমি যেই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা নিজের জন্য পছন্দ কর, আমি ঐ অবস্থাতে জ্ঞান কবজ করিব। সেই ব্যক্তি বলিল, ইহা তোমার ইচ্ছা। ফেরেশতা বলিল, আমাকে ইহাই হুকুম করা হইয়াছে (যে, তোমার ইচ্ছার অনুসরণ করি)। সেই ব্যক্তি বলিল, আচ্ছা ; তবে আমাকে ওয়ু করিয়া নামায পড়িতে দিন এবং যখন আমি সেজদায় যাইব, তখন আমার রূহ কবজ করিয়া লইবেন। অতঃপর সে নামায শুরু করিল এবং সেজদারত অবস্থায় তাহার রূহ কবজ করা হইল। (এহইয়া)

ইহাও আল্লাহ তায়ালার অপরিসীম অনুগ্রহ যে, এই অধর্মের সবচেয়ে

বড় মেয়ে স্নেহাস্পদ মুহতারাম মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ^১ ছাছেবের স্ত্রী যিনি দীর্ঘদিন যাবৎ অসুস্থ ছিলেন এবং ইশারা করিয়া নামায পড়িতেন—এই বৎসরই ২৯শে শাওয়াল ৬৬ হিজরী সোমবার রাতে যখন তিনি মাগরিবের নামাযে ইশারা করিয়া সেজদায় গিয়াছেন, তখন ঐ অবস্থায়ই তিনি রহকে রাহের সৃষ্টিকর্তার নিকট সোপর্দ করিয়া দিয়াছেন এবং এই সেজদারত অবস্থায়ই দুনিয়া ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। আত্মাহ তায়ালার কোন্ কোন্ অনুগ্রহের শোকর আদায় করিয়া শেষ করা যাইতে পারে!

আবু বকর ইবনে আবদুল্লাহ মুজানী (রহঃ) বলেন, বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি অনেক সম্পদ জমা করিয়াছিল। যখন মৃত্যুর কাছাকাছি সময় হইল, তখন নিজের পুত্রদেরকে বলিল, আমার সমস্ত ধন-সম্পদ আমার সম্মুখে লইয়া আস। তাড়াতাড়ি সমস্ত সম্পদ জমা করা হইল। অনেক ঘোড়া, উট, গোলাম ইত্যাদি যাবতীয় জিনিস সম্মুখে আনা হইল। সে এই সমস্ত কিছু দেখিয়া (আফসোস করিয়া) কাঁদিতেছিল যে, এই সবই ছুটিয়া যাইতেছে। এমন সময় মালাকুল মউত সামনে আসিয়া গেল এবং বলিতে লাগিল, কান্নাকাটি দ্বারা কি ফায়দা? ঐ যাতে কসম! যিনি এই সমস্ত নেয়ামত তোমাকে দান করিয়াছেন। এখনই তোমার জ্ঞান লইয়া যাইব। সে দরখাস্ত করিল, আমাকে যদি একটু সুযোগ দেওয়া হয়, তবে আমি এইসমস্ত জিনিস বন্টন করিয়া দিব। ফেরেশতা বলিল, আফসোস! সুযোগ চলিয়া গিয়াছে। ভাল হইত যদি তুমি এই সময়ের আগেই বন্টন করিয়া দিতে। এই বলিয়া তাহার জ্ঞান বাহির করিয়া লইল।

আরও একটি ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন যে, এক ব্যক্তি অনেক সম্পদ জমা করিয়াছিল। এমন কোন জিনিস বাকী রাখে নাই যাহা সে সংগ্রহ করে নাই। সে একটি আলীশান মহল তৈয়ার করিয়াছিল। যাহার দুইটি দরজা ছিল। উহাতে পাহারার জন্য গোলাম নিযুক্ত করিল। বাড়ীর প্রস্তুতি উপলক্ষে সে অনেক বড় দাওয়াতের অনুষ্ঠান করিল। ইহাতে নিজের সকল আপনজন ও বন্ধু-বান্ধবকে জমা করিল। সে নিজে বড় একটি সিংহাসনের উপর পায়ের উপর পা রাখিয়া বসিয়াছিল। লোকেরা খানা খাইতেছিল। সে মনে মনে চিন্তা করিতেছিল যে, সবরকমের সম্পদ এত বেশী জমা হইয়া গিয়াছে যে, কয়েক বৎসর পর্যন্ত আর কিছু খরিদ করিতে

১. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ (রহঃ) ও ইনতিকাল করিয়াছেন। তিনি ২৯শে যিলক্বদ ১৩৮৪ হিঃ সালে লাহোরে ইনতিকাল করেন। ইম্মা সিন্নাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজেউন।

হইবে না। এমন সময় একজন ফকীর ছেঁড়া কাপড় পরিধান করা অবস্থায় (ফকীরের মত) গলায় খলি বুলাইয়া দরজার সামনে আসিল এবং এত জোরে দরজার কপাটে আঘাত করিতে শুরু করিল যে, তাহার সিংহাসন পর্যন্ত আওয়াজ পৌছিল। গোলাম দৌড়াইয়া বাহিরে আসিল যে, এই কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকটি কে? গোলাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, কি ব্যাপার? ফকীর বলিল, তোমার মনিবকে আমার নিকট পাঠাইয়া দাও। গোলামরা বলিল, আমাদের মনিব তোমার মত ফকীরের নিকট আসিবে? সে বলিল, অবশ্যই আসিবে। তাহার নিকট যাইয়া বল। তাহারা মনিবের নিকট গেল এবং ঘটনা শুনাইল। মনিব বলিল, তোমরা তাহাকে ইহার মজা দেখাও নাই? এমন সময় সেই ফকীর পুনরায় পূর্বের চাইতে জোরে কপাটে আঘাত করিতে লাগিল। দারোয়ান দৌড়াইয়া আবার দরজার নিকট আসিল। তখন ফকীর বলিল, তোমাদের মনিবকে বলিয়া দাও যে, আমি মালাকুল-মউত। ইহা শুনিয়া তাহারা দিশাহারা হইয়া গেল এবং মনিবকে যাইয়া বলিল। শুনিয়া মনিবেরও মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল এবং অত্যন্ত বিনয়ের সহিত বলিতে লাগিল, ফকীরকে বলিয়া দাও যে, আমার বদলে যেন অন্য কাহাকেও গ্রহণ করিয়া লয়। ইতিমধ্যে ফকীর ভিতরে পৌছিয়া গেল এবং তাহাকে বলিল, তোমার যাহা কিছু করিবার আছে করিয়া লও। আমি তোমার রূহ কবজ না করিয়া ফিরিয়া যাইতে পারি না। সে নিজের সমস্ত ধন-সম্পদ জমা করাইল এবং ধন-সম্পদকে সম্বেদন করিয়া বলিতে লাগিল, তোদের উপর আল্লাহ তাআলার লানত হউক, তোরা এবং তোদের ব্যস্ততা আমাকে আপন মাওলার এবাদত হইতে বিরত রাখিয়াছে। তোরা আমাকে এতটুকু সময়ও দিস নাই যে, আমি কোন সময় একটু একাগ্রতার সহিত আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করিতাম। আল্লাহ তাআলা আপন কুদরতে সম্পদকে কথা বলিবার শক্তি দান করিলেন। সম্পদ বলিল, আমাকে কেন লানত করিতেছ? আমারই কারণে তুমি বড় বড় বাদশাহদের নিকট এমন সময় পৌছিয়া যাইতে, যখন নেক লোকদেরকে তাহাদের দরজা হইতে ফিরাইয়া দেওয়া হইত। আমার কারণেই তো তুমি কোমলদেহী নারীদের স্বাদ গ্রহণ করিতে। আমার কারণেই তুমি বাদশাহদের মত জীবন যাপন করিতে। তুমি আমাকে মন্দ কাজে খরচ করিতে; আর আমি অস্বীকার করিতে পারিতাম না। যদি তুমি আমাকে ভাল কাজে খরচ করিতে, তবে আমি তোমার কাজে আসিতাম। অতঃপর মালাকুল-মউত মুহূর্তে তাহার রূহ কবজ করিয়া লইল।

ওয়াহব ইবনে মুনাবেহ (রহঃ) বলেন, একবার মালাকুল-মউত একজন অত্যন্ত জালেম ও অত্যাচারী ব্যক্তির রাহ কবজ করিয়া লইয়া গেল। দুনিয়াতে তাহার চাইতে বড় জালেম কেহ ছিল না। মালাকুল-মউত যাইতেছিল, এমন সময় ফেরেশতারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি সর্বদা জ্ঞান কবজ করিয়া থাক। তোমার কি কখনও কাহারও প্রতি দয়া হইয়াছে? মালাকুল-মউত বলিল, এক মহিলার প্রতি আমার সবচেয়ে বেশী দয়া হইয়াছিল। সে একা জঙ্গলের মধ্যে ছিল, সেখানে তাহার একটি সন্তান পয়দা হইয়াছিল। আমাকে ঐ মহিলার জ্ঞান কবজ করার হুকুম করা হইল। উক্ত মহিলা এবং তাহার সন্তানের একাকীত্ব ও অসহায় অবস্থার উপর আমার বড় দয়া হইয়াছিল যে, এইরূপ নির্জন ময়দানে এই শিশুর কি পরিণতি হইবে। ফেরেশতারা বলিল, এই জালেম যাহার রাহ তুমি লইয়া যাইতেছ, এই সেই শিশু। মালাকুল-মউত হতবাক হইয়া বলিতে লাগিল, হে মাওলা! তুমি পাক, বড় মেহেরবান, তুমি যাহা চাও, তাহাই কর।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, যখন কোন ব্যক্তি মারা যায় আর তাহার ঘরের লোকেরা কান্নাকাটি শুরু করে, তখন মালাকুল-মউত ঐ ঘরের দরজার উপর দাঁড়াইয়া বলে, আমি তাহার রুজি খাই নাই (বরং সে নিজেরই তাহার রুজি শেষ করিয়াছে)। আমি তাহার আয়ু কম করি নাই। আমাকে তো এই ঘরে আবার আসিতে হইবে এবং বারবার আসিতে হইবে—যতক্ষণ না ঘরের সমস্ত লোক শেষ হইয়া যায়। হযরত হাসান (রহঃ) বলেন, আল্লাহর কসম! যদি ঘরের লোকেরা সেই সময় ঐ ফেরেশতাকে দেখে এবং তাহার কথা শুনিতে পায়, তবে মূর্দাকে ভুলিয়া নিজের ফিকিরে পড়িয়া যাইবে।

ইয়াযীদ রাক্বানী (রহঃ) বলেন, বনী ইসরাঈলের এক অত্যাচারী ব্যক্তি নিজের ঘরে স্ত্রীর সহিত নির্জনতা উপভোগ করিতেছিল। এমন সময় ঘরের মধ্যে একজন অপরিচিত লোককে দরজা দিয়া হাঁটিয়া আসিতে দেখিল। এই ব্যক্তি অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া তাহার দিকে দৌড়াইয়া গেল এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে? এবং কে তোমাকে ঘরে প্রবেশের অনুমতি দিয়াছে? সে বলিল, আমাকে এই ঘরের মালিক ভিতরে আসিতে বলিয়াছেন। আর আমি ঐ ব্যক্তি যাহাকে না কোন পর্দা বাধা দিতে পারে, না বাদশাহদের নিকট যাইতে আমার কোন অনুমতির প্রয়োজন হয়, না কোন জালেমের প্রভাবকে আমি ভয় করি আর না কোন অহংকারী দাঙ্গিকের নিকট যাইতে কোন জিনিস আমাকে বাধা দিতে পারে। তাহার

এইরূপ কথাবার্তা শুনিয়া সেই জালেম ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া গেল। শরীরে কম্পন আসিয়া গেল এবং উপুড় হইয়া পড়িয়া গেল। অতঃপর অত্যন্ত বিনয়ের সহিত বলিতে লাগিল, তবে তো আপনি মালাকুল-মউত। সে বলিল, হাঁ, আমিই মালাকুল-মউত। গৃহকর্তা বলিল, আপনি আমাকে এতটুকু সুযোগ দিন, যাহাতে আমি ওসিয়তনামা লিখিয়া দিতে পারি। ফেরেশতা বলিল, এখন উহার সময় চলিয়া গিয়াছে। আফসোস ; যে তোমার সুযোগ শেষ হইয়া গিয়াছে। তোমার নিঃশ্বাস পুরা হইয়া গিয়াছে। তোমার সময় খতম হইয়া গিয়াছে। এখন তোমার জন্য বিন্দুমাত্র দেরী করিবারও অবকাশ নাই। গৃহকর্তা জিজ্ঞাসা করিল, আপনি আমাকে কোথায় লইয়া যাইবেন? ফেরেশতা বলিল, তোমার আমলসমূহ যাহা আগে চলিয়া গিয়াছে, উহার নিকট লইয়া যাইব। (তুমি যেমন আমল করিয়াছ, তেমন ঠিকানা পাইবে) যেই ধরনের ঘর তুমি ঐ জগতের জন্য বানাইয়াছ, উহাই তুমি পাইবে। সে বলিল, আমি তো কোন নেক আমলই করি নাই এবং না কোন উত্তম ঘর নিজের জন্য এখন পর্যন্ত বানাইয়াছি। ফেরেশতা বলিল, তবে তো لَطَىٰ نَزَاةً لِّلشَّوٰى এর দিকে লইয়া যাইব। ইহা সূরা মাআরেজ, রুকু-১ এর দিকে ইশারা করা হইয়াছে। যাহার অর্থ এই যে, “নিঃসন্দেহে সেই আগুন এইরূপ প্রজ্জ্বলিত হইবে যাহা চামড়া পর্যন্ত টানিয়া লইবে। আর ঐ ব্যক্তিকে যে (দুনিয়াতে সত্য হইতে) মুখ ফিরাইয়াছে এবং অবহেলা করিয়াছে সেই আগুন নিজেই ডাকিয়া লইবে, (নিজের দিকে টানিয়া লইবে।)” অতঃপর সেই ফেরেশতা তাহার জ্ঞান বাহির করিয়া লইল। ঘরে কান্নার রোল পড়িয়া গেল। কেহ কাঁদিতেছিল, কেহ চিৎকার করিতেছিল। ইয়াযীদ বাক্বাশী (রহঃ) বলেন, যদি মানুষ ইহা জানিত যে, ঐ সময় মূর্দার উপর কি অতিবাহিত হইতেছে, তবে তাহার মৃত্যুর চাইতে তাহার ঐ অবস্থার উপর বেশী কান্নাকাটি ও আহাজারি করিত যাহা তাহার উপর অতিবাহিত হইতেছে। (এহইয়া)

হযরত সুফিয়ান সওরী (রহঃ) বলেন, যখন মালাকুল-মউত অন্তরের রগকে স্পর্শ করে, তখন মানুষ অন্যকে চিনিতে পারে না। জ্বান বন্ধ হইয়া যায় এবং দুনিয়ার সমস্ত জিনিসকে ভুলিয়া যায়। যদি এই সময় মানুষের উপর মৃত্যুর নেশা সওয়ার না হইত, তবে প্রচণ্ড কষ্টের কারণে নিকটস্থ লোকদের উপর সে তলোয়ার চালাইতে আরম্ভ করিত।

কোন কোন বর্ণনায় আসিয়াছে, যখন নিঃশ্বাস গলায় আসিয়া যায়, তখন শয়তান তাহাকে গোমরাহ করিবার জন্য চরমভাবে চেষ্টা করে।

এক বর্ণনায় আছে, মালাকুল-মউত নামাযের সময় মানুষের

খোঁজ-খবর লয়। যদি কোন ব্যক্তিকে নামাযের সময়ের প্রতি যত্নশীল দেখিতে পায়, তবে মৃত্যুর সময় সে নিজেই তাহাকে কালেমা তাইয়্যোবার তালকীন করে এবং শয়তানকে তাহার নিকট হইতে সরাইয়া দেয়।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, মানুষ যখন মৃত্যুর নিকটবর্তী হয়, তখন তাহার সম্মুখে তাহার সঙ্গী-সাথীদের আকৃতিসমূহ পেশ করা হয়—যদি তাহার উঠাবসা নেক লোকদের সহিত হয়, তবে তাহাদেরকে সামনে আনা হয়, আর যদি খারাপ লোকদের সহিত তাহার উঠাবসা হয়, তবে ঐ সমস্ত লোকদেরকে সামনে আনা হয়।

হযরত ইয়াযীদ ইবনে শাজারা সাহাবী (রাযিঃ) হইতেও এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে।

রাবী ইবনে বাযযাহ (রহঃ) নামে একজন বুয়ুর্গ লোক বসরা এলাকায় ছিলেন। তিনি বলেন, এক ব্যক্তির মৃত্যুর সময় লোকেরা তাহাকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর তালকীন করিতেছিল। আর সে ব্যক্তি বলিতেছিল, (মদের গ্লাস) তুমিও পান কর, আমাকেও পান করাও।

এমনিভাবে আহওয়াজ নামক স্থানে এক ব্যক্তির ইন্তেকাল হইতেছিল। লোকেরা তাহাকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিতেছিল। আর সে বলিতেছিল, দশ দশ টাকা, এগার এগার, বার বার। (ইতহাক) পক্ষান্তরে, যে সমস্ত লোক মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়া রাখিয়াছে, দুনিয়াতে মৃত্যুকে স্মরণ রাখিয়াছে, উহার জন্য কিছু আমল করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের জন্য মৃত্যু এরূপ—যেমন হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমিনের জন্য তোহফা বলিয়াছেন।

হযরত বেলাল (রাযিঃ) এর মৃত্যুর সময় তাহার স্ত্রী বলিতেছিলেন :
 وَاطْرَبْنَا غَدًا نَلْقَى الْأَحِبَّةَ مَحْمَدًا
 وَاحْرَبْنَا هَیْ آفَسَاس ! তুমি বিদায় হইয়া যাইতেছ। তখন হযরত বেলাল (রাযিঃ) বলিতেছিলেন :
 وَاحْرَبْنَا هَی آفَسَاس ! অর্থাৎ, কতই না মজার কথা, কতই না আনন্দের কথা—আগামীকাল বন্ধুদের সহিত মিলিত হইব, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত মিলিত হইব, তাহার সাথীদের সহিত মিলিত হইব।

হযরত মুয়ায (রাযিঃ) এর যখন ইন্তেকালের সময় নিকটবর্তী হইল, তখন তিনি বলিলেন, হে আল্লাহ ! আপনি জানেন, আমি দুনিয়াতে বেশী দিন থাকিতে চাহিতাম, কিন্তু উহা এই কারণে নহে যে, দুনিয়ার সহিত আমার মহব্বত ছিল, আর না এই কারণে যে, আমি এখানে নহর ও বাগান লাগাইব। বরং এই জন্য চাহিতাম যে, গ্রীষ্মের দুপুরে রোযার কারণে পিপাসার স্বাদ উপভোগ করিব, আর (দ্বীনের জন্য) কষ্ট-ক্লেশে

সময় অতিবাহিত করিব এবং আপনার যিকিরের হালকায় শরীক হইব।

হযরত সালমান (রাযিঃ) মৃত্যুর সময় কাঁদিতে লাগিলেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, কাঁদিবার কি আছে, হৃযুরের সহিত আপনি সাক্ষাৎ করিবেন! হৃযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই অবস্থায় দুনিয়া হইতে বিদায় লইয়াছেন যে, তিনি আপনার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, 'আমি না মৃত্যুর ভয়ে কাঁদিতেছি, না দুনিয়া ছুটিয়া যাওয়ার কারণে কাঁদিতেছি। বরং আমি এইজন্য কাঁদিতেছি যে, হৃযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট হইতে একটি অঙ্গীকার লইয়াছিলেন যে, আমরা যেন দুনিয়া হইতে এই পরিমাণ ব্যবহার করি, যেই পরিমাণ একজন মুস'ফিরের সম্বল হইয়া থাকে। সেই অঙ্গীকার পূরা করিতে পারি নাই।' কিন্তু তাহার ইন্তেকালের পর যখন ঘরের আসবাব-পত্র দেখা হইল, তখন উহা দশ দেরহাম হইতে কিছু বেশী ছিল। আর এক দেরহাম তিন মাশা পরিমাণ হয়। ইহাই ছিল তাহার সমুদয় সম্পদ, যাহা বেশী হইয়া গিয়াছে বলিয়া তিনি কাঁদিতেছিলেন। অতঃপর তিনি সামান্য মেশক আনিতে বলিলেন এবং স্ত্রীকে বলিলেন, ইহাকে ভিজাইয়া আমার বিছানার উপর ছিটাইয়া দাও। আমার নিকট এমন জামাত আসিতেছে; যাহারা মানুষও নহেন, জিনও নহেন। (এতহাফ)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ)এর যখন ইন্তেকালের সময় হইল, তখন তিনি হাসিলেন এবং বলিলেন : **لِمِثْلِ ذَلِكَ فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ** অর্থাৎ, এই ধরনের জিনিসের জন্য মানুষের আমল করা উচিত (পরজগতের কিছু স্বাদ ও আনন্দের বিষয় হয়ত দেখিয়াছিলেন)। এমনভাবে যখন তাহার মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হইল, তখন তিনি তাহার নসর নামক গোলামকে বলিলেন, আমার মাথা জমিনের উপর রাখিয়া দাও। সে কাঁদিতে লাগিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি কারণে কাঁদিতেছ? নসর বলিল, আপনি কত আরাম-আয়েশে জীবন-যাপন করিতেন, এখন এইভাবে ফকীরদের মত জমিনের উপর মাথা রাখিয়া মৃত্যুবরণ করিতেছেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, চুপ থাক, আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করিয়াছিলাম, আমার জিন্দেগী যেন মালদারদের মত হয় আর মৃত্যু যেন ফকীরদের মত হয়।

আতা ইবনে ইয়াসার (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তির ইন্তেকালের সময় নিকটবর্তী হইলে শয়তান তাহার নিকট আসিয়া বলিতে লাগিল, তুমি আমার হাত হইতে বাঁচিয়াই গেলে। (আমার আয়ত্রে আসিলে না)। তিনি বলিতে লাগিলেন, তোর ব্যাপারে আমি এখনও পর্যন্ত নিশ্চিত হই নাই।

জারীরা (রহঃ) বলেন, আমি হযরত জুনায়েদ (রহঃ)এর নিকট তাহার ইন্তেকালের সময় উপস্থিত ছিলাম। তিনি কুরআন শরীফ পড়িতেছিলেন। কেহ আরজ করিল, এই সময় (শরীর দুর্বল ; এখন) কি তেলাওয়াতের সময়? তিনি বলিতে লাগিলেন, এখন আমার আমলনামা বন্ধ হইতেছে, তেলাওয়াতের জন্য ইহা হইতে অধিক উত্তম সময় আর কোনটি হইবে?

হযরত জুনায়েদ (রহঃ)কে কেহ জিজ্ঞাসা করিল, হযরত আবু সাঈদ খায্যাব (রহঃ)কে ইন্তেকালের সময় অত্যন্ত উৎফুল্ল দেখাইতেছিল ; ইহার কারণ কি? তিনি বলিতে লাগিলেন, যদি ঐ সময় তাহার রূহ আনন্দের আতিশয্যে উড়িয়া যাইত, তবু আশ্চর্যের কিছু ছিল না।

হযরত জুন্নুন মিসরী (রহঃ)কে কেহ তাহার ইন্তেকালের সময় জিজ্ঞাসা করিল, আপনার কি কিছু বলিবার আছে? কোন খাহেশ থাকিলে বলুন। তিনি বলিলেন, আমার শুধু এই খাহেশ যে, মৃত্যুর পূর্বে যেন তাহার মারেফত লাভ হইয়া যায়।

এক ব্যক্তি বলেন, আমি হযরত মামশাদ দিনাওয়ারী (রহঃ)এর নিকট বসিয়াছিলাম। একজন ফকীর আসিল এবং বলিতে লাগিল, এখানে এমন কোন পবিত্র ও পরিষ্কার জায়গা আছে কি, যেখানে কেহ মৃত্যুবরণ করিতে পারে? তিনি একটি জায়গার দিকে ইশারা করিলেন, যেখানে পানির একটি ঞ্ণাও ছিল, সে উহার নিকটে গেল। ওযু করিল এবং নামায পড়িল, অতঃপর পা লম্বা করিয়া শুইয়া পড়িল এবং মারা গেল।

আবু আলী রোযবারী (রহঃ)এর আপন বোন ফাতেমা (রহঃ) বলেন, যখন আমার ভাইয়ের ইন্তেকাল হইতে লাগিল, তখন তাহার মাথা আমার কোলের উপর ছিল। তিনি চোখ খুলিলেন ও বলিতে লাগিলেন, আসমানের দরজাসমূহ খুলিয়া গিয়াছে, আর জান্নাতকে সুসজ্জিত করা হইয়াছে এবং একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করিতেছে যে, হে আবু আলী! তুমি যদিও এত উচ্চ মর্যাদার খাহেশ করিতেছিলে না ; কিন্তু আমি তোমাকে উচ্চ মর্যাদায় পৌছাইয়া দিয়াছি। অতঃপর তিনি দুইটি কবিতা পাঠ করিলেন, যাহার অর্থ এই—“তোমার হকের কসম! আমি কখনও তোমাকে ছাড়া কাহারও প্রতি (মহব্বতের দৃষ্টিতে) চক্ষু উঠাইয়াও দেখি নাই। আমি দেখিতেছি যে, তুমি আমাকে তোমার রুগ্ন নয়নযুগল ও লজ্জায় আবৃত্ত গুণদ্বয় দ্বারা আমাকে অস্থির করিয়া তুলিতেছ।

হযরত জুনাইদ (রহঃ)এর ইন্তেকালের সময় কেহ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিল। তিনি বলিতে লাগিলেন, আমি এই কালেমা কখনও ভুলি নাই, যাহাকে এখন স্মরণ করিতে হইবে।

হযরত শিবলী (রহঃ)এর খাদেম বাকরন দিনাওয়ারী (রহঃ)এর নিকট জাফর ইবনে নাসীর (রহঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি হযরত শিবলী (রহঃ)এর ইন্তেকালের সময় কি দৃশ্য দেখিয়াছ? তিনি বলিলেন, হযরত শিবলী বলিতেছিলেন, আমার দ্বারা এক ব্যক্তির উপর এক দেরহাম পরিমাণ জুলুম হইয়াছিল। আমি তাহার পক্ষ হইতে কয়েক হাজার দেরহাম সদকা করিয়াছি কিন্তু আমার অন্তরে এখন পর্যন্ত ঐ এক দেরহামের দুঃশ্চিন্তা রহিয়া গিয়াছে যে, কেন উহা রহিয়া গেল? অতঃপর তিনি বলিয়াছেন, আমাকে ওয়ু করাইয়া দাও। আমি ওয়ু করাইলাম। কিন্তু দাড়িতে খেলাল করা ভুলিয়া গেলাম। তিনি দুর্বলতার কারণে নিজের করিতে পারিতেছিলেন না। জ্বান বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, আমার হাত ধরিয়া নিজের দাড়ির ভিতরে ঢুকাইয়া দিলেন এবং এই অবস্থায় তাহার ইন্তেকাল হইয়া গেল। ইহা শুনিয়া জাফর (রহঃ) কাঁদিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, এইরূপ অবস্থায়ও যে ব্যক্তির শরীয়তের একটি আদব ও একটি মুস্তাহাব পর্যন্তও ছুটে না তাহার সম্পর্কে আর কি বলিব!

এক বুযুর্গের ইন্তেকালের সময় তাহার স্ত্রী কাঁদিতে লাগিলেন। বুযুর্গ বলিলেন, কেন কাঁদিতেছ? তিনি বলিলেন, আপনার বিচ্ছেদের কারণে কাঁদিতেছি। বুযুর্গ বলিলেন, নিজের জন্য কাঁদ। আমি তো আজকের দিনের জন্য (অর্থাৎ এই দিনের আকাশক্ষায় ও অপেক্ষায়) বেয়াল্লিশ বৎসর যাবৎ কাঁদিতেছি।

হযরত কাত্তানী (রহঃ)এর নিকট কেহ তাহার ইন্তেকালের সময় জিজ্ঞাসা করিল, আপনার নিয়মিত আমলসমূহ কি? তিনি বলিলেন, আমার মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী না হইলে বলিতাম না, আমি চল্লিশ বৎসর যাবৎ আমার দিলের দরজার হেফাজত করিতেছি, যখনই উহার মধ্যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু প্রবেশ করিবার ইচ্ছা করে, তখনই আমি উহার দরজা বন্ধ করিয়া দেই।

হযরত মু'তামির (রহঃ) বলেন, আমি হাকাম (নামক এক ধনী ব্যক্তি)এর ইন্তেকালের সময় তাহার নিকট ছিলাম। আর দোয়া করিতেছিলাম যে, আল্লাহ তায়ালা যেন তাহার মৃত্যু যাতনা সহজ করিয়া দেন। যেহেতু তাহার মধ্যে অমুক অমুক গুণ ছিল। আমি তাহার ভাল গুণসমূহ গণিয়া গণিয়া দোয়া করিতেছিলাম। হাকাম তখন বেঁটশ অবস্থায় ছিলেন। যখন তাঁহার ঈশ হইল, তখন বলিতে লাগিলেন, অমুক অমুক কথা কে বলিতেছিল? মু'তামির (রহঃ) বলিলেন, আমি বলিতেছিলাম। হাকাম বলিলেন, মালাকুল-মউত (আঃ) বলেন যে, আমি প্রত্যেক

দানশীল ব্যক্তির সহিত সদয় ব্যবহার করিয়া থাকি। এই বলিয়া হাকামের রুহ উড়িয়া গেল।

হযরত মামশাদ দিনাওয়ারী (রহঃ)এর ইন্তেকালের সময় এক বুয়ুর্গ তাহার নিকট বসা ছিলেন। তিনি তাহার জন্য জ্ঞানাত লাভের দোয়া করিতে লাগিলেন। হযরত মামশাদ (রহঃ) হাসিলেন এবং বলিলেন, ত্রিশ বৎসর যাবৎ জ্ঞানাত তাহার সমগ্র সাজসজ্জা সহকারে আমার সামনে প্রকাশ হইতেছে। আমি একবারও উহার প্রতি পূর্ণরূপে চাহিয়া দেখি নাই। (আমি তো জ্ঞানাতের মালিকের প্রতি আগ্রহী) (এইহা)

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ)এর ইন্তেকালের সময় যখন নিকটবর্তী হইল, তখন একজন চিকিৎসক তাহার খেদমতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, আমি রুল-মুমিনীনকে বিষ প্রয়োগ করা হইয়াছে, এইজন্য আমি তাহার জীবনের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত নই।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) বলিলেন, তোমাদের ঐ ব্যক্তির জীবনের ব্যাপারেও নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয়, যাহাকে বিষ প্রয়োগ করা হয় নাই। চিকিৎসক জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি নিজেও কি অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন যে, আপনাকে বিষ দেওয়া হইয়াছে? হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) বলিলেন, আমি ঐ সময়ই জানিয়া গিয়াছিলাম যখন ঐ বিষ আমার পেটে গিয়াছিল। চিকিৎসক বলিলেন, আপনি ইহার চিকিৎসা করুন। নতুবা আপনার জ্ঞান চলিয়া যাইবে। তিনি বলিতে লাগিলেন, (যাহার নিকট যাইবে অর্থাৎ আমার পরওয়ার দিগার) তিনি তে তাহাদের সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যাহাদের নিকট কেহ যায়। আল্লাহর কসম! যদি আমি ইহা জানি যে, আমার কানের নিকট কোন জিনিস এমন রাখা আছে যাহার মধ্যে আমার আরোগ্য রহিয়াছে, তবু আমি ঐ পর্যন্তও হাত বাড়াইব না। অতঃপর বলিলেন, হে আল্লাহ! ওমরকে তোমার সহিত সাক্ষাত করিবার জন্য পছন্দ করিয়া লও। ইহার কয়েক দিন পরই ইন্তেকাল করিলেন।

মাইমুন ইবনে মেহরান (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) ঐ সময় বেশী বেশী মৃত্যুর দোয়া করিতেন। কেহ আরজ করিল, এইরূপ করিবেন না, আল্লাহ তায়ালা আপনার কারণে (হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) অনেক সুন্নত জিন্দা করিয়াছেন। অনেক বিদায়াত (যাহা শুরু হইয়া গিয়াছিল) দাবাইয়া রাখিয়াছেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, আমি কি (হযরত ইউসুফ (আঃ))এর মত নেক বান্দা হইব না? তিনি এই দোয়া করিয়াছিলেন : رَبِّ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي

بِالصَّالِحِينَ অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমাকে ইসলামের হালতে মৃত্যু দান কর এবং নেক লোকদের সহিত शामिल করিয়া দাও। (ইউসুফ ৪: ১০১)

মাসলামা (রহঃ) ইন্তেকালের নিকটবর্তী সময়ে বলিলেন, আপনি কাফনের জন্য যে দাম দিয়াছেন উহাতে অত্যন্ত সাধারণ কাপড় পাওয়া গিয়াছে। উহার সহিত কিছু বৃদ্ধি করিবার অনুমতি দান করুন। তিনি বলিলেন, উহা আমার নিকট লইয়া আস। কিছুক্ষণ তিনি ঐ কাপড়টিকে দেখিলেন অতঃপর বলিলেন, যদি আমার রব আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন, তবে তো আমি তৎক্ষণাৎ ইহা অপেক্ষা উত্তম কাপড় পাইয়া যাইব, আর যদি আমার রব আমার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন তবে যেরূপ কাফনই হইবে উহা জোরপূর্বক সরাইয়া দেওয়া হইবে এবং উহার পরিবর্তে জাহান্নামের আগুনের কাফন হইবে। অতঃপর বলিলেন, আমাকে বসাও। বসিয়া বলিলেন, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে (যে সমস্ত কাজ করিবার) হুকুম করিয়াছ, আমি উহা পালন করিতে পারি নাই। তুমি (যে সমস্ত কাজ করিতে) নিষেধ করিয়াছ, আমি উহার অবাধ্যতা করিয়াছি। কিন্তু লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। অতঃপর ইন্তেকাল করিলেন। ঐ সময় ইহাও বলিয়াছেন যে, আমি একটি জামাতকে দেখিতেছি, তাহারা মানুষও নহেন, জিনও নহেন।

এক বর্ণনায় আছে, ইন্তেকালের সময় সকলকে তাহার নিকট হইতে সরাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, এখানে যেন কেহ না থাকে। সকলে বাহিরে চলিয়া গেল এবং দরজা দিয়া দেখিতে লাগিল। তখন তিনি বলিতেছিলেন, এরূপ লোকদের আগমন বড় বরকতময়, যাহারা মানুষও নহেন, জিনও নহেন। ইহার পর সূরা কাসাসের শেষ রুকুর এই আয়াত শরীফ পড়িলেন تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ الْآلِ আলাহ তায়ালা বলেন, এই আখেরাতের ঘর আমি ঐ সমস্ত লোকদের জন্য বরাদ্দ করিয়াছি, যাহারা দুনিয়াতে না বড়াই চায় আর না ফাসাদ চায়। (এতহাফ)

এক বুয়ূর্গ বলেন, আমি আল্লাহ তায়ালায় নিকট দোয়া করিলাম, আমাকে যেন কবরবাসীদের অবস্থা দেখাইয়া দেন। আমি এক রাত্রি দেখিলাম, যেন কিয়ামত কায়েম হইয়া গিয়াছে। আর লোকেরা নিজ নিজ কবর হইতে বাহির হইতেছে। আমি তাহাদিগকে দেখিলাম যে, কেহ অতি উন্নত সুন্দরের উপর (যাহা বিশেষ ধরনের উন্নতমানের রেশমী কাপড়) ঘুমাইতেছে। কেহ সাধারণ রেশমের উপর রহিয়াছে, কেহ উঁচু উঁচু পালংকের উপর রহিয়াছে, কেহ ফুলের উপর রহিয়াছে, কেহ হাসিতেছে, কেহ কাঁদিতেছে। আমি বলিলাম, হে আল্লাহ! যদি এইসব লোক একই

অবস্থায় থাকিত, তবে কতই না ভাল হইত। মুর্দাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি বলিল, ইহা আমলের তারতম্যের কারণে হইয়াছে। যাহারা উন্নত মানের রেশমের উপর ঘুমাইতেছে তাহারা তো উন্নত চরিত্রের অধিকারী, যাহারা সাধারণ রেশমের উপর রহিয়াছে তাহারা শহীদগণ, যাহারা ফুলের উপর রহিয়াছে তাহারা অধিক রোযা রাখিতেন, যাহারা হাসিতেছেন তাহারা তওবাকারী, যাহারা কাঁদিতেছে তাহারা গোনাহগার, আর উচ্চ স্তরে যাহারা রহিয়াছেন (সম্ভবতঃ উচ্চ পালঙ্কে উপবিষ্টগণ) ঐ সমস্ত লোক যাহারা আল্লাহ তায়ালার জন্য পরস্পর মহব্বত রাখিত। (রওজ)

এক কাফন চোর ছিল। সে কবর খুঁড়িয়া কাফন চুরি করিত। একবার সে একটি কবর খুঁড়িল, উহাতে উচ্চ পালঙ্কের উপর বসে একজন লোককে দেখিল। তাহার সম্মুখে কুরআন শরীফ ছিল, সে কুরআন শরীফ পড়িতেছিল। তাহার পালঙ্কের নিচে একটি বর্ণা বহিতেছে। ইহাতে সেই ব্যক্তি এত ভীত হইল যে, বেহঁশ হইয়া পড়িয়া গেল। লোকেরা তাহাকে কবর হইতে বাহির করিল। তিন দিন পর ঈশ ফিরিয়া আসিল। লোকেরা ঘটনা জিজ্ঞাসা করিলে সে সমস্ত অবস্থা শুনাইল। কোন কোন লোক উক্ত কবর দেখিবার আকাঙ্ক্ষা করিল। তাহাকে কবর দেখাইয়া দেওয়ার জন্য বলিল। সে ইচ্ছাও করিল যে, তাহাদিগকে লইয়া যাইয়া কবর দেখাইয়া দিবে। রাত্রে স্বপ্নের মধ্যে ঐ কবরবাসী বুয়ুর্গকে দেখিল। তিনি বলিতেছেন, তুমি যদি আমার কবর বলিয়া দাও, তবে এমন বিপদে পড়িয়া যাইবে যে, চিরদিন তোমার স্মরণ থাকিবে। সে প্রতিজ্ঞা করিল যে, কবরের কথা বলিব না। (রওজ)

শায়েখ আবু ইয়াকুব সানুসী (রহঃ) বলেন, আমার নিকট এক মুরীদ আসিল এবং বলিতে লাগিল, আমি আগামীকাল যোহরের সময় মারা যাইব। সুতরাং দ্বিতীয় দিন যোহরের সময় মসজিদে হারামে আসিল। তওয়াফ করিল এবং কিছু দূর যাইয়া মরিয়া গেল। আমি তাহাকে গোসল দিলাম এবং দাফন করিলাম। আমি যখন তাহাকে কবরে রাখিলাম, তখন সে চোখ খুলিল। আমি বলিলাম, মরিয়াও জীবিত রহিয়াছ? বলিতে লাগিল, আমি জীবিত আছি এবং আল্লাহ তায়ালার প্রত্যেক আশেক জীবিতই থাকে। (রওজ)

এক বুয়ুর্গ বলেন, আমি এক মুরীদকে গোসল দিয়াছি। সে আমার বৃদ্ধাসুলী ধরিয়া ফেলিল। আমি বলিলাম, আমার বৃদ্ধাসুলী ছাড়িয়া দাও, আমি জানি যে, তুমি মারা যাও নাই; ইহা এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় স্থানান্তর মাত্র। সে আমার বৃদ্ধাসুলী ছাড়িয়া দিল।

শায়েখ ইবনুল জালা (রহঃ) বিখ্যাত বুযুর্গ ছিলেন। তিনি বলেন, যখন আমার পিতার ইন্তেকাল হইল এবং তাহাকে গোসল দেওয়ার জন্য তক্তার উপরে রাখিলাম, তখন তিনি হাসিতে আরম্ভ করিলেন। গোসলদাতাগণ ছাড়িয়া পালাইল। তাহাকে গোসল দেওয়ার সাহস কাহারও হইতেছিল না। তাহার এক বুযুর্গ বন্ধু আসিয়া তাহাকে গোসল দিলেন।

(রওজ)

মোটকথা, রওয কিতাবের গ্রন্থকার এই সকল আত্ম-বিসর্জনকারীদের বহু ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। যদ্বারা তাহাদের মৃত্যুর সময় এবং মৃত্যুর পর অত্যন্ত উৎফুল্ল হওয়া, হাসি-তামাশা করা, আনন্দ উপভোগ করা জানা যায়। মৃত্যুর পর কথা বলা সম্পর্কিত বেশ কিছু ঘটনা হাফেজ ইবনে আবদুল বার (রহঃ) ইস্তিআব নামক কিতাবেও উল্লেখ করিয়াছেন।

হযরত যায়েদ ইবনে খারেজা (রাযিঃ)এর জীবনীতে লেখা আছে, এই ব্যাপারে কাহারও দ্বিমত নাই যে, তিনি মৃত্যুর পর কথা বলিয়াছেন। এমনভাবে আরও অন্যান্য সাহাবী সম্পর্কেও বর্ণিত রহিয়াছে।

সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) যখন মৃত্যুর যুদ্ধে যাইতেছিলেন, তখন লোকেরা তাহাদের জন্য কল্যাণ ও নিরাপদে ফিরিয়া আসিবার দোয়া করিতে লাগিল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাযিঃ) তখন তিনটি কবিতা পাঠ করিলেন, যাহার অর্থ এই—

“আমি তো ফিরিয়া আসিবার স্থলে এই আকাঙ্ক্ষা করিতেছি যে, আল্লাহ তায়ালা যেন আমাকে মাফ করিয়া দেন এবং সেই সঙ্গে একটি তলোয়ার যেন মাথার উপর এমনভাবে লাগে, যাহা মাথাকে দুই টুকরা করিয়া দেয়। অথবা কোন বর্শা আমার ভিতরে এমনভাবে ঢুকে, যাহা আমার নাড়িভুড়ি ও কলিজা চিরিয়া বাহির হইয়া যায়।” যখন তাহার যুদ্ধের ময়দানে পৌঁছিলেন, তখন তাহাদের সংখ্যা তিন হাজার ছিল। সেখানে পৌঁছিয়া জানা গেল যে, শত্রুর সংখ্যা দুই লক্ষ। অতঃপর সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে এই পরামর্শ হইল যে, প্রথমে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই অবস্থার খবর দেওয়া হউক। তারপরও যদি হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুম হয়, তবে যুদ্ধ শুরু করা হইবে। যখন আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাযিঃ) জানিতে পারিলেন যে, এই পরামর্শ হইতেছে, তখন তিনি আসিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, তোমরাও আশ্চর্য মানুষ, যে জিনিসের আকাঙ্ক্ষা লইয়া আমরা বাহির হইয়াছি, উহা সম্পর্কে পরামর্শ করিতেছ। তোমরা তো শুধু শহীদ হওয়ার আগ্রহে বাহির হইয়াছ। আমরা কখনও আসবাব এবং শক্তি ও সংখ্যার

উপর ভরসা করিয়া যুদ্ধ করি নাই। আমরা সবসময় শুধু দীন ইসলামের শক্তির উপর যুদ্ধ করিয়াছি। উঠ, ময়দানে চল। দুই অবস্থার যে কোন একটি হইবেই—হয়ত বিজয়ী হইব নতুবা শহীদী মর্যাদা লাভ করিব। আর আমাদের জন্য উভয়টিই সম্মান ও মর্যাদার বিষয়। তাহার এই কথা শুনিয়া সকলেই যুদ্ধের জন্য তৈয়ার হইয়া গেল এবং যুদ্ধ শুরু হইয়া গেল। রওয়ানা হওয়ার সময় তব্বার সাঙ্গান্নাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়েদ ইবনে হারেসাকে আমীর নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং বলিয়া দিয়াছিলেন যে, যদি তিনি শহীদ হইয়া যান, তবে হযরত জাফর ইবনে আবী তালেব (রাযিঃ) আমীর হইবেন। তিনিও যদি শহীদ হইয়া যান, তবে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহ আমীর হইবেন। আর তিনিও যদি শহীদ হইয়া যান, তখন মুসলমানগণ পরামর্শ করিয়া যাহাকে চাহিবে আমীর বানাইয়া লইবে। সুতরাং যখন ময়দানে হযরত জায়েদ (রাযিঃ) ও তাহার পর হযরত জাফর (রাযিঃ) শহীদ হইয়া গেলেন, তখন লোকেরা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহ (রাযিঃ)কে ডাকিলেন। তিনি তখন সৈন্যদলের এক পার্শ্বে ছিলেন, তাহার হাতে গোশতের একটি টুকরা ছিল। তিন দিন যাবৎ কোন কিছু চাখিবারও সুযোগ তাহার হয় নাই। কেহ আসিয়া বলিল, হযরত জাফর (রাযিঃ) শহীদ হইয়া গিয়াছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহ (রাযিঃ) নিজের নফসকে তিরস্কার করিলেন যে, তুমি দুনিয়ার মধ্যে মশগুল রহিয়াছ (খাওয়ার মধ্যে লাগিয়া গিয়াছ)। এই বলিয়া গোশতের টুকরাটি দূরে নিক্ষেপ করিলেন এবং ঝাণ্ডা হাতে লইয়া আগে বাড়িলেন। কেহ তাহার উপর আঘাত করিল, ইহাতে হাতের আঙ্গুল কাটিয়া গেল। তখন তিনি তিনটি কবিতা পড়িলেন, যাহার অর্থ এই—

“তুমি তো কেবল আঙ্গুলই যাহা রক্তাক্ত হইয়াছে ; ইহা ছাড়া আর কি হইয়াছে। আর ইহাও আব্দুল্লাহ তায়ালার পথেই হইয়াছে ; যাহা স্বয়ং অনেক মর্যাদার বিষয়। হে নফস ! ইহা বুঝিয়া লও যে, যদি তুমি শহীদ না হও তবে এমনিতেই মরিবে ; মরিতে তো অবশ্যই হইবে। দেখ, যেই জিনিসের তুমি আকাঙ্ক্ষা করিতেছ অর্থাৎ শহীদী মর্যাদা, উহা সম্মুখে আসিয়া গিয়াছে। যদি তুমি তোমার আগের দুই সাথী যায়েদ (রাযিঃ) ও জাফর (রাযিঃ)এর মত কাজ কর, তবে তুমি হেদায়াতপ্রাপ্ত হইবে। আর যদি তুমি তোমার কদমকে তাহাদের হইতে পিছনে সরাইয়া লও, তবে বদ-নসীব হইবে।”

অতঃপর তিনি আপন দিলকে বলিলেন, এই সময়ে তোমার মনে কোন জিনিসের খেয়াল আসিতেছে? যদি স্ত্রীর খেয়াল আসে, তবে

তাহাকে তিন তালাক। যদি গোলামদের খেয়াল আসে, তবে তাহারা সকলেই আযাদ। যদি বাগ বাগিচার খেয়াল আসে, তবে উহা আল্লাহর জন্য সদকা। হে নফস! তুমি কি জাম্মাত পছন্দ কর না। খোদার কসম! তোমাকে উহার দিকে চলিতেই হইবে, স্বেচ্ছায় চল অথবা জোরজবরদস্তি চল, তুমি অনেক দীর্ঘসময় নিশ্চিন্ত কাটাইয়া দিয়াছ, এখন আর কি চিন্তা করিতেছ। নিজের আসল অবস্থাকে চিন্তা কর, তুমি বীর্যের একটি ফোটা ছিলে। মোটকথা, এই চিন্তার পর হযরত ইবনে রাওয়াহা (রাযিঃ) আগে বাড়িলেন এবং শহীদ হইয়া গেলেন। হে কায়ামে সাহাবা কিতাবে এই ঘটনা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে এবং এই ধরনের আরও ঘটনা বর্ণনা করা হইয়াছে।

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাত ভাই হযরত আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস (রাযিঃ) এর যখন ইন্তেকাল হইতে লাগিল, তখন ঘরের লোকেরা কাঁদিতে আরম্ভ করিল। তখন তিনি বলিতে লাগিলেন, এমন ব্যক্তির জন্য কাঁদিও না, যে ইসলাম গ্রহণ করিবার পর না জবান দ্বারা কখনও কোন গুনাহের শব্দ উচ্চারণ করিয়াছে, না শরীর দ্বারা কখনও কোন গুনাহের কাজ করিয়াছে (অর্থাৎ এমন ব্যক্তির জন্য মৃত্যু তো আনন্দই আনন্দ)।

সুনাবেহী (রহঃ) বলেন, যখন হযরত উবাদা (রাযিঃ) এর ইন্তেকাল হইতেছিল, তখন আমি নিকটে ছিলাম। আমি কাঁদিতে লাগিলাম। তিনি বলিতে লাগিলেন, তুমি কেন কাঁদিতেছ? আল্লাহর কসম! যদি কিয়ামতের দিন সাক্ষী তলব করা হয়, তবে আমি তোমার জন্য উত্তম সাক্ষ্য প্রদান করিব। আর যদি আমাকে সুপারিশের অনুমতি দেওয়া হয়, তবে আমি তোমার জন্য সুপারিশ করিব এবং যতদূর সম্ভব আমার সামর্থ্য অনুযায়ী তোমার উপকার করিব। অতঃপর বলিলেন, আমি যতগুলি হাদীস হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াছি এবং তোমাদের জন্য উপকারী মনে করিয়াছি, উহা সবই তোমাদের নিকট পৌছাইয়া দিয়াছি। শুধু একটি হাদীস বাতীত, যাহা এখন গুনাহিতেছি। কারণ, আমি এই জগত হইতে বিদায় লইতেছি। আমি হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ-এর সাক্ষ্য দিবে, তাহার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম।

হযরত আবু বকর (রাযিঃ) এর যখন ইন্তেকাল হইতে লাগিল, তখন তাহার মেয়ে কাঁদিতে লাগিলেন। হযরত আবু বকর (রাযিঃ) বলিলেন,

বেটি কাঁদিও না। মেয়ে বলিলেন, যদি আপনার ইন্তেকালেও কান্না না আসে, তবে কাহার ইন্তেকালে আসিবে? তিনি বলিলেন, এই সময় আমার জান বাহির হওয়া অপেক্ষা আর কাহারও জান বাহির হওয়া আমার নিকট অধিক প্রিয় নয়। এমনকি এই মাহির জান বাহির হওয়াও আমার জান বাহির হওয়া অপেক্ষা বেশী প্রিয় নয়। (অতএব, মৃত্যু যখন আমার নিকট এতই প্রিয় তখন তুমি কাঁদিতেছ কেন?) ইহার পর হোমরানকে বলিলেন, অবশ্য ভয় নিশ্চয়ই আছে যে, মৃত্যুর সময় ইসলাম আমার হাত হইতে ছুটিয়া যায় কিনা?

হযরত সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাযিঃ)এর যখন ইন্তেকাল হইতে লাগিল, তখন বলিলেন, আমার পশমের জুকাটি লইয়া আস। উহা আনা হইল। যাহা অনেক পুরাতন ও জীর্ণশীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তিনি বলিলেন, আমাকে ইহার মধ্যে কাফন দিবে। বদরের লড়াইয়ের সময় এই জুকাই আমার পরনে ছিল।

আবদুল্লাহ ইবনে আমের ইবনে কুরাইয (রাযিঃ)এর যখন ইন্তেকাল হইতে লাগিল এবং একেবারে অন্তিম সময় ছিলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাযিঃ) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) তাহার নিকট উপস্থিত ছিলেন, তখন তিনি নিজের লোকদেরকে বলিলেন, দেখ, আমার এই দুই ভাই রোযা রাখিয়াছেন। এমন যেন না হয় যে, আমার মৃত্যুর কারণে তাহাদের খাইতে বিলম্ব হয় এবং রোযা ইফতার করিতে দেৱী হইয়া যায়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাযিঃ) বলিতে লাগিলেন, যদি অন্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও দানশীলতা হইতে তোমাকে কোন জিনিস বাধা দিতে পারিত, তবে মৃত্যুকষ্ট বাধা দিতে পারিত। কিন্তু ইহাও তোমার জন্য বাধা হয় নাই। সুতরাং মেহমানদের সম্মুখে খানা রাখা অবস্থায় তাহার ইন্তেকাল হইল।

আমর ইবনে আউস (রাযিঃ) বলেন, যখন উতবা ইবনে আবু সুফিয়ানের ইন্তেকাল হইতেছিল, আমি তাহার নিকট গেলাম। তিনি অন্তিম অবস্থায় ছিলেন। বলিতে লাগিলেন, আমি তোমাকে বিদায়ের সময় একটি হাদীস শুনাইতেছি, যাহা আমার নিকট আমার বোন উম্মে হাবীবা (রাযিঃ) বর্ণনা করিয়াছিলেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াত্তে (অর্থাৎ এখলাসের সহিত) বার রাকাত চাপাতের নামায প্রতি দিন পড়ে, আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য জান্নাতে একটি মহল তৈয়ার করেন। (এই ছিল হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস এবং দ্বীন প্রচারের জয়বা,

মৃত্যুও ইহার জন্য বাধা হয় নাই।)

মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির (রহঃ)এর যখন ইন্তেকাল হইতেছিল, তখন তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, কাঁদিবার কারণ কি? বলিলেন, আমি এইজন্য কাঁদিতেছি না যে, আমার দ্বারা কখনও কোন গুনাহ হইয়া গিয়াছে। আমার জানা মতে তো আমি জীবনে কোন গুনাহ করিই নাই। তবে এইজন্য কাঁদিতেছি যে, কোন কাজ আমার দ্বারা এমন হইয়া গিয়াছে, যাহাকে আমি আমার ধারণায় সাধারণ মনে করিয়াছি; অথচ উহা আল্লাহ তায়ালার নিকট অসাধারণ বিষয়। অতঃপর কুরআন পাকের আয়াত **وَبَدَّالَهُمْ مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ** তেলাওয়াত করিলেন। যাহার অর্থ এই—“তাহাদের জন্য আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে এমন বিষয় প্রকাশ হইয়াছে, যাহা সম্পর্কে তাহাদের ধারণাও ছিল না।” (যুমার : ৪৭) ইহা তেলাওয়াত করিয়া বলিলেন, আমার শুধু ইহারই ভয় যে, এমন কোন বিষয় প্রকাশ হইয়া যায়, যাহার ধারণাও আমি করি নাই।

আমের ইবনে আব্দে কায়েস (রহঃ)এর যখন ইন্তেকাল হইতেছিল, তখন তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। কেহ বলিল, আপনি এমন সাধনা ও মুজাহাদা করিয়াছেন; তারপরও কাঁদিতেছেন? বলিতে লাগিলেন, আমি না মৃত্যুর ভয়ে কাঁদিতেছি, আর না দুনিয়ার লোভে কাঁদিতেছি, আমার দুঃখ এইজন্য যে, আজ হইতে আমার গ্রীষ্মকালে দ্বিপ্রহরের রোয়া এবং শীতকালের শেষ রাত্রে তাহাজ্জুদ ছুটিয়া যাইতেছে।

হযরত হাসান (রাযিঃ)এর যখন ইন্তেকাল হইতে লাগিল, তখন কিছু লোক তাহার খেদমতে উপস্থিত ছিলেন। তাহারা আরজ করিলেন, শেষ কোন নসীহত করিয়া দিন। তিনি বলিলেন, তোমাদিগকে তিনটি নসীহত করিতেছি। উহা শুনিয়া আমার নিকট হইতে চলিয়া যাইও এবং আমি যেখানে যাইতেছি আমাকে একাকী সেইখানে যাইতে দিও। অতঃপর বলিলেন, (১) যেই কাজের জন্য অন্যকে হুকুম করিবে, প্রথমে নিজে উহার উপর আমল শুরু করিয়া দিও। (২) যেই কাজ হইতে অন্যকে নিষেধ করিবে, প্রথমে নিজে উহা হইতে বিরত থাকিও। (৩) তোমাদের প্রত্যেক কদম হয়ত তোমাদের জন্য উপকারী হইবে (অর্থাৎ জাহান্নামের দিকে যাইবে) না হয় ক্ষতিকর হইবে (অর্থাৎ জাহান্নামের দিকে যাইবে) এইজন্য প্রতিটি কদম উঠাইবার সময় ইহা চিন্তা করিয়া লইও যে, কোন দিকে যাইতেছে।

হযরত রবী (রহঃ)এর যখন ইন্তেকাল হইতেছিল, তখন তাহার কন্যা

কাঁদিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, বেটি কাঁদিবার বিষয় নয়। এইরূপ বল যে, আজকের দিন কত আনন্দের দিন যে, আমার পিতা আজ অনেক কিছু পাইয়াছেন।

হযরত মাকহুল শামী (রহঃ) এর যখন ইন্তেকাল হইতে লাগিল, তখন তিনি হাসিতেছিলেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, ইহা কি হাসিবার সময়? তিনি বলিলেন, কেন হাসিব না। এখন আমি যাহাদের কারণে পেরেশান হইতাম, তাহাদের নিকট হইতে চিরদিনের জন্য পৃথক হইয়া যাইতেছি। আর যে মহান সত্তার সহিত সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা জড়িত ছিল, তাহার নিকট তাড়াতাড়ি যাইতেছি।

হযরত হাসসান ইবনে সিনান (রহঃ) এর অন্তিম অবস্থায় কেহ বলিল, আপনার অনেক কষ্ট হইতেছে। তিনি বলিতে লাগিলেন, কষ্ট তো অবশ্যই হইতেছে; কিন্তু এইরূপ সময়ে মুমেন লোকের কষ্ট তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়, যখন আল্লাহ তায়ালার সহিত তাহার সাক্ষাতের আশা হইতেছে। আর এই কষ্টের উপর তাহার আনন্দ প্রাধান্য লাভ করিতেছে।

ইবনে ইদরীস (রহঃ) এর ইন্তেকালের সময় হইলে তাহার মেয়ে কাঁদিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, কাঁদিবার কোন কারণ নাই। আমি এই ঘরে চার হাজার বার কুরআন পাক খতম করিয়াছি।

হাসান ইবনে হাই (রহঃ) বলেন, আমার ভাই আলী (রহঃ) এর যেই রাতে ইন্তেকাল হইয়াছে, সেই রাতে তিনি আমাকে ডাকিয়া পানি চাহিলেন। আমি নামাযের নিয়ত বাঁধিয়াছিলাম। সালাম ফিরাইয়া পানি লইয়া গেলাম। তিনি বলিতে লাগিলেন, আমি তো পানি পান করিয়াছি। আমি বলিলাম, আপনি কোথা হইতে পান করিয়াছেন? ঘরে তো আমি এবং আপনি ছাড়া অন্য কেহ নাই। তিনি বলিতে লাগিলেন, হযরত জিবরাঈল (আঃ) এইমাত্র পানি আনিয়াছিলেন। তিনি আমাকে পানি পান করাইয়া গিয়াছেন এবং বলিয়া গিয়াছেন যে, তুমি এবং তোমার ভাই আল্লাহ তায়ালার পুরস্কৃত লোকদের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছ। ইহা দ্বারা কুরআন পাকের একটি আয়াতের দিকে ইশারা করা হইয়াছে। (যাহা সূরা নিসার নবম রুকুতে রহিয়াছে **وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ** الآية) তরজমা এই যে, যে সমস্ত লোক আল্লাহ তায়লা ও তাহার রাসূলের আনুগত্য করে, তাহারাই ঐ সমস্ত লোক, যাহাদেরকে আল্লাহ তায়লা পুরস্কৃত করিয়াছেন—তাহারা হইলেন নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও নেককার লোকগণ।

(নিসাঃ ৬৯)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুসা (রহঃ) বলেন, হযরত আলী ইবনে

সালেহ (রহঃ)এর ইন্তেকাল হইল। আমি তখন সফরে ছিলাম। যখন আমি সফর হইতে ফিরিয়া আসিলাম, তখন তাহার ভাই হাসান ইবনে সালেহের নিকট সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য গেলাম। সেইখানে যাওয়ার পর আমার কান্না আসিয়া গেল। তাহার ভাই বলিতে লাগিলেন, কাঁদিবার পূর্বে তাহার ইন্তেকালের অবস্থা শুনিয়া লও, উহা কেমন আনন্দের বিষয়। তাহার যখন মৃত্যুকষ্ট আরম্ভ হইল, তখন তিনি আমার নিকট পানি চাহিলেন। আমি পানি লইয়া গেলাম। বলিতে লাগিলেন, আমি তো পান করিয়া লইয়াছি। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কে পান করাইল? তিনি বলিতে লাগিলেন, বহু কাতারে কাতার ফেরেশতাদের সহিত ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তশরীফ আনিয়াছিলেন এবং আমাকে পানি পান করাইয়া দিয়াছেন। আমার মনে হইল—হয়ত তিনি অচেতন অবস্থায় এরূপ বলিতেছেন। এইজন্য আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ফেরেশতাদের কাতারগুলি কিরূপ ছিল? বলিতে লাগিলেন—‘উপর হইতে নীচে এইরূপ ছিল’ বলিয়া তিনি একটি হাত অপরটির উপর রাখিয়া দেখাইলেন।

আবু বকর ইবনে আইয়াশ (রহঃ)এর যখন ইন্তেকাল হইতে লাগিল, তখন তাহার বোন কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, বোন! কাঁদিবার বিষয় নয়। তোমার ভাই ঘরের ঐ কোণে বার হাজার বার কুরআন পাক খতম করিয়াছে।

আমর ইবনে উবায়দ (রহঃ) বলেন, আবু শুয়ায়েব সালেহ ইবনে জিয়াদ (রহঃ) অসুস্থ ছিলেন। আমি তাহাকে দেখিতে গেলাম। তখন তাহার অন্তিম সময় হইল। আমাকে বলিতে লাগিলেন, আমি তোমাকে সুসংবাদ শুনাইতেছি। আমি এইখানে একজন অপরিচিত লোকের চেহারা দেখিতেছি। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কে? তিনি বলিতে লাগিলেন, আমি মালাকুল-মউত। আমি বলিলাম, আমার সহিত নরম ব্যবহার করিও। সে বলিতে লাগিল, আমাকে সদয় ব্যবহার করার হুকুমই করা হইয়াছে।

হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)এর ছেলে বলেন, যখন আমার পিতার ইন্তেকাল হইতে লাগিল, তখন আমি তাহার নিকট বসিয়াছিলাম। আমার হাতে একটি কাপড় ছিল, যাহাতে ইন্তেকালের পর তাহার চোয়াল বাঁধিয়া দিতে পারি। তিনি বারবার বেঁঁশ হইয়া যাইতেছিলেন। ইহাতে আমাদের ধারণা হইতেছিল যে, তাহার ইন্তেকাল হইয়া গিয়াছে। ৭ ক্ষণে ঝঁশ ফিরিয়া আসিত, আর তখন তিনি বলিতেন, এখনও নয়, এখনও নয়। যখন তৃতীয় বার একই অবস্থা হইল, তখন

আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি ইহা কি বলিতেছেন? তিনি বলিতে লাগিলেন, বেটা, তোমার খবর নাই, অভিশপ্ত শয়তান আমার নিকট দাঁড়াইয়া রহিয়াছে এবং দুঃখ ও গোস্বায় নিজের আগুল মুখের ভিতর চাপিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে আর বলিতেছে, হে আহমদ! তুমি আমার হাত হইতে ছুটিয়া গিয়াছ। যখন সে ইহা বলে, তখন আমি তাহাকে বলি, এখনও ছুটি নাই। (যতক্ষণ পর্যন্ত জান বাহির না হইয়া যাইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোর ব্যাপারে নিশ্চিত নই।)

হযরত আদম ইবনে আবী ইয়াছ (রহঃ) এর যখন অন্তিম সময় হইল, তখন তিনি চাদর জড়াইয়া পড়িয়াছিলেন এবং কুরআন শরীফ পড়িতেছিলেন। যখন কুরআন পাক খতম করিলেন, তখন বলিতে লাগিলেন, আপনার প্রতি আমার মহব্বতের দোহাই দিয়া আরজ করিতেছি যে, আমার সহিত যেন নম্ন ব্যবহার করা হয়। আজকের দিনের জন্যই আপনার সহিত সকল আশা আকাঙ্ক্ষা বাঁধিয়া রাখিয়াছিলাম। অতঃপর লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিলেন এবং রুহ উড়িয়া গেল।

মাসলামা ইবনে আবদুল মালেক (রহঃ) এর যখন ইন্তেকাল হইতে লাগিল, তখন তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। কেহ কাঁদিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে লাগিলেন, আমি মৃত্যুর ভয়ে কাঁদিতেছি না। আল্লাহ তায়ালার উপর আমার পূর্ণ ভরসা রহিয়াছে। আমি এইজন্য কাঁদিতেছি যে, আমি ত্রিশবার জেহাদে শরীক হইয়াছি; কিন্তু শাহাদত নসীব হয় নাই। আর আজ মেয়েলোকদের মত বিছানার উপর মরিতেছি।

ইয়াছ ইবনে কাতাদা (রহঃ) একদিন আয়না দেখিলেন। মাথায় সাদা চুল দেখিতে পাইয়া বলিতে লাগিলেন, চুল সাদা হওয়ার পর আখেরাত ছাড়া অন্য কোন ব্যস্ততা থাকা উচিত নয়। কেননা, এখন দুনিয়া হইতে বিদায় নেওয়ার সময় আসিয়া গিয়াছে। ইহার পর অনেক বেশী সাধনা শুরু করিয়া দিলেন। একবার জুমআর দিন নামায হইতে অবসর হইয়া মসজিদ হইতে বাহির হইতেছিলেন। আসমানের দিকে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, তোমার আগমন সুবারক, আমি তো অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে তোমার অপেক্ষা করিতেছিলাম। অতঃপর আপন সঙ্গীদিগকে বলিতে লাগিলেন, যখন আমি মরিয়া যাইব, তখন মালছব (একটি জায়গার নাম) এলাকায় লইয়া যাইয়া আমাকে দাফন করিও। ইহার পর রুহ বাহির হইয়া গেল এবং মাটিতে পড়িয়া গেলেন।

হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) এর শাগরেদ ইবরাহীম ইবনে হানী (রহঃ) এর যখন ইন্তেকাল হইতে লাগিল, তখন তাহার পুত্র

ইসহাককে জিজ্ঞাসা করিলেন, সূর্য ডুবিয়া গিয়াছে? তিনি বলিলেন, এখনও ডুবে নাই, কিন্তু আব্বাজান! এরূপ কঠিন রোগের মধ্যে তো ফরয রোয়াও ভাঙ্গিয়া ফেলার অনুমতি আছে। আপনার তো নফল রোয়া, ভাঙ্গিয়া ফেলুন। বলিতে লাগিলেন, আরে থাম। ইহার পর (বুঝা গেল না; কি দেখিলেন) বলিতে লাগিলেন, এইরূপ বস্তুর জন্যই মানুষের নেক আমল করিতে থাকে উচিত। (ইহা দ্বারা কুরআন পাকের আয়াত সূরা ছাফ্ফাত এর দ্বিতীয় রুকুর দিকে ইশারা করা হইয়াছে। যাহাতে আব্বাহ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন, 'নিঃসন্দেহে ইহাই বড় কামিয়াবী, এইরূপ কামিয়াবী হাসিল করিবার জন্য আমলকারীদের আমল করা উচিত।') অতঃপর রুহ উড়িয়া গেল।

আবু হাকীম হীরী (রহঃ) বসিয়া কিছু লিখিতেছিলেন। লিখিতে লিখিতে কলম হাত হইতে রাখিয়া বলিতে লাগিলেন, যদি ইহারই নাম মৃত্যু হইয়া থাকে, তবে খোদার কসম বড় উত্তম মৃত্যু। ইহা বলিয়া মরিয়া গেলেন।

আবুল ওয়াফা ইবনে আকীল (রহঃ) এর যখন ইন্তেকাল হইতে লাগিল, তখন ঘরের লোকেরা কান্নাকাটি শুরু করিয়া দিল। তিনি বলিতে লাগিলেন, ৫০ বৎসর যাবৎ তো ইহাকে সরাইতেছি। এখন আর কত দিন সরাইতে থাকিব। এখন তোমরা আমাকে ছাড়িয়া দাও। এখন আমি ইহার আগমনে ইহাকে মুবারকবাদ দিতেছি।

'এহইয়াউল উলূম' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের লেখক ইমাম গাযযালী (রহঃ) সোমবার দিন ফজরের নামায ওযু করিয়া পড়িলেন। অতঃপর নিজের কাফন আনাইলেন, উহাকে চুম্বন করিলেন, চোখের উপর রাখিলেন এবং বলিলেন, বাদশাহর খেদমতে হাজির হওয়ার জন্য বড় আনন্দ সহকারে হাজির আছি। ইহা বলিয়া কেবলার দিকে পা লম্বা করিয়া শুইয়া পড়িলেন এবং তখনই ইন্তেকাল করিলেন।

ইবনুল জাওয়ী (রহঃ) বলেন, আমার উস্তাদ আবু বকর ইবনে হাবীব (রহঃ) এর যখন ইন্তেকাল হইতে লাগিল, তখন তাহার শাগরেদগণ আরুজ করিল, কিছু নসীহত করুন। তিনি বলিলেন, তিনটি বিষয়ের ওসিয়ত করিতেছি—আব্বাহর ভয়, নির্জনে তাহার ধ্যান ও মুরাক্বা, আর আমি যেই বস্তুর সম্মুখীন হইতেছি (অর্থাৎ মৃত্যু) উহার ভয় রাখিবো। আমার একষটি বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু আমি যেন দুনিয়াকে দেখিই নাই। (এত জলদি সময় কাটিয়া গিয়াছে।) অতঃপর নিকটে বসা এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেখ, আমার কপালে যাম আসিয়া

গিয়াছে কিনা। সে আরজ করিল, আসিয়া গিয়াছে। বলিলেন, আল্লাহর শোকর যে, ইহা ঈমানের উপর মৃত্যু হওয়ার আলামত। (যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে।)

ইমাম বুখারী (রহঃ)এর শাগরেদ আবুল ওয়াকত আবদুল আউয়াল (রহঃ)এর যখন ইন্তেকালের সময় আসিল, তখন সর্বশেষ কালেমা যাহা তাহার জবান হইতে বাহির হইয়াছিল উহা এই ছিল : **بَالَيْتَ قُرْمِي** (ইহা সূরা ইয়াসীন শরীফের দ্বিতীয় রুকূর আয়াত) যাহার তরজমা এই—হায়! আমার কণ্ঠের লোকেরা যদি এই কথা জানিত যে, আমার রব আমাকে মাফ করিয়া দিয়াছেন এবং আমাকে সম্মান ও মর্যাদাপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে शामिल করিয়া দিয়াছেন। (ইয়াসীন : ২৬-২৭)

মুহাম্মদ ইবনে হামেদ (রহঃ) বলেন, আমি আহমদ ইবনে খাজরাবিয়া (রহঃ)এর ইন্তেকালের সময় তাহার নিকট বসা ছিলাম। তাহার মৃত্যুর অবস্থা শুরু হইয়া গিয়াছিল। ৯৫ বৎসর বয়স ছিল। এক ব্যক্তি তাহার নিকট কোন মাসআলা জিজ্ঞাসা করিল। তাহার চোখে অশ্রু ভরিয়া আসিল এবং বলিতে লাগিলেন, বেটা! ৯৫ বৎসর যাবৎ একটি দরজা খুলিবার চেষ্টায় লাগিয়া রহিয়াছি ; এখন উহা খুলিবার সময়। উহার চিন্তায় মগ্ন রহিয়াছি যে, সৌভাগ্যের সহিত খোলে, নাকি দুর্ভাগ্যের সহিত খোলে। এখন জবাব দেওয়ার সুযোগ কোথায়? ঐ সময় তাহার পাওনাদারগণ তাহার মারা যাওয়ার খবর শুনিয়া জমা হইয়া গেল। ৭০০ দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) তাহার জিম্মায় করজ ছিল। তিনি বলিতে লাগিলেন, হে আল্লাহ! আপনি বন্ধক রাখা এইজন্য শরীয়তসম্মত করিয়াছেন, যাহাতে পাওনাদাররা নিশ্চিন্ত থাকে। এখন আপনি—যাহার কারণে তাহারা নিশ্চিন্ত ছিল—তাহাকে ডাকিতেছেন। অর্থাৎ আমি বাঁচিয়া থাকিবার কারণে তাহারা নিশ্চিন্ত ছিল ; এখন আমি চলিয়া যাইতেছি। কাজেই আপনি তাহাদের করজ আদায় করিয়া দিন। ঐ সময়েই কেহ দরজা খটখটাইল এবং বলিতে লাগিল, আহমদের পাওনাদারগণ কোথায়? এবং সমস্ত করজ গণিয়া গণিয়া আদায় করিয়া চলিয়া গেল। অতঃপর তাহার রাহ বাহির হইয়া গেল।

এক বুয়ূর্গের ইন্তেকাল হইতেছিল। তিনি তাহার খাদেমকে বলিলেন, আমার হাত দুইটি বাঁধিয়া দাও এবং আমার মুখ জমিনের উপর রাখিয়া দাও। অতঃপর তিনি বলিতে লাগিলেন, বিদায় নেওয়ার সময় হইয়া গিয়াছে। না আমি গুনাহ হইতে পবিত্র এবং না আমার কাছে এমন কোন

উষর আছে, যাহা অজুহাত হিসাবে পেশ করিব। না কোন শক্তি আছে, যাহার দ্বারা সাহায্য লইব। আমার জন্য কেবল তুমিই রহিয়াছ, আমার জন্য কেবল তুমিই রহিয়াছ, এই কথা বলিতে বলিতে এক চিৎকার দিলেন এবং ইন্তেকাল হইয়া গেল। গায়েব হইতে আওয়াজ আসিল, এই বাম্পা তাহার মনিবের সম্মুখে বিনয় প্রকাশ করিয়াছে। আর তিনি তাহা কবুল করিয়া লইয়াছেন।

এক ব্যক্তি বলেন, একজন ফকীর মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাইতেছিল। তাহার মুখের উপর বহু মাছি বসিয়াছিল। আমার দয়া হইল। আমি তাহার নিকট বসিয়া মাছিগুলি তাড়াইতে লাগিলাম। সে চক্ষু মেলিল এবং বলিতে লাগিল, বহু বৎসর যাবৎ বিশেষ মুহূর্তটির জন্য চেষ্টায় লাগিয়াছিলাম। সারা জীবন চেষ্টা করিয়াও ভাগ্য হয় নাই, এখন মিলিয়াছিল আর তুমি মাঝখানে আসিয়া ঢুকিয়া গিয়াছ, যাও, নিজের কাজ কর, আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন।

আবু বকর রাক্বী (রহঃ) বলেন, আমি আবু বকর যাককাক (রহঃ)এর নিকট সকাল বেলা উপস্থিত ছিলাম। তিনি বলিতেছিলেন, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে এই দুনিয়াতে কতদিন পর্যন্ত ফেলিয়া রাখিবে। যোহরের সময় আসিবার পূর্বেই তাহার ইন্তেকাল হইয়া গেল।

হযরত মাকহুল শামী (রহঃ) অসুস্থ ছিলেন, এক ব্যক্তি তাহার নিকট যাইয়া বলিতে লাগিল, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে সুস্থ করিয়া দিন। তিনি বলিতে লাগিলেন, কখনও নয়। এমন মহান সত্তার নিকট যাওয়া যাহার নিকট শুধু মঙ্গলের আশা রহিয়াছে, এমন লোকদের নিকট থাকা হইতে উত্তম যাহাদের অনিষ্ট হইতে কখনও নিশ্চিত হওয়া যায় না।

আবু আলী রোযবারী (রহঃ) বলেন, অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত পুরাতন কাপড় পরিহিত একজন ফকীর ঈদের দিন আমার নিকট আসিল এবং বলিতে লাগিল, এখানে কোন পবিত্র ও পরিষ্কার জায়গা এমন আছে কি? যেখানে কোন গরীব ফকির মৃত্যুবরণ করিতে পারে? আমি বেপরওয়াভাবে অহেতুক কথা মনে করিয়া বলিয়া দিলাম, ভিতরে আসিয়া যাও এবং যেখানে ইচ্ছা পড়িয়া মরিয়া যাও। সে ভিতরে আসিল, ওজু করিল, কয়েক রাকাত নামায পড়িল, অতঃপর শুইয়া মরিয়া গেল। আমি তাহার গোসল ও কাফনের কাজ সমাধা করিলাম। যখন তাহাকে দাফন করিতে লাগিলাম, তখন আমার মনে হইল যে, তাহার মুখের উপর হইতে কাফন সরাইয়া তাহার মুখ জমিনের উপর রাখিয়া দেই। যাহাতে আল্লাহ তায়ালা তাহার অসহায় অবস্থার উপর দয়া করেন। আমি তাহার মুখ খুলিলাম, সে

চোখ মেলিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আমার সরদার! মৃত্যুর পরেও কি জিন্দেগী আছে! সে বলিতে লাগিল, আমি জিন্দা আছি। আর আল্লাহ তায়ালার প্রত্যেক আশেক জিন্দা থাকে। আমি কাল কিয়ামতে আমার মর্যাদা দ্বারা তোমার সাহায্য করিব।

আলী ইবনে সাহল আসবাহানী (রহঃ) বলিতেন, “তোমরা কি মনে কর যে, আমিও ঐভাবে মরিব, যেইভাবে লোকেরা অসুস্থতা, সেবা-শুশ্রূষা (এরূপ শত ঝামেলা বাঁধাইয়া) মারা যায়? আমি তো এইভাবে মরিব যে, আমাকে বলা হইবে, হে আলী! আর আমি তৎক্ষণাৎ রওয়ানা হইয়া যাইব।” অবশেষে এইরূপই হইয়াছে। একদিন কে'থাও যাইতেছিলেন। চলিতে চলিতে বলিতে লাগিলেন, লাব্বাইক (আমি হাজির), অতঃপর মরিয়া গেলেন।

আবুল হাসান মুজানী (রহঃ) বলেন, আবু ইয়াকুব নাহরজুরী (রহঃ) এর যখন ইন্তেকাল হইতে লাগিল, তখন আমি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ তালকীন করিলাম। তিনি আমার দিকে দেখিয়া হাসিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, আমাকে তালকীন করিতেছ, ঐ সন্তার ইযযতের কসম! যাহার কখনও মৃত্যু আসিবে না। আমার এবং তাহার মাঝে শুধু তাহার মহত্ত্ব ও ইযযতের পর্দা রহিয়াছে। ইহা বলিতেই তাহার রূহ উড়িয়া গেল। মুজানী (রহঃ) নিজের দাড়ি ধরিয়া বলিতেন, আমার মত নাপিত আল্লাহর ওলীগণকে কি তালকীন করিবে; কেমন লজ্জার কথা। যখন তিনি এই ঘটনা আলোচনা করিতেন তখন কাঁদিতেন।

আবুল হুসাইন মালেকী (রহঃ) বলেন, আমি হযরত খায়ের নূর বাফ (রহঃ) এর সহিত কয়েক বৎসর থাকিলাম। তিনি তাহার ইন্তেকালের আট দিন পূর্বে বলিলেন, আমি বৃহস্পতিবার দিন সন্ধ্যায় মাগরিবের সময় মারা যাইব এবং জুম'আর নামাযের পর আমাকে দাফন করা হইবে। তুমি ভুলিয়া যাইও না। কিন্তু আমি একেবারে ভুলিয়া গেলাম। জুম'আর দিন সকালে এক ব্যক্তি আমাকে তাহার ইন্তেকালের খবর শুনাইল। আমি তৎক্ষণাৎ জানাযায় শরীক হওয়ার জন্য গেলাম। পথে লোকদের সহিত দেখা হইল, যাহারা তাহার বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিতেছিল এবং বলিতেছিল যে, জুম'আর পর দাফন হইবে। কিন্তু আমি তাহার বাড়ীতে পৌছিয়া গেলাম। আমি সেইখানে যাইয়া তাহার ইন্তেকালের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলাম। তখন এক ব্যক্তি যে ইন্তেকালের সময় তাহার নিকট উপস্থিত ছিল, আমার নিকট বলিল, রাতে মাগরিবের নামাযের কাছাকাছি সময় তিনি বেহুঁশের মত হইয়া গেলেন। ইহার পর কিছুটা হুঁশে আসিল,

তখন ঘরের এক কোণার দিকে মুখ করিয়া বলিতে লাগিলেন, সামান্য সময় অপেক্ষা কর, তোমাদের প্রতি একটি কাজের হুকুম রহিয়াছে এবং আমার প্রতিও একটি কাজের হুকুম রহিয়াছে। কিন্তু তোমাদের প্রতি যে কাজের হুকুম রহিয়াছে উহা তো ছুটিবে না, আর আমার প্রতি যে কাজের হুকুম রহিয়াছে উহা থাকিয়া যাইবে। এইজন্য কিছু সময় অপেক্ষা কর আমি উহা পূরা করিয়া লই যাহার হুকুম আমাকে করা হইয়াছে। অতঃপর তিনি পানি আনাইলেন। নূতন ওয়ু করিলেন, নামায পড়িলেন। অতঃপর চক্ষু বন্ধ করিয়া পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িলেন এবং মৃত্যুবরণ করিলেন। কেহ তাহাকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার কি অবস্থা হইয়াছে? তিনি বলিতে লাগিলেন, ইহা জিজ্ঞাসা করিও না; তোমাদের দুর্গন্ধময় দুনিয়া হইতে মুক্তি পাইয়াছি।

আবু সাঈদ খাযয (রহঃ) বলেন, আমি একবার মক্কা মুকাররমায ছিলাম। বনী শায়বার দরজা দিয়া বাহির হইতেছিলাম। দরজার বাহিরে অত্যন্ত সুশ্রী একজন লোককে মৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিলাম। আমি যখন তাহাকে ভালভাবে দেখিতে লাগিলাম, তখন সে আমার দিকে তাকাইয়া হাসিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল, হে আবু সাঈদ! তোমার কি জ্ঞানা নাই যে, (প্রেমিক) বন্ধু কখনও মরে না; শুধু এক জগত হইতে আরেক জগতে স্থানান্তরিত হয়।

হযরত যুনুন মিসরী (রহঃ)এর যখন ইন্তেকাল হইতেছিল, তখন কেহ তাহার নিকট আরজ করিল, কিছু ওসিয়ত করুন। বলিতে লাগিলেন, আমি তাহার মেহেরবানীর অকল্পনীয় আচরণ দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইতেছি, এই সময় আমাকে অন্যমনস্ক করিও না।

আবু উসমান হীরী (রহঃ) বলেন, যখন আবু হাফস (রহঃ)এর ইন্তেকাল হইতে লাগিল, তখন কেহ বলিল, কোন ওসিয়ত করুন। বলিতে লাগিলেন, আমার মধ্যে বলিবার শক্তি নাই। কিছুক্ষণ পর সামান্য শক্তি অনুভব হইল। তখন আমি বলিলাম, এখন বলুন। আমি মানুষের নিকট উহা পৌছাইয়া দিব। বলিতে লাগিলেন, নিজের ভুল-ত্রুটির জন্য পূর্ণ অন্তর দ্বারা অনুনয় বিনয় হওয়া চাই। (ইহাই আমার শেষ ওসিয়ত।)

হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ) বলেন, যখন হযরত সাররী সাকতি (রহঃ)এর ইন্তেকাল হইতে লাগিল এবং অন্তিম অবস্থা হইল, তখন আমি তাহার শিয়রে বসা ছিলাম। আমি আমার মুখ তাহার মুখের উপর রাখিয়া দিলাম। আমার চক্ষু হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইতেছিল। আমার অশ্রু তাহার চেহারার উপর পড়িল। জিজ্ঞাসা করিলেন, কে? আমি আরজ করিলাম,

আপনার খাদেম জুনায়েদ। বলিতে লাগিলেন, মারহাবা। (বহু ভাল করিয়াছ, আসিয়াছ) আমি আরজ করিলাম, শেষ কোন ওসিয়ত করুন। বলিতে লাগিলেন, খারাপ লোকদের সঙ্গে হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিও এবং এমন যেন না হয় যে, অন্যদের সঙ্গে তোমাকে আল্লাহ তায়ালা হইতে পৃথক করিয়া দেয়।

হযরত হাবীব আযমী (রহঃ) (যিনি উচ্চ শ্রেণীর বিখ্যাত সুফীগণের মধ্যে ছিলেন) ইষ্টেকালের সময় অনেক বেশী ঘাবড়াইতেছিলেন। কেহ আরজ করিল, আপনার মত বুয়ুর্গের এইরূপ ঘাবড়াইবার কথা নয়। ইতিপূর্বে তো কখনও আপনার এইরূপ অবস্থা হয় নাই। (অর্থাৎ কোন বিষয়েই এই পরিমাণ ঘাবড়াইতে দেখি নাই।) তিনি বলিতে লাগিলেন, সফর অনেক দীর্ঘ, সফরের সামান সঙ্গে নাই, ইতিপূর্বে কখনও এই রাস্তা দেখি নাই, মনিব ও সর্দারের সহিত সাক্ষাত করিতে হইবে, পূর্বে কখনও সাক্ষাৎ হয় নাই, এমন ভয়ানক দৃশ্য দেখিতে হইবে যাহা পূর্বে কখনও দেখি নাই, কেয়ামত পর্যন্ত মাটির নিচে একাকী পড়িয়া থাকিতে হইবে, আপন কেহ নিকটে থাকিবে না। উহার পর আল্লাহ তায়ালা দরবারে দণ্ডায়মান হইতে হইবে। আমার ভয় হয় যে, যদি সেখানে এই প্রশ্ন করা হয় যে, হাবীব! ষাট বৎসরের মধ্যে একটি তসবীহ এমন পেশ কর ; যাহার মধ্যে শয়তানের কোন অংশ নাই। তখন কি জওয়াব দিব। অথচ তাহার প্রকৃত অবস্থা এইরূপ ছিল যে, ষাট বৎসরের জীবনে দুনিয়ার সহিত সামান্যতম সম্পর্কও ছিল না। সেখানে আমাদের মত লোকদের কি অবস্থা হইবে, যাহারা কখনও দুনিয়া তো দূরের কথা গুনাহ হইতেও বাঁচিয়া থাকি না ; বরং সবসময় শয়তানের খোশামোদির মধ্যেই লাগিয়া থাকি।

আবদুল জাব্বার (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ফাতাহ ইবনে শাখরফ (রহঃ) এর খেদমতে ত্রিশ বৎসর থাকিয়াছি। তিনি কখনও আসমানের দিকে মুখ উঠান নাই। ত্রিশ বৎসর পর একবার আসমানের দিকে মুখ উঠাইয়া বলিতে লাগিলেন, এখন তো আপনার প্রতি আগ্রহ অনেক বেশী বাড়িয়া গিয়াছে। অতি সত্বর আমাকে ডাকিয়া লউন, ইহার পর এক সপ্তাহও অতিবাহিত হয় নাই, তাহার ইষ্টেকাল হইয়া গেল।

আবু সাঈদ মাওসেলী (রহঃ) বলেন, ফাতাহ ইবনে সাঈদ (রহঃ) ঈদুল আযহার নামায় পড়িয়া ঈদগাহ হইতে দেবীতে ফিরিলেন। ফিরিবার সময় দেখিলেন, চতুর্দিকে বিভিন্ন বাড়ীঘর হইতে কুরবানীর গোশত পাকানোর ধোঁয়া বাহির হইতেছে। ইহা দেখিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, হে আল্লাহ! লোকেরা কুরবানীর মাধ্যমে আপনার নৈকট্য

হাসিল করিয়াছে। হে আমার মাহবুব! যদি আমি জানিতে পারিতাম যে, আমি কোন্ জিনিসের কুরবানী করিব! ইহা বলিয়া বেঈশ হইয়া পড়িয়া গেলেন। আমি পানি ছিটাইলাম। অনেকক্ষণ পর ঈশে আসিলেন। অতঃপর উঠিয়া চলিলেন। যখন শহরের গলির মধ্যে পৌঁছিলেন, তখন আবার আসমানের দিকে মুখ উঠাইয়া বলিতে লাগিলেন, হে আমার মাহবুব! আপনার জানা আছে যে, আমার দুঃখ ও চিন্তা দীর্ঘ হইয়া গিয়াছে। আর আমি গলি গলি ফিরিতেছি ইহাও আপনার জানা আছে। হে আমার মাহবুব! এইভাবে আপনি আমাকে কতদিন কয়েদ করিয়া রাখিবেন। ইহা বলিয়া আবার বেঈশ হইয়া পড়িয়া গেলেন। আমি আবার পানি ছিটাইলাম। আবার ঈশে আসিলেন। এইভাবে কিছুদিন পর তিনি ইন্তেকাল করিলেন।

মুহাম্মদ ইবনে কাসেম (রহঃ) বলেন, আমার মোর্শেদ মুহাম্মদ ইবনে আসলাম তুসী (রহঃ) ইন্তেকালের চার দিন পূর্বে আমাকে বলিলেন, আস, তোমাকে সুসংবাদ শুনাই। তোমার সাথীর (অর্থাৎ আমার) সঙ্গে আল্লাহ তায়ালা কি পরিমাণ অনুগ্রহ করিয়াছেন। আমার মৃত্যুর সময় হইয়াছে; এমতাবস্থায় আমার প্রতি আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহ এই যে, আমার নিকট একটি দেরহামও নাই, যাহার হিসাব আমাকে দিতে হইবে। এখন ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দাও। আমার মৃত্যু পর্যন্ত কাহাকেও আমার নিকট আসিতে দিও না। আর শুনিয়া রাখ যে, আমার নিকট এমন কোন জিনিস নাই যাহা উত্তরাধিকার সূত্রে বন্টন হইতে পারে। শুধুমাত্র এই চাদর এবং একটি চট ও ওজু করিবার এই লোটা এবং আমার কিছু কিতাব রহিয়াছে। আর এই খলিতে ত্রিশটি দেরহাম রহিয়াছে যাহা আমার নয়, বরং আমার ছেলের। তাহার এক আত্মীয় তাহাকে দিয়াছে। ইহা হইতে অধিক হালাল জিনিস আমার জন্য কি হইবে। কেননা, ভূমুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তুমি এবং তোমার সম্পদ তোমার পিতার। (অতএব ইহা পুত্রের মাল হওয়ার কারণে এই হাদীস অনুযায়ী আমার জন্য হালাল।) ইহা হইতে আমার কাফনের জন্য এই পরিমাণ খরিদ করিয়া লইবে যাহা দ্বারা আমার ছতর ঢাকিয়া যায়। বেশী লইবে না। অর্থাৎ উহা হইতে শুধু লুঙ্গি খরিদ করিবে। আর এই চট ও চাদর কাফনের মধ্যে शामिल করিয়া লইবে। এইভাবে কাফনের তিনটি কাপড় পুরা হইয়া যাইবে। লুঙ্গি চাদর এবং চট — এই তিনের মধ্যে আমাকে জড়াইয়া দিবে। আর ওয়ুর এই লোটা কোন নামাযী গরীব লোককে সদকা করিয়া দিবে। সে ইহা দ্বারা ওয়ু করিবে। এই সবকিছু

বলিয়া তিনি চতুর্থ দিন ইন্তেকাল করিলেন।

আবু আবদুল খালেক (রহঃ) বলেন, আমি ইউসুফ ইবনে হুসাইন (রহঃ)এর নিকট তাহার মৃত্যুর সময় উপস্থিত ছিলাম। তিনি বলিতেছিলেন, হে আল্লাহ! আমি প্রকাশ্যে মানুষকে নসীহত করিতে থাকিয়াছি। আর গোপনে নিজের নফসের সহিত ধোকাবাজী করিতে থাকিয়াছি। আমি নিজের নফসের সহিত যে ধোকাবাজী করিয়াছি, উহা তোমার মঞ্চলুককে নসীহত করার বদলায় মাফ করিয়া দাও। এই কথা বলিতে বলিতে তাহার প্রাণ বাহির হইয়া গেল। ইহাদের সকলকে আল্লাহ তায়ালা আপন অসীম রহমতের ছায়াতলে আশ্রয় দান করুন। কত সৌভাগ্যবান ছিলেন এই সমস্ত মৃত্যুবরণকারীগণ! আল্লাহ তায়ালা তাহাদের বরকতের কিছু অংশ এই অধ্যমকেও দান করুন। কেননা, তিনি বড় মেহেরবান। তাহার মেহেরবানীতে কোন কিছুই অসম্ভব নয়।

حضرت مائشہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا۔ یا رسول اللہ! میرے کسی غلام ہیں جو مجھ سے بھوٹ بھی بولتے ہیں، خیانت بھی کرتے ہیں، کہنا بھی نہیں مانتے ہیں ان کو برا بھلا بھی کہتا ہوں اور مانتا بھی ہوں، میرا ان کا (قیامت میں) کیا معاملہ رہے گا حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جتنی مقدار کی انہوں نے خیانت کی ہوگی اور تیری نافرمانی کی ہوگی، اور بھوٹ بولا ہوگا۔ اس ساری مقدار کا وزن کیا جائے گا (کہ وہاں ہر چیز کا وزن ہوتا ہے چاہے وہ چیز جسم والی جو ہر

(٢٠) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ
فَقَعَدَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَمْلُوكَيْنِ
يَكْذِبُونَنِي وَيَخُونُونَنِي وَ
يَعْصُونَنِي وَأَشْتَمُهُمْ وَأَضْرِبُهُمْ
فَكَيْفَ أَنَا مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا
كَانَ يَوْمُ الْقِيَمَةِ يُحْسَبُ مَا
خَانُوكَ وَعَصَوْكَ وَكَذَّبُوكَ وَ
عَقَابَكَ إِيَّاهُمْ فَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ
إِيَّاهُمْ يَقْدِرُ دُئُوبُهُمْ كَانَ
ذَلِكَ كَقَالَا لَا لَكَ وَرَبِّكَ
فَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ قُوتٌ

দৃশ্যমান বস্তুগত জিনিস হউক অথবা অদৃশ্য জিনিস হউক)। আর তুমি যে পরিমাণ শাস্তি দিয়াছ, উহাও ওজন করা হইবে। যদি তোমার শাস্তি এবং তাহাদের অপরাধ সমান সমান হয়, তবে তো না পাওনা হইবে, না দেনা। আর যদি তোমার শাস্তি প্রদান তাহাদের অপরাধ হইতে ওজনে কম হয়, তবে তো যে পরিমাণ কম হইবে উহা তোমাকেই দেওয়া হইবে। আর যদি শাস্তি প্রদান তাহাদের অপরাধ হইতে বেশী হয়, তবে তোমার নিকট হইতে উহার বদলা লওয়া হইবে। ইহা শুনিয়া সেই ব্যক্তি আফসোস করিতে লাগিল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে মজলিস হইতে একদিকে সরিয়া গেল। ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি কি কুরআন শরীফের আয়াত (সূরা আন্বিয়া, রুকু ৪) الْاِيَةُ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ পড় নাই। (যাহার অর্থ এই) কিয়ামতের দিন আমি ইনসারের পাল্লা কায়ম করিব (উহাতে আমলসমূহ ওজন করিব) এবং কাহারও উপর বিন্দু পরিমাণও জুলুম করা হইবে না। যদি কাহারও আমল সরিষা পরিমাণও হয়, তবে আমি উহাকে সেইখানে উপস্থিত করিব (এবং উহার ওজন করিব)। আর আমি হিসাব লওয়ার জন্য যথেষ্ট। (মিশকাত : তিরমিযী)

ফায়দা : কিয়ামতের দিন হিসাবের ব্যাপারও বড় কঠিন বিষয় হইবে। কুরআন পাক ও হাদীস শরীফে অনেক বেশী পরিমাণে এই বিষয়ে সতর্ক করা হইয়াছে এবং বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ নমুনা হিসাবে কয়েকটি আয়াত এবং কয়েকটি হাদীস এই স্থানে উল্লেখ করা হইতেছে।

① وَأَتَقُوا أَيُّوْمًا تُرْجَعُونَ فِيْهِ إِلَى اللَّهِ تَنْتَفَرُكُوْنِي كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○

① এবং তোমরা ঐদিনকে ভয় করিতে থাক, যেইদিন তোমাদিগকে আঞ্জাহ তাযালার সম্মুখে আনা হইবে। অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তিকে কৃতকর্ম (অর্থাৎ উহার বদলা) পরিপূর্ণরূপে দেওয়া হইবে এবং তাহাদের উপর কোন প্রকার জুলুম করা হইবে না। (বাকার : ২৮১)

② يَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ۖ وَلَا مَآعِيْلَتٌ مِنْ سُوْرِ ۖ كَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيْدًا ۖ وَيَعْدِي رُكُومًا اللَّهُ نَفْسَهُ ۖ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ○

② যেইদিন প্রত্যেক ব্যক্তি—সে যে কোন সংকাজ করিয়াছে অথবা যে

কোন মন্দকাজ করিয়াছে, নিজের সম্মুখে উপস্থিত পাইবে। আর আকাঙ্ক্ষা করিবে, হায়! যদি এইদিন ও তাহার মাঝে অনেক দূরের ব্যবধান হইত। আর আল্লাহ তায়ালা নিজ হইতে তোমাদিগকে ভয় প্রদর্শন করেন। আর আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান (এই দয়ার কারণেই ভয় প্রদর্শন করা হয়; যাহাতে তোমরা তাহার আজাবে গ্রেফতার না হইয়া যাও)। (আলি-ইমরান : ৩০)

﴿ ৩ ﴾ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

③ এবং যে ব্যক্তি খেয়ানত করিবে, সে তাহার খেয়ানতকৃত বস্তুকে কিয়ামতের দিন (হাশরের ময়দানে) লইয়া আসিবে। অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার কৃতকর্মের পরিপূর্ণ বদলা দেওয়া হইবে।

(আলি-ইমরান : ১৬১)

﴿ ৫ ﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۖ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ الْجُودَ كُلَّ يَوْمٍ الْقِيَمَةِ ۝

⑤ প্রত্যেক ব্যক্তিকে মৃত্যুর স্বাদ অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। এবং তোমাদের (নেক ও বদ) আমলসমূহের পুরাপুরি বদলা কিয়ামতের দিনেই দেওয়া হইবে। (আলি-ইমরান : ১৮৫)

﴿ ৫ ﴾ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

⑤ (এই আয়াত কুরআন পাকের অনেক জায়গায় উল্লেখিত হইয়াছে) আল্লাহ তায়ালা অনেক জলদি হিসাব গ্রহণকারী (অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির হিসাব-কিতাব অনেক জলদি পুরা করিয়া দেওয়া হইবে এবং সেই অনুযায়ী বদলা দেওয়া হইবে)।

﴿ ৬ ﴾ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ۖ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ۝

⑥ আর ঐদিন (কিয়ামতের দিন আমলসমূহের) অবশ্যই ওজন করা হইবে। সুতরাং যে ব্যক্তির (নেক আমলের) পাল্লা ভারী হইবে, এইরূপ লোকেরা সফলকাম হইবে। আর যে ব্যক্তির (নেক আমলসমূহের) পাল্লা হালকা হইবে, এইরূপ লোকেরাই নিজেদের ক্ষতি করিয়াছে। কেননা,

তাহারা আমার আয়াতসমূহের হক নষ্ট করিত। (আরাফ : ৮-৯)

④ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَكْفُرُونَ ط

④ নিঃসন্দেহে আমার দূতগণ (ফেরেশতাগণ) তোমাদের সকল অন্যায়সমূহকে লিপিবদ্ধ করিতেছে। (আর ঐ সবকিছুর বদলা তোমাদিগকে কিয়ামতের দিন দেওয়া হইবে—যখন লিখিত এই সবকিছু সম্মুখে আনা হইবে।) (ইউনুস : ২১)

⑤ وَالَّذِينَ كَفَرُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا
وَبِزْءِهَا زِلْ ط مَا لِقَوْمٍ أَلَدٍ مِنْ عَاصِرٍ ط

⑤ আর যে সমস্ত লোক মন্দকাজ করিয়াছে, তাহাদের মন্দকাজের শাস্তি উহার সমান সমান মিলিবে এবং অপমান তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া লইবে এবং তাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালা শাস্তি হইতে রক্ষা করিবার কেহ হইবে না। (এবং তাহাদের মুখমণ্ডল এমন কালো হইবে) যেন তাহাদের চেহারার উপর স্তরে স্তরে অন্ধকার রাত্রি ভাঁজ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

(ইউনুস : ২৭)

⑥ هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مِمَّا أَسْلَفَتْ ط

⑥ ঐ স্থানে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের পূর্বকৃত আমলসমূহকে (যাহা দুনিয়াতে করিয়াছিল) যাচাই করিয়া লইবে (অর্থাৎ তাহারা কোন্ ধরনের নেক কাজ অথবা বদ কাজ করিয়াছিল। অতঃপর উহার হিসাব হইয়া যাইবে)। (ইউনুস : ৩০)

⑦ ۱- لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى ط وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا
لَهُ لَوَ أَنَّهُمْ فَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَا فُتْدُوا بِهِ ط
أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ ○

⑦ ১০) যে সমস্ত লোক নিজেদের প্রাতিপালকের কথা মানিয়া লইয়াছে তাহাদের জন্য উত্তম বিনিময় রহিয়াছে, আর যাহারা তাহার কথা মানে নাই তাহাদের নিকট যদি দুনিয়ার সমস্ত জিনিস হয় ; (বরং) উহার সহিত সেই পরিমাণ আরও জিনিস হয়, তবে এই সবকিছুকে নিজের আত্মরক্ষার জন্য দিয়া দিবে। (এবং) তাহাদের কঠিন হিসাব হইবে। (রাদ : ১৮)

⑧ ۱۱) فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْعُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ط

১১) অতএব (হে মুহাম্মদ (সাঃ) : আপনার জিম্মায় তো শুধু পৌছাইয়া দেওয়া আর (উহার উপর আমল করা না করার) হিসাব আমার জিম্মায়। (রাদ : ৪০)

১২) رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ○

১২) হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাকে এবং আমার পিতামাতাকে এবং সকল মুমিনকে হিসাব কায়েম হওয়ার দিন মাফ করিয়া দিন। (ইহা হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর দোয়া।) (ইবরাহীম : ৪১)

১৩) وَتَرَى الْمُحْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ○ سَرَابِهُمُ مِّنْ قَطْرَانٍ وَتَفْشَىٰ وَجُوهُهُمْ النَّارُ ○ لِيُجْزَىٰ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ فَكَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ○

১৩) এবং তুমি ঐদিন অপরাধীদেরকে জিঞ্জিরে আবদ্ধ দেখিবে এবং তাহাদের জামা আলকাতরা (চিড় বৃক্ষের তেল) এর হইবে। (কেননা, এই তেলে পেট্রলের মত জলদি আগুন ধরিয়া যায়) এবং তাহাদের মুখমণ্ডলের উপর আগুন ছাইয়া থাকিবে। এই সমস্ত কষ্ট এইজন্য হইবে) যাহাতে আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার কৃতকর্মের শাস্তি প্রদান করেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা অনেক জলদি হিসাব গ্রহণকারী।

(ইবরাহীম : ৪৯-৫১)

১৪) وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلَئِامُهُ ظِلْرُهُ فِي عُنُقِهِ ○ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا ○ يَلْقَاهُ مَنشُورًا ○ أَتْرَأُ كِتَابَكَ ○ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ○

১৪) এবং আমি প্রত্যেক মানুষের আমলকে (ভাল হউক বা মন্দ হউক) তাহার গলার হার বানাইয়া রাখিয়াছি। কিয়ামতের দিন আমি তাহার আমলনামা তাহার সম্মুখে করিয়া দিব, সে উহা উন্মুক্ত দেখিতে পাইবে। (এবং তাহাকে বলা হইবে) নিজের আমলনামা নিজেই পড়িয়া লও। আজকে তোমার হিসাবের জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট (অর্থাৎ নিজেই হিসাব করিয়া লও। অন্য কাহারও প্রয়োজন হইবে না)।

(বনী ইসরাঈল : ১৩-১৪)

১৫) لَا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ ○ الْآيَةُ

১৫) (কাফেররা যাহা মনে করিতেছে তাহা) কখনও নয়, আমি প্রত্যেক ঐ কথা লিখিয়া লই যাহা কেহ মুখে বলে (অতঃপর কিয়ামতের

দিন লিখিত ঐ আমলনামা তাহার সম্মুখে রাখিয়া দেওয়া হইবে)।

(মারইয়াম : ৭৯)

①৬ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ

①৬ লোকদের হিসাবের সময় তো নিকটবর্তী হইয়া গিয়াছে। অথচ তাহারা এখনও গাফলতির মধ্যেই পড়িয়া রহিয়াছে (এবং উহার প্রস্তুতি হইতে) বিমুখ হইয়া রহিয়াছে। (আম্বিয়া : ১)

①৭ فَإِذَا نُفِخَ فِي الْقُورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ○ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ○ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ○ تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ النَّارَ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ○

①৭ অতঃপর যখন (কিয়ামতের দিন) শিঙ্গায় ফুক দেওয়া হইবে, তখন (এত বেশী ভয়-ভীতি হইবে যে,) পরস্পর আত্মীয়তার সম্পর্কও ঐদিন থাকিবে না। (অর্থাৎ সকলেই অপরিচিতের মত হইয়া যাইবে) পিতা-পুত্র হইতে পলায়ন করিবে ইত্যাদি ইত্যাদি। যেমন, সূরা আবাছায় বর্ণিত হইয়াছে (يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ) এবং কেহ কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিবে না (এবং আমলের পাল্লা কায়ম করিয়া দেওয়া হইবে)। অতঃপর যেই ব্যক্তির পাল্লা ভারী হইবে (অর্থাৎ যাহার নেকীসমূহ ঝুকিয়া যাইবে)—এইরূপ লোকেরাই তো কামিয়াব হইবে। আর যে ব্যক্তির পাল্লা হালকা হইবে, তাহারা ঐ সমস্ত লোক হইবে—যাহারা নিজেদের ক্ষতি করিয়াছে। তাহারা জাহান্নামে চিরকাল থাকিবে। আগুন তাহাদের চেহারাকে ঝলসাইয়া দিবে এবং উহাতে তাহাদের মুখমণ্ডল বিকৃত হইয়া যাইবে। (মুমিনুন : ১০১-১০৪)

①৮ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ مُّتَبَعَةٍ يَّتَخَسَّبُهُ الظُّلُمَانُ ○ مَاءٌ مَّحْضٍ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ قِوْفَهُ ○ حِسَابُهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ○

①৮ আর যাহারা কাফের (এবং হিদায়েতের নূর হইতে দূরে রহিয়াছে) তাহাদের আমল এমন, যেমন মরুভূমির মধ্যে চিকচিকা বালু। পিপাসার্ত মানুষ উহাকে (দূর হইতে) পানি মনে করে। অবশেষে যখন উহার নিকট

আসে, তখন সেখানে কিছুই পায় না। এবং পায় সেখানে আল্লাহ তায়ালাকে। অতঃপর তিনি তাহার সমস্ত হিসাব সেখানেই চুকাইয়া দেন। আর আল্লাহ তায়ালা অতি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (নূর : ৩৯)

﴿١٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ

بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ○

﴿১৯﴾ যে সমস্ত লোক আল্লাহর রাস্তা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের জন্য কঠিন আযাব রহিয়াছে। কারণ, তাহারা হিসাবের দিনকে ভুলিয়া রহিয়াছে। (সোয়াদ : ১৬)

﴿٢٠﴾ الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ

سَرِيعُ الْحِسَابِ ○

﴿২০﴾ আজ (কিয়ামত)এর দিন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার কৃতকর্মের বদলা দেওয়া হইবে। আজ জুলুম নাই, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা অতি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (মুমিন : ১৭)

﴿٢١﴾ وَتَوَلَّى كُلُّ أُمَّةٍ جَائِئَةٌ تَفْ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ

تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ○ هَذَا كِتَابُنَا يُطِيقُ عَلَيْكُمْ

بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ○

﴿২১﴾ এবং আপনি (কিয়ামতের দিন) প্রত্যেক দলকে দেখিবেন যে, (তাহারা ভয়ের কারণে) হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িবে। প্রত্যেক দলকে তাহাদের কিতাব (আমলনামা)এর দিকে ডাকিয়া আনা হইবে। (এবং তাহাদিগকে বলা হইবে) আজ তোমাদিগকে তোমাদের কৃতকর্মের বদলা দেওয়া হইবে (এবং বলা হইবে) যে, ইহা আমাদের কিতাব (যাহার মধ্যে তোমাদের আমলসমূহ লিখিত আছে) তোমাদের আমলসমূহকে ঠিক ঠিক বলিয়া দিতেছে। আমি (দুনিয়াতে ফেরেশতাদের দ্বারা) তোমাদের আমলসমূহকে লিখাইয়া রাখিতাম (যাহা এখন তোমাদের সম্মুখে রহিয়াছে)। (জাহিয়া : ২৮-২৯)

﴿٢٢﴾ إِذْ يَتَلَفَّى السَّمَلِيُّونَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ○

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ○

﴿২২﴾ যখন দুই জন গ্রহণকারী (কথাকে তাড়াতাড়ি লিপিবদ্ধকারী দুই ফেরেশতা) গ্রহণ করিতে থাকে এবং ডানদিকে ও বামদিকে বসিয়া থাকে।

সে (অর্থাৎ মানুষ) যখনই কোন শব্দ জবান হইতে বাহির করে, তখনই একজন অপেক্ষমান প্রস্তুত থাকে (এবং সে তৎক্ষণাৎ উহা লিখিয়া লয়, ইহাই আমলনামা)। (ক্বাফ : ১৭)

﴿ ২৩ ﴾ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ۝ فَأَمَّا مَنْ أُوِّ
كُتِبَتْهُ يَمِينُهُ ۖ فَيَقُولُ هَٰؤُلَاءِ أَتْرُوكُوا كِتَابِيَةَ ۖ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي
مُلِقٌ حِسَابِيَةَ ۖ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ۖ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۖ قُطُوفُهَا
دَانِيَةٌ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ۖ
وَأَمَّا مَنْ أُوِّكُتِبَتْهُ شِمَالُهُ ۖ فَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَةَ ۖ
وَلَمْ أَدْرِكْ مَا حِسَابِيَةَ ۖ يَلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ۖ مَا أَغْنَىٰ
عَنِّي مَالِي ۖ هَلْكَ عَنِّي سُلْطَانِيَّةٌ ۖ خَذَوُهَا فَعَلَّوْهُ ۖ ثُمَّ الْجَبِيمَ
صَلَّوْهُ ۖ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ۖ

﴿ ২৩ ﴾ যেইদিন তোমাদিগকে (আল্লাহ তাযালার সম্মুখে হিসাবের জন্য) উপস্থিত করা হইবে, তোমাদের কোন কথা গোপন থাকিবে না। অতঃপর (আমলনামা প্রত্যেকের হাতে দিয়া দেওয়া হইবে, অতএব) যেই ব্যক্তির আমলনামা তাহার ডান হাতে দেওয়া হইবে, সে তো (আনন্দের আতিশয্যে অন্যদেরকে) বলিবে, দেখ আমার আমলনামা, পড়িয়া লও, আমার তো (পূর্ব হইতেই) বিশ্বাস ছিল যে, আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হইতে হইবে (আমি তো দুনিয়াতেই উহার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছিলাম।) অতএব, এই ব্যক্তি তো পছন্দনীয় জীবন অর্থাৎ উচ্চ বেহেশতের মধ্যে থাকিবে। যাহার ফলসমূহ ঝুকিয়া থাকিবে (এবং তাহাকে বলা হইবে) আনন্দের সহিত খাও এবং পান কর ঐ সমস্ত আমলের বদলায় যাহা তুমি বিগতকালে করিয়াছ। আর যে ব্যক্তির আমলনামা তাহার বামহাতে দেওয়া হইবে, সে (অত্যন্ত আফসোস ও দুঃখসহকারে) বলিবে, কতই না ভাল হইত ; যদি আমাকে আমার আমলনামা দেওয়াই না হইত এবং আমার এই খবরই না হইত যে, আমার হিসাব কি জিনিস। হায় ! মৃত্যু (যাহা আসিয়াছিল উহাই) যদি সমস্ত কিছু শেষ করিয়া দিত। (আফসোস) আমার সম্পদ আমার কোন কাজে আসিল না। আমার প্রভাব-প্রতিপত্তিও আমার নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছে। (এই ব্যক্তির জন্য ভকুম হইবে যে,) তাহাকে ধর। তাহার গলায় বেড়ী পরাইয়া দাও। অতঃপর তাহাকে

জাহান্নামে দাখেল করিয়া দাও। তারপর সত্তর গজ লম্বা শিকলে তাকে আবদ্ধ কর। (হাক্বাহ : ১৮-৩২) (এই আয়াতের কিছু অংশ কৃপণতার বিবরণে ১৪ নম্বরে অতিবাহিত হইয়াছে।)

(২৩) وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ط

(২৪) এবং তোমাদের উপর নিযুক্ত রহিয়াছে (এমন ফেরেশতাগণ যাহারা তোমাদের সকল কাজের) সংরক্ষক, যাহারা সম্মানিত (এবং প্রত্যেক কাজকে) লিপিবদ্ধকারী, যাহারা তোমাদের সমস্ত কাজকর্মকে জানে (এবং লিপিবদ্ধ করিয়া রাখে, কিয়ামতের দিন এই সবকিছু একসঙ্গে পেশ করা হইবে।) (ইনফিতার : ১০-১২)

(২৫) فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ يَمِينًا ۖ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ
حِسَابًا يَسِيرًا ۖ وَنُفِّلَ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۖ وَأَمَّا مَنْ
أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ۖ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ۖ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ۖ
إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۖ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّنْ يَخُورَ ۖ

(২৫) অতএব, যে ব্যক্তির আমলনামা তাহার ডান হাতে মিলিবে, শীঘ্র তাহার সহজ হিসাব লওয়া হইবে এবং সে (উহা হইতে অবসর হইয়া) সানন্দে আপন পরিজনের নিকট আসিবে। আর যে ব্যক্তির আমলনামা (তাহার বাম হাতে) পিঠের পিছন হইতে দেওয়া হইবে, সে মৃত্যুকে ডাকিবে (যেমন বিপদের সময় ডাকা হইয়া থাকে) এবং জাহান্নামে দাখেল হইবে। এই ব্যক্তি (দুনিয়াতে) নিজের ঘরে অত্যন্ত আনন্দ সহকারে থাকিত, সে ধারণা করিয়া রাখিয়াছিল যে, তাকে আল্লাহর নিকট যাইতেই হইবে না। (ইনশিকাক : ৭-১৪)

(২৬) إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ

(২৬) নিঃসন্দেহে তাহাদের সকলকে আমরাই নিকট ফিরিয়া আসিতে হইবে। অতঃপর তাহাদের হিসাব লওয়া আমরাই কাজ হইবে।

(গাশিয়া : ২৫-২৬)

﴿٢٤﴾ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ
 زِلْزَالًا ۖ وَآخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۖ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ۚ
 يَوْمَئِذٍ تُخْبِتُ أَخْبَارَهَا ۖ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ بَرَأْتَ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ
 يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ۖ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ
 ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۖ ○

(২৭) যখন জমিনকে সম্পূর্ণরূপে প্রকম্পিত করা হইবে (যখন সমস্ত
 দুনিয়া জুড়িয়া ভূমিকম্প হইবে, তখন জানা কথা যে, উহা কত বড়
 কম্পন হইবে) এবং জমিন উহার ভিতরের সমস্ত বোঝা (প্রাণিত ধনবস্তু
 হউক বা মূর্দাগণ হউক) বাহিরে নিক্ষেপ করিবে এবং মানুষ (দিশাহারা
 হইয়া) বলিবে, ইহার কি হইয়া গেল, সেই দিন জমিন (উহার উপর
 যাহা কিছু ভাল বা মন্দ কাজ করা হইয়াছে) সব কিছুর খবর বলিয়া দিবে।
 এই কারণে যে, উহার প্রতি আপনার প্রতিপালকের ইহাই হুকুম হইবে
 (যেমন সামনে বিভিন্ন রেওয়াজাতে উহার বর্ণন আসিতেছে)। ঐদিন
 লোকেরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত (কোন দল নৈকট্যপ্রাপ্তদের, কোন দল নেক
 লোকদের, কোন দল জাহান্নামীদের হইবে, আবার প্রত্যেক দলের মধ্যে
 বিভিন্ন উপদল হইবে, এমনভাবে কোন দল সওয়ারীদের হইবে আবার
 কোন দল পদচারীদের হইবে, আবার কোন দল ঐ সমস্ত লোকের হইবে
 যাহাদিগকে অধঃমুখে হেঁচড়াইয়া লইয়া যাওয়া হইবে। মোটকথা,
 সর্বপ্রকার বিভিন্ন রকমের দল) হইয়া প্রত্যাবর্তন করিবে, যাহাতে
 নিজদের আমলসমূহ (যাহা তাহারা দুনিয়াতে করিয়াছিল) দেখিয়া লয়।
 অতএব, যে ব্যক্তি (দুনিয়াতে) রেণু পরিমাণ নেক কাজ করিবে সে উহাকে
 সেইখানে দেখিয়া লইবে, আর যে ব্যক্তি রেণু পরিমাণ খারাপ কাজ করিবে
 সে উহাকে সেইখানে দেখিয়া লইবে। (ফিলফাল)

নমুনা স্বরূপ এই সাতাইশটি আয়াত 'হিসা-কিতাব ও আমলের বদলা'
 সম্পর্কিত উল্লেখ করা হইল। এইগুলি ছাড়া শত শত আয়াতে বিভিন্ন
 শিরোনামে এই সব বিষয় এবং এই ধরনের অনেক বিষয় বর্ণিত
 রহিয়াছে। এমনভাবে হাদীস শরীফেও হাজারো রেওয়াজাতের মধ্যে এই
 হিসাবের দিনের কঠিন অবস্থাসমূহ উল্লেখ করা হইয়াছে, যেইগুলিকে এক
 জায়গায় একত্রিত করা কঠিন। কিন্তু ইহাও জরুরী যে, নিজের ঐ সমস্ত
 সময় যাহা শুধু দুনিয়া কামাইয়ের মধ্যে নষ্ট করা হয়, উহা হইতে কিছু
 সময় হইলেও ভবিষ্যতে কাজে আসিবে—এমন জিনিসের মধ্যে ব্যয় করা

উচিত। এখন সময় হাতে আছে, কিছু করা সম্ভব। অচিরেই এমন সময় আসিতেছে, যখন আফসোস করা ছাড়া আর কিছুই থাকিবে না। নমুনাস্বরূপ কয়েকটি হাদীসের তরজমাও এইখানে লেখা হইতেছে।

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) একবার জাহান্নামকে স্মরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কি হইয়াছে, কেন কাঁদিতেছ? হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলিলেন, জাহান্নামের কথা আমার মনে পড়িয়াছে, এইজন্য কাঁদিতেছি। আপনারা সেই দিন নিজেদের পরিবার-পরিজনকেও স্মরণ করিবেন কি? হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তিনটি সময় তো এমন, যখন কেহ কাহাকেও স্মরণ করিবে না। এক—ওজনের সময় (যখন আমলসমূহ ওজন করিবার সময় হইবে) ; যতক্ষণ না তাহার জানা হইবে যে, তাহার (নেকীর) পাল্লা ঝুকিতেছে কিনা। দ্বিতীয়—যখন এই ঘোষণা করা হইবে যে, আস, নিজ নিজ হিসাবের কিতাব লইয়া লও, তখন কেহ কাহাকেও স্মরণ করিবে না ; যতক্ষণ না জানা হইবে যে, সে আমলনামা ডান হাতে পাইতেছে, নাকি পিঠের পিছনের দিক হইতে বাম হাতে পাইতেছে। তৃতীয়—পুলসিরাতের সময় ; যখন উহা জাহান্নামের উপর স্থাপন করা হইবে (এবং উহার উপর চলিতে হইবে) ; যতক্ষণ না মানুষ উহার উপর দিয়া নিরাপদে অতিক্রম করিয়া যাইবে। (মিশকাত)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, কিয়ামতের দিন হিসাব করা হইবে—যাহার নেকীসমূহের মধ্যে একটিও বেশী হইবে সে জান্নাতে চলিয়া যাইবে আর যাহার গুনাহসমূহের মধ্যে একটিও বেশী হইবে সে জাহান্নামে যাইবে। ইহার পর তিনি **فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ** আয়াতটি পড়িলেন। যাহা উপরে ৬নম্বরে উল্লেখ করা হইয়াছে। অতঃপর বলিলেন, একটি দানা দ্বারাও পাল্লা ঝুকিয়া যাইবে। আর যাহার নেকী ও বদী বরাবর হইবে, সে আ'রাফ নামক স্থানে থাকিবে। (যাহা জান্নাত ও দোযখের মধ্যবর্তী একটি স্থান।)

হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, যাহার বাহির তাহার ভিতর অপেক্ষা বেশী ভাল হইবে, তাহার ওজন হালকা হইবে। আর যাহার ভিতর বাহির অপেক্ষা বেশী ভাল হইবে তাহার ওজন ভারী হইবে।

হযরত আনাস (রাযিঃ) হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করেন যে, একজন ফেরেশতা পাল্লার নিকট নিযুক্ত থাকিবে—যাহার পাল্লা ভারী হইবে সে এমন উচ্চস্বরে ঘোষণা করিবে ; যাহা সমস্ত মখলুক শুনিবে যে, অমকের বেটা অমুক সৌভাগ্যবান হইয়া

গিয়াছে ; আর এমন সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে যাহার পর দুর্ভাগ্য নাই। আর যদি তাহার পাল্লা হালকা হয়, তবে অনুৰূপভাবেই তাহার দুর্ভাগ্যের বিষয় ঘোষণা করিবে, যাহা সমস্ত মখলুক শুনিবে। বিভিন্ন রেওয়াজাতে আসিয়াছে, সেই পাল্লা এত বড় হইবে যে, আসমান-জমিন এবং উহাদের মধ্যস্থলে যাহা কিছু আছে সব উহার এক পাল্লায় আসিয়া যাইবে।

হযরত জাবের (রাযিঃ) হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন যে, পাল্লার মধ্যে সর্বপ্রথম ঐ খরচ রাখা হইবে যাহা মানুষ নিজের পরিবার-পরিজনের উপর ব্যয় করিয়াছে।

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু যর (রাযিঃ)কে এরশাদ করিলেন যে, এমন দুইটি অভ্যাস তোমাকে বলিয়া দিব, যাহা আমল করিতে অনেক সহজ, ওজনে অনেক ভারী। এক হইল উত্তম অভ্যাস, দ্বিতীয় চুপ থাকা (অর্থাৎ বেকার কথাবার্তা হইতে বাঁচিয়া থাকা)।

অন্য এক হাদীসে আছে, দুইটি কালেমা এমন রহিয়াছে, যাহা আল্লাহ তায়ালার নিকট অত্যন্ত প্রিয়। জবানে অনেক হালকা এবং দাড়িপাল্লায় অনেক ভারী, উহা 'সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল-আযীম'।

এক হাদীসে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি তাহার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করিবে, আমি তাহার পাল্লার নিকট দাঁড়াইব। যদি তাহার নেকীসমূহ বাড়িয়া যায়, তবে তো অনেক ভাল, না হয় আমি তাহার জন্য সুপারিশ করিব।

এক হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন আলেমগণের লেখার কালি এবং শহীদগণের রক্তও ওজন করা হইবে। আলেমগণের লেখার কালির ওজন শহীদগণের রক্তের চাইতে বেশী ভারী হইবে।

হযরত ঈসা (আঃ) বলিয়াছেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের আমলনামার ওজন অন্যান্য উম্মতের চাইতে অনেক বাড়িয়া যাইবে। কেননা, তাহাদের জবান কালেমায়ে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর সহিত অত্যন্ত অভ্যস্ত হইবে।

হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বলেন, যে ব্যক্তি সবসময় পেট এবং লজ্জাস্থানেরই চিন্তায় লাগিয়া থাকে, তাহার ওজন হালকা হইবে।

(দুররে মানসুর)

এক হাদীসে বর্ণিত আছে, যে ফেরেশতা ডানদিকে থাকে এবং নেকীসমূহ লিপিবদ্ধ করে, সে বামদিকের ফেরেশতার উপর আমীর হয়। যখন বান্দা কোন নেক কাজ করে, তখন ডানদিকের ফেরেশতা উহার সওয়াব দশগুণ লিখিয়া লয়। আর যখন কেহ গুনাহ করে এবং

বামদিকের ফেরেশতা উহা লিখিবার ইচ্ছা করে, তখন সে অধীন হওয়ার কারণে আমীরের নিকট হইতে লিখিবার অনুমতি চায়। তখন আমীর অর্থাৎ ডানদিকের ফেরেশতা বলে, এখনও ছয় সাত ঘণ্টা অপেক্ষা কর। যদি বান্দা এই সময়ের মধ্যে উক্ত গুনাহ হইতে তওবা করিয়া লয়, তবে সে লিখিবার অনুমতি দেয় না। আর যদি তওবা না করে, তবে সে লিখিয়া লয়। (দুররে মানসুর)

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, কিয়ামতের দিন তিনটি আদালত হইবে—প্রথম দুইটিতে জিজ্ঞাসাবাদ, প্রশ্ন উত্তর, ওজর, আপত্তি ইত্যাদি হইবে। আর তৃতীয়টিতে আমলনামাসমূহ হাতে দিয়া দেওয়া হইবে—কাহারও ডান হাতে, কাহারও বাম হাতে। (দুররে মানসুর)

এক হাদীসে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত আছে, যেই ব্যক্তির মধ্যে তিনটি বিষয় থাকিবে আল্লাহ তায়ালা তাহার হিসাব অত্যন্ত সহজ করিয়া লইবেন এবং আপন রহমতে জালাতে দাখেল করিয়া দিবেন। এক, যে ব্যক্তি তোমাকে নিজ অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত রাখে, তুমি তাহার উপর অনুগ্রহ কর। দ্বিতীয়, যে ব্যক্তি তোমার সহিত আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে, তুমি তাহার সহিত সম্পর্ক জুড়িয়া রাখ। তৃতীয়, যে তোমার উপর জুলুম করে, তুমি তাহাকে মাফ করিয়া দাও।

(দুররে মানসুর)

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, (আখেরাতের অবস্থাসমূহ হইতে) যাহাকিছু আমি জানি তাহা যদি তোমরা জানিতে, তবে তোমরা (ভয়-ভীতির কারণে) কম হাসিতে এবং বেশী কাঁদিতে, আর স্ত্রীলোকদের সহিত বিছানায় আনন্দ উপভোগ ছাড়িয়া দিতে এবং চিৎকার করিতে করিতে ময়দানের দিকে বাহির হইয়া যাইতে।

হযরত আবু যর (রাযিঃ) হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদ শুনিয়া বলিতে লাগিলেন, হায়! আমি যদি একটি বৃক্ষ হইতাম আর উহাকে কাটিয়া ফেলা হইত (অর্থাৎ মানুষই না হইতাম যে কারণে এত মুসীবত সহ্য করিতে হয়)!

অন্য এক হাদীসে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত আছে, মানুষ যেই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিবে, সেই অবস্থায়ই তাহাকে কিয়ামতের দিন উঠানো হইবে। (অর্থাৎ যেই নেক কাজে অথবা বদ কাজে মশগুল অবস্থায় মৃত্যু হইবে, সেই অবস্থায়ই তাহার হাশর হইবে। (মিশকাত)

একবার হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াজ করিলেন। উহাতে এরশাদ করিলেন, তোমরা মনোযোগ সহকারে শুনিয়া লও যে, দুনিয়া একটি ক্ষণস্থায়ী ফায়দা হাসিল করিবার বস্তু মাত্র। যাহা দ্বারা ভাল-মন্দ সবারকমের মানুষ ফায়দা হাসিল করে। (অতএব, এই দুনিয়া দ্বারা বেশী ফায়দা লাভ করা কোন কল্যাণের আলামত নয়।) পক্ষান্তরে, আখেরাত একটি নির্ধারিত জিনিস। যাহা অবশ্যই নির্ধারিত সময়ে আসিবে এবং উহাতে এমন এক বাদশাহ ফয়সালা করিবেন, যিনি সমস্ত জিনিসের উপর ক্ষমতা রাখেন (তাহার ক্ষমতা অনেক বেশী প্রশস্ত)। কল্যাণের বিষয় সম্পূর্ণই জাহান্নামে রহিয়াছে। (অতএব, মানুষ যে সংকাজই করিতে পারে উহাতে যেন ভ্রুটি না করে। কেননা, উহা তাহাকে জাহান্নামে লইয়া যাইবে।) আর মন্দ বিষয় সম্পূর্ণই জাহান্নামে রহিয়াছে। (অতএব, সামান্যতম মন্দ কাজ হইতেও বাঁচিবার চেষ্টা করা চাই, উহাকে তুচ্ছ মনে না করা চাই। কেননা, সামান্য পরিমাণ অসংকাজও জাহান্নামের দিকে লইয়া যাইবে।) গুরুত্বসহকারে নেক আমল করিতে থাক। তোমরা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে অত্যন্ত আশংকাজনক অবস্থায় রহিয়াছ। (আল্লাহ তায়ালার হইতে কখনও নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয়।) এই কথা উত্তমরূপে জানিয়া লও যে, তোমাদিগকে তোমাদের আমলের সম্মুখীন করা হইবে (এবং উহার হিসাব হইবে)। যে ব্যক্তি অণু পরিমাণও নেক কাজ করিবে, সে উহা দেখিতে পাইবে। আর যে ব্যক্তি অণু পরিমাণও অন্যায় করিবে, সে উহাও দেখিতে পাইবে। (মিশকাত)

হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, দুনিয়া দিন দিন মুখ ফিরাইয়া লইতেছে অর্থাৎ দূর হইতে চলিয়াছে। আর আখেরাত দিন দিন নিকটবর্তী হইতেছে। আর (দুনিয়া ও আখেরাত) উভয়ের নিজস্ব সন্তান-সন্ততি রহিয়াছে, সুতরাং তোমরা দুনিয়ার সন্তান হইও না, বরং আখেরাতের সন্তান হও। আজ আমলের দিন ; হিসাবের দিন নয় এবং কাল হিসাবের দিন ; আমলের দিন থাকিবে না। (মিশকাত)

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কিয়ামতের দিন তিনটি আদালত হইবে। এক আদালতে ক্ষমা বলিতে কিছুই থাকিবে না। আর তাহা হইল, আল্লাহ তায়ালার সহিত কাহাকেও শরীক করা (অর্থাৎ এই আদালতে তো শুধু ঈমান ও কুফরের মোকদ্দমা পেশ হইবে এবং এই আদালতে অপরাধ ক্ষমার প্রশ্নই নাই)। দ্বিতীয় আদালতে আল্লাহ তায়ালার পাওনাদারদেরকে তাহাদের হক অবশ্যই আদায় করাইয়া দিবেন (চাই নিজের পক্ষ হইতে প্রদান করিয়া হউক অথবা যাহার নিকট পাওনা

রহিয়াছে তাহার নিকট হইতে উসূল করিয়া হউক)। এই আদালত বাস্তাদের পরস্পর একে অপরের উপর জুলুমের আদালত। ইহাতে জালেমের নিকট হইতে মজলুমের বদলা উসূল করিয়া দেওয়া হইবে। তৃতীয় আদালত—আল্লাহ তাযালার নিজের হক সম্পর্কে হইবে। (অর্থাৎ ফরজ ইত্যাদির মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতির বিষয় হইবে।) ইহাতে আল্লাহ তাযালা বিশেষ কোন পরওয়া করিবেন না। কারণ, ইহা দয়ালু আল্লাহর নিজের হকের বিষয়। তিনি চাহিলে জবাব তলব করিবেন অথবা মাফ করিয়া দিবেন। (মিশকাত)

অন্য এক হাদীসে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তির জিম্মায় তাহার কোন ভাইয়ের হক রহিয়াছে ; তাহার উপর ইয্যত অথবা সম্পদ সম্পর্কীয় কোন সীমালংঘন ও জুলুম করিয়াছে—উহা আজ্জই ক্ষমা করাইয়া লও ; ঐদিন আসিবার পূর্বেই মিটাইয়া লও, যেইদিন না দিনার থাকিবে, না দেবহাম (না টাকা পয়সা, না স্বর্ণমুদ্রা বা রৌপ্যমুদ্রা বরং সেই দিন সমস্ত হিসাব নেক আমল ও গুনাহসমূহের দ্বারা হইবে)। কাজেই জুলুমকারী ব্যক্তির নিকট যদি কিছু নেক আমল থাকে, তবে তাহার জুলুম পরিমাণ নেকী লইয়া মজলুম ব্যক্তিকে দিয়া দেওয়া হইবে। আর যদি তাহার নিকট নেক আমল না থাকে, তবে মজলুমের সেই পরিমাণ গুনাহ তাহার উপর চাপাইয়া দেওয়া হইবে। (যদরুন নিজের গুনাহের সাথে সাথে অন্যের গুনাহের শাস্তি হিসাবে জাহান্নামের মধ্যে কিছু বেশী সময় পড়িয়া থাকিতে হইবে)।

(মিশকাত)

অন্য এক হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন পাওনাদারদের হক অবশ্যই দেওয়া হইবে। এমনকি শিংবিহীন বকরীর জন্য শিংওয়ালা বকরী হইতে বদলা লওয়া হইবে। (মিশকাত) অর্থাৎ, যদি দুনিয়াতে শিংওয়ালা কোন বকরী শিংবিহীন কোন বকরীকে আঘাত করিয়া থাকে আর শিং না থাকার দরুন সে দুনিয়াতে উহার বদলা লইতে পারে নাই, তবে সেই বকরীর বদলাও হাশরের দিন লওয়া হইবে।

একবার হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তোমরা কি জান—গরীব কে? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, আমাদের নিকট তো গরীব ঐ ব্যক্তিকে মনে করা হয়, যাহার নিকট দেবহাম (টাকা পয়সা) নাই, ধন-সম্পদ নাই। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমার উম্মতের মধ্যে গরীব ঐ ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন অনেক নামায, রোযা, যাকাত লইয়া আসিবে, কিন্তু সে

কাহাকেও গালি দিয়াছিল, কাহারও উপর অপবাদ লাগাইয়াছিল, কাহারও মাল খাইয়াছিল, কাহাকেও মারিয়াছিল, সুতরাং কিছু নেকী এই ব্যক্তি লইয়া গেল, কিছু ঐ ব্যক্তি লইয়া গেল, এইভাবে যখন তাহার নেকীগুলি খতম হইয়া গেল এবং অন্যদের দাবী বাকী রহিয়া গেল, তখন তাহাদের দাবী পরিমাণ গুনাহ এই ব্যক্তির উপর চাপাইয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর ঐ (অধিক এবাদতকারী জালেম) ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে।

(মিশকাত)

ফকীহ আবুল লাইস (রহঃ) বলেন, কিয়ামতের দিন যখন লোকদেরকে নিজ নিজ কবর হইতে উঠান হইবে, তখন সত্তর বৎসর তো তাহারা এমন অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিবে যে, তাহাদের প্রতি কোন প্রকার দৃষ্টিপাত করা হইবে না। তাহারা এই পেরেশানীর কারণে এত বেশী কাঁদিবে যে, তাহাদের অশ্রু শেষ হইয়া যাইবে এবং অশ্রুর স্থলে রক্ত বাহির হইতে আরম্ভ করিবে। অতঃপর হাশরের ময়দানের দিকে ডাকা হইবে এবং আসমান হইতে ফেরেশতাগণ অবতরণ করিতে আরম্ভ করিবে। প্রত্যেক আসমানের ফেরেশতাগণ এক এক হালকা বানাইয়া এক আসমানের ফেরেশতা অন্য আসমানের ফেরেশতাদের পিছনে দাঁড়াইবে। যাহা কুরআন পাকে উল্লেখ করা হইয়াছে—

وَيَوْمَ تَشْقُقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِلَ الْمَلَكَةُ نَزِيلًا . الْمَلَكُ
يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَذَابًا . وَيَوْمَ
يَقْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا .
يَوْنُسُ لِيْتَنِي لِمَ اتَّخَذْتُ فُلَانًا خَلِيلًا . لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ
بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا .

অর্থাৎ, যেইদিন মেঘমালার উপর হইতে আসমান ফাটিয়া যাইবে এবং অধিক পরিমাণে ফেরেশতাদেরকে নামানো হইবে, সেইদিন একমাত্র রহমানেরই রাজত্ব হইবে (অর্থাৎ হিসাব-কিতাব, পুরস্কার ও শাস্তি প্রদানে কাহারও দখল থাকিবে না)। ঐ দিন কাফেরদের উপর বড় কঠিন হইবে, যেইদিন জালেমরা নিজেদের হাত কাটিয়া খাইবে এবং বলিবে, কতই না ভাল হইত যদি আমি রাসূল (সাঃ)এর সহিত সঠিক পথে চলিতাম। হায় আমার দুর্ভাগ্য (যে, আমি এইরূপ করি নাই এবং) কতই না উত্তম হইত যদি আমি অমুক ব্যক্তিকে (যে আমাকে নেক কাজ হইতে বিরত রাখিয়াছে) বন্ধু না বানাইতাম। সে আমাকে—উপদেশ আসিয়া যাওয়া

সঙ্গেও উহা হইতে পথদ্রষ্ট করিয়াছে। আর শয়তান তো মানুষকে (যথাসময়ে সম্পূর্ণরূপে) সাহায্য করার ব্যাপারে অস্বীকৃতি জানাইয়াই থাকে (যাহার বিস্তারিত ঘটনা সূরা ইবরাহীমে উল্লেখ করা হইয়াছে)।

(ফুরকান : ২৫-২৯)

অন্য এক হাদীসে ছ্যূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন যে, ঐ সময় আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে এরশাদ হইবে, হে জিন ও ইনসান! আমি দুনিয়াতে তোমাদিগকে নসীহত করিয়া দিয়াছিলাম। আজকে তোমাদের এই সমস্ত আমল তোমাদের সম্মুখে রহিয়াছে, যে ব্যক্তি তাহার আমলনামায় নেকী দেখিতে পায়, সে যেন আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করে, আর যে নেকী দেখিতে না পায়, সে যেন নিজেই নিজেকে তিরস্কার করে (কেননা, সে নসীহতের কথা মানে নাই)। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামকে হুকুম করিবেন, উহার আযাব সামনে আসিয়া যাইবে। যাহা দেখিয়া প্রত্যেক ব্যক্তি হাঁটু গাড়িয়া পড়িয়া যাইবে। যাহা সূরা জাছিয়া চতুর্থ রুকুতে বলা হইয়াছে যে, আপনি প্রত্যেক দলকে দেখিবেন হাঁটু গাড়িয়া পড়িয়া রহিয়াছে এবং প্রত্যেক দলকে নিজ নিজ আমলনামার দিকে ডাকা হইবে। উহার পর মানুষের মধ্যে ফয়সালা শুরু হইয়া যাইবে। এমনকি জীব-জন্তুর মধ্যেও ইনসাফ করা হইবে। শিংবিহীন বকরীর জন্য শিংবিশিষ্ট বকরী হইতে বদলা লওয়া হইবে। অতঃপর জীব-জন্তুদের প্রতি হুকুম হইবে—তোমরা মাটি হইয়া যাও। (তোমাদের বিষয় শেষ হইয়া গিয়াছে।) তখন কাফেররা এই আকাঙ্ক্ষা করিবে এবং কাফের বলিবে : **يَلَيِّنِي كُنْتُ تَرَابًا** অর্থাৎ, আফসোস, আমি যদি মাটি হইয়া যাইতাম! (নাবা : ৪০)

এক হাদীসে ছ্যূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষ যেইরূপ তাহাদের মায়ের পেট হইতে জন্মগ্রহণ করে, তদ্রূপ উলঙ্গ অবস্থায় তাহারা হাশরের ময়দানে থাকিবে।

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সকলের সম্মুখে উলঙ্গ হইলে কিরূপ লজ্জার বিষয় হইবে, একে অপরকে দেখিবে। ছ্যূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ঐ সময় লোকেরা এই পরিমাণ নিজেদের মুসীবতে গ্রেফতার থাকিবে যে, একে অপরকে দেখিবার সুযোগও হইবে না। সকলের চক্ষু উপরের দিকে লাগিয়া থাকিবে। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের বদআমল পরিমাণ ঘামের মধ্যে ডুবিয়া থাকিবে। কাহারও ঘাম পা পর্যন্ত উঠিবে, কাহারও গোছা পর্যন্ত, কাহারও পেট পর্যন্ত, কাহারও মুখ পর্যন্ত পৌছিয়া যাইবে। ফেরেশতাগণ আরশের চতুর্দিকে

হালকা বানাইয়া থাকিবে। তখন এক এক ব্যক্তির নাম লইয়া ডাকা হইবে। সে সকল মানুষের মধ্য হইতে বাহির হইয়া সেইখানে উপস্থিত হইবে। যখন তাহাকে আল্লাহ তায়ালা সন্মুখে উপস্থিত করা হইবে, তখন ঘোষণা করা হইবে যে, এই ব্যক্তির জিম্মায় যাহাদের দাবী রহিয়াছে তাহারা যেন উপস্থিত হয়। তাহার জিম্মায় যেই যেই ব্যক্তির হক থাকিবে অথবা এই ব্যক্তির পক্ষ হইতে যাহার উপর কোন রকম জুলুম করা হইয়া থাকিবে, তাহাদের এক একজনকে ডাকা হইবে এবং তাহার নেক আমলসমূহ হইতে তাহাদের হক আদায় করিয়া দেওয়া হইবে। আর যদি নেকী না থাকে অথবা শেষ হইয়া গিয়া থাকে, তবে ঐ সমস্ত লোকের গুনাহ তাহার উপর চাপাইয়া দেওয়া হইবে। আর যখন সে নিজের গুনাহের সহিত অন্যান্যদের গুনাহকেও মাথায় লইবে, তখন তাহাকে বলা হইবে, যাও নিজের ঠিকানা 'হাবিয়া'তে চলিয়া যাও। (সূরা আল কারিয়াহ—এর মধ্যে ইহার বিবরণ রহিয়াছে অর্থাৎ প্রজ্জলিত জাহান্নামে যাও।) হিসাব ও আযাবের এই কঠিন অবস্থা দেখিয়া কোন নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা এবং কোন নবী এমন হইবে না যাহার নিজের সম্পর্কে ভয় সৃষ্টি না হইবে। তবে যাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালা হেফাজত করিবেন তাহাদের কথা ভিন্ন। ঐ সময় প্রত্যেক ব্যক্তিকে চারটি বিষয় প্রশ্ন করা হইবে (যেমন পূর্বে এই পরিচ্ছেদের ৬ নম্বরে বিস্তারিত হাদীস উল্লেখ করা হইয়াছে) যে, জিন্দেগী কি কাজে শেষ করিয়াছ? শরীর কি কাজে লাগাইয়াছ? নিজের এলোমের উপর কি আমল করিয়াছ? আর সম্পদ কোথা হইতে উপার্জন করিয়াছ এবং কোথায় খরচ করিয়াছ?

ইকরিমা (রাযিঃ) বলেন, সেইদিন পিতা নিজের পুত্রকে বলিবে, আমি তোমার পিতা ছিলাম, তোমার জনক ছিলাম। পুত্র তাহার দয়াসমূহকে স্বীকার করিবে। অতঃপর পিতা বলিবে, আমার শুধু অণু পরিমাণ একটি নেকীর প্রয়োজন। উহার দ্বারা হয়তঃ আমার পান্না বুকিয়া যাইবে। পুত্র বলিবে, আমি নিজেই মুসীবতের সন্মুখীন। আমার নিজের অবস্থা জানা নাই যে, কি হইবে। আমি তো কোন নেকী দিতে পারি না। অতঃপর সেই ব্যক্তি নিজের স্ত্রীর নিকট অনুরূপভাবে নিজের অনুগ্রহ এবং সম্পর্কের কথা বলিয়া নেকী চাহিবে। সেও তদ্রূপ অস্বীকার করিয়া দিবে (মোটকথা, এইভাবেই প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট চাহিয়া ফিরিতে থাকিবে)। ইহাই আল্লাহ তায়ালা **وَأَنْ تَذْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَنْبِهَا لَا يَجْعَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ تَاَافِي** আয়াতে উল্লেখ করিয়াছেন। যাহার অর্থ এই—এবং (ঐ দিন) কেহ অন্যের (গুনাহের) বোঝা উঠাইবে না। (নিজে কাহারও সাহায্য করা

তো দূরের কথা।) যদি কোন বোঝা বহনকারী অর্থাৎ গুনাহগার ব্যক্তি কাহাকেও নিজের বোঝা উঠানোর জন্য ডাকে, তবুও উহা হইতে সামান্য বোঝাও উঠান হইবে না। (অর্থাৎ, তাহার কোন রকম সাহায্য করা হইবে না) যদিও সেই ব্যক্তি আত্মীয়ই হউক না কেন (ফাতির : ১৮)। (তাস্বীহুল গাফেলীন)

ইকরিমা (রাযিঃ)এর রেওয়ায়াত 'দূরে মানসূর' কিতাবে আরও স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে। যাহার তরজমা এই—পিতা পুত্রকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করিবে, আমি দুনিয়াতে তোমার সহিত কেমন আচরণ করিয়াছিলাম? সে পিতার সংব্যবহারের অনেক প্রশংসা করিবে। অতঃপর পিতা বলিবে, আমি আজ তোমার নিকট শুধু একটি নেকী চাহিতেছি। সম্ভবতঃ উহা দ্বারাই আমার কাজ হইয়া যাইবে। পুত্র বলিবে, আব্বাজান! আপনি খুবই সাধারণ জিনিস চাহিয়াছেন। কিন্তু আমি একেবারেই অপারগ। কেননা, স্বয়ং আমার নিজেরও একই ভয় হইতেছে যাহা আপনার হইতেছে। অতঃপর একই প্রশ্ন-উত্তর স্ত্রীর সহিত হইবে। যেমন এরশাদ হইয়াছে : **يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ الْاِيَةِ** আরও এরশাদ হইয়াছে : **يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْأُ مِنْ أَخِيهِ الْاِيَةِ** (দূরে মানসূর)

এই দুই আয়াতের প্রথম আয়াতটি সূরা লুকমানের শেষ রুকুতে রহিয়াছে : **يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الْاِيَةِ** আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিতেছেন, হে লোকসকল! আপন প্রতিপালককে ভয় কর এবং ঐদিনকে ভয় কর, যেদিন না কোন পিতা আপন পুত্রের নিকট হইতে কোন দাবী পূরণ করিতে পারিবে, আর না কোন পুত্র এমন হইবে, যে পিতার পক্ষ হইতে কোন দাবী পূরণ করিতে পারে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা সত্য (যে, ঐদিন অবশ্যই আসিবে)। অতএব, পার্শ্বিক জীবন যেন তোমাদিগকে ধোকায় ফেলিয়া না দেয়। (ফলে, তোমরা উহাতে মত্ত হইয়া ঐদিনকে ভুলিয়া যাও) এবং তোমাদিগকে ধোকাবাজ (শয়তান) যেন ধোকায় ফেলিয়া না দেয়। (ফলে, তাহার প্রতারণায় পড়িয়া তোমরা ঐদিন হইতে গাফেল হইয়া যাও।) (লুকমান : ৩৩)

দ্বিতীয় আয়াত সূরায়ে আবাসায় রহিয়াছে : **فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاعَةُ** অর্থাৎ, অতএব, যেদিন কানকে বধির করিয়া দিবার মত আওয়াজ হইবে (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আসিয়া যাইবে, উহা এমন দিন হইবে), যেদিন মানুষ নিজের ভাই হইতে, নিজের মাতা হইতে, নিজের পিতা হইতে, নিজের স্ত্রী হইতে এবং নিজের সম্মান-সম্মতি হইতে পলায়ন করিবে (কেহ কাহারও কাজে আসিবে না)।

সেইদিন প্রত্যেকের নিজেরই এমন বাস্তবতা থাকিবে যাহা তাহাকে অন্যের দিকে ফিরিয়া তাকাইবার সুযোগ দিবে না। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদা (রহঃ) বলেন, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট ইহা অপছন্দনীয় হইবে যে, কোন পরিচিত নিকটাত্মীর সহিত দেখা হইয়া যায়, এই আশংকায় যে, হয়ত বা সে নিজের কোন দাবী পেশ করিয়া বসিবে। (দুররে মানসুর)

কুরআন পাকে অনেক বেশী পরিমাণে এই বিষয়টি বিভিন্ন শিরোনামে উল্লেখ করা হইয়াছে। সূরায়ে বাকারার রুকু নং ৬তে আছে : **وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ الْإِبَةِ** অর্থাৎ, তোমরা এমন দিনকে ভয় কর, যেই দিন কোন ব্যক্তি কাহারও পক্ষ হইতে না কোন (জানের) বদলা দিতে পারিবে (যেমন একজনের নামায়ের পরিবর্তে অন্যজনের নামায় কবুল করিয়া লওয়া হইবে), আর না কাহারও পক্ষ হইতে কোন সুপারিশ কবুল হইবে এবং না কাহারও পক্ষ হইতে কোন ফিদইয়া (মাল জাতীয় বদলা) গ্রহণ করা হইবে এবং না তাহাদের কোন সাহায্য করা হইবে (যাহাতে কেহ নিজের শক্তি দ্বারা তাহাদের আযাবকে বাধা দিবে, ইহা অসম্ভব)। (বাকারা : ৪৮) উক্ত আয়াত শরীফে সাহায্যের যত পন্থা হইতে পারে কোনটাই সম্ভব হইবে না বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। কেননা, কাহারও সাহায্যের চারটি পন্থাই হইতে পারে। এক হইল, কোন শক্তিশালী লোক মাঝখানে প্রতিবন্ধক হইয়া যায় এবং নিজের শক্তি দ্বারা বাধা দেয়—ইহা হইল সাহায্য, ইহাও অসম্ভব বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় : শক্তি ছাড়া আক্রমণকে ফিরানো দুইভাবে হইতে পারে, কোনরূপ বিনিময় ছাড়া ফিরাইবে, ইহা হইল সুপারিশ। অথবা কেহ কোন রকম বিনিময় দিয়া ফিরাইবে। ইহাও দুইভাবে হইতে পারে, জানের বদলা দিয়া অথবা মালের বদলা দিয়া। এই দুই পন্থাকেও অসম্ভব বলা হইয়াছে।

উপরোক্ত আয়াত ছাড়া আরও অন্যান্য আয়াতেও এই বিষয়টি বিভিন্ন শিরোনামে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে একটি বিষয় মনে রাখা চাই যে, এক হইল, কাফেরদের বিষয়, তাহাদের সম্পর্কে তো সর্বসম্মতিক্রমে উপরোক্ত বিষয়গুলি প্রযোজ্য। অর্থাৎ কোন নবী, ওলী, ফেরেশতা যতই নৈকট্যপ্রাপ্ত হউক না কেন, কাফেরদের আযাব সরাইতে পারিবে না। আর গুনাহগার মুসলমানদের বিষয় হইল, তাহাদের সম্পর্কেও এই ধরনের আয়াত ও হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা একটি বিশেষ সময় হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে। সেই সময় পার হইয়া যাওয়ার পর সুপারিশের অনুমতি হইয়া যাইবে। যেমন, কুরআন পাকের বিভিন্ন

জায়গায় বর্ণিত হইয়াছে। এক জায়গায় বর্ণিত হইয়াছে : **يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ** অর্থাৎ—“ঐদিন সুপারিশ দ্বারা কেহ উপকৃত হইবে না, তবে এমন ব্যক্তি (নবী ও ওলীগণের সুপারিশ দ্বারা) উপকৃত হইবে যাহার জন্য আল্লাহ তায়াল সুপারিশের অনুমতি দিয়াছেন এবং তাহার পক্ষে (কাহারও কথা বলা) পছন্দ করিয়া লইয়াছেন।” (আ-হা : ১০৯) এই ধরনের বিষয়বস্তুও অধিক পরিমাণে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু কাহার জন্য সুপারিশ করিবার অনুমতি হইবে তাহা কাহারও জানা নাই। যদিও আল্লাহ তায়ালা দয়ার উপর ভরসা করিয়া সকলেরই আশাবাদী থাকা চাই। কিন্তু কাহারো সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। অতএব, এই ভয়াবহ দিনটি অত্যন্ত ভয় ও আশংকার দিন। সেইদিনের কঠিন মুসীবত হইতে বাঁচিবার জন্য যাহা কিছু করা যায় উহা আজই করা যাইতে পারে। ঐদিনের কঠিন মুসীবত হইতে বাঁচিবার ব্যাপারে বেশী বেশী সদকা করার বিশেষ দখল রহিয়াছে। প্রথম পরিচ্ছেদে এই বিষয়ে অনেক আয়াত ও হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রসিদ্ধ এরশাদ রহিয়াছে (জাহান্নামের) আগুন হইতে বাঁচ ; যদিও অর্ধেক পরিমাণ খেজুর দান করিয়াই হউক না কেন।

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, সদকা গুনাহসমূহকে এমনভাবে নিভাইয়া দেয়, যেমন পানি আগুনকে নিভাইয়া দেয়। (এতহাফ)

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও এরশাদ করিয়াছেন, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার সদকার ছায়াতে থাকিবে। (এতহাফ) অর্থাৎ, মানুষের সদকার পরিমাণ যত বেশী হইবে সেই কঠিন দিনে তাহার ছায়াও তত ঘন হইবে। যেই দিন প্রচণ্ড গরমের কারণে মুখ পর্যন্ত ঘাম আসিয়া পৌঁছিবে।

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, সদকা আল্লাহ তায়ালা গোশ্বাকে ফিরায়ে এবং মন্দ পরিণতি (অপমৃত্যু) হইতেও হেফাজতের কারণ হয়। (মিশকাত)

হযরত লুকমান (আঃ) আপন পুত্রকে ওসীয়াত করিয়াছেন, যখন তোমার দ্বারা কোন গুনাহ হইয়া যায়, তখন সদকা করিও। (এহইয়া)

প্রথম পরিচ্ছেদের দশ নম্বর হাদীসে এই ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, একটি পিপাসার্ত কুকুরকে পানি পান করাইবার কারণে জনৈক চরিত্রহীনা মহিলাকে ক্ষমা করা হইয়াছে।

উবায়দ ইবনে ওমায়ের (রহঃ) বলেন, হাশরের ময়দানে মানুষ চরম ক্ষুধার্ত থাকিবে। অত্যন্ত পিপাসার্ত ও সম্পূর্ণ উলঙ্গ থাকিবে। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাহাকেও খানা খাওয়াইছে, তাহাকে আল্লাহ তায়ালা খানা খাওয়াইবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাহাকেও পানি পান করাইয়াছে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে পানি পান করাইবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালায় সন্তুষ্টির জন্য কাহাকেও কাপড় দিয়াছে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে পোশাক পরাইবেন। (এহইয়া)

প্রথম পরিচ্ছেদে ১১নং হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, কিয়ামতের দিন জাহান্নামী লোকদেরকে এক কাতারে দাঁড় করানো হইবে। তাহাদের নিকট দিয়া একজন (কামেল ওলী) মুসলমান অতিক্রম করিবেন। ঐ কাতার হইতে এক ব্যক্তি বলিবে, আপনি আমার জন্য আল্লাহ তায়ালায় নিকট সুপারিশ করিয়া দিন। তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন, তুমি কে? সেই জাহান্নামী বলিবে, আপনি আমাকে জানেন না? আমি অমুক সময় দুনিয়াতে আপনাকে পানি পান করাইয়াছিলাম।

আর এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, কিয়ামতের দিন যখন জাহান্নামী ও জাহান্নামী লোকদের কাতারে দাঁড় করানো হইবে, তখন জাহান্নামীদের কাতারসমূহ হইতে এক ব্যক্তির দৃষ্টি জাহান্নামীদের কাতারে এক ব্যক্তির উপর পড়িবে। তখন সে তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিবে যে, আমি দুনিয়াতে তোমার উপর অমুক অনুগ্রহ করিয়াছিলাম। ইহা শুনিয়া এই ব্যক্তি তাহার হাত ধরিয়া আল্লাহ তায়ালায় দরবারে লইয়া যাইবে এবং আরজ করিবে, হে আল্লাহ! আমার উপর এই ব্যক্তির অমুক অনুগ্রহ রহিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালায় রহমতে তাহাকে মাফ করিয়া দেওয়া হইবে।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, কিয়ামতের দিন ঘোষণা হইবে, উম্মতে মুহাম্মাদীর গরীব লোকেরা কোথায়, উঠ এবং লোকদেরকে কিয়ামতের ময়দান হইতে তালাশ করিয়া লও। যে ব্যক্তি আমাকে রাজি করিবার জন্য তোমাদের মধ্য হইতে কাহাকেও এক লোকমা খানা খাওয়াইয়াছে অথবা আমাকে রাজি করিবার জন্য এক টোক পানি পান করাইয়াছে অথবা নূতন বা পুরাতন কোন কাপড় দিয়াছে, তাহার হাত ধরিয়া জান্নাতে দাখেল করিয়া দাও। ইহা শুনিয়া উম্মতের গরীব লোকেরা উঠিবে এবং তাহাদিগকে বাছিয়া বাছিয়া জান্নাতে দাখেল করিয়া দিবে।

পূর্বে আরও এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, কিয়ামতের দিন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করিবে, কোথায় ঐ সমস্ত লোক যাহারা গরীবদের এবং মিসকীনদের সম্মান করিয়াছে। আজ তোমরা জান্নাতে এইরূপভাবে

দাখেল হইয়া যাও যে, না তোমাদের কোন ভয় আছে, না তোমরা চিন্তিত হইবে। এই ধরনের বিষয়বস্তুর উপর বেশ কয়েকটি রেওয়ায়েত ঐখানে বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত পরিচ্ছেদের ১৩ নং হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের কোন মুসীবত দূর করে, আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তির কিয়ামতের দিনের মুসীবতসমূহ হইতে কোন মুসীবত দূর করিয়া দিবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন করিয়া রাখে, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তাহার দোষ-ত্রুটিও গোপন করিয়া রাখিবেন।

১৪নং হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি নিজের কোন বিপদগ্রস্ত ভাইকে সাহায্য করিবে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে ঐদিন দৃঢ়পদ রাখিবেন, যেইদিন পাহাড় পর্যন্ত নিজের স্থানে কায়েম থাকিতে পারিবে না (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন)। প্রথম পরিচ্ছেদে আয়াতসমূহের বিবরণে ৩৪ নম্বরে কুরআন পাকের একটি দীর্ঘ আয়াত উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ঐ সমস্ত লোক আল্লাহ তায়ালা মহব্বতে খানা খাওয়াইয়া থাকে, এতীমকে এবং মিসকীনকে এবং (কাফের) বন্দীদিগকে এবং বলে, আমরা তো শুধু আল্লাহ তায়ালা জন্ম খাওয়াইয়া থাকি, তোমাদের নিকট হইতে আমরা ইহার বদলাও চাই না এবং শুকরিয়াও চাই না বরং আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে একটি তিক্ত ও কঠিন (কিয়ামতের) দিনের ভয় আমাদের রহিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে ঐদিনের কঠোরতা হইতে হেফাজতে রাখিবেন এবং তাহাদিগকে আনন্দ ও সজীবতা দান করিবেন। মোটকথা, এই পরিচ্ছেদে অধিক পরিমাণে এই ধরনের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। কিয়ামতের দিনের কঠিন অবস্থা হইতে বাঁচিবার জন্য বেশী পরিমাণে সদকা-খয়রাত করা অত্যন্ত উপকারী জিনিস। আর এই আয়াত শরীফে তো আল্লাহ তায়ালা পক্ষ হইতে যেন ইহার ওয়াদাও হইয়া গিয়াছে। কাজেই ইহা হইতে বেশী আর কি হইতে পারে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ও আল্লাহর রাস্তায় খরচকারীদের ঘটনাবলী

এই পরিচ্ছেদে দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ও আল্লাহর রাস্তায় খরচকারীদের কিছু ঘটনাও নমুনাস্বরূপ উল্লেখ করা হইতেছে। যাহারা দুনিয়া ও আখেরাতের আসল অবস্থাকে বুঝিয়াছেন, তাহারা এই ধোকার ঘরের প্রতি কিরূপ অনাসক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন এবং আখেরাতের জন্য কত কিছুই না জমা করিয়া লইয়াছেন। দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি এবং দানশীলতা অর্থ ও আমল হিসাবে দুইটি পৃথক পৃথক জিনিস। কিন্তু সম্পদের সহিত উভয়ের সম্পর্ক হিসাবে কাছাকাছি। কেননা, যুহুদ অর্থাৎ দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি যাহার মধ্যে হইবে, দানশীলতার গুণ অবশ্যই তাহার মধ্যে হইবে। যখন তাহার মধ্যে সম্পদ জমা করার আগ্রহই নাই, তখন সম্পদ থাকা অবস্থায় সে অবশ্যই দান-খয়রাত করিবে। এমনভাবে দান-খয়রাত ঐ ব্যক্তি করিতে পারে, যাহার মালের প্রতি মহব্বত না থাকে। আর যত বেশী মালের প্রতি মহব্বত হইবে, ততই সে উহার মধ্যে কৃপণতা করিবে। এইজন্য এই পরিচ্ছেদে উভয় প্রকার ঘটনাবলীকে একই জায়গায় জমা করিয়া দিলাম। আর এইজন্যই আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার ফযীলত সম্পর্কিত এই কিতাবে দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তির বিষয়েও বিভিন্ন হাদীস ও আয়াত উল্লেখ করা হইয়াছে। কেননা, দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তিই হইল, আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিবার সিঁড়ি। যতক্ষণ পর্যন্ত এই নাপাক দুনিয়ার প্রতি মহব্বত ও আকর্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিবার মন কখনও তৈয়ার হইবে না। দিলে কখনও ইচ্ছা হইলেও মন খরচ করার জন্য প্রস্তুত হইবে না। ইহাকেই হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি উত্তম উদাহরণের মাধ্যমে স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন। তিনি এরশাদ করিয়াছেন, কৃপণ এবং দানশীল লোকের উদাহরণ এইরূপ, যেমন দুই ব্যক্তি—তাহাদের উপর লোহার

পোশাক এমনভাবে জড়াইয়া রহিয়াছে যে, তাহাদের উভয়ের হাতও লোহার পোশাকের ভিতরেই বুকের উপর জড়ো হইয়া রহিয়াছে। লোহার পোশাক হইতে বাহিরে নয়। এমতাবস্থায় দানশীল ব্যক্তি যে দান করিতে অভ্যস্ত যখন দান করিবার ইচ্ছা করে, তখন ঐ লোহার পোশাক আপনা-আপনিই খুলিয়া যায়। (এবং হাত স্বাভাবিকভাবে লোহার পোশাক হইতে বাহির হইয়া আসে) আর কৃপণ ব্যক্তি যখন দান করার ইচ্ছা করে, তখন ঐ পোশাক আরও বেশী সংকুচিত হইয়া যায়। ফলে, হাত আপন জায়গা হইতে মোটেও নড়াচড়া করিতেই পারে না। (মিশকাত)

ইহার ব্যাখ্যা এই যে, দানশীল ব্যক্তি যখন খরচ করিবার ইচ্ছা করে, তখন তাহার অন্তর উহার জন্য প্রশস্ত হইয়া যায়। ফলে, সে নিঃসংকোচে খরচ করে। আর কৃপণ ব্যক্তি যদি কাহারও কথা শুনিয়া অথবা অন্য কোন কারণে কখনও ইচ্ছাও করে, তবে ভিতর হইতে কোন জিনিস এমনভাবে তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরে যেমন লোহার পোশাক তাহার হাত বাঁধিয়া দিয়াছে। ফলে, হাতকে শক্তি প্রয়োগ করিয়া লোহার পোশাকের ভিতর হইতে বাহির করিতে চাহিলেও অর্থাৎ অন্তরকে বারবার বুঝানো সত্ত্বেও মন মানিতে চাহে না, দান করিবার জন্য হাত উঠেই না। অত্যন্ত সঠিক ও বাস্তব উদাহরণ। নিত্যদিনের বাস্তব অভিজ্ঞতা যে, কৃপণ ব্যক্তি খরচ করিতে চাহিলেও হাত উঠে না। কোথাও দশ টাকা খরচ করিবার সুযোগ হইলে সে দশটি পয়সাও অনেক কষ্টে বাহির করিবে।

① আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)এর পুরা জীবনের ঘটনাবলীতে উপরোক্ত বিষয়ের দৃষ্টান্ত এত বেশী পরিমাণে রহিয়াছে যে, উহা গণনা করাও মুশকিল। তবুকের যুদ্ধের সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাঁদার জন্য উৎসাহিত করিলেন, তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)-এর ঐ সময় ঘরে যাহাকিছু রাখা ছিল সবকিছু জমা করিয়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পেশ করিয়া দেওয়া একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা। আর যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবু বকর! ঘরে কি রাখিয়া আসিয়াছ? তখন তিনি বলিলেন, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (অর্থাৎ তাহাদের সন্তুষ্টির ভাণ্ডার) ঘরে মজুদ রহিয়াছেন। ‘হেকায়াতে সাহাবা’ কিতাবে এই ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামেরও এই ধরনের আরও ঘটনাবলী হেকায়াতে সাহাবা কিতাবে লিখিয়াছি। সেখানে পাঠ করিলে জানা যাইবে যে, অন্যকে নিজের উপর প্রাধান্য দেওয়া, সহানুভূতি এবং আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা

ঐ সকল বুয়ুর্গদের ভাগে ছিল। উহার সামান্যতম অংশও যদি আমরা পাইয়া যাই, তবে নাজানি আমরা উহাকে কত কি-ই না মনে করিব। অথচ ঐ সকল বুয়ুর্গদের নিকট ইহা নিত্যদিনের সাধারণ ঘটনাবলী ছিল। বিশেষ করিয়া হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) সম্পর্কে ইহা হইতে অধিক স্পষ্ট বিষয় কি হইতে পারে যে, স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কুরআন পাকে প্রশংসার ক্ষেত্রে বলিয়াছেন : **وَسَيَجْزِيهَا الْآتِقَى** অর্থাৎ, (ঐ আগুন হইতে) সেই ব্যক্তিকে দূরে রাখা হইবে, যে বড় পরহেযগার। যে নিজের সম্পদ এই উদ্দেশ্যে (আল্লাহর রাস্তায়) দেয়, যাহাতে উহা পবিত্র হইয়া যায় এবং নিজের মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টি হাসিল করা ছাড়া (অন্য কোন উদ্দেশ্য তাহার নাই এবং) তাহার জিম্মায় কাহারও কোন এহসান বা অনুগ্রহ ছিল না যে, উহার বিনিময় দেওয়া উদ্দেশ্য হইতে পারে। (লাইল : ১৭-২০) (উক্ত আয়াতে অত্যন্ত জোরদার এখলাসের কথা বলা হইয়াছে। কেননা, কাহারও অনুগ্রহের বদলা দেওয়াও পছন্দনীয় বিষয়। কিন্তু ফযীলতের দিক দিয়া প্রথম অনুগ্রহের সমান হইতে পারে না। (বয়ানুল কুরআন)

ইবনে জাওযী (রহঃ) বলেন, এই বিষয়ে সকলেই একমত যে, উক্ত আয়াত হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) সম্পর্কে নাথিল হইয়াছে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করেন যে, কাহারও সম্পদ আমার এত উপকার করে নাই, আবু বকরের সম্পদ আমার যত উপকার করিয়াছে। হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদ শুনিয়া হযরত আবু বকর (রাযিঃ) কাঁদিতে লাগিলেন এবং আরজ করিলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি এবং আমার সম্পদ কি আপনি ছাড়া আর কাহারও জন্য? হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদ অনেক সাহাবায়ে কেলাম হইতে অনেক রেওয়াযাতে বর্ণিত হইয়াছে।

সাদ্দদ ইবনে মুসাইয়্যাব (রাযিঃ) এর রেওয়াযাতে উহার পর ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর (রাযিঃ) এর সম্পদের মধ্যে এইরূপ অধিকার খাটাইতেন যেইরূপ নিজের সম্পদের মধ্যে খাটাইতেন।

হযরত উরওয়া (রহঃ) বলেন, যখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) মুসলমান হইলেন, তখন তাহার নিকট চল্লিশ হাজার দিরহাম ছিল, উহা সম্পূর্ণ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর খরচ করিয়া দিয়াছেন। (অর্থাৎ, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

সন্তুষ্টির কাজে খরচ করিয়াছেন।)

অন্য এক হাদীসে আছে, ইসলাম গ্রহণের সময় চল্লিশ হাজার দিরহাম ছিল এবং হিজরতের সময় পর্যন্ত পাঁচ হাজার অবশিষ্ট ছিল। এই সমস্ত অর্থ (যে সকল) গোলামদিগকে (ইসলাম গ্রহণের অপরাধে শাস্তি দেওয়া হইত তাহাদিগকে) আজাদ করার ব্যাপারে ও ইসলামের অন্যান্য কাজে খরচ করা হইয়াছে। (তরীখুল খুলাফা)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাযিঃ) বলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) দুর্বল গোলামদেরকে খরিদ করিয়া আজাদ করিতেন। তাঁহার পিতা আবু কুহাফা (রাযিঃ) বলিলেন, যদি তোমাকে গোলামই আবাদ করিতে হয় তবে শক্তিশালী গোলামদেরকে খরিদ করিয়া আজাদ কর, যাহাতে উহারা তোমার সাহায্যও করিতে পারে। সময়মত তোমার কাজেও আসিতে পারে। হযরত আবু বকর (রাযিঃ) বলিলেন, (আমি আমার জন্য আবাদ করি না) আমি তো শুধু আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য আবাদ করি। (দুররে মনসুর)

আর আল্লাহ তায়ালার নিকট দুর্বল ও কমজোরকে সাহায্য করার মধ্যে যত সওয়াব রহিয়াছে, উহা কোন শক্তিশালীকে সাহায্য করা হইতে অনেক বেশী।

অন্য এক হাদীসে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ আছে, এমন কোন ব্যক্তি নাই যাহার আমার উপর এহসান রহিয়াছে আর আমি তাহার এহসানের বদলা দেই নাই। কিন্তু আবু বকরের এহসান আমার ঘিষ্মায় রহিয়াছে। (যাহার বদলা আমি দিতে পারি নাই) আল্লাহ তায়লা নিজেই কিয়ামতের দিন তাহার এহসানের বদলা দান করিবেন। আমাকে কাহারও সম্পদ এত উপকৃত করে নাই, যত আবু বকরের সম্পদ উপকৃত করিয়াছে। (তরীখুল খুলাফা)

২) হযরত ইমাম হাসান (রাযিঃ) এর খেদমতে এক ব্যক্তি হাজির হইল এবং নিজের প্রয়োজন উল্লেখ করিয়া কিছু সাহায্য চাহিল ও সওয়াল করিল। তিনি বলিলেন, তোমার সওয়ালের কারণে আমার উপর যে হক কায়েম হইয়া গিয়াছে উহা আমার দৃষ্টিতে অনেক উঁচু। আর তোমাকে আমার যেরূপ সাহায্য করা উচিত উহার পরিমাণ আমার দৃষ্টিতে অনেক বেশী। কিন্তু আমার আর্থিক অবস্থা ঐ পরিমাণ দান করিতে অক্ষম, যাহা তোমার মর্যাদা উপযোগী হইতে পারে। আর আল্লাহর রাস্তায় মানুষ যতই বেশী হইতে বেশী খরচ করে, উহা কমই। কিন্তু আমি কি করিব, আমার

নিকট এত পরিমাণ নাই যাহা দ্বারা তোমার সওয়ালের শুকরিয়া আদায় হইতে পারে। যদি তুমি ইহার জন্য প্রস্তুত থাক যে, যাহা আমার নিকট মজুদ আছে, উহাকে তুমি সন্তুষ্টমনে কবুল করিয়া লইবে এবং আমাকে ইহার উপর বাধ্য করিবে না যে, আমি ঐ পরিমাণ কোথাও হইতে সংগ্রহ করি ; যাহা তোমার মর্যাদা উপযোগী হয় এবং যাহা তোমার হক হিসাবে আমার উপর ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে ; তাহা পূরণ করিতে পারে, তবে আমি আনন্দের সহিত রাজি আছি। সওয়ালকারী ব্যক্তি বলিল, হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেটা! আপনি আমাকে যাহাকিছু দিবেন আমি উহাকেই কবুল করিয়া লইব, উহার উপর শোকর আদায় করিব এবং উহা হইতে বেশী করিতে না পারার কারণে আপনাকে অক্ষম মনে করিব। ইহা শুনিয়া হযরত হাসান (রাযিঃ) নিজের খাজাঞ্চিকে বলিলেন, সেই তিন লক্ষ দেহহামের মধ্য হইতে (যাহা তোমার নিকট রাখিয়াছিলাম) যাহা অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছে লইয়া আস। সে পঞ্চাশ হাজার দেহহাম আনিল (বাকী সব খরচ হইয়া গিয়াছিল)। হযরত হাসান (রাযিঃ) বলিলেন, পাঁচশত দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) আরও তো কোথাও ছিল। খাজাঞ্চি আরজ করিল, উহাও মজুদ রহিয়াছে। তিনি বলিলেন, উহাও লইয়া আস। যখন এই সমস্ত কিছু আনা হইল, তখন সেই সওয়ালকারীকে বলিলেন, কোন মজদুর লইয়া আস। যে এইগুলিকে তোমার ঘরে পৌছাইয়া দিবে। সে দুইজন মজদুর লইয়া আসিল। হযরত হাসান (রাযিঃ) সব কিছু তাহাদের হাওয়ালা করিয়া দিলেন এবং নিজের শরীর মুবারক হইতে চাদর খুলিয়া দিয়া দিলেন এবং বলিলেন, এই মজদুরদের তোমার ঘর পর্যন্ত পৌছাইবার পারিশ্রমিকও আমারই দায়িত্ব। সুতরাং এই চাদর বিক্রয় করিয়া তাহাদের পারিশ্রমিক দিয়া দিবে। হযরত হাসান (রাযিঃ) এর গোলামগণ আরজ করিল, আমাদের নিকট তো এখন খাওয়ার জন্য এক দেহহামও বাকি রহিল না। আপনি সবকিছুই দিয়া দিলেন। হযরত হাসান (রাযিঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালার মহান সন্তার নিকট আমি দৃঢ় আশা রাখি যে, তিনি নিজ দয়া ও রহমতে আমাকে ইহার অনেক সওয়াব দিবেন। (এহইয়া)

সবকিছু দিয়া দেওয়ার পর যখন নিজের কাছে কিছুই রহিল না এবং পরিমাণও অত্যন্ত বেশী ছিল, এতদসত্ত্বেও এই ব্যাপারে পেরেশানী ও লজ্জা ছিল যে, সওয়ালকারীর হক আদায় হয় নাই।

(রাযিঃ)এর খেদমতে হাজির হইলেন এবং আরজ করিলেন, আমাদের একজন প্রতিবেশী আছে ; যিনি অনেক বেশী রোযা রাখেন। অনেক বেশী তাহাজ্জুদ পড়েন, তাহার এবাদত দেখিয়া আমাদের প্রত্যেকেরই ঈর্ষা হয় এবং এই আকাঙ্ক্ষা হয় যে, আমরাও যদি তাহার মত এবাদত করিতে পারিতাম। তিনি নিজ কন্যাকে আপন ভাতিজার সহিত বিবাহ দিয়াছেন ; কিন্তু গরীব হওয়ার কারণে তাহার নিকট বিবাহের খরচের কোন ব্যবস্থা নাই। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) তাহাদিগকে লইয়া নিজের ঘরে গেলেন এবং সিঁদুক খুলিলেন, যাহার মধ্যে ছয়টি তোড়া (রৌপ্য মুদ্রা অথবা স্বর্ণমুদ্রার থলিকে তোড়া বলে) বাহির করিলেন এবং তাহাদের হাওয়ালা করিয়া দিলেন। আর বলিলেন, এইগুলি তাহাকে দিয়া দিবেন। তাহারা এই তোড়াগুলি লইয়া যখন রওয়ানা হইলেন, তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, আমরা ঐ ব্যক্তির সহিত ইনসাফের ব্যবহার করি নাই। এই মাল যদি তাহার হাওয়ালা করিয়া দেওয়া হয়, তবে ঐ পরীবের বড় কষ্ট হইবে। সে এই বিবাহের আয়োজনের ঝামেলায় লাগিয়া যাইবে, ইহাতে তাহার ব্যস্ততা বাড়িয়া যাইবে এবং তাহার এবাদতে বিঘ্ন ঘটবে। এই কমবখত দুনিয়ার এত মর্যাদা নাই যে, ইহার কারণে একজন এবাদতগোজার মুমিন বান্দার ক্ষতি করা যায়। ইহাতে আমাদের মর্যাদা কি কমিয়া যাইবে যে, একজন দীনদার লোকের খেদমত আমরা করিয়া দেই? সুতরাং এই মাল দ্বারা বিবাহের সমস্ত এন্তেজাম আমরা সকলে মিলিয়া করিয়া দেই এবং সামান তৈয়ার করিয়া তাহার হাওয়ালা করিয়া দেই। তাহারাও ইহাতে রাজী হইয়া গেলেন এবং সমস্ত সামান উক্ত টাকা দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত করিয়া ঐ গরীবের হাওয়ালা করিয়া দিলেন। (এহইয়া)

⑧ আবুল হাসান মাদায়েনী (রহঃ) বলেন, হযরত ইমাম হাসান (রাযিঃ), ইমাম হুসাইন (রাযিঃ) ও আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রাযিঃ) হজ্জের জন্য যাইতেছিলেন। পথে তাহাদের সামানের উট তাহাদের নিকট হইতে পৃথক হইয়া গেল। তাহারা ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত অবস্থায় চলিতেছিলেন। তাহারা একটি তাঁবুর নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, উহাতে একজন বৃদ্ধা মেয়েলোক ছিল। তাহারা বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাদের পান করিবার জন্য কোন জিনিস (পানি অথবা দুধ, লাচ্ছি ইত্যাদি) তোমার নিকট আছে কি? সে বলিল, আছে। তাহারা নিজ নিজ উটের উপর হইতে নামিলেন। ঐ বৃদ্ধার নিকট অতি সাধারণ একটি বকরি

ছিল। উহার দিকে ইশারা করিয়া বলিল, উহার দুধ দোহন করিয়া লও এবং অল্প অল্প পান করিয়া লও। তাঁহারা উহার দুধ দোহন করিলেন এবং পান করিলেন। অতঃপর তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, খাওয়ার কোন জিনিসও আছে কি? সেই বৃদ্ধা বলিল, এই বকরিটিই আছে, ইহাকে তোমাদের কেহ জবাই করিয়া লও। আমি পাকাইয়া দিব। তাহারা উহাকে জবাই করিলেন। সে পাকাইল। তাঁহারা খানাপিনা করিয়া যখন সন্ধ্যায় রওয়ানা হইতে লাগিলেন, তখন বৃদ্ধাকে বলিলেন, আমরা হাশেমী বংশের লোক। এই সময় হজ্জের এরাদায় যাইতেছি। যদি আমরা জীবিত অবস্থায় সহি-সালামতে মদীনায়া ফিরিয়া আসিতে পারি, তখন তুমি আমাদের নিকট আসিও, তোমার এহসানের বদলা দিব। তাঁহারা তো এই কথা বলিয়া চলিয়া গেলেন। সন্ধ্যায় যখন তাহার স্বামী (ময়দান বা কোথাও হইতে) আসিল, তখন বৃদ্ধা হাশেমী লোকদের ঘটনা শুনাইল। সে খুবই রাগান্বিত হইয়া বলিল, তুমি অপরিচিত লোকদের জন্য বকরিটি জবাই করিয়া ফেলিলে, জানা নাই কে বা কাহারা ছিল, অথচ বলিতেছ, হাশেমী বংশের লোক ছিল। মোটকথা, সে রাগান্বিত হইয়া চুপ হইয়া গেল। কিছুদিন পর যখন তাহাদেরকে অভাব-অনটন খুবই অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল, তখন তাহারা মেহনত ও মজদুরী করার উদ্দেশ্যে মদীনা মুনাওয়ারায় গেল। দিনভর উটের গোবর শুকাইয়া উহা বিক্রয় করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিল। একদিন সেই বৃদ্ধা গোবর শুকাইতেছিল। হযরত হাসান (রাযিঃ) নিজ ঘরের দরজার সামনে অবস্থান করিতেছিলেন। যখন এই বৃদ্ধা ঐ দিক দিয়া যাইতেছিল, তখন তাহাকে দেখিয়া হযরত হাসান (রাযিঃ) চিনিয়া ফেলিলেন এবং আপন গোলামকে পাঠাইয়া তাহাকে নিজের নিকট ডাকাইলেন এবং বলিলেন, হে আব্বাহর বান্দী! তুমি কি আমাকে চিন? সে বলিল, আমি তো চিনিতে পারি নাই। তিনি বলিলেন, আমি তোমার সেই দুধ ও বকরিওয়ালা মেহমান। বৃদ্ধা তবুও চিনিলা না এবং বলিল, আব্বাহর কসম! আপনি কি সেই ব্যক্তিই। হযরত হাসান (রাযিঃ) বলিলেন, সেই ব্যক্তিই। এই বলিয়া তিনি নিজের গোলামদেরকে হুকুম দিলেন, তাহার জন্য এক হাজার বকরি খরিদ করা হউক। সুতরাং তৎক্ষণাৎ খরিদ করা হইল। এই বকরিগুলি ছাড়াও আরও এক হাজার দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) নগদও দান করিলেন। অতঃপর নিজের গোলামের সহিত ঐ বৃদ্ধাকে ছোট ভাই হযরত হুসাইন (রাযিঃ)এর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। হযরত হুসাইন (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাই কি বদলা দান করিয়াছেন? সে বলিল, এক হাজার বকরি ও এক হাজার

স্বর্ণমুদ্রা। ইহা শুনিয়া হযরত হুসাইন (রাযিঃ) ঠিক এই পরিমাণই বকরি ও স্বর্ণমুদ্রা দান করিলেন। অতঃপর তিনি বৃদ্ধাকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রাযিঃ)এর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তিনি খবর লইলেন যে, ঐ দুই বুয়ুর্গ কি কি দান করিয়াছেন। যখন তাহাদের পরিমাণ জানিতে পারিলেন, তখন তিনি দুই হাজার বকরি এবং দুই হাজার স্বর্ণমুদ্রা দান করিলেন। আর বলিলেন, তুমি যদি প্রথমে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে, তবে আমি ইহা হইতে অনেক বেশী দিতাম। এই বৃদ্ধা চার হাজার বকরি ও চার হাজার স্বর্ণমুদ্রা লইয়া স্বামীর নিকট পৌছিল এবং বলিল, ইহা ঐ দুর্বল ও কমজোর বকরির বদলা। (এহইয়া)

⑤ হযরত উসম্মন (রাযিঃ)এর চাচাতো ভাই আবদুল্লাহ ইবনে আমের ইবনে কুরাইয (রাযিঃ) একবার (সম্ভবতঃ রাত্রিকাল হইবে) মসজিদ হইতে বাহিরে আসিলেন। নিজ বাড়ীর দিকে একাকী যাইতেছিলেন। পথে একটি যুবক ছেলেকে দেখিতে পাইলেন। সে তাহার সহিত চলিতে লাগিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কিছু বলার আছে কি? সে আরজ করিল, আপনার মঙ্গল কামনা করি, কোন কিছু আরজ করার নাই, আপনাকে এই সময় একাকী যাইতে দেখিয়া আশঙ্কা হইল যে, একাকী আপনার কোন কষ্ট না হয়, এইজন্য আপনার হেফাজতের খেয়ালে সঙ্গে চলিতেছি। আল্লাহ না করুন, পথে অপছন্দনীয় কোন কিছু সন্মুখীন হইতে না হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমের (রাযিঃ) যুবকের হাত ধরিয়া তাহাকে নিজ ঘর পর্যন্ত সঙ্গে লইয়া গেলেন। সেখানে পৌছিয়া এক হাজার দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) তাহাকে দান করিলেন এবং বলিলেন, ইহা নিজের কাজে ব্যবহার করিও। তোমার মুরব্বীগণ তোমাকে অতি উত্তম শিক্ষা দান করিয়াছেন। (এহইয়া)

⑥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, এক ব্যক্তির বাড়িতে একটি খেজুর গাছ ছিল। যাহার ডাল প্রতিবেশীর বাড়ীর উপর ঝুলিতেছিল। প্রতিবেশী গরীব লোক ছিল। যখন এই ব্যক্তি খেজুর পাড়িবার জন্য নিজের গাছে চড়িত, তখন নাড়াচাড়ার কারণে কিছু খেজুর প্রতিবেশীর বাড়িতেও পড়িয়া যাইত। তাহার গরীব বাচ্চারা উহা উঠাইয়া লইত। এই ব্যক্তি গাছ হইতে নামিয়া প্রতিবেশীর বাড়িতে যাইয়া বাচ্চাদের হাত হইতে খেজুরগুলি কাড়িয়া লইত। এমনকি তাহাদের মুখের ভিতর হইতেও আগুল ঢুকাইয়া বাহির করিয়া লইত। গরীব লোকটি ছয়

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নালিশ করিল। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনিয়া বলিলেন, আচ্ছা, যাও। ইহার পর হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাছের মালিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার অমুক খেজুর গাছটি যাহা অমুক ব্যক্তির বাড়ির উপর ঝুকিয়া রহিয়াছে উহা আমাকে এই ওয়াদার উপর দিতে পার কি যে, উহার বদলে তুমি জান্নাতে খেজুরের গাছ পাইবে। সে আরজ করিল, হযূর! এই গাছটি আরও অনেকে খরিদ করিতে চাহিয়াছে। আর আমার নিকট আরও গাছ রহিয়াছে কিন্তু ইহার খেজুর আমার বড় পছন্দ, এইজন্য আমি বিক্রয় করি নাই। এই বলিয়া লোকটি উহা দিতে আপত্তি করিল। (যেহেতু সে-ই মালিক ছিল; কাজেই হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহা শুনিয়া চূপ রহিলেন।) তৃতীয় এক ব্যক্তিও এই কথাগুলি শুনিতেছিল। সে এই ব্যক্তি চলিয়া যাইবার পর হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিল, এই গাছটি যদি আমি লইয়া দান করিয়া দেই, তবে আমার জন্যও কি জান্নাতে খেজুর গাছ পাইবার ওয়াদা থাকিবে, যাহা আপনি ঐ ব্যক্তির সহিত বলিয়াছিলেন? হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার সহিতও সেই ওয়াদাই রহিল। এই ব্যক্তি উঠিয়া সেই গাছের মালিকের নিকট গেল এবং বলিল, আমারও খেজুরের বাগান আছে, তুমি কি এই গাছটি যে কোন মূল্যে বিক্রয় করিতে পার? সে বলিল, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সহিত জান্নাতে গাছের ওয়াদা করিয়াছিলেন, তবুও আমি দেই নাই; এই গাছ আমার খুবই পছন্দ। আমি ইহাকে বিক্রয় তো করিতে পারি; কিন্তু যত মূল্য আমি চাই উহা কেহ দিবে না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কত মূল্য চাও? সে বলিল, চল্লিশটি গাছের বিনিময়ে বিক্রয় করিতে পারি। সেই লোকটি বলিল, একটি বাঁকা গাছের মূল্য চল্লিশটি গাছ অনেক বেশী হইয়া যায়। আচ্ছা; যদি আমি চল্লিশটি গাছ উহার বদলে তোমাকে দেই, তবে কি তুমি বিক্রয় করিবে? গাছের মালিক বলিল, তুমি যদি নিজের কথায় সত্যবাদী হও, তবে কসম খাইয়া বল যে, আমি একটি গাছের বদলে চল্লিশটি গাছ দিয়া দিলাম। সেই ব্যক্তি কসম খাইয়া বলিল, আমি এই বাঁকা গাছের বদলে চল্লিশটি গাছ দিয়া দিলাম। ইহার পর গাছের মালিক অস্বীকার করিয়া বসিল আর বলিল, আমি গাছ বিক্রয় করিব না। সেই ব্যক্তি বলিল, এখন তুমি মোটেও অস্বীকার করিতে পার না। তোমার কথার উপর আমি কসম খাইয়াছি। সে বলিল, আচ্ছা, এই শর্তের উপর যে, সবগুলি গাছ এক জায়গাতে হইবে। সেই ব্যক্তি সামান্য সময় চিন্তা

করিয়া ইহারও ওয়াদা করিল যে, সব গাছ এক জায়গায় হইবে। কথা পাকাপাকি করিয়া সেই ব্যক্তি হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া বলিলেন, হযূর! ঐ গাছটি আমি খরিদ করিয়া লইয়াছি। উহা আপনার জন্য হাদিয়া। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ গরীবের বাড়ীতে গেলেন এবং গাছটি ঐ গরীব ব্যক্তিকে দান করিয়া দিলেন। ইহার পর সূরায়ে ওয়াল লাইলে নাযিল হইল।

(দুররে মানসুর)

৭) এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রাযিঃ)এর খেদমতে হাজির হইয়া কবিতার দুইটি চরণ পাঠ করিল, যাহার অর্থ এই—“অনুগ্রহ ও সং ব্যবহার তখন প্রকৃত অনুগ্রহ হিসাবে গণ্য হইবে, যখন উহা উপযুক্ত লোকদের উপর করা হইবে। অনুপযুক্ত লোকদের উপর অনুগ্রহ করা ঠিক নয়। সুতরাং তুমি যদি কাহারও উপর অনুগ্রহ কর, তবে হযরত খালেস আল্লাহর জন্য যেন দান কর (কেননা, ইহাতে উপযুক্ততা শর্ত নয়, কাফের ও জীব-জন্তুর উপরও করা যায়) অথবা আত্মীয়-স্বজনের উপর অনুগ্রহ কর (কেননা, তাহাদের আত্মীয়তার হক তাহাদের উপযুক্ততার উপর প্রাধান্য রাখে)। আর যদি এই দুই বিষয় কোন ক্ষেত্রে পাওয়া না যায়, তবে অনুপযুক্তের উপর অনুগ্রহ করা চাই না।” (এই কবিতায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রাযিঃ)এর প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে, কারণ তাহার দান ও বখশিশ এত ব্যাপক ছিল যে, উপযুক্ত ও অনুপযুক্ত সকলের উপর বৃষ্টির মত বর্ষিত হইত) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রাযিঃ) এই কবিতা শুনিয়া বলিলেন, এই কবিতা মানুষকে কৃপণ বানাইবে। আমি তো আমার অনুগ্রহকে বৃষ্টির মত বর্ষাইব, যদি উহা ভদ্র ও উপযুক্ত লোকদের পর্যন্ত পৌছিয়া যায় তবে নিঃসন্দেহে তাহারা এই উপযুক্ত যে, তাহাদের উপর অনুগ্রহ করা হউক। আর যদি অনুপযুক্তদের পর্যন্ত পৌছে, তবে তো আমিও অনুপযুক্ত, আমার মালও অনুপযুক্ত। অতএব, অনুপযুক্ত লোকদের নিকটই পৌছা উচিত। (এহইয়া)

৮) হযরত মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির (রহঃ) একবার হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর খেদমতে উপস্থিত হইলেন এবং নিজের কঠিন প্রয়োজনের কথা বলিলেন। তিনি বলিলেন, আমার নিকট এই সময় কিছুই নাই। যদি আমার নিকট দশ হাজারও হইত, তবে সবই তোমাকে দিয়া দিতাম। কিন্তু এখন আমার নিকট কিছুই নাই। তিনি ফিরিয়া চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পর খালেদ ইবনে আসাদের নিকট হইতে দশ হাজারের একটি হাদিয়া

হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর খেদমতে পৌঁছিল। তিনি বলিতে লাগিলেন, আমার কথার পরীক্ষা খুবই দ্রুত লওয়া হইয়াছে। অতএব, তৎক্ষণাৎ ইবনুল মুনকাদিরের নিকট লোক পাঠাইলেন এবং তাহাকে ডাকিয়া সম্পূর্ণ অর্থ তাহার হাওয়ালা করিয়া দিলেন। ইবনুল মুনকাদির উহা হইতে এক হাজার দ্বারা একটি বাঁদি খরিদ করিলেন, যাহার গর্ভ হইতে তিনজন পুত্রসন্তান পয়দা হইয়াছে। তাহাদের নাম মুহাম্মদ, আবু বকর, ওমর। তাহারা তিনজনই মদীনা মুনাওয়ারার এবাদতগুয়ার লোকদের মধ্যে গণ্য হইতেন। (তাহযীবুত-তাহযীব)

এই তিনজনের এবাদতের মধ্যে কি হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এরই অংশ হইবে না? কেননা, তিনিই তাহাদের অস্তিত্বের কারণ হইয়াছেন। হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর দানশীলতার ঘটনাবলী তাহার আব্বাজান (রাযিঃ)এর মতই অগণিত রহিয়াছে। একটি ঘটনা 'হেকায়েতে সাহাবা' কিতাবেও লিখিয়াছি যে, তিনি দেহহামে পরিপূর্ণ বড় দুইটি থলি বন্টন করিয়া দিয়াছেন। আর ইহাও স্মরণ ছিল না যে, আমি রোযা রাখিয়াছি এবং ইফতারের জন্য এক দেহহামের অন্তত গোশত আনাইয়া লই। এই দুইটি থলিতে এক লক্ষেরও বেশী দেহহাম ছিল। এই ধরনের আরও একটি ঘটনা বর্ণিত রহিয়াছে। উহাতে এক লক্ষ আশি হাজার দেহহাম ছিল বলিয়া বর্ণিত আছে।

তামীম ইবনে ওরওয়া (রহঃ) বলেন, আমি একবার (আমার পিতার খালা) হযরত আয়েশা (রাযিঃ)কে দেখিয়াছি। তিনি সত্তর হাজার দেহহাম বন্টন করিলেন। অথচ তাহার পরিধানে তালিওয়ালা কোর্তা ছিল।

(এতহাক্)

৯ আবান ইবনে উসমান (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)কে পেরেশান ও অপদস্থ করিবার জন্য এই কাণ্ড করিল যে, কুরাইশের সর্দারদের নিকট যাইয়া বলিল, ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) আগামীকাল সকালে আপনাদিগকে খাওয়ার দাওয়াত দিয়াছেন। সব জায়গায় এই পয়গাম পৌঁছাইয়া দিল। যখন সকালে খাওয়ার সময় হইল, তখন হযরত ইবনে আব্বাসের ঘরে এত মানুষের সমাবেশ হইল যে, ঘর ভরিয়া গেল। ঘটনা জানিতে পারিয়া হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) সকলকে বসাইলেন এবং বাজার হইতে ফলের টুকরি আনাইয়া তাহাদের সম্মুখে রাখিয়া খাইতে দিলেন আর তিনি কথাবার্তা আরম্ভ করিয়া দিলেন। অপরদিকে বাবুর্চিদেরকে খানা তৈয়ার করিতে হুকুম দিলেন। মেহমানগণ ফল খাওয়া হইতে অবসর হওয়ার পূর্বেই খানা

তৈয়ার হইয়া গেল। অতঃপর হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) তাহার খাজাঞ্চিদিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দাওয়াতের এই ব্যবস্থাকে প্রতিদিন চালু রাখা আমাদের পক্ষে সম্ভব হইবে কি? তাহারা আরজ করিল, জি হাঁ, সম্ভব হইবে। ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলিয়া দিলেন যে, উপস্থিত সকলের প্রতিদিন সকালে আমাদের এখানে দাওয়াত রহিল। আপনারা প্রতিদিন সকালে আসিয়া যাইবেন। (এতহাক)

ইহা সাহাবায়ে কেরামদের প্রাচুর্যের যুগ ছিল। কিন্তু তাহাদের অত্যধিক দানশীলতার কারণে সম্পদ এত জলদি খতম হইয়া যাইত ; যেমন চালনিতে পানি ভরিলে তৎক্ষণাৎ খতম হইয়া যায়। এইজন্য যখন সম্পদ হইত, তখন খুব হইত আর যখন উহা শেষ হইয়া যাইত, তখন তাহাদের নিকট খাওয়ার জন্য একটি দেহরহামও থাকিত না। না তাহাদের জমা করিয়া রাখিবার অভ্যাস ছিল, না নিজের জন্য পৃথক করিয়া রাখাও তাহারা জানিতেন। লক্ষ লক্ষ পরিমাণ আসিতে থাকিত এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে বিতরণ হইয়া যাইত।

(১০) ওয়াকেন্দী (রহঃ) বলেন, আমার দুই বন্ধু ছিল। তাহাদের মধ্যে একজন হাশেমী বংশের ছিল। আমাদের তিনজনের মধ্যে এত গভীর সম্পর্ক ছিল, যেন আমরা এক প্রাণ তিন দেহ ছিলাম। আমার উপর কঠিন অভাব-অনটন চলিতেছিল। ঈদের দিন আসিয়া গেল, স্ত্রী বলিল, আমরা তো সর্বাবস্থায় সবার করিয়া লইব, কিন্তু ঈদ নিকটে আসিয়া গিয়াছে বাচ্চাদের কান্নাকাটি ও জিদ আমার অন্তরকে টুকরা টুকরা করিয়া দিয়াছে। ইহারা মহল্লার বাচ্চাদেরকে দেখে যে, তাহারা ঈদের জন্য সুন্দর সুন্দর পোশাক ও সাজ-সামান খরিদ করিতেছে। আর ইহারা পুরাতন ছেঁড়া কাপড়ে ঘোরাফেরা করিতেছে। যদি তুমি কোথাও হইতে কিছু আনিতে পার, তবে আনিয়া দাও। এই বাচ্চাদের অবস্থার উপর আমার অনেক ব্যথা অনুভব হইতেছে। আমি তাহাদের জন্যও কাপড় বানাইয়া দিব। আমি স্ত্রীর এই কথা শুনিয়া আমার হাশেমী বন্ধুকে চিঠি লিখিলাম। উহাতে অবস্থা প্রকাশ করিলাম। উত্তরে তিনি মোহরকৃত একটি খলি আমার নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, ইহাতে এক হাজার দেহরহাম আছে, তুমি উহা খরচ করিয়া লও। আমার অন্তর এই খলি দ্বারা এখনও ঠাণ্ডাও হইতে পারে নাই ; এমন সময় আমার অপর বন্ধুর চিঠি আমার নিকট পৌঁছিল। যাহাতে ঐ ধরনের বিষয়বস্তু ছিল ; যাহা আমি আমার হাশেমী বন্ধুকে লিখিয়াছিলাম। আমি ঐ খলিটি মোহরকৃত অবস্থায়

তাহার নিকট পাঠাইয়া দিলাম এবং স্ত্রীর লজ্জায় ঘরে যাওয়ার হিম্মত হইল না, মসজিদে চলিয়া গেলাম এবং দুই দিন দুই রাত্র মসজিদেই অবস্থান করিলাম। লজ্জায় ঘরে যাইতে পারিলাম না। তৃতীয় দিন ঘরে গেলাম এবং স্ত্রীকে সম্পূর্ণ ঘটনা শুনাইলাম। স্ত্রী বিন্দুমাত্রও নারাজ হইল না এবং অভিযোগের কোন শব্দও উচ্চারণ করিল না। বরং আমার এই কাজকে পছন্দ করিল এবং বলিল, তুমি বড় ভাল করিয়াছ। আমি এই সমস্ত কথা বলিতেছিলাম; এমন সময় আমার সেই হাশেমী বন্ধু সেই মোহরকৃত খলিটি হাতে লইয়া আসিল এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল যে, সত্য সত্য বল যে, এই খলির ঘটনা কি হইয়াছে। আমি তাহাকে ঘটনা শুনাইয়া দিলাম। ইহার পর ঐ হাশেমী বলিলেন, যখন তোমার চিঠি পৌছিল, তখন আমার নিকট এই খলিটি ছাড়া আর কোন জিনিস একেবারেই ছিল না। আমি এই খলিটি তোমার নিকট পাঠাইয়া দিলাম। ইহার পর আমি তৃতীয় বন্ধুকে চিঠি লিখিলাম। তখন তিনি জওয়াবে এই খলিটিই আমার নিকট পাঠাইলেন। ইহাতে আমি আশ্চর্যান্বিত হইলাম যে, ইহা তো আমি তোমার নিকট পাঠাইয়াছিলাম; ইহা তৃতীয় বন্ধুর নিকট কিভাবে পৌছিল। এইজন্য আমি বিষয়টি জানিতে আসিয়াছিলাম। ওয়াকেদী (রহঃ) বলেন, আমরা ঐ খলির মধ্য হইতে একশ দেরহাম তো আমার স্ত্রীকে দিয়া দিলাম আর অবশিষ্ট নয় শ দেরহাম আমরা তিনজন বন্টন করিয়া লইলাম। এই ঘটনার খবর কোনভাবে বাদশাহ মামুনুর রশিদের নিকট পৌছিয়া গেল। তিনি আমাকে ডাকিলেন এবং আমার নিকট হইতে সম্পূর্ণ ঘটনা শুনিলেন। অতঃপর মামুনুর রশিদ সাত হাজার দেরহাম দিলেন—দুই দুই হাজার করিয়া আমাদের তিনজনকে এবং এক হাজার আমার স্ত্রীকে। (এতহাক)

(১১) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রাযিঃ) একবার মদীনা মুনাওয়ারার একটি বাগানের ভিতর দিয়া যাইতেছিলেন। সেই বাগানের মালী একজন হাবশী গোলাম ছিল। সে রুটি খাইতেছিল আর একটি কুকুর তাহার সম্মুখে বসিয়াছিল। যখন সে একটি লোকমা নিজের মুখে দিত, তখন ঐরূপ আর একটি লোকমা উক্ত কুকুরের সম্মুখে নিক্ষেপ করিত। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রাযিঃ) দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিতে থাকিলেন। গোলাম যখন খানা খাইয়া অবসর হইল, তখন তিনি তাহার নিকট গেলেন। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কাহার গোলাম? সে বলিল, আমি হযরত উসমান (রাযিঃ)এর ওয়ারিশদের গোলাম। তিনি

বলিলেন, আমি তোমার একটি আশ্চর্য বিষয় দেখিয়াছি। সে আরজ করিল, জনাব! আপনি কি দেখিয়াছেন? তিনি বলিতে লাগিলেন, তুমি যখন একটি লোকমা খাইতেছিলে, সঙ্গে সঙ্গে আর একটি লোকমা ঐ কুকুরকে দিতেছিলে। সে আরজ করিল, এই কুকুর কয়েক বৎসর যাবৎ আমার সঙ্গে আছে। এইজন্য খাওয়ার মধ্যেও তাহাকে নিজের সঙ্গী হিসাবে রাখা আমি জরুরী মনে করি। তিনি বলিলেন, ঐ কুকুরের জন্য তো ইহা হইতে নিম্নমানের জিনিসও অনেক যথেষ্ট ছিল। গোলাম আরজ করিল, আল্লাহ তায়ালার নিকট আমার এই বিষয়ে লজ্জা হয় যে, আমি খাইতে থাকিব আর একটি জীবন্ত চোখ আমাকে দেখিতে থাকিবে। হযরত ইবনে জাফর (রাযিঃ) তাহার সহিত কথা বলিয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং হযরত উসমান (রাযিঃ) এর ওয়ারিশগণের নিকট তশরীফ লইয়া গেলেন এবং বলিলেন, আমি একটি আরজ লইয়া আপনাদের নিকট আসিয়াছি। তাহারা বলিলেন, কি বিষয় বলুন। তিনি বলিলেন, অমুক বাগানটি আমার নিকট বিক্রয় করিয়া দিন। তাহারা আরজ করিলেন, জনাবের খেদমতে উহা হাদিয়া হিসাবে পেশ করিলাম। ইহাকে বিনা মূল্যে কবুল করিয়া লউন। তিনি বলিতে লাগিলেন, আমি মূল্য ব্যতীত লইতে চাই না। অতঃপর মূল্য নির্ধারিত হইয়া লেন-দেন হইয়া গেল। তারপর হযরত ইবনে জাফর (রাযিঃ) বলিলেন, উহাতে যে গোলাম কাজ করে তাহাকেও লইতে চাই। তাহারা অপারগতা প্রকাশ করিয়া বলিল যে, সে ছোটবেলা হইতে আমাদের নিকটেই লালিত পালিত হইয়াছে। তাহার বিচ্ছেদ কষ্টদায়ক হইবে। কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রাযিঃ) এর বারবার বলার কারণে তাহারা গোলামকেও তাহার নিকট বিক্রয় করিয়া দিল। এই দুইটি জিনিস খরিদ করিয়া উক্ত বাগানে তশরীফ লইয়া গেলেন এবং সেই গোলামকে বলিলেন, আমি এই বাগান এবং তোমাকে খরিদ করিয়া লইয়াছি। গোলাম আরজ করিল, আল্লাহ তায়ালা আপনার এই খরিদকে মোবারক করুন এবং বরকত দান করুন। তবে আমার মনিবদের বিচ্ছেদে আমার বড় কষ্ট হইল। কেননা, তাহারা আমাকে বাল্যকাল হইতে লালনপালন করিয়াছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রাযিঃ) বলিলেন, আমি তোমাকে আজাদ করিয়া দিলাম এবং এই বাগানটি তোমাকে দিয়া দিলাম। গোলাম আরজ করিল, তাহা হইলে আপনি সাক্ষী থাকুন যে, এই বাগান আমি হযরত উসমান (রাযিঃ) র ওয়ারিশগণের উপর ওয়াকফ করিয়া দিলাম। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রাযিঃ) বলেন, তাহার এই বিষয়টির

উপর আমি আরও বেশী আশ্চর্যান্বিত হইলাম এবং তাহার জন্য বরকতের দোয়া দিয়া চলিয়া আসিলাম। (মুসামারাত)

এই ছিল মুসলমানদের পূর্বপুরুষগণের গোলামদের কৃতিত্ব।

(১২) নাফে (রাযিঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) একবার মদীনা মুনাওয়ারা হইতে বাহিরে যাইতেছিলেন। খাদেমগণ সঙ্গে ছিল। খাওয়া-দাওয়ার সময় হইলে খাদেমগণ দস্তুরখান বিছাইল এবং সকলে খাওয়ার জন্য বসিল। এমন সময় একজন রাখাল বকরী চরাইতে চরাইতে নিকট দিয়া যাইতেছিল। সে সালাম করিল। হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) তাহাকে খাওয়ায় শরীক হইতে অনুরোধ করিলেন। সে বলিল, আমি রোযা রাখিয়াছি। হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, এমন কঠিন গরমের দিনে কিরূপ লু' হাওয়া চলিতেছে, আর ভূমি মাঠের মধ্যে রোযা রাখিতেছ? সে আরজ করিল, আমি আমার আইয়ামে খালিয়াহ (অতীত দিনগুলি) উসূল করিতেছি (ইহা দ্বারা কুরআন পাকের একটি আয়াতের দিকে ইশারা ছিল যাহা সূরা আল-হাক্কার মধ্যে রহিয়াছে। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা জান্নাতী লোকদিগকে বলিবেন : **كُلُوا وَاشْرَبُوا** অর্থাৎ, খাও এবং পান কর আনন্দসহকারে, **فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ** এই সমস্ত আমলের বিনিময়ে যাহা তোমরা অতীত দিনগুলিতে (দুনিয়াতে) করিয়াছ। (হাক্কাহ : ২৪) ইহার পর হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) পরীক্ষাস্বরূপ তাহাকে বলিলেন, আমরা একটি বকরী খরিদ করিতে চাই। উহার দাম বলিয়া দাও এবং লইয়া লও। আমরা উহাকে জবাই করিব এবং তোমাকেও গোশত দিব। আর উহা তোমার ইফতারে কাজে আসিবে। সে বলিল, এইসব বকরী আমার নয়, আমি তো গোলাম। এইগুলি আমার সর্দারের বকরী। হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, সর্দার কিভাবে জানিবে? তাহাকে বলিয়া দিবে যে, বাঘে খাইয়া ফেলিয়াছে। সে আসমানের দিকে ইশারা করিল এবং বলিল **فَإِنَّ اللَّهَ** আল্লাহ তায়ালা কোথায় যাইবেন, (অর্থাৎ সেই পাক পরওয়াবদিগার তো অবশ্যই দেখিতেছেন। তামাম জাহানের মালিক যখন দেখিতেছেন, তখন আমি কিভাবে বলিতে পারি যে, বাঘে খাইয়া ফেলিয়াছে?) হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) আশ্চর্যান্বিত হইলেন এবং আনন্দসহকারে বারবার বলিতেছিলেন যে, এক রাখাল বলে **أَيُّنَ اللَّهِ، أَيُّنَ اللَّهِ** (আল্লাহ তায়ালা কোথায় যাইবেন, আল্লাহ তায়ালা কোথায় যাইবেন) ইহার পর হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) শহরে ফিরিয়া আসিলেন এবং সেই গোলামকে

মনিবের নিকট হইতে বকরীগুলিসহ খরিদ করিয়া গোলামকে আজাদ করিয়া দিলেন আর বকরীগুলি তাহাকেই দান করিয়া দিলেন।

(দূররে মানসুর)

এই ছিল সেই যুগের রাখালদের অবস্থা। নির্জন ময়দানেও তাহাদের এই ফিকির ছিল যে, আল্লাহ তায়ালা দেখিতেছেন।

১৩) হযরত সাঈদ ইবনে আমের (রহঃ) হযরত ওমর (রাযিঃ)এর পক্ষ হইতে হেমসের শাসনকর্তা নিযুক্ত ছিলেন। হেমসবাসীগণ হযরত ওমর (রাযিঃ)এর নিকট তাহার সম্পর্কে কয়েকটি অভিযোগ করিল এবং তাহাকে বরখাস্ত করিবার আবেদন জানাইল। হযরত ওমর (রাযিঃ)কে আল্লাহ তায়ালা দূরদর্শিতার বিশেষ অংশ দান করিয়াছিলেন। যেই কারণে তিনি মানুষ চিনিতে পারদর্শী ছিলেন এবং হাজারও বার ইহার পরীক্ষাও হইয়াছিল। তিনি ইহাতে আশ্চর্যবোধ করিলেন যে, আমি তো অনেক ভাল মনে করিয়া তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলাম এবং এই ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা নিকট দোয়াও করিয়াছিলাম যে, হে আল্লাহ! লোকদের সম্পর্কে আমার দূরদর্শিতা বিনষ্ট করিও না। কেননা, ইহাতে সমস্ত বিভাগেই অযোগ্য লোকদের ঢুকিয়া যাইবার আশংকা রহিয়াছে। সুতরাং হযরত ওমর (রাযিঃ) হযরত সাঈদকে তলব করিলেন এবং অভিযোগকারীদেরকেও ডাকিলেন। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সাঈদ সম্পর্কে তোমাদের কি কি অভিযোগ আছে? তাহারা তিনটি অভিযোগ করিল।

এক, দিনের বেলায় অনেক দেরী করিয়া ঘর হইতে বাহির হন (আদালতে দেরীতে পৌছেন)। দুই, যদি কেহ রাত্রে তাহার নিকট যায়, তবে তখন তাহার অভিযোগ শোনে না। তিন, প্রতি মাসে তিনি একদিন ছুটি কাটান। হযরত ওমর (রাযিঃ) উভয় পক্ষকে সম্মুখে দাঁড় করাইলেন এবং বলিলেন, তোমরা একেকটা করিয়া অভিযোগ উল্লেখ কর; যাহাতে প্রত্যেক অভিযোগের পৃথক পৃথক জওয়াব লওয়া যাইতে পারে।

তাহারা বলিল, সকালে দেরী করিয়া ঘর হইতে বাহির হন। হযরত ওমর (রাযিঃ) তাহার নিকট জওয়াব তলব করিলেন। তিনি আরজ করিলেন, আমার স্ত্রী ঘরে একা কাজ করে। আমি আটা মলিয়া দেই, রুটি পাক করি। যখন রুটি তৈরী হইয়া যায়, তখন খানা খাইয়া ওষু করিয়া বাহির হইয়া আসি।

হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, দ্বিতীয় দাবী কি? তাহারা আরজ করিল, রাত্রে কাজ করেন না। যদি কেহ যায় তবে তাহার প্রয়োজন পূরা

হয় না। হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, তোমার নিকট ইহার কি জওয়াব আছে? হযরত সাঈদ আরজ করিলেন, আমার মন চাহিতেছিল না যে, ইহা প্রকাশ করি। আমি দিন এবং রাত্ৰকে ভাগ করিয়া রাখিয়াছি। দিন মাখলুকের জন্য এবং রাত্ৰ খালেকের জন্য। আমি পুরা রাত্ৰ আমার মাওলাকে দিয়া রাখিয়াছি।

হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, তৃতীয় দাবী কি? তাহারা আরজ করিল, প্রতি মাসে একদিন অনুপস্থিত থাকেন। হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, ইহার কি জওয়াব? হযরত সাঈদ (রাযিঃ) আরজ করিলেন, আমার নিকট কোন খাদেম নাই। আমি মাসে একদিন নিজের কাপড় নিজেই ধৌত করি। উহা শুকাইয়া পরিধান করিতে সক্ষ্য হইয়া যায়।

হযরত ওমর (রাযিঃ) আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায় করিলেন যে, আমার দূরদর্শিতা ভুল সাব্যস্ত হয় নাই। ইহার পর ঐ সমস্ত লোকদেরকে বলিলেন, তোমরা তোমাদের আমীরের কদর কর। তাহারা সকলে চলিয়া যাইবার পর হযরত ওমর (রাযিঃ) হযরত সাঈদের নিকট এক হাজার দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) পাঠাইলেন যে, ইহা নিজের প্রয়োজনে খরচ করিবে। তাহার স্ত্রী বলিল, আল্লাহর শোকর যে, তিনি আমাদের অনেক প্রয়োজন মিটাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। এখন ঘরের কাজকর্মের জন্য আপনার প্রয়োজন হইবে না। একজন খাদেমও এই অর্থ দ্বারা রাখা যাইবে এবং অন্যান্য প্রয়োজনও মিটানো যাইবে। হযরত সাঈদ (রাযিঃ) বলিলেন, এখানে আমাদের চাইতেও বেশী অভাবী ও মুখাপেক্ষী লোক রহিয়াছে। এই অর্থ তাহাদের জন্য খরচ করিব। স্ত্রী এই প্রস্তাবকে আনন্দচিত্তে গ্রহণ করিয়া লইলেন। হযরত সাঈদ (রাযিঃ) উহা হইতে ছোট ছোট থলি বানাইয়া একটি অমুক মিসকীনকে, একটি অমুক মিসকীনকে, একটি অমুককে মোটকথা অনেকগুলি তো ঐ সময়ই বন্টন করিয়া দিলেন। কিছু বাকী ছিল, উহা স্ত্রীর হাওয়ালা করিয়া দিলেন যে, অল্প অল্প করিয়া খরচ করিতে থাক। স্ত্রী বলিল, এই অবশিষ্ট টাকা দ্বারা একটি গোলাম খরিদ করিয়া লইব, যাহাতে ঘরের কাজকর্মে আপনার সুবিধা হইবে। তিনি বলিতে লাগিলেন, না। অতি শীঘ্রই তোমার চাইতে বেশী অভাবী তোমার নিকট আসিবে। (আশহার)

(১৪) একবার মিসরে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। আবদুল হামিদ ইবনে সাদ মিসরের শাসনকর্তা ছিলেন। বলিতে লাগিলেন, আমি শয়তানকে বলিব যে, আমি তাহার শত্রু (সে এইরূপ সময়ে অনেক সাবধানে খরচ করিবার

উৎসাহ দেয়)। মিসরে যত অসহায় গরীব লোক ছিল সকলের খাওয়া দাওয়া নিজ জিম্মায় লইয়া বলিলেন, দ্রব্যমূল্য কম হওয়া পর্যন্ত তাহাদের খাওয়া-দাওয়া আমার জিম্মায় থাকিবে। অবশেষে এইরূপই হইতে থাকিল। এইভাবে দুর্ভিক্ষ দূর হইয়া গেল। বাজারে দ্রব্যমূল্য সস্তা হইয়া গেল। ইহার পর তাহাকে বরখাস্ত করিয়া দেওয়া হইল। যখন তিনি মিসর হইতে বিদায় হইতে লাগিলেন, তখন যেই সকল ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে দুর্ভিক্ষের সময় কর্জ করিয়া লোকদেরকে খানা খাওয়াইয়াছিলেন তাহাদের দশ লক্ষ দেবহাম তাহার জিম্মায় পাওনা ছিল। যেহেতু সেইখান হইতে বিদায় হইয়া যাইতেছিলেন এইজন্য নিজের পরিবার-পরিজনদের অলংকার ইত্যাদি চাহিয়া আনিয়া ঐ সমস্ত ব্যবসায়ীদের নিকট বন্ধক রাখিয়া গেলেন। যে সমস্ত জিনিস বন্ধক রাখিয়াছিলেন উহার মূল্য পঞ্চাশ কোটি দেবহাম ছিল। কিছুদিন ইচ্ছা করিতেছিলেন যে, তাহাদের পাওনা শোধ করিয়া বন্ধকের অলংকারগুলি ছাড়াইয়া লইবেন, কিন্তু এই পরিমাণ অর্থ যোগাড় হয় নাই। ব্যবসায়ীদিগকে লিখিয়া দিলেন যে, ঐ অলংকারগুলি বিক্রয় করিয়া নিজেদের পাওনা আদায় করিয়া লও আর যেই পরিমাণ অর্থ বাঁচিয়া যায় উহা মিসরের ঐ সমস্ত গরীব লোকদের মধ্যে বন্টন করিয়া দাও, যাহাদিগকে আমি ঐ সময় সাহায্য করি নাই। (এতহাফ)

তাহাদের নিকট হইতে অলংকার লওয়া হইয়াছিল তাহারও সেই যুগেরই ফসল ছিলেন। কাজেই তাহাদের অলংকার বিক্রয় করিয়া গরীবদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া হইবে, এই ব্যাপারে কি তাহাদের কোন দ্বিধা থাকিতে পারে?

১৫ আবু মারসাদ একজন বিখ্যাত দানশীল লোক ছিলেন। তাহার নিকট এক ব্যক্তি আসিল এবং তাহার প্রশংসায় কিছু কবিতা পাঠ করিল (দানশীল ব্যক্তির প্রশংসা সর্বদা বাহ্যতঃ সওয়ালেরই নামান্তর হইয়া থাকে)। তিনি বলিলেন, আমার নিকট এখন তোমাকে দেওয়ার জন্য একেবারেই কিছু নাই। তবে একটা পন্থা হইতে পারে যে, তুমি কাজীর নিকট যাইয়া আমার উপর দশ হাজার দেবহামের দাবী কর। আমি কাজীর সামনে উহা স্বীকার করিয়া লইব (আর মানুষের সহিত কাহারও ওয়াদা করিয়া লওয়াও করজের মতই, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ রহিয়াছে : الْعِدَّةُ دَيْنٌ অর্থাৎ, ওয়াদা করজ সমতুল্য)। কাজী তোমার করজ আদায়ের জন্য আমাকে কয়েদ করিবে। আর আমার

পরিবারের লোকেরা আমাকে কয়েদখানায় তো থাকিতে দেবে না, তখন তাহারা ঐ পরিমাণ জমা করিয়া দিবে। সে এইরূপই করিল। তিনি কয়েদ হইয়া গেলেন এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত দশ হাজার দেহরাম কাজী সাহেবের হাওয়ালা হইয়া গেল এবং তিনি কয়েদ হইতে মুক্ত হইয়া আসিলেন। আর সেই অর্থ সেই ব্যক্তি পাইয়া গেল। (এতহাক)

(১৬) আরবের একটি জামাত একজন বিখ্যাত দানশীল দয়ালু ব্যক্তির কবর খিয়ারতের জন্য গেল। দূরের সফর ছিল, রাত্রে তাহারা সেখানে থাকিয়া গেল। তাহাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি উক্ত কবরবাসীকে স্বপ্নে দেখিল। সে তাহাকে বলিতেছে, তুমি কি তোমার উটটিকে আমার বুখতী উটের বদলে বিক্রয় করিবে? (বুখতী উট উন্নতমানের উটের মধ্যে গণ্য হয়। এই উটটি মৃত ব্যক্তি পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসাবে রাখিয়া গিয়াছিল।) স্বপ্নের মধ্যেই লেনদেন হইয়া গেল এবং কবরস্থ ব্যক্তি উঠিয়া তাহার উটটিকে জবাই করিয়া দিল। উটের মালিক ঘুম হইতে উঠিয়া দেখিল তাহার উটের রক্ত বহিতেছে। সে উঠিয়া উহাকে জবাই করিয়া দিল। (কেননা, উহার বাঁচিবার আশা ছিল না।) অতঃপর গোশত বন্টন করিয়া দিল। সকলে রান্না করিল এবং খাইল। অতঃপর তাহারা সেখান হইতে ফিরিয়া চলিল। যখন পরবর্তী মঞ্জিলে পৌঁছিল, তখন বুখতী উটের উপর সওয়ার এক ব্যক্তির সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইল। সে জিজ্ঞাসা করিল, অমুক নামের কোন ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে আছে কি? সেই স্বপ্নদ্রষ্টা ব্যক্তি বলিল, ইহা আমার নাম। সে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি অমুক কবরবাসীর নিকট কোন জিনিস বিক্রয় করিয়াছ? স্বপ্নদ্রষ্টা ব্যক্তি স্বপ্নের ঘটনা শুনাইল। বুখতী উটের আরোহী ব্যক্তি বলিল, উহা আমার পিতার কবর ছিল, এই তাহার বুখতী উট। তিনি আমাকে স্বপ্নে বলিয়াছেন, যদি তুমি আমার সন্তান হইয়া থাক, তবে আমার বুখতী উট অমুক ব্যক্তিকে দিয়া দাও এবং তোমার নাম বলিয়াছিলেন। অতএব, এই বুখতী উট আপনার হাওয়ালা করিলাম। এই বলিয়া সে উট রাখিয়া চলিয়া গেল। (এতহাক)

চরম পর্যায়ের দানশীলতা যে, মৃত্যুর পরেও তাহার কবরে আগমনকারীদের মেহমানদারীর জন্য নিজের মূল্যবান উটকে বিক্রয় করিয়া আগন্তুকদের মেহমানদারী করিল। তবে এই বিষয় যে, মৃত্যুর পর এই ধরনের ঘটনা কিভাবে ঘটিল। ইহাতে অসম্ভবের কিছু নাই। রূহ জগতে এই ধরনের ঘটনাবলী সংঘটিত হওয়া সম্ভব।

১৭) একজন কুরাইশী সফরে যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে বিপদগ্রস্ত অত্যন্ত দুর্বল একজন অসুস্থ ফকীরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে দরখাস্ত করিল, আমাকে কিছু সাহায্য করিয়া যাও। সেই কুরাইশী ব্যক্তি নিজের গোলামকে বলিলেন, যাহা কিছু তোমার নিকট খরচের জন্য আছে সব লইয়া আস। গোলাম চার হাজার দেবহাম পরিমাণ যাহা ছিল সব আনিয়া ফকীরের কোলে ঢালিয়া দিল। ফকীর দুর্বলতার কারণে উঠিতেও পারিল না। এত বড় মোটা অংকের দান পাইয়া আনন্দে তাহার চোখে পানি আসিয়া গেল। কুরাইশী ব্যক্তি মনে করিলেন, হয়ত সে এই পরিমাণকে কম মনে করিয়া কাঁদিতেছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি এইজন্য কাঁদিতেছ যে, ইহা অনেক কম পরিমাণ (কিন্তু আমার নিকট ইহা ছাড়া আর কিছু এইসময় নাই)। ফকীর বলিল, না, এইজন্য কাঁদিতেছি না। বরং এইজন্য কাঁদিতেছি যে, আপনার দানের দ্বারা কত সৃষ্টি উপকৃত হইতেছে। (এতহাফ)

যখন অপরিচিত একজন সওয়ালকারীর সওয়ালের উপর আপনার দানের এই অবস্থা যে, সফরের অবস্থায়ও যাহা কিছু ছিল সব দিয়া দিয়াছেন কাজেই ইহা দ্বারা আপনার দানশীলতার আন্দাজ হইয়া গিয়াছে।

১৮) আবদুল্লাহ ইবনে আমের ইবনে কুরাইয (রহঃ) নিজের প্রয়োজনে নব্বই হাজার দেবহামের বিনিময়ে হযরত খালেদ ইবনে উকবা উমাবীর নিকট হইতে তাহার বাড়ী খরিদ করিলেন। যখন উহা বিক্রয় হওয়ার পর খালেদের ঘরের লোকেরা জানিতে পারিল এবং ইহাতে তাহাদের অত্যন্ত কষ্ট হইল, রাত্রিবেলায় ইবনে আমের (রহঃ) কান্নার আওয়াজ শুনিতে পাইলেন। তিনি ঘরের মহিলাদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই কান্নার আওয়াজ কোথা হইতে আসিতেছে? তাহারা বলিল, খালেদের পরিবারের লোকদের, তাহাদের বাড়ী বিক্রয় হওয়ার কারণে কষ্ট হইতেছে। ইহা শুনিয়া তখনই ইবনে আমের (রহঃ) নিজের গোলামকে তাহাদের নিকট পাঠাইলেন। আর এই কথা জানাইলেন যে, উক্ত বাড়ী তোমাদের জন্য হাদিয়া। আর যে মূল্য আমি দিয়াছি উহাও এখন আর ফেরত লইব না। এই বাড়ী আমার পক্ষ হইতে তোমাদের জন্য হাদিয়া। (এতহাফ)

১৯) হারুন রশীদ (রহঃ) একবার হযরত ইমাম মালেক (রহঃ)কে পাঁচশত দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) হাদিয়া দিলেন। হযরত লায়স ইবনে সাদ (রহঃ) যখন ইহা জানিতে পারিলেন, তখন তিনি এক হাজার দিনার

হযরত ইমাম মালেক (রহঃ)এর নিকট হাদিয়া স্বরূপ পাঠাইলেন। বাদশাহ যখন ইহা জানিতে পারিলেন, তখন তিনি নারাজ হইলেন এবং বলিলেন, তুমি প্রজা হইয়া বাদশাহ উপর উঠিতে চাও। (আমাকে অপমান করা উদ্দেশ্য মনে হইতেছে!) লায়েস (রহঃ) বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! একরূপ নয়, বরং বর্তমানে আমার দৈনিক আয় এক হাজার দিনার। আমার লজ্জা হইল যে, এত বড় মর্যাদাশীল ইমামকে আমি হাদিয়া দিব আর উহা আমার একদিনের আমদানী হইতে কম দিব। হযরত লায়েস (রহঃ)এর সর্বদা অভ্যাস ছিল—তিনি প্রতি বৎসর হযরত ইমাম মালেক (রহঃ)এর খেদমতে একশত স্বর্ণমুদ্রা হাদিয়া পেশ করিতেন। ইহা ছাড়াও তাহার নিকট হাদিয়া আসিতে থাকিত। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহে হযরত ইমাম মালেক (রহঃ) অনেক সময় ঋণগ্রস্ত থাকিতেন। আর স্বয়ং হযরত লায়েস ইবনে সাদ (রহঃ) বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ওলামায়ে কেরামের মধ্যে ছিলেন। যাহার দৈনিক আমদানী ঐ সময় একহাজার দিনার ছিল। কিন্তু সারাজীবনে কখনও তাহার উপর যাকাত ওয়াজিব হয় নাই। বিভিন্ন সময় তাহার আমদানী বিভিন্ন রকম ছিল। আর এইরূপ তো হইয়াই থাকে যে, আমদানী কখনও কম আবার কখনও বেশী হয়। কিন্তু তাহার উপর যাকাত কখনই ওয়াজিব হয় নাই। কেননা, যাকাত তো তখনই ওয়াজিব হইতে পারে, যখন কেহ জমা করিয়া রাখে।

মুহাম্মদ ইবনে রুম্হ (রহঃ) বলেন, হযরত লায়েস (রহঃ)এর বাৎসরিক আয় প্রতি বৎসর আশি হাজার দিনার ছিল। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা কখনও তাহার উপর এক দেহরাম যাকাতও ওয়াজিব করেন নাই। স্বয়ং তাহার পুত্র শোয়াইব বলেন, আমার পিতার বাৎসরিক আমদানী বিশ পঁচিশ হাজার (স্বর্ণমুদ্রা) ছিল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তিনি সর্বদা ঋণগ্রস্তই থাকিতেন। (এতহাক)

প্রথম প্রথম বাৎসরিক আমদানী বিশ পঁচিশ হাজার হইয়া থাকিবে, যেই কারণে করজ হইতেছিল। ইহা সত্ত্বেও তিনি সবকিছু আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিয়া দিতেন। এই কারণে উহা বৃদ্ধি পাওয়া জরুরী ছিল। এইজন্য কোন এক সময় দৈনিক আমদানী এক হাজারও হইয়া গিয়াছে।

জনৈকা মহিলা হযরত লায়েস (রহঃ)এর নিকট একটি পেয়ালা লইয়া আসিল এবং বলিল, আমার সামান্য মধুর প্রয়োজন, যদি আপনার নিকট থাকে, তবে দয়া করিয়া দান করুন। তিনি এক কলস ভর্তি মধু তাহার হাওয়ালা করিয়া দিলেন। কেহ বলিল, সে তো সামান্যই চাহিয়াছিল। তিনি বলিলেন, ইহা তাহার কাজ ছিল যে, সে নিজের প্রয়োজন পরিমাণ

চাহিয়াছে। আর আমার উচিত হইল, ঐ পরিমাণ দেওয়া ; যে পরিমাণ আল্লাহ তায়ালা আমার উপর অনুগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন।

একবার কিছু লোক তাহার একটি বাগানের ফল খরিদ করিল। ইহাতে ক্রেতাদের লোকসান হইল। তিনি জানিতে পারিয়া বাগানের লেনদেন বাতিল করিয়া দিলেন এবং উহার মূল্য ফেরৎ দিলেন। আর তাহাদিগকে নিজের নিকট হইতে পঞ্চাশ দিনার হাদিয়া দিলেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, ইহা কিসের জরিমানা দিলেন? তিনি বলিলেন, তাহারা আমার বাগান হইতে উপকৃত হওয়ার আশা করিয়াছিল, আমার মন চাহিল যে, তাহাদের আশা পূর্ণ করিয়া দেই। (এতহাফ)

(২০) হযরত আমাশ সোলাইমান ইবনে মেহরান (রহঃ) বিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি বলেন, আমার একটি বকরী ছিল। উহা অসুস্থ হইয়া গেল। হযরত খায়সামা ইবনে আবদুর রহমান (রহঃ) প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় ঐ বকরীর খবরাখবর নেওয়ার জন্য আমার নিকট আসিতেন। বকরীর অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতেন এবং ইহাও বলিতেন যে, সম্ভবতঃ বাচ্চারা দুধ পাইতেছে না, তাহারা জ্বিদ তো করে না, বকরী কিছু খাইয়াছে কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি। আর সব সময় বিদায়কালে ঐ চটের নিচে যাহার উপর আমি বসিতাম কিছু রাখিয়া যাইতেন এবং বলিতেন, ইহা বাচ্চাদের জন্য খরচ করিবেন। বকরীর অসুস্থতার সময়ে তিনশত দিনার হইতে বেশী আমি তাহার অনুগ্রহ পাইয়াছি। আমার মনে আকাঙ্ক্ষা হইতে লাগিল যে, এই বকরী সবসময় অসুস্থ থাকিলেই ভাল। (এতহাফ)

(২১) আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান (রহঃ) হযরত আসমা ইবনে খারেসা (রহঃ)কে বলিলেন, আমার নিকট তোমার কিছু ভাল অভ্যাস সম্পর্কে খবর পৌঁছিয়াছে। তুমি তোমার নিয়মিত আমলগুলি আমাকে শুনাও। তিনি ওজর করিয়া বলিলেন যে, আমার অভ্যাস আর এমন কি ভাল হইতে পারে। অন্যান্যদের অভ্যাস অনেক ভাল, তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করুন। কিন্তু যখন তিনি বারবার কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন তিনি বলিলেন, আমি সর্বদা তিন ব্যাপারে যত্নবান থাকি। এক হইল, কখনও কোন উপবিষ্ট লোকের দিকে পা লম্বা করি নাই। দ্বিতীয়, যখন আমি খানা পাকাইয়াছি এবং লোকদিগকে খাওয়ার জন্য দাওয়াত করিয়াছি, তখন আমি তাহাদের উপর যতটুকু অনুগ্রহ করিয়াছি ; আমার উপর তাহাদের অনুগ্রহ উহা হইতে বেশী মনে করিয়াছি। তৃতীয়, যখন

আমার নিকট কোন অভাবী লোক কোন সওয়াল করিয়াছে, তখন তাহাকে দেওয়ার ব্যাপারে আমি কোন পরিমাণকেই বেশী মনে করি নাই। (যাহা কিছু দিয়াছি উহাকে সবসময় কমই মনে করিয়াছি।) (এতহাফ)

(২২) হযরত সাঈদ ইবনে খালেদ উমাতী (রহঃ) অনেক বেশী সম্পদশালী ছিলেন। আরব দেশে তাঁহার ধনাঢ্যতা প্রবাদবাক্য ছিল। তাঁহার নিয়ম ছিল—যখন কোন অভাবী লোক তাহার নিকট আসিত, তখন যাহা কিছু মওজুদ থাকিত উহাতে কৃপণতা করিতেন না। কিন্তু যদি কোন সময় কিছু না থাকিত, তবে সেই ব্যক্তিকে তিনি একটি চুক্তিপত্র লিখিয়া দিতেন যে, যখন আমার নিকট কোথাও হইতে কিছু আসিবে (অথবা মারা যাই), তখন এই চুক্তিপত্র দ্বারা উসূল করিয়া লইও। (এতহাফ)

(২৩) হযরত কায়েস ইবনে সাদ খায়রাজী (রাযিঃ) একবার অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। বন্ধু-বান্ধবদের মধ্য হইতে কেহ খোঁজ-খবর লওয়ার জন্য আসিল না। ইহাতে তিনি বড় আশ্চর্যান্বিত হইলেন। বিশেষতঃ ঐ সমস্ত লোকদের উপর যাহাদের আসা-যাওয়া বেশী ছিল এবং সুস্থতার সময় বেশী বেশী আসা-যাওয়া করিত। ঘরের লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ব্যাপার, এমন হইতেছে কেন? তাহারা বলিল, তাহারা প্রত্যেকেই আপনার নিকট ঋণগ্রস্ত। এইরূপ অবস্থায় ঋণের অর্থ না লইয়া আপনার নিকট আসিতে তাহাদের লজ্জা হইতেছে। তিনি বলিলেন, এই কমবখত মালের সর্বনাশ হউক। ইহা বন্ধু-বান্ধবদের সাক্ষাতও ছাড়াইয়া দেয়। এই বলিয়া এক ব্যক্তিকে ডাকিলেন এবং তাহার দ্বারা সারা শহরে ঘোষণা করাইলেন যে, যার যার জিম্মায় কায়েসের পাওনা রহিয়াছে, কায়েস উহা ক্ষমা করিয়া দিয়াছে। ইহার পর খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য লোকদের এত বেশী ভীড় হইল যে, দরজার চৌকাঠ পর্যন্ত ভাঙ্গিয়া গেল। (এতহাফ)

(২৪) মিসরে একজন নেক লোক ছিলেন। অভাবী গরীব লোকদের জন্য চাঁদা উঠাইয়া দিতেন। যখন কাহারও কোন প্রয়োজন দেখা দিত তখন তাহাকে বলিত। তিনি ধনী লোকদের নিকট হইতে কিছু চাহিয়া লইয়া তাহাকে দিয়া দিতেন। একজন ফকীর তাহার নিকট গেল এবং বলিল, আমার পুত্রসন্তান জন্ম হইয়াছে। আমার নিকট তাহার জন্য ব্যবস্থা করিবার কোন কিছু নাই। এই ব্যক্তি উঠিলেন এবং লোকদের নিকট তাহার জন্য চাহিলেন। কিন্তু কোথাও হইতে কিছু পাওয়া গেল না। (কারণ, যে

ব্যক্তি বারবার চাহিতে থাকে তাহার জন্য কিছু পাওয়াও মুশকিল হইয়া যায়।) এই ব্যক্তি সকলের নিকট হইতে নিরাশ হইয়া একজন দানশীল ব্যক্তির কবরের নিকট গেলেন। তাহার কবরের নিকট বসিয়া পুরা ঘটনা বর্ণনা করিলেন এবং সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া আসিলেন। ফিরিয়া আসিয়া নিজের নিকট হইতে একটি দিনার বাহির করিলেন এবং উহাকে ভাঙ্গিয়া দুই টুকরা করিয়া এক টুকরা নিজের নিকট রাখিলেন এবং অপর টুকরা ফকিরকে দিয়া দিলেন এবং বলিলেন, ইহা আমি তোমাকে করজ দিতেছি। আপাতত তুমি নিজের কাজ চালাইয়া লও। যখন তোমার নিকট কোথাও হইতে কিছু আসিবে, তখন আমার করজ পরিশোধ করিয়া দিও। সে লইয়া চলিয়া গেল এবং নিজের প্রয়োজন পূরা করিয়া লইল। রাত্রে ঐ নেকবখত দিনারদাতা ব্যক্তি কবরস্থ ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখিলেন। সে বলিতেছে, আমি তোমার কথা তো শুনিয়াছিলাম কিন্তু আমাকে জওয়াব দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় নাই। তুমি আমার পরিবারের লোকদের নিকট যাও এবং তাহাদেরকে বল, ঘরের অমুক অংশে যে চুলা আছে উহার নিচে একটি চিনামাটির বাসন প্রোথিত আছে। উহাতে পাঁচশত স্বর্ণমুদ্রা রহিয়াছে, উহা যেন ঐ ফকিরকে দিয়া দেয়।

এই ব্যক্তি সকালে উঠিয়া ঐ বাড়ীতে গেলেন এবং বাড়ীওয়ালাদেরকে সম্পূর্ণ ঘটনা এবং নিজের স্বপ্ন বর্ণনা করিলেন। তাহারা ঐ জায়গাটি খুঁড়িলেন এবং সেখান হইতে পাঁচ শত স্বর্ণমুদ্রা ভর্তি চিনামাটির বাসনটি বাহির করিয়া তাহার হাওয়ালা করিয়া দিলেন। সেই ব্যক্তি বলিলেন, স্বপ্ন কোন শরীয়তগত বিধান নয়, তোমরা এই সম্পদের ওয়ারিশ এবং মালিক, এইজন্য আমি শুধু স্বপ্নের কারণে এই সম্পদ নিতে চাই না। কিন্তু ওয়ারিশগণ বারবার অনুরোধ করিল এবং বলিল, তিনি যেখানে মরিয়াও দান করিতেছেন, সেখানে আমরা জীবিত অবস্থায়ও দান করিব না, ইহা বড় লজ্জার বিষয়। তাহাদের বারবার পীড়াপীড়ির কারণে তিনি ঐ স্বর্ণমুদ্রাগুলি লইয়া ফকীরকে দিয়া দিলেন এবং সমস্ত ঘটনা ফকিরকে শুনাইলেন। ফকীর উহা হইতে একটি দিনার লইয়া উহাকে দুই টুকরা করিল। এক টুকরা ঐ ব্যক্তিকে দিয়া নিজের করজ পরিশোধ করিল। আর দ্বিতীয় টুকরা নিজের কাছে রাখিয়া বলিল, আমার প্রয়োজনের জন্য তো ইহাই যথেষ্ট। বাকী এই সব দিনার আমার প্রয়োজন হইতে অতিরিক্ত। আমি এইগুলি লইয়া কি করিব? অতঃপর এই সব দিনার অন্যান্য ফকীরদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিল। এতহাফ কিতাবের লেখক বলেন, এই ঘটনায় চিন্তা করিবার বিষয় হইল, সবচেয়ে বেশী দানশীল কে? মৃত

ব্যক্তি, না তাহার পরিবারের লোকেরা, না এই ফকীর। আমাদের মতে তো এই ফকীরই সবচেয়ে বেশী দানশীল। কেননা, সে এত কঠিন প্রয়োজন থাকে সত্ত্বেও অর্ধেক দিনার হইতে বেশী লওয়া পছন্দ করিল না। (এতহাক)

(২৫) আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবনে আবী হেলাল মীর মুনশী বলেন, আমি একবার উজির আবু মুহাম্মদ মুহাম্মাবীর নিকট বসিয়াছিলাম। দারোয়ান আসিয়া খবর দিল যে, সাইয়্যেদ শরীফ মুর্তাজা (রহঃ) হাজির হওয়ার জন্য অনুমতি চাহিতেছেন। উজির সাহেব অনুমতি দিয়া দিলেন। যখন শরীফ মুর্তাজা (রহঃ) ভিতরে আসিয়া গেলেন, তখন উজির সাহেব দাঁড়াইয়া বড় সম্মান ও ভক্তি সহকারে তাহাকে নিজের আসনে বসাইলেন। তাহার সহিত কথাবার্তা বলিলেন। যখন তিনি যাইতে লাগিলেন, তখন দাঁড়াইয়া তাহাকে বিদায় করিলেন। তিনি চলিয়া গেলেন। সামান্য সময় অতিবাহিত হওয়ার পর দারোয়ান আসিয়া খবর দিল যে, তাহার ছোট ভাই সাইয়্যেদ শরীফ রাজী (রহঃ) হাজির হওয়ার জন্য অনুমতি চাহিতেছেন। উজির সাহেব তখন কিছু লেখার কাজে মশগুল হইয়া গিয়াছিলেন। ঐ কাগজটিকে জলদি রাখিয়া উঠিলেন এবং ব্যস্ততার সহিত দরজা পর্যন্ত গেলেন এবং বড় সম্মান ও ভক্তি সহকারে তাহার হাত ধরিয়া নিজের সঙ্গে করিয়া আনিয়া আসনে বসাইলেন এবং বিনয়ের সহিত তাহার সম্মুখে বসিলেন। আর খুবই মনোযোগ সহকারে তাহার সহিত কথাবার্তা বলিতে থাকিলেন। যখন তিনি উঠিয়া যাইতে লাগিলেন, তখন দরজা পর্যন্ত তাহাকে পৌছাইতে গেলেন। অতঃপর ফিরিয়া আসিয়া নিজের স্থানে বসিয়া গেলেন। তখন তো উজির সাহেবের নিকট লোকজন ছিল। কিছু জিজ্ঞাসা করিবার আমার হিম্মত হয় নাই, যখন লোকজন কমিয়া গেল, তখন আমি উজির সাহেবের নিকট আরজ করিলাম, আমি একটা কথা জানিতে চাই। অনুমতি হইলে আরজ করিব। উজির বলিলেন, অবশ্যই বল, অনুমতি আছে। আর তুমি সন্তবতঃ ইহা জিজ্ঞাসা করিবে যে, আমি ছোট ভাইয়ের যেই পরিমাণ সম্মান করিয়াছি, বড় ভাইয়ের সেই পরিমাণ সম্মান করি নাই, অথচ তিনি এলেম ও বয়স উভয় দিক দিয়া অগ্রগন্য ছিলেন। আমি বলিলাম, ইহাই আমার প্রশ্ন।

উজির বলিলেন, শোন, আমি একটি নহর খননের হুকুম দিয়াছিলাম। উহার নিকট শরীফ মুর্তাজার জমিনও ছিল। যেই কারণে ঐ নহরের খরচ সংক্রান্ত প্রায় ষোল দেহহামের মত তাহার জিম্মায় আসিয়াছিল। তিনি আমাকে কয়েকবার চিঠি লিখিয়াছেন, যেন উহা হইতে কিছু কম করিয়া

দেই। এইরূপ সামান্য অর্থের জন্য বারবার তিনি আমার নিকট সওয়াল করিতে থাকিলেন। আর সাইয়েদ রাজী সম্পর্কে আমি একবার জানিতে পারিলাম যে, তাহার ঘরে পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আমি উহার খুশীতে এবং তাহার প্রয়োজনের দিক খেয়াল করিয়া একটি খাঞ্চায় একশত দিনার তাহার খেদমতে পাঠাইলাম। তিনি তাহা এই বলিয়া ফেরত পাঠাইয়া দিলেন যে, উজির সাহেবকে (শুকরিয়ার পর) বলিয়া দিবে যে, আমি লোকদের দান কবুল করি না। (আল্লাহর শোকর আমার প্রয়োজন পরিমাণ আমার নিকট মওজুদ আছে।) আমি পুনরায় সেই খাঞ্চা পাঠাইলাম এবং বলিলাম যে, ইহা ধাত্রী এবং অন্যান্য কাজ যে সমস্ত মহিলারা করিয়াছে, তাহাদের জন্য পাঠাইয়াছি। তিনি আবার ফেরত পাঠাইয়া দিলেন এবং বলিলেন যে, আমার ঘরের মহিলারাও অন্যদের নিকট হইতে কিছু লইতে অভ্যস্ত নহে। আমি তৃতীয়বার পুনরায় পাঠাইলাম এবং আরজ করিলাম যে, আপনার নিকট যে সমস্ত তালেবে এলেম থাকে ইহা তাহাদের জন্য। তিনি বলিলেন, বড় খুশীর সহিত কবুল করিলাম। অতঃপর সেই খাঞ্চা তালেবে এলেমদের সম্মুখে রাখিয়া দিলেন আর বলিলেন, যাহার যতটুকু প্রয়োজন লইয়া লও। শরীফ রাজী (রহঃ)এর নিকট অনেক তালেবে এলেম থাকিত। একটি বাড়ী তিনি তালেবে এলেমদের থাকিবার জন্য বানাইয়া রাখিয়াছিলেন, যাহার নাম দারুল উলুম রাখিয়াছিলেন। উহাতে এইসব তালেবে এলেম থাকিত এবং তাহাদের যাবতীয় প্রয়োজন শরীফ রাজী (রহঃ)এর পক্ষ হইতে মিটানোর ব্যবস্থা ছিল। এই খাঞ্চা দারুল উলূমে রাখিবার পর তালেবে এলেমদের মধ্য হইতে কেহ উঠিল না। শুধুমাত্র একজন তালেবে এলেম উঠিয়া খাঞ্চা হইতে একটি দিনার বাহির করিল এবং উহাকে সেখানেই ভাঙ্গিয়া উহা হইতে সামান্য এক অংশ তাহার নিকট রাখিল আর বাকী অংশ ঐ খাঞ্চাতেই রাখিয়া দিল।

শরীফ রাজী ঐ তালেবে এলেমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই সামান্য পরিমাণ তোমার কি কাজের জন্য দরকার ছিল? সে আরজ করিল, এক রাত্রে আমার নিকট বাতি জ্বালানোর জন্য তৈল ছিল না, খাজাঞ্চী সাহেবকে পাই নাই। আমি অমুক দোকানদারের নিকট হইতে তৈল করজ আনিয়াছিলাম। ইহা দ্বারা তাহার করজ পরিশোধ করিব। শরীফ রাজী এই শব্দ শুনিয়া তালেবে এলেমদের সংখ্যা অনুযায়ী নিজের ভাণ্ডারের চাবি বানাইলেন এবং প্রত্যেক তালেবে এলেমকে একটি করিয়া চাবি দিয়া দিলেন ও বলিলেন, যাহার যখন যতটুকু প্রয়োজন হয়, যেন লইয়া লয় ;

খাজাঞ্চি সাহেবকে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন নাই। আর ঐ খাজাটিকে ঐ অবস্থাতেই অর্থাৎ উহাতে শুধুমাত্র একটি দিনার ভাঙ্গা ছিল। অন্যান্য সকল দিনার সহ ফেরত পাঠাইয়া দিলেন। এই ঘটনা শুনাইয়া উজির সাহেব বলিলেন, এখন তুমিই বল আমি এইরূপ ব্যক্তির সম্মান কেন করিব না? (এতহাফ)

(২৬) হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এর যখন ইন্তেকাল হইতেছিল, তখন তিনি ওসীয়াত করিলেন যে, আমার গোসল মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল হাকীম (রহঃ) দিবেন। যখন তাহার ইন্তেকাল হইয়া গেল, তখন মুহাম্মদ (রহঃ) কে জানানো হইল। তিনি তশরীফ আনিলেন এবং বলিলেন, তাহার হিসাবের খাতা আগে আমাকে দেখাও। খাতা আনা হইল। উহাতে হযরত ইমামের জিম্মায় লোকদের যে সমস্ত করজ ছিল উহা হিসাব করিয়া জমা করিলেন। উহার পরিমাণ সমস্ত হাজার দেহাম ছিল। মুহাম্মদ (রহঃ) বলিলেন, এই সমস্ত করজ আমার দায়িত্বে। দায়িত্ব গ্রহণ করার কাগজ লিখিয়া দিলেন এবং বলিলেন, আমার গোসল দেওয়ার দ্বারা ইহাই উদ্দেশ্য ছিল। অতঃপর তিনি সমস্ত করজ আদায় করিয়া দিলেন। (এতহাফ)

(২৭) হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন, আমি সর্বদা হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান (রহঃ) কে (যিনি হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর বিখ্যাত উস্তাদ ছিলেন) ভালবাসিতাম। কারণ, আমি তাহার একটি ঘটনা জানিয়াছিলাম। উহা এই যে, তিনি একদিন গাধার উপর সওয়ার হইয়া ঘাইতেছিলেন। উহাকে পা দিয়া আঘাত করিলে উহা এত জোরে দৌড়াইল যে, উহার ঝটকায় হযরত হাম্মাদের জামার বোতাম ছুটিয়া গেল। পথে একটি দর্জির দোকান নজরে পড়িল। উহা সেলাই করিবার জন্য নামিতে লাগিলেন। দর্জি বলিল, নামিবার দরকার নাই, সাধারণ কাজ; আমি এখনই লাগাইয়া দিতেছি। দর্জি দাঁড়াইয়া ঐ বোতামটি জামার মধ্যে সেলাই করিয়া দিল। হাম্মাদ (রহঃ) উহার পারিশ্রমিক হিসাবে একটি থলি দিলেন, যাহাতে দশটি স্বর্ণমুদ্রা ছিল। তদুপরি পারিশ্রমিক কম হইয়াছে বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। (এতহাফ)

(২৮) রাবী ইবনে সুলাইমান (রহঃ) বলেন, হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) একবার সওয়ারীর উপর সওয়ার হইতেছিলেন। এক ব্যক্তি

তাড়াতাড়ি আসিয়া লাগাম ধরিল (যাহাতে আরোহণ করিতে সহজ হয়)। হযরত ইমাম (রহঃ) আমাকে বলিলেন, আমার পক্ষ হইতে এই ব্যক্তিকে চারটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়া দাও এবং কম হওয়ার জন্য ক্ষমা প্রার্থনাও করিও।

আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের ছমাইদী (রহঃ) বলেন, একবার হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) হজ্জে গেলেন। তাহার নিকট দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা ছিল। মক্কা মুকাররমার বাহিরে তাহার তাঁবু লাগান ছিল। ফজরের নামাযের পর তিনি ঐখানেই তাঁবুর মধ্যে একটি কাপড় বিছাইয়া স্বর্ণমুদ্রাগুলি উহার উপর রাখিয়া দিলেন। (মক্কাবাসীদের মধ্য হইতে) যাহারা সাক্ষাৎ করিবার জন্য আসিতেছিল এক এক মুষ্টি তাহাদের প্রত্যেককে দিতে থাকিলেন। যোহর পর্যন্ত সবগুলি শেষ হইয়া গেল।

(এতহাফ)

২৯) মুহাম্মদ ইবনে আব্বাদ মুহান্নাবী (রহঃ) বলেন, আমার পিতা একবার মামুনুর রশীদের নিকট গেলেন। তিনি এক লক্ষ দেরহাম নজরানা পেশ করিলেন। সেখান হইতে উঠিয়া আসিবার পর সবগুলি দেরহাম তখনই গরীবদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন। ইহার পর পুনরায় যখন মামুনের নিকট যাওয়ার সুযোগ আসিল, তখন মামুন সবগুলি দেরহাম বিতরণ করিয়া দেওয়ার কারণে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিলেন। তখন আমার পিতা বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! যাহা আছে উহার ব্যাপারে কৃপণতা করা মাবুদের (আব্বাহর) সহিত কুধারণার নামাণ্ডর (অর্থাৎ তিনি একবার তো দিয়াছেন আবার কোথা হইতে দিবেন)। (এতহাফ)

৩০) সাহাবী হযরত তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ আল ফাইয়াজ (রাযিঃ) বিখ্যাত দানশীল লোকদের মধ্যে ছিলেন। একবার হযরত উসমান (রাযিঃ)এর নিকট তাহার পঞ্চাশ হাজার দেরহামের ঋণ হইয়া গিয়াছিল। হযরত উসমান (রাযিঃ) মসজিদে যাইতেছিলেন। রাস্তায় তাহার সহিত সাক্ষাত হইল। হযরত তালহা আরজ করিলেন, আমার নিকট এখন অর্থ আসিয়া গিয়াছে, আপনার করজ আদায় করিতে চাই। হযরত উসমান (রাযিঃ) বলিলেন, উহা তোমাকে হাদিয়া দিলাম। কেননা, লোকদের জন্য তোমার অনেক খরচ করিতে হয়।

জাবের ইবনে কাবীসা (রহঃ) বলেন, আমি বহুদিন পর্যন্ত হযরত তালহা (রাযিঃ)এর সঙ্গে ছিলাম। না চাহিতে দানকারী হিসাবে আমি তাহার চাইতে অধিক কাহাকেও দেখি নাই।

হযরত হাসান (রহঃ) বলেন, একবার তিনি তাহার একটি জমিন

বিক্রয় করিলেন, যাহার মূল্য সাত লক্ষ ছিল। যখন মূল্য উসূল হইল, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। সেই অর্থ রাত্রে তাহার নিকট রহিল। সারারাত্র অত্যন্ত পেরেশান অবস্থায় জাগিয়া কাটাইলেন। এই ভয়ে যে, এই সম্পদ আমার নিকট রহিয়াছে (হঠাৎ মৃত্যু না আসিয়া যায়)। সকালে উঠিয়া সর্বপ্রথম উহা বন্টন করিয়া দিলেন। তাহার স্ত্রী হযরত সাদা বিনতে আউফ (রহঃ) বলেন, আমি একবার তাহাকে দেখিলাম যে, তাহার খুব কষ্ট হইতেছে। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি সুস্থ আছেন তো, আপনার কি অবস্থা? তিনি বলিতে লাগিলেন, আমার নিকট কিছু মাল জমা হইয়া গিয়াছে, উহার কারণে বড় কষ্ট হইতেছে। আমি বলিলাম, ইহা তো তেমন কোন বিষয় নয়। গোলামকে পাঠাইয়া আপনার আত্মীয়-স্বজনদেরকে ডাকিয়া আনুন এবং (আত্মীয়দের সহিত সদ্যবহার হিসাবে) তাহাদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিন। সুতরাং তিনি ঐ সময়ই গোলামকে পাঠাইয়া লোকদেরকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং উহা বন্টন করিয়া দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাহার খাদেমকে জিজ্ঞাসা করিলাম, উহা কি পরিমাণ মাল ছিল? সে বলিল, চার লক্ষ ছিল।

তাহার স্ত্রী আরও একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যে, একবার তিনি ঘরে আসিলেন, চেহারা অত্যন্ত বিষন্ন ছিল। চিন্তার কারণে চেহারা কালো বর্ণ দেখাইতেছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কি ব্যাপার? আমার পক্ষ হইতে আপনার অপছন্দনীয় কোন বিষয় ঘটিয়া থাকিলে আমি ক্ষমা চাহিব। তিনি বলিতে লাগিলেন, না, তুমি তো মুসলমানের জন্য অত্যন্ত ভাল স্ত্রী (কেননা, তুমি নেককাজে সাহায্য করিয়া থাক)। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তবে কি বিষয় দেখা দিল। তিনি বলিতে লাগিলেন, কিছু মাল জমা হইয়া গিয়াছে, উহার কারণে আমি পেরেশান হইয়া গিয়াছি। আমি বলিলাম, ইহা তো এমন কোন বিষয় নয়, উহা লইয়া বন্টন করিয়া দিন, ইহাতে কি হইয়াছে। কোন কোন সময় দান গ্রহণকারী কেহ না আসিলে উহা থাকিয়া যাইত। তাহার স্ত্রী সাদা ইহাও বলেন যে, একবার তিনি এক লক্ষ পরিমাণ বন্টন করিয়াছেন। তখন তাহার অবস্থা এই ছিল যে, ঐদিন তাহার মসজিদে যাইতে এই কারণে দেরী হইয়া গেল যে, তাহার নিকট যে কাপড় ছিল (চাদর) উহার উভয় কিনারা সেলাই করিতে আমার দেরী হইয়াছিল। (অর্থাৎ এই একটি কাপড়ই ছিল যাহা সেলাই হওয়ার অপেক্ষায় বসিয়া রহিলেন, অন্য কোন কাপড় ছিল না যাহা পরিধান করিয়া মসজিদে যাইবেন)।

একজন গ্রাম্য লোক হযরত তালহা (রাযিঃ)এর নিকট আসিল এবং

আত্মীয়তার দোহাই দিয়া (আত্মীয়ের সহিত সদ্যবহার হিসাবে) কিছু চাহিল। তিনি বলিলেন, আত্মীয়তার দোহাই দিয়া কথা বলিয়া আজ পর্যন্ত কেহ আমার নিকট চাহে নাই। আমার নিকট একখণ্ড জমিন আছে। হযরত উসমান (রাযিঃ) উহা খরিদ করিতে চাহিয়াছিলেন। উহার মূল্য তিনি তিন লক্ষ বলিয়াছিলেন। তোমার যদি মনে চায়, তবে ঐ জমিন লইয়া লও। আর যদি নগদ চাও, তবে আমি উহা তাহার নিকট বিক্রয় করিয়া উহার মূল্য তোমাকে দিয়া দিব। লোকটি মূল্য পছন্দ করিল। তিনি হযরত উসমান (রাযিঃ)এর হাতে উহা বিক্রয় করিয়া উহার মূল্য তাহাকে দিয়া দিলেন। (এতহাফ)

তাহাদের নিকট প্রচুর পরিমাণে জমিন ছিল। কেননা, যেই সমস্ত এলাকায় জিহাদে যাইতেন সেই সমস্ত এলাকা বিজয় হইত আর অধিকাংশ সময় গনিমতের সহিত জমিনও মুজাহিদগণের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া হইত।

৩১ একবার হযরত আলী (রাযিঃ) বসিয়া কাঁদিতেছিলেন। কেহ কাঁদিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন, সাত দিন যাবত কোন মেহমান আসে নাই। আমার ভয় হইতেছে, আল্লাহ তায়ালা (কোন কারণে নারাজ হইয়া) আমাকে অপমান করিবার ইচ্ছা তো করেন নাই! (এতহাফ)

৩২ একবার এক ব্যক্তি তাহার এক বন্ধুর নিকট গেল। যাইয়া বলিল, আমার চারশত দেরহাম ঋণ হইয়া গিয়াছে। তোমার নিকট সাহায্য চাহিতে আসিয়াছি। সে তৎক্ষণাৎ চারশত দেরহাম ওজন করিয়া দিয়া দিল। যখন লোকটি চলিয়া গেল, তখন সে কাঁদিতে আরম্ভ করিল। স্ত্রী মনে করিল, হযরত মাল খরচ হইয়া যাওয়ার কারণে তাহার কষ্ট হইয়াছে। স্ত্রী বলিতে লাগিল, যদি এতই কষ্ট হইয়া থাকে, তবে দান করিবার কি দরকার ছিল। সে বলিতে লাগিল, আমি এইজন্য কাঁদিতেছি যে, তাহার সহিত আমার সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও তাহার অবস্থা সম্পর্কে নিজে কেন খবর রাখিলাম না। তাহাকে আমার নিকট চাহিবার প্রয়োজন কেন হইল। (এতহাফ)

৩৩ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রাযিঃ) একবার একটি ময়দান দিয়া যাইতেছিলেন। পথে একটি বাগান পড়িল। একজন হাবশী গোলাম বাগানে কাজ করিতেছিল। তাহার জন্য রুটি আসিল এবং উহার সঙ্গে একটি কুকুরও বাগানে চলিয়া আসিল। কুকুরটি ঐ গোলামের নিকট

আসিয়া দাঁড়াইয়া গেল। গোলাম কাজ করিতে করিতে একটি রুটি ঐ কুকুরের সম্মুখে ফেলিয়া দিল। কুকুর রুটিটি খাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। গোলাম দ্বিতীয় এবং পরবর্তীতে তৃতীয় রুটিটিও কুকুরের সামনে ফেলিয়া দিল। সর্বমোট তিনটি রুটিই ছিল আর এই তিনটি রুটিই কুকুরকে খাওয়াইয়া দিল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রাযিঃ) দাঁড়াইয়া গভীর দৃষ্টিতে দেখিতেছিলেন। যখন তিনটি রুটিই শেষ হইয়া গেল, তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রাযিঃ) গোলামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রতিদিন তোমার জন্য কয়টি রুটি আসে? সে আরজ করিল, আপনি তো দেখিলেন। তিনটি রুটিই আসে। তিনি বলিলেন, তবে তিনটি রুটিই কেন দিয়া দিলে? গোলাম বলিল, জনাব! এখানে কোন কুকুর নাই। এই অসহায় ক্ষুধার্ত কুকুরটি কোথাও দূর হইতে অনেক পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে। এইজন্য আমার ভাল লাগিল না যে, উহাকে খালি ফিরাইয়া দিব। তিনি বলিলেন, আজ তুমি কি খাইবে? গোলাম বলিল, একদিন না খাইয়া থাকিব। ইহা তো তেমন বড় কোন ব্যাপার নয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রাযিঃ) মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, লোকেরা আমাকে তিরস্কার করে যে, তুমি অনেক বেশী দান কর। অথচ এই গোলাম তো আমার চাইতে অনেক বেশী দানশীল। এই চিন্তা করিয়া শহরে ফিরিয়া গেলেন এবং ঐ বাগান, গোলাম এবং যে সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম বাগানে ছিল সম্পূর্ণ মালিকের নিকট হইতে খরিদ করিলেন। খরিদ করিয়া গোলামকে আজাদ করিয়া দিলেন আর বাগানটি ঐ গোলামকে দিয়া দিলেন। (এতহাক)

৩৪) আবুল হাসান আনতাকী (রহঃ) খুরাসানের শহরে রাই নামক স্থানে বসবাস করিতেন। একদিন ত্রিশজনেরও বেশী মেহমান আসিয়া গেল, রুটি অল্প ছিল। প্রস্তুত করিবারও সুযোগ ছিল না। রাত্রিকাল ছিল। তিনি যে কয়টি রুটি ছিল, সবগুলিকে টুকরা টুকরা করিলেন এবং ঐগুলিকে দস্তুরখানে ছড়াইয়া দিয়া সবাইকে বসাইলেন এবং বাতি নিভাইয়া দিলেন। সকলেই খাওয়া আরম্ভ করিল। সকলেরই মুখ চালনার আওয়াজ আসিতেছিল। কিছু সময় পার হওয়ার পর মনে হইল সকলেই খাওয়া শেষ করিয়াছে। অতএব, বাতি জ্বালান হইল ও দস্তুরখান উঠানো হইল। অথচ উহাতে রুটির সমস্ত টুকরা পূর্বের মত রহিয়া গিয়াছিল। সকলেই শুধু শুধু মুখ চালাইতেছিল। এই খেয়াল করিয়া কেহই খায় নাই যে, ভালই হইল—ইহা ভাল সুযোগ যে, অন্যদের খাওয়ার কাজ হইয়া যাইবে। (এতহাক)

৩৫) হযরত শোবা (রহঃ) বিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁহার উপাধি ছিল আমিরুল মুমিনীন ফিল হাদীস (হাদীস শাস্ত্রে মুমিনদের বাদশাহ)। বড় এবাদতগুজার ও দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত লোকদের মধ্যে ছিলেন। একবার একজন অভাবী লোক তাহার নিকট হাজির হইল। তখন দেওয়ার মত কোন জিনিস তাহার নিকট ছিল না। নিজের ঘরের ছাদ হইতে একটি কড়া বাহির করিয়া তাহাকে দিয়া দিলেন (এবং বলিলেন, ইহাকে বিক্রয় করিয়া লও) আর অনেক ক্ষমা চাহিলেন যে, এখন আমার নিকট তোমাকে দেওয়ার মত কিছুই নাই। (এতহাক্)

৩৬) হযরত আবু সাহল সালুকি (রহঃ) একবার ওজু করিতেছিলেন। এক ব্যক্তি আসিল এবং নিজের কিছু অভাবের কথা বলিল। দেওয়ার জন্য কোন জিনিস ছিল না। তিনি বলিতে লাগিলেন, কিছু সময় অপেক্ষা কর, আমি ওজু শেষ করিয়া লই। যখন তিনি ওজু শেষ করিলেন, তখন বলিলেন, এই কাঠের লোটাটি যাহা দ্বারা আমি ওজু করিতেছিলাম লইয়া যাও। আর তো কোন জিনিস এই সময় নাই। (এতহাক্)

৩৭) ইয়ারমুকের যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)দের একটি বড় জামাত পানি থাকা সত্ত্বেও এই কারণে পিপাসিত অবস্থায় জীবন দিয়াছেন যে, তাহাদের নিকট পানি পৌঁছার পর অন্য এক ব্যক্তি আহঁ করিয়া উঠিয়াছে। সুতরাং তিনি নিজে পানি পান না করিয়া অপরজনের দিকে পানি লইয়া যাওয়ার ইঙ্গিত করিয়াছেন। এই বিষয়ে একটি ঘটনা হেকায়াতে সাহাবা কিতাবে লেখা হইয়াছে। কিন্তু যুদ্ধের অবস্থা বর্ণনাকারী লিখিয়াছেন, হযরত ইকরিমা ইবনে আবু জাহাল (রাযিঃ), সুহায়েল ইবনে আমর (রাযিঃ), সাহল ইবনে হারেস (রাযিঃ), হারেস ইবনে হিশাম (রাযিঃ) এবং মুগীরা গোত্রের একটি জামাত অনুরূপ পিপাসিত অবস্থায় জীবন দিয়াছেন যে, যখন তাহাদের নিকট পানি আনা হইত, তখন তাহারা অন্যদের দিকে ইঙ্গিত করিতেন। হযরত ইকরিমা (রাযিঃ)এর নিকট পানি আনা হইল। কিন্তু তিনি দেখিলেন যে, হযরত সুহাইল ইবনে আমর (রাযিঃ) পানির দিকে তাকাইতেছেন। তিনি বলিয়া দিলেন যে, প্রথমে সুহায়েলকে পান করাও। যখন তাহার নিকট নেওয়া হইল, তখন তিনি দেখিলেন, হযরত সাহল ইবনে হারেস (রাযিঃ) পানির দিকে তাকাইতেছেন। তিনি বলিয়া দিলেন, প্রথমে সাহলকে পান করাও। মোটকথা, তাহারা পিপাসিত অবস্থায়ই জীবন দিলেন। হযরত খালেদ

ইবনে ওলীদ (রাযিঃ) যখন তাহাদের লাশের নিকট গেলেন, তখন বলিতে লাগিলেন, তোমাদের উপর আমার জান কুরবান হউক (এই সময়েও অপরকে প্রাধান্য দেওয়া তোমাদের হইতে ছুটে নাই)। (এতহাক)

৩৮) আব্বাস ইবনে দেহকান (রহঃ) বলেন, বিশ্র ইবনে হারেস হাফী (রহঃ) ছাড়া কোন ব্যক্তি এমন নাই যে, যেই অবস্থায় দুনিয়াতে আসিয়াছিল অর্থাৎ খালি হাত ও উলঙ্গ শরীর তদ্রূপ দুনিয়া হইতে বিদায় লইয়াছে। বিশ্র ইবনে হাফী (রহঃ) অবশ্য ঐ ভাবেই দুনিয়া হইতে বিদায় লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি অসুস্থ ছিলেন। ইন্তেকালের সময় নিকটবর্তী ছিল। একজন সওয়ালকারী লোক আসিল। নিজের অভাবের কথা প্রকাশ করিল। যে জামাটি তাহার পরনে ছিল উহা খুলিয়া তাহাকে দান করিয়া দিলেন। আর নিজে অল্প সময়ের জন্য অন্য একজনের নিকট হইতে জামা ধার লইলেন এবং ঐ অবস্থায় ইন্তেকাল করিলেন। (এতহাক)

৩৯) কে বলে যে, এই সমস্ত ঘটনা শুধু পূর্ববর্তী বুয়ুগদের সহিতই খাস ছিল। হযরত মাওলানা শাহ আবদুর রহীম রায়পুরী (রহঃ) এর ইন্তেকাল হইয়াছে বেশী দিন হয় নাই। তাহার অভ্যাস ছিল- যাহাকিছু কোথাও হইতে আসিত উহা তখনই বিতরণ করিয়া দিতেন। কখনও কখনও বালিশের নিচে কিছু রাখা আছে দেখিয়া বলিতেন, এই যে, আরও আসিয়া গিয়াছে। ইন্তেকালের কিছুদিন পূর্বে নিজের সমস্ত কাপড়-চোপড় খাদেমদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিয়াছিলেন। অতঃপর নিজের একান্ত খাদেম (খাছ খলীফা) হযরত মাওলানা শাহ আবদুল কাদের (রহঃ)কে এরশাদ করিলেন, বাস, এখন জীবনের যে কয়দিন বাকী আছে তোমার নিকট হইতে কাপড় ধার লইয়া পরিধান করিব। এইভাবে হযরত মাওলানার কাপড়ই জীবনের শেষ অংশে ব্যবহার করিতেন।

৪০) এক বুয়ুগ বলেন, আমরা কয়েকজন লোক শাম দেশের একটি শহর তুরসূসে একত্রিত হইয়া বাহিরে ঘাইতেছিলাম। পথিমধ্যে একটি কুকুরও আমাদের সঙ্গে চলিতে লাগিল। যখন আমরা শহর হইতে বাহির হইলাম, তখন একটি মৃত জন্তু পড়িয়া থাকিতে দেখিলাম। আমরা উহা হইতে সরিয়া কিছুটা দূরে একটি উচু জায়গায় বসিয়া গেলাম। যে কুকুরটি আমাদের সঙ্গে আসিয়াছিল সে ঐ মৃত জন্তুটিকে দেখিয়া শহরের দিকে ফিরিয়া গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে সে নিজের সঙ্গে প্রায় আরও বিশটি কুকুর

লইয়া আসিল। মৃতজন্তটির নিকট আসিয়া সে নিজে পৃথক হইয়া বসিয়া গেল আর অন্যান্য সকল কুকুর উহাকে খাইতে থাকিল। যখন কুকুরগুলি খাইয়া শহরের দিকে চলিয়া গেল, তখন এই কুকুর যে ডাকিতে গিয়াছিল নিজ জায়গা হইতে উঠিল এবং ঐ মৃতজন্তটির নিকট আসিয়া কেবল হাড়ি ইত্যাদি যাহা উহারা খাইয়া ফেলিয়া গিয়াছিল খাইল। অতঃপর শহরের দিকে চলিয়া গেল। (এতহাফ)

(৪১) আবুল হাসান বুশাঞ্জী (রহঃ) এক বুয়ুর্গ ছিলেন। একবার তিনি পায়খানায় প্রবেশ করিবার পর সেইখান হইতে নিজের এক শাগরেদকে ডাকিলেন এবং নিজের জামা খুলিয়া দিয়া বলিলেন, ইহা অমুক ফকিরকে দিয়া আস। শাগরেদ বলিল, আপনি এন্তেঞ্জা হইতে অবসর হওয়া পর্যন্ত তো দেবী করিতে পারিতেন। তিনি বলিলেন, তাহার অভাবের কথা মনে হওয়াতে আমার এই ইচ্ছা হইয়াছে যে, জামাটি তাহাকে দিয়া দেই। আর আমার নফসের উপর এই ভরসা ছিল না যে, সে এন্তেঞ্জা হইতে অবসর হওয়া পর্যন্ত পরিবর্তন হইবে না। (এতহাফ)

পায়খানায় কথা বলা মকরুহ ; কিন্তু দান করার আগ্রহ এবং নিজের নফসের উপর খারাপ ধারণা তাহাকে এইরূপ করিতে বাধ্য করিয়াছে, হয়তবা তখনও ছতর খোলাই হয় নাই।

(৪২) আমিরুল মুমিনীন মাহদী (রহঃ) মূসা ইবনে জাফরকে বিদ্রোহের আশংকায় কয়েদ করিয়া রাখিয়াছিলেন। একবার রাতে তিনি তাহাজ্জুদ নামায পড়িতেছিলেন। উহাতে সূরা মুহাম্মদের আয়াত **فَهَلْ عَسَيْتُمْ أَنْ تُلَاقُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ** পর্যন্ত পৌঁছিলেন। এই পর্যন্ত পৌঁছিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। এই আয়াতকে বারবার পড়িতেছিলেন এবং কাঁদিতেছিলেন। সালাম ফিরাইয়া রাবীকে বলিলেন, মূসাকে ডাকিয়া আন। রাবী (রহঃ) বলেন, আমি তাহাকে ডাকিয়া আনিলাম। ফিরিয়া আসিয়া দেখি, তখনও তিনি ঐ আয়াতই বারবার পড়িতেছিলেন এবং কাঁদিতেছিলেন। যখন মূসা আসিলেন তখন মাহদী বলিলেন, আমি এই আয়াত পড়িতেছিলাম, আমার আশংকা হইল যে, আমি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছি। তুমি যদি এই ওয়াদা কর যে, আমার সন্তানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবে না, তাহা হইলে আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিব। মূসা বলিলেন, অসম্ভব, আমার তো এইরূপ ক্ষমতাও নাই। আর আমি কখনও ইহার কল্পনাও করি না। মাহদী রাবীকে

বলিলেন, তাহাকে এখনই তিন হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিয়া এই রাতেই রওয়ানা করাইয়া দাও, এমন না হয় যে, পরে আমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হইয়া যায়। (এতহাফ)

৪৩ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, হযরত হাসান (রাযিঃ) ও হযরত হুসাইন (রাযিঃ) একবার ভীষণ অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। তখন হযরত আলী (রাযিঃ) ও হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) মাল্লত করিলেন যে, যদি ইহারা সুস্থ হইয়া যায়, তবে শুকরিয়া হিসাবে উভয়েই তিনটি করিয়া রোযা রাখিবেন। আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানীতে দুইজনই সুস্থ হইয়া গেল। তাহারা শুকরানা স্বরূপ রোযা রাখা শুরু করিলেন। কিন্তু ঘরে না সেহরীর জন্য কিছু ছিল, না ইফতারের জন্য। ক্ষুধার্ত অবস্থায়ই রোযা শুরু করিয়া দিলেন। সকালে হযরত আলী (রাযিঃ) শামউন নামক জনৈক ইহুদীর নিকট গেলেন। তিনি তাহাকে বলিলেন, তুমি যদি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সুতা বানাইবার জন্য কিছু পশম দাও, তাহা হইলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেটি সুতা বানাইয়া দিবেন। সে পশমের একটি গাঁট তিন ছা (সাড়ে দশ সের পরিমাণ) যবের বিনিময় নির্ধারণ করিয়া তাহাকে দিয়া দিল। হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) উহা হইতে এক-তৃতীয়াংশ সুতা বানাইলেন এবং এক ছা (সাড়ে তিন সের) যব পারিশ্রমিক লইয়া উহাকে পিষিয়া পাঁচটি রুটি তৈয়ার করিলেন। স্বামী-স্ত্রী দুইজনের জন্য দুইটি, দুই পুত্রের জন্য দুইটি, আর একটি বাদীর জন্য যাহার নাম ছিল ফিজ্জা। রোযা অবস্থায় দিনভর মেহনত মজদুরী করিয়া হযরত আলী (রাযিঃ) ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত মাগরিবের নামায পড়িয়া ঘরে ফিরিলেন এবং খানা খাওয়ার জন্য দস্তুরখান বিছাইলেন, হযরত আলী (রাযিঃ) রুটির একটি টুকরা মাত্র ছিড়িয়াছিলেন এমন সময় একজন ফকীর দরজা হইতে আওয়াজ দিল যে, হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরওয়ালাগণ! আমি একজন ফকীর মিসকীন মানুষ, আমাকে খানা দাও, আল্লাহ তায়লা তোমাদিগকে জান্নাতের দস্তুরখান হইতে খানা খাওয়াইবেন। হযরত আলী (রাযিঃ) হাত গুটাইয়া লইলেন, হযরত ফাতেমার সহিত পরামর্শ করিলেন, তিনি বলিলেন, অবশ্যই দিয়া দিন। সব রুটি তাহাকে দিয়া দিলেন এবং ঘরের সকলেই না খাইয়া রহিলেন। এই অবস্থায় দ্বিতীয় দিন রোযা শুরু করিয়া দিলেন।

দ্বিতীয় দিন পুনরায় হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) দুই-তৃতীয়াংশ পশমের

সুতা বানাইলেন এবং এক ছা (সাড়ে তিন সের) যব পারিশ্রমিক লইয়া উহা পিষিয়া রুটি পাকাইলেন। যখন হযরত আলী (রাযিঃ) হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত মাগরিবের নামায পড়িয়া তশরীফ আনিলেন এবং সকলেই খাইতে বসিলেন, তখন একজন এতীম দরজায় দাঁড়াইয়া সওয়াল করিল এবং নিজের অসহায় অবস্থা ও অভাবের কথা বলিল। তাহারা সেই দিনের রুটিও তাহাকে দিয়া দিলেন এবং নিজেরা পানি পান করিয়া তৃতীয় দিনের রোযা শুরু করিয়া দিলেন।

সকালে হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) পশমের বাকী অংশ দ্বারা সুতা বানাইলেন এবং এক ছা (সাড়ে তিন সের) যব যাহা অবশিষ্ট ছিল লইয়া উহা পিষিয়া রুটি পাকাইলেন। মাগরিবের নামাযের পর যখন খানা খাইতে বসিলেন, তখন একজন কয়েদী আসিয়া আওয়াজ দিল এবং তাহার ভীষণ অভাব ও পেরেশানীর কথা বলিল। তাহারা এই দিনের রুটিগুলিও তাহাকে দিয়া দিলেন এবং নিজেরা না খাইয়াই রহিলেন।

চতুর্থ দিন সকালে তাহাদের রোযা তো ছিল না ; কিন্তু খাওয়ারও কিছু ছিল না। হযরত আলী (রাযিঃ) দুই পুত্রকে লইয়া হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন। ক্ষুধা ও দুর্বলতার কারণে চলাও মুশকিল হইতেছিল। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাযিঃ)কে বলিলেন, তোমাদের কষ্ট ও অভাব দেখিয়া আমার খুবই কষ্ট হয়। চল ফাতেমার নিকট যাই। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ফাতেমা (রাযিঃ)এর নিকট তশরীফ আনিলেন। তখন তিনি নামায পড়িতেছিলেন। ভীষণ ক্ষুধার কারণে চোখ কোটরাগত হইয়া গিয়াছিল। পেট কোমরের সহিত লাগিয়া গিয়াছিল। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বুকে জড়াইয়া লইলেন আর আল্লাহ তায়ালার নিকট ফরিয়াদ করিলেন। তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) সূরা দাহরের এই আয়াত **وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ** লইয়া আসিলেন এবং সুসংবাদ ও মুবারকবাদ জানাইলেন। (মুসামারাত আউয়াল)

এই আয়াতগুলি প্রথম পরিচ্ছেদের ৩৬ নম্বর আয়াত প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে। আল্লামা সুয়ুতী (রহঃ) দুররে মানসূর কিতাবে ইবনে মারদুইয়ার সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে সংক্ষিপ্তভাবে এই বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই আয়াতগুলি হযরত আলী ও হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে।

(৪৪) একজন শরাবী লোক ছিল, যাহার নিকট সবসময় শরাবের আসর চলিত। একবার তাহার বন্ধু-বান্ধবদের মজলিস জমিল। শরাব প্রস্তুত ছিল। সে তাহার এক গোলামকে এই বলিয়া চারটি দিরহাম দিল যে, শরাব পান করিবার পূর্বে বন্ধুদেরকে খাওয়ানোর জন্য কিছু ফল খরিদ করিয়া লইয়া আস। গোলাম বাজারে চলিল। পথে হযরত মানসুর ইবনে আশ্মার বসরী (রহঃ)এর মজলিস পড়িল। তিনি কোন অভাবী লোকের জন্য মানুষের নিকট হইতে কিছু চাহিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন যে, যেই ব্যক্তি এই ফকিরকে চার দেহহাম দান করিবে আমি তাহার জন্য চারটি দোয়া করিব। সেই গোলাম ঐ চারটি দেহহামই ঐ ফকিরকে দিয়া দিল। হযরত মানসুর (রহঃ) বলিলেন, বল, তুমি কি দোয়া চাও? গোলাম বলিল, আমার একজন মনিব আছেন, তাহার নিকট হইতে আমি আজাদ হইতে চাই। হযরত মানসুর (রহঃ) দোয়া করিলেন। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, দ্বিতীয় দোয়া কি চাও? গোলাম বলিল, আমি যেন এই দিরহামগুলির বদলা পাইয়া যাই। মানসুর ইহার জন্যও দোয়া করিলেন। অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলেন, তৃতীয় দোয়া কি চাও? গোলাম বলিল, আল্লাহ তায়ালা যেন আমার মনিবকে তওবার তৌফীক দেন এবং তাহার তওবা কবুল করেন। মানসুর ইহার জন্যও দোয়া করিলেন। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, চতুর্থ দোয়া কি চাও? গোলাম বলিল, আল্লাহ তায়ালা যেন আমাকে, আমার মনিবকে, আপনাকে এবং এই মজলিসে যাহারা হাজির আছে সবাইকে মাফ করিয়া দেন। হযরত মানসুর ইহার জন্যও দোয়া করিলেন। অতঃপর গোলাম (শূন্যহাতে) মনিবের নিকট ফিরিয়া গেল (এবং মনে করিল বেশীর চেয়ে বেশী ইহাই তো হইবে যে, মনিব আমাকে মারিবেন, বেশী আর কি হইবে।)

মনিব তো অপেক্ষায় ছিলই। দেখিয়া বলিতে লাগিল, এত দেবী করিয়াছ? গোলাম ঘটনা শুনাইল। মনিব (তাহার দোয়ার বরকতে তাহার প্রতি গোন্দা হওয়া ও মারধর করার পরিবর্তে) জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি কি দোয়া করাইয়াছ? গোলাম বলিল, প্রথম তো এই যে, আমি যেন গোলামী হইতে আজাদ হইয়া যাই। মনিব বলিল, আমি তোমাকে আজাদ করিয়া দিলাম। জিজ্ঞাসা করিল, দ্বিতীয় দোয়া কি ছিল? গোলাম বলিল, আমি যেন ঐ দেহহামগুলির বদলা পাইয়া যাই। মনিব বলিল, আমি তোমাকে চার হাজার দেহহাম হাদিয়া দিলাম। জিজ্ঞাসা করিল, তৃতীয় দোয়া কি ছিল? গোলাম বলিল, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে (শরাব ইত্যাদি গুনাহ ও সীমালংঘন হইতে) যেন তওবার তৌফীক দেন। মনিব

বলিল, আমি (আমার সমস্ত গুনাহ হইতে) তওবা করিলাম। জিজ্ঞাসা করিল, চতুর্থ দোষা কি ছিল? গোলাম বলিল, আল্লাহ তায়ালা যেন আমাকে, আপনাকে, ঐ বুয়ুর্গকে এবং পুরা মজলিসকে মাফ করিয়া দেন। মনিব বলিল, ইহা আমার ক্ষমতার বাহিরে। অতঃপর রাত্রে মনিব স্বপ্নে দেখিল, কোন ব্যক্তি বলিতেছে, যখন তুমি ঐ তিনটি কাজ করিয়া দিয়াছ যাহা তোমার ক্ষমতায় ছিল, তবে কি তুমি ইহা মনে কর যে, আমি ঐ কাজটি করিব না; যাহা আমার ক্ষমতায় রহিয়াছে। আমি তোমাকে, গোলামকে, মনসূরকে এবং ঐ মজলিসের সকলকে ক্ষমা করিয়া দিলাম।

(এতহাফ)

(৪৫) আবদুল ওয়াহহাব ইবনে আবদুল হামীদ সাকাফী (রহঃ) বলেন, আমি একটি জানাযা দেখিলাম, যাহাকে তিনজন পুরুষ ও একজন মহিলা বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। জানাযার সহিত অন্য কোন লোক ছিল না। আমি তাহাদের সঙ্গী হইয়া গোলাম আর মহিলার দিকের অংশ আমি বহন করিলাম। জানাযা কবরস্থানে আনা হইল। সেখানে তাহার জানাযার নামায পড়িলাম। অতঃপর তাহাকে দাফন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কাহার জানাযা ছিল? মহিলাটি বলিল, সে আমার পুত্র। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার মহল্লায় আর কোন পুরুষ ছিল না, যে তোমার স্থলে জানাযার চতুর্থ পায়াটি ধরিত? সে বলিল, মানুষ তো অনেক ছিল কিন্তু তাহাকে নিকৃষ্ট মনে করিয়া কেহ সঙ্গে আসে নাই। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কি কারণে নিকৃষ্ট মনে করিত? মহিলা বলিল, সে খোঁজা ছিল (হিজড়া অথবা মহিলাদের মত কাজকর্ম করিত)। ইহা শুনিয়া মহিলাটির ওপর আমার দয়া হইল। আমি তাহাকে সঙ্গে করিয়া আমার ঘরে লইয়া গোলাম আর তাহাকে কিছু দেবহাম, কাপড় এবং গম দিলাম। আমি রাত্রে স্বপ্নে দেখিলাম, এক ব্যক্তি পূর্ণিমার চন্দ্রের মত উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট অত্যন্ত সাদা ও উৎকৃষ্ট পোশাক পরিয়া আমার নিকট আসিল এবং আমার শুকরিয়া আদায় করিতে লাগিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কে? বলিল, আমি সেই খোঁজা, যাহাকে তুমি আজ দাফন করিয়াছ। আমার উপর আল্লাহ তায়ালা এইজন্য রহমত করিয়াছেন যে, লোকেরা আমাকে নিকৃষ্ট মনে করিত। (এতহাফ)

(৪৬) মুহাম্মদ ইবনে সাহল বোখারী (রহঃ) বলেন, আমি মক্কা মুকাররমার রাস্তায় যাইতেছিলাম। দেখিলাম, একজন মরক্কোবাসী লোক একটি খচ্চরের উপর সওয়ার হইয়া যাইতেছে আর তাহার আগে আগে

এক ব্যক্তি এই ঘোষণা করিয়া যাইতেছে যে, (একটি থলি হারাইয়া গিয়াছে) যে ব্যক্তি থলির খোঁজ বলিয়া দিবে তাহাকে একশত স্বর্ণমুদ্রা আমি নিজের নিকট হইতে দিব। কারণ, ঐ থলিতে অনেকগুলি আমানত ছিল। (উহা বিশেষ ধরনের লম্বা থলি যাহাতে রৌপ্য ও স্বর্ণমুদ্রা রাখা হয় এবং কোমরে বাধিয়া রাখা হয়) এই ঘোষণা শুনিয়া পুরাতন ছেঁড়া কাপড় পরিহিত একজন খোঁড়া ব্যক্তি মরক্কোবাসী লোকটির নিকট আসিল এবং তাহার নিকট হারানো থলির আলামত জিজ্ঞাসা করিল যে, উহা কেমন ছিল। মরক্কোবাসী লোকটি উহার আলামত বলিল এবং বলিল যে, উহার মধ্যে অনেক মানুষের আমানত রহিয়াছে। খোঁড়া লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, এখানে এমন কোন লোক আছে, যে লেখাপড়া জানে? মুহাম্মদ ইবনে সাহল বলিলেন, আমি জানি। খোঁড়া লোকটি আমাদের তিনজনকে তাহার সঙ্গে করিয়া পৃথক এক দিকে লইয়া গেল এবং একটি থলি বাহির করিয়া দেখাইল। মরক্কোবাসী লোকটি উহার ভিতরের সমস্ত জিনিস সম্পর্কে বলিতে লাগিল যে, দুইটি জিনিস পাঁচশত স্বর্ণমুদ্রার বদলে অমুক মহিলার মেয়ে অমুকের রক্ষিত আছে এবং একটি জিনিস একশত স্বর্ণমুদ্রার বদলে অমুকের রক্ষিত আছে। এইভাবে এক একটি করিয়া আমানতের জিনিস সে গণনা করিতে থাকিল। আর আমি উহার ভিতর রক্ষিত জিনিসগুলিকে পড়িয়া বলিতে থাকিলাম যে, উহা এই, উহা এই। ঐ মরক্কোবাসী লোকটি থলির সমস্ত জিনিস বলিয়া দিল এবং সবগুলি জিনিস ঠিক ঠিকভাবে মিলিয়া গেল। যখন সবকিছু সঠিকভাবে মিলিয়া গেল, তখন সেই খোঁড়া লোকটি থলিটি মরক্কোবাসী লোকটির নিকট হস্তান্তর করিয়া দিল। সে নিজের ওয়াদা অনুযায়ী তাহার নিকট হইতে একশত দিনার বাহির করিয়া খোঁড়া লোকটিকে দিল। সে উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া বলিল, যদি এই থলিটির মূল্য আমার দৃষ্টিতে দুইটি গোবরের টুকরার সমানও হইত, তবে সম্ভবতঃ তুমি ইহাকে পাইতে না। এমন জিনিসের কি বিনিময় লইব, যাহার মূল্য আমার নিকট দুইটি গোবরের টুকরার সমানও নয়। ইহা বলিয়া খোঁড়া লোকটি চলিয়া গেল এবং এই একশত স্বর্ণমুদ্রার দিকে চোখ উঠাইয়াও দেখিল না। (এতহাফ)

(৪৭) বুখারা এলাকার এক শাসনকর্তা অত্যধিক জালেম লোক ছিল। একদিন সে নিজের সওয়ারীতে আরোহণ করিয়া কোথাও যাইতেছিল। পথে একটি কুকুরের উপর দৃষ্টি পড়িল, যাহার শরীরে পাঁচড়া হইয়াছিল। শীতের কারণে আরও বেশী কষ্ট পাইতেছিল। জালেম লোকটির দৃষ্টি উহার

উপর পড়িতেই তাহার চোখে অশ্রু ভরিয়া আসিল। এক চাকরকে বলিল, কুকুরটিকে আমার ঘরে লইয়া যাও। ফিরিয়া আসা পর্যন্ত উহার প্রতি খেয়াল রাখিও। এই বলিয়া সে তাহার কাজে যেখানে বাইতেছিল চলিয়া গেল। যখন ফিরিয়া আসিল, তখন ঐ কুকুরটিকে আনিতে বলিল এবং ঘরের এক কোণে উহাকে বাঁধিয়া রাখিল। উহার সম্মুখে রুটির টুকরা রাখিল। পানি রাখিল। আর উহার শরীরে তৈল মালিশ করাইয়া একটি কাপড়ের খুল উহার উপর দেওয়াইল। নিকটে আগুন রাখিল, যাহাতে উহার তাপে কুকুরের উপর হইতে ঠাণ্ডার প্রভাব দূর হইয়া যায়। এই ঘটনার মাত্র দুইদিন পরই ঐ জালেমের ইন্তেকাল হইয়া গেল। এক বুযুর্গ ব্যক্তি যিনি তাহার যাবতীয় জুলুম ও তাহার অবস্থা সম্পর্কে খুব ভালভাবে জানিতেন, তাহাকে স্বপ্নে দেখিলেন। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার অবস্থা কি? সে বলিল, আল্লাহ তায়ালা আমাকে তাহার সম্মুখে দাঁড় করাইলেন এবং বলিলেন, তুই কুকুর ছিলি, (অর্থাৎ কুকুরের মত কাজ করিতি, মানুষের মত কাজ করিতি না;) এইজন্য আমিও একটি কুকুরই তোকে দিয়া দিলাম (অর্থাৎ ঐ পাঁচড়া রোগাক্রান্ত কুকুরের ওসীলায় তোকে মাফ করিয়া দিলাম)। আর আমার জিম্মায় অন্যদের যে সমস্ত হক পাওনা ছিল আল্লাহ তায়ালা নিজেই উহা আদায় করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন। (মুসামারাত)

আল্লাহ তায়ালা মহান সত্তা বড় দয়ালু, তিনি সমস্ত দয়ালুদের মালিক, বাদশাহ। তাহার দয়া পর্যন্ত কেহ পৌঁছিতে পারে না। কোন ব্যক্তির কোন মামুলি বিষয়ও যদি তাহার পছন্দ হইয়া যায়, তবে সে তাহার মঞ্জিলে পৌঁছিয়া যায়। এইজন্য উচিত—মানুষ যেন তাহার সন্তুষ্টির তালাশে থাকে। জানা নাই, কাহার কোন কাজ আল্লাহ তায়ালা পছন্দ হইয়া যায়।

(৪৮) আবু ওমর দেমশকী (রহঃ) বলেন, আমরা কয়েকজন লোক হযরত আবু আবদুল্লাহ ইবনে জালা (রহঃ)এর সঙ্গে মক্কা মুকাররমায় যাইতেছিলাম। কয়েক দিন এইভাবে অতিবাহিত হইয়া গেল যে, আমরা খাওয়ার কোন জিনিসই পাইলাম না। ময়দানের মধ্যে একজন মহিলার সহিত দেখা হইল। তাহার একটি বকরি ছিল। আমরা (মনে করিলাম যে, উহাকে খরিদ করিয়া পাকাইব, কাজেই) মহিলাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহার মূল্য কত? সে বলিল, পঞ্চাশ দেবহাম। আমরা বলিলাম, আমাদের উপর দয়া কর, কিছু কম কর। সে বলিল, ইহার মূল্য পাঁচ দেবহাম।

আমরা বলিলাম, ঠাট্টা করিও না, ঠিক ঠিক মূল্য বলিয়া দাও। এইমাত্র পঞ্চাশ দেবহাম বলিতেছিলে আবার পাঁচ দেবহাম বলিতেছ? মেয়েলোকটি বলিল, আল্লাহর কসম, ঠাট্টা করিতেছি না। তোমরা বলিয়াছ, দয়া করিবার জন্য, আফসোস, যদি আমার সামর্থ্য থাকিত, তবে আমি উহার কোন মূল্যই লইতাম না (কিন্তু আমিও নিরুপায়। এইজন্য নিরুপায় হইয়াই পাঁচ দেবহাম বলিয়া দিয়াছি)।

হযরত ইবনে জালা (রহঃ) সঙ্গীদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের সকলের সহিত কত দেবহাম আছে? সব মিলাইয়া মোট ছয়শত দেবহাম হইল। ইবনে জালা (রহঃ) বলিলেন, সবগুলি তাহাকে দিয়া দাও এবং বকরীটিও তাহার নিকটেই থাকিতে দাও। আমরা সব দেবহাম তাহাকে দিয়া দিলাম। অতঃপর আমাদের সফর আল্লাহর ফ্যালে এমন আরামে কাটিয়াছে যাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ (মুসামারাত)

(৪৯) হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহঃ) একবার জনৈক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি আল্লাহর ওলী হইতে চাও? সে বলিল, অবশ্যই চাই। তিনি বলিলেন, দুনিয়া ও আখেরাতের কোন জিনিসের বাহেশ করিও না। তুমি নিজেকে শুধু আল্লাহ তায়ালায় জন্য খাস করিয়া লও। আর তুমি একাগ্রচিত্তে তাহার দিকে রুজু হইয়া যাও। যাহাতে তিনি পরিপূর্ণভাবে তোমার প্রতি মনোযোগী হইয়া যান এবং তোমাকে নিজের ওলী বানাইয়া লন। (রওজ)

হযুর সাপ্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে সহীহ হাদীসসমূহে আল্লাহ তায়ালায় এই এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি আমার দিকে হাঁটিয়া আসে, আমি তাহার দিকে দৌড়াইয়া যাই। আর যে আমার দিকে এক বিষৎ অগ্রসর হয়, আমি তাহার দিকে দুই হাত অগ্রসর হই।

(৫০) হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ)এর খেদমতে এক ব্যক্তি পাঁচশত দেবহাম পেশ করিল এবং আরজ করিল, ইহা আপনার খাদেমদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নিকট ইহা ছাড়া আরও কিছু আছে কি? সে আরজ করিল, হযুর! আমার নিকট অনেক দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি চাও যে, উহা আরও বেশী হউক, না চাও না। সে আরজ করিল, এই বাহেশ তো অবশ্যই আছে। তিনি বলিলেন, তবে তো তুমি আমাদের চাইতে বেশী

অভাবী। (কেননা, আমাদের নিকট যাহা কিছু আছে, আমরা উহার বৃদ্ধি চাই না।) কাজেই এইগুলি তুমি নিজের কাছেই রাখ। এই বলিয়া দেবহামগুলি ফেরত দিয়া দিলেন ; কবুল করিলেন না। (রওজ)

(৫১) হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) একবার (শাগরেদদের সহিত) বসিয়াছিলেন। তাহার স্ত্রী আসিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, আপনি তো ইহাদেরকে লইয়া বসিয়া আছেন আর ঘরে সামান্য আটাও নাই। তিনি বলিলেন, হে আল্লাহর বান্দী! আমাদের সম্মুখে একটি অত্যন্ত কঠিন ও দুর্গম হাঁটি আসিতেছে। উহা হইতে কেবল ঐ সমস্ত লোকই নাজাত পাইবে, যাহারা খুব হালকা পাতলা হইবে। স্ত্রী এই কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট ও খুশী মনে ফিরিয়া গেলেন।

একবার তিনি বলিলেন, দুনিয়াদার লোকেরাও খায়, আর আমরাও খাই। তাহারাও কাপড় পরিধান করে, আর আমরাও পরিধান করি। তাহাদের নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে সম্পদ আছে, তাহারা উহাকে কাজে লাগায় না, শুধু দেখে যে, হাঁ এই সম্পদ রহিয়াছে। আর আমরাও সম্পদ দেখিয়া থাকি (যাহা অন্যদের নিকট থাকে। অতএব, দেখার মধ্যে তো আমরা এবং তাহারা এক বরাবর, তাহারাও কাজে লাগায় না, আমরাও কাজে লাগাই না)। কিন্তু তাহাদের সম্পদের হিসাব দিতে হইবে আর আমরা হিসাব হইতে মুক্ত। কেননা, আমাদের কাছে সম্পদ নাই।

একবার বলিলেন, আমাদের ভাইয়েরা আমাদের সহিত ইনসাফের ব্যবহার করে না, আমাদেরকে আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বত তো করে ; কিন্তু দুনিয়াতে আমাদের নিকট হইতে পৃথক পৃথক চলে। অতি শীঘ্র ঐ দিন আসিবে, যখন তাহারা তো এই আকাঙ্ক্ষা করিবে যে, হায়! তাহারা যদি আমাদের মত হইত, কিন্তু আমরা এই আকাঙ্ক্ষা করিব না যে, আমরা যদি তাহাদের মত হইতাম। (রওজ)

(৫২) এক বুযুর্গের খেদমতে জনৈক ব্যক্তি হাজির হইল এবং আরজ করিল, আমার জন্য দোয়া করিয়া দিন। আমাকে আমার পরিবার-পরিজনের অধিক সংখ্যা (তৎসহ আমদানীর স্বল্পতা) অত্যন্ত নিরুপায় করিয়া রাখিয়াছে। তিনি বলিলেন, যখন তোমার পরিবারের লোকেরা তোমাকে বলে যে, আমাদের নিকট না আটা আছে, না রুটি আছে, সেই সময় তোমার দোয়া আল্লাহ তায়ালায় নিকট আমার এই সময়ের দোয়া হইতে বেশী কবুল হওয়ার যোগ্য হইবে। (রওজ)

হযরত শায়েখ (রহঃ) অত্যন্ত সঠিক বলিয়াছেন যে, মানুষের মধ্যে মনিবের নিকট চাহিবার কদর নাই। ইহার গুরুত্বও মানুষের অন্তরে নাই, বস্তুতঃ ঐ মহান দয়ালুর নিকট ছটফট করিয়া চাহিবার বড় কদর রহিয়াছে। অসহায় ব্যক্তির দোয়া বিশেষভাবে কবুল হইয়া থাকে। আল্লাহ তায়ালার এরশাদ হইতেছে : **أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاُ الْإِلَٰهَ** অর্থাৎ, ঐ মহান সত্তা যিনি অসহায় মানুষের ডাক শোনে যখন সে তাহাকে ডাকে, অতঃপর তাহার মুসীবত দূর করিয়া দেন। (তিনি কি এমন সত্তা যাহার সহিত কাহাকেও শরীক করা যায়।) (নামলঃ ৬২)

এক হাদীসে আছে, এক ব্যক্তি ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কাহার দিকে লোকদেরকে ডাকেন। ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ঐ এক আল্লাহর দিকে, যিনি তোমার উপর কোন মুসীবত আসিবার পর তাহাকে ডাকিলে তিনি তোমার মুসীবত দূর করিয়া দেন। ঐ এক আল্লাহর দিকে, যদি তুমি কোথাও পথে তোমার সওয়ারী হারাইয়া ফেল, অতঃপর তাহাকে ডাক, তখন তিনি তোমার সওয়ারী তোমার নিকট ফিরাইয়া দেন। আর যদি তোমার অভাব দেখা দেয় অতঃপর তুমি তাহাকে ডাক, তবে তিনি তোমাকে রুজি দান করেন।

সুহায়েম (রহঃ) বলেন, আমরা হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ)এর নিকট বসিয়াছিলাম। একটি মেয়ে আসিল এবং সে তাহার মনিবকে বলিল, আপনি এখানে বসিয়া রহিয়াছেন অথচ বদনজর আপনার ঘোড়াটিকে শেষ করিয়া দিল, উহা অস্থিরভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কোন ঝাড়ফুককারী লোককে তালাশ করিয়া আনুন। হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলিলেন, কোন ঝাড়ফুককারীর প্রয়োজন নাই। উহার নাকের ডান ছিদ্রে চারবার এবং বাম ছিদ্রে তিনবার এই দোয়া পড়িয়া ফুক দাও : **لَا بَأْسَ أَذْهَبَ الْبَأْسَ رَبُّ النَّاسِ أَشْفَى أَنْتَ الشَّافِي لَا يَكْشِفُ الضُّرَّ إِلَّا أَنْتَ** (অর্থাৎ, কোন ভয়ের কারণ নাই, হে মানুষের প্রতিপালক! আপনি উহার কষ্টকে দূর করিয়া দিন, এবং উহাকে সুস্থ করিয়া দিন, আপনিই সুস্থতা দানকারী, আপনি ছাড়া কেহ কষ্ট দূর করিতে পারে না।)

সেই লোকটি গেল এবং কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আমি আপনার কথা অনুযায়ী আমল করিয়াছি, ঘোড়াটি একেবারেই সুস্থ হইয়া গিয়াছে। সে খাইতেও আরম্ভ করিয়াছে, পেশাব-পায়খানাও করিয়াছে। (দুররে মানসুর)

এই কথা খুব ভাল করিয়া দিলের মধ্যে জমাইয়া লওয়া উচিত এবং

যত বেশী দিলের মধ্যে ইহা পাকাপোক্তা হইবে, ততই ইহা দীন ও দুনিয়ার ব্যাপারে কাজে আসিবে যে, লাভ ও লোকসান একমাত্র ঐ মহান পবিত্র সত্তার হাতে, যাহার কোন শরীক নাই। তাহারই নিকট নিজের প্রয়োজন তলব করা উচিত, তাহারই দিকে সকল মুসীবতে রুজু করা উচিত, সমস্ত দুনিয়ার অন্তর তাহারই অধীনে।

(৫৩) হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহঃ) এর খেদমতে এক ব্যক্তি দশ হাজার দেবহাম হাদিয়া পেশ করিল। তিনি উহা কবুল করিতে অস্বীকার করিলেন এবং বলিলেন, তুমি কি ইহা চাও যে, দশ হাজার দেবহামের কারণে আমার নাম ফকীরদের খাতা হইতে কাটিয়া যাক? আল্লাহর কসম! আমি ইহা কখনও সহ্য করিব না।

তিনি আরও এরশাদ করিয়াছেন, দুনিয়াদার লোক দুনিয়াতে আরাম তালাশ করে; এইজন্য ধোকায পড়িয়া যায়। (দুনিয়াতে আরাম কোথায় পাইবে?) যদি ঐ সমস্ত লোকেরা জানিত যে, বাদশাহী আমাদের নিকট রহিয়াছে, তবে তাহারা তরবারী দ্বারা আমাদের সহিত যুদ্ধ করিত।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) কে কেহ জিজ্ঞাসা করিল, মানুষ কাহার? তিনি বলিলেন, আলেমগণ। সেই লোক জিজ্ঞাসা করিল, বাদশাহ কাহার? তিনি বলিলেন, যাহেদগণ (অর্থাৎ দুনিয়ার প্রতি যাহাদের আসক্তি নাই)। সে জিজ্ঞাসা করিল, বেওকুফ আহমক কাহার? তিনি বলিলেন, যাহারা দীন দ্বারা দুনিয়া কামাই করে।

হযরত যুন্নুন মিসরী (রহঃ) বলেন, যাহেদগণ আখেরাতের বাদশাহ। আর তাহারাই আল্লাহর মর্যাদাত লাভকারী ফকীর।

হযরত শায়েখ আবু মাদিয়ান (রহঃ) বলেন, বাদশাহী দুই প্রকার। এক, শহরের বাদশাহী, দ্বিতীয়, দিলের বাদশাহী। যাহেদগণই প্রকৃত বাদশাহ। (তাহারা দিলের বাদশাহ।)

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এবং অনেকের মতে—যদি কোন ব্যক্তি এই ওসীয়াত করিয়া মারা যায় যে, আমার সম্পদ হইতে এই পরিমাণ এমন লোকদেরকে যেন দেওয়া হয় যাহারা সবচেয়ে বেশী বুদ্ধিমান, তবে ওসীয়াতের সেই সম্পদ যাহেদগণকে দিতে হইবে। (কারণ, প্রকৃত জ্ঞানী তাহারাই।) (রওজ)

(৫৪) বিখ্যাত আরিফ ইমামে কবীর শায়েখ আবু আবদুল্লাহ হারেস ইবনে আসাদ মুহাসেবী (রহঃ) একবার দুনিয়ার প্রতি আসক্ত আলেমদের

সম্পর্কে আলোচনা করিতে যাইয়া বলিলেন, তাহারা এই ধারণা করে যে, সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)দের নিকটও তো অনেক মাল ছিল। এই বেওকুফরা সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)দের আলোচনা এইজন্য করে যে, লোকেরা যাহাতে সম্পদ জমা করার ব্যাপারে তাহাদের অজুহাতকে সঠিক মনে করে। শয়তান তাহাদের সহিত প্রতারণা করে; অথচ তাহারা কিছুই বুঝিতে পারে না। আরে আহমক! তোর নাশ হউক। তোর জন্য আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাযিঃ)এর সম্পদ দ্বারা দলীল পেশ করা শয়তানের একটি ধোকা। শয়তান তোর জ্বান হইতে এই সমস্ত বাক্য বাহির করে; যাহাতে তুই ধ্বংস ও বরবাদ হইয়া যাস। যখন তুই বলিলি যে, সাহাবায়ে কেরামও সম্মান ও জাঁকজমকের জন্য মাল জমা করিয়াছেন, তখন তুই এই সকল মহান ব্যক্তিদের গীবত করিলি এবং তুই তাহাদের সম্পর্কে অত্যন্ত কঠিন কথা বলিলি। আর যখন তুই মনে করিলি যে, হালাল পন্থায় সম্পদ জমা করা উহা পরিত্যাগ করা হইতে উত্তম, তখন তুই হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে বেয়াদবী করিলি, তুই সমস্ত নবীগণের শানে বেয়াদবী করিলি এবং তুই নাউযুবিল্লাহ তাহাদিগকে অজ্ঞ বলিলি। কেননা, তাহারা তোর মত সম্পদ জমা করেন নাই। আর যখন তুই এই ধারণা করিলি যে, হালাল পন্থায় সম্পদ জমা করা উহা পরিত্যাগ করা হইতে উত্তম, তখন তুই এই দাবী করিয়া ফেলিলি যে, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের সহিত কল্যাণ কামনা করেন নাই। কেননা, তিনি মাল জমা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আসমানের প্রতিপালকের কসম! তুই তোর এই দাবী দ্বারা হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর মিথ্যা আরোপ করিলি। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার উম্মতের অবস্থার উপর অত্যন্ত দয়ালু ও তাঁহাদের কল্যাণকামী ছিলেন। তাঁহাদের উপর বড় মেহেরবান ও অত্যন্ত দয়াবান ছিলেন।

আরে আহমক! হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাযিঃ) তাহার জ্ঞান ও গুণের পরিপূর্ণতা, তাহার তাকওয়া-পরহেজগারী, তাহার দান ও দয়ালীলতা, আল্লাহ তায়ালায় রাস্তায় তাহার সম্পদ খরচ করা, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী হওয়া এবং ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও যাহাদিগকে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াতেই জাহ্নাতবাসী হওয়ার সুসংবাদ দান করিয়াছিলেন (যাহারা আশারায়ে মুবাশশারা নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন), এই সমস্ত গুণের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও শুধু তাহার সম্পদের কারণে কিয়ামতের ময়দানে আটকা

রহিলেন এবং গরীর মুহাজিরগণের সঙ্গে জ্ঞানতে যাইতে পারেন নাই।
এমতাবস্থায় আমাদের মত লোকদের সম্পর্কে তোর কি ধারণা, যাহারা
দুনিয়ার ধাক্কায় ডুবিয়া রহিয়াছে? আশ্চর্য এবং খুবই আশ্চর্য তাহাদের
প্রতি, যাহারা দুনিয়ার ফেতনায় পড়িয়া রহিয়াছে, যাহারা হারাম ও
সন্দেহযুক্ত মালের গোলমালে জড়াইয়া রহিয়াছে এবং লোকদের ময়লা
(সদকা ইত্যাদির মাল) খায়, ফাহেশাত, জাঁকজমক ও পরস্পর দস্ত
অহমিকার মধ্যে সময় অতিবাহিত করে। আবার তাহারা হযরত আবদুর
রহমান ইবনে আউফ (রাযিঃ)এর অবস্থার দ্বারা দলীল পেশ করে।

অতঃপর আল্লামা মুহাসেবী (রহঃ) সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)এর উন্নত
অবস্থা বর্ণনা করিয়া বলেন, তাহারা গরীবী অবস্থাকে পছন্দ করিতেন।
দরিদ্রতাকে ভয় করিতেন না, নিজেদের রুজির ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার
উপর পূর্ণ ভরসা রাখিতেন। তকদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকিতেন। মুসীবতের
উপর রাজী থাকিতেন। সচ্ছল অবস্থা হইলে শোকর করিতেন। দরিদ্রতা
আসিলে ছবর করিতেন। ভাল অবস্থা হইলে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা
করিতেন। বিনয়ী ছিলেন, নিজেদের উপর অন্যদেরকে অগ্রাধিকার
দিতেন। যখন তাহাদের নিকট দরিদ্রতা আসিত, তখন উহাকে মারহাবা
(আসিয়াছ, খুব ভাল করিয়াছ) বলিতেন। উহাকে নেক লোকদের বিশেষ
আলামত বলিতেন। তুই আল্লাহর কসম করিয়া বল, তোর অবস্থা কি
এইরূপ? তুই তাহাদের সামঞ্জস্য হইতে অনেক দূরে। তোর অবস্থা
তাহাদের অবস্থার একেবারে বিপরীত। সচ্ছলতার সময় তুই অবাধ্য হইয়া
যাস। প্রাচুর্যের সময় অহংকার করিতে থাকিস। সম্পদ আসিলে আনন্দে
এইরূপ আত্মহারা হইয়া যাস যে, আল্লাহর নিয়ামতের শোকর আদায়
করিতেও ভুলিয়া যাস। দুঃখ-কষ্টের সময় আল্লাহ তায়ালার সাহায্য হইতে
নিরাশ হইয়া যাস। মুসীবতের সময় অধৈর্য হইয়া যাস। তকদীরের উপর
সামান্যতমও সন্তুষ্ট থাকিস না, তুই গরীবদের প্রতি বিদ্বেষ রাখিস।
দরিদ্রতাকে ঘৃণা করিস। তুই সম্পদ এইজন্য জমা করিস ; যাহাতে
দুনিয়ার সুখ ভোগ করিতে পারিস। উহার চাকচিক্য দ্বারা মন ভুলাইতে
পারিস। উহার স্বাদ ও ফাহেশ দ্বারা তৃপ্তি লাভ করিতে পারিস। তাহারা
দুনিয়ার হালাল বস্তু হইতে যত দূরে থাকিতেন তুই হারাম বস্তু হইতেও
তত দূরে থাকিস না। তাহারা সাধারণ ভুল-ত্রুটিকেও যত মারাত্মক মনে
করিতেন, তুই হারাম ও কবিরী গুনাহকেও তত মারাত্মক মনে করিস না।
হায়! তোর উত্তম হইতে উত্তম এবং হালাল হইতে হালাল সম্পদও যদি
তাহাদের সন্দেহযুক্ত সম্পদের সমান হইতে পারিত! আফসোস! তুই

নিজের গুনাহসমূহ হইতে যদি এমন ভয় করিতি যেমন তাহারা নিজেদের নেক আমলসমূহ কবুল না হওয়ার ব্যাপারে ভয় করিতেন। হায়! তোর রোযা যদি তাহাদের ইফতারের সমতুল্য হইত (কেননা, তাহাদের ইফতার করাও আল্লাহ তায়ালার জন্য ছিল, যাহাতে সওয়াব ছিল)। হায়! তোর রাত্রি জাগরণও যদি তাহাদের নিদ্রার সমতুল্য হইত! আফসোস! তোর সারা জীবনের নেক আমলসমূহ যদি তাহাদের কোন একটি নেকীর সমান হইত! ওহে কমবখত! তোর জন্য ইহাই ভাল ছিল যে, তুই দুনিয়া হইতে কেবল ততটুকু হাসিল করিতি, যতটুকু মুসাফিরের সম্বল হয়। হায়! তুই যদি দুনিয়াদারদের অবস্থা হইতে শিক্ষা হাসিল করিতি! কেননা, তাহারা হাশর ময়দানে হিসাবের মধ্যে গ্রেফতার হইয়া থাকিবে আর তুই প্রথম কাফেলার মধ্যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত জাহাজে চলিয়া যাইতি, না হাশর ময়দানে তোকে বাধা দেওয়া হইত, আর না তোর হিসাব নিকাশ দীর্ঘ করা হইত। কেননা, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার উম্মতের গরীবগণ আমার উম্মতের ধনীদের হইতে পাঁচশত বৎসর পূর্বে জাহাজে চলিয়া যাইবে।

(রওজ)

(৫৫) হযরত আবদুল ওয়াহেদ ইবনে যায়েদ (রহঃ) (যিনি চিশতিয়া তরীকার মাশায়েখগণের মধ্যে বিখ্যাত বুয়ুর্গ ছিলেন) বলেন, আমরা একবার নৌকায় চড়িয়া যাইতেছিলাম। ঘূর্ণি বাতাস আমাদের নৌকাকে এক দীপে পৌছাইয়া দিল। আমরা সেখানে একজন লোককে দেখিলাম, সে একটি মূর্তির পূজা করিতেছে। আমরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কাহার পূজা কর? সে ঐ মূর্তির দিকে ইশারা করিল। আমরা বলিলাম, তোমার মাবুদ স্বয়ং তোমার হাতের বানানো আর আমাদের মাবুদ এইরূপ জিনিস সৃষ্টি করেন। নিজের হাতের বানানো জিনিস পূজার উপযুক্ত নয়। সে বলিল, তোমরা কাহার পূজা কর? আমরা বলিলাম, ঐ পবিত্র সত্তার, যাহার আরশ আসমানের উপর, যাহার ক্ষমতা জমিনের উপর, যাহার শ্রেষ্ঠত্ব ও বড়ত্ব সবকিছুর উর্ধ্বে। সে বলিল, তোমরা ঐ পবিত্র সত্তা সম্পর্কে কিভাবে জানিতে পারিলে? আমরা বলিলাম, তিনি একজন রাসূল (দূত) আমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন। তিনি অত্যন্ত দয়ালু ও ভদ্র ছিলেন। তিনি আমাদের কাছে এইসব কথা বলিয়াছেন। সে বলিল, তিনি কোথায়? আমরা বলিলাম, তিনি যখন পয়গাম পৌছাইয়া দিয়াছেন এবং নিজের দায়িত্ব পূরা করিয়াছেন, তখন সেই মালিক তাহাকে নিজের নিকট ডাকিয়া লইয়া গিয়াছেন। যাহাতে তাহাকে পয়গাম পৌছাইবার এবং

উত্তমরূপে উহা আদায় করিবার বিনিময় ও পুরস্কার দান করেন। সে বলিল, সেই রাসূল কি তোমাদের নিকট কোন আলামত রাখিয়া গিয়াছেন? আমরা বলিলাম, ঐ মালিকের পবিত্র কালাম আমাদের নিকট রাখিয়া গিয়াছেন। সে বলিল, আমাকে সেই কিতাব দেখাও। আমরা কুরআন পাক আনিয়া তাহার সম্মুখে রাখিলাম। সে বলিল, আমি তো পড়িতে জানি না। তোমরা আমাকে ইহা হইতে কিছু শোনাও। আমরা একটি সূরা শুনাইলাম। সে শুনিতেছিল আর কাঁদিতেছিল। এইভাবে সূরা শেষ হইয়া গেল। সে বলিল, এই পবিত্র কালামের মালিকের হুকুম হইল, তাহার অবাধ্যতা না করা। অতঃপর সে মুসলমান হইয়া গেল। আমরা তাহাকে ইসলামের আরকান ও আহকাম বলিয়া দিলাম এবং কুরআন শরীফের কয়েকটি সূরা শিখাইলাম।

যখন রাত্র হইল, এশার নামায পড়িয়া আমরা শুইতে লাগিলাম। তখন সে জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের মাবুদও কি রাতে নিদ্রা যান? আমরা বলিলাম, তিনি চিরন্তন ও চিরঞ্জীব, তিনি নিদ্রাও যান না, তাহার তন্দ্রাও আসে না। (আয়াতুল কুরসী) সে বলিতে লাগিল, তোমরা কিরূপ অযোগ্য বান্দা যে, তোমাদের মাওলা তো জাগ্রত থাকেন আর তোমরা ঘুমাইয়া যাও। তাহার কথা শুনিয়া আমাদের বড় আশ্চর্য বোধ হইল। যখন আমরা ঐ দ্বীপ হইতে ফিরিয়া আসিতে লাগিলাম তখন সে বলিল, আমাকেও তোমাদের সঙ্গে লইয়া চল, যাহাতে আমি দ্বীনের কথা শিখিতে পারি। আমরা তাহাকে আমাদের সঙ্গে লইয়া লইলাম। যখন আমরা আবাদান শহরে পৌঁছিলাম, তখন আমি আমার সঙ্গীদেরকে বলিলাম, এই ব্যক্তি নওমুসলিম, তাহার জন্য কিছু জীবিকার চিন্তাও করা চাই। আমরা কিছু দেহহাম চাঁদা তুলিলাম। যখন তাহাকে দিতে লাগিলাম, তখন সে জিজ্ঞাসা করিল, ইহা কি? আমরা বলিলাম, কিছু দেহহাম। ইহা তুমি নিজের প্রয়োজনে খরচ করিও। সে বলিতে লাগিল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তোমরা আমাকে এমন রাস্তা দেখাইয়াছ যাহার উপর স্বয়ং তোমরাই চল না, আমি এক দ্বীপে ছিলাম, একটি মূর্তির পূজা করিতাম, আল্লাহ পাকের পূজাও করিতাম না। তিনি আমাকে ঐ অবস্থায়ও ধ্বংস করেন নাই, অথচ আমি তাহাকে একেবারেই জানিতাম না। অতএব, তিনি এখন আমাকে কিভাবে ধ্বংস করিবেন যখন আমি তাহাকে চিনি (তাহার ইবাদতও করি)।

তিন দিন পরে আমরা জানিতে পারিলাম যে, তাহার শেষ সময়। মৃত্যু নিকটবর্তী। আমরা তাহার নিকট গেলাম, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,

তোমার কোন প্রয়োজন থাকিলে বল। সে বলিতে লাগিল, আমার সমস্ত প্রয়োজন ঐ মহান সত্তা পূরা করিয়া দিয়াছেন, যিনি তোমাদিগকে (আমার হেদায়েতের জন্য) দ্বীপে পাঠাইয়াছিলেন।

শায়েখ আবদুল ওয়াহেদ (রহঃ) বলেন, হঠাৎ আমার ঘুম আসিয়া গেল, আমি সেখানেই ঘুমাইয়া পড়িলাম। স্বপ্নে দেখিলাম, একটি অত্যন্ত সবুজ শ্যামল বাগান, সেখানে একটি অত্যন্ত উন্নত গম্বুজ বানানো রহিয়াছে। উহাতে একটি সিংহাসন রাখা আছে, উহার উপর অনিন্দ্য সুন্দরী একটি মেয়ে বসিয়া আছে, যাহার মত সুন্দরী কেহ কোন দিন দেখে নাই। সে বলিতেছে, আল্লাহর ওয়াস্তে তাহাকে জলদি পাঠাইয়া দাও। তাহার আগ্রহে আমার অস্থিরতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমার যখন চোখ খুলিল, তখন সেই নওমুসলিমের রূহ বাহির হইয়া গিয়াছিল। আমরা তাহার কাফন ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়া তাহাকে দাফন করিয়া দিলাম। যখন রাত্র হইল, তখন আমি (স্বপ্নে) সেই বাগানে গম্বুজের ভিতর সিংহাসনের উপর ঐ মেয়েটিকে তাহার নিকট দেখিলাম আর সেই লোকটি এই আয়াত পড়িতেছিল **وَالْمَلَكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ** ২৬। অর্থাৎ, এবং ফেরেশতাগণ তাহাদের নিকট প্রত্যেক দরজা দিয়া আসিতে থাকিবে আর তাহাদিগকে সালাম করিতে থাকিবে। (যাহা সর্বপ্রকার আপদ-বিপদ হইতে নিরাপদে থাকার সুসংবাদ স্বরূপ, আর ইহা) এই জন্য যে, তোমরা ছবর করিয়াছিলে (এবং দ্বীনের উপর মজবুতভাবে জমিয়াছিলে)। অতএব, এই জগতে তোমাদের পরিণাম খুবই উত্তম (রাদঃ ২৩-২৪)। (রওজ)

ইহা আল্লাহ তায়ালার দান ও বখশিশের নিদর্শন যে, লোকটি সারাজীবন মূর্তিপূজা করিল আর আল্লাহ তায়ালা আপন দয়া ও মেহেরবানীতে মৃত্যুর নিকটবর্তী সময়ে ঐ লোকগুলিকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও নৌকা নিয়ন্ত্রণহারা হইয়া যাওয়ার কারণে তাহার নিকট পাঠাইলেন এবং তাহাকে আখেরাতের দৌলতের দ্বারা ভাগ্যবান করিলেন। **اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ** হে রাজত্বের মালিক! যাহাকে তুমি দিতে চাও, কেহ উহাতে বাধা দিতে পারে না। আর যাহাকে তুমি দিতে না চাও, তাহাকে কেহ দিতে পারে না।

(৫৬) হযরত মালেক ইবনে দীনার (রহঃ) একবার বসরার গলি দিয়া যাইতেছিলেন। পথে এক বাঁদী চাকর-নওকর লইয়া এমন জাঁকজমকের সহিত যাইতেছিল যেমন বাদশাহদের বাঁদী হইয়া থাকে। হযরত মালেক

(রহঃ) তাহাকে দেখিয়া ডাকিয়া বলিলেন, হে বাঁদী! তোমাকে তোমার মালিক কি বিক্রয় করিবে? বাঁদী এই কথা শুনিয়া (অবাক হইয়া গেল) বলিতে লাগিল, কি বলিলে, আবার বল। তিনি আবার বলিলেন। সে বলিল, যদি তিনি বিক্রয় করেনও; তবে কি তোমার মত ফকীর খরিদ করিতে পারিবে? তিনি বলিলেন, হাঁ তোমার চাইতে উত্তমকে খরিদ করিতে পারিবে। বাঁদী ইহা শুনিয়া হাসিয়া উঠিল এবং খাদেমদেরকে হুকুম করিল, এই ফকীরকে ধরিয়া আমাদের সহিত লইয়া চল (অন্ততঃ কিছুটা হাসি-তামাশা করা যাইবে)। খাদেমরা ধরিয়া সঙ্গে লইয়া লইল।

বাঁদী যখন ঘরে ফিরিল, তখন সে তাহার মনিবকে উক্ত ঘটনা শুনাইল। সেও শুনিয়া অনেক হাসিল এবং তাহাকে তাহার সম্মুখে আনিবার হুকুম দিল। যখন তাহাকে সম্মুখে আনা হইল, তখন মনিবের অন্তরকে এক প্রকার ভয় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সে বলিল, আপনি কি চান? তিনি বলিলেন, তুমি তোমার বাঁদীটি আমার নিকট বিক্রয় করিয়া দাও। সে বলিল, আপনি কি উহার মূল্য দিতে পারিবেন? হযরত মালেক (রহঃ) বলিলেন, আমার নিকট তাহার মূল্য খেজুরের ছুড়িয়া ফেলিয়া দেওয়া দুইটি দানা সমতুল্য। ইহা শুনিয়া সকলেই হাসিতে লাগিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি এই মূল্য কিসের ভিত্তিতে সাব্যস্ত করিয়াছ? তিনি বলিলেন, তাহার মধ্যে অনেক দোষ আছে। সে জিজ্ঞাসা করিল, তাহার মধ্যে কি কি দোষ আছে?

তিনি বলিতে লাগিলেন, যদি সুগন্ধি ব্যবহার না করে, তবে শরীর হইতে দুর্গন্ধ বাহির হইবে, যদি দাঁত পরিষ্কার না করে, তবে মুখ হইতে দুর্গন্ধ আসিতে আরম্ভ করিবে, যদি চুলে তৈল চিরুনী ব্যবহার না করে, তবে উহা এলোমেলো ও বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইবে, উহার মধ্যে উকুন পয়দা হইয়া যাইবে (এবং মাথা হইতে দুর্গন্ধ আসিতে শুরু করিবে), সামান্য বয়স বেশী হইয়া গেলে সে বুড়ী হইয়া যাইবে (তাকাইয়া দেখিবারও উপযুক্ত থাকিবে না), মাসিক হয়, পেশাব পায়খানা করে, সবরকম দুর্গন্ধময় জিনিস (ধুথু, গ্লেটমা, লালা, নাকের ময়লা ইত্যাদি) তাহার ভিতর হইতে বাহির হইতে থাকে। দুঃখ-কষ্ট, দুশ্চিন্তা ও মুসীবত আসিতে থাকে। এত বেশী স্বার্থপরতা যে, শুধুমাত্র নিজের স্বার্থের জন্যই তোমার সহিত মহব্বত প্রকাশ করে। কেবল নিজের আরাম ও সুবিধার জন্যই তোমার প্রতি ভালবাসা দেখায়। (আজ যদি তোমার দ্বারা কোন কষ্ট পায়, সমস্ত ভালবাসা শেষ হইয়া যাইবে) চরম অকৃতজ্ঞ, কোন কথা বা ওয়াদা পূরণ করে না। তাহার সমস্ত ভালবাসা মিথ্যা। আগামীকাল তোমার পরেই অন্য

কাহারও পার্শ্বে বসিবে। তখন তাহার সহিতও এইরূপ ভালবাসার দাবী করিবে।

পক্ষান্তরে, আমার নিকট ইহা হইতে হাজার গুণ ভালো বাঁদী রহিয়াছে, যাহার মূল্য ইহার চেয়ে অনেক কম। তাহাকে কর্পুরের উপাদান দ্বারা বানানো হইয়াছে, মেশক ও জাফরানের সংমিশ্রণে সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহার উপর মুক্তা ও নূর জড়ানো হইয়াছে, যদি লবনাক্ত পানিতে তাহার মুখের লাল ফেলা হয়, তবে উহা মিঠা হইয়া যাইবে। যদি সে মৃত ব্যক্তির সহিত কথা বলে, তবে মৃত ব্যক্তি জিন্দা হইয়া যাইবে। যদি তাহার হাতের কব্জি সূর্যের সম্মুখে ধরা হয়, তবে সূর্য আলোহীন হইয়া গ্রহণ লাগিয়া যাইবে। যদি সে অন্ধকারে আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে সমস্ত ঘর আলোকিত হইয়া যাইবে এবং ঝলমল করিয়া উঠিবে। যদি সে তাহার সাজ-সজ্জাসহকারে দুনিয়াতে আসিয়া পড়ে, তবে সারা জাহান ঘ্রাণে মোহিত হইয়া যাইবে, উজ্জ্বল হইয়া যাইবে। সেই বাঁদী মেশক ও জাফরানের বাগিচায় লালিতপালিত হইয়াছে। ইয়াকুত ও মারজানের শাখাসমূহে খেলিয়াছে। সর্বপ্রকার নেয়ামতসমূহের তাঁবুতে তাহার মহল রহিয়াছে। তাসনীম (জান্নাতের ঝর্ণাসমূহের মধ্য হইতে একটি ঝর্ণা)এর পানি পান করে, কখনও ওয়াদা ভঙ্গ করে না। ভালবাসা পরিবর্তন করে না (অন্যের প্রেমে মজে না)। এখন তুমিই বল, মূল্য হিসাবে কোন্ বাঁদী বেশী উপযোগী?

সকলেই বলিল, ঐ বাঁদীই বেশী উপযোগী যাহার কথা আপনি বলিলেন। তিনি বলিলেন, ঐ বাঁদীর মূল্য সবসময় সব জমানায় প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট মজুদ রহিয়াছে। লোকেরা বলিল, উহার মূল্য কি? তিনি বলিলেন, এত বড় গুরুত্বপূর্ণ এবং আলীশান বস্তু খরিদ করিবার জন্য অত্যন্ত সাধারণ মূল্য আদায় করিতে হয়। আর উহা হইল, রাএর কিছু সময় অবসর করিয়া শুধু আল্লাহ তায়ালায় জন্য কমপক্ষে দুই রাকাত তাহাজ্জুদ নামায পড়িয়া লওয়া। আর যখন তোমরা খানা খাইতে বস, তখন কোন গরীব অভাবী লোককেও শরীক করিয়া লও। আর আল্লাহ তায়ালায় সন্তুষ্টিকে নিজের খাহেশের উপর প্রাধান্য দাও। পথে কোন কষ্টদায়ক জিনিস যেমন কাঁটা, ইট ইত্যাদি পড়িয়া থাকিতে দেখিলে উহা সরাইয়া দাও। দুনিয়ার জীবনকে সাধারণভাবে কাটাইয়া দাও। নিজের চিন্তা-ফিকিরকে এই ধোকার ঘর হইতে সরাইয়া চিরস্থায়ী ঘরের প্রতি লাগাইয়া লও। এই সমস্ত বিষয়ে এহতেমাম করিলে তুমি দুনিয়াতে ইচ্ছতের যিন্দেগী অতিবাহিত করিতে পারিবে। আখেরাতে নিশ্চিন্ত ও

সম্মানের সহিত পৌঁছিব। অফুরন্ত নেয়ামতের ঘর জান্নাতে আল্লাহ তায়ালা প্রতিবেশী হইয়া অনন্তকাল থাকিবে।

উক্ত বাঁদীর মনিব বাঁদীকে সম্বেদন করিয়া বলিল, তুমি কি শায়েখের কথাগুলি শুনিয়াছ? ইহা সত্য কিনা? বাঁদী বলিল, সম্পূর্ণ সত্য। শায়েখ বড় উপদেশ, হিতকামনা ও কল্যাণের কথা বলিয়াছেন। মনিব বলিল, আচ্ছা, তুমি এখন হইতে আজাদ এবং এত এত সামান তোমাকে দিলাম। আর অন্যান্য সকল গোলামদেরকে বলিল, তোমরা সকলেই আজাদ এবং আমার সম্পদ হইতে এত এত সম্পদ তোমাদিগকে দিলাম। আমার এই বাড়ী এবং যাহা কিছু সম্পদ ইহার মধ্যে আছে সব আল্লাহর রাস্তায় সদকা করিলাম। ঘরের দরজায় একটি মোটা কাপড়ের পর্দা ঝুলান ছিল, উহাকে খুলিয়া শরীরে জড়াইয়া লইল এবং নিজের সমস্ত মূল্যবান পোশাক খুলিয়া সদকা করিয়া দিল।

বাঁদী বলিল, হে আমার মনিব! আপনার পর আমার এই জীবন আর ভাল লাগিবে না। এই কথা বলিয়া সেও একটি মোটা কাপড় পরিধান করিয়া নিজের সমস্ত সাজ-সজ্জার পোশাক এবং সমস্ত মাল-সম্পদ সদকা করিয়া মনিবের সঙ্গী হইল। মালেক ইবনে দীনার (রহঃ) তাহাদের জন্য দোয়া করিতে করিতে বিদায় লইলেন। আর তাহারা উভয়ে সমস্ত আশ্রম-আশ্রমের জীবনকে ছাড়িয়া আল্লাহর এবাদতে মশগুল হইয়া গেল এবং এই অবস্থাতে তাহাদের ইন্তেকাল হইল। আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে এবং তাহাদিগকে মাফ করিয়া দিন। (রওজ)

(৫৭) জাফর ইবনে সুলাইমান (রহঃ) বলেন, আমি একবার হযরত মালেক ইবনে দীনার (রহঃ) এর সহিত বসরায় যাইতেছিলাম। একটি বড় শানদার অট্টালিকার নিকট দিয়া অতিক্রম করিলাম, যাহার নির্মাণ কাজ চলিতেছিল। একজন যুবক বসিয়া রাজমিস্ত্রীদিগকে নির্দেশ দিতেছিল যে, এখানে এই হইবে, আর ঐখানে এইরূপ হইবে। মালেক ইবনে দীনার (রহঃ) ঐ যুবককে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, এই যুবকটি কত সুন্দর ও সুশ্রী অথচ কি কাজের মধ্যে জড়াইয়া রহিয়াছে, এই নির্মাণ কাজে তাহার কত মনোযোগ! আমার মন চাহিতেছে, আল্লাহ তায়ালা নিকট এই যুবকের জন্য দোয়া করি—তিনি যেন তাহাকে এইসব ঝামেলা হইতে মুক্ত করিয়া আপন মুখলেস বান্দা বানাইয়া লন। কত ভাল হয় যদি—সে জান্নাতের যুবকদের মধ্যে হইয়া যায়। হে জাফর! চল আমরা ঐ যুবকের নিকট যাই।

জাফর বলেন, আমরা দুইজন ঐ যুবকের নিকট গেলাম। তাকে সালাম করিলাম। সে সালামের জওয়াব দিল। (সে মালেক (রহঃ) সম্পর্কে জানিত) কিন্তু তাকে চিনিতে পারে নাই। কিছুক্ষণ পর চিনিতে পারিয়া দাঁড়াইয়া গেল এবং বলিল, কি মনে করিয়া তশরীফ আনিয়াছেন? মালেক (রহঃ) বলিলেন, তুমি তোমার এই বাড়ীর নির্মাণ কাজে কি পরিমাণ অর্থ খরচ করিবার ইচ্ছা করিয়াছ? সে বলিল, এক লক্ষ দেরহাম। মালেক (রহঃ) বলিলেন, তুমি যদি এই এক লক্ষ দেরহাম আমাকে দিয়া দাও তবে আমি তোমার জন্য জাম্মাতে একটি বাড়ীর জিম্মা লইতেছি, উহা এই বাড়ী হইতে অনেক গুণ উত্তম হইবে। সেখানে অনেক বাদেম থাকিবে। উহাতে লাল ইয়াকুতের তাঁবু ও গম্বুজ হইবে, উহার উপর মুক্তা জড়ানো থাকিবে। উহার মাটি জাফরানের হইবে, উহার মসলা মেশকের হইবে, যাহার সুগন্ধি ছড়াইতে থাকিবে। উহা কখনও পুরাতন হইবে না। নষ্ট হইবে না। উহাকে কোন মিস্ত্রী বানাইবে না, বরং আল্লাহ তায়ালার 'কুন' (হইয়া যাও) হুকুমের দ্বারা তৈয়ার হইয়া যাইবে।

যুবক বলিল, আজ রাত্র আমাকে চিন্তা করিবার জন্য সময় দিন। আপনি আগামীকাল সকালে আসুন। তখন আমি এই বিষয়ে আমার সিদ্ধান্ত জানাইব। হযরত মালেক (রহঃ) চলিয়া আসিলেন। রাত্রভর ঐ যুবকের চিন্তায় কাটাইলেন। শেষ রাত্রে তাহার জন্য খুব বিনয়ের সহিত দোয়া করিলেন। যখন সকাল হইল, তখন আমরা দুইজন তাহার বাড়ীতে গেলাম। নওজোয়ান দরজার বাহিরে বসিয়াই অপেক্ষা করিতেছিল। যখন হযরত মালেক (রহঃ)কে দেখিল, তখন খুব খুশী হইল। হযরত মালেক (রহঃ) বলিলেন, গতকালের বিষয় সম্পর্কে তুমি কি সিদ্ধান্ত লইয়াছ? সেই নওজোয়ান বলিল, আপনি কাল যে জিনিসের ওয়াদা করিয়াছেন, উহা কি আপনি পূরা করিবেন? হযরত মালেক (রহঃ) বলিলেন, অবশ্যই। নওজোয়ান দেহহামের খলি সম্মুখে রাখিয়া দিল এবং দোয়াত, কলম আনিয়া রাখিল। হযরত মালেক (রহঃ) একটি চিঠি লিখিলেন, উহাতে বিহ্মিগ্গাহির রাহমানির রাহীম এর পর লিখিলেন—

‘ইহা একটি অঙ্গীকারনামা। এই মর্মে যে, মালেক ইবনে দিনার অমুক ব্যক্তির নিকট হইতে এই জিম্মা লইয়াছে যে, তাহার এই মহলের পরিবর্তে আল্লাহ তায়ালার নিকট এইরূপ মহল যাহার গুণাবলী উপরে বর্ণনা করা হইয়াছে (উল্লেখিত মহলের গুণাবলী লিখিবার পর), সে পাইবে। বরং উহা হইতেও অনেক বেশী উত্তম ও উন্নত মহল পাইবে। যাহা অতি উত্তম ছায়াতে আল্লাহ তায়ালার নিকটে হইবে।’

এই চিঠি লিখিয়া তাহাকে দিয়া দিলেন এবং একলক্ষ দেবহাম তাহার নিকট হইতে লইয়া চলিয়া আসিলেন।

জাফর (রহঃ) বলেন, সন্ধ্যার সময় হযরত মালেক (রহঃ)এর নিকট উহা হইতে এই পরিমাণও বাকী ছিল না যে, একবেলা খাওয়ার কাজ চলিতে পারে। এই ঘটনার পর চল্লিশ দিনও অতিবাহিত হয় নাই, একদিন হযরত মালেক (রহঃ) যখন ফজরের নামায হইতে অবসর হইলেন, তখন মসজিদের মেহরাবে একটি কাগজের টুকরা পড়িয়া থাকিতে দেখিলেন। উহা ঐ কাগজের টুকরাই ছিল যাহা মালেক (রহঃ) ঐ যুবককে লিখিয়া দিয়াছিলেন। উহার অপর পৃষ্ঠায় কালি ছাড়া লেখা ছিল যে, ইহা আল্লাহ তায়ালায় পক্ষ হইতে মালেক ইবনে দিনারের জিম্মার মুক্তিদানপত্র। তুমি ঐ যুবকের জন্য যেই বাড়ীর জিম্মা লইয়াছিলে, আমি পুরাপুরিভাবে তাহাকে উহা দান করিয়া দিয়াছি এবং উহা হইতে সত্তর গুণ বেশী দিয়াছি।

হযরত মালেক (রহঃ) পত্রটি পড়িয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন। অতঃপর আমরা সেই যুবকের বাড়ীতে গেলাম। সেখানে তাহার বাড়ীর উপর কালো পতাকা ছিল (যাহা শোকের আলামত হিসাবে হয়ত লাগান হইয়াছিল) এবং কান্নাকাটির আওয়াজ আসিতেছিল। আমরা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, গতকাল সেই যুবকের ইন্তেকাল হইয়া গিয়াছে। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহাকে কে গোসল দিয়াছে? গোসলদাতাকে ডাকাইয়া আনা হইল। আমরা তাহাকে যুবকের গোসল ও কাফনের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল, এই যুবক মৃত্যুর পূর্বে আমাকে একটি কাগজের টুকরা দিয়াছিল এবং বলিয়াছিল যে, যখন তুমি আমাকে গোসল করাইয়া কাফন পরাইবে, তখন এই কাগজটি উহার ভিতরে রাখিয়া দিও। আমি তাহাকে গোসল করাইলাম, কাফন পরাইলাম এবং সেই কাগজটি তাহার কাফন এবং শরীরের মাঝখানে রাখিয়া দিলাম। হযরত মালেক (রহঃ) সেই কাগজটি তাহার নিকট হইতে বাহির করিয়া তাহাকে দেখাইলেন। সে বলিল, ইহাই ঐ কাগজ। ঐ মহান সত্তার কসম, যিনি তাহাকে মৃত্যু দিয়াছেন, এই কাগজটি আমি নিজে তাহার কাফনের ভিতর রাখিয়াছিলাম।

এই ঘটনা দেখিয়া অন্য এক যুবক উঠিল এবং বলিতে লাগিল, হে মালেক (রহঃ)! আপনি আমার নিকট হইতে দুই লক্ষ দেবহাম গ্রহণ করুন এবং আমাকেও একটি কাগজ লিখিয়া দিন। হযরত মালেক (রহঃ) বলিলেন, সেই কথা অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে। এখন হইতে পারে না।

আল্লাহ তায়ালা যাহা চাহেন, তাহা করেন। ইহার পর যখনই মালেক (রহঃ) ঐ যুবকের আলোচনা করিতেন, তখনই কাঁদিতেন এবং তাহার জন্য দোয়া করিতেন। (রওজ)

এই ধরনের ঘটনাবলী বুয়ুগানে দ্বীনের দ্বারা অনেক বেশী পরিমাণে ঘটিয়া থাকে। জোশের সহিত কোন কথা তাহাদের জবান হইতে বাহির হইয়া যায়। আর আল্লাহ তায়ালা এইভাবেই উহাকে পূরণ করিয়া দেন। এই বিষয়ে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, অনেক এলোমেলো চলওয়াল্য ধুলিধূসরিত লোক এমন রহিয়াছে, যাহাদিগকে লোকেরা নিজেদের দরজা হইতে সরাইয়া দেয় এবং তাহাদের প্রতি কোন রকম জাফেপও করে না, অথচ তাহারা যদি আল্লাহ তায়ালা উপর কোন বিষয়ের কসম খাইয়া ফেলে, তবে আল্লাহ তায়ালা তাহাদের কথা পূরণ করিয়া দেন। (মুসলিম)

(৫৮) মুহাম্মদ ইবনে সিমাক (রহঃ) বলেন, উমাইয়া বংশের লোকদের মধ্যে মুসা ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সুলাইমান হাশেমী বড় আরাম-আয়েশে লালিত বিরাট বিত্তশালী লোক ছিল। সর্বদা মনের খাহেশ পূরা করিবার মধ্যে লাগিয়া থাকিত। খানাপিনা লেবাস-পোশাক খেল-তামাশা এবং খাহেশাত ও ভোগ-বিনাসিতা লুটিবার যত পন্থা হইতে পারে সবকিছুর মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে ছিল। কিশোর-কিশোরীদের লইয়া সবসময় মস্ত থাকিত। দুঃখ-চিন্তা বলিতে তাহার কিছুই ছিল না। নিজেও চাঁদের মত অত্যন্ত সুশ্রী ছিল। আল্লাহ তায়ালা সর্ব প্রকার দুনিয়াবী নেয়ামত তাহার উপর পরিপূর্ণ ছিল। তাহার বার্ষিক আয় তিন লক্ষ তিন হাজার দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) ছিল। উহা সম্পূর্ণ এই সব খেল-তামাশার মধ্যে খরচ হইত। একটি উচু বালাখানা ছিল যাহাতে কয়েকটি জানালা সদর রাস্তার দিকে খোলা ছিল। উহার উপর বসিয়া সে পথচারীদের তামাশা দেখিত। আর কয়েকটি জানালা অপর পার্শ্ব বাগানের দিকে খোলা ছিল। সেখানে বসিয়া সে বাগানের বাতাস উপভোগ করিত। ফুলের সুঘ্রাণ লইত। ঐ বালাখানায় হাতির দাঁতের নির্মিত একটি গম্বুজ ছিল, যাহা চাঁদির পেরেক দ্বারা জড়ানো ছিল। উহার উপর স্বর্ণের ঝুল ছিল, সেখানে একটি আসন ছিল, যাহার উপর মুক্তার চাদর ছিল এবং ঐ হাশেমীর মাথার উপর মুক্তা জড়ানো পাগড়ী ছিল। উক্ত গম্বুজের মধ্যে সবসময় তাহার বন্ধুবান্ধবরা থাকিত। খাদেমরা আদবের সহিত পিছনে দাঁড়াইয়া থাকিত। সম্মুখে নর্তকীরা গম্বুজের বাহিরে জমায়েত হইয়া থাকিত। যখন গান শুনিতে

ইচ্ছা হইত, তখন সে সেতারার দিকে একবার দেখিত, অমনি সকলেই উপস্থিত হইয়া যাইত। আর যখন বন্ধ করিতে চাহিত, হাত দ্বারা সেতারার দিকে ইশারা করিয়া দিত। গান বন্ধ হইয়া যাইত।

রাত্রে যতক্ষণ ঘুম না আসিত, ততক্ষণ ইহাতেই মশগুল থাকিত। আর যখন (শরাবের নেশায়) তাহার বুদ্ধি লোপ পাইত, মজলিসের সঙ্গী সাথীরা চলিয়া যাইত। সে যে মেয়েকে চাহিত ধরিয়া লইত এবং রাতভর তাহার সহিত একান্তে কাটাইত। সকালে সে দাবাঘুটি ইত্যাদি খেলার মধ্যে মগ্ন হইয়া যাইত। তাহার সম্মুখে কোন দুঃখ ও কষ্টের কথা, কোন মৃত্যু, কাহারও অসুস্থতার আলোচনা একেবারে হইত না। তাহার মজলিসে সবসময় হাসি ও আনন্দের কথা, হাসির কাহিনী এবং এই ধরনের আলোচনা চলিতে থাকিত। প্রতিদিন নূতন নূতন সুগন্ধি যাহা ঐ যুগে কোথাও পাওয়া যাইত, তাহার মজলিসে আসিত। ভাল ভাল সুব্রানযুক্ত ফুলদানী ইত্যাদি হাজির করা হইত।

এই অবস্থাতে তাহার ২৭ বৎসর কাটিয়া গেল। এই রাত্রে সে অভ্যাস অনুযায়ী তাহার গম্বুজে ছিল। হঠাৎ তাহার কানে এমন একটি সুমধুর আওয়াজ আসিল যাহা গায়িকাদের আওয়াজ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। কিন্তু উহা বড়ই আকর্ষণীয় ছিল। উহার আওয়াজ কানে পড়িতেই তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। গান বন্ধ করিয়া দিল এবং গম্বুজের জানালা দিয়া মাথা বাহির করিয়া ঐ আওয়াজ শুনিতে লাগিল। ঐ আওয়াজ কখনও শুনা যাইত আবার কখনও বন্ধ হইয়া যাইত। সে তাহার খাদেমদেরকে হুকুম করিল, এই আওয়াজ যাহার, তাহাকে ধরিয়া লইয়া আস। শরাবের আসর চলিতেছিল, খাদেমরা তাড়াতাড়ি ঐ আওয়াজের দিকে দৌড়াইল এবং আওয়াজের দিকে চলিত চলিতে এক মসজিদে পৌছিল। সেখানে এক যুবক অত্যন্ত দুর্বল শরীর, হরিদ্রা বর্ণ, শীর্ণ ঘাড়, শুষ্ক ঠোঁট, এলোমেলো চুল, পেট কোমরের সহিত লাগিয়া আছে, ছোট দুইটি লুঙ্গি তাহার শরীরের উপর রহিয়াছে, যাহাতে কোনরূপে শরীর ঢাকিতে পারে। মসজিদে দাঁড়াইয়া তাহার প্রতিপালকের সহিত কুরআন তেলাওয়াতে মশগুল রহিয়াছে। খাদেমরা তাহাকে ধরিয়া লইয়া গেল। তাহাকে কিছুই বলিল না। হঠাৎ তাহাকে মসজিদ হইতে বাহির করিয়া বালাখানার উপর তাহার সম্মুখে হাজির করিয়া বলিল, ছয়ুর! আনিয়াছি। সে শরাবের নেশার মধ্যে বলিতে লাগিল, কে এই ব্যক্তি? তাহারা আরজ করিল, ছয়ুর! ইনি সেই ব্যক্তি, যাহার আওয়াজ আপনি শুনিয়াছিলেন। সে জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা তাহাকে কোথা হইতে আনিয়াছ? তাহারা বলিল,

হয়! সে মসজিদে ছিল। দাঁড়াইয়া কুরআন শরীফ পড়িতেছিল। সর্দার লোকটি এই ফকীরকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি পড়িতেছিলে? সে আউযুবিল্লাহ পড়িয়া এই আয়াতসমূহ পড়িল : **إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ خِتْمُهُ مِنْسُكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ**

অর্থাৎ, নিঃসন্দেহে নেককারগণ (জান্নাতে) বড় নেয়ামতের মধ্যে থাকিবে। পালঙ্কসমূহের উপর বসিয়া (জান্নাতের মনোরম বস্তুসমূহ) দেখিতে থাকিবে। হে শ্রোতা, তুমি তাহাদের মুখমণ্ডলে সুখের সজীবতা দেখিতে পাইবে। তাহারা পান করার জন্য মোহরকৃত বিশুদ্ধ শরাব পাইবে যাহার উপর কস্তুরীর মোহর থাকিবে। (পরস্পর) প্রতিযোগীদের এইরূপ জিনিসের ব্যাপারেই প্রতিযোগিতা করা উচিত, (অর্থাৎ এই সমস্ত নেয়ামত কে বেশী লাভ করিতে পারে এই ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করা উচিত। আর যেহেতু এইগুলি আমল দ্বারা হাসিল হয় সেহেতু সেই সমস্ত আমলের ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করা চাই যাহা দ্বারা এই সমস্ত নেয়ামত হাসিল হয়। আর এই শরাবের সংমিশ্রণ তাসনীম এর পানি দ্বারা হইবে। (শরাবের মধ্যে কোন জিনিস যখন মিলান হয়, তখন উহার তেজ বাড়িয়া যায়, আর তাসনীম জান্নাতের) এমন একটি ঝর্ণা যাহা হইতে নৈকট্যপ্রাপ্তগণ পান করিবে। (অর্থাৎ, ঐ ঝর্ণার পানি নৈকট্যপ্রাপ্ত লোকেরা কোনরূপ মিশ্রণ ব্যতিরেকে খাঁটিভাবে পাইবে। আর অন্যান্য নেক লোকদের শরাবের মধ্যে উহা হইতে সামান্য মিলাইয়া দেওয়া হইবে) (তাফসীর : ২২-২৮)

অতঃপর ফকীর বলিল, আরে ধোকাগ্রস্ত! তোমার এই প্রাসাদ, তোমার এই অটালিকা, তোমার এইসব গালিচাসমূহের বেহেশতের সহিত কি সামঞ্জস্য রহিয়াছে! সেইখানে বড় উচু পালঙ্কসমূহ রহিয়াছে, যাহার উপর গালিচা বিছানো রহিয়াছে। এমন গালিচা যাহা অনেক উচু। (সূরা ওয়াক্কেয়া, রুকু-১) উহার আন্তর মোটা রেশমের হইবে। (সূরা আর-রহমান, রুকু-৩) ঐ সমস্ত লোকেরা সবুজ বৃক্ষের ছবি অংকিত অপূর্ব সুন্দর কাপড়ের উপর হেলান দিয়া থাকিবে। (সূরা আর-রহমান, রুকু-৩) আল্লাহর ওলীগণ ঐ পালঙ্কসমূহ হইতে এমন দুইটি ঝর্ণা দেখিবেন যাহা দুইটি বাগানের মধ্যে প্রবাহিত হইবে। (সূরা আর রহমান, রুকু ৩) এই দুই বাগানের মধ্যে সবরকম ফলের দুই দুই প্রকার থাকিবে। (অর্থাৎ, একই প্রকার ফলের

দুই রকম স্বাদ হইবে) (সূরা আর রহমান, রুকু ৩) এই সমস্ত ফল না শেষ হইবে, না এইগুলি আহরণ করিতে কোন বাধা হইবে (যেমন দুনিয়াতে বাগানের মালিকগণ ফল আহরণ করিতে বাধা দিয়া থাকে)। (সূরা ওয়াকেরা, রুকু ১) ঐ সমস্ত লোক পছন্দনীয় জিন্দেগীর মধ্যে অনেক উচ্চ মর্যাদায় জাম্নাতে থাকিবে। (আল হাক্বাহ, রুকু ১) তাহারা এইরূপ উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বেহেশতে থাকিবে যেখানে কোন অহেতুক কথাবার্তা শুনিবে না। উহাতে প্রবহমান ঋণ থাকিবে। উহাতে উচু উচু আসন বিছানো থাকিবে। পানপাত্র রাখা থাকিবে এবং গদিসমূহ সাজানো থাকিবে। সর্বদিকে গালিচাই গালিচা ছড়ানো থাকিবে। (যাহাতে যেইখানে ইচ্ছা বসিতে পারে আর বসিবার জন্য সর্বত্রই শীর্ষ আসন হইবে) (সূরা গাশিয়াহ) তাহারা ছায়াতে এবং কর্ণাসমূহে থাকিবে। (সূরা আল মুরসালাত) ঐ জাম্নাতের ফল চিরকাল থাকিবে (কখনও শেষ হইবে না)। উহার ছায়া চিরকাল থাকিবে। ইহা তো হইল মুত্তাকী লোকদের পরিণাম। আর কাফেরদের পরিণতি হইল, দোযখ। (সূরা রাদ, রুকু ৫) উহা কিরূপ কঠিন আগুন হইবে (আল্লাহ তায়ালা হেফাজত করুন), নিঃসন্দেহে অপরাধী লোকেরা জাহান্নামের আজাবে চিরকাল থাকিবে, ঐ আজাব কখনও তাহাদের হইতে হালকা করা হইবে না এবং তাহারা উহার মধ্যে নিরাশ হইয়া পড়িয়া থাকিবে। (সূরা যুখরুফ, রুকু ৬) নিঃসন্দেহে অপরাধী লোকেরা অত্যন্ত পত্রভট্টতা ও (বোকামীর) উন্মাদনায় পড়িয়া রহিয়াছে। (তাহারা তাহাদের বোকামী সেই দিন বুঝিবে) যেইদিন তাহাদিগকে উপুড় করিয়া হেঁচড়াইয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে (এবং তাহাদিগকে বলা হইবে যে,) দোযখের আগুনের স্পর্শ (উহাতে জ্বলিবার) স্বাদ গ্রহণ কর। (সূরা কামার, রুকু ৩) তাহারা আগুনের মধ্যে এবং উত্তপ্ত পানির মধ্যে আর কালো ধোয়ার ছায়াতে অবস্থান করিবে। (সূরা ওয়াকেরা, রুকু ১) অপরাধীরা ইহার আকাঙ্ক্ষা করিবে যে, সেই দিনের আযাব হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য তাহাদের পুত্রদেরকে, স্ত্রীকে, ভাইকে এবং সমস্ত পরিবার-পরিজনকে যাহাদের মধ্যে সে অবস্থান করিত এবং সারাজগতের মানুষকে তাহার মুক্তিপণস্বরূপ দিয়া দেয় আর কোন প্রকারে আযাব হইতে বাঁচিয়া যায়, কিন্তু ইহা কখনও হইবে না। উহা এইরূপ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা হইবে যাহা শরীরের চামড়া পর্যন্ত খসাইয়া ফেলিবে। ঐ আগুন এইরূপ ব্যক্তিকে নিজেই ডাকিবে, (যে দুনিয়াতে সত্য হইতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছে এবং (আল্লাহ তায়ালা)র আনুগত্য হইতে) মুখ ফিরাইয়াছে এবং (অন্যায়ভাবে) সম্পদ জমা করিয়াছে এবং উহা জমা করিয়া রাখিয়াছে। (সূরা মাজাঈজ,

রুক-১) এই ব্যক্তি অত্যন্ত কঠিন কষ্টের মধ্যে থাকিবে আর অত্যন্ত কঠিন আযাব এবং আল্লাহ তায়ালার গোস্বার মধ্যে থাকিবে। এই সমস্ত লোক ঐ আযাব হইতে কখনও বাহির হইতে পারিবে না। (কথাবার্তার মধ্যে ফকীর জ্ঞানাত ও দোযখ সম্পর্কিত অনেকগুলি আয়াতের দিকে ইশারা করিলেন, ঐ সমস্ত আয়াত সম্পর্কিত সূরা ও রুকুর বরাত লিখিয়া দেওয়া হইল। সম্পূর্ণ আয়াত অনুবাদকৃত কুরআন শরীফে দেখা যাইতে পারে।)

ঐ হাশেমী সর্দার ফকীরের কথা শুনিয়া তাহার জায়গা হইতে উঠিল, ফকীরের সহিত গলাগলি করিল এবং অত্যন্ত চিৎকার করিয়া কাঁদিল। অতঃপর তাহার মজলিসের লোকদিগকে বলিয়া দিল, তোমরা সবাই চলিয়া যাও এবং ফকীরকে সঙ্গে করিয়া বারান্দায় গেল। একটি চাটাইয়ের উপর বসিয়া নিজের যৌবনের উপর বিলাপ করিতে থাকিল। নিজের অবস্থার উপর কাঁদিতে থাকিল আর ফকীর তাহাকে নসীহত করিতে থাকিল। এইভাবে সকাল হইয়া গেল। সে তাহার সমস্ত গুনাহ হইতে প্রথমে ফকীরের সম্মুখে তওবা করিল এবং আল্লাহ তায়ালার সহিত এই অঙ্গীকার করিল যে, ভবিষ্যতে কখনও কোন গুনাহ করিবে না। অতঃপর দিনের বেলায় সকলের সম্মুখে পুনরায় তওবা করিল এবং মসজিদের একটি কোণে অবস্থান গ্রহণ করিয়া এবাদতে মশগুল হইয়া গেল। নিজের সমস্ত সাজ-সামান ধন-সম্পদ বিক্রয় করিয়া সদকা করিয়া দিল। সমস্ত চাকর-নকরদিগকে বিদায় করিয়া দিল। যেই সমস্ত জিনিস জুলুম অত্যাচারের মাধ্যমে লইয়াছিল সবকিছু হকদারদের নিকট ফেরত দিল। গোলাম ও বাদীদের মধ্য হইতে অনেককে আজাদ করিয়া দিল। আর অনেককে বিক্রয় করিয়া উহার মূল্য সদকা করিয়া দিল এবং মোটা পোশাক পরিধান ও ঘবের রুটি খাওয়া শুরু করিল। রাতভর নামায পড়িত, দিনে রোযা রাখিত।

অবশেষে বুযুর্গ ও নেক লোকেরা তাহার নিকট সাক্ষাতের জন্য আসিতে লাগিল। তিনি এত সাধনা করিতে লাগিলেন যে, লোকেরা তাহাকে তাহার অবস্থার উপর দয়া করার এবং কষ্টসাধনা কমাইবার জন্য বলিতে লাগিল। তাহাকে বুঝাইত যে, আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত দয়াশীল। তিনি সামান্য মেহনতের উপর অনেক বেশী বিনিময় দান করেন। কিন্তু সে বলিত, বন্ধুগণ! আমার অবস্থা একমাত্র আমারই জানা আছে, আমি রাত্রদিন আমার মাওলার নাফরমানী করিয়াছি, বড় কঠিন কঠিন গুনাহ করিয়াছি। ইহা বলিয়া সে কাঁদিতে আরম্ভ করিত এবং খুব বেশী কাঁদিত। এই অবস্থায় সে খালি পায়ে পায়দল হজে রওয়ানা হইল। তাহার শরীরে

একটি মোটা কাপড় ও সঙ্গে একটি পেয়ালা ও একটি থলি ছিল। এই অবস্থায়ই মক্কা মুকাররমায় পৌঁছিল এবং হজ্জের পর সেখানেই অবস্থান করিল। অবশেষে সেখানেই তাহার ইন্তেকাল হইল। আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর অফুরন্ত রহমত বর্ষণ করুন।

মক্কায় অবস্থান কালে রাতে হাতিমের মধ্যে যাইয়া খুব কান্নাকাটি করিত আর বিনয় সহকারে দোয়া করিত এবং বলিত, হে আমার মাওলা! আমার কত নির্জন সময় এমন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, উহাতে আমি তোমার কোন খেয়াল করি নাই। আমি কত বড় বড় গুনাহের দ্বারা তোমার মুকাবিলা করিয়াছি। হে আমার মাওলা! আমার সমস্ত নেক কাজ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে (কেননা, আমি কিছুই কামাই করি নাই)। অথচ আমার সমস্ত গুনাহ আমার সঙ্গে রহিয়া গিয়াছে। আমার জন্য ঐদিন ধ্বংস রহিয়াছে, যেইদিন তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ ঘটিবে। (অর্থাৎ মৃত্যুর পর) আমার জন্য ধ্বংসই ধ্বংস রহিয়াছে, অর্থাৎ অনেক বেশী ধ্বংস রহিয়াছে, যেইদিন আমার আমলনামা খোলা হইবে। আফসোস! উহা আমার লাঞ্ছনা ও অপমান দ্বারা পরিপূর্ণ হইবে। আমার গুনাহের দ্বারা উহা পরিপূর্ণ হইবে। বরং তোমার অসন্তুষ্টির কারণে আমার উপর ধ্বংস নামিয়া আসিয়াছে। তোমার গোস্তা আমার জন্য ধ্বংসের কারণ হইবে। তোমার অসন্তুষ্টি ও গোস্তা তোমার ঐ সমস্ত দয়া ও অনুগ্রহের মুকাবিলায় হইবে, যাহা সবসময় তুমি আমার প্রতি করিয়াছ এবং তোমার ঐ সমস্ত নেয়ামতের মুকাবিলায় হইবে, যাহার মুকাবিলা আমি সর্বদা গুনাহের দ্বারা করিয়াছি আর তুমি আমার সমস্ত কর্মকাণ্ড দেখিতেছিলে।

হে আমার মাওলা! তুমি ছাড়া আমার আর কোন ঠিকানা আছে, যেখানে আমি পালাইয়া যাইতে পারি। তুমি ছাড়া কোন ব্যক্তি আছে, যাহার নিকট আমি কাকুতি-মিনতি করিব। তুমি ছাড়া কে আছে, যাহার উপর আমি কোন প্রকার ভরসা করিতে পারিব। হে আমার মাওলা! আমি কখনও ইহার উপযুক্ত নই যে, তোমার নিকট জাম্বাত চাহিব। তবে শুধুমাত্র তোমার মেহেরবানী, তোমার দান, তোমার দয়ায় এই আশা করি যে, তুমি আমার উপর রহম করিবে এবং আমার গুনাহ ক্ষমা করিবে। কেননা, একমাত্র তুমিই ভয় করার যোগ্য এবং ক্ষমা করার যোগ্য। فَإِنَّكَ أَهْلُ التَّنَوُّيِ وَأَهْلُ السَّغْفِرَةِ (রওজ)

(৫৯) হারুনুর রশীদ (রহঃ) এর একটি ছেলে ছিল। যাহার বয়স প্রায় ১৬ বৎসর ছিল। সে অধিকাংশ সময় দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত ও বুয়ুর্গ

লোকদের মজলিসে থাকিত এবং প্রায় সময় কবরস্থানে চলিয়া যাইত। সেখানে যাইয়া বলিত, তোমরা আমাদের পূর্বে দুনিয়াতে ছিলে। দুনিয়ার মালিক ছিলে। কিন্তু এই দুনিয়া তোমাদিগকে মুক্তি দেয় নাই। অবশেষে তোমরা কবরে পৌঁছিয়া গিয়াছ। হায়! কোনভাবে যদি আমি জানিতে পারিতাম যে, তোমাদের উপর কি অতিবাহিত হইতেছে এবং তোমাদের সহিত কি কি সওয়াল-জওয়াব হইয়াছে! আর অধিকাংশ সময় সে এই কবিতা পাঠ করিত :

تَرَوْنِي الْجَنَائِزَ كُلَّ يَوْمٍ
وَيَحْزُنُنِي بِكُلِّ النَّاحِيَاتِ

অর্থাৎ, আমাকে জানাযা প্রতিদিন ভয় দেখায় এবং মৃত্যুবরণকারীদের উপর ক্রন্দনকারিণীদের আওয়াজ আমাকে চিন্তিত করিয়া রাখে।

একদিন সে তাহার পিতা (বাদশাহের) মজলিসে আসিল। তাহার নিকট উজির আমীর সকলেই উপস্থিত ছিল। ছেলের গায়ে সাধারণ একটি কাপড় এবং মাথায় একটি লুঙ্গি বাঁধা ছিল। রাজ্যের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ পরস্পর বলিতে লাগিল, এ পাগল ছেলেটির কাজকর্ম আমীরুল মুমিনীনকে অন্যান্য বাদশাহদের দৃষ্টিতে হেয় করিয়া দিয়াছে। যদি আমিরুল মুমিনীন তাহাকে সতর্ক করিয়া দেন, তবে হয়ত সে তাহার অবস্থা পরিবর্তন করিবে। আমীরুল মুমিনীন এই কথা শুনিয়া তাহাকে বলিলেন, হে পুত্র! তুমি আমাকে লোকদের দৃষ্টিতে হেয় করিয়া রাখিয়াছ। সে এই কথা শুনিয়া পিতাকে তো কোন জবাব দিল না; কিন্তু একটি পাখী সেখানে বসিয়া ছিল, উহাকে বলিল, ঐ মহান সত্তার দোহাই, যিনি তোমাকে পয়দা করিয়াছেন, তুমি আমার হাতের উপর আসিয়া বসিয়া যাও। ঐ পাখিটি সেখান হইতে উড়িয়া তাহার হাতের উপর আসিয়া বসিয়া গেল। অতঃপর বলিল, এখন তুমি তোমার জায়গায় চলিয়া যাও। পাখিটি তাহার হাত হইতে উড়িয়া নিজ জায়গায় চলিয়া গেল।

অতঃপর সে আরজ করিল, হে আব্বাজান! প্রকৃতপক্ষে দুনিয়ার প্রতি আপনার মহব্বত আমাকে হেয় করিয়া রাখিয়াছে। এখন আমি এই সিদ্ধান্ত লইয়াছি যে, আপনার নিকট হইতে পৃথক হইয়া যাইব। ইহা বলিয়া সে সেখান হইতে রওয়ানা হইয়া গেল। শুধু এক জিলদ কুরআন শরীফ সঙ্গে লইল। বিদায়ের সময় মা তাহাকে অনেক মূল্যবান একটি আংটিও দিয়া দিলেন (যাহাতে প্রয়োজনের সময় উহা বিক্রয় করিয়া কোন কাজে লাগাইতে পারে)। সে সেইখান হইতে রওয়ানা হইয়া বসরায়

পৌছিল এবং মজদুরদের সহিত কাজ করিতে লাগিল। সপ্তাহে শুধু একদিন শনিবারে কাজ করিত। আর আটদিন ঐ মজুরীর পয়সা খরচ করিত এবং অষ্টম দিন শনিবারে আবার কাজ করিত। সে এক দেরহাম এক দানিক (অর্থাৎ এক দেরহামের ছয় ভাগের একভাগ) মজুরী লইত। ইহা হইতে কম বা বেশী লইত না। প্রতিদিন এক দানিক খরচ করিত।

আবু আমের বসরী (রহঃ) বলেন, আমার একটি দেওয়াল পড়িয়া গিয়াছিল। উহা ঠিক করিবার জন্য আমি একজন মিস্ত্রী তালাশ করিতে বাহির হইলাম। (কেহ বলিল যে, এই ব্যক্তিও নির্মাণের কাজ করে) আমি দেখিলাম, অত্যন্ত সুশ্রী একটি ছেলে বসিয়া বহিয়াছে। নিকটে একটি থলি রাখা আছে এবং দেখিয়া কুরআন শরীফ পড়িতেছে। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে ছেলে! কাজ করিবে? সে বলিতে লাগিল, কেন করিব না? কাজ করিবার জন্যই তো পয়সা হইয়াছি। আপনি বলুন, আমার দ্বারা কি কাজ লইতে চান। আমি বলিলাম, গারা মাটির (নির্মাণ) কাজ লইব। সে বলিল, এক দেরহাম এক দানিক মজুরী হইবে এবং নামাযের সময়ে কাজ করিব না, আমাকে নামাযের জন্য যাইতে হইবে। আমি তাহার উভয় শর্তই মঞ্জুর করিলাম এবং তাহাকে আনিয়া কাজে লাগাইয়া দিলাম। মাগরিবের সময় যখন আমি দেখিলাম, তখন সে দশজন লোকের কাজ করিয়াছে। আমি তাহাকে দুই দেরহাম মজুরী দিলাম। সে শর্তের অতিরিক্ত লইতে অস্বীকার করিল এবং এক দেরহাম এক দানিক লইয়া চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় দিন আমি আবার তাহার তালাশে বাহির হইলাম; কিন্তু আমি তাহাকে কোথাও পাইলাম না। আমি লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম যে, এইরূপ চেহারা বিশিষ্ট একটি ছেলে মজদুরী করে, কাহারও কি জানা আছে যে, তাহাকে কোথায় পাওয়া যাইবে? লোকেরা বলিল, সে শুধু শনিবার দিনই মজদুরী করে। এই দিনের আগে তুমি কোথাও তাহাকে পাইবে না। কাজ দেখিয়া তাহার প্রতি আমার এইরূপ আগ্রহ সৃষ্টি হইয়াছে যে, আমি আটদিন পর্যন্ত আমার নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখিলাম এবং শনিবার দিন তাহার তালাশে বাহির হইলাম। আগের মতই তাহাকে বসিয়া কুরআন শরীফ পাঠরত অবস্থায় পাইলাম। আমি সালাম করিলাম এবং কাজ করিবে কিনা জিজ্ঞাসা করিলাম। সে পূর্বের দুই শর্ত বলিল। আমি মঞ্জুর করিয়া লইলাম। সে আমার সহিত আসিয়া কাজে লাগিয়া গেল। আমি এই ব্যাপারে অবাক হইতেছিলাম যে, গত শনিবারে সে একা দশজন লোকের কাজ কিভাবে করিল। এইজন্য এইবার আমি এমনভাবে আড়াল

হইয়া রহিলাম যে, সে যেন আমাকে না দেখে। আমি তাহার কাজের অবস্থা দেখিলাম। আমি এই দৃশ্য দেখিলাম যে, সে হাতে মাটির গারা লইয়া দেওয়ালের উপর রাখে আর পাথর নিজে নিজেই একটি অপরটির সহিত লাগিয়া যাইতে থাকে। আমার একীন হইয়া গেল যে, সে আল্লাহর ওলী হইবে, আর আল্লাহর ওলীদের কাজে গায়েব হইতে সাহায্য হইয়াই থাকে। যখন সন্ধ্যা হইল, তখন আমি তাহাকে তিন দেবহাম দিতে চাহিলাম। সে উহা লইতে অস্বীকার করিয়া বলিল, আমি এত দেবহাম কি করিব? সে এক দেবহাম এক দানিক লইয়া চলিয়া গেল।

আমি এক সপ্তাহ পুনরায় অপেক্ষা করিলাম। তৃতীয় শনিবারে আবার তাহার তালাশে বাহির হইলাম; কিন্তু আমি তাহাকে পাইলাম না। আমি লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করিলাম। এক ব্যক্তি বলিল, সে তিন দিন যাবৎ অসুস্থ, অমুক নির্জন জঙ্গলে পড়িয়া রহিয়াছে। আমি এক ব্যক্তিকে বিনিময় দিয়া রাজি করিলাম যে, সে আমাকে ঐ জঙ্গলে পৌছাইয়া দিবে। সে আমাকে সঙ্গে লইয়া ঐ বিরান জঙ্গলে পৌছিল। তখন আমি দেখিলাম, সে বেহঁশ অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। একটি ইটের অর্ধেক টুকরা তাহার মাথার নিচে রহিয়াছে। আমি তাহাকে সালাম করিলাম, সে জওয়াব দিল না। আমি দ্বিতীয়বার সালাম করিলাম। তখন সে (চোখ খুলিল এবং) আমাকে চিনিয়া ফেলিল। আমি তৎক্ষণাৎ তাহার মাথা ইটের উপর হইতে সরাইয়া আমার কোলে রাখিলাম। সে মাথা সরাইয়া লইল এবং কবিতার কয়েকটি চরণ পড়িল। তন্মধ্যে দুইটি এই—

يَا صَاحِبِي لَا تَفْتَرِدْ بِتَنْقِيمِ
وَأَذْهَمْتِ إِلَى الْقُبُورِ جَنَارَةً
فَالْعَمْرُ يَنْفَدُ وَالنَّعِيمُ يَزُولُ
فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا حُمُولُ

অর্থাৎ, হে বন্ধু! দুনিয়ার নেয়ামত দ্বারা ধোকাই পড়িও না। জীবন শেষ হইয়া যাইতেছে আর এইসব নেয়ামত খতম হইয়া যাইবে। যখন তুমি কোন জানাযা লইয়া কবরস্থানে যাও, তখন এই চিন্তা করিতে থাকিও যে, একদিন এমনিভাবে তোমারও জানাযা উঠান হইবে।

অতঃপর সে আমাকে বলিল, হে আবু আমের! যখন আমার রূহ বাহির হইয়া যাইবে, তখন আমাকে গোসল দিয়া আমার এই কাপড়েই কাফন দিবে। আমি বলিলাম, হে আমার প্রিয়! ইহাতে কি ক্ষতি আছে যে, আমি তোমার কাফনের জন্য নূতন কাপড়ের ব্যবস্থা করিব। সে জবাব দিল, নূতন কাপড়ের জন্য জীবিত লোকেরাই বেশী উপযুক্ত। (হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) এর জওয়াবও এরূপ ছিল। তিনিও ইন্তেকালের সময়

ইহাই ফরমায়েশ করিয়াছিলেন যে, আমার এই চাদরগুলির মধ্যেই আমাকে কাফন দিও। যখন তাহার নিকট নূতন কাপড়ের অনুমতি চাওয়া হইল, তখন তিনি এই জওয়াবই দিয়াছিলেন।) ছেলেটি বলিল, কাফন তো (পুরাতন হউক বা নূতন হউক অবশ্যই উহা) পুরাতন হইয়া যাইবে। মানুষের সহিত শুধু তাহার আমলই থাকিবে। আর আমার এই লুঙ্গি ও লোটা কবর খননকারীকে মজুরী হিসাবে দিয়া দিও। আর এই আংটি ও কুরআন শরীফ হারুনুর রশীদের নিকট পৌছাইয়া দিও। আর খেয়াল রাখিও যে, তুমি স্বয়ং তাহার হাতে দিবে এবং এই বলিয়া দিবে যে, এক পরদেশী ছেলের পক্ষ হইতে ইহা আমার নিকট আমানত ছিল। সে আপনাকে এই কথা বলিয়া গিয়াছে যে, এমন যেন না হয় যে, এই গাফলত ও ধোকার অবস্থাতেই আপনার মৃত্যু আসিয়া যায়। এই পর্যন্ত বলার পরই তাহার রুহ বাহির হইয়া গেল। তখন আমি জানিতে পারিলাম যে, ছেলেটি শাহজাদা ছিল।

ইন্তেকালের পর তাহার ওসীয়ত অনুযায়ী আমি তাহাকে দাফন করিলাম এবং তাহার দুইটি জিনিসই কবর খননকারীকে দিয়া দিলাম। অতঃপর কুরআন শরীফ ও আংটি লইয়া বাগদাদ পৌছিলাম। যখন শাহী মহলের নিকট পৌছিলাম, তখন বাদশাহর সওয়ারী বাহির হইতেছিল। আমি একটি উঁচু জায়গাতে দাঁড়াইয়া গেলাম। প্রথমে অনেক বড় একটি বাহিনী বাহির হইল, যাহার মধ্যে প্রায় এক হাজার অশ্বারোহী ছিল। ইহার পর এইভাবে একের পর এক দশটি বাহিনী বাহির হইল। প্রতিটি বাহিনীতে প্রায় এক হাজার সওয়ারী ছিল। দশম বাহিনীতে স্বয়ং আমীরুল মুমিনীনও ছিলেন। আমি জোরে আওয়াজ দিয়া বলিলাম, হে আমীরুল মুমিনীন! হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আপনার সম্পর্ক ও আত্মীয়তার দোহাই! আপনি একটু থামুন। আমার আওয়াজ শুনিয়া তিনি আমার দিকে দেখিলেন। আমি জলদি অগ্রসর হইয়া বলিলাম, একটি পরদেশী ছেলের এই আমানত আমার নিকট রহিয়াছে। সে আমাকে এই ওসীয়ত করিয়াছিল যে, এই দুইটি জিনিস যেন আপনার নিকট পৌছাইয়া দেই।

বাদশাহ এইগুলিকে দেখিয়া (চিনিয়া ফেলিলেন।) কিছু সময় মাথা নিচু করিয়া রহিলেন। তাহার চোখ হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইল। তিনি একজন দারোয়ানকে বলিলেন, এই লোকটিকে তোমার সাথে রাখ। যখন আমি ফিরিয়া আসিয়া ডাকিব, তখন আমার নিকট পৌছাইয়া দিও। যখন তিনি বাহির হইতে ফিরিয়া মহলে পৌছিলা, তখন মহলের পর্দা টানিয়া

দিয়া দারোয়ানকে বলিলেন, ঐ লোকটিকে ডাকিয়া আন ; যদিও সে আমার মনের ব্যথা তাজা করিবে। দারোয়ান আমার নিকট আসিয়া বলিল, আমীরুল মুমিনীন ডাকিয়াছেন, এই বিষয়ে খেয়াল রাখিও যে, আমীরুল মুমিনীন অত্যন্ত ব্যথিত। তুমি যদি দশটি কথা বলিতে চাও, তবে পাঁচটি বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়া যাইও। এই বলিয়া সে আমাকে আমীরের নিকট লইয়া গেল।

তখন আমীর সম্পূর্ণ একা বসিয়াছিলেন। আমাকে বলিলেন, আমার নিকটে আস। আমি নিকটে যাইয়া বসিলাম। তিনি বলিতে লাগিলেন, তুমি কি আমার ছেলেকে চিন? আমি বলিলাম, জ্বি হাঁ, আমি তাহাকে চিনি। তিনি বলিলেন, সে কি কাজ করিত? আমি বলিলাম, গারা মাটির কাজ করিত। তিনি বলিলেন, তুমিও কি তাহার দ্বারা মজদুরীর কোন কাজ করাইয়াছ? আমি বলিলাম, করাইয়াছি। তিনি বলিলেন, তুমি ইহার প্রতি খেয়াল কর নাই যে, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত তাহার আত্মীয়তার সম্পর্ক রহিয়াছে? (তাহারা হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা হযরত আব্বাস (রাযিঃ)এর আওলাদ ছিলেন।) আমি বলিলাম, হে আমীরুল মুমিনীন! প্রথমে আমি আল্লাহ তাযালার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি, অতঃপর আপনার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি যে, তখন এই ব্যাপারে আমি মোটেও জানিতাম না যে, সে কে। তাহার ইন্তেকালের সময় তাহার অবস্থা আমার জানা হইয়াছে। তিনি বলিলেন, তুমি কি নিজ হাতে তাহাকে গোসল দিয়াছ? আমি বলিলাম, জ্বি হাঁ। তিনি বলিলেন, তোমার হাত দাও। আমার হাত লইয়া তিনি তাহার সিনার উপর রাখিলেন এবং কয়েকটি কবিতা পড়িলেন, যাহার অর্থ এই—

হে ঐ মুসাফির! যাহার জন্য আমার অন্তর বিগলিত হইতেছে আর আমার চক্ষু তাহার জন্য অশ্রু বহাইতেছে। হে ঐ ব্যক্তি! যাহার ঘর (কবর) দূরে রহিয়াছে কিন্তু তাহার ব্যথা আমার নিকটে রহিয়াছে। নিঃসন্দেহে মৃত্যু সর্বোত্তম আনন্দের জীবনকেও বিষন্ন করিয়া দেয়। সেই মুসাফির একটি চাঁদের টুকরা ছিল (অর্থাৎ তাহার চেহারা) যাহা খাঁটি চাঁদির ডালের উপর ছিল (অর্থাৎ তাহার দেহের উপর)। অবশেষে চাঁদের টুকরাটিও কবরে পৌছিয়া গেল এবং চাঁদির ডালাও কবরে পৌছিয়া গেল।

অতঃপর হারুনুর রশীদ বসরায় তাহার কবরের নিকট যাওয়ার ইচ্ছা করিলেন। আবু আমের (রাযিঃ) সঙ্গে ছিলেন। তাহার কবরের পার্শ্বে পৌছিয়া হারুনুর রশীদ কয়েকটি কবিতা পাঠ করিলেন, যাহার অর্থ এই—

হে ঐ মুসাফির! যে তাহার সফর হইতে আর কখনও ফিরিবে না।

মৃত্যু অল্পবয়সেই তাহাকে শীঘ্র ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে। হে আমার চোখের শীতলতা! তুমি আমার মনের সান্ত্বনা এবং অন্তরের শান্তি ছিলে—দীর্ঘ রাত্রগুলিতেও এবং সংক্ষিপ্ত রাত্রগুলিতেও। তুমি মৃত্যুর ঐ পেয়ালা পান করিয়াছ, যাহা অতিসত্ত্বর তোমার বৃদ্ধ পিতা বার্বক্য অবস্থায় পান করিবে। বরং দুনিয়ার প্রতিটি মানুষ উহাকে পান করিবে। চাই সে গ্রামের অধিবাসী হউক কিংবা শহরের অধিবাসী হউক। অতএব, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র লা-শরীক ঐ আল্লাহর, যাহার লিখিত তকদীরেরই এই লীলাখেলা।

আবু আমের (রহঃ) বলেন, উহার পরবর্তী রাত্রিতে আমি আমার ওজিফাসমূহ আদায় করিয়া মাত্র শুইয়াছিলাম; এমন সময় আমি স্বপ্নে দেখিলাম, একটি নূরের গম্বুজ যাহার উপর মেঘের মত নূরই নূর ছড়াইতেছে। নূরের ঐ মেঘমালা হইতে ঐ ছেলেটি আমাকে আওয়াজ দিয়া বলিল, হে আবু আমের! আল্লাহ তায়ালা তোমাকে উত্তম বদলা দান করুন। (তুমি আমার কাফন-দাফনের কাজ সম্পন্ন করিয়াছ এবং আমার ওসিয়তও পূরা করিয়াছ।) আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আমার প্রিয়! তোমার কি অবস্থা হইয়াছে? সে বলিতে লাগিল, আমি এমন মাওলার নিকট পৌছিয়াছি, যিনি অত্যন্ত দয়াশীল। তিনি আমার প্রতি খুবই সন্তুষ্ট, তিনি আমাকে ঐ সমস্ত জিনিস দান করিয়াছেন, যাহা কখনও কোন চক্ষু দেখে নাই, কোন কান শোনে নাই, কোন মানুষের অন্তর উহার কল্পনাও করে নাই। (ইহা একটি প্রসিদ্ধ হাদীসের বিষয়বস্তু, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন এমন জিনিস তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছি, যাহা না কোন চোখ কখনও দেখিয়াছে, না কোন কান শুনিয়াছে, না কাহারো অন্তর উহার কল্পনা করিয়াছে।)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, তওরাত কিতাবে লিখিত আছে, আল্লাহ তায়ালা ঐ সমস্ত লোকদের জন্য যাহাদের পার্শ্বদেশ রাতে বিছানা হইতে দূরে থাকে (অর্থাৎ তাহাজ্জুদ নামায আদায়কারীদের জন্য) ঐ সমস্ত জিনিস তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছেন, যাহা না কোন চোখ দেখিয়াছে, না কোন কান শুনিয়াছে, না কোন মানুষের অন্তর উহার কল্পনা করিয়াছে, না উহাকে কোন নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা জানে, না কোন নবী-রাসূল জানে। আর এই বিষয়বস্তুটি কুরআন পাকেও বর্ণিত হইয়াছে : **فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ** অর্থাৎ, অতএব, কাহারো জানা নাই যে, এইরূপ লোকদের জন্য কত যে

নয়নজুড়ানো আসবাব গায়েবী ভাণ্ডারে মওজুদ রহিয়াছে (সিজদাহ : ১৭)।
(দুররে মানসুর)

অতঃপর সেই ছেলেটি বলিল, আল্লাহ তায়ালা কসম খাইয়া বলিয়াছেন, যে কেহ দুনিয়া হইতে এইভাবে বাহির হইয়া আসিবে যেমন আমি বাহির হইয়া আসিয়াছি, তাহার জন্যও এই ইজ্জত ও সম্মান রহিয়াছে, যাহা আমাকে দেওয়া হইয়াছে।

রওজ কিতাবের লেখক বলেন, এই সম্পূর্ণ ঘটনাটি আমার নিকট অপর একটি সূত্রেও পৌছিয়াছে। উহাতে এই কথাও রহিয়াছে যে, কোন এক ব্যক্তি হাকনুর রশীদকে তাহার ঐ ছেলে সম্পর্কে প্রশ্ন করিল। তখন তিনি বলিলেন, আমি বাদশাহ হওয়ার পূর্বে এই ছেলের জন্ম হইয়াছিল। অনেক উত্তমরূপে তাহার প্রতিপালন হইয়াছে। কুরআন শরীফও পড়িয়াছে এবং বিভিন্ন এলিমও শিখিয়াছে। যখন আমি বাদশাহ হইয়া গেলাম, তখন সে আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। আমার দুনিয়া দ্বারা সে কোন সুখ ভোগ করে নাই। বিদায়ের সময় আমিই তাহার মা'কে বলিয়াছিলাম, যেন এই আংটিটি দিয়া দেয়। এই আংটির মধ্যে যে ইয়াকুত পাথর রহিয়াছে উহা অনেক মূল্যবান ছিল। কিন্তু সে ইহাকেও কাজে লাগায় নাই। মৃত্যুর সময় ফেরত দিয়া গেল। এই ছেলে তাহার মায়ের খুবই অনুগত ছিল। (রওজ)

যেই পিতার দুনিয়াদারীতে এই ছেলে মনক্ষুন্ন হইয়া চলিয়া গিয়াছিল, সেই হাকনুর রশীদ পুণ্যবান বাদশাহদের মধ্যে ছিলেন। সম্পদ ও প্রাচুর্যের মধ্যে পদস্খলন তো হইয়াই যায় ; কিন্তু তাহার দ্বীনী কীর্তিসমূহ ইতিহাসে বহুল পরিমাণে মওজুদ রহিয়াছে। বাদশাহী যুগেও তিনি মৃত্যু পর্যন্ত দৈনিক একশত রাকাত নফল নামায পড়িতেন। নিজস্ব সম্পদ হইতে দৈনিক এক হাজার দেহরাম দান করিতেন। এক বৎসর হজ্জ করিতেন, আর এক বৎসর জিহাদে শরীক হইতেন। যেই বৎসর নিজে হজ্জ যাইতেন, তাহার সঙ্গে একশত উলামায়ে কেরামকে তাহাদের পুত্রদের সহ হজ্জ লইয়া যাইতেন। আর যে বৎসর হজ্জ করিতেন না, সেই বৎসর তিন শত লোককে তাহাদের পূর্ণ খরচ এবং পোশাক, সরঞ্জাম ইত্যাদি সহকারে হজ্জ পাঠাইতেন। তাহাদিগকে অত্যন্ত প্রশস্ততার সহিত খরচ দিতেন এবং উন্নতমানের পোশাকও দিতেন। ইহা ছাড়াও প্রচুর পরিমাণে দান-খয়রাত করিতে থাকিতেন। যাহারা চাহিত তাহাদিগকেও দিতেন, যাহারা চাহিত না তাহাদিগকেও দিতেন। তাহার মজলিসে উলামায়ে কেরামের খুবই সম্মান ছিল। উলামায়ে কেরামকে তিনি অত্যন্ত মহব্বত করিতেন। আবু

মুয়াবিয়া জারীর (রহঃ) বিখ্যাত অন্ধ মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি একবার বাদশাহর সহিত খানা খাইলেন। খাওয়ার পর হারুনুর রশীদ স্বয়ং তাহার হাত ধোয়াইলেন এবং বলিলেন, এলেমের সম্মানে আমি হাত ধোওয়াইয়াছি।

একবার আবু মুয়াবিয়া (রহঃ) হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐ হাদীস বর্ণনা করিলেন, যাহার মধ্যে হযরত আদম ও হযরত মুসা (আঃ)এর বিতর্কের বর্ণনা ছিল। ইহা শুনিয়া এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, এই দুইজনের সাক্ষাৎ কোথায় হইল? ইহা শুনিয়া বাদশাহ রাগান্বিত হইয়া গেলেন এবং বলিলেন, আমার তলোয়ার আন, এই বদদ্বীন ও নাস্তিক হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের উপর প্রশ্ন করিতেছে। তিনি উপদেশমূলক কথা শুনিয়া অনেক বেশী কাঁদিতেন।

(তারীখে বাগদাদ ৪ খতীব)

(৬০) একবার হারুনুর রশীদ হজ্জে যাইতেছিলেন। পথে কুফা নগরীতে কয়েকদিন অবস্থান করিলেন। যখন সেখান হইতে রওয়ানা হওয়ার সময় হইল, তখন বাদশাহের সওয়ারী দেখিবার আগ্রহে শহরের বাহিরে অনেক লোক জমা হইয়া গেল। বাহলুল মজনুনও আসিয়া হাজির হইলেন এবং পথে একটি আবর্জনার স্তুপের উপর বসিয়া গেলেন। ছেলেপেলের দল সবসময় তাহাকে বিরক্ত করিত, ঢিল মারিত, হাসি-ঠাট্টা করিত। উহারা রীতিমত তাহার চতুর্দিকে জমা হইয়া গেল। বাদশাহর সওয়ারী যখন নিকটে আসিল, তখন ছেলেপেলেরা এদিক-সেদিক চলিয়া গেল। তিনি জোরে আওয়াজ দিয়া বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! হে আমীরুল মুমিনীন! ইহা শুনিয়া হারুনুর রশীদ সওয়ারীর পর্দা উঠাইলেন এবং বলিলেন, লাব্বাইক ইয়া বাহলুল! লাব্বাইক ইয়া বাহলুল! অর্থাৎ হে বাহলুল! আমি হাজির, হে বাহলুল! আমি হাজির। বল তুমি কি বলিবে। তিনি বলিলেন, আমার নিকট আয়মান (রহঃ) এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত কুদামা (রাযিঃ) বলেন, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হজ্জে তশরীফ লইয়া যাইতেছিলেন, তখন আমি মিনাতে তাহাকে একটি উটের উপর সওয়ার দেখিলাম। যাহার উপর সাধারণ হাওদা (উটের উপর বসিবার আসন) ছিল। না লোকদেরকে সম্মুখ হইতে সরানো হইতেছিল, না হটিয়া যাও, সরিয়া যাও-এর কোন শোরগোল ছিল। হে আমীরুল মুমিনীন! তোমারও এই সফরে বিনয়ের সহিত চলা অহংকারের সহিত চলা হইতে উত্তম। হারুনুর রশীদ ইহা শুনিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অতঃপর বলিলেন, হে বাহলুল! আরও কিছু

নসীহত কর। আল্লাহ তায়ালা তোমার উপর রহম করুন। বাহলুল ইহা শুনিয়া দুইটি কবিতা পাঠ করিলেন, যাহার অর্থ এই—

মনে কর, তুমি সারা দুনিয়ার বাদশাহ হইয়া গিয়াছ এবং সারা দুনিয়ার মখলুক তোমার অনুগত হইয়া গিয়াছে। তাহাতে কি হইয়াছে? আগামীকাল তো অবশ্যই তোমার ঠিকানা কবরের গর্ত হইবে। কেহ এদিক হইতে মাটি ফেলিতে থাকিবে, আর কেহ ওইদিক হইতে মাটি ফেলিতে থাকিবে। ইহা শুনিয়া হারুনুর রশীদ পুনরায় অনেক কাঁদিলেন এবং বলিলেন, হে বাহলুল! তুমি অনেক ভাল কথা বলিয়াছ। আরও কিছু বল, বাহলুল বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! যাহাকে আল্লাহ তায়ালা মাল ও সৌন্দর্য দান করেন এবং সে নিজের মালকে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে এবং নিজের সৌন্দর্যকে গুনাহ হইতে হেফাজতে রাখে, তাহাকে আল্লাহ তায়ালা দপ্তরে নেক লোকদের মধ্যে লেখা হয়। হারুনুর রশীদ বলিলেন, তুমি অনেক ভাল কথা বলিয়াছ। ইহার পুরস্কার পাওয়া উচিত। বাহলুল বলিলেন, পুরস্কারের অর্থ ঐসব লোকদিগকে ফেরত দাও, যাহাদের নিকট হইতে (ট্যাক্স ইত্যাদি বাবদ) লইয়া রাখিয়াছ। তোমার পুরস্কারের আমার প্রয়োজন নাই। হারুনুর রশীদ বলিলেন, যদি তোমার জিস্মায় কাহারও করজ থাকে, তবে আমি উহা আদায় করিয়া দিব। বাহলুল বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! করজ দ্বারা করজ আদায় করা যায় না (অর্থাৎ এই অর্থ যাহা তোমার নিকট আছে; ইহা অন্যের হক যাহা তোমার জিস্মায় তাহাদের পাওনা হিসাবে রহিয়াছে) হকদারদের হক ফেরত দাও। প্রথমে নিজের করজ আদায় কর, তারপর অন্যের করজের চিন্তা করিও। হারুনুর রশীদ বলিলেন, তোমার জন্য কোন ভাতা ঠিক করিয়া দেই, যাহা দ্বারা তোমার খানাপিনার ব্যবস্থা হইয়া যাইবে। বাহলুল বলিলেন, আমি এবং তুমি উভয়ই আল্লাহ তায়ালা বান্দা। ইহা অসম্ভব যে, তিনি তোমার বিষিকের তো চিন্তা করিবেন আর আমার বিষিকের চিন্তা করিবেন না। ইহার পর হারুনুর রশীদ সওয়ারীর পর্দা নামাইলেন এবং সম্মুখে অগ্রসর হইলেন। (রওজ)

বাদশাহ হারুনুর রশীদ সম্পর্কে প্রসিদ্ধ আছে যে, নসীহতের কথা শুনিয়া তিনি অনেক বেশী কাঁদিতেন। একবার হজ্জ যাইতেছিলেন। সাদুন মজনুন সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কয়েকটি কবিতা পাঠ করিলেন। যাহার অর্থ এই—

মনে কর, তুমি সারা দুনিয়ার বাদশাহ হইয়া গিয়াছ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি তোমার মৃত্যু আসিবে না? দুনিয়াকে তোমার দূশমনদের জন্য ছাড়িয়া

দাও। যে দুনিয়া আজ তোমাকে খুব হাসাইতেছে, কাল সে তোমাকে অনেক বেশী কাঁদাইবে।

এই কবিতাগুলি শুনিয়া হারুনুর রশীদ চিৎকার দিয়া বেইশ হইয়া পড়িয়া গেলেন এবং এত দীর্ঘ সময় বেইশ থাকিলেন যে, তাহার তিন ওয়াস্ত নামায কাযা হইয়া গেল। (রওজ)

বাদশাহ হারুনুর রশীদের আংটিতে এই মোহর খোদাইকৃত ছিল :
الْعُظْمَةُ وَالْقُدْرَةُ لِلَّهِ অর্থাৎ, সর্বপ্রকার বড়ত্ব ও সর্বপ্রকার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই জন্য। এই বিষয়টি যেন সর্বদাই তাহার দৃষ্টির সম্মুখে থাকিত।

(৬১) হযরত মালেক ইবনে দীনার (রহঃ) বলেন, আমি একবার বসরার জঙ্গল দিয়া যাইতেছিলাম। সেখানে হযরত সাদুনকে দেখিলাম। যিনি সাদুন মজনুন নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি অবস্থা? তিনি বলিতে লাগিলেন, এমন ব্যক্তির অবস্থা কি জিজ্ঞাসা করিতেছ? যে সকাল-সন্ধ্যা সবসময় একটি দীর্ঘ সফরের জন্য তৈয়ার হইয়া বসিয়া রহিয়াছে। সফরের জন্য কোন প্রকার সম্বল তাহার সঙ্গে নাই। সফরের কোন সামান বা সওয়ারী ইত্যাদি তাহার নিকট নাই। এমন মাগুলার নিকট তাহাকে যাইতে হইবে, যিনি অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ও বড় দয়ালু। তিনি তখন মানুষের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দিবে। এই বলিয়া তিনি অনেক বেশী কাঁদিতে লাগিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কাঁদিবার কি আছে? তিনি বলিতে লাগিলেন, আমি দুনিয়ার বিচ্ছেদের জন্য কাঁদিতেছি না আর না মৃত্যুর ভয়ে কাঁদিতেছি, বরং আমার জীবনের ঐ দিনগুলির উপর কাঁদিতেছি, যাহা কোন নেক আমল ব্যতীত কাটিয়া গিয়াছে। আল্লাহর কসম, সফরে সামানের স্বল্পতা আমাকে কাঁদাইতেছে। সফর অনেক দীর্ঘ এবং বড় কষ্টের। এই সফরে অনেক ঘাঁটি সম্মুখে আসিবে। অথচ আমার নিকট সফরের কোন সামান মওজুদ নাই। এই সফরের সমস্ত মুসীবত সহ্য করিবার পরও ইহা জানা নাই যে, জাহাযে যাইব না জাহাজে নিষ্কিন্তু হইব। আমি তাহার এই হেঁকমতপূর্ণ কথা শুনিয়া বলিলাম, লোকেরা আপনাকে পাগল বলে অথচ আপনি তো অনেক ভাল কথা বলেন। তিনি বলিলেন, তুমিও দুনিয়াদার লোকদের কথায় ধোঁকায় পড়িয়া গিয়াছ। আমি পাগল নই, আমার মনিবের মহব্বত আমার অন্তরে আমার কলিজায় আমার গোশত ও চামড়ায় এবং আমার হাড়ে ঢুকিয়া গিয়াছে। তাহার মহব্বতে আমি হযরান ও পেরেশান

থাকি। (এই কারণে দুনিয়ার পাগলরা আমাকে পাগল বলে।) আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কেন মানুষের নিকট হইতে পলায়ন করেন? (জঙ্গলে পড়িয়া থাকেন) ইহা শুনিয়া তিনি দুইটি কবিতা পাঠ করিলেন যাহার অর্থ এই—

মানুষের নিকট হইতে সর্বদা দূরে থাক এবং সবসময় আল্লাহ তায়ালার সান্নিধ্য অবলম্বন কর। যখনই যেইভাবে তোমার মনে চায় মানুষকে পরীক্ষা করিয়া দেখ। তুমি সর্বাবস্থায় তাহাদিগকে বিচ্ছুর ন্যায় দেখিতে পাইবে। কেননা, কষ্ট দেওয়া ছাড়া তাহাদের আর কোন কাজ নাই। (রওজ)

(৬২) চিশতিয়া খান্দানের বিখ্যাত বুয়ুর্গ হযরত আবদুল ওয়াহেদ ইবনে য়ায়েদ (রহঃ) বলেন, আমি একাধারে তিন রাত্রি অনবরত এই দোয়া পড়িতে থাকিলাম—হে আল্লাহ! জান্নাতে আমার সাথী যে হইবে, তাহার সহিত দুনিয়াতেই আমার সাক্ষাৎ করাইয়া দাও। তিনদিন পর আমাকে বলা হইল, তোমার সাথী মাইমুনা সাওদা হইবে। (তিনি একজন হাবশী মহিলা ছিলেন। এত কালো ছিলেন যে, তাহার উপাধিই সাওদা (কৃষ্ণবর্ণ) হইয়া গিয়াছিল।) আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহাকে কোথায় পাওয়া যাইবে? আমাকে বলা হইল, কুফার অমুক গোত্রের মধ্যে আছে। আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য রওয়ানা হইয়া গেলাম। কুফায় পৌঁছিয়া আমি তাহার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলাম। আমাকে বলা হইল, তিনি বকরি চরাইবার কাজ করেন, অমুক জঙ্গলে আছেন। আমি সেই জঙ্গলে পৌঁছিলাম। তিনি একটি মোটা তালিযুক্ত কাপড় পরিয়া নামায পড়িতেছিলেন। তাহার নিকটেই বকরি ও বাঘ একত্রে চরিতেছিল। যখন আমি পৌঁছিলাম, তখন তিনি তাহার নামায সংক্ষিপ্ত করিয়া সালাম ফিরাইলেন। সালাম ফিরাইয়া বলিতে লাগিলেন, হে আবদুল ওয়াহেদ! আজ নয়, আজ তুমি চলিয়া যাও। সাক্ষাতের ওয়াদা আগামীকাল (কিয়ামতের দিবসে) রহিল। আমি তাহাকে বলিলাম, আল্লাহ তায়ালার আপনার প্রতি দয়া করুন। আপনি কিভাবে জানিতে পারিলেন যে, আমি আবদুল ওয়াহেদ। তিনি বলিতে লাগিলেন, তুমি কি জাননা যে, রূহসমূহ (রূহজগতে) একটি বাহিনীর মত একত্রিত ছিল, সেখানে যাহাদের পরস্পর পরিচয় হইয়া গিয়াছে তাহারা দুনিয়াতেও পরস্পর পরিচিত হইয়া যায়। (ইহা বিখ্যাত একটি হাদীসের বিষয়বস্তু) আমি তাহাকে বলিলাম, আমাকে কোন নসীহত করুন। তিনি বলিতে লাগিলেন, বড় আশ্চর্যের বিষয়, যে

ব্যক্তি নিজে ওয়াজ করিয়া বেড়ায় সে অন্যের নিকট নসীহতের আবেদন করে (তুমি তো নিজেই বড় ওয়ায়েজ)। অতঃপর তিনি বলিলেন, বুয়ুর্গদের নিকট হইতে আমার নিকট এই কথা পৌঁছিয়াছে যে, যেই বান্দাকে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার কোন নেয়ামত (ধন-সম্পদ ইত্যাদি) দান করেন তারপরও সে উহারই তালাশে লাগিয়া থাকে, তখন আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তির সহিত নিজের নির্জনে মহব্বতের সম্পর্ককে ছিন্ন করিয়া দেন এবং নিজের সহিত নৈকট্যের পরিবর্তে দূরত্ব সৃষ্টি করিয়া দেন আর নিজের সঙ্গে আপনত্ব দূর করিয়া পরভাব সৃষ্টি করিয়া দেন। ইহা বলিয়া তিনি পাঁচটি কবিতা পাঠ করিলেন, যাহার অর্থ এই—

হে ওয়াজকারী! তুমি লোকদেরকে ওয়াজ-নসীহত এবং সতর্ক করিবার জন্য যখন দাঁড়াও, তখন তুমি লোকদেরকে গুনাহ হইতে নিষেধ কর। অথচ তুমি নিজে ঐ সমস্ত গুনাহের রোগে আক্রান্ত ও উহার মধ্যে লিপ্ত রহিয়াছ। যদি তুমি অন্যদেরকে নসীহত করার পূর্বে নিজের সংশোধন করিয়া লইতে এবং নিজের গুনাহসমূহ হইতে তওবা করিয়া লইতে, তবে তোমার কথার প্রভাব তাহাদের দিলের উপর পড়িত। কিন্তু যখন তুমি এইরূপ অবস্থায় অন্যদেরকে নিষেধ কর যে, তুমি স্বয়ং উহাতে লিপ্ত রহিয়াছ, তখন তুমি এই নিষেধ করার ব্যাপারে নিজেই সন্দেহের মধ্যে রহিয়াছ। (আর কোন বিষয়ে যখন কাহারও নিজের সংশয় থাকে, তখন অন্যকে জোর দিয়া বলিতে পারে না) আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার বকরিগুলি বাঘের সহিত চরিতেছে, বাঘ উহাদের কোন ক্ষতি করিতেছে না; ইহার কারণ কি? তিনি বলিতে লাগিলেন, তুমি যাও; নিজের কাজ কর। আমি আমার সর্দারের সঙ্গে সন্ধি করিয়া লইয়াছি। তিনি আমার বকরি এবং বাঘের মধ্যে সন্ধি করিয়া দিয়াছেন। (রওজ)

আমি আমার চাচাজান মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস (রহঃ)এর সেখানে সবসময় দেখিয়াছি যে, তাহার ঘরে কয়েকটি বিড়াল এবং মুরগী সারাদিন একত্রে চলাফেরা করিতে থাকিত। পড়িয়া থাকা খাদ্যদ্রব্য খাইতে থাকিত। না মুরগী বিড়ালকে ভয় করিত আর না বিড়াল মুরগীর উপর কোন হামলা করিত।

৬৩ হযরত উতবা গোলাম (রহঃ) বলেন, আমি বসরার জঙ্গল দিয়া যাইতেছিলাম। আমি জঙ্গলের অধিবাসীদের কয়েকটি তাঁবু দেখিলাম। সেখানে তাহাদের ক্ষেত-খামার ছিল। একটি তাঁবুতে এক পাগলিনী ছিল। আমি তাহাকে সালাম করিলাম। সে আমার সালামের জওয়াব দিল না।

(সম্ভবতঃ সালাম শোনে নাই অথবা সালামদাতা জওয়াব শোনে নাই অথবা এমন কোন অবস্থা হইয়ায় ছিল যখন সালামের জওয়াব দেওয়া জরুরী নয়। কেননা, অনেক ক্ষেত্রে সালামের জওয়াব দিতে হয় না।) সে কয়েকটি কবিতা পড়িল, যাহার অর্থ এই—দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত ও এবাদতগুজার লোকেরা সফলকাম হইয়া গিয়াছে, যাহারা আপন মাওলার সন্তুষ্টির জন্য তাহাদের পেটকে ক্ষুধার্ত রাখিয়াছে। তাহারা রাত্রিতে নিভেদের চক্ষুকে জাগ্রত রাখিয়াছে, তাহাদের সারারাত্রি মুশাহাদা (আল্লাহ তায়ালার নূর পরিদর্শন করাকে সুফীদের পরিভাষায় 'মুশাহাদা' বলে) অবস্থায় কাটিয়া যায়। তাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালার মহব্বত এমন অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে যে, দুনিয়াদার লোকেরা তাহাদিগকে পাগল মনে করে অথচ তাহারাই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান লোক। কিন্তু তাহাদের অবস্থা তাহাদিগকে অস্থির করিয়া রাখিয়াছে।

উতবা (রহঃ) বলেন, আমি সেই পাগলিনীর নিকটে গেলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম, এই খেতখামার কাহার? সে বলিতে লাগিল, যদি নিরাপদ থাকে, তবে আমার। অতঃপর আমি ঘুরিয়া ফিরিয়া অন্যান্য তাঁবু দেখিতেছিলাম। এমন সময় ভীষণ বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া গেল। আসমান হইতে এমন মুঘলধারে পানি বর্ষিত হইল যেন কলসের মুখ খুলিয়া গিয়াছে। আমি চিন্তা করিলাম, দেখি ঐ পাগলিনী এই বৃষ্টি সম্পর্কে কি বলে (কেননা, ইহাতে সমস্ত খেত-খামার বরবাদ হইয়া গিয়াছে)। আমি যাইয়া দেখিলাম, তাহার খেত-খামার পানিতে একেবারে ডুবিয়া গিয়াছে আর সে দাঁড়াইয়া বলিতেছে—ঐ পবিত্র যাতের কসম! যিনি তাহার খাঁটি মহব্বতের কিছু অংশ আমার অন্তরে দিয়া রাখিয়াছেন। আমার দিল তোমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকিবার ব্যাপারে অত্যন্ত মজবুত। অতঃপর সে আমার দিকে ফিরিয়া বলিতে লাগিল, দেখ, তিনিই তো এই খেত-খামার জমাইয়াছেন। তিনিই বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন করিয়াছেন, তিনিই ইহাকে সোজা দাঁড় করাইয়াছেন, তিনিই উহার মধ্যে শীষ লাগাইয়াছেন, তিনিই এইসব শীষের মধ্যে শস্য পয়দা করিয়াছেন, তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া ইহাকে লালন-পালন করিয়াছেন, তিনিই ইহাকে ধ্বংস হইতে হেফাজত করিয়াছেন, আর যখন উহা কাটিবার সময় একেবারে নিকটবর্তী হইয়া গেল, তখন তিনিই উহাকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর সে আসমানের দিকে মুখ করিয়া বলিল, এই সমগ্র মাখলুক তোমারই বান্দা। আর তাহাদের সকলের রিযিক তোমারই যিম্মায়, তুমি যাহা চাও কর, ইহা তোমার ক্ষমতায় রহিয়াছে।

আমি তাহাকে বলিলাম, এই সব ফসল ধ্বংস হইয়া যাওয়ার পরও তুমি কিভাবে সবার করিলে? সে বলিতে লাগিল, হে উতবা! চুপ থাক। আমার মালিক অত্যন্ত বেপরওয়া, অত্যন্ত প্রশংসার যোগ্য, তাহার পক্ষ হইতে সর্বদা নতুন রিথিক পাওয়া যায়। সমস্ত প্রশংসা ঐ পবিত্র সত্তার জন্য, যিনি আমার সহিত আমার চাহিদা হইতে অনেক বেশী অনুগ্রহ করিতেছেন। উতবা বলেন, যখনই তাহার অবস্থা ও তাহার কথা আমার স্মরণ হয়, তখনই আমার খুব কান্না আসে। (৪৩)

(৬৪) হযরত আবু রাবী (রহঃ) বলেন, আমি একটি গ্রামে একজন মেয়েলোকের সুখ্যাতি শুনিয়াছিলাম, যাহার নাম ফিজ্জা ছিল। আমার কোন মহিলার সহিত সাক্ষাত করার অভ্যাস ছিল না। কিন্তু আমি তাহার এমন অবস্থা শুনিয়াছি যে, আমার তাহার নিকট যাওয়ার ইচ্ছা হইল। আমি ঐ গ্রামে গেলাম এবং তাহার খোঁজ করিলাম। লোকেরা আমাকে বলিল, তাহার নিকট একটি বকরি আছে, উহার স্তন হইতে দুধ ও মধু উভয়টি বাহির হয়। আমি ইহা শুনিয়া আশ্চর্য হইলাম। আমি একটি নূতন পেয়ালা খরিদ করিলাম এবং তাহার ঘরে যাইয়া বলিলাম, তোমার বকরি সম্পর্কে আমি এই সুখ্যাতি শুনিয়াছি যে, উহা দুধ এবং মধু দেয়। আমিও উহার বরকত দেখিতে চাই। সে ঐ বকরীটি আমার হাওয়ালা করিয়া দিল। আমি উহা দোহন করিলাম। বাস্তবিকই উহা হইতে দুধ ও মধু বাহির হইল। আমি উহা পান করিলাম অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এই বকরিটি তোমার নিকট কোথা হইতে আসিয়াছে? সে বলিতে লাগিল, ইহার ঘটনা এই যে, আমরা গরীব মানুষ। একটি বকরি ছাড়া আমাদের নিকট কিছু ছিল না। উহা দ্বারাই আমাদের জীবন-যাপন হইতেছিল। ঘটনাক্রমে কুরবানী ঈদ আসিয়া গেল। আমার স্বামী বলিলেন, আমাদের নিকট আর তো কিছু নাই, এই বকরিটিই আমাদের নিকট আছে। চল উহা দ্বারাই কুরবানী করিয়া লই। আমি বলিলাম, আমাদের জীবন যাপনের জন্য ইহা কতীত আর তো কোন জিনিস নাই। এইরূপ অবস্থায় কুরবানীর হুকুম তো নাই। সুতরাং কুরবানী করা কি জরুরী? স্বামী এই কথা মানিয়া লইলেন এবং কুরবানী মূলতবী করিয়া দিলেন। ইহার পর ঐদিনই হঠাৎ আমাদের এখানে একজন মেহমান আসিয়া গেল। তখন আমি স্বামীকে বলিলাম, মেহমানের সম্মান করার তো হুকুম রহিয়াছে। এদিকে অন্য কোন জিনিসও নাই, এই বকরিটিকেই জবাই করিয়া ফেলুন। তিনি বকরিটিকে জবাই করিতে লাগিলেন। আমার খেয়াল হইল, আমার ছোট

ছোট বাচ্চারা এই বকরিটিকে জবাই হইতেছে দেখিয়া কান্নাকাটি শুরু করিয়া দিবে। এইজন্য আমি বলিলাম, বাহিরে নিয়া দেওয়ালের আড়ালে জবাই করুন, বাচ্চারা যাহাতে দেখিতে না পায়। তিনি বাহিরে লইয়া গেলেন। যখন উহার উপর ছুরি চালাইলেন, তখন এই বকরি আমাদের দেওয়ালের উপর দাঁড়ান ছিল এবং সেখান হইতে নিজেই নামিয়া বাড়ীর বারান্দায় আসিয়া গেল। আমি মনে করিলাম, হয়ত সেই বকরিটি স্বামীর হাত হইতে ছুটিয়া গিয়াছে। আমি তাহাকে দেখিতে বাহিরে গেলাম। তখন স্বামী বকরিটির চামড়া ছিলিতেছিলেন। আমি তাহাকে বলিলাম, বড় আশ্চর্যের কথা, ঠিক এই রকমই একটি বকরি ঘরে আসিয়া গিয়াছে। আমি উহার ঘটনা শুনাইলাম। স্বামী বলিতে লাগিলেন, অসম্ভব কি হয়ত আল্লাহ তায়ালা ইহার পরিবর্তে আমাদেরকে দান করিয়াছেন। ইহাই সেই বকরী যাহা দুধ এবং মধু দেয়, এই সবকিছু কেবল মেহমানের সম্মানের কারণে হইয়াছে। অতঃপর সেই মেয়েলোকটি বলিতে লাগিল, হে আমার বাচ্চারা! এই বকরী অন্তরের মধ্যে বিচরণ করে, যদি তোমাদের দিল নেক থাকে তবে ইহার দুধও ভাল থাকিবে আর যদি তোমাদের দিলের মধ্যে খারাবী আসিয়া যায় তবে ইহার দুধও নষ্ট হইয়া যাইবে। তোমরা নিজেদের দিলকে ভাল রাখ, সব জিনিস তোমাদের জন্য ভাল হইয়া যাইবে। (রওজ)

(৬৫) হযরত বাহনুল (রহঃ) বলেন, আমি একবার বসরার কোন এক সড়ক দিয়া যাইতেছিলাম। পথে কয়েকটি ছেলে আখরোট ও বাদাম দ্বারা খেলিতেছিল। তাহাদের নিকটে আর একটি ছেলে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছিল। আমার ধারণা হইল, এই ছেলেটির কাছে বাদাম ও আখরোট নাই, এইজন্য কাঁদিতেছে। আমি তাহাকে বলিলাম, বেটা! আমি তোমাকে আখরোট, বাদাম খরিদ করিয়া দিব; তুমিও তাহাদের সহিত খেলিবে। সে আমার প্রতি দেখিয়া বলিল, আরে বেওকুফ, আমরা কি খেল-তামাশার জন্য পয়দা হইয়াছি? আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তবে কি কাজের জন্য পয়দা হইয়াছ? সে বলিতে লাগিল, এলেম হাসিল করিবার জন্য এবং এবাদত করিবার জন্য। আমি বলিলাম, আল্লাহ তায়ালা তোমার হায়াতে বরকত দান করুন। তুমি এই কথা কোথা হইতে জানিলে? সে বলিল, আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিতেছেন : **أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا** الآية অর্থাৎ, তোমরা কি এই ধারণা করিয়া লইয়াছ যে, আমি তোমাদিগকে অনর্থক পয়দা করিয়াছি আর এই যে, তোমাদিগকে আমার নিকট ফিরাইয়া আনা হইবে না। আমি বলিলাম, বেটা তোমাকে তো বড়

বুদ্ধিমান মনে হইতেছ। আমাকে কিছু নসীহত কর। সে চারটি কবিতা পড়িল যাহার অর্থ এই—

আমি দেখিতেছি, দুনিয়া সবসময় চলমান অবস্থায় রহিয়াছে (আজ একজন গেল কাল আর একজন গেল) সর্বদা চলার জন্য পা ও গোছার উপর কাপড় উঠাইয়া রহিয়াছে (যেমন দৌড়াইবার জন্য প্রস্তুত হয়)। না কোন জীবিতের জন্য দুনিয়া বাকী থাকে, আর না কোন জীবিত দুনিয়ার জন্য বাকী থাকে। মনে হয়, যেন মৃত্যু এবং আকস্মিক দুর্ঘটনা দুইটি ঘোড়া যাহা মানুষের দিকে দ্রুত দৌড়াইয়া আসিতেছে। অতএব, হে বেওকুফ! যে দুনিয়াকে লইয়া ধোকার মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছ, একটু চিন্তা কর এবং দুনিয়া হইতে নিজের জন্য (আখেরাতে কাজে আসে এমন) কোন উপযুক্ত জিনিস লইয়া লও। এই কবিতা পড়িয়া ছেলেটি আসমানের দিকে মুখ করিয়া দুই হাত উঠাইল। আর অশ্রুধারা তাহার গালের উপর প্রবাহিত হইতেছিল। তারপর সে আরও দুইটি কবিতা পড়িল—

يَا مَنْ إِلَهِي الْمَبْتَلُ يَا مَنْ عَلَيَّ الْمَشْكَلُ
يَا مَنْ إِذَا مَا أَمِلْتُ تَرْجُوهُ لَمْ يَخْطِ الْأَمَلُ

অর্থাৎ, হে ঐ পাকযাত! একমাত্র যাহার প্রতি মিনতি ও বিনয় প্রকাশ করা হয়, আর তাহারই উপর ভরসা করা হয়। হে পাকযাত! যখন কোন ব্যক্তি তাহার নিকট আশা করে, তখন সে নিরাশ হইতে পারে না। তাহার আশা অবশ্যই পূরা হয়।

এই কবিতা পড়িয়া সে বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া গেল। আমি তাড়াতাড়ি তাহার মাথা উঠাইয়া আমার কোলে রাখিলাম এবং জামার আস্তিন দ্বারা তাহার মুখের মাটি ইত্যাদি মুছিতে লাগিলাম। যখন তাহার হুঁশ হইল তখন আমি বলিলাম, বেটা! এখন হইতেই তোমার কেন এত ভয় হইল? তুমি তো এখনও অনেক ছোট। এখন তো তোমার আমলনামায় কোন গুনাহ লেখা হইবে না। সে বলিল, হে বাহলুল! সরিয়া যাও। আমি সবসময় আমার মা'কে দেখিয়াছি তিনি যখন আগুন জ্বলাইতে আরম্ভ করেন, তখন প্রথমে ছোট ছোট লাকড়ির টুকরা চুলায় রাখেন তারপর বড় বড় লাকড়ি রাখেন, আমার ভয় হয়—জাহান্নামের আগুনে ছোট ছোট লাকড়ির স্থলে নাজানি আমাকে রাখিয়া দেওয়া হয়। আমি বলিলাম, বেটা! তুমি বড় বুদ্ধিমান মনে হইতেছ। আমাকে সংক্ষিপ্ত কোন নসীহত কর। তখন সে চৌদ্দটি কবিতা পড়িল, যাহার অর্থ এই—

আমি গাফলতির মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছি আর মৃত্যুর পরিচালক আমার

পিছনে পিছনে মৃত্যুকে হাঁকাইয়া লইয়া আসিতেছে। আজ যদি আমি না-ও যাই, তবে কাল অবশ্যই চলিয়া যাইব। আমি আমার শরীরকে ভাল ভাল এবং নরম নরম পোশাক দ্বারা সজ্জিত করিয়াছি। অথচ আমার শরীরের জন্য (কবরে যাইয়া) পচিয়া গলিয়া যাওয়া ব্যতীত উপায় নাই। ঐ দৃশ্য যেন এখন আমার সম্মুখে রহিয়াছে যখন আমি কবরে গলিত অবস্থায় পড়িয়া থাকিব। আমার উপর মাটির স্তূপ হইবে এবং নিচে কবরের গর্ত হইবে, আমার এইরূপ সৌন্দর্য সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যাইবে। আর একেবারে শেষ হইয়া যাইবে। এমনকি আমার হাড়ের উপর না গোশত থাকিবে, না চামড়া থাকিবে। আমি দেখিতেছি যে, জীবন তো শেষ হইয়া যাইতেছে আর আশা-আকাঙ্ক্ষাসমূহ অপূর্ণ রহিয়া যাইতেছে। বড় দীর্ঘ সফর সম্মুখে রহিয়াছে আর সামান্যতম সম্বলও সাথে নাই। আমি প্রকাশ্য গুনাহ দ্বারা আমার রক্ষণাবেক্ষণকারীর মুকাবেলা করিয়াছি এবং বড় বড় অন্যায় আচরণ করিয়াছি। যাহা এখন ফিরাইয়া নেওয়া সম্ভব নয়। (অর্থাৎ যে সমস্ত গুনাহ করিয়া ফেলিয়াছি, উহা করি নাই এইরূপ হইতে পারে না।) আমি মানুষের নিকট হইতে গোপন করিবার জন্য পর্দা ফেলিয়া রাখিয়াছি যেন কাহারও সম্মুখে আমার দোষ প্রকাশ না হয়। কিন্তু আমার যত গোপন গুনাহ রহিয়াছে, উহা আগামীকাল সেই মালিকের সম্মুখে প্রকাশ হইয়া যাইবে। (তাহার সম্মুখে পেশ করা হইবে।) ইহাতে সন্দেহ নাই যে, তাহার ভয় আমার অবশ্যই ছিল ; কিন্তু আমি তাহার অপরিসীম ধৈর্যের উপর ভরসা করিতেছিলাম। (যে কারণে দুঃসাহস হইতেছিল।) আর এই ভরসা করিতেছিলাম যে, তিনি বড় ক্ষমাশীল। তিনি ছাড়া আর কে ক্ষমা করিতে পারে? নিঃসন্দেহে সমস্ত প্রশংসা একমাত্র সেই পবিত্র সন্তার জন্যই। যদি মৃত্যু এবং মৃত্যুর পর পচিয়া গলিয়া যাওয়া ব্যতীত আর কোন আপদ না-ও থাকিত এবং আমার রবের পক্ষ হইতে জান্নাতের ওয়াদা এবং দোযখের ধমক না-ও থাকিত, তবুও মৃত্যু এবং পচিয়া গলিয়া যাওয়ার মধ্যেও খেল-তামাশা হইতে বাঁচিয়া থাকার জন্য যথেষ্ট ঈশিয়ारी ছিল। কিন্তু কি করিব, আমাদের বিবেক-বুদ্ধি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে (কোন বিষয় হইতে শিক্ষা গ্রহণ করি না, সুতরাং এখন ইহা ছাড়া কোন উপায় নাই যে,) একমাত্র গুনাহ ক্ষমাকারী আমাকে ক্ষমা করিয়া দিবে। যখন কোন গোলামের দ্বারা কোন ভুল-ভ্রান্তি হইয়া যায়, তখন একমাত্র মনিবই তাহাকে ক্ষমা করেন। নিঃসন্দেহে আমি নিকৃষ্টতম বান্দা। যে তাহার মাওলার অঙ্গীকারে খেয়ানত করিয়াছে। আর অযোগ্য গোলাম এমনি হইয়া থাকে যে, তাহার কোন ওয়াদা-

অঙ্গীকার ধর্তব্য হয় না।

হে আমার মাওলা! যখন তোমার আগুন আমার শরীরকে জ্বলাইবে, তখন আমার কি অবস্থা হইবে? যখন কঠিন পাথরও ঐ আগুনকে সহ্য করিতে পারিবে না! আমি মৃত্যুর সময়ও একাকী যাইব, কবরেও একাকী যাইব, কবর হইতে একাকীই উঠিব (কোথাও আমার কোন সহায় ও সাহায্যকারী হইবে না)। সুতরাং হে ঐ পবিত্র সত্তা! যিনি স্বয়ং একক, যাহার কোন শরীক নাই, এমন ব্যক্তির উপর দয়া করুন, যে সম্পূর্ণ একাকী রহিয়া গিয়াছে।

বাহুলুল বলেন, তাহার এই সমস্ত কবিতা শুনিয়া আমার উপর এমন প্রভাব পড়িল যে, আমি বেইশ হইয়া পড়িয়া গেলাম। দীর্ঘ সময় পর যখন আমার ইঁশ হইল, তখন ছেলেটি চলিয়া গিয়াছিল। আমি ঐ সমস্ত ছেলেদেরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই ছেলেটি কে ছিল? তাহারা বলিল, আপনি কি তাহাকে চিনেন না? এই ছেলে হযরত ইমাম হুসাইন (রাযিঃ)এর বংশধর। আমি বলিলাম, আমি নিজেই এই বিষয়ে আশ্চর্যবোধ করিতেছিলাম যে, ইহা কোন্ বৃক্ষের ফল! বাস্তবিকই এই ফল ঐ বৃক্ষেরই হইতে পারে। আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে এই বংশের বরকত দ্বারা উপকৃত করুন। আমীন। (রওজ)

৬৬ হযরত শিবলী (রহঃ) বলেন, একবার আমার দিল আমাকে বলিল, তুমি কৃপণ। কিন্তু আমার নফস বলিল, না, আমি কৃপণ নই। আমার দিল আবার বলিল, না, তুমি কৃপণ। আমি ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য এই নিয়ত করিলাম যে, আমার নিকট সর্বপ্রথম যাহা কিছু আসিবে (যত পরিমাণই না হউক না কেন) আমি উহা সম্পূর্ণ ঐ ফকীরকে দিয়া দিব, যাহার সঙ্গে আমার সর্বপ্রথম সাক্ষাত হইবে। আমার এই নিয়ত পূরা হইতে না হইতেই এক ব্যক্তি আমাকে পঞ্চাশ দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) হাদিয়া দিল। আমি উহা গ্রহণ করিলাম এবং নিয়ত অনুযায়ী কোন ফকীরের তালাশে বাহির হইলাম। সর্বপ্রথম একজন অন্ধ ফকীরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে এক নাপিতের দ্বারা চুল কাটাইতেছিল। আমি উহা সম্পূর্ণ তাহাকে দিয়া দিলাম। সে বলিল, ইহা (চুল কাটার পারিশ্রমিক স্বরূপ) এই নাপিতকে দিয়া দাও। আমি বলিলাম, এইখানে পঞ্চাশটি স্বর্ণমুদ্রা রহিয়াছে; এতগুলি স্বর্ণমুদ্রা কি কেহ চুল কাটার পারিশ্রমিক হিসাবে দেয়? অন্ধ ব্যক্তি উপরের দিকে মাথা উঠাইয়া বলিল, আমি বলিয়াছিলাম না যে, তুমি কৃপণ। আমি তাড়াতাড়ি উহা নাপিতকে দিয়া দিলাম। নাপিত

বলিল, যখন এই অন্ধ ব্যক্তি চুল কাটাইবার জন্য বসিয়াছিল, আমি তাহার দরিদ্রতা দেখিয়া এই নিয়ত করিয়াছিলাম যে, তাহার নিকট হইতে পারিশ্রমিক লইব না। (তাহাদের উভয়ের কথা শুনিয়া আমি এত লজ্জিত হইলাম যে,) আমি সমস্ত স্বর্ণমুদ্রাগুলিকে নদীতে ফেলিয়া দিলাম; আর মনে মনে বলিলাম যে, খোদা তোকে ধ্বংস করুন, তোর সহিত যে কেহ সামান্য পরিমাণ দিল লাগাইবে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে এইভাবেই অপমান করেন। (রওজ)

অতি মাত্রায় লজ্জিত হইয়া এই ধরনের কাজ সংঘটিত হওয়া নূতন কোন বিষয় নয়। যদি হযরত সুলাইমান (আঃ) (فَطْفِقَ مَسْعًا بِالسُّوقِ) (وَ) (الْأَعْنَابِ) ঘোড়ার পা ও ঘাড় কাটিয়া দিতে পারেন, যদি উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযিঃ) ছ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে অন্য সতীনের পেয়ালা ভাঙিতে পারেন এবং উহার মধ্যস্থ খাদ্য-দ্রব্য ফেলিয়া দিতে পারেন, যদি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযিঃ) কুসুম রংয়ের চাদর শুধু এই কারণে জ্বালাইয়া ফেলিতে পারেন যে, ছ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তুমি ইহা কি পরিধান করিয়া রাখিয়াছ এবং যদি আনসারী সাহাবী ছ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসন্তুষ্টি দেখিয়া তৈরী গম্বুজকে ভাঙিয়া ফেলিতে পারেন, তবে হযরত শিবলী (রহঃ) কর্তৃক স্বর্ণমুদ্রা নদীতে নিক্ষেপ করার মধ্যে কোন প্রশ্ন থাকিতে পারে না।

(৬৭) হযরত যুননুন মিসরী (রহঃ) (যিনি বিখ্যাত সুফীগণের মধ্যে ছিলেন) বলেন, আমি একটি জঙ্ঘল দিয়া যাইতেছিলাম। একজন যুবক ছেলেকে দেখিতে পাইলাম। তাহার মুখমণ্ডলে দাড়ির দুইটি রেখা ছিল (অর্থাৎ সবেমাত্র দাড়ি উঠিতেছিল)। আমাকে দেখিয়া তাহার শরীরে কম্পন আসিয়া গেল, চেহারা হলুদবর্ণ হইয়া গেল এবং সে আমার নিকট হইতে পালাইতে লাগিল। আমি বলিলাম, আমি তো তোমার মতই মানুষ (জিন নই, তবে কেন এত ভয় পাইতেছ এবং পলায়ন করিতেছ)। সে বলিতে লাগিল, তোমাদের (মত মানুষদের) হইতেই তো পলায়ন করিতেছি। আমি তাহার পিছনে পিছনে চলিলাম। তাহাকে কসম দিয়া বলিলাম, একটু দাঁড়াও। সে দাঁড়াইয়া গেল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি এই নির্জন জঙ্ঘলে সম্পূর্ণ একা থাক, তোমার অপর কোন সাথী নাই, ইহাতে কি তোমার ভয় হয় না? সে বলিল, না, আমার সঙ্গে তো আমাকে সাক্ষ্যদানকারী রহিয়াছে। (আমি মনে করিলাম, তাহার কোন সাথী

আছে, হয়ত কোথাও গিয়াছে।) আমি বলিলাম, সে কোথায় গিয়াছে? বলিতে লাগিল, সে সবসময় আমার সাথে আছে। সে আমার ডানে, বামে, সামনে, পিছনে সবদিকে রহিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার নিকট খাওয়া-দাওয়ার কোন সামগ্রীও তো নাই। সে বলিতে লাগিল, তাহাও আছে। আমি বলিলাম, কোথায়? সে বলিল, যিনি আমাকে আমার মায়ের পেটে রিযিক দিয়াছেন, তিনিই আমার বড় হওয়ার পরও রিযিকের জিম্মাদারী লইয়া রাখিয়াছেন। আমি বলিলাম, খাওয়া-দাওয়ার জন্য কিছু তো চাই। কেননা, উহা দ্বারা রাতে তাহাজ্জুদ নামাযে দাঁড়াইবার শক্তি পয়দা হয়, দিনে রোযা রাখিতে সাহায্য হয় এবং (শরীরের শক্তি দ্বারা মাওনার খেদমত (এবাদত)ও উত্তমরূপে হইতে পারে। এইভাবে আমি খাওয়া-দাওয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর অনেক জোর দিলাম। তখন সে কয়েকটি কবিতা পড়িয়া পলায়ন করিল। উহার অর্থ এই—

আল্লাহর ওলীর জন্য কোন ঘরের প্রয়োজন নাই। সে কখনও ইহা সহ্য করে না যে, তাহার কোন সম্পত্তি থাকিবে। সে যখন জঙ্গল হইতে পাহাড়ের দিকে রওয়ানা হয়, তখন ঐ জঙ্গল তাহার বিচ্ছেদের কারণে ক্রন্দন করে, যেখানে সে প্রথমে ছিল। সে রাতে তাহাজ্জুদ পড়া ও দিনে রোযা রাখার ব্যাপারে অনেক বেশী ধৈর্যশীল হয়। সে তাহার নফসকে বুঝাইয়া দেয় যে, যত বেশী পরিশ্রম ও কষ্ট করা সম্ভব করিয়া লও। কেননা, রহমানের খেদমত করিতে লজ্জার কিছু নাই। (বরং উহা বড় গৌরবের বিষয়।) সে যখন আপন প্রতিপালকের সহিত কথাবার্তা বলে, তখন তাহার চক্ষু হইতে অশ্রু প্রবাহিত হয়। আর সে বলে, হে আল্লাহ! আমার দিল উড়িয়া যাইতেছে। (তুমি উহার খবর লও।) সে এইরূপ বলে, হে আল্লাহ! আমার জন্য না (জান্নাতে) ইয়াকুত নির্মিত মহলের প্রয়োজন আছে যাহার মধ্যে ভরগণ থাকিবে, আর না আমার জান্নাতে আদনের বাহেশ রহিয়াছে, না জান্নাতের ফলের আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে। আমার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা একমাত্র তোমার দীদার। এই বিষয়ে তুমি আমার উপর দয়া কর। কেননা, ইহাই বড় গৌরবের বিষয়। (রওজ)

(৬৮) হয়ত ইবরাহীম খাওয়াস (রহঃ) বলেন, আমি একবার জঙ্গল দিয়া যাইতেছিলাম। পথে একজন খৃষ্টান পাদরীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। যাহার কোমরে পৈতা (ফিতা অথবা সুতা ইত্যাদি, যাহা কাফেররা কুফরীর আলামত হিসাবে বাঁধিয়া থাকে) বাঁধা ছিল। সে আমার সহিত থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। (কাফের সাধুদের মুসলমান ফকীরদের খেদমতে

থাকিবার প্রচলন পূর্ব হইতে চালু রহিয়াছে।) আমি তাহাকে সঙ্গে লইয়া লইলাম। সাতদিন পর্যন্ত আমরা চলিতে থাকিলাম (খাওয়া-দাওয়া কিছুই করি নাই)। সপ্তম দিন পাদরী বলিল, হে মুহাম্মদী! কোন গায়েবী সাহায্য দেখাও (কয়েক দিন হইয়া গেল কিছুই খাই নাই)। আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করিলাম, হে আল্লাহ! এই কাফেরের সম্মুখে আমাকে অপমান করিও না। আমি দেখিলাম, তৎক্ষণাৎ একটি খাঞ্চা সম্মুখে রাখা হইল। উহার মধ্যে রুটি, ভুনা গোধত এবং তাজা খেজুর ও পানির লোটা রাখা ছিল। আমরা উভয়ে খাইলাম, পান করিলাম এবং এইভাবে সাতদিন পর্যন্ত চলিতে থাকিলাম। সপ্তম দিন আমি (এই মনে করিয়া যে, পাদরী আবার কিছু না বলিয়া ফেলে) জলদি করিয়া পাদরীকে বলিলাম, এইবার তুমি কিছু দেখাও ; এখন তোমার পালা। সে তাহার লাঠির উপর ভর করিয়া দাঁড়াইয়া গেল এবং দোয়া করিতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ দুইটি খাঞ্চা যাহার মধ্যে প্রত্যেক বস্তু পূর্বের চাইতে দ্বিগুণ ছিল, সম্মুখে আসিয়া গেল। লজ্জায় আমার চেহারা ফ্যাকাশে হইয়া গেল, আর আমি আশ্চর্যান্বিত হইয়া গেলাম। মনের দুঃখে আমি খানা খাইতে অস্বীকার করিলাম। পাদরী খাওয়ার জন্য আমাকে পীড়পীড়ি করিল। কিন্তু আমি অপারগতা প্রকাশ করিতে থাকিলাম। সে বলিল, তুমি খাও ; আমি তোমাকে দুইটি সুসংবাদ শুনাইব। প্রথমটি এই যে, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আল্লা মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। আমি মুসলমান হইয়া গিয়াছি। ইহা বলিয়া সে পৈতা ছিড়িয়া ফেলিয়া দিল। আর দ্বিতীয় সুসংবাদ এই যে, আমি খাবারের জন্য যে দোয়া করিয়াছিলাম, উহা এই বলিয়াই করিয়াছিলাম যে, হে আল্লাহ! যদি তোমার নিকট এই মুহাম্মদী লোকটির কোন মর্যাদা থাকে, তবে তাহার ওসীলায় তুমি আমাদেরকে খানা দাও। এইজন্য এই খানা আসিয়াছে। আর এই কারণেই আমি মুসলমান হইয়াছি। অতঃপর আমরা উভয়েই খানা খাইলাম। তারপর সম্মুখে চলিলাম। অবশেষে আমরা মক্কায় পৌছিলাম এবং হজ্জ করিলাম। আর সেই নওমুসলিম মক্কাতেই অবস্থান করিল। সেখানেই তাহার ইন্তেকাল হইল। আল্লাহ তায়ালার তাহাকে মাফ করিয়া দিন। (রওজ)

এইভাবে অনেক কাফের মুসলমান হওয়ার বহু ঘটনাবলী ইতিহাসে মণ্ডুদ রহিয়াছে। এই ঘটনার দ্বারা ইহাও জানা গেল যে, আল্লাহ তায়ালার অনেক সময় অন্যদের বরকতে কাহাকেও রিযিক দান করেন। যাহারা পায়, তাহারা নিজেদের নিবুদ্ধিতার কারণে মনে করে যে, ইহা আমাদের

কৃতিত্ব, আমাদের চেষ্টার ফল।

হাদীস শরীফে এই বিষয় অনেক জায়গায় বর্ণিত হইয়াছে যে, তোমাদের দুর্বলদের বরকতে (অনেক সময়) তোমাদিগকে রিযিক দেওয়া হয়। এই ঘটনা দ্বারা আরও বুঝা গেল যে, অনেক সময় কাফেরদের উপরেও মুসলমানদের কারণে গায়েবী সাহায্য হয়। দেখিতে যদিও কাফেরদের প্রতি সাহায্য মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে উহা মুসলমানদের ওসীলায় হইয়া থাকে।

৬৯ এক বুয়ুর্গ বলেন, আমি একটি গোলাম খরিদ করিলাম। যখন তাহাকে ঘরে আনিলাম, তখন জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার নাম কি? সে বলিল, মনিব যেই নাম রাখিবেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কি কাজ করিবে? সে বলিল, হে আমার মনিব! আপনি যাহা হুকুম করিবেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কি খাইতে চাও? (আমি তোমার জন্য উহার ব্যবস্থা করিব।) সে বলিল, হে আমার মনিব! আপনি যাহা খাওয়াইবেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমারও কি কোন জিনিস খাইতে ইচ্ছা হয়? সে বলিল, মনিবের সম্প্রদায় গোলামের আবার কিসের চাহিদা? মনিবের যাহা মর্জি হয় উহাই গোলামের চাহিদা। তাহার এই জবাব শুনিয়া আমার কান্না আসিল। আমার খেয়াল হইল যে, আমারও তো আমার মাওলার সহিত এইরূপ আচরণই হওয়া উচিত। আমি তাহাকে বলিলাম, তুমি তো আমাকে আমার মনিব আল্লাহ তায়ালা সহিত আদব শিখাইয়া দিলে। তখন সে দুইটি কবিতা পড়িল যাহার অর্থ এই—

যদি তোমার কোন বান্দার খেদমত আমার দ্বারা পুরাপুরি আদায় হইয়া যায়, তবে উহা হইতে বড় নেয়ামত আমার জন্য আর কি হইতে পারে। অতএব, তুমি শুধু আপন অনুগ্রহ দ্বারা আমার ক্রটি ও গাফলতিকে মাফ করিয়া দাও। কেননা, আমি তোমাকে বড় অনুগ্রহকারী এবং বড় দয়ালু মনে করি। (রওজ)

৭০ হযরত মালেক ইবনে দীনার (রহঃ) বিখ্যাত বুয়ুর্গদের মধ্যে ছিলেন। এই কিতাবেও তাহার কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি প্রথম জীবনে খুব ভাল অবস্থায় ছিলেন না। এক ব্যক্তি তাহাকে তাহার তওবার ঘটনা জিজ্ঞাসা করিল যে, আপনার অতীত জীবন হইতে তওবা করার কারণ কি ছিল? তিনি বলিতে লাগিলেন, আমি একজন সিপাহী ছিলাম। শরাবের বড় আসক্ত ও অভ্যস্ত ছিলাম। সবসময় শরাবের

মধ্যেই ডুবিয়া থাকিতাম। আমি একটি বাঁদী খরিদ করিলাম, সে অত্যন্ত সুন্দরী ছিল এবং তাহার সহিত আমার খুবই সম্পর্ক ছিল। তাহার গর্ভে আমার একটি কন্যা সন্তান জন্মলাভ করিল। মেয়েটির প্রতি আমারও মহব্বত ছিল এবং সেও আমার প্রতি খুব আকৃষ্ট ছিল। যখন সে হাঁটিতে লাগিল, তখন তাহার প্রতি আমার আরও বেশী মহব্বত হইয়া গেল এবং সবসময় সে আমার নিকটেই থাকিত। কিন্তু তাহার অভ্যাস ছিল যে, যখন আমি শরাবের গ্লাস পান করিবার জন্য লইতাম, তখন সে আমার হাত হইতে উহা ছিনাইয়া লইয়া আমার কাপড়ে ঢালিয়া দিত। অধিক মহব্বতের দরুন তাহাকে ধমক দিতে মন চাহিত না। যখন তাহার বয়স দুই বৎসর হইল, তখন সে মারা গেল। এই ব্যথা আমার অন্তরকে জ্বলম করিয়া দিল। একদিন ১৫ই শাবানের রাত্রি ছিল, আমি শরাবের নেশায় বিভোর ছিলাম। এশার নামাযও পড়ি নাই ; এই অবস্থাতেই আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। স্বপ্নে দেখিলাম, হাশরের ময়দান কায়েম হইয়া গিয়াছে। লোকেরা নিজ নিজ কবর হইতে বাহির হইতেছে। আমিও ঐ সমস্ত লোকের মধ্যে রহিয়াছি, যাহারা হাশরের ময়দানের দিকে যাইতেছে। আমি আমার পিছনে কেমন যেন মৃদু শব্দ শুনিতে পাইলাম। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম বিকট একটি কাল অজগর সাপ আমার পিছনে দৌড়াইয়া আসিতেছে। উহার চক্ষু নীলবর্ণ, মুখ হা করিয়া দ্রুতগতিতে আমার দিকে দৌড়াইতেছে। আমি উহার ভয়ে ঘাবড়াইয়া ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া দ্রুত পলায়ন করিতেছি, আর উহা আমার পিছনে ধাওয়া করিতেছে। সম্মুখে অত্যন্ত মূল্যবান পোশাক পরিহিত সুগন্ধিময় একজন বৃদ্ধ লোকের সহিত আমার দেখা হইল। আমি তাহাকে সালাম করিলাম, তিনি জবাব দিলেন। আমি তাহাকে বলিলাম, আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে সাহায্য করুন। তিনি বলিতে লাগিলেন, আমি দুর্বল মানুষ আর ইহা খুব শক্তিশালী, আমি ইহার মুকাবিলা করিতে পারিব না, কিন্তু তুমি দৌড়াইয়া চলিয়া যাও ; হয়ত সম্মুখে কোন জিনিস এইরূপ পাইয়া যাইবে, যাহা দ্বারা ইহা হইতে তুমি মুক্তি পাইয়া যাইবে। আমি অস্থির হইয়া দৌড়াইতেছিলাম। অবশেষে একটি টিলা দেখিতে পাইয়া উহার উপর উঠিয়া গেলাম, কিন্তু উপরে উঠিতেই টিলার অপর দিকে জাহান্নামের জ্বলন্ত আগুন দৃষ্টিগোচর হইল। উহার ভয়ংকর আকৃতি ও দৃশ্য দেখিতে পাইলাম। এই সমস্ত অবস্থা দেখা সত্ত্বেও সাপের ভয়ে আমি এত ভীত ছিলাম এবং এমনভাবে ভাগিতেছিলাম যে, আমি প্রায় জাহান্নামের গর্ভে পড়িয়া যাইতেছিলাম। এমন সময় একটি জোর আওয়াজ শুনিতে

পাইলাম। কেহ বলিতেছে, পিছনে হটিয়া যাও ; তুমি জাহান্নামী লোকদের মধ্যে নও। আমি সেখান হইতে আবার পিছনের দিকে দৌড়াইলাম। সাপটিও আমার পিছনে ফিরিয়া আসিল। পুনরায় সাদা পোশাক পরিহিত বৃদ্ধ লোকটির সহিত দেখা হইল। আমি তাহাকে বলিলাম, পূর্বেও আপনাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম যে, এই অজগর হইতে যে কোন প্রকারে আমাকে রক্ষা করুন, আপনি কবুল করেন নাই। বৃদ্ধ লোকটি কাঁদিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, আমি অনেক দুর্বল আর এই সাপ অত্যন্ত শক্তিশালী ; আমি উহার মুকাবেলা করিতে পারিব না। অবশ্য সম্মুখে দ্বিতীয় আরেকটি পাহাড় আছে, তুমি উহার উপর চড়িয়া যাও, সেখানে মুসলমানদের কিছু আমানত রক্ষিত আছে। হইতে পারে তোমারও কোন এমন জিনিস আমানত স্বরূপ থাকিবে, যাহার সাহায্যে এই অজগর হইতে বাঁচিতে পারিবে। আমি দৌড়াইয়া উহার উপর উঠিলাম, আর সেই অজগর সাপটিও আমার পিছনে পিছনে আসিতেছিল। আমি সেখানে দেখিলাম, একটি গোল পাহাড়। উহাতে অনেকগুলি খোলা জানালা রহিয়াছে। সেইগুলির উপর পর্দা দেওয়া রহিয়াছে। প্রত্যেকটি জানালার দুইটি করিয়া স্বর্ণের কপাট রহিয়াছে। যাহাতে ইয়াকুত ও মুক্তা জড়ানো রহিয়াছে। প্রতিটি দরজার উপর একটি রেশমী পর্দা ঝুলিতেছে। আমি যখন উহার উপর উঠিতে লাগিলাম, তখন ফেরেশতারা আওয়াজ দিল, কপাট খুলিয়া দাও, পর্দা উঠাইয়া দাও এবং বাহির হইয়া আস। হইতে পারে এই দুর্দশাগ্রস্ত লোকটির কোন আমানত তোমাদের মধ্যে এরূপ রহিয়াছে, যাহা এখন তাহাকে এই মুসীবত হইতে মুক্তি দিতে পারে। তাহার আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গেই কপাট খুলিয়া গেল এবং পর্দা উঠিয়া গেল আর ভিতর হইতে চাঁদের মত সুন্দর চেহারার অনেকগুলি বাচ্চা বাহির হইয়া আসিল। কিন্তু আমি অত্যন্ত পেরেশান ছিলাম যে, সাপটি একেবারে আমার নিকটে আসিয়া গিয়াছিল। ইতিমধ্যে বাচ্চারা চিৎকার দিতে লাগিল—আরে তোমরা সকলেই জলদি বাহির হইয়া আস। সাপটি তো একেবারে তাহার নিকটে আসিয়াই পড়িল। ইহাতে বাচ্চারা দলে দলে বাহির হইয়া আসিল। তাহাদের মধ্যে হঠাৎ আমি আমার সেই দুই বৎসরের মেয়েটিকে দেখিতে পাইলাম, যে মারা গিয়াছিল। সে আমাকে দেখিয়াই কাঁদিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল, আল্লাহর কসম ! ইনি তো আমার আব্বা। এই বলিয়াই তীরের মত লাফ দিয়া একটি নূরের পাল্লার উপর চড়িয়া গেল এবং তাহার বাম হাতটি আমার ডান দিকে বাড়াইল। আমি ভাড়াভাড়ি তাহাকে জড়াইয়া ধরিলাম, আর সে তাহার ডানহাত সাপটির

দিকে বাড়াইল ; তৎক্ষণাৎ উহা পিছনে পলায়ন করিতে লাগিল। অতঃপর সে আমাকে বসাইল এবং নিজে আমার কোলে বসিয়া গেল। আর তাহার ডানহাতটি আমার দাড়ির উপর বুলাইতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল, হে আমার আব্বাজান! اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ اٰمَنُوا الْاِيْمَةَ অর্থাৎ, ঈমানওয়ালাদের (মধ্যে যাহারা গুনাহের মধ্যে লিপ্ত থাকে, তাহাদের) জন্য কি এখনও সময় আসে নাই যে, তাহাদের দিল আল্লাহর যিকিরের জন্য এবং ঐ সত্য কথার জন্য যাহা তাহাদের উপর নাজিল হইয়াছে ঝুকিয়া যাইবে? (হাদীদ : ১৬) তাহার এই কথা শুনিয়া আমি কাঁদিতে লাগিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, বেটি! তোমরা কি সকলেই কুরআন শরীফ জ্ঞান? সে বলিতে লাগিল, আমরা সকলেই কুরআন শরীফ তোমাদের চেয়ে বেশী জানি। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, বেটি এই সাপটি কি মুসীবত ছিল, যাহা আমার পিছনে লাগিয়াছিল? সে বলিল, ইহা আপনার বদআমল ছিল, আপনি উহাকে নিজের গুনাহের দ্বারা এত শক্তিশালী করিয়া দিয়াছেন যে, সে আপনাকে এখন টানিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবার ফিকিরে ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ঐ সাদা পোশাক পরিহিত দুর্বল বুয়ুর্গ কে ছিলেন? সে বলিল, তিনি আপনার নেক আমল ছিলেন। যাহাকে আপনি এত দুর্বল করিয়া দিয়াছেন যে, তিনি সাপটিকে আপনার নিকট হইতে দূর করিতে পারেন নাই। (অবশ্য এতটুকু সাহায্য করিয়াছেন যে, বাঁচিবার রাস্তা বলিয়া দিয়াছেন।) আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, বেটি! তোমরা এই পাহাড়ে কি কর? বলিতে লাগিল, আমরা সকলেই মুসলমানদের বাচ্চা, আমরা কিয়ামত পর্যন্ত এখানে থাকিব। আপনাদের আগমনের অপেক্ষা করিতেছি। যখন আপনারা সকলে আসিবেন, তখন আমরা সুপারিশ করিব। অতঃপর আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, তখনও ঐ সাপের ভয় আমার উপর সওয়ার ছিল। আমি উঠিয়াই আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে তওবা করিলাম এবং আমার সমস্ত খারাপ কাজ ছাড়িয়া দিলাম। (রওজ)

এই কিতাব অনুমানের চেয়ে বেশী বড় হইয়া গিয়াছে। শুরু করিবার সময় তো সংক্ষিপ্ত আকারেই লিখিবার খেয়াল ছিল। কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও দীর্ঘ হইয়া গিয়াছে। এখন এমন পর্যায়ে পৌঁছিয়া গিয়াছে যে, কেহ ইহা পড়িবে—এই আশাও কম হইতে চলিয়াছে। কেননা, ধর্মীয় কিতাবাদি পাঠ করিবার মত আমাদের নিকট সময় নাই। এইজন্য এইখানেই শেষ করিলাম। আল্লাহ তায়ালার আপন দয়া ও মেহেরবানী দ্বারা এই নাপাককেও ; যে সবসময় গুনাহ এবং দুনিয়াতেই ডুবিয়া থাকে তাহার

প্রতি মনোযোগী হওয়ার তৌফীক দান করুন এবং এই নাপাক দুনিয়ার প্রতি তহার মনে ঘৃণা সৃষ্টি করিয়া দিন। এই কিতাব হিজরী ১৩৬৬ সালের শাওয়াল মাসে লেখা শুরু হইয়াছিল, কিন্তু বিভিন্ন অসুবিধার কারণে শেষ করিতে দেবী হইতে লাগিল। এখনও ইহাতে অনেক বিষয় সংযোজন করার খেয়াল ছিল, কিন্তু দীর্ঘ হইয়া যাওয়ার কারণে এই পর্যন্তই আজ ২২শে সফর ১৩৬৮ হিজরী জুমআর রাত্ৰিতে সমাপ্ত করিলাম।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ
عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاتَّبَاعِهٖ اٰجَمَعِيْنَ
بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ .

যাকারিয়া উফিয়া আনহু কাঞ্চলবী
মুকীম, মাদ্রাসায়ে মাজাহেরে উলূম
সাহারানপুর।

সমাপ্ত





দারুল কিতাব

৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০